কুরআনিয়াত—২

সুইটহার্ট কুরআন

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

আমি নিজেও লেখালেখির জগতের মানুষ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, এমনকি গভীর রাত অবধি আমাকে রাজ্যের বইপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। হাতের দশ আঙুল কীবোর্ডে চেপে হাজার হাজার পৃষ্ঠার কাজ করেছি বললে অত্যুক্তি হবে না, ইনশাআল্লাহ। যার ফলে বই হাতে নিলেই বুঝতে পারি— কোন বইয়ের পেছনে লেখক কী পরিমাণ শ্রম দিয়েছেন।

ভালোবেসে সবাই যাকে *কুরআনের পাখি* বলে থাকেন সেই মজলুম আলেমে দ্বীন, প্রিয় ভাই মাওলানা আতীক উল্লাহর প্রকাশিতব্য বই *সুইটহার্ট কুরআন* এর প্রাকপ্রকাশনা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে আদ্যোপান্ত পড়া হয়েছে একাধিকবার। যার ফলে বলতে পারি— এটি এমন একটি বই, যা রচনার জন্যে লেখককে শত-সহস্র পৃষ্ঠা পড়তে হয়েছে। কুরআনের একেকটি আয়াতের মর্ম ও আবেদন বোঝার জন্যে শত মুহূর্ত ভাবতে হয়েছে। আয়াতের ভাব-ব্যঞ্জনা ছোট ছোট গল্পে সাজিয়ে তোলার জন্যে মাসের পর মাস গল্পের প্লট ও চরিত্র খুঁজতে হয়েছে। তারপরেই আলোর মুখ দেখেছে সময়ের এই মাস্টারপিস বই।

(অপর ফ্লাপে দ্রষ্টব্য)

...লেখক হিসেবে আতীক উল্লাহ ভাইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বিস্তর পড়েন। জ্ঞানের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, সবগুলোতে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা দাপিয়ে বেড়ান। মুদ্রিত কিতাব থেকে শুরু করে ফেসবুক, টুইটার, পিডিএফ— সবখান থেকেই তিনি জ্ঞান খুঁজে বেড়ান। এ কারণে তার বইয়ের চরিত্রগুলো যেমন কোনো দেশ বা অঞ্চলের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, তেমনই থাকে না কোনো নির্দিষ্ট বলয়ে রুদ্ধ।

আমি আমার সমকালে জ্ঞানের এমন বুভুক্ষু খাদক আরেকজন পাইনি। তাঁর প্রকাশিত বইগুলোতে সেই বিস্তর পড়াশুনার যৎকিঞ্চিৎই প্রকাশ পেয়েছে। আশা করি, আগামীর পৃথিবী তাঁর এমন আরো অনেকগুলো কালজয়ী গ্রন্থ দেখতে পাবে।

মহান আল্লাহ এই ক্ষণজন্মা লোকটাকে নিরাপদ রাখুন। জ্ঞানের এই ফল্গুধারা থেকে বাংলাভাষী পাঠকমহল তৃপ্ত হোক যুগের পর যুগ, অনন্তকাল।

—আবদুল্লাহ আল ফারুক
লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, ১৪৪২ হিজরি

প্রচ্ছদ :: কাজী যুবাইর মাহমুদ

সুইটহার্ট কুরআন

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
শিক্ষক
তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম, সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

মাকতাবাতুল আযহার

ইহদা!

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন

আমার প্রথম শিক্ষক। যার হাতে কুরআন কারীম শিক্ষার হাতেখড়ি। আমার জান্নাত। যিনি আদরে শাসনে স্নেহে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের পথে থাকার পেছনেও অনঢ় কার্যকর ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তাঁর অবিচল দৃঢ় অবস্থান না থাকলে, আধপথে ছিটকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সবকিছু আল্লাহই করেন। বান্দা উসীলামাত্র।

সবার কাছেই নিজের 'মা' বিশেষ কিছু। সবার কাছেই নিজের 'মা' বিশ্বের সেরা মা। আমাদের ভাইবোনদের কাছেও, আমাদের 'আম্মা' সবচেয়ে সেরা 'আম্মা'। আমাদের আম্মা 'মা' ডাক শুনতে পছন্দ করেন না। ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি, আমরা ভুল বা অসমীচীন শব্দ উচ্চারণ করলে, সাথে সাথে সংশোধন করে দিয়েছেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণ বা ভাষার কথা বলছি না। বিশুদ্ধ রুচির কথা বলছি। তারমানে এই নয়, শুধু 'মা' বলে ডাকা অনুচিত বা অরুচিকর। আম্মার নিজস্ব অভিরুচি ও চিন্তায় এক অক্ষরের 'মা' ডাকটা পরিপূর্ণ আদব ভালোবাসা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে না হয়তো। কখনো জানতে চাইনি—কেন তিনি 'মা' ডাকের চেয়ে 'আম্মা' ডাককে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদের মুখ দিয়ে আরও অনেক শব্দ উচ্চারণ, তার সূক্ষ্ম রুচিবোধকে আহত করত। তাই আমরা শব্দ নির্বাচনে সতর্ক থাকতাম। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, 'আম্মা' শব্দটি 'আমার মা' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। দু'টি 'ম' মায়ের ভূমিকা আর অবস্থানকে 'মা'-এর তুলনায় আরেকটু বেশি 'যূথবদ্ধ' আর সন্নিকট করে প্রকাশ করে। 'আম্মু'-ও তাই।

আম্মার আদর্শ আমরা ছয় ভাইবোন তেমন করে ধারণ করতে পারিনি। আম্মার সুতীব্র আত্মসম্মানবোধ, কৃত্রিমতা, ভান-ছল-মিথ্যামুক্ত আচার-আচরণ, আত্মনির্ভরশীলতা, পরনির্ভরশীলতার প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ, সন্তানের নৈতিকতার প্রতি আপোশহীন অবস্থানসহ আরও অসংখ্য গুণাবলী আমরা ভাইবোনেরা প্রতিনিয়ত আত্মস্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাঁর মতো মায়ের সন্তান হতে পেরে আমরা ধন্য। রাব্বে কারীমের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা, তিনি আমাদেরকে এমন

একজন অনন্যসাধারণ 'আম্মা' দান করেছেন। সবার কাছেই নিজের 'মা-আম্মা-আম্মু' অনন্যসাধারণ—

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার প্রতিপালক, তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন। (বনী ইসরাঈল ২৪)

رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

হে আমার প্রতিপালক, আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দেন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক, এবং আমার দোয়া কবুল করে নিন। হে আমার প্রতিপালক, যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইবরাহীম : ৪০-৪১)

জীবনের শেষবেলায় এসে, দিনের দীর্ঘ সময় তাঁর কুরআন তিলাওয়াতে কাটে। এবার একটি বিষয় বেশ অবাক করেছে। বাচ্চারা নানাবাড়ি বেড়াতে গেছে। ঘরে শুধু আম্মা আর আমি। পাশের কক্ষে আমি *সুইটহার্ট কুরআন* নিয়ে ব্যস্ত। সেই ফেলে আসা শৈশবে ফিরে গেছি যেন। আমিও কুরআনে, আম্মাও কুরআনে। মা-বেটা একসাথে কালামুল্লায় নিমগ্ন। লেখার মাঝে আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে হলে, আয়াত টাইপ করতে করতে গুনগুন করে আয়াতখানা তিলাওয়াত করতে ভালো লাগে। মনে হয়, আয়াতের তাদাব্বুর আরেকটু গভীর হয়। এপাশে আমি, ওপাশে আম্মা তাঁর মতো করে তিলাওয়াত করে চলছেন। দুই তিলাওয়াতের গুনগুন সুর মিলে তৈরি হচ্ছিল এক অপূর্ব মূর্ছনা। সন্তান আর মায়ের মিলিত সুর। তখন মনের কোণে একটি তামান্না বারবার উঁকি মারছিল, রাব্বে কারীম যেন জান্নাতেও মায়ের পাশটিতে বসে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করারও তাওফীক দান করেন।

সূচিপত্র

মুকাদ্দিমা

১. শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভীষণ জরুরী। আমাদের এই সংকলন, একান্তই প্রাথমিক কুরআনপ্রেমীগণের জন্য। বিজ্ঞজনের জন্য এই বই উপযোগী নয়। এখন কথা বলার পরিধি অনেক সীমিত হয়ে এসেছে। বিশেষ কারণে, চিন্তাভাবনায় 'ওয়াহান' (ঈমানি দুর্বলতা) ঢুকে পড়াও বিচিত্র নয়। তাছাড়া আমাদের কথাবার্তায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই নিরাপদ হলো, বইয়ের প্রতিটি লেখা, আশেপাশের অভিজ্ঞ কোনো আলিম থেকে যাচাই করে তারপর পড়া। আমরাও চেষ্টা করেছি, জমহুর সালাফ ও জমহুর উলামায়ে কেরামের ইজমাবিরোধী কোনো বক্তব্য-তাফসীর-তাদাব্বুর যেন আমাদের বইয়ে স্থান না পায়। অভিজ্ঞজনদের দেখানো হয়েছে। তারপরও ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আমাদের একটাই তামান্না, হেদায়াত পরিবেশন করতে গিয়ে যেন, গোমরাহির 'এজেন্ট' বনে না বসি। রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে এ-বড় ভয়ংকর শাস্তি। উম্মাহর ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির আছে। রাব্বে কারীম হেফাযত করুন—

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে যখন হিদায়াত দান করেছেন তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করবেন না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহাদাতা (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮)।

২. *সুইটহার্ট কুরআন* একবসায় পড়ে শেষ করা-ধর্মী বই নয়। বিনীত অনুরোধ, বইটি যেন সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে পড়া হয়। বইটির বিন্যাস আঁটসাঁট বা হিজিবিজি মনে হলে, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার করজোড় অনুরোধ। আমাদের মনে হয়েছে—অল্প কিছু মানুষের হলেও, বইয়ের লেখাগুলো কাজে লাগবে। তাই একমলাটে যতটা বেশি সম্ভব লেখা জমা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জীবন অনিশ্চিত। একখণ্ড বের করার পর, আরেক খণ্ড কখন বের হয়, আদৌ বের করা সম্ভব হবে কি না, এই অনিশ্চয়তা থেকেই বইয়ের কলেবরটা বৃহদায়তন হয়ে পড়েছে। করজোড় ক্ষমাপ্রার্থনা।

৩. আমাদের লেখায় নানা সীমাবদ্ধতা আছে। রচনায় প্রসাদগুণেরও গুরুতর রকমের অভাব আছে. বইয়ের বিষয়ও গুরুগম্ভীর। আরও নানাবিধ কারণে, বইটা একটানা পড়ে যাওয়া হয়তো পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর নাও হয়ে উঠতে পারে। আমাদের উপস্থাপন ও ভাষাগত দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে, পুরো বইটা ইচ্ছা না করলেও, জোর করে হলেও রয়েসয়ে ধীরে ধীরে সময় লাগিয়ে একবার পড়ে নেয়ার বিনীত অনুরোধ। কিছু-না-কিছু ফায়েদা অবশ্যই হবে, ইন শা আল্লাহ। আমরা প্রতিটি মুনাজাতে নিজের এবং সুপ্রিয় পাঠকের হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য কায়মনোবাক্যে রাব্বে কারীমের দরবারে দোয়া করে যাব, ইন শা আল্লাহ। ইয়া রাব্বাহ, বইয়ে কোনো ভুল থেকে গেলে, তার প্রভাব যেন সুপ্রিয় পাঠকের ওপর না পড়ে।

৪. অনেক সময় এমন হয় না, একটা কথা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না, কিছু পড়তে গিয়ে, কোনো দৃশ্য দেখে, চট করে কথাটি মনে পড়ে যায়। আমাদের বইটা কারও কারও ক্ষেত্রে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এই বই থেকে বিজ্ঞ পাঠকগণের নতুন করে কিছু পাওয়া হবে না, তবে ভেতরে থাকা 'ঘুমন্ত জানাকে' নতুন করে জাগিয়ে তুলবে হয়তো। এতদিন যা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছিল না, এই বই হাতে নেওয়ার পর, হারানো স্মৃতি হয়তো জেগে উঠতে পারে। এমনটাই আমাদের ধারণা।

৫. এই খণ্ডে, আয়াত-নির্ভর তাদাব্বুর-নসীহার চেয়ে, কুরআনঘেঁষা উৎসাহবর্ধক বক্তব্য বেশি হয়ে গেছে বোধহয়। কথাটা কেমন শোনায় বুঝতে পারছি না, তবুও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুআল্লিমুল কুরআন ও আব্বু-আম্মুদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ করতে মন চাচ্ছে। তারা ভাল মনে করলে—প্রতিদিন বা মাঝেমধ্যে *সুইটহার্ট কুরআন* থেকে কিছু অংশ বাচ্চাদের পড়ে শোনাতে পারেন। এই খণ্ডে কিছু লেখা এমন, যেগুলো তালীমের মতো করে পড়া যায়। বড়ো লেখা হলেও, পুরো লেখাকে ছোটো ছোটো করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নাম্বারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নাম্বারকে উক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৬. এই খণ্ডের লেখাগুলোতে প্রথম খণ্ডের তুলনায় বেশি 'উপদেশ-উপদেশ' গন্ধও লেগে গেছে? হয়তোবা। আসলে কখন কী হয়, এই অন্তর্লীন আশংকা থেকেই, মনে হলো, লেখাগুলো পাঠকের কাছে জমা দিয়ে দেওয়া দরকার। তৃতীয় খণ্ড কবে বের করা যাবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চেয়ে বরং যতবেশি সম্ভব লেখা ছাপার অক্ষরে চলে আসাই ভালো। কুরআন

কারীমের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, এমন লেখাই বেশি স্থান পেয়েছে এ-খণ্ডে। একেকটি খণ্ডের একেক রঙ হোক, এমনটাই আমাদের ইচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডের রঙ হবে নতুন আরেক ধরনের, ইন শা আল্লাহ। একজন ভাইবোনও যদি আমাদের কথা পড়ে, কুরআন কারীম তিলাওয়াতে আগ্রহী হন, কুরআন হিফযে আগ্রহী হন, অসামান্য কুরআন নিয়ে, আমাদের এই সামান্য প্রয়াস সার্থক।

৭. একেকটি শিরোনামের অধীনে অনেক ভাবনা জড়ো করা হয়েছে। এক শিরোনামের অধীনে উপশিরোনামগুলো দেখে মনে হতে পারে, সব লেখা 'এক বসাতে' তৈরি হয়েছে বা এক দিন বা একবারের চিন্তানির্যাস থেকে প্রস্তুত হয়েছে। জি না, এমনো হয়েছে—একেকটি ভাবনা একেক বৈঠকে লেখা হয়েছে। বেশিরভাগ ভাবনাই স্বতন্ত্র। নানা সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে মাথায় এসেছে। একটি ভাবনার সাথে আরেকটি ভাবনার সময়পার্থক্য দশ থেকে পনের বছরও আছে। ফিল্মমেকিং বা চলচ্চিত্র নির্মাণবিদ্যার সাথে যাদের পরিচয় আছে, তারা বুঝতে পারবেন। অসংখ্য দৃশ্যের শট আলাদা আলাদা করে নিয়ে, পরে এডিটিংয়ের সময় সেগুলোকে জায়গামতো ধারাবাহিকভাবে বসানো হয়। আমাদের অনেক লেখাও এমনই।

৮. বড়ো লেখাগুলো দেখলে প্রতিটিকে স্বতন্ত্র লেখা মনে হলেও, প্রতিটি লেখা সাজিয়ে তুলতে কতশত লেখায় যে চোখ বোলাতে হয়েছে, বলে শেষ করা যাবে না। এমনো হয়েছে—দশ-বিশ পৃষ্ঠা কখনো আরও বেশি পড়ে, ওখান থেকে ছেঁকে তুলতে পেরেছি মাত্র একটি বাক্য। তারপরও স্বীকার করতে দোষ নেই, এত ছাঁকাছাঁকি আর বাছাবাছির পরও বইয়ের কিছু কিছু জায়গার বাক্য ও বক্তব্যের বাঁধুনি অটুট রাখতে পারিনি। কিঞ্চিত শিথিল হয়ে গেছে। এলিয়ে নুয়ে গেছে। সীমিত যোগ্যতায় এরচেয়ে বেশি আর কীইবা করতে পারি। আমাদের পরে আরও যোগ্যতর লোক আসবে, ইন শা আল্লাহ। তারা আমাদের ঘাটতিগুলো পুষিয়ে দেবে।

৯. কুরআন সম্পর্কে ছোট্ট একটি সুন্দর কথা, চমৎকার একটি উক্তি সংগ্রহের জন্য আমরা কী না করেছি। কুরআন-বিষয়ক নতুন কোনো খবর, অভিনব কোনো প্রয়াস জানার জন্য, আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার শুনেছি। ঢাউস ঢাউস কিতাব পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গেছি। ভিনদেশী কোনো কুরআনী প্রয়াসের সংবাদ পেয়ে, অনেক কায়দা কসরৎ করে ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছি। ভাষাগত দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি। ইংরেজী/আরবী মেসেজে প্রশ্ন পাঠিয়ে অনেক টাকা খরচ করে ডিরেক্ট কল

করেছি। প্রশ্নের উত্তর রেকর্ড করে, অভিজ্ঞজন থেকে অনুবাদ করে উত্তর উদ্ধার করেছি। বিশেষত আফ্রিকার দেশগুলোতে ফরাসীর প্রচলন। আবার মাগরিব অঞ্চলে বারবার ভাষার প্রচলন। দু'টো ভাষাই অধরা। কুরআন কারীমের অভিনব সব মেহনত এই অঞ্চলগুলোতেই হচ্ছে। কুরআন কারীমের জন্য আমরা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত—

For we are bound where
mariner has not yet dared to go,

And we will risk the ship,
ourselves and all

আমরা যাবো যেখানে কোনো
যায়নি নেয়ে সাহস করি,

ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন
ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।

১০. কুরআন কারীম ও সুন্নাহ উভয়টাই ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। এ-দু'টির সহযোগী আরও দু'টি সহায়ক বিষয় আছে—ইজমা ও কিয়াস। আমরা এখানে শুধু কুরআন কারীমের কথা বলেছি, তাই অন্য উৎসের আলোচনা তেমনটা স্থান পায়নি। কুরআন কারীম বুঝতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই সুন্নাহর প্রয়োজন।

১১. একান্ত আপন

হয়েছে এক মধুর বিড়ম্বনা। আগে ছিল বইয়ের ভালোবাসা। পরে যোগ হয়েছে বউয়ের ভালোবাসা। দুই ভালোবাসাকে ছাপিয়ে আরেকটা ভালোবাসাও ছিল—কুরআন কারীমের ভালোবাসা। কুরআনের ভালোবাসার হাত ধরে এলো আরেক দুর্নিবার পিপাসা—তামান্নায়ে শাহাদাত। শাহাদাতের ভালোবাসা।

১২. প্রথম প্রেম

কায়দা-আমপারা শেষ করে, কুরআন শরীফ নিয়েছি ওই মুসহাফ দিয়ে। পুরো হিফয-জীবন ওই 'মুসহাফের' সান্নিধ্যে কেটেছে। হিফয শেষ হওয়ার পরও কিছুদিন ছিল। এরপর কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর খুঁজে পাইনি। জীবনের এক অতৃপ্ত কষ্ট রয়ে গেল। যেখানে যেখানে থাকার কথা, সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি। আজো খুঁজে ফিরছি আমার প্রথম ভালোবাসার কুরআনখানাকে।

১৩. হেফযখানায় কোথাও ভুল হলে, রঙিন কাগজ দিয়ে লোকমা দিতাম। নানারঙের লোকমার কাগজ ছিল। আমরা লোকমার কাগজ বানাতাম বিস্কুটের প্যাকেট থেকে। আল-আমীন কোম্পানির 'পাইনএপেল' বিস্কুটের লম্বা প্যাকেট থেকে। সেই ক্ল্যাসিক বিস্কুট। দু'টি বিস্কুট জোড়া লাগানো থাকত। ভেতরে থাকত সাদা ক্রিমের পুর। চিনি চিনি স্বাদ। ঢাকার নাবিস্কো বিস্কুটের প্যাকেট দিয়েও কখনো কখনো লোকমার কাগজ বানাতাম। লোকমার কাগজ মুখে লাগিয়ে দাঁত দিয়ে ছেঁড়ার সময় সময় নাকে লাগত বিস্কুটের সুবাস, জিভে আসত হারানো স্বাদ। কিনে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না, সুবাসই সহি। এ বিস্কুটের প্যাকেট হাসিল করা সহজ ছিল না। কিনে খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। মাদরাসার সবাই গরীব। বাড়িতে মেহমান এলে তারা সাথে করে আনত। বিস্কুট ভাগে পড়ত জোড়ার অর্ধেক। কখনো আমার ভাগের বিস্কুটের সাথে কিছুটা ক্রিম লেগে থাকত, কখনো অন্যভাগেই সব ক্রিম থেকে যেত। কখনোই শখ মিটিয়ে এই বিস্কুট খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এখন আর সে সুযোগও নেই। কোম্পানির উৎপাদনই বন্ধ হয়ে গেছে। ভালোবাসার প্রথম কুরআন শরীফখানা ছিল আমার হিফয-জীবনের ইতিহাস। কুরআন হিফযের খতিয়ান। নোয়াখালির আল-আমীন আর ঢাকার নাবিস্কো কোম্পানি কি জানতেন, তাদের বিস্কুটের প্যাকেটের জন্য আল্লাহর কালামের শিক্ষার্থীরা কী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনত?

১৪. কুরআন শরীফকে গিলাফে মুড়িয়ে রাখতে হতো। এটা ছিল বাধ্যতামূলক। আমাদের হুজুর নিয়মিত তদারকি করতেন, কার কার কুরআনের গিলাফ আছে, কার কার নেই। গিলাফ থাকলেই হতো না, নিয়মিত ধুয়েমুছে পরিচ্ছন্ন রাখতে হতো। সবক শোনাতে গেলে, হুজুর হাতে নিয়ে দেখতেন গিলাফ ধোয়া আছে কি না। অপরিষ্কার থাকলে, সবক না শুনেই উঠিয়ে দিতেন। তখনি গিলাফ ধুয়ে সবক শোনানোর লাইনে বসতে হতো।

১৫. ছুটিছাটায় কুরআন কারীম মাদরাসায় রেখে আসা চলত না। সেলাই করার সময়ই গিলাফে একটা তোড়া থাকত, গলায় ঝোলানোর জন্য। বাড়ি আসার সময় গলায় ঝুলিয়ে কুরআনখানা সাথে করে নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক ছিল। দীর্ঘ প্রায় তিন কিলোমিটার হেঁটে আসতে হতো রেলস্টেশনে। আমরা যারা ট্রেন ধরব, তারা ছুটি হওয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়তাম। একদল কিশোর গলায় কুরআন ঝুলিয়ে হাসিমুখে হেঁটে যাচ্ছে, দৃশ্যটা গ্রামের শিশুকিশোর আর বালিকা-বধূদের খুবই মুগ্ধ করত। বালিকা ও বধূরা পুকুরপাড়ে বাসনমাজা

ছেড়ে দৌড়ে আমাদের দেখতে রাস্তার পাশের বাঁশঝাড়ের আড়ালে এসে ভীড় জমাত। দীর্ঘদিন পর ছাড়া পেয়েছি। কুরবানী বা রোযার ঈদের লম্বা ছুটি সামনে। কী ভীষণ আনন্দ নিয়ে স্টেশনমুখো হতাম, সে বলে বোঝানো যাবে না। স্টেশনে আসার পথে কয়েকবার থেমে খেলায় নেমে পড়তাম। হাঁটার সময় কখনোই কুরআনখানা কাঁধে ঝুলিয়ে একপাশে লটকে নিতাম না। এভাবে ব্যাগের মতো কুরআনখানা ঝুলিয়ে নেওয়াকে কুরআনের সাথে বেআদবি মনে করা হতো। পরম আদরে গলায় ঝুলিয়ে বুকের সাথে লেপ্টে নিতাম। জোরে হাঁটলে, খেলাচ্ছলে দৌড়ালে, কুরআন কারীমখানা যেন অসম্মানজনকভাবে হেলাদোলা না খায়, সেজন্য দৌড়ানোতে ব্যাঘাত ঘটলেও, ডানহাত দিয়ে মুসহাফখানা বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতাম। ভুলেও বামহাত দিয়ে কুরআন শরীফ ধরতাম না।

১৬. অনেক সময় দেখা যেত, ছুটির দিন মাদরাসা থেকে বের হয়েছি সময়মতোই। স্টেশনের কাছাকাছি নাবাল জমিতে গ্রামের ছেলেদের হুটোপুটি করতে দেখে, বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলে তাদের সাথে নেমে পড়েছি। কোন্ ফাঁকে রেলের সময় হয়ে গেছে, টেরও পাইনি। ট্রেনের দূরাগত হুইসেল শুনে সম্বিত ফিরত। খেলার মোহে পড়ে দুনিয়াদারি ভুলে গেলেও, আমরা কুরআনের সম্মানের কথা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হতাম না। হেফযখানার মহান হুজুরদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে, কুরআনের মহব্বত আমাদের হৃদয়ের গভীরে শেকড় গজিয়ে বসে যেত। শতখেলায় বুঁদ হলেও কুরআনের সম্মানের কথা বিলক্ষণ মনে থাকত। পালা করে একজন সবার কুরআন হাতে নিয়ে দাঁড়াত। কোথাও রাখতে বা গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে রাখতেও অস্বস্তি বোধ হতো। মনে হতো—এভাবে রাখলে কুরআন কারীমের অসম্মান হবে।

১৭. ট্রেনের হুইসেল শুনে ভোঁ-দৌড় দেওয়ার সময়ও সর্বোচ্চ মনোযোগ থাকত 'কলিজার টুকরা' মুসহাফের দিকে। দৌড়ের গতি যতই তীব্র হোক, কুরআনখানা সর্বোচ্চ চেষ্টায় বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতাম। একটুও যেন নড়চড় না হয়। এবার ট্রেনে চড়ার পালা। প্রচণ্ড ভিড়ে ট্রেনের পা-দানিতে পা রাখা দায়; যে কোনো মূল্যে ট্রেনে চড়তেই হবে। এই একটাই ট্রেন। অন্য কোনো উপায় নেই। গাদাগাদি ভিড়েও কীভাবে যেন এইটুকুন শরীর সাপটে-সুপটে উঠে পড়তাম। এতকিছুতেও কুরআন কারীম বুকেই আছে। মানুষের চাপ নিজের শরীর দিয়ে আগলাতাম। শত ঝড়ঝাপ্টা শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যেত, ছোট্ট শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে হলেও বুকে থাকা কুরআনখানার ওপর আঁচড়টিও লাগতে দিতাম না। কুরআন কারীমের সম্মান রক্ষার্থে অমানুষিক কষ্ট

দাঁতমুখ চেপে সহ্য করেছি। লোকাল ট্রেন। প্রতিটি স্টেশনেই থামে। যত থামে তত ভিড় বাড়ে। গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ট্রেনের অবস্থা দাঁড়াত সোনার তরীর মতো—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। পুরো ট্রেনে তিলধারণের জায়গা নেই। প্রিয় কুরআন আর বুকে রাখা যাচ্ছে না। ভিড়ের এত চাপ, ডানহাত বুকের যেখানে রেখেছি, সেখান থেকেও একবিন্দু নড়ানো যাচ্ছে না। পুরো গাড়ি মৌচাক বা পিঁপড়ার বাসার মতো একটি 'চাকে' পরিণত হয়েছে। একেকটি বগিতে আগাগোড়া সব যাত্রী মিলে একটি দেহ যেন। কারও বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার সুযোগ নেই। এমন ঘন সন্নিবদ্ধ আঁটুনিতেও জানপ্রাণ এক করে কুরআন কারীমকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলে এনেছি। বাকি পথ হাত উঁচিয়ে কুরআন শরীফকে মাথার ওপর ধরে রেখেছি। কুরআন কারীমের সম্মান-রক্ষায় এমন মরণপণ প্রচেষ্টা শুধু একজন নয়, আমরা যারা হেফযখানায় পড়তাম, তাদের প্রায় সবাই এমন যত্নবান ছিলাম।

১৮. কুরআন শরীফ উঁচিয়ে রাখতে রাখতে হাঁত ব্যথা হয়ে যেত। নামানোর উপায় ছিল না বে। মনে হতো অনন্ত অসীম কাল ধরে হাত উঁচিয়ে ধরে আছি তো আছিই, ট্রেনও শম্বুক গতিতে চলছে। একসময় গন্তব্যে এসে নামতাম। ট্রেন থামলেই কি সাথে সাথে নামার জো আছে, দরজা থেকে যাত্রী নেমে নেমে চাপাচাপি গাদাগাদির বজ্রআঁটুনি শিথিল হতেও অনেক সময় লেগে যেত। ভিড় পাতলা হয়ে এলে, কুরআনখানাকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে, দরজার দিকে অগ্রসর হতাম। দ্রুত বাস-স্টেশনে যেতে হবে। দেরি করলে দিনের শেষ বাস পাওয়া যাবে না। কুরআন বুকে জড়িয়ে আবার দৌড়। তখন অত রিকশা ছিল না। কখনো শেষ বাস পেতাম, কখনো পেতাম না। না পেলে ফের স্টেশনে ফিরে বেঞ্চে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু হতো। মশার কামড় ছিল। দুষ্টলোকের আনাগোনা ছিল। সাথে জ্বিনভূতের ভয়। তখনো মসজিদগুলো তালাচাবির খপ্পরে পড়েনি। স্টেশন মসজিদের দরজা খোলা থাকত। সেখানে থাকতে ভয় লাগত। স্টেশনে বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিতাম। এই দুঃসময়ে কুরআন শরীফ সাথে থাকার উপকারিতা বুঝে আসত। সাথে কুরআন শরীফ দেখে দুষ্টলোকেরাও কাছে ঘেঁষত না। পকেটে ভাড়ার অতিরিক্ত কোনো টাকাও থাকত না। রাতে স্টেশনের কলের পানিই শরাবান তাহুরা। পেটভরে পানি পিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে তিলাওয়াত করতে করতে কোন ফাঁকে ফজরের আযান শুরু হতো। ভাগ্য ভালো থাকলে, কোনোবার স্টেশন মাস্টারের বাড়িতেও ঠাঁই জুটত। মাস্টারের স্ত্রী আমাদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে চাইতেন। এই দম্পতির কথা আপাতত তোলা থাক।

১৯. রাতের ট্রেন সময়মতো পৌঁছলে, বাস ধরার জন্য ছুট দিতে হতো। স্টেশন থেকে বাস পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার। আবার আগের মতো কুরআন কারীম বুকে জড়িয়ে দৌড়। জীবনটাই আসলে অসংখ্য দৌড়ের সমন্বয়। দেখা যেত—হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকম বাস ধরতে পেরেছি। বাস না বলে, ধানের গোলা বলাই ভালো। এটাই আজকের শেষ বাস। ঠেসে ঠেসে যাত্রী তোলা হয়েছে। ছাদও ভর্তি। পেছনে ছাদে ওঠার মইয়েও পা রাখার জায়গা নেই। জীবনের মায়া ত্যাগ করে বাড়ি ফিরছে সবাই। মাদরাসা থেকে বের হওয়ার সময় হুজুর প্রতিজ্ঞা করিয়ে দিয়েছেন—কুরআন শরীফ ব্যাগে নিয়ে যাওয়া যাবে না। গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। উসতাদের আদেশ পালন করতে গিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতো। হুজুরের যুক্তি ছিল—গলায় কুরআন ঝোলানো থাকলে, ছেলেরা গুনাহের শিকার হবে না। হুজুরের যুক্তির পেছনে কিছু দুষ্ট ছেলের আচরণ দায়ী ছিল। তারা ছুটির দিন বাড়ি যাওয়ার সময় শহরে এসে অহেতুক ঘোরাঘুরি করত। হুজুর বাধ্য হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

২০. ট্রেনের চেয়েও বাসে কুরআনের সম্মান রক্ষা আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠত। কুরআন বুকে ঝুলিয়ে চলার উপকারিতা সেই বয়েসেই অনুভব করতাম। কুরআন বুকে ঝুলিয়ে গুনাহের জায়গায় যাওয়া যেত না। বাস থেকে নামতে নামতে রাত গভীর। ভরদুপুরেও নিঝুম গ্রামের পথ চলতে যেখানে গা ছমছম করত, গভীর রাত হলে তো কথাই নেই। কুরআন সাথে থাকলে, ভরসা লাগত। ভয় কাটাতে জোরে জোরে তিলাওয়াত করতাম, কুরআনখানা বুকে জড়িয়ে মনে হতো, আর কোনো চিন্তা নেই, পথ যত বিপদসংকুলই হোক, কোনো ক্ষতি আমাকে ছুঁতে পারবে না। কুরআন বুকে জড়িয়ে আরেকটি জায়গায় ভরসা খুঁজে পেতাম। প্রতিদিন ভোরে নতুন সবক শোনানোর সময় লাইন ধরতে হতো। ঘুম থেকে উঠেই কেউ বালিশ দিয়ে, কেউ কাঁথা দিয়ে লাইনে জায়গা ধরতাম। কে কার আগে সবক শোনাবে, এ নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হতো। হুজুর আইন করে দিয়েছিলেন, সবকের লাইনে কেউ কুরআন শরীফ সাথে রাখতে পারবে না। সবক শোনার ব্যাপারে হুজুর অত্যন্ত কঠোর আপোশহীন অবস্থানে থাকতেন। মদগুন্না তাজবীদ ঠিক থাকা ফরযে আইন ছিল। পড়া শোনানোর সময় সামান্যতম দ্বিধাও থাকা যাবে না। পান থেকে একটু চুন খসার উপায় ছিল না। একটু এদিক-ওদিক হলেই কেয়ামত...। হুজুরের কথা ছিল, নতুন সবক একলাইন হোক আপত্তি নেই, তবে সবকটা হতে হবে আয়নার মতো তকতকে। (হুজুরের ভাষায়) কোনো রকমের 'শকো-শোবার' অবকাশ থাকতে পারবে না। শত ইয়াদের পরও,

মাঝেমধ্যে প্যাঁচ লেগে যেত। আর যায় কোথায়, বেধড়ক সপাং সপাং। এমন বেগতিক অবস্থা দেখে আমরা হিফয দূরের কথা, নাজেরা পর্যন্ত ভুলে যেতাম। তখন সাথে কুরআন থাকলে, বুকে জড়িয়ে হলেও নিশ্চিন্ত বোধ হতো।

<u>২১.</u> আমরা হুজুরের কাছে বিনীত আবেদন জানিয়েছিলাম, একদম কুরআন ছাড়া থাকতে ভরসা লাগে না। সবকের লাইনে কুরআন শরীফ দেখব না, শুধু বুকে জড়িয়ে রাখব। হুজুর একটু নরম হয়েছিলেন। পরিবর্তিত আইন হলো, পনের পারার কমে যাদের সবক, তারা কুরআন রাখতে পারবে। এর বেশি পারা যাদের হিফয হয়েছে, তারা কুরআন ছাড়া সবকের লাইন ধরবে। কারণ, বাকি জীবন সবসময় কুরআন কারীম সাথে নিয়ে ঘুরতে পারবে না। তাই আগে থেকেই কুরআন না দেখে পড়ার অভ্যেস গড়ে ওঠা ভালো। কুরআন কারীম বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। কুরআন বুকে জড়িয়ে আমরা প্রায় প্রতিদিনই বেতের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কুরআন কারীমখানা বুকে জড়িয়ে ধরলেই, মনে হতো আমি সেই ছোটোবেলার মতো মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছি। আমার আর কোনো ভয় নেই। কুরআন কারীম সত্যি সত্যিই মুমিনের অপূর্ব এক আশ্রয়,

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল...।

<u>২২.</u> নিজস্ব বিবির মতো, নিজস্ব একটা (নাকি কয়েকটা?) কুরআনও থাকা চাই। একান্ত আপন। একান্ত নিজের। মুখোমুখি বসিবার।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার.....

'একান্ত আপনার 'কুরআন'

<u>২৩.</u> *আই লাভ কুরআনের* 'সুইটহার্ট কুরআন' লেখাটা পড়ে, আল্লাহর বান্দা-বান্দীরা একদম পিচ্চিতম কুরআন থেকে শুরু করে বিশালায়তন কুরআন কারীমও হাদিয়া পাঠিয়েছেন। সেই সুদূর সুদান থেকে শুরু করে জার্মানি হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তাদের দুর্লভ হাদিয়ার কুরআন সংগ্রহের

অভিযান। বিশালায়তন কুরআন যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি পিচ্চিতম কুরআনও পাঠিয়েছেন। আরেকটা কুরআনের শখ ছিল, একপৃষ্ঠা কুরআন আরেক পৃষ্ঠা খালি। আশেপাশের বর্ডারে নোট লেখার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা। নাম না জানা (অথবা জানা) এক মানবী (নাকি মানব) অনেক কায়দা কসরত করে, পাকিস্তান থেকে, নানা চড়াই-উৎরাই পার করে, একেবারে শতভাগ পছন্দসই একটি কুরআন হাদিয়া পাঠিয়েছেন। সাথে একটি পিচ্চিতম কুরআনও। এসব বলার উদ্দেশ্য, কিছু মানুষের ছবেব কুরআনের নমুনা তুলে ধরা। হাদিয়াগুলো শতভাগ পছন্দসই হয়েছে। বিশেষ করে একপৃষ্ঠা কুরআন আরেক পৃষ্ঠা খালি কুরআনখানা অত্যন্ত কাজের। ভবিষ্যতে আমাদের দেশব্যাপী দরসে কুরআন মেহনতে এই 'মুসহাফ' আমাদের অনেক উপকারে আসবে। ইন শা আল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

২৪. হাতের কাছে এতগুলো হাদিয়ার কুরআন, কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি। ভালোবাসার মূল্য দিতেই হয়। বড়টা না হয় পড়া যায়। পিচ্চিটা কীভাবে পড়ি? আতশি কাচ কিনতে হবে। একান্ত নিজের কুরআনের পাশাপাশি হাদিয়ার কুরআনগুলোতেও চোখ বোলাই। দুষ্টমন বলে, কি রে পরকীয়া করছিস। দু'চোখ পাকিয়ে শাসিয়ে বলি, কেন? কুরআনই তো একাধিকের সুযোগ রেখেছে। তবুও প্রথম প্রেম বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই কুরআনখানা আর পাই না,

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।

২৫. প্রথম প্রেম খুঁজে ফিরছি। হিফযযাত্রার পুরো পথজুড়ে প্রথম প্রেম আমাকে জড়িয়ে ছিল। পড়তে পড়তে ছিঁড়ে গিয়েছিল। লালকাপড়ে বাঁধাই করে নিয়েছিলাম। প্রথম প্রেম হারিয়ে যাওয়ার পর, পুরো ছাত্রজীবন-জুড়ে আর কোনো বড়ো কুরআন শরীফ কেনা হয়নি। ছোট্ট একটি কুরআন শরীফ কিনেছিলাম। ওটাও এখন কোথায় যে আছে—জানা নেই। আর সবকিছুর মতো কুরআনগুলোও এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। কবে যে দেখা হবে, আদৌ দেখা হবে কি না, সেটাও বলা যাচ্ছে না। ছাত্রজীবনে কেনা ছোট্ট কুরআন কারীমখানা সংগ্রহ করা নিয়ে আনন্দ ও বেদনার গল্প আছে।

২৫. শিক্ষক জীবনের দ্বিতীয় ধাপে এলো তৃতীয় প্রেম—আরেকটি কুরআন শরীফ। সেই ক্লাসিক যুগের এমদাদিয়া নূরানী কুরআন শরীফের নতুন সংস্করণ। ওটা এখনো আছে বলেই মনে হয়। 'মনে হয়' এজন্য বললাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক মধুর-বিধুর ইবতিলায় সব এলোমেলো হয়ে

গেছে। কিতাবপত্র একখানে, কিতাবের মালিক আরেকখানে। আবার কবে একসাথ হবো, রাব্বে কারীমই জানেন। তৃতীয় প্রেম এসেছিল দুই তালিবে ইলমের হাত ধরে। রাব্বে কারীম দু'জনকে সালাফের উত্তম উত্তরসূরি বানিয়ে দিন। গত দশ-পনের বছর ধরে তৃতীয় প্রেমের সাথেই সংসারযাপন চলছিল। নতুন আর কোনো প্রেমের প্রয়োজন হবে না বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল; কিন্তু তাফসীর পড়তে গিয়ে, মনে হল আরেকটা কুরআন শরীফ হলে ভালো হয়। আল্লাহ তা'আলা গায়েবীভাবে পছন্দের কুরআন শরীফ মিলিয়ে দিলেন। কিন্তু ওটার সাথে সংসার 'সারময়' হয়ে ওঠার আগেই ছাড়াছাড়ি। ওটা কোথায় আছে বলতে পারছি না।

২৭. আমরা হয়তো খোঁজ রাখি না, দেশের অভ্যন্তরেই কুরআন-চর্চার অপূর্ব সব হালাকা আছে। আমাদের পক্ষ থেকে একটি সবিনয় অনুরোধ থাকবে প্রাণপ্রিয় পাঠকের কাছে। বাংলাদেশে অতীতে কোথায় কোথায় কুরআনচর্চা হতো, এখন কোথায় কোথায় কুরআন কারীম চর্চা হচ্ছে, খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করব। আমার বাড়ির পাশে, আমার মহল্লার মসজিদে ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব, খাদেম সাহেব, নূরানীখানার কারী সাহেবের সাথে কথা বলে দেখব। তারা কীভাবে কুরআন শিক্ষা দেন, কুরআন শেখাতে গিয়ে তারা কেমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, জানার চেষ্টা করব। এমন হতে পারে, তাদের কারও কারও আচরণ অমার্জিত মনে হবে, তাদের ভাবভঙ্গি গেঁয়ো মনে হবে। তবুও তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। তাকে কিছুটা হলেও সম্মান দেখানোর চেষ্টা করব। আল্লাহর কালামের সম্মানেই এটা করতে পারি। আমি হয়তো শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরআন কারীম কিছুটা হলেও বুঝি। মসজিদের মুয়াজ্জিন-খাদেম-কারী সাহেব শুধু পড়তে পারেন। তারপরও, এই মানুষগুলোকে একটু সম্মান দেখাতে পারি না? তারা যে আক্ষরিক অর্থে হলেও কুরআনচর্চা করে এসেছেন!

২৮. আমাদের এই মেহনত পাঠকের কতটা কাজে লাগছে, সেটা জানতে পারলে, আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের কোনো কথা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কি না, সেটা জানতে পারলে, উপকার হয়। এজন্য সৌভাগ্যক্রমে কোনো পাঠকের সাথে দেখা হলে, আগ্রহ করে জানতে চাই, কোনো পরামর্শ আছে কি না। একবার এক অদ্ভুত পাঠকের সাথে দেখা। দেখা হতেই এমনভাবে প্রশংসা শুরু করলেন, শুনতে অস্বস্তি লাগছিল। একটু পর জানতে চাইলাম, কোন বইটা পড়েছেন? *আই লাভ কুরআন*সহ আরও কয়েকটা বইয়ের নাম বলল। কথা আরেকটু অগ্রসর হওয়ার পর, বুঝতে পারলাম, মানুষটা একটি বই তো দূরের কথা, কোনো বই উল্টেও দেখেনি। অন্যদের পড়তে দেখেছে,

ব্যস এটুকুই। গঠনমূলক সমালোচনা পেলে, গভীর মনোযোগে শুনে, নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করি।

২৯. আমাদের বইয়ের পাঠক খুবই সীমিত। আরও সীমিত লেখকের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া পাঠকের সংখ্যা। হাতেগোনা অল্পক'জন পাঠকের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তাদের সাথে মতবিনিময় করার সৌভাগ্য হয়েছে। নিজের অনেক ভুল ধরা পড়েছে। অনেক ঘাটতি শোধরানোর সুযোগ হয়েছে। কিছু আন্তরিক পাঠক দেখা হলে, আগের বই, বর্তমান বই ও ভবিষ্যৎ বই নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমরা ভীষণ আনন্দ আর লজ্জা নিয়ে আবিষ্কার করি, প্রায় সব পাঠকই ইলমে, আমলে, আখলাকে, কুরআনপ্রেমে, লেখকের চেয়ে বহুগুণ বড়িয়া। অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এমন কৃতী পাঠকের দোয়া সামনের কাজকে বরকতপূর্ণ করে তুলবে। ইন শা আল্লাহ।

৩০. গুণী পাঠকের মুখোমুখি হয়ে লাভ যেমন হয়েছে, পাশাপাশি মনে ভয়ও সঞ্চারিত হয়েছে। পাঠকের তুলনায় আমি কত অজ্ঞ আর জাহিল! এসব লেখা তো তাদের জানার পরিধিতেই পড়ে? তবে বেশি অবাক করেছে, কিছু 'মাস্তুরাত' পাঠিকার গুণপনা দেখে। কেউ তাদের মাহরামের মাধ্যমে, আর কেউ কেউ লেখকের আত্মীয় মাস্তুরাতের মাধ্যমে নিজের অভিব্যক্তি ও মতামত লেখক পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের এই একনিষ্ঠ সুন্নাহসম্মত বিশুদ্ধ 'নসীহাপ্রবণ' মনোবৃত্তি আমাদের ভীষণ অবাক করেছে। প্রাণিত করেছে। তারা শতভাগ 'ইফফাত, ইযযত, ইহসান' বজায় রেখে, দুর্নিবার ইলমপিপাসা ব্যক্ত করেছেন, এজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাদের অমূল্য পরামর্শগুলো আমাদের সামনের পথচলাকে সুন্দর আর সার্থক করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩১. বিভিন্ন জায়গা থেকে কুরআন-বিষয়ক চিন্তা সংগ্রহ করেছি। কিছু চিন্তা আমাদের ভাবনার জগৎকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। কিছু চিন্তা আমাদেরকে বেঘোর ঘুম থেকে জাগতে সাহায্য করেছে। কিছু চিন্তা আমাদের সম্বিত ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। কিছু চিন্তা আমাদের বিষণ্ন করে তুলেছে। কিছু চিন্তা আমাদের কাঁদিয়েছে। কিছু চিন্তা হাসিয়েছে। চিন্তাগুলো পাঠে, আমরা যে ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, পাঠকও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—এমন দাবি আমরা করছি না। আমাদের লেখার হাত অতটা শক্তিশালী নয়, তবে পাঠকের হৃদয় অনেক অনেক বেশি সংবেদনশীল, এটাই আমাদের ভরসা জোগায়। আমরা যা বলতে পারিনি, পাঠক নিজ যোগ্যতায় তা বুঝে যাবেন—এই আমাদের আশা।

৩২. আমরা চেষ্টা করেছি, বড়বড় লেখাগুলোকেও ছোটো ছোটো ভাবনায় প্রকাশ করতে। চেষ্টা করেছি, শতাধিক পৃষ্ঠার লেখাকেও অসংখ্য ছোটো ছোটো পরিধিতে প্রকাশ করতে। এমন করে সাজাতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। বড়ো একটি ভাবকে ছোটো ছোটো টুকরো ভাবনায় বিভাজিত করা, মেধাবীদের পক্ষে সহজ হলেও, আমাদের জন্য কাজটা অনায়াস ছিল না। বড়ো লেখাগুলোর ভাবনা মাথায় আসার পর, আমরা প্রতিটি লেখাকে একটি বড়সড় পাথরের চাঁই বা পাহাড়ের মতো করে দেখেছি। তারপর আস্তে আস্তে করে কী-বোর্ডের ছেনি দিয়ে ঠুকঠুক খটাখট করে, ভাবনার পাহাড় কেটে ছোটো ছোটো টুকরায় চকচকে মসৃণ করে পরিবেশন করেছি। এভাবে বিভাজিত করার সুবিধা হয়েছে এই—যতবারই সম্পন্ন হয়ে যাওয়া লেখা পড়তে গিয়েছি, প্রতিটি খণ্ডে নতুন নতুন কথা যোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩৩. কিছু পড়তে গেলে, কিছু দেখতে গেলে, কিছু শুনতে গেলে, আমরা ভাবি—এই পড়া-দেখা-শোনা থেকে কুরআন-বিষয়ক কোনো ভাব উদ্ধার করা যায় কি না? আমি যা পড়ছি-দেখছি-শুনছি, সেটাকে কোনোভাবে কুরআন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় কি না? কুরআন-বিষয়ক কোনো লেখা দেখলে, আমরা পরম আগ্রহ ভরে পড়ি। বারবার পড়ি। পড়ি আর ভাবি, কথাগুলোকে সহজ বাংলায় কীভাবে রূপান্তর করা যায়? এতবড় তাত্ত্বিক লেখাকে কীভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়? এজন্য অনেক লেখাকে অসংখ্যবার পড়তে হয়। কখনো একদিনে হয় না, মাস-বছরও পেরিয়ে যায়। মনমতো ধাঁচ মাথায় আসে না। হুবহু বাংলায় রূপান্তর করে নেয়া যায়, কিন্তু সেটা হয়ে যাবে কাঠকোট্টা রসকষহীন। গবেষণাধর্মী। অনেক লেখা বা কিতাব এমনো আছে, কয়েক বছর ধরে পড়ছি। এখনো যুৎসই কোনো রূপ বের করতে সমর্থ হইনি। পড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। আলহামদু লিল্লাহ, এ-কাজে আমাদের ক্লান্তি আসে না। প্রথমবারের মতো শততম বারেও সমান আগ্রহে একটি লেখা পড়তে পারি। এটা শুধু কুরআন-বিষয়ক লেখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পড়তে পড়তে পড়তে অনেক সময় এমন হয়, আমরা বাংলায় যা লিখেছি, সেটার সাথে মূল লেখার কোনো মিলই নেই। সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি লেখার জন্ম হয়েছে। আমাদের বেশিরভাগ লেখাই এই ধাঁচের। নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত লেখা খুবই কম। বেশিরভাগই অন্য কোনো নির্দিষ্ট লেখা বা কয়েকটি লেখার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাবপ্রসূত। বিশেষ করে ড. ইবরাহীম সাকরানের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। রাব্বে কারীম তাঁকে এবং তার সহযাত্রীদের দ্রুত জালিমের কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন। তাঁর কুরআন-বিষয়ক প্রায় সব লেখাই আমাদের এই সিরিজে চলে আসবে। ইন শা আল্লাহ। প্রথম খণ্ডে কিছু গিয়েছে, এই খণ্ডেও কিছু আছে।

৩৪. কুরআন-বিষয়ক কোনো লেখা ভালো লেগে গেলে, লেখাটা বারবার পড়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি হুবহু এই বিষয়ে বা কাছাকাছি বিষয়ে আরও কী কী লেখা পাওয়া যায়, হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকি। অভিজ্ঞজনের সাথে কথাবার্তা, মতবিনিময় চালিয়ে যাই। চতুর্মুখী প্রয়াসের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া ভাবনার বুদ্বুদগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করে। আল্লাহর কাছে দোয়া তো নিরন্তরই চলতে থাকে।

৩৫. আমরা ছোটো ছোটো কলেবরে কুরআনের কথা বলি। আমরা মনে করি—কথাগুলো একেকটি ছন্দহীন কুরআনী কবিতা। ভাষাগত গুণেমানে কবিতার মতো নয়, কিন্তু একজন কবির যেমন কবিতার ভাব আসে, আমাদের মনোজগতেও সারাদিনে অসংখ্য কুরআনী ভাবনা আসে। আমরা ভাবনাগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই লিখে ফেলার চেষ্টা করি। দুঃখের বিষয় হয়——এক বছরের 'মাদরাসায়ে ইউসুফী'তে অসংখ্য অগণিত কুরআনি ভাবনা হারিয়ে গেছে। লেখার সুবন্দোবস্তি না থাকায়, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেসব। একেবারেই কি হারিয়ে গেছে? মনে হয় না। আমরা মনে করি, হারিয়ে যাওয়া ভাবনাগুলো আবার সময়-সুযোগমতো ফিরে আসবে। ইন শা আল্লাহ্। দোয়ার দরখাস্ত।

৩৬. তাদাব্বুর নিয়ে আরবীতে অসংখ্য কিতাব আছে। ইচ্ছা ছিল সবগুলো সামনে রেখে একটা লেখা তৈরি করব। চিন্তাটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না সময় ও সুযোগের অভাবে। বেশি ভালো করার চিন্তাই কাজটাকে পিছিয়ে দিচ্ছিল। এটা ভুল চিন্তা। এখন ঠিক করেছি, প্রতি খণ্ডেই তাদাব্বুর বিষয়ক একটি লেখা থাকবে। বেশি ভালো দরকার নেই। আপাতত মোটামুটি হলেই কাজ চলে যাবে। এই সিদ্ধান্তে আরও আগে আসতে পারলে, কাজ আরও এগিয়ে থাকত। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

৩৭. আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, সবার হাতে কুরআন তুলে দেয়া। পাঠককে সরাসরি কাগজের কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহী করে তোলা। একজন পাঠকও যদি বইটি পড়তে পড়তে, বইপড়া বাদ রেখে কুরআন হাতে তুলে নেন, তাহলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে। প্রথম খণ্ড পড়ার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একজন বলেছিলেন—আমি খুবই সিরিয়াস পাঠক। কোনো বই হাতে নিলে, সাধারণত শেষ না করে উঠি না। আই লাভ কুরআন ব্যতিক্রম। বইটা আমি একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়তে পারি না। তার কথা শুনে ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বইটা এতই অপাঠ্য? পরক্ষণে ভুল ভাঙল। তিনি

বললেন, *আই লাভ কুরআন* একটু পড়ার পর, ভেতরে কেমন যেন কুরআন তিলাওয়াতের পিপাসা প্রবল হয়ে ওঠে। বই রেখে কুরআন নিয়ে বসে পড়ি। দু'চোখ ভিজে উঠল। অধমের লেখা ক'টা লাইন একজন মুমিনকে কুরআন নিয়ে বসে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে, এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে?

<u>৩৮.</u> কুরআন বুঝতে পারি না, এজন্য মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাও আসে। আমরা কুরআনী ভাবনা শিরোনামে কিছু কথা বলার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি আমাদের ভাবনার সাথে আরবের বড়ো শায়খদের ভাবনা মিলে যায়। আমরা যে কথা আরও কয়েকবছর আগে বলেছি, কোনো শায়খ হয়তো সেটা আজ বলছেন। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কুরআনী ইলম তো আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহর কাছে সমস্ত কুরআনী ইলম সঞ্চিত আছে। একটা ইলম কেউ হয়তো গতকাল ছুঁতে পেরেছে, কেউ আজ। এখানে যোগ্যতা নয়, তাওফীকই মুখ্য। কাউকে গতকাল তাওফীক দিয়েছেন কাউকে আজ।

<u>৩৯.</u> কুরআন কারীম ভালোভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই উম্মাহর মুক্তি নিহিত। উম্মাহর এই দুর্দিন কাটিয়ে উঠতে, যেসব বিষয়ের চর্চা সবচেয়ে বেশি হওয়া দরকার, আমরা সেগুলো আলোচনায় আনার চেষ্টা করেছি। কিছুটা বিশদভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমরা কিছু বিষয় শুধু একটু ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেছি। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর পড়ে নিলে বিষয়গুলো আরও খোলাসা হবে। আমরা যেসব বিষয় স্পষ্ট করতে পারিনি, তাও ভালো করে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। ইন শা আল্লাহ। আরও বেশ কিছু বড়ো বড় লেখা রয়ে গেছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সরিয়ে রাখতে হয়েছে। লেখাগুলো আমাদের খুবই প্রিয়। অনেক ইচ্ছা ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডেই দিয়ে দেওয়ার। আল্লাহ যা চান, সেটাই হয়। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করা, বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। আগ্রহ আর আবেগের লেখাগুলো পরবর্তী খণ্ড 'রবীউ কুলবী'/হৃদয়বসন্ত কুরআন/স্প্রিং অব হার্ট-এর জন্য তোলা রইল। সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় ছিল, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের কুরআনচর্চা, কুরআনী শিক্ষানীতি, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর বিশ্বপরিচালনানীতি-সুনানুল্লাহ, মুনাফিকুন, বনী ইসরাঈল, সুনানে ইবতিলা, দাম্পত্য, নেতৃত্ব ইত্যাদি। এসব বিষয়ে বেশ বড়ো বড় লেখা প্রস্তুত ছিল, এ-খণ্ডে দেওয়া গেল না। আগাম দাওয়াত রইল—তৃতীয় খণ্ড *কুরআনী বসন্ত*-এর বাগানে। রাব্বে কারীম সবাইকে কবুল করে নিন। তাওফীক দান করুন।

৪০. কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন, মূল আয়াত না দিয়ে, শুধু তরজমা দিতে। কারও কারও পরামর্শ ছিল, শুধু আরবী আয়াত দিতে। দু'টোই আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ চিন্তা মনে হয়েছে। কুরআন-বিষয়ক অনেক কিতাবে দেখি, কলেবর বড়ো হয়ে যাওয়ার ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে, শুধুই তরজমা দিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা সাময়িক সমাধান হতে পারে, আখেরে বিষয়টা বিপদজনক। তরজমা কখনোই কুরআন নয়। শুধু তরজমা পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, একসময় মূল আরবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুরআন-বিষয়ক বইপত্রের মূল উদ্দেশ্য, কুরআনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা। বাংলা তরজমা পড়ে, সম্পর্ক দৃঢ় হবে? আর আল্লাহর নিজস্ব ভাষার যে শক্তি, তরজমায় তার ছিটেফোঁটাও থাকে? হোক পাঠক আরবীটা পড়ে না, কিন্তু তরজমা পড়তে গিয়ে, আরবীটার ওপর অন্তত চোখ তো পড়ে? ওটাওবা কম কীসে? কুরআনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও লাভ। শুধু আরবী আয়াত দিলে, পাঠক সবসময় আলাদা তরজমা নিয়ে বসার সুযোগ নাও পেতে পারে।

৪১. আমরা কুরআন চর্চা করতে চাই সুন্নাহসম্মতভাবে। সালাফসম্মত উপায়ে। সালাফের কুরআন-বিষয়ক কথা হুবহু অনুবাদ করতে পারলে ভালো হতো। সমস্যা হলো, তাদের কথাতে কিছু-না-কিছু তাকরার (পুনরাবৃত্তি) আছে। আমরা সবার কথা মিলিয়েমিশিয়ে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছি। কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলে, আমরা চেষ্টা করেছি, সে বিষয়ে আরও আয়াত থাকলে, সেটা উল্লেখ করে দিতে। যাতে আলোচনাটুকু পূর্ণতা পায়। কুরআন কারীমে একই ঘটনা বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, গোটা বইয়ে দেখা যাবে, একই আয়াত অনেকবার এসেছে। একই আয়াত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। একটি আয়াত ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার পড়ার কারণে, মনের মণিকোঠায় গেঁথে যাবে, ইন শা আল্লাহ। ভুলবশত *আই লাভ কুরআনের* কোনো লেখা বা ভাবনা এই খণ্ডে চলে আসতে পারে। কুরআন নিয়ে ভাবনা-বিষয়ক ছোটো ছোটো লেখাগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়ে যেতে পারে। অথবা দুই ভাবনাতে প্রায় একই কথা থাকতে পারে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিছু লেখা গবেষণামূলক হলেও, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, লেখাগুলোতে যেন হৃদয়ের ছোঁয়াও থাকে। নিছক নিরাবেগ হয়ে না যায়। লেখাগুলোতে যেন আমলের আবেদন থাকে, নিজেকে পরিবর্তনের আহ্বান থাকে। দয়া করে মায়া করে, আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে, ভীষণ কৃতজ্ঞ থাকব। রাব্বে কারীম তাওফীক দান করুন। দয়া করুন।

৪২. প্রকাশক মহোদয় সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বইটা আরও দুই বছর আগেই বের হওয়ার কথা ছিল। আই লাভ কুরআন বের হওয়ার কিছুদিন পরপরই। পাণ্ডুলিপি জমা দিচ্ছি-দেবো করতে করতে বাধ্যতামূলকভাবে 'মাদরাসারে ইউসুফীতে' ভর্তি হয়ে যেতে হয়েছে। ইউসুফী পাঠশালায় পড়তে গিয়ে, আগের সমস্ত লেখা, পাণ্ডুলিপি সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিছু লেখা নতুন করে লিখতে হয়েছে, কিছু লেখা এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিতে নিতে আরও কিছু সময় গড়িয়ে গেছে। পুরো সময়জুড়ে তিনি নীরব আগোচরে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, দিয়ে চলেছেন। সীরাতের একটি ঘটনাই বারবার মনে পড়ে। মক্কা বিজয়ের দিনে, নবীজির মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে, নবীজি সা. সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মক্কাবাসী বলেছিল—

أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ

মহানুভব ভাই, মহানুভব ভাইয়ের সন্তান।

ওবায়েদ ভাইও কারীম। তাঁর বাবাকেও যতদূর চিনেছি—তিনিও কারীম। মহানুভব। মহৎ। তাঁর ঘরের মানুষটাও 'কারীমা বিনতে কারীম'। ভাইয়ের শ্বশুরকেও কারীম পেয়েছি। রাব্বে কারীম তাদের সন্তানকেও 'কারীমা' হিসেবে কবুল করুন। কেন যেন ইউসুফ আ.-এর বিখ্যাত দোয়াটি মনে পড়ে যাচ্ছে—

فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আপনি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিয়েন, যখন আমি থাকি আপনার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ ১০১)।

একজন মুমিনের জন্য এরচেয়ে বড়ো চাওয়া আর কী হতে পারে? মুসলিম হিসেব মৃত্যুবরণ, পরকালে সালিহীনের কাতারে শামিল। রাব্বে কারীম তাকে ও তার আহল-আয়ালকে কুরআনের হাফেয বানিয়ে দিন। ইউসুফ আ.-এর এই দোয়ায় শামিল করে নিন। বইয়ের পাঠক ও লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকেও রাব্বে কারীম এই নববী দোয়ায় শামিল করে নিন।

আরেকটা কথা না বললেই নয়, যারা গোচরে, অগোচরে, দোয়া দিয়ে, দাওয়া দিয়ে, চোখের পানি ফেলে, কথা দিয়ে, জানা-অজানা নানাভাবে 'ইবতিলার' দিনে পাশে থেকেছেন, সবার জন্য সবসময় দোয়া ছিল, আছে, থাকবে—ইন

শা আল্লাহ। রব্বে কারীম সবাইকে ইউসুফ আ.-এর দোয়ায় শামিল করে নিন। এক অসহায় মাজলুমের দুর্দিনে পাশে দাঁড়িয়েছেন, পেয়ারা নবীজি সা.-এর হাদীস অনুযায়ী, রাব্বে কারীমও তাদের পাশে দাঁড়াবেন, ইন শা আল্লাহ। মাওলায়ে কারীম সবাইকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন। সা-লিহীনের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন। এই বই প্রস্তুতে অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। তাদেরকেও উপরোক্ত দোয়ায় শামিল করে নিন। রাব্বে কারীম বিশেষ করে মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক কাসেমী ভাইকে বিবিবাচ্চাসহ উপরোক্ত নববী দোয়ায় শামিল করে নিন।

ইয়া আল্লাহ, এমন জীবন দান করুন, বাকী জীবন যেন কুরআনের খেদমতে কাটিয়ে দিতে পারি। নিরিবিলিতে নিজে কুরআন শেখার পাশাপাশি বাচ্চাকাচ্চা আর তালিবে ইলমদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পেছনে পুরো সময় ব্যয় করতে পারি। ইয়া আল্লাহ আপনার খাজানায় তো অভাব নেই, বিবিবাচ্চার চাহিদা পূরণ করে, নিশ্চিন্তমনে একান্ত নিরুপদ্রব স্থানে কুরআন নিয়ে মশগুল থাকার ব্যবস্থা করে দিন। কুরআনী বিধান বাস্তবায়নের মেহনতে শামিল করে নিন। দুনিয়ার কোনো লোভ-ভয় যেন এই মেহনত থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আমীন।

মুহিতিহার্ত কুরআন

হাবলুল্লাহ : আল্লাহর রজ্জু

১. কুরআন কারীমে এক অদৃশ্য সুতো আছে। পুরো কুরআন কারীমের আলোচ্য বিষয়গুলো সেই অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। ভাসাভাসা ওপর-দৃষ্টিতে সুতোটা চোখে পড়ে না। তলিয়ে দেখতে হয়। দেখার চোখকে একটু সরু করলেই নজরে আসে পাতলা সূক্ষ্ম একটি সুতো পাতা জালের মতো আয়াত থেকে আয়াতে ছড়িয়ে-জড়িয়ে আছে। আমরা সংক্ষিপ্ত একটি কুরআনি সফর শুরু করতে যাচ্ছি। এই সফরে দেখার চেষ্টা করব, কুরআন আমাদের কাছে কী চায়, কুরআন আমাদের কী করতে বলে। এটা কোনো গবেষণামূলক কিছু নয়। নিয়মতান্ত্রিক প্রবন্ধ বা নিবন্ধও নয়। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে আত্মজৈবনিক রচনা, তাও নয়। এগুলো একান্তই আমার একগুচ্ছ ব্যক্তিগত চিন্তার সমন্বয়। লেখাটাকে আমার কনফেশন বা স্বীকারোক্তিও বলা যেতে পারে। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়—আত্মোপলব্ধি।

২. নানা কুচিন্তা-পাপচিন্তা মনের গহিনে ঘুরপাক খায়। একধরনের মানসিক বৈকল্য আচ্ছন্ন করে রাখে। এগুলো হঠাৎ করে গজিয়েছে, এমন নয়। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে। দিন-দিন এসব চিন্তার জঞ্জাল লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। মনে কেমন এক ভোঁতাভাব। সলাতে-সিয়ামে-কেয়ামে-তিলাওয়াতে যান্ত্রিক রোবটের মতো আচরণ করছি। ইবাদতে স্বাদ-মজা-গন্ধ কিছুই পাই না আজকাল। এসব করতে হয় বলে, অভ্যেসবশে করে যাচ্ছি। এই আত্মিক সংকট, সর্বগ্রাসী মানসিক সমস্যা আজকালের নয়, অনেকদিন ধরেই এই অচলাবস্থা চলছে। দিনদিন এই মনোবিকলন গুরুতর আকার ধারণ করছে। ভেতরটাকে কুরে কুরে ফাঁপা করে দিচ্ছে। মানসিক প্রশান্তিকে খুবলে খুবলে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। অন্তর্জগতের এই নিদারুণ সংঘাতে বহির্জগতের স্থিতিশীলতা চিড়েচ্যাপ্টা হওয়ার জোগাড়।

৩. এটাও সত্যি, দৈনন্দিন জীবনের ঝুট-ঝামেলার চাপে, দিনমানের হুটপিটে এই মানসিক বৈকল্যের অনুভূতি মাঝেমধ্যে ক্ষণিকের তরে অপসৃত হয়ে যায়। রাত নামলে, বিছানায় গা এলিয়ে দিলে, বালিশে মাথা রাখলে, কোত্থেকে যেন শত্রুরা এসে চারদিক থেকে হামলে পড়ে। একের এক দাগাতে থাকে দুশ্চিন্তা অস্থিরতার তোপ। রোজকার আত্মসমালোচনা করব কি, উল্টো ধেয়ে আসা মানসাঘাত সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। চোখের ঘুম পালিয়ে যায়। মনের উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। শরীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অচেনা চিনচিনে ব্যথা। ধুঁকতে

ধুঁকতে কেটে যায় নির্ঘুম রাত। ভাবতে থাকি, এর সমাধান কী? একটা কিছু বিহিত তো করতেই হবে। এভাবে কাহাঁতক সহ্য করা যায়?

৪. কোন কাজটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে কোন কাজটা, এটা আমার জানা আছে। এরপরও গড়িমসি করতে করতে দিনসপ্তাহমাস পেরিয়ে বছর হয়। আসল কাজটা শুরু করা হয় না। গতানুগতিক চালে সময়গুলো হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। আমি কেন দিনের পর দিন আসল কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছি? কেন 'ফার্স্ট থিং ফার্স্ট' রুল মানতে সমর্থ হচ্ছি না? কেন আসল কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও পালন করতে পারছি না? যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়, যখন দেখি আশেপাশের প্রায় সবাই আমার মতোই আসল কাজ থেকে দূরে সরে আছে। আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত হাতেগোনা কিছু মানুষই শুধু 'চূড়ান্ত অগ্রাধিকার (الأولوية القصوى)'-কে গুরুত্ব দিচ্ছে।

৫. সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিই, দেখি সেখানকার সবকিছুই 'চূড়ান্ত অগ্রাধিকার (الأولوية القصوى)' থেকে দূরে। সবাই মূল দায়িত্ব বিস্মৃত। অনলাইনে, ফেসবুক-টুইটারে বিচরণ করি, বইপত্র উল্টাই, পত্রিকা ঘাঁটি, অসংখ্য লেখা চোখে পড়ে। অবাক বিস্ময়ে দেখি, প্রায় সবগুলোই 'চূড়ান্ত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' কর্তব্য থেকে দূরে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় গুটিকয়েক বান্দাই শুধু ব্যতিক্রম। কত বইপত্র পড়ি। চিন্তার বই, বিনোদনের বই, গল্পের বই, ইতিহাসের বই, বিজ্ঞানের বই, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে যাই। আকাশ, বাতাস, সাগর, নদী, গাছপালা, পশুপাখি, ঘরদোর, ব্যবসা-বাণিজ্য কতকিছুর কথা থাকে! সবই ঠিক থাকে, শুধু আসল বিষয়টা থাকে না—'চূড়ান্ত অগ্রাধিকার'। লেখক-পাঠক সবার চোখে ঠুলি। চোখ বাঁধা। অন্তরও।

৬. রাতে, কর্মক্লান্ত দিবসের অবসানে, নিজের অবস্থা নিয়ে যখন ভাবতে বসি, চারপাশের লোকজনের কথা চিন্তা করি, বুকচিরে দীর্ঘশ্বাস আসে। আফসোস আর মর্মযাতনায় দগ্ধ হতে থাকি। কেন এই উদাসীনতা? আর কত এই ক্রান্তিকাল? ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক। সময়সুযোগ করে যখনই কুরআন নিয়ে ভাবতে বসি, বুঝতে পারি আমি এখনো আল্লাহর মূলচাহিদা থেকে বহুদূরে। মারকাযুল কুরআন, কুরআনের মূলবিষয়, যাকে ঘিরে কুরআনের যাবতীয় আলোচনা, আমি তা থেকে বহুদূরে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অসংখ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিজের পবিত্র সত্তার কথা, অনন্যগুণাবলির কথা আলোচনা করেছেন। কেয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা, হাশর-নশরের কথা আলোচনা করেছেন।

নবী-রাসূলের কথা, নেককারগণের কথা, পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর কথা, বিশেষ করে বনী ইসরায়েল ও তাদের মিশ্র আচরণের কথা আলোচনা করেছেন। ইবাদত ও লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, প্রতিটি আলোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। অদৃশ্য এক সুতো সমস্ত আলোচনাকে একমালায় গেঁথে রেখেছে। বিষয়বস্তু বদলায়, আলোচ্য বিষয় পরিবর্তিত হয়, মূল সুর সেই একই থাকে। এই একটি বিষয়কে ঘিরেই পুরো কুরআন গড়ে উঠেছে। কুরআনের আলোচনাগুলো ঘুরপাক খেয়েছে। আর সেই বিষয়টি হলো, অন্তরকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা (عمارة النفوس بالله)।

৭. সূরা বাকারা শুরু করে একটুখানি অগ্রসর হওয়ার পরই সামনে পড়ে, ফিরিশতাদের সাথে রাব্বে কারীমের কথোপকথন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

আমি পৃথিবীতে এক খলীফা (প্রতিনিধি) বানাতে চাই (বাকারা, ৩০)।

আল্লাহর কথা শুনে, ফিরিশতারা ভীষণ অবাক। প্রশ্নের মাঝেই তাদের বিস্ময় ঠিকরে বেরোচ্ছে,

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি বিস্তার করবে ও খুন-খারাবী করবে? অথচ আমরা আপনার তাসবীহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছি?

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণের বিস্ময়সূচক প্রশ্নের জবাব সরাসরি দিলেন না। বললেন,

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি এমন-সব বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না (বাকারা, ৩০)।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ভিন্নধর্মী উত্তরের মাধ্যমে ফিরিশতাদের মনে দুটি বিষয় জাগিয়ে তুলেছেন,

ক. আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মানবোধ।

খ. সবকিছুর ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে, এই আকীদা।

৮. আরেকটু পরে গিয়ে দেখি আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরায়েলের আলোচনা শুরু করেছেন। পরপর ছয় আয়াতে বনী ইসরায়েলের প্রতি কী কী নেয়ামত দিয়েছেন, তার ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। তাদের বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদের ফেরাওনের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। সাগরের বুক

চিরে পথ তৈরি করেছেন। তাদের পার হওয়ার সুযোগ দিয়ে ফারাও বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছেন। গোবৎস পূজা করার পরও তাদের ক্ষমা করেছেন। নেয়ামতের আলোচনা শেষ করেছেন একটি দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে,

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো (বাকারা, ৫২)।

৯. প্রতিটি আলোচনার মূলকথা একটাই, কলবকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা। যেকোনো ঘটনা উদাহরণ উদ্ধৃতির শেষকথা—মুখে আল্লাহর যিকির, অন্তরে স্মরণ, চিন্তায় আল্লাহর শোকর চালু করা। বাকারায় প্রসঙ্গটা এনেছেন, আ'রাফে আবার। একটি পাহাড়কে বনী ইসরায়েলের ওপর তুলে ধরেছেন। কেন? তাদের মধ্যে ধার্মিকতা আনার জন্য। আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য। আল্লাহর সাথে তাদের আরও শক্ত করে জুড়ে দেয়ার জন্য। বাকারায় বলেছেন,

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾

এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম (আর বলেছিলাম যে,) আমি তোমাদের যা (যে কিতাব) দিয়েছি, তা শক্ত করে ধরো (বাকারা, ৬৩)।

আবার আরাফে বলেছেন,

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾

এবং (স্মরণ করো) যখন আমি পাহাড়কে তাদের ওপর এভাবে তুলে ধরেছিলাম, যেন সেটি একখানি শামিয়ানা, এবং তারা মনে করেছিল সেটি তাদের ওপর পতিত হবে। (তখন আমি হুকুম দিয়েছিলাম) আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি, তা আঁকড়ে ধরো (১৭১)।

১০. বারবার একই আলোচনার হেতু কী? অন্তরকে আল্লাহর কালামের সাথে সুদৃঢ়ভাবে জুড়ে দেয়া, কলবকে আল্লাহর কিতাব দ্বারা সমৃদ্ধ করা। চেতনাকে কুরআনের রূহ দ্বারা আবাদ করার জন্য বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾। আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি, তা আঁকড়ে ধরো।

১১. বাকারার আরেকটু সামনে গিয়ে অবাক হয়ে যাই, থমকে দাঁড়াই, গভীর ভাবনায় ডুবে যাই। শুষ্ক মওসুমে মরুভূমি তো বটেই, বসতিপূর্ণ জনপদের পানিও ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে চলে যায়। আমাদের অনেকের ঈমানের অবস্থাও এমন। আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরতে সরতে একসময় ঈমান আমাদের কলবের অনেক গভীরে চলে যায়। কুরআন হৃদয়ের বসন্ত। আল্লাহর

যিকির কলবের জন্য বৃষ্টিস্বরূপ। যিকির ও কুরআনের ছোঁয়া না থাকলে, কলবে খরা দেখা দেয়। কুরআন ও যিকিরবিহীন কলব আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, অন্তরের সজীবতা। ক্রমান্বয়ে গভীরে নেমে যেতে থাকে 'ঈমানী আর্দ্রতার' স্তর। আমাদের অনেকে নাম বা জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও, কাজেকর্মে প্রায় কুফরঘেঁষা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিঁড়ে যায়-যায় অবস্থা। হৃদয়ের অনেক গভীরে হয়তো ঈমানের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট আছে। এমন কলবকে আল্লাহ তা'আলা পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। পাথর সৃষ্টিকুলের অন্যতম শুষ্ক বস্তু। এই তুলনায় ধিক্কার আছে। শোকপ্রকাশ আছে। আছে আফসোস,

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মতো; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত (বাকারা, ৭৪)।

আলোচনা শুধু তুলনাতেই থেমে থাকেনি। আরও শোচনীয় লজ্জাজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক,

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾

(কেননা) পাথরের মধ্যে কিছু তো এমনও আছে, যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা চরম ধিক্কার দিয়ে বলছেন, বান্দা, তোমার কলব এতটাই উষর হয়ে গেছে, পাথরের সাথেও তুলনা করা চলে না। কারণ পাথরও কখনো কখনো আর্দ্র হয়। সিক্ত হয়। বিনীত হয়। নম্র হয়। পাথর ফেটে পানি বের হয়। আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়ে,

﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

আবার তার মধ্যে এমন (পাথর)-ও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে।

এসব বলার উদ্দেশ্য কী? আমাদের অন্তরকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা। ভর্ৎসনা করে সচেতন করা। ঈমানী চেতনা জাগ্রত করা। নিজের করুণ অবস্থা জানিয়ে সংশোধিত হতে বলা।

১২. এই বাকারাতেই আরেকটু আগে বেড়ে দেখি, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কিতাব দিয়েছেন। কতিপয় বান্দা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছে, কিছু অংশ বাদ দিয়েছে। নিজের সুখসুবিধা আর পছন্দমতো বিধান গ্রহণ করেছে, নিজের মনচাহি জিন্দেগীবিরোধী বিধানগুলো বর্জন করেছে। তাদের এই আচরণ আল্লাহ কীভাবে নিয়েছেন? তারা কিতাবের কিছু অংশ তো অন্তত মেনেছে। আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের বাহবা দিয়েছেন, কিতাবের বাকি অংশ

ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন? মোটেও না। তিনি ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾

তবে কি তোমরা কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখো এবং কিছু অস্বীকার করো? (বাকারা, ৮৫)।

আল্লাহ তা'আলা তাদের আংশিক ঈমানে মোটেও তুষ্ট হননি। কিতাবের কিয়দংশের প্রতি ঈমান এনে, বাকিটুকু বর্জন করাকে তিনি এতটুকু প্রশ্রয় দেননি। কিতাবের কিছু অংশ বাদ দেয়ার কারণে, তাদের মেনে নেয়া অংশটুকুর প্রতিদানও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো অর্ধাঅর্ধি বা ভাগাভাগি নেই। আল্লাহ চান আমাদের কলবের পুরোটা জুড়ে থাকতে। তিনি চান, আমরা যেন কলবে শুধু তাঁকেই স্থান দিই। তিনি চান আমরা তাঁর বিধান ও কিতাব পুরোপুরি গ্রহণ করি, শতভাগ মান্য করি। কিছু ধরি কিছু ছাড়ি, এমন না করি। জীবনের প্রতিটি ধাপে তার আনুগত্যের সীমায় থাকি। তার দেয়া প্রতিটি বিধান মেনে নিই। আরেকটু পরেই তিরস্কার করে বনী ইসরায়েলকে বলেছেন,

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾

অতঃপর এটা কেমন আচরণ যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনের চাহিদাসম্মত নয়, তখনই তোমরা দম্ভ দেখিয়েছ? (বাকারা, ৮৭)।

১৩. বনী ইসরায়েল সম্পর্কে এতকথা বলা বা তাদের কৃতকর্ম উল্লেখ করে তাদের ভর্ৎসনা করা কেন? পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বস্তুবাদি চিন্তাজর্জর ব্যক্তির কাছে এসব তিরস্কার ধিক্কার কোনো অর্থ বয়ে আনবে না। সত্যিকারের মুমিন ঠিকই বুঝতে পারে, এসবের পেছনে কারণ একটাই, আমাদের অন্তরকে আল্লাহমুখী করা। আমাদের কলবকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা। আমাদের কলবকে শতভাগ আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত করে তোলা।

১৪. আরেকটু পরে গিয়ে দেখি, আল্লাহ তা'আলা 'নসখ'-এর কথা বলেছেন। নসখ মানে 'রহিতকরণ'। এক আয়াতের বদলে আরেক আয়াত আনয়ন। এক বিধানের স্থানে আরেক বিধান জারীকরণ। 'নসখ' বিষয়টা উলূমুল কুরআন আর উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয়। যে আয়াত বা বিধান রহিত হয়েছে, সেটাকে 'মানসূখ' বলে। যে আয়াত বা বিধান আরেক আয়াত বিধানকে রহিত করে, সেটাকে নাসিখ বলে। নাসিখ-মানসুখ ইসলামী শরীয়তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী ফিকহের অপরিহার্য বিষয়। আয়াতখানা দেখি,

﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আমি যখনই কোনো আয়াত মানসূখ (রহিত) করি বা তা ভুলিয়ে দিই, তখন তার চেয়ে উত্তম বা সে রকম (আয়াত) আনয়ন করি। তোমরা কি জানো না, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন? (বাকারা, ১০৬)।

১৫. এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ তা'আলা কী উপসংহার টানলেন? সুবহা-নাল্লাহ, প্রশ্ন উত্থাপন করে চেয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান এটা যেন আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। নাসিখ-মানসুখের বর্ণনাও আল্লাহর বড়ত্ব বোঝানোর জন্য। আমাদের অন্তরে আল্লাহর সম্মান ও অবস্থান উন্নত করার জন্য। আমরা যেন এসব বিধান পড়ে, এসব আয়াত পড়ে শুধু বিধান জেনেই ক্ষান্ত না হই, আগে বেড়ে আল্লাহ বড়ত্ব ও গুরুত্ব যেন অন্তরে আরও ভালো করে বসিয়ে নিই। আল্লাহর কুদরতের যথাযথভাবে উপলব্ধিতে আনি। আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে আরও বেশি করে মানি।

১৬. আরেকটু সামনে গিয়ে দেখি, ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সলাতের গুরুত্বপূর্ণ রোকন, কিবলামুখী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সলাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মসজিদে হারামের দিকে রোখ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি একটি বিশুদ্ধ ফিকহী মাসয়ালা। সাধারণ দৃষ্টিতে প্রথমে এমনটাই ভেবেছি। পরক্ষণেই দেখি, না: এখানে শুধু ইতিহাস বা মাসয়ালা বলাই উদ্দেশ্য নয়,

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾

পূর্বে আপনি যে কিবলার অনুসারী ছিলেন, আমি তা অন্য কোনো কারণে নয়; বরং কেবল এ-কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই-কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তার পেছন দিকে ফিরে যায় (বাকারা, ১৪৩)।

মূল উদ্দেশ্য পরীক্ষা। বান্দা আল্লাহর আদেশের প্রতি কতটা আত্মসমর্পিত, সেটা যাচাই ছিল আল্লাহর অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ যা বলেন, সেটা যতই মনের ইচ্ছার বিপরীত হোক, বান্দা কতটা সাচ্ছন্দ্যে সেটা মানতে পারে, আল্লাহ সেটা দেখতে চান। বান্দার কলব কতটা আল্লাহমুখী, আল্লাহ সেটা বারবার পদে পদে যাচাই করতে চান। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বান্দার কলবে কতটা গুরুত্ববহ, আল্লাহ অসংখ্যবার সেটা পরীক্ষা করেছেন।

১৭. কিসাসের বিধান বর্ণনা করেছেন। সমাপ্তিতে কী বলেছেন?

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে (১৭৯)।

কথা শেষ করেছেন 'তাকওয়া' দিয়ে। এসব বিধান আল্লাহ কেন দিয়েছেন? যাতে আমরা আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান দিই। আল্লাহর বিধানকে গুরুত্ব দিই। নিজেদের মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তুলি।

১৮. সিয়ামের বিধান দিলেন। কথা শেষ করলেন কী দিয়ে? সেই তাকওয়া দিয়ে,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয় (১৮৩)।

এতকিছু বলার একমাত্র কারণ, আমাদের আল্লাহমুখী করা। আমাদের আল্লাহর সাথে আরও বেশি করে জুড়ে দেয়া।

১৯. এরপর ওসীয়তের বিধান দিয়েছেন। সেখানেও একই ব্যাপার,

﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তবে যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করবে। এটা মুত্তাকীদের অবশ্যকর্তব্য (১৮০)।

আবারও তাকওয়ার কথা। বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন। সতর্ক করছেন। মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে সচেতন করছেন। আমি আল্লাহমুখী হচ্ছি তো?

২০. হজের আলোচনা শুরু হলো। হজের পদ্ধতি বললেন। আমল ও নিদর্শনের কথা বললেন। হজ শেষ। বাড়ি ফেরার পালা। শেষপর্যায়ে পৌঁছে কী করলেন? সেই আগের কথা। আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনলেন,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾

তোমরা যখন হজের কার্যাবলি শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে (২০০)।

আবারও নবায়ন করলেন। আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে আল্লাহর সাথে জুড়তে হবে। কলবকে আল্লাহর সাথে বাঁধতে হবে। সুবহানাল্লা-হ! হজ শেষ করে যিকির করতে বলছেন আল্লাহ। তাহলে পুরো হজের সময় কি যিকির করেনি?

পুরো হজটাই তো শুধু যিকির আর যিকির। তালবিয়া যিকির। তাওয়াফ যিকির। সাঈ যিকির। আরাফা যিকির। মিনা যিকির। মুযদালিফা যিকির। সবই যিকির। তারপরও আবার যিকিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। হজ সাধারণ আমল নয়। অনেক কষ্টের বিনিময়ে হজ করতে হয়। সব কষ্টই শুধু আল্লাহর জন্য। রাব্বে কারীম আসলে আমাদের কাছে কী চান, সেটা কি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছে? কুরআনের পরতে পরতে আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন বলছে, বান্দার কলব হবে আল্লাহ হতে। আল্লাহর সাথে। আল্লাহকে নিয়ে। আল্লাহর রঙে। আল্লাহর জন্যে। আল্লাহর ধ্যানে। আল্লাহর পানে।

২১. আরবদের মধ্যে এক অন্যায় প্রথা চালু ছিল। স্বামীরা কসম করে বলত, সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। ফলে স্ত্রী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকত; সে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকারও পেত না, আবার অন্যত্র বিয়েও করতে পারত না। এরূপ কসমকে ঈলা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ঈলা (الإيلاء)-র বিধান বর্ণনা করলেন। পুরুষকে দুটি এখতিয়ার দিলেন। হয় চার মাস অপেক্ষা করবে, না হয় তালাক দিয়ে দেবে। বিশুদ্ধ ফিকহী মাসয়ালা। অবাক করা ব্যাপার, এখানেও আল্লাহ তা'আলা পরপর দুটি আয়াতের শেষেই বান্দাকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বান্দার মনে আল্লাহর বড়ত্ব গুরুত্ব জাগিয়ে তুলেছেন।

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে (অর্থাৎ তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করে) তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। সুতরাং যদি তারা (এর মধ্যে কসম ভেঙে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তারা যদি তালাকেরই সংকল্প করে নেয়, তবে আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন (২২৬-২৭)।

২২. ওয়াল্লা-হ! আল্লাহ কত-কত গুরুত্ব দিয়েছেন এই একটি বিষয়কে। কত-কতবার তিনি আমাদের আল্লাহমুখী করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন পুরো কুরআনজুড়ে। বড় আলোচনা, ছোট আলোচনা, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বিস্তারিত আলোচনা-কোথাও তিনি বাদ দেননি। বারবার শুধু এককথা—আল্লাহর আল্লাহর যিকির। আমাকে আল্লাহমুখী হতে হবে। আমার কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়তে হবে। এখানে আলোচনা শেষ করে, আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। আলোচনা যেদিকেই গড়াক, শেষে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে।

২৩. সলাতুল খাওফ। যুদ্ধ বা আপৎকালীন সলাত। এমন পরিস্থিতিতে সলাত মাফ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু না, আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়। তিনি জানেন কিসে বান্দার সার্বিক কল্যাণ,

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেকো এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো। তোমরা যদি (শত্রুর) ভয় করো, তবে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নিয়ো) (২৩৮-৩৯)।

ভয় ও যুদ্ধের সময় যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে নিরাপদ থাকাকালে কী অবস্থা হবে? আল্লাহ তা'আলাই বলে দিয়েছেন,

﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ অবস্থা লাভ করো, তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে (২৩৯)।

আয়াতখানা শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আবার তিলাওয়াত করলাম। আরও একবার। একটা কথাই মনে হলো, আল্লাহ তা'আলা ভয়ে ও জয়ে সর্বাবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকতে বলেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক, ভয়ের হোক, নিরাপত্তার হোক, বান্দার অবশ্যকর্তব্য কলবকে আল্লাহমুখী রাখা। নিজেকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া। আয়াতখানা আরেকবার পড়ে দেখতে পারি। কলব কিছুটা হলেও আল্লাহমুখী হচ্ছে না?

২৪. আল্লাহ চান বান্দা তাঁর কলবকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে বেঁধে রাখবে। প্রতিটি পলক, প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি শোয়াবসা আল্লাহকে উপস্থিত রেখে করবে। মনে আল্লাহকে হাজির রাখবে। আল্লাহ বিজয় দান করেন। বিজয়ের আত্মহারা মুহূর্তেও আল্লাহকে সাথে রাখতে বলেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন সামগ্রিক বিজয়-মুহূর্তের কর্তব্য—নফসকে আল্লাহর সাথে বাঁধতে হবে,

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আল্লাহ বদর (যুদ্ধ)-এর ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন ছিলে। সুতরাং তোমরা অন্তরে (কেবল) আল্লাহর ভয়কেই জায়গা দিয়ো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো (আলে ইমরান, ১২৩)।

২৫. মানুষ পাপ করে ফেলে। নানাবিধ শরীয়তবিরোধী অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এসব বর্ণনা করেন। কুরআন তখনো আদমসন্তানের সামনে আল্লাহর যিকিরের পথ খোলা রাখে,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে (আলে ইমরান, ১৩৫)।

ইতিহাসজুড়ে অসংখ্য ঘটনা। আল্লাহ মানুষের ক্ষমতার পালাবদল ঘটান। শক্তির মানদণ্ড হাতবদল করেন। কারণ একটাই—যাতে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে দৃঢ় হয়,

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ﴾

এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদের পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা (১৪০)।

ক্ষমতার রদবদল করেন, যাতে আমাদের ঈমান যাচাই করতে পারেন। কারা মুমিন কারা কাফের সেটা প্রকাশ করতে পারেন। কুফর থেকে ঈমান আলাদা করতে পারেন। প্রতিটি ঘটনার পেছনেই আল্লাহর কুদরত থাকে।

২৬. এক কওম তাদের নবীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। কুরআন তাদের অবিচলতার কথা বর্ণনা করেছে। কুরআন তাদের যুদ্ধকালীন কথোপকথন উদ্ধৃত করেছে। খেয়াল করলেই চোখে পড়ে, সে কথার পুরোটাই আল্লাহর কাছে মুনাজাত। আত্মসমর্পণের দলীল। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

এমন কত নবী রয়েছে, যাদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। এর ফলে আল্লাহর পথে তাদের যে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে তারা হিম্মত হারায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং তারা নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ অবিচল লোকদের ভালোবাসেন। তাদের কথা এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলিতে যে সীমালঙ্ঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন (আলে ইমরান, ১৪৬-৪৭)।

২৭. আল্লাহ প্রশংসার ভঙ্গিতেই তাদের আলোচনা এনেছেন। তারা তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাচ্ছে। তাঁর কাছে কাকুতিমিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

নিজেদের অসহায়ত্ব, অক্ষমতা, দোষত্রুটি প্রকাশ করছে। নিজেদের সীমালঙ্ঘনের কথা বলতেও কসুর করেনি। তাদের এমন 'আল্লাহমুখিতা' আল্লাহর খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি কুরআনে স্থান দিয়েছেন। আমাদেরও এমন হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

বলে দিন, তোমরা যদি নিজ গৃহেও থাকতে, তবুও কতল হওয়া যাদের নিয়তিতে লেখা আছে, তারা নিজেরাই বের হয়ে নিজ-নিজ বধ্যভূমিতে পৌঁছে যেত। (এসব হয়েছিল) এ কারণে যে, তোমাদের বক্ষদেশে যা-কিছু আছে আল্লাহ্ তা পরীক্ষা করতে চান এবং যা-কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তা পরিশোধন করতে চান। আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত (আলে ইমরান, ১৫৪)। উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিল, তা আল্লাহর হুকুমেই (ঘটেছিল), যাতে তিনি মুমিনদেরও পরখ করে দেখতে পারেন (আলে ইমরান, ১৬৬)।

২৮. আল্লাহ জিহাদের কথা বললেন। পাশাপাশি তার উদ্দেশ্যের কথাও বলে দিলেন। তিনি পরীক্ষা করতে চান। যাচাই করে নিতে চান, আমাদের অন্তর কতটা আল্লাহমুখী। আমাদের নফস কতটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর প্রতি কতটা ঈমান রাখে।

﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ﴾

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের অসহায় ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? (আলে ইমরান, ১৬০)।

মানুষ জয়ী হতে পছন্দ করে। বিজয়ের প্রতি মানবমনের আজন্ম আকর্ষণ। বিজয়ে কেউ কেউ আত্মহারা হয়ে পড়ে। আল্লাহ এমন বেসামাল মুহূর্তের কথা আলোচনায় এনেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিজয়ের মূল কারণ তিনিই। তিনি ছাড়া কোনো বিজয় আসতেই পারে না। জয়ী হয়ে আত্মগৌরবে ডোবা যাবে না। কুরআন আমাদের প্রতিনিয়ত আল্লাহর সাথেই থাকতে বলে। যেকোনো পরিস্থিতিতে। পরাজয়ে তো বটেই, জয়েও। এ-এক অন্তহীন কর্মধারা। আমার কাজ একটাই, আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকা। অনবরত। অবিরত। অবিরাম। আমার সৃষ্টিই হয়েছে এ জন্য। আমার আর কোনো কাজ নেই। সব কাজই এককাজ—আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকা। সব কাজকেই এই কাজের অধীনে নিয়ে আসা। যা-ই করি, আল্লাহর জন্য করা,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন (মুহাম্মাদ, ৭)।

আল্লাহর সাথে লেগে থাকলে আখেরে আমারই লাভ। তিনি প্রার্থিত বিজয় দ্বারা আমাকে গৌরবান্বিত করবেন।

২৯. কুরআন আমার প্রতিটি নড়চড়াকে আল্লাহমুখী করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমার দাঁড়ানো, আমার বসা, আমার শোয়া, আমার ঘুমুনো, আমার জেগে থাকা সবই আল্লাহর যিকির দ্বারা আবৃত করতে উৎসাহ দেয়। আমার একটা চোখের পলকও যেন আল্লাহশূন্য না হয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে (আলে ইমরান, ১৯১)।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, কুরআন আমাকে আল্লাহর যিকির করতে বলে। আমি বসে আছি, কুরআন আমাকে আল্লাহর যিকির করতে বলে। আমি শুয়ে আছি, কুরআন আমাকে আল্লাহর যিকির করতে বলে। আমাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকতে বলে। আল্লাহর সাথে এঁটে থাকতে বলে। কুরআন বলে, আমার হৃদয় হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে পূর্ণ। একটি প্রশ্ন করা যাক, আমি যখন আয়াতখানা পড়ছি, আমার চোখের সামনে কি সৌম্যদর্শন শান্ত সমাহিত আল্লাহওয়ালা বৃদ্ধের চেহারা ভেসে উঠেছে? যার ঠোঁট সব সময় নড়ছে। তাসবীহ পাঠ করছে—সুবহানাল্লাহ। তাহমীদ পাঠ করছে—আলহামদুলিল্লাহ। তাকবীর দিচ্ছে—আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে মুমিনের যে যিকিরপূর্ণ জীবনের চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন, সেটা কি এমনি এমনি? নাকি আল্লাহ তা'আলা চান, আমরাও তাদের মতো যিকিরপূর্ণ জীবন গড়ি? রবের ভালোবাসায় পরিপ্লুত কলব ধারণ করি? যে কলব আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর মহিমা উপলব্ধিতে অহর্নিশি উন্মুখ।

৩০. শুধু ব্যক্তিই নয়, দাম্পত্যজীবনের যুগলবন্ধনেও কুরআন উপস্থিত। দু'জনের একান্ত আপন নিবিড় সম্পর্কে ছন্দপতন ঘটলে, কুরআন আল্লাহকে হাজির করে। দুজনের মনে জাগিয়ে তোলে আল্লাহর উপস্থিতি। দুজনকে পরামর্শ দেয় আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হতে। দুজনের ঈমানকে তরতাজা করার আহ্বান জানায়,

﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (নিসা, ১৯)।

৩১. দুজনের মনোবিচ্ছেদ যখন তুঙ্গে, তখন শরীয়ত দু-পক্ষ থেকে সালিশ নিয়োগ দিতে বলে। আপসমীমাংসার কাজেও আল্লাহর উপস্থিতি অনস্বীকার্য। চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে আল্লাহর তাওফীকের কথা কুরআন মনে করিয়ে দিয়েছে। দুজনের ভাঙামন জোড়া লাগাবেন আল্লাহ। তিক্ততা যেমনই হোক, আল্লাহ হবেন যোগসূত্র। তাই দুটি হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা করো, তবে (তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য) পুরুষের পরিবার হতে একজন সালিশ ও নারীর পরিবার হতে একজন সালিশ পাঠিয়ে দেবে। তারা দুজন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত (নিসা, ৩৫)।

কোথাও নির্বিঘ্নে দ্বীন পালন করা না গেলে, ইসলামের নিদর্শন প্রকাশে বাধা এলে, হিজরতের আদেশ দেয়া হয়েছে। উপযোগী অনুকূল দেশে গিয়ে বসত গড়তে আদেশ দেয়া হয়েছে। এই স্থানান্তর নিছক 'ইমিগ্রেশন' বা ভৌগোলিক দেশান্তর নয়, এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে 'আল্লাহর দিকে হিজরত',

﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হয়, অতঃপর তার মৃত্যু এসে পড়ে, তারও সওয়াব আল্লাহর কাছে স্থিরীকৃত রয়েছে (নিসা, ১০০)।

চর্মচক্ষে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে, আমি হয়তো লুকিয়ে বর্ডার পার হচ্ছি বা গোপনে ফ্লাইট ধরে দেশত্যাগ করছি, ঈমান বাঁচানোর তাগিদে, এটাই কুরআনের ভাষায়—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত।

৩২. পুরো কুরআনের সবচেয়ে অবাক করা স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম 'সলাতুল খাওফ'। এমন ভয়ের মুহূর্তে, যুদ্ধের ভয়ালতম ঘনঘটায়ও আল্লাহ সলাতে ছাড় দেননি। গভীরভাবে ভাবতে গেলে, বিস্ময় বাঁধ মানতে চায় না। আল্লাহ কতটা গুরুত্ব দিয়ে বান্দাকে তার সাথে জুড়ে রাখতে চান। দু-ফোঁটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়ে কি? কুরআন কারীমে সাধারণ সলাত কীভাবে আদায় করবে, তার বিবরণ

নেই। কিন্তু সলাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি বলা আছে। সুন্নাহতে সলাতুল খাওফের আরও বিস্তারিত বিবরণ আছে। কল্পনার চোখে দেখলে কেমন গা শিউরে ওঠে। সবাই যুদ্ধবর্ম পরিহিত, মুখোমুখি অবস্থানে, চারদিকে শত্রুরা ওত পেতে আছে, মন-বদন উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত, ঝাঁকে ঝাঁকে তির-বুলেট ছুটে আসছে, বিমান হামলা চলছে। মুহুর্মুহু বোমা পড়ছে। এমন প্রচণ্ড অনিশ্চিত মুহূর্তেও আল্লাহ বলেননি, যাও, এখনকার মতো সলাত ছেড়ে দাও। আগে যুদ্ধ শেষ করো, তারপর দেখা যাবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও সলাত না হয় ফরজ থাকল। কিন্তু জামাত তো অন্তত মাফ হওয়াই সকল মানবীয় বাছবিচারে বাঞ্ছনীয় ছিল। না, আল্লাহর হেকমত মানবীয় চিন্তার অতীত। আল্লাহ জানেন, যা আমরা জানি না। আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানেও জামাত ছাড়াকে অনুমোদন করেননি। জমাতবদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করতে বলেছেন। শুধু কি তা-ই, জামাত কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾

এবং (হে নবী,) আপনি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও তাদের নামায পড়ান, তখন (শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে,) মুসলিমদের একটি দল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। অতঃপর তারা যখন সিজদা করে নেবে, তখন তারা তোমাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য দল, যারা এখনো নামায পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা আপনার সাথে নামায পড়বে। তারাও নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সাথে রাখবে (নিসা, ১০২)।

৩৩. ভাবতে গেলেও দম বন্ধ হয়ে আসে, আর কীভাবে বোঝানো সম্ভব! কুরআন কোনো পন্থাই বাকি রাখেনি। যখন যেভাবে পেরেছে, বান্দাকে আল্লাহর দিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে। বান্দার মনে আল্লাহর সম্মান-তাযীম জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। বান্দাকে আল্লাহর ইবাদতে, আল্লাহর যিকিরে জুড়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে। এর চেয়ে বেশি চেষ্টা করা সম্ভব নয়। কুরআন যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়ে বান্দার হৃদয়কে আল্লাহর সাথে বাঁধতে চেষ্টা করেছে।

এসব আয়াত পড়ার পর, কোনো মুসলিমের পক্ষে কি সম্ভব, জামাতের সাথে সলাত আদায়ে অবহেলা করা? সে দেখেছে আল্লাহ কতটা গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধাবস্থায় জামাতের সাথে সলাত আদায় করতে বলেছেন। সে শান্তিতে নিরাপদে আরামে থাকাবস্থায় জামাত ছাড়তে পারবে? যার মধ্যে সামান্যতম আল্লাহর ভয় আছে, আল্লাহপ্রীতি আছে, সে জামাতে শরীক না হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারবে না।

অতর্কিতে হামলা, বোমাবর্ষণের ভয় থাকা সত্ত্বেও যেখানে জামাতে দাঁড়াতে বলেছেন, সেখানে মুমিন ঘরে বসে থাকে কী করে?

৩৪. যারা ঘরেই জায়নামায বিছিয়ে, বা অফিসেই একাকী সলাতে দাঁড়িয়ে যান, তারা কি একটু ভেবে দেখবে, আল্লাহ কীভাবে তরবারি-বুলেট-বোমার মধ্যেও জামাত কায়েম করতে বলেছেন? একটু ভাবলেই চলবে। ইন শা আল্লাহ, কাজ হবে। আল্লাহ বোধোদয় ঘটিয়ে দেবেন।

এমন কি হতে পারে, শত্রুর মুখোমুখি, ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে, প্রাণের ঝুঁকিতে থাকা যোদ্ধাকে বিস্তারিত বর্ণনাসহ জামাতে সলাত আদায়ের হুকুম দিচ্ছেন, আর ঘরে, অফিসে, আরামে বসে থাকা ব্যক্তির একাকী সলাত আদায়ের ওযর মেনে নেবেন? শতভাগ যুক্তিসম্মত ইসলামী শরীয়ত এটা অনুমোদন করবে বলে মনে হয়?

৩৫. কুরআন এটুকুতেই থেমে যায়নি, আগের আয়াতে আমরা জেনেছি, দুই পক্ষে সংঘর্ষের সময় সলাত কীভাবে আদায় করবে, তার বিবরণ, সলাত শেষ করার পর কী করবে? কুরআন বলছে,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾

যখন তোমরা সলাত আদায় করে ফেলবে, তখন আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করতে থাকবে—দাঁড়িয়ে, বসে এবং শোয়া অবস্থায়ও (নিসা, ১০৩)।

আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ, মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে তাঁর কথামতো জামাতের সাথে সলাত শেষ করেছে। দায়িত্ব এটুকুতেই শেষ? জি না। এখনো কাজ শেষ হয়নি। কর্তব্য আরও বাকি আছে। সলাত শেষ হলে আল্লাহর যিকির চালু করতে বলেছেন। তারপর? যিকির করে দায়িত্ব শেষ? তাও না। আলোচনার তরী বিপৎসংকুল পরিবেশ পার হয়ে নিরাপত্তার সময় আসা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছে। শুরু হলো নিরাপত্তার সময়। কুরআন কী করতে বলছে তখন? আবার বান্দাকে সলাতের আদেশ দিচ্ছে। বান্দাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে চাইছে,

﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

অতঃপর যখন (শত্রুর দিক থেকে) নিরাপত্তা বোধ করবে, তখন সলাত যথারীতি আদায় করবে।

পুরো বিষয়টা দাঁড়াল তাহলে এই—সবকিছু আল্লাহর জন্য। কষ্ট করে কি আয়াত দুটো আবার পড়ব? কুরআন কারীম খুলে, একসাথে মিলিয়ে, মহব্বত নিয়ে? গভীর অভিনিবেশে?

৩৬. সূরা ত্বহায় আল্লাহ তা'আলা সলাতের কথা বলেছেন। সলাতের উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের অনেকের কাছে সলাতের আসল দিকটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। বলতে পারি, সলাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। শরীয়তে ঈমানের পরই সলাতের গুরুত্ব। সলাতই মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা সলাতকে কেন এত পছন্দ করেন, কেনই-বা সলাতকে এতটা মর্যাদা দান করেন? উত্তরটা রাব্বে কারীম নিজেই দিয়েছেন—সলাত আল্লাহর স্মরণের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। সলাত আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করার সর্বোত্তম উপায়। সলাত আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হওয়ার অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো (ত্বহা, ১৪)।

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত সলাত। সলাত কেন পড়ব? আল্লাহর যিকিরের জন্য। আল্লাহর স্মরণের জন্য। আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। সলাতে দাঁড়ানোর সময় আয়াতটা মনের পর্দায় ভাসিয়ে তোলা, আমি সলাতে দাঁড়াচ্ছি আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে। যিকিরটা যেন যথাযথ হয়।

৩৭. শিকারি প্রাণীর কথা বলেছেন। সে প্রাণী, শিকার ধরতে মনিবকে সাহায্য করে। মনিব সে প্রাণীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে শিকারি বানায়। এখানেও আল্লাহ বান্দাকে বেখবর হতে দেননি। কুরআন এমন কাজের ফাঁকেও মুসলিমকে আকীদা শিক্ষা দিতে ভোলেনি। মুমিনকে আল্লাহমুখী করার প্রয়াস ত্যাগ করেনি। বান্দা শিকারধরা প্রাণীকে যে প্রশিক্ষণ দেয়, তা মূলত আল্লাহর শেখানো জ্ঞান,

﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾

আর যেই শিকারী পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় শিখিয়ে শিখিয়ে (শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ (মায়েদা, ৪)।

সামান্য কুকুর বা অন্য শিকারধরা প্রাণীকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ও বান্দার মাথায় রাখতে হবে, সে আল্লাহর দেয়া 'ইলম'-ই শেখাচ্ছে। তার নিজস্ব কিছু নয়। তার বড়াই করার উপায় নেই। তার সবকিছুই আল্লাহর। তাকে আল্লাহমুখী হতেই হবে। আমাকে আল্লাহর সাথে জড়িয়ে রাখার এত এত প্রয়াস পুরো কুরআনে ছড়িয়ে আছে, তবুও কি আমি আল্লাহমুখী হতে পেরেছি?

৩৮. কুরআন একবার সাহাবায়ে কেরামকে স্মৃতি রোমন্থন করতে বলেছে। কাফেররা তাদের হত্যাই করে ফেলেছিল প্রায়। কুরআন অতীতদিনের ইতিহাস

মনে করিয়ে দিচ্ছে। উপসংহার? সেই চিরাচরিত ধাঁচ—আল্লাহ তা'আলা সাথে সম্পর্ক গাঢ় করা। যে আল্লাহ তাদের সেদিনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর প্রতি আরও দায়বদ্ধ করে তোলা,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমত স্মরণ করো। যখন একদল লোক তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের (ক্ষতিসাধন করা) থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন এবং (তার কৃতজ্ঞতা এই যে,) আল্লাহকে ভয় করো আর মুমিনদের তো কেবল আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা উচিত (মায়েদা, ১১)।

৩৯. তাফসীরকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। গাযওয়া যা-তুর রিকায়ে, এক বেদুইন গাওরাস বিন হারেস নবীজিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। ইহুদীরা নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, এমনি আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। এসব ঐতিহাসিক পটভূমি আমাদের এখনকার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা লক্ষ করব, সেসব ঘটনা উল্লেখ করে, কুরআন কীভাবে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহমুখী করছে, সেই সাথে আমাদেরও কীভাবে আল্লাহর সাথে জুড়তে উৎসাহ দিচ্ছে। কাফেরদের প্রয়াস আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কাফেরদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছেন। এখন সাহাবায়ে কেরামের করণীয় কী? আরও বেশি তাওয়াক্কুল করা। আরও বেশি আল্লাহমুখী হওয়া। আরও বেশি আল্লাহর মহব্বতে পরিপূর্ণ হওয়া।

কুরআন নিছক অতীত ইতিহাস বলার জন্য পেছন ফিরে তাকায় না। কুরআন ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকায়, মুমিনের কলবকে আল্লাহমুখী করার জন্য। উপরিউক্ত আয়াত যেন বলছে, তোমরা সেসব ঘটনায় নিরাপদ থেকেছ, বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পেয়েছ, এসব এমনি এমনি ঘটেনি, আল্লাহর ফযল-করম আর অনুগ্রহেই হয়েছে। আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, শুকরিয়া আদায় করো, তাঁকে মোটেও ভুলে যেয়ো না। প্রতিনিয়ত তাঁর যিকির মনের চোখে চোখে রাখো। হরদম কলবকে তাঁর যিকিরে যিন্দা সজীব রাখো।

৪০. আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, আমরা সীরাত-ইতিহাস পড়ি। কেন পড়ি? জানার জন্য, শেখার জন্য। কী জানার জন্য, কী শেখার জন্য? যারা সীরাত রচনা করেন, কেন রচনা করেন? কী ফুটিয়ে তোলেন তাদের রচনায়? বিশাল কলেবরের সীরাতগ্রন্থগুলো কী শেখায় আমাদের? তাদের সীরাত রচনাভঙ্গি আর আল্লাহর সীরাত বর্ণনাভঙ্গি এক? দুটি ধারা একটি আরেকটি সাথে মেলে?

বর্তমানের সীরাহগুলো প্রতিটি ঘটনার শেষে আমাকে আল্লাহমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করে? আমাকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল করে? প্রচলিত সীরাহ পাঠশেষে আমি আগের চেয়ে বেশি আল্লাহর দিকে ধাবিত হই?

৪১. সূরা আনফালে আল্লাহ বিভিন্ন গাযওয়ার কথা বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে তাদের ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দিয়েছেন। কেন? সেটা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন। মূসাকে আদেশ দিয়েছেন, বনী ইসরায়েলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহগুলো মনে করিয়ে দিতে,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾

আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে, নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ (বিভিন্ন মানুষকে ভালো অবস্থা ও মন্দ অবস্থার) যে দিনসমূহ দেখিয়েছেন, তার কথা বলে তাদের উপদেশ দাও (ইবরাহীম, ৫)।

পরের আয়াতে মূসা আল্লাহর আদেশে সাড়া দিয়েছেন,

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾

সেই সময়কে স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার স্মরণ করো, যখন তিনি ফিরআওনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন (ইবরাহীম, ৬)।

৪২. কুরআনে মূসার নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মূসা আ. হুকুম দিলেন বনী ইসরাইলকে, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে। তারা প্রবেশে অপারগতা জানাল। অজুহাত দিল, সেখানে প্রতাপশালী সম্প্রদায়ের বাস। তারা শক্তসমর্থ কওম। তাদের সাথে আমরা পেরে উঠব না। তখন দুই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল বুক চিতিয়ে। বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে। মূসার ডাকে সাড়া দিয়ে। বীরদ্বয় কওমকে সজাগ করার প্রয়াস চালাল। উৎসাহ দিয়ে বলল, আমরা নিছক প্রবেশ করলেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই জাতি আল্লাহর ইচ্ছায় পরাজিত হবে। দুই বীরের নাম কুরআন উল্লেখ করেনি। কিন্তু তাদের কীর্তি অক্ষয় করে দিয়েছে। তাদের এই বীরত্বের উৎস কী? কুরআন তা নির্ণয় করে রেখেছে,

﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে প্রবেশ করো এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেয়ো না; তা হলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা, সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে অবশ্যই আমরা (সেখানে) প্রবেশ করব। যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দুজন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল, তোমরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার ওপরই ভরসা রেখো, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও (মায়েদা, ২০-২৩)।

আল্লাহর সাথে দুজনের সম্পর্ক কী চমৎকারভাবেই না ফুটে উঠেছে। তারা দুজন আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ঈমান ও দ্বীন দান করেছেন। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহর নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অন্যদের পরামর্শ দিয়েছেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে। তাওয়াক্কুল কলবকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করার সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মসৃণতম মাধ্যম। বলা ভালো, তাওয়াক্কুলই আল্লাহর সাথে কলবের সংযোগের একমাত্র মাধ্যম।

৪৩. মূসার যত ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফেরাওনের সাথে, বনী ইসরায়েলের সাথে, প্রতিটি ঘটনার মূলকেন্দ্রে আল্লাহ। আল্লাহই প্রতিটি ঘটনার 'জওহার'। মূল কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি ঘটনা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বান্দাকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করার বার্তা দিয়ে গেছে। পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার কথা বলে মূসা তাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দুই অজানা বীর সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করেছেন, কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। দুই বীরের নসীহত শেষ হয়েছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল দিয়ে। পুরো ঘটনায় শুধু ঈমান আর ঈমান।

আমাদের জীবনে নেমে আসা বিপদাপদ, দুঃখকষ্টের কথা কুরআন বলে। রোগবালাই হলে সারাইয়ের জন্য উপায় অবলম্বন করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে। রোগ হলে আরোগ্যলাভের জন্য ওষুধ সেবন, দারিদ্র্য দূর করার জন্য হালাল রুজির চেষ্টা ইত্যাদি। কুরআন এসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বনের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দেয়—আল্লাহমুখিতা। দুর্যোগে কুরআন মানুষকে আল্লাহর দিকে ভালো করে ঝুঁকতে বলে। রোগ-সমস্যা দূর করেন। তিনিই মূলত কুরআন অপূর্ব ভঙ্গিতে বিষয়টি তুলে ধরেছে,

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন, তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনি তো সব বিষয়ে শক্তিমান (আন আম, ১৭)।

৪৪. আরেক জায়গায় বলেন,

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾

আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনো মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তাঁর অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (ইউনুস, ১০৭)।

দুটি আয়াতে আরেকটি দিক ফুটে ওঠে, আল্লাহ শুধু বিপদ দূরই করেন না, বিপদগুলো পাঠানও তিনি। মুমিন যখন এসব আয়াতের গভীরে গিয়ে ভাবে, তার কলব আগের চেয়েও বেশি ঈমান-একীনে পূর্ণ হয়ে যায়। বিপদাপদ দেন যিনি, দূরও করেন তিনি। গরিব করেন যিনি, ধনীও বানান তিনি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, যেখান থেকে শুরু, ওখানেই শেষ। সূচনাতেও আল্লাহ, সমাপ্তিতেও আল্লাহ। আদিতেও আল্লাহ, অন্তেতেও আল্লাহ। আদিগন্ত পুরোটাই আল্লাহময়। বাকি আর থাকে কী? গাইরুল্লাহর কোনো স্থান আছে? শুধু আল্লাহ আর আল্লাহ। আল্লাহই নামান, আল্লাহই ওঠান। এই উত্থান-পতন সবই মুমিনকে শুধু একটি দিকেই ধাবিত করে—আল্লাহ। জীবনের এসব ছন্দপতন মুমিনকে আল্লাহর মহব্বতে আরও পোক্ত করে তোলে। মুমিনের কলবকে আল্লাহর হাকীকত-মারেফতে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে। আল্লাহর প্রতি সমীহ-সম্ভ্রমবোধে জাগরিত করে তোলে।

৪৫. এরপর কুরআন ব্যক্তিগত গণ্ডি ছেড়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। ব্যক্তির পরিধির পর ব্যষ্টির পরিধিতে আলোচনা টেনে নিয়েছে। সমাজ, জাতিগোষ্ঠীর সংকট সমস্যা তুলে ধরেছে। আল্লাহ তা'আলা এসব কেন দেন, এর পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী, সেটা পরিষ্কার করেছে। কেন এসব দেন আল্লাহ? কারণ একটাই, মানবজাতিকে মহাসত্যের মুখোমুখি করে দেয়া। কুরআনের পরতে পরতে যা ছড়িয়ে আছে। কুরআনের শিরায় উপশিরায় যা বয়ে গেছে। কুরআনের প্রতিটি উপমা-উচ্চারণে মিশে আছে যা। অন্য কিছু নয়; সবাইকে আল্লাহমুখী করে তোলা। দুনিয়ার সমস্ত কার্যকলাপের পেছনে একটাই হেকমত, দুনিয়াবাসীকে তাদের খালেকের সাথে জুড়ে দেয়া,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

(হে নবী,) আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর আমি (তাদের অবাধ্যতার কারণে) তাদের অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুনয়-বিনয় করে। অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল (আন'আম, ৪২-৪৩)।

৪৬. প্রায় এমন কথা আরেক আয়াতে বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾

আমি যেকোনো জনপদে নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদের অবশ্যই অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা বিনয় অবলম্বন করে (আ'রাফ, ৯৪)।

আরেকটি আয়াতেও পরোক্ষভাবে আমাদের আল্লাহমুখী হতে বলা হয়েছে। শুধু বাহ্যিকভাবেই নয়, মনেপ্রাণে। সর্বান্তঃকরণে। বিনয়ে বিগলিত হয়ে। মনপ্রাণ উজাড় করে,

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾

আমি তো তাদের (একবার) শাস্তিতে ধৃত করেছিলাম। তখনো তারা নিজ প্রতিপালকের সামনে নত হয়নি এবং তারা তো কোনোরকম অনুনয়-বিনয় করে না (মুমিনুন, ৭৬)।

৪৭. সময়ে সময়ে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর বালা-মুসীবত আসে। আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার আওতাতেই এসব নেমে আসে। আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন। তাই তিনি চান, আমরা তার থেকে দূরে সরে না যাই। আমরা তার দিকে ফিরে যাই,

﴿وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

আমি তাদের ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসে (আ'রাফ, ১৬৮)।

ব্যক্তি ও সমাজে দারিদ্র্য, রোগবালাই, অর্থনৈতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে ছন্দপতন ঘটায়। এসবের কারণে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব পাঠানোর উদ্দেশ্য একটাই—সেতুবন্ধ। তিনি চান বালা-মুসীবত বান্দা ও তার মাঝে সম্পর্ক নবায়ন ও উন্নয়নে সেতুর ভূমিকা পালন করুক। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কলব জেগে উঠুক। আমাদের অন্তর আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও শান্তি খুঁজুক। আল্লাহর কাছে

কাকুতিমিনতি করে আহাজারি করুক, আল্লাহর সাথে জুড়ে যাক। এখন আমার কাজ হলো, ভাবতে বসা। বিপদাপদের সম্মুখীন হলে আমার ভূমিকা কী হয়, সেটা যাচাই করে দেখা। আমার আচরণগুলো কি কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত হয়? বিপদে আমি আগের চেয়ে বেশি আল্লাহমুখী হই নাকি নির্বিকার থাকি? আমি কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানবে পরিণত হতে হলে, আমার সবকিছুকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে হবে।

৪৮. কুরআন নাযিলের পেছনে 'হাকীকতে কুবরা' বা মহাসত্য কী? প্রতিটি মুসলমানেরই এই মহাসত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াতে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শতভাগ পূর্ণতার সাথে কুরআনের মূলদর্শন শিখিয়ে দিয়েছেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক (আন'আম, ১৬২)।

কী অসম্ভব সুন্দর আয়াত। আত্মসমর্পণের একেবারে চূড়ান্ত। আয়াতখানা ইবাদত, জীবন ও মৃত্যুর মূল উদ্দেশ্য সাফসাফ বলে দিয়েছে। কীভাবে সলাত আদায় করতে হবে, কীভাবে হজ করতে হবে বা অন্যান্য দৈনন্দিন আমল কীভাবে করবে, তা অনেকেই জানে। কিন্তু খুব কম মানুষই জানে, কীভাবে আল্লাহর জন্য বাঁচবে, কীভাবে আল্লাহর জন্য মরবে। এই সুমহান আয়াতখানা কুরআনের মৌলিক ও প্রধানতম শিক্ষাটি খুবই অল্পকথায় দিয়ে দিয়েছে। এই শিক্ষাটিই কুরআনের 'লুব্ব' বা মগজ। সারনির্যাস। কুরআন আত্মশুদ্ধির কিতাব। বান্দা যখন এই আয়াতের শিক্ষাটা নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারবে, তখনি তার আত্মশুদ্ধি পূর্ণতা পাবে— আমার সবকিছুই আল্লাহর।

৪৯. সূরা আনফালের সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে বদরের পূর্বাভাসমূলক আলোচনা। তারপর বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা, কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন, তারপর কুরাইশের সামরিক শাখার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ও মহান বিজয়গাথা। পুরো ধারাবিবরণীর মধ্যে বিস্ময়কর বিষয় কোনটা? কুরআন পুরো ব্যাপারটা, নিজস্ব অননুকরণীয় ধাঁচে ঘটনাবলি তুলে ধরার করার পর, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে আপন লক্ষে ফিরে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহমুখী হওয়ার তাগিদ দিয়েছে। বিজয়ের পুরো কৃতিত্ব আল্লাহর, এই দীক্ষা দিয়েছে। গভীর অনুধ্যান নিয়ে তিলাওয়াত করে দেখি,

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

সুতরাং (হে মুসলিমগণ, প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছিলেন এবং (হে নবী,)

আপনি যখন (তাদের ওপর মাটি) নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন (আনফাল, ১৭)।

৫০. সাধারণ ভাসাভাসা দৃষ্টিতে ভাবতে বসলে কেমন লাগে না? যুদ্ধ করলেন সাহাবায়ে কেরাম, মুঠোভরে ধুলো উড়িয়ে মারলেন রাসূলুল্লাহ, তা সত্ত্বেও কুরআন বলছে, না তোমরা মুশরিকদের হত্যা করোনি, আর হে রাসূল, আপনিও নিক্ষেপ করেননি, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই কাফেরদের হত্যা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই কাফেরদের দিকে ধূলি ছুড়ে মেরেছেন। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলাই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করেছেন। চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশ কৃতিত্ব আল্লাহর, এ কথা বোঝানোর জন্য বান্দার কিছু বাহ্যিক আচরণকেও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দেখিয়েছেন। মানে, তোমরা যা করেছ, তা আল্লাহর তাওফীকেই করেছ। সবকিছুর নিয়ন্তা যমীনে নয় আসমানে। বাহ্যিক কিছু চাকচিক্য দেখে বান্দা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ সঠিক সময়ে সঠিক পন্থায় বান্দার কলবকে মাটি থেকে তুলে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। মাটির ফাঁদ থেকে অবমুক্ত করে উর্ধ্বজগৎমুখী করে দিয়েছেন। আবার একটু ধ্যান দিই (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)। এই বাক্যে দুটি বিষয় লক্ষণীয়,

ক. ইসবাত-সাব্যস্তকরণ। (إِذْ رَمَيْتَ) যখন আপনি নিক্ষেপ করেছেন। নবীজির জন্য 'নিক্ষেপ' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে মূলত নবীজির 'আমিত্ব' দূর করা হয়েছে। নিক্ষেপ সাব্যস্তের মাধ্যমে নবীজির 'আমিত্ব'-কে অসাব্যস্ত করা হয়েছে।

খ. নফী-অসাব্যস্তকরণ। (وَمَا رَمَيْتَ) আপনি নিক্ষেপ করেননি। মূলত আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। এর মাধ্যমে নবীজিকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে আল্লাহর কাছে। নিক্ষেপটা আসাব্যস্তের মাধ্যমে আল্লাহমুখিতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। মানে আপনি করেননি।

৫১. এমনি বার্তা আরেক আয়াতেও আছে। লড়াই করবে মুসলিমগণ, শাস্তি দেবেন আল্লাহ। মারবে মানুষ, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে আল্লাহর,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দান করেন (তাওবা, ১৪)।

বাহ্যিক উপকরণ সাহাবায়ে কেরামের হাত। মূল কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলার। প্রাকপরিকল্পনা ও কর্মপরিণতি আল্লাহর জন্য। মধ্যখানে 'বান্দা'। আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী কর্মী। যাকে কুরআন কারীম খলীফা অভিধায় সম্মানিত করেছে। খলীফা মানে প্রতিনিধি। কার? অবশ্যই আল্লাহর। তোমরা কাফেরদের হত্যা করছ, কিন্তু তোমাদের এই কাফেরবধ, মূলত তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি।

৫২. কুরআন কি শুধু মুসলিমের কিতাব? কুরআন বিশ্বমানবতার কিতাব। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুসলিমের নয়, সবার নবী। কুরআনে কারীম শুধু মুসলিমকে আল্লাহর সাথে জোড়ার কথা বলে না, কাফেরের হৃদয়েও কীভাবে আল্লাহকে বসানো যায়, তার রূপরেখা তৈরি করে। কুরআন মুসলিমকে বলে, বন্দীর হৃদয়কে কীভাবে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে। তারা ছিল বদরের কিছু বন্দী। ইসলাম ও মুসলিমদের মদীনার বুক থেকে নির্মূল করার দুরভিসন্ধি নিয়ে মক্কা থেকে এসেছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের কলবের খোঁজ নিতে বলেছেন। তাদের কলবকে আল্লাহর ক্ষমাপরায়ণতা ও দয়াময়তার মহাগুণের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

হে নবী, আপনাদের হাতে যে সকল বন্দী আছে (এবং যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে), তাদের বলে দিন, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের থেকে যে সম্পদ (ফিদয়ারূপে) নেওয়া হয়েছে, তোমাদের তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (আনফাল, ৭০)।

আয়াতের আলোচ্য বিষয় বন্দীদের কলব। তাদের হৃদয়কর্মের প্রতি নজর দিতে বলা হয়েছে। বন্দীদের কলবে কি ঈমান আছে? থাকলে তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বন্দীরাও যাতে নিজের কলব সংশোধনের প্রতি আগ্রহী হয়, তার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। পরোক্ষভাবে এটাও বলে দেয়া হয়েছে, তাদের কলবের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি আছে। পুরো ব্যাপারটাতে কাফিরদের কলবকে গড়ে তোলার এক নিবিড় প্রয়াস ফুটে উঠেছে।

৫৩. তাবূকে পিছিয়ে থাকা তিন সাহাবীর ঘটনা বলছেন আল্লাহ তা'আলা। তিন জনের প্রচণ্ড মর্মযাতনা, সুতীব্র বিবেকদংশন, অসহনীয় অন্তর্জ্বালার কথা বলা হয়েছে। উত্তরণের স্বর্ণালি পর্বও কুরআন সামনে এনেছে। তিন সাহাবীর সংকট কেটেছে তাওবার স্তরে উপনীত হয়ে। আল্লাহর কাছে ফিরে আসাই মুমিনের শেষকথা, মুমিনের পথচলার শেষধাপ। ভুল করার পর মুমিনের এভাবে আল্লাহর পানে ফিরে আসাটা আল্লাহর বড়ই প্রিয়। রাব্বে কারীম মুমিনের এই আত্মসমর্পণে খুবই খুশি হন,

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় হলেন), যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখা হয়েছিল। যে পর্যন্ত না এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং তারা উপলব্ধি করল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না, পরে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তাঁরই দিকে রুজু করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (তাওবা, ১১৮)।

৫৪. তাদের ওপর দিয়ে কী যে বয়ে গেছে, আয়াতের দিকে গভীরভাবে তাকালে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে। তিন জনের কষ্ট-যাতনার ধরন ও স্তরগুলো নিপুণ নিখুঁতভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে,

ক. বাইরের জগতের চিত্র কেমন ছিল? (ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল।

খ. তাদের অন্তর্গত চিত্র কেমন ছিল? (وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ) তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

গ. এই দুঃসহ যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে তিন জন কোন তুঙ্গে আরোহণ করলেন? (وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ) এবং তারা উপলব্ধি করল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না।

৫৫. এই শিখরের চেয়ে উঁচু আর কোনো চূড়া আছে? পুরো ঘটনার দিকে আরেকবার দৃষ্টিপাত করি। তিন জনের শেষ আশ্রয় 'আল্লাহ'। তিন জনের চূড়ান্ত উপলব্ধি 'আল্লাহ'। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁরা আগেও আল্লাহমুখী ছিলেন এখনো আছেন। পরম আশ্চর্যের বিষয় হলো ঘটনার শুরু ও শেষ এক। কুরআনে পুরো ঘটনার আদি ও অন্ত নির্দিষ্ট একটি দিকে ইশারা করে। যেখান থেকে শুরু সেখানে এসেই শেষ। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, এই ভয় কে দেখিয়েছেন? আল্লাহ। তিন সাহাবী ভয় পেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কার কাছে? আল্লাহর কাছে। মাওলায়ে কারীম চান আমরা শুধু তাঁরই কাছে ধরনা দিই। তাঁরই দরবারে হাজির হই। এমন বান্দাই তাঁর পছন্দ। এমন কলবই তাঁর আদরের।

৫৬. কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, উপমা থেকে একটি বিষয়ই ফুটে ওঠে, আল্লাহ চান, আমরা বিপদে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করি। রাব্বে কারীম চান, বিপদমুক্ত হলেও আমরা আগের মতো কাকুতি-মিনতি অব্যাহত রাখি। দুর্দিনে আল্লাহমুখী হয়ে, সুদিনে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বিবেচনাপ্রসূত আচরণ নয়। আল্লাহর প্রতি আদব বা সৌজন্যের দাবিও এমনটা নয়। এই প্রসঙ্গেই কুরআন বলছে,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দিই, তখন সে এমনভাবে পথ চলে যেন সে কখনো তাকে স্পর্শ করা কোনো বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি। যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের কাছে নিজেদের কৃতকর্মকে এভাবেই মনোরম করে তোলা হয়েছে (ইউনুস, ১২)।

৫৭. আয়াতখানার দিকে গভীরভাবে তাকালে বান্দার অকৃতজ্ঞতার চিত্র ভেসে ওঠে। বিপদে সে দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে ডাকতে ডাকতে দম ফুরিয়ে ফেলে। যেই বিপদ দূর হলো, সে বেমালুম সব ভুলে আগের মতো আল্লাহভোলা হয়ে যায়। সে ভুলে যায়, রাতের পর রাত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া মুহূর্তগুলো। সে ভুলে যায় আপৎকালে মুনাজাতে কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে ফেলার কথা। বান্দার এই পিঠটান দেয়া স্বভাবের পরিণতি খুবই গুরুতর আর যন্ত্রণাদায়ক। বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাতে আরেক আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾

মানুষকে যখন কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই অভিমুখী হয়ে ডাকে। অতঃপর তিনি মানুষকে যখন নিজের পক্ষ থেকে কোনো নি'আমত দান করেন, তখন সে তা (অর্থাৎ সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতিপূর্বে আল্লাহকে ডাকছিল (যুমার, ৮)।

৫৮. বান্দার দুষ্টস্বভাব সহজে শিষ্ট হওয়ার নয়। কুরআনও সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। বান্দা একবারে সংশোধন না হলে, দুইবার, তিনবার, বারবার একই নসীহত দিয়ে যেতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে,

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾

আমি মানুষের প্রতি যখন কোনো অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দূরে সরে যায়। আবার তাকে যখন কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দুআকারী হয়ে যায় (ফুসসিলাত, ৫১)।

আয়াতগুলো তিলাওয়াত করার সময় সত্যি সত্যি লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাই। আমিও যে এমনই। কষ্টে পড়লে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মুখের ফেনা বের করে ফেলার জোগাড়। যখনি বিপদ কেটে যায়, আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহর অবদান পুরোপুরি ভুলে অকৃতজ্ঞতায় ডুবে যাই,

১. আমার এহেন আচরণ কি সূরা ইউনুসের (যেন সে কখনো তাকে স্পর্শ করা কোনো বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি)-এর মতো নয়?

২. আমার এহেন আচরণ কি সূরা যুমারের (তখন সে তা (অর্থাৎ সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতিপূর্বে আল্লাহকে ডাকছিল) মতো নয়?

৩. আমার এহেন আচরণ কি সূরা ফুসসিলাত (সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দূরে সরে যায়। আবার তাকে যখন কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দুআকারী হয়ে যায়)-এর মতো নয়?

৫৯. অথচ আমার উচিত ছিল, এই আনন্দে প্রথমে আল্লাহকেই মনে আনা। বিপদাশ্রুতে যেমন আল্লাহকে ডেকেছিলাম, আনন্দাশ্রুতেও আল্লাহর সাথেই থাকা। আল্লাহর প্রশংসায় ডুবে যাওয়া। আল্লাহর শোকরগুজার হওয়া। কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া। আয়াতগুলো একটু তলিয়ে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জায়গায় জায়গায়, যারা দুর্দিনে আল্লাহকে ডাকে, সুদিনে আল্লাহকে ভোলে, বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ চান যেকোনো পরিস্থিতিতেই বান্দার কলব থাকবে আল্লাহর সাথে যুক্ত।

৬০. একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে। ধরা যাক ভ্রমণে বের হয়েছি, কোথাও যাচ্ছি, গাড়ি বা বিমানে আরোহণ করেছি। বাহন মসৃণ গতিতে তরতর করে সম্মুখ পানে ছুটছে। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা বাহনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। বিমান তখন মেঘের ভেলায় ভাসছে। এমতাবস্থায় বিমানের ইঞ্জিন সাময়িক বিকল হয়ে গেল। অথবা বাস ব্রেকফেল করল। যেকোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কেমন হবে আমার তখনকার অনুভূতি? আমি কি তখন চূড়ান্তমাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আল্লাহকে ডাকতে শুরু করব না? অতীতস্মৃতির ফিতাগুলো অত্যন্ত দ্রুতলয়ে পেছন দিকে ঘুরতে থাকবে না? আমার চোখের সামনে একে একে আসতে থাকবে না, আমার কৃত যাবতীয় পাপ-দোষগুলো? মৃত্যুকে অতি সন্নিকট থেকে দেখার সাথে সাথে এমন অনুভূতিও কি জাগবে না, আমি যদি এবার বাঁচতে পারি, সব ছেড়ে তাওবা করে ভালো হয়ে যাব। ইন শা আল্লাহ? এমন পরিস্থিতি আমার জীবনে এসেছিল? আরেকটি দৃশ্যকল্প দেখি। আল্লাহ তা'আলা একই বিষয়কে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করছেন,

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ
أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

ٱلْحَقِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির ওপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তার ওপর আপতিত হয় তীব্র বায়ু এবং সব দিক থেকে তাদের দিকে ছুটে আসে তরঙ্গ এবং তারা মনে করে সব দিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ,) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদের মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের মুক্তি দান করেন, অমনি তারা যমীনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদের তোমরা যা-কিছু করছ তা অবহিত করব (ইউনুস, ২২-২৩)।

৬১. আয়াতগুলো কয়েকবার পড়ে দেখি, মাওলায়ে কারীম আমাদের অকৃতজ্ঞতাকে কীভাবে তিরস্কার করছেন, বোঝা যায়? বোঝার পর আমার ভাবনার জগতে দোলা লাগে কি? নিজের জীবনের প্রতি সংশোধনমূলক দৃষ্টি যায় কি? নিজেকে পরিবর্তনের সদিচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে? এর চেয়ে জীবন্ত দৃশ্যায়ন সম্ভব? সেই কুরআন নাযিলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দৃশ্যকল্পটা সর্বযুগে সর্বমানুষের জন্য একই বার্তা পুনরাবৃত্তি করে আসছে। আমরা কতটা সচেতন হচ্ছি? সূরা ইউনুসের দৃশ্যটির আরেকটি ভিন্নভঙ্গির ব্যাখ্যাচিত্র আছে সূরা ইসরায়। সেখানে কুরআন ফুটিয়ে তুলেছে মানববুদ্ধির অজ্ঞতা। আল্লাহ বান্দাকে নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেন। বান্দা কূলে ভিড়ে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়। সে ভাবে নিজের চেষ্টাতেই বিপদমুক্ত সফর সম্পন্ন করতে পেরেছে,

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا﴾

সাগরে যখন তোমাদের কোনো বিপদ দেখা দেয়, তখন তোমরা যাদের (অর্থাৎ যেই দেবতাদের) ডাকো তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়, সঙ্গে থাকেন কেবল আল্লাহ। তিনি যখন তোমাদের উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, অমনি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ ঘোর অকৃতজ্ঞ। তবে কি তোমরা এর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আল্লাহ স্থলেরই কোথাও তোমাদের

ধসিয়ে দিতে পারেন অথবা তোমাদের প্রতি পাথরবর্ষী ঝড় পাঠাতে পারেন, তখন আর তোমরা নিজেদের কোনো রক্ষাকর্তা পাবে না? নাকি তোমরা এর থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের আবার তাতেই (অর্থাৎ সাগরে) নিয়ে যেতে পারেন, তারপর তোমাদের প্রতি প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়ে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি-স্বরূপ তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন, যখন তোমরা এমন কাউকে পাবে না, যে এ ব্যাপারে আমার পেছনে লাগতে পারে (ইসরা, ৬৭-৬৯)।

৬২. কুরআন চমৎকারভাবে মানুষের অজ্ঞতা আর অপরিণামদর্শিতার আসল রূপ তুলে ধরেছে। সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত মানুষ ভাবে, তরী কূলে ভিড়লেই সে নিরাপদ। কুরআন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তুমি ভূমিতে পৌঁছে নিজেকে নিরাপদ ভাবছ কী করে? সেখানেও তুমি ঝুঁকির মুখে আছ; বরং জলের চেয়ে স্থলেই তুমি বেশি অনিরাপদ। স্থলের বিপদই বেশি কঠিন। কারূনের মতো তোমাকেও ধসিয়ে দিতে পারেন। সাদূম নগরীর মতো নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে তোমাকে ধ্বংস করতে পারেন। এরপর কুরআন এক বিস্ময়কর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছে। আচ্ছা, তুমি এবার নাহয় নিরাপদে বেঁচে ঘরে ফিরলে। কিন্তু পরেরবার তিনি চাইলে তোমাকে তোমার কল্পনার চেয়েও কঠিন পদ্ধতিতে শাস্তি দিয়ে তোমাকে ডুবিয়ে দিতে পারেন। সবাই একরকম নয়। ব্যতিক্রম চরিত্রও আছে। বিপদ কেটে গেলে কিছু বান্দা অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করে না,

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

তরঙ্গমালা যখন মেঘচ্ছায়ার মতো তাদের আচ্ছন্ন করে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে ভক্তি-বিশ্বাসকে তাঁরই জন্য খালেস করে। অতঃপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিছুসংখ্যক সরল পথে থাকে। (অবশিষ্ট সকলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়) আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক এমন লোক, যে ঘোর বিশ্বাসঘাতক, চরম অকৃতজ্ঞ (লুকমান, ৩২)।

৬৩. কুরআনে বারবার জাহাজ ভ্রমণ দিয়ে উদাহরণ পেশ করেছে। আমরা এখন বিমান, বাস-ট্রেনের ভ্রমণকেও কুরআনবর্ণিত জাহাজী ভ্রমণের সাথে তুলনা করতে পারি। আমরা স্থল বা আকাশপথের ভ্রমণে বিপদের সম্মুখীন হলে, কেমন অস্থির হয়ে পড়ি? পাহাড়ি পথে যাচ্ছি, গভীর রাতে দুর্গম জঙ্গলে শত্রুপরিবেষ্টিত অঞ্চলে গাড়ি বিকল হয়ে পড়লে, পাশাপাশি ঝড়তুফান আরম্ভ হলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় কেমন বোধ হতে থাকে? তখন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে? অসহায় বোধ থেকে হোক, বাধ্য হয়ে হোক, পুরো সময় আল্লাহকেই ডেকে চলে। এরপর অপ্রত্যাশিতভাবে যখন উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছায়, আল্লাহকে ভুলে যায়।

৬৪. সূরা ইউনুস, ইসরা, যুমারের আয়াতগুলো আরেকবার পড়ে দেখি, এসব আয়াতে আল্লাহ আমাদের কী বোঝাতে চাইছেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। ঘুরেফিরে একটি অর্থই উপলব্ধিতে আসবে—তা'আল্লুক মা'আল্লাহ। এতসব বর্ণনা বৃত্তান্ত দিয়ে কুরআন একটা কথাই বোঝাতে চেয়েছে, বান্দা যেন সুদিন ও দুর্দিন উভয় অবস্থাতেই নিজেকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখে। পুরো কুরআনজুড়ে এই একটি হাকীকতই শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—তা'আল্লুক মা'আল্লাহ। কুরআন কারীমের আগাগোড়া প্রতিটি ছত্র-শব্দকে এই একটি সুতোই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে—তা'আল্লুক মা'আল্লাহ। গোটা কুরআন কারীমের হৃৎস্পন্দন বলতে এই একটিই—তা'আল্লুক মা'আল্লাহ। আল্লাহর সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পুরো কুরআনের আগাগোড়া স্রেফ একটি বিষয়ই ঘুরেফিরে এসেছে—তা'আল্লুক মা'আল্লাহ।

৬৫. যদি প্রশ্ন করা হয়, সাহাবায়ে কেরাম কেরাম কারা ছিলেন? এককথায় সাহাবীর সংজ্ঞার্থ কী? প্রশ্নটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে—সৎসঙ্গ মানে কী? পাশ্চাত্যের বস্তবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে আত্মোন্নয়ন বলতে বোঝায়, বাড়ি-গাড়িতে উন্নতি। পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতিই আত্মোন্নয়নের মূল মানদণ্ড। বস্তুবাদী দর্শনে গাড়ি-বাড়িতে সফল ব্যক্তি মানে সৎব্যক্তি, আদর্শব্যক্তি। অনুকরণীয় ব্যক্তি। অনুসরণীয় ব্যক্তি। এমন সৎ-সফল ব্যক্তির সঙ্গই সৎসঙ্গ। সময় কাটালে এমন ঝাঁ-চকচকে ক্যারিয়ারের লোকদের সাথেই কাটানো উচিত। অনুপ্রেরণা গ্রহণ করলে, এমন বিত্তবৈভবের অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অথবা খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র, শিক্ষাদীক্ষা, গবেষণা বা দানধ্যান করে বিখ্যাত হওয়া ব্যক্তিকেই বর্তমানে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বলে মনে করা হয়। কুরআন বলছে ভিন্নকথা, সম্পর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সৎসঙ্গ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾

ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে (কাহফ, ২৮)।

৬৬. একটু ভেবে দেখি তো, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, পত্র-পত্রিকায়, বক্তব্য-লেকচারে একজন সফল ব্যক্তির কেমন চিত্র আঁকা হয়? ঘুণাক্ষরে কস্মিনকালেও কি কুরআনের মানদণ্ডের সাথে তাদের বক্তব্য মেলে? কুরআন বলে (الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ)-ই অনুকরণীয়। তাদের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহর নবীকেও এমন মানুষগুলোর সঙ্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ভোগসর্বস্ব বস্তুবাদী ঘরানা দূরের কথা, ধর্মীয় পরিবেশও কি উক্ত কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি সাবলীল? বস্তুবাদের ধাক্কা মসজিদ-মাদরাসাতেও ঢুকে পড়েনি?

৬৭. আল্লাহ তা'আলা মূসাকে রেসালতের দায়িত্ব দিলেন। একজন সহকারী হলে, রেসালতের গুরুদায়িত্ব পালন করা সহজ হবে। মূসা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ভাই হারূনকে সহযোগী হিসেবে চাইলেন। দুই ভাইয়ের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? কুরআন বলে দিচ্ছে কেন এই সাহায্য প্রার্থনা,

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾

আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন। আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন। যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ করতে পারি। এবং বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি (ত্বহা, ২৯-৩৪)।

৬৮. রেসালতের দায়িত্ব পালনকালে বেশি বেশি তাসবীহ ও যিকির করার জন্যই সহযোগী চেয়েছেন। কথা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ মূসা ও হারূনকে দায়িত্ব দিয়েছেন ফেরাওনকে দাওয়াত দেয়ার। জানা কথা, মূসা ও হারূন এমনিতেই বেশি বেশি যিকির-তাসবীহ পাঠ করবেন। তারপরও আল্লাহ তা'আলা দুজনকে যিকরুল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নামকাওয়াস্তে যিকির?

﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾

তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার যিকিরে শৈথিল্য কোরো না (ত্বহা, ৮২)।

শুধু যিকির নয়, অবিশ্রান্ত যিকির করতে বলেছেন আল্লাহ। ক্লান্তিহীন নিরন্তর যিকির। যিকিরের পর যিকির। সেকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপতম স্বৈরাচারী একনায়ক ফেরাওনকে দাওয়াত দিতে যাচ্ছেন। এমন গুরুদায়িত্বের মধ্যেও ক্লান্তিহীন যিকিরের আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ। বর্তমানে সরকার ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী একজন বিপ্লবীকে তার বিপ্লব সফল করার জন্য বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরের উপদেশ দেয়া হলে, পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে? বিশুদ্ধ ইসলামী রাজনীতিবিদকেও যদি রাজপথে নেমে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতে বলা হয়, স্বাভাবিকভাবে নেবে বলে মনে হয় না। এমনও বলতে পারে, রাজপথে দরবেশি আর সুফীবাদের স্থান নেই, এখানে টিকে থাকতে হলে 'পলিটিক্স' ছাড়া উপায় নেই। ধন্য সমকালীন 'পলিটিক্স', কুরআনের নামে কুরআনহীন 'রাজনীতি'। আজকের জনজীবনে কুরআনি ভাবধারা কতবেশি অপরিচিত!

৬৯. কুরআন আল্লাহর কালাম। মানুষের হেদায়াতের জন্য। আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য। কুরআনের প্রতি মুমিনের কর্তব্য কী? মুমিন আল্লাহর

কালামকে কীভাবে গ্রহণ করবে? নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবে নিছক কুরআনি বিধান বাস্তবায়ন করলেই হবে? না, কুরআন বলে শুধু আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলেই হবে না। কুরআনের চাহিদা আরও বেশি কিছু। কুরআন শুধু বহিরঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করলেই হবে না, কুরআন গ্রহণ করতে হবে অন্তরঙ্গতা দিয়ে। আল্লাহ চান দাসত্বের বিনয়নম্রতা। আনুগত্যের পূর্ণতম আত্মসমর্পণ। কুরআনের ছোঁয়া পেয়েই মুমিনের মনোজগৎ বরফগলার মতো বিনয়ে বিগলিত হয়ে যাবে,

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾

আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় এটাই (অর্থাৎ এ কালামই) সত্য, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সরল পথের হিদায়াতদাতা (হাজ্জ, ৫৪)।

কোনো কোনো মুফাসসির ইখবাত (إخبات) অর্থ বলেছেন কুরআনের প্রতি বিনম্রচিত্তে সমর্পিত হওয়া।

৭০. কুরআন কারীম শুরু থেকেই আমাদের নিয়ে নানাদিকে যাচ্ছে। কখনো নবীদের গৃহে, কখনো বদর-ওহুদের প্রান্তরে, কখনো অতীতের স্মৃতিতে। একটাই উদ্দেশ্য আমাদের হৃদয়কে সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত করে তোলা। অনেকের ধারণা, শুধু গুনাহ হয়ে গেলে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে হবে। তাওবা করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করলে, আল্লাহর প্রতি ভয়ের মনোভাব রাখতে হবে না। অবচেতনে এ-ধরনের চিন্তা কেউ কেউ পোষণ করেন। কুরআন এমন বলে না। কুরআন বলে পাপ-পুণ্যি উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর প্রতি ভীতনম্র মনোভাব রাখতে হবে। কুরআন বলে মুমিনের কলব সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি নতজানু থাকবে। পাশ্চাত্যসৃষ্ট বস্তুবাদী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে কুরআনি চিন্তা। দুটি চিন্তা কখনোই এক হওয়ার নয়। কুরআন শেখায়, মুমিনের কলব সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর কুদরতের সাথে আবদ্ধ থাকবে। নেককাজ করার সময়ও মুমিনের অন্তরাত্মার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, তার চিত্র তুলে ধরেছে,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

এবং যারা যেকোনো কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদের নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে (মুমিনূন, ৬০)।

অনেক কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রুজি করেছেন। সে টাকা আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা করছেন। বড় ভয়ে ভয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তার দান কবুল করবেন তো? একজন মুমিনের পক্ষে, আল্লাহর প্রতি এর

চেয়ে বেশি আনুগত্য আর কী হতে পারে? এই যদি হয় পুণ্যির সময়কার মনোভাব, পাপের মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি বান্দার কেমন মনোভাব হওয়া উচিত?

৭১. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ পার্থিব বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে ব্যবসার কথা উঠলেও, ব্যবসার কলাকৌশল, ব্যবসার গুরুত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি; বরং সতর্ক করা হয়েছে, ব্যবসা যেন আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ করে না দেয়। ব্যবসা যেন আল্লাহর প্রতি সমর্পণচিত্ততা নষ্ট করে না দেয়,

﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾

এমন লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে না (নূর, ৩৭)।

ব্যবসার মতো মহাব্যস্ততা আর ক্লান্তিকর কাজের সময়ও আল্লাহর যিকির ভুলে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে, অবসর সময়ে কেমন যিকিরে মশগুল থাকতে হবে?

৭২. কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখার বাহ্যিকভাবে দুটি মূলনীতি বলে দিয়েছে কুরআন কারীম। দুটি মূলনীতির সাথেই কলবের সুগভীর সম্পর্ক,

১. নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম রাখা।

২. নিজেকে পরিপূর্ণ আল্লাহর অভিমুখী রাখা।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত গভীর অভিনিবেশে কয়েকবার তিলাওয়াত করে দেখি,

﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾

এবং (আমাকে) এই (বলা হয়েছে) যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজ চেহারাকে এই দ্বীনের দিকেই কায়েম রাখবেন (ইউনুস, ১০৫)।

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾

সুতরাং আপনি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখুন (রূম, ৩০)।

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾

সুতরাং আপনি নিজ চেহারা বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে কায়েম রাখুন, সেই দিন আসার আগে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা টলবার কোনো সম্ভাবনাই নেই (রূম, ৪৩)।

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾

যে ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয়ে নিজ চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আঁকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল (লুকমান, ২২)।

৭৩. কুরআনকে অনায়াসে 'কিতাবুত তাওহীদ' বলা যায়। তাওহীদ কুরআনের প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। তাওহীদ নিয়েই কুরআন সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে তাওহীদই কুরআনের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। তাওহীদের পর কুরআনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় কী? অভিজ্ঞ আলিমগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। বেশির ভাগই 'আল্লাহর যিকির'-কেই কুরআনের দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় বলেছেন। কুরআন কারীমে মৌলিকভাবে দুইভাবে 'যিকরুল্লাহ'-এর আলোচনা হয়েছে,

১. যিকিরের প্রকৃতি। অধিক যিকিরকারীর কথা হয়েছে। বসে-দাঁড়িয়ে-শুয়ে যিকিরের আলোচনা করা হয়েছে। দিনরাতের নানা অংশে যিকিরের প্রসঙ্গ এসেছে। যিকরুল্লাহ থেকে বিমুখকারী বিষয়গুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কলব শক্ত হওয়ার কারণে যিকরুল্লাহ থেকে দূরে সরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। যিকরুল্লাহর ছোঁয়ায় অশ্রুর বিগলিত হওয়ার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২. যিকিরের পদ্ধতি। কখনো তাসবীহ-সুবহানাল্লাহ, কখনো তাহমীদ-আলহামদুলিল্লাহ, কখনো তাহলীল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কখনো তাকবীর-আল্লাহু আকবারের মাধ্যমে যিকরুল্লাহর কথা বলা হয়েছে। কখনো বিশ্বজগতের তাসবীহপাঠের কথা আলোচিত হয়েছে। কখনো সূরার সূচনা হয়েছে তাসবীহ বা হামদের মাধ্যমে।

৭৪. এই বিশ্বজগৎ আল্লাহর 'মাদরাসা'। নবীগণ এই মাদরাসার শিক্ষক। এই মাদরাসার সিলেবাসে পাঠ্যবই দুটি,

ক. কিতাবুল্লাহ। যুগে যুগে পাঠানো আল্লাহর কিতাবসমূহ।
খ. কাওনুল্লাহ। আল্লাহসৃষ্ট বিশ্বজগৎ।

কুরআন কারীম বিশুদ্ধতম 'পাঠ্যবই'। সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের মানসগঠনের জন্য কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কুরআনি আলোচনাগুলোকে আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি,

১. আকীদাগত। কুরআন আমাদের আকীদা গঠন করার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনের প্রতিটি আলোচনাকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আকীদাগত আলোচনার কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যায়। আকীদাগত আলোচনার প্রায় পুরোভাগেই আছে 'তাওহীদ'।

২. কর্মগত। আমলের আলোচনা। যিকরুল্লাহ, সলাত, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। কর্মগত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়কেই সরলার্থে 'যিকরুল্লাহর' আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যায়। কর্মগত আলোচনার পুরোভাগেই আছে আক্ষরিক অর্থেই 'যিকরুল্লাহ'। আল্লাহর স্মরণ। মুখে-চিন্তায়-আচরণে। আচরণে-উচ্চারণে।

৩. ইখবার বা সংবাদ প্রদানমূলক। কুরআন কারীমে বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে। অতীতের ও ভবিষ্যতের। তাওহীদের আলোচনাকেও এই ভাগে ফেলা যায়। তাহলে তাওহীদের পর 'কেয়ামত'-এর আলোচনাই কুরআনে বেশি উচ্চারিত হয়েছে। কুরআনকে যেমন কিতাবুত তাওহীদ বলা যায়, তদ্রূপ কিতাবুল আখিরাহ-ও বলা যায়। তাওহীদের মতোই, ঘুরেফিরেই আখেরাতের আলোচনা।

৭৫. কুরআন তিলাওয়াতের সময় খেয়াল রাখা, আল্লাহ তা'আলা কীভাবে যিকিরের কথা বলেছেন, কোন ভঙ্গিতে বলেছেন। যিকরুল্লাহর একমাত্র মাধ্যম 'কলব'। কলব ও যিকিরের মাঝে যোগসূত্র ও সম্পর্ক কী, সেটাও মুমিনের কাছে স্পষ্ট থাকা জরুরি। দুটি আয়াতে কলব ও যিকিরের সম্পর্কের সেতুবন্ধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় (আনফাল, ২)।

﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

আর সুসংবাদ দিন বিনীতদের। যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত-কম্পিত হয় (হাজ্জ, ৩৪-৩৫)।

দুটি আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, কলবের সাথে যিকিরের সম্পর্কসূত্র। যিকিরের সাথে সাথেই তাদের কলব আল্লাহর প্রতি ভীতনত হয়ে পড়ে।

৭৬. কুরআনের শেষদিকে এসে মুমিনের অনুভূতির চিত্র তুলে ধরেছে। জিহাদের মেহনতের পর আসে বিজয়। নবীজির পুরো জীবন জুড়েই, বিজয় লাভের জন্য কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছে কুরআন। বিজয়ের পর করণীয় কী?

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দেখবেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল (নাস্‌র)।

৭৭. কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, নানা ভঙ্গিতে কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। শুধু মৌখিক আল্লাহর যিকির নয়, একই আলোচনায় আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নাম ব্যবহার করে, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রতিটি

সিফাতী নামই স্বতন্ত্র গুরুত্ব মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ধারণ করে। বান্দা যে গুণবাচক নামে আল্লাহকে ডাকবে, বান্দার ওপর সে গুণবাচক নামের প্রভাব পড়বে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, সূরা নাসে বান্দা আল্লাহর একেকটি গুণবাচক নামের মাধ্যমে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সুরক্ষা লাভ করে চলেছে,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ﴾

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের। সমস্ত মানুষের অধিপতির, সমস্ত মানুষের মাবুদের (নাস, ১-৩)।

৭৮. প্রথমে রবের কাছে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)। রব বলা হয়, যিনি পরম আদরযত্নে প্রতিপালন করে, অসম্পূর্ণ অবস্থা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। আল্লাহকে রব মেনে কলব আশ্বস্ত হওয়ার পর, বান্দার সামনে মহান আল্লাহর সুবিশাল রাজত্বের দ্বার উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে (مَلِكِ النَّاسِ)। বান্দার কলব আরও বেশি আস্থার সাথে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতে পেরেছে। পরম নির্ভরতার সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছে। তারপর সামনে আনা হয়েছে আল্লাহর উলূহিয়্যাত (إِلَٰهِ النَّاسِ)। আল্লাহ আমাদের ইলাহ। উপাস্য। আল্লাহকে আমাদের উপাসনা-ইবাদত করা আবশ্যক। একমাত্র প্রকৃত ইলাহের কাছেই আশ্রয় নেয়া আবশ্যক। কুরআন ধাপে ধাপে বান্দার কলবকে আল্লাহমুখী করেছে। ধীরে ধীরে বান্দার কলবে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা সৃষ্টি করেছে। ক্রমান্বয়ে বান্দার কলবকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে, আল্লাহর ইবাদতে উৎসাহী করে তুলেছে। কুরআন বান্দাকে নিছক আক্ষরিক নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ব্যবহারিকভাবেও ধাপে ধাপে প্রস্তুত করে নিয়েছে। কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা, বান্দার কলবকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। কেমন হবে মুমিনের কলব, কী হবে মুমিনের কলবের কর্তব্য, তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে গেছে।

৭৯. পুরো লেখায় শুধু বাছাই করা কিছু আয়াত ও ঘটনার চিত্র উঠিয়ে আনা হয়েছে। আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে অনেক-অনেক গুণ বেশি আয়াত। বলা ভালো, আমরা খেয়াল করলেই বুঝতে পারব, কুরআনের প্রতিটি আয়াতই আসলে (عمارة النفوس بالله) নাফসকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার কথা বলে। প্রতিটি আয়াতই কলবকে আল্লাহর স্মরণ দ্বারা আবাদ করার কথা বলে। প্রতিটি আয়াতই বান্দার কলবকে আল্লাহর দিকে উঠিয়ে নেয়ার সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি আয়াতই বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সোপানের ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি আয়াতই মানবাত্মাকে আত্মার স্রষ্টার

কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার শক্তি বহন করে। প্রতিটি আয়াতই কলবকে কলবনিয়ন্তার সাথে জুড়ে দেয়ার প্রাণশক্তি বিকিরণ করে।

নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে এই শিক্ষাই আজীবন দিয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরামের কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। হাদীস থেকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। সাত সফল ব্যক্তির তালিকা দিয়েছেন নবীজি। যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। অন্যতম হলো,

وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ منه حتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ

এমন ব্যক্তি, যারা কবল সব সময় মসজিদমুখী থাকে। মসজিদ ছেড়ে বের হলে, আবার কখন মসজিদে যাবে, তার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে (মুত্তাফাক, ৬৬০)।

৮০. রাসূলুল্লাহ চমৎকার উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমাদের অন্তরকে মসজিদের মাধ্যমে আল্লাহমুখী করার কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আজকের বস্তুবাদী দর্শনের আগ্রাসনে, মসজিদমুখী কলবের চিন্তা সেকেলে মনে হবে। ইসলামের আধুনিকায়নের প্রবক্তা দাঈদের কথাবার্তা শুনলেও মনে হয়, মসজিদমুখী কলবের চর্চা এ-যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। 'মডার্ন' দাঈদের চিন্তা মসজিদমুখী নয়, মসজিদের বাহিরমুখী। রাসূলুল্লাহ মুমিনের কলবকে মসজিদমুখী করার মেহনত করে গেছেন, বর্তমানে ইসলামের যুগোপযোগীকরণের প্রবক্তা দাঈগণ মুমিনের কলবকে মসজিদ থেকে বের করে আনার এজেন্ডা নিয়ে নেমেছে। রাসূলুল্লাহ মুমিনের কলবকে মসজিদের প্রশান্তিময় ছায়ার মধ্য দিয়ে আরশের ছায়ায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আধুনিক দাঈরা মুমিনকে মসজিদের সুশীতল ছায়া থেকে বের করে, দুনিয়ার অগ্নিগর্ভ কোলাহলে নিয়ে যেতে চায়।

৮১. আমরা এতক্ষণ যা বললাম, সবই আসলে 'তাওহীদের' বৈশিষ্ট্য। কলবে সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকির, কলবকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখা তাওহীদেরই বাহ্যিক রূপ। কুরআন কারীমে তাওহীদের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে। এ-দুই মহান নবী আজীবন তাওহীদের জন্য লড়ে গেছেন। দুজনেই তাওহীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে পরিপূর্ণ সাফল্যের ধারকবাহক। তাওহীদের প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? ইফরাদুল উলূহিয়্যাহ (إفراد الألوهية)-কলবকে সম্পূর্ণ গাইরুল্লাহমুক্ত করা। কলবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু স্থান না দেয়া। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ-উপাস্য, কলবের প্রতিটি অন্দর-কন্দর এই মহাসত্যে আকীর্ণ হওয়া।

৮২. মানবহৃদয় জন্মগতভাবেই দুনিয়াপ্রবণ। পার্থিব ভোগবিলাসের দিকে মানুষের আকর্ষণ সহজাত। পাশাপাশি আখেরাতের প্রতি উদাসীনতাও মানুষের সত্তাগত প্রবণতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জন্য কুরআনে দুনিয়াকে নিতান্তই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বস্তুরূপে উপস্থাপন করেছে। পাশাপাশি আখেরাতের আলোচনাকে মহীয়ান গরীয়ান করে দেখানো হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি আলোচনা ঘুরেফিরে গিয়ে শেষ হয়েছে আখেরাতে। কুরআন নানাভঙ্গিতে মানুষের কলবকে আখেরাতমুখী করার প্রয়াস চালিয়েছে। আখেরাতের পাথেয় উপার্জনের নানা উপায় বর্ণিত হয়েছে কুরআনজুড়ে। প্রধানত আখেরাতকে মূল গন্তব্য দেখানো হয়েছে বারবার। আখেরাতের প্রস্তুতি অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সালাফও জীবনযাপনে, ওয়াজ-নসীহতে কুরআনের পথেই হেঁটেছেন। দুঃখের বিষয়, মুসলিম-সমাজে আজ দুনিয়া পেয়ে গেছে প্রধান গুরুত্ব, আখেরাত হয়ে গেছে গুরুত্বহীন। চিন্তার গতিপ্রকৃতিই বদলে গেছে একেবারে। এখন মনে করা হয়, দ্বীন পালনে অবহেলা নয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পশ্চাৎপদতাই মুসলিম-সমাজের পিছিয়ে পড়া ও যাবতীয় সংকটের কারণ। অবশ্য আশার কথা, পুরো মুসলিম-সমাজেই পচন ধরেনি, আজও কিছু লোক আছে :

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনো প্রতীক্ষায় আছে আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি (আহযাব, ২৩)।

৮৩. আল্লাহ সর্বনিয়ন্তা। সবকিছু আল্লাহর ইশারাতেই ঘটে। পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার পেছনেই আল্লাহর হেকমত নিহিত থাকে। প্রতিটি ঘটনাই আল্লাহর কুদরত প্রকাশ করে। যারা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনাই আল্লাহর অস্তিত্বের কথা জানান দেয়, বান্দাকে আল্লাহমুখী করে, তারাই মূলত আল্লাহওয়ালা। তারাই কিতাবুল্লাহর মূল সুর ধরতে পেরেছে। তারাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী। বিপরীতে কিছু লোক আছে, যারা সবকিছুর পেছনে আল্লাহর কুদরত আবিষ্কার করার প্রবণতাকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখে, তারা মনে করে এটা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি। এরা আল্লাহর কিতাবের মূল শিক্ষা ধরতে পারেনি। এরা আল্লাহকেও ভালো করে চেনেনি। এরা কুরআন ও দ্বীনের বিকৃত রূপে মোহিত হয়ে আছে। এরা কিতাবুল্লাহর মূল বার্তা থেকে দূরে অবস্থান করছে। কুরআন শিক্ষা দেয়, দুনিয়ার সৃষ্টিই হয়েছে আল্লাহকে চেনার জন্য।

কুরআন বলে বিশ্বজগৎ আল্লাহকে চেনা ও জানার মাধ্যম। আসমান-যমীনের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর অস্তিত্বকে জানান দেয়। কুরআন কারীম এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসব অস্বীকার করতে পারে।

৮৪. বান্দা যখন কুরআন কারীমের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তাওহীদ, আখেরাত, যিকরুল্লাহর প্রতিচ্ছবি দেখার স্তরে উত্তীর্ণ হয়, তার মধ্যে জন্ম নেয় ঈমানের অবিস্মরণীয় এক প্রভাব ও শক্তি। এমন বান্দার কলব থেকে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। তার কলবে অবশিষ্ট থাকে একমাত্র যিকরুল্লাহ। এমন বান্দা প্রতিটি প্রয়োজনে আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয়। তার কলবে সার্বক্ষণিক প্রশান্তি বিরাজমান থাকে। নিজের সবকিছুর দায়-দায়িত্ব আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার কারণে, নিজের মধ্যে অনুভব করে অপরিমেয় এক শক্তি আর নির্ভরতা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'তাওয়াক্কুল'। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির চেয়ে শক্তিমান আর কেউ হতে পারে না। সত্যিকারের তাওয়াক্কুল থাকলে, শরীয়তসম্মত উপায়-মাধ্যম অবলম্বন করবে সত্য, কলব থাকবে পুরোপুরি আল্লাহমুখী, নিজের হাতে ধান কাটলেও তার মন বলবে, আল্লাহই এই ধান কাটাচ্ছেন। নিজের হাতে পানি পান করলেও, মন বলবে আল্লাহই পান করাচ্ছেন। হাড়ভাঙা খাটুনি করে উপার্জন করলেও মনে মনে জানবে, এই রিযিক আল্লাহই দিয়েছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ঘর বানালেও, মনে থাকবে এই ঘর আল্লাহই বানিয়ে দিয়েছেন। অহোরাত্র খাটাখাটুনি করে জুতোর সুকতলা ক্ষইয়ে চাকরি পেল, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, এই চাকরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। দিনরাত এক করে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়েছে, আলিম হয়েছে। এতকিছু করার পরও, ঠিকই জানবে, যা-কিছু শিখেছে, সবই আল্লাহর দান। এই ডাক্তার, ওই হেকিম, নানা হাসপাতাল দৌড়ে জেরবার হয়ে সুস্থ হয়েছে। একবারের জন্যও মনে হয়নি, নিজের চেষ্টায় নিরাময় লাভ হয়েছে। আল্লাহই সুস্থ করেছেন। দেদার টাকা খরচ করে, দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ে জিতে জেলজুলুম থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই বিশ্বাসে একটু চিড় ধরেনি, আল্লাহই যিন্দানখানা থেকে মুক্ত করেছেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ের মুখ দেখেছে। সাজদায়ে শোকর দিয়ে মনেপ্রাণে বিশ্বাস প্রকাশ করেছে, এই বিজয় আল্লাহরই দান। এটাই তাওয়াক্কুল। এরাই সত্যিকারের শক্তিমান।

৮৫. আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের বইগুলোর সাথে কুরআনি চিন্তাকে মেলালে, দুই চিন্তার পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক চিন্তার বইগুলোর দৌড় শিল্পবিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিস্ফোরণ, বিজ্ঞানের নানাশাখায় অভাবনীয় উন্নতি পর্যন্তই। কিন্তু কুরআনের ব্যাপ্তি? দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি-অগ্রগতির ধারাকে ধারণ ও সমর্থন করে কুরআনের গতিপথ আরও সুদূরে—আখেরাতে।

পার্থিব উন্নতিকে কুরআন নিরুৎসাহিত করে না। আখেরাতকে সবকিছুর মূলে রেখে, কুরআন দুনিয়াতে বসবাস করতে বলে এখানেই আধুনিক চিন্তাদর্শন ও কুরআনি হেদায়াতের মৌলিক পার্থক্য। রেনেসাঁ, নবজাগরণ, জাতিগোষ্ঠীর উত্থানের নানা পদ্ধতি নিয়ে আধুনিক চিন্তাদর্শনের বইগুলো দিকনির্দেশনা দিয়েছে। একটা বইও নবজাগরণ বা উত্থান সম্পর্কে কুরআনি চিন্তা গ্রহণ করেছে? তামকীন ও ইস্তেখলাফ (প্রতিষ্ঠা ও স্থলাভিষিক্তি) বিষয়ক কুরআনি আয়াতগুলোয় বর্ণিত সূত্র গ্রহণ করেছে, অমুসলিম ঘরানায় লিখিত এমন কোনো বই আছে? সবই প্রাচীন গ্রিক-মেসোপটেমিয়া-আলেকজান্দ্রিয়া-বেদপুরাণ প্রভাবিত চিন্তার পথেই হেঁটেছে। পার্থিব অপার্থিব সব উন্নতি-অগ্রগতির মূলে কুরআন আল্লাহকে মূল কেন্দ্রে রেখেছে। কুরআন কারীমের আয়াতগুলো আমাদের কলবকে 'যিকরুল্লাহ' দ্বারা সার্বক্ষণিক আবাদ রাখতে বলে। এই 'হৃদয়াবাদ' কর্মসূচিই পুরো কুরআনের 'শাহরগ'। জীবনধমনি। মূল রজ্জু। অন্তঃসলিল নির্ঝরের মতো এই 'শিরা' কুলকুল করে বয়ে গেছে কুরআনের প্রতিটি আয়াতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এই রজ্জুই কুরআন। এই কুরআনই 'হাবলুল্লাহ'। আল্লাহর রজ্জু। এই 'হাবলুল্লাহ'-কেই শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾

আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দ্বীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পরে বিচ্ছেদ কোরো না (আলে ইমরান, ১০৩)।

৮৬. রাসূলুল্লাহও আল্লাহর কিতাবকে 'হাবলুল্লাহ' আখ্যা দিয়ে গেছেন (كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ) আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর কিতাব, আর সেটাই হাবলুল্লাহ—আল্লাহর রজ্জু (*মুসলিম*, ২৪০৮)।

কলবকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা, শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। কলব আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর মারেফাত-মহব্বতের কেন্দ্র। মানবহৃদয় আল্লাহর 'ঘর'। আল্লাহর ঘরের মানে এই নয়, আল্লাহর সত্তা মানুষের কলবে অধিষ্ঠান করেন। নাউযুবিল্লাহ। মুমিনের কলবে থাকে আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর যিকির, আল্লাহর মারেফত। কলবকে আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর পছন্দনীয় আমল, ইখলাস, ইহসান, ইত্তিবা দ্বারা পূর্ণ করাই কলবকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা। কলবকে গাইরুল্লাহমুক্ত করার নামই কলবকে আল্লাহ দ্বারা আবাদ করা।

৮৭. যাহোক, আমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা কী চান, কুরআন কারীমে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহর একমাত্র চাওয়া কী, সেটা অসংখ্যবার, নানা ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত কবরের দিকে ছুটে চলেছে। মৃত্যু অতি সন্নিকটে। কেয়ামত এই তো এল

বলে। খুব শীঘ্রই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চলেছি। আমি কি আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পেরেছি? শেষবিচারে ধরা পড়ে যাব না তো?

﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾

আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পড়ে শোনানো হতো। কিন্তু তোমরা পেছন ফিরে সরে পড়তে (মুমিনুন, ৬৬)।

﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾

(তাদের বলা হবে) তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হতো না? কিন্তু তোমরা তা অবিশ্বাস করতে (মুমিনুন, ১০৫)।

﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾

তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পড়া হতো না? তা সত্ত্বেও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায় (জাসিয়া, ৩১)।

আমার হাতে এখনো সময় আছে। বাকি দিনগুলো কুরআনি ভিতের ওপর গড়তে পারি। আজ-এখনি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার জীবনের ভিত কী?

কুরআন নাকি অন্য কিছু?

কুরআন বালিকাদের কথা

চূড়ান্ত ফায়সালা

গতকালের হিফয ছিল ষোলতম পারায়। সূরা কাহফ শেষ করে সূরা মারয়ামে এলাম। পড়তে পড়তে চোখে পড়ল,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(হে নবী,) তাদের আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ গাফলতিতে পড়ে আছে এবং তারা ঈমান আনছে না (মারয়াম, ৩৯)।

আয়াতে কারীমার দুটি শব্দ আমার পুরো অস্তিত্বের ভিত ধরে নাড়া দিল। কিছুক্ষণের জন্য হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। কী অমোঘ বাণী (قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে।

(قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) ফিরে আসার সুযোগ নেই। সব শেষ হয়ে যাবে

(قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) আর কোনো সলাত নেই। সিয়াম নেই। তিলাওয়াত নেই। দান-সাদাকা নেই। হজ নেই। জাকাত নেই। জিহাদ নেই। কিতাল নেই। কল্যাণ কাজের প্রতিযোগিতা নেই। দ্বীনের তরে ত্যাগ-তিতিক্ষা নেই।

(قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) কৃতকর্ম থেকে দায়মুক্তি প্রার্থনার কোনো অবকাশ নেই। প্রিয়জনের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের সুযোগ নেই।

(قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) আর নতুন করে আমলের সুযোগ নেই। এখন শুধু হিসেব আর হিসেব। কৃতকর্মের খতিয়ান।

(قُضِىَ ٱلْأَمْرُ) আয়াতের অন্য কালিমা ছাপিয়ে শুধু এই শব্দ-দুটি যেন আমার মনের কানে বিকট আওয়াজে উচ্চারিত হয়ে চলেছে। শব্দ-দুটি যেন আমাকে সজোরে ঝাঁকি দিচ্ছে। আমি যে গাফলতের গাঢ় নিদে চুর হয়ে আছি, তা থেকে আমাকে সজাগ করার চেষ্টা করছে। আমার অন্তর্দেশে যে স্থবিরতা আর কঠোরতা ছেয়ে আছে, সেটা থেকে আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিন ধরে আমার দু-চোখ আল্লাহর ভয়যুক্ত অশ্রুহীন হয়ে আছে, এই আযাব থেকে শব্দ-দুটি আমাকে ছুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

এক মুসাফির, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, সন্ধ্যার মুখে এক গাছের ছায়ায় রাতের শয্যা পেতেছে। রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুই রাকাত সলাত আদায় করেছেন। যেমনটা

সালিহীন করে থাকেন। নেককারগণ যেখানে যান, চেষ্টা করেন সেখানে অন্তত দুই রাকাত সলাত আদায় করে নিতে। যাতে শেষদিন উক্ত স্থান তার পক্ষে কল্যাণকর সাক্ষ্য দেয়। সারাদিনের পথচলার ক্লান্তিতে শোয়ার সাথে সাথেই মুসাফির গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। স্বপ্নে দেখল, একলোক তাকে বলছে, আপনি কত সুন্দর করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। আহা, আমিও যদি আপনার মতো এত গুরুত্ব দিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়তে পারতাম! মুসাফির অবাক। আপনি কে ভাই? আমি? আপনি যে গাছের নিচে শুয়ে আছেন, তার অদূরে শতাব্দীপ্রাচীন এক কবরস্থান আছে। আমাকে সেখানে দাফন করা হয়েছে। কবরস্থানের সবাই আপনার সলাতের দিকে ভীষণ আফসোস আর হা-হুতাশভরা আক্ষেপ নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সবারই এককথা, হায় আমরাও যদি এই দূরদেশি মুসাফিরের মতো দুইটা রাকাত পড়তে পারতাম! আপনাদের কত সৌভাগ্য! আপনার যখন ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করে আমলনামা ভারী করে নিতে পারছেন। এখনো হিসেব দিতে হচ্ছে না। আর আমরা? কোনো আমল করতে পারছি না, অথচ হিসেব দিতে হচ্ছে।

মৃতলোকটি সত্যি বলেছে। আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি, ভীষণ সৌভাগ্য বহন করে চলছি। যখন ইচ্ছা সলাত-সিয়াম-কেয়াম-তেলাওয়াত করার সুযোগ পাচ্ছি। আমরা কি সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছি? জীবনের অমূল্য সময়গুলো আমরা অযথা অপচয় করে ফেলছি। আল্লাহর হক আদায়ে আমরা চরম উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছি। অন্যের ওপর তো বটেই, নিজের প্রতিও জুলুম করে চলেছি। আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে প্রবৃত্তি আর শয়তানের পূজারিতে পরিণত হয়েছি। এই করতে করতে হঠাৎ একদিন ঘুমের মধ্যেই মালাকুল মাউত এসে হাজির হয়ে যাবে। আর কখনো ঘুম থেকে জেগে ওঠার সুযোগ হবে না (قُضِيَ الْأَمْرُ)। কুরআনের আয়াতগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে অমোঘ সত্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। কুরআনি নূর-বঞ্চিত কলবগুলো কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে, কুরআনি সতর্কবাণী আমাদের মনে কোনো রকমের দাগ কাটছে না। কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করছে না।

একলোককে দেখেছি সব সময় দুর্বলের প্রতি জুলুম করত। তাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিত। অসহায় মানুষের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করত। তার দুর্ব্যবহারের জ্বালা সইতে না পেরে, একলোক মারা গেল। জীবিত থাকলে, ক্ষমা চাওয়ার বা পাওয়ার ক্ষীণ হলেও আশা ছিল। এখন? মাজলুমের মামলা সরাসরি আল্লাহর আদালতে চলে গেছে। যিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। ভয়াবহ ব্যাপার হলো, মাজলুমের মৃত্যুর কয়েকদিন পর, জালিম লোকটিও মারা গেল। জালিম কী ভেবেছিল? আরও বাঁচবে? জুলুমের প্রতিকার করার সুযোগ পাবে? তা আর পেল কই? মালাকুল

মাউত কখন কার ঘরে হানা দেয়, আগাম বলা যায়? কখন কার রূহ কবজ করতে আসে, জানা আছে?

আমার কি এখনো সময় হয়নি, জেগে ওঠার? সচেতন হওয়ার? সংবিৎ ফিরে পাওয়ার? মালাকুল মাউত এসে (قُضِيَ الْأَمْرُ) বলার আগে আগে সতর্ক হয়ে যাওয়ার? বর্তমানে নানা যোগাযোগমাধ্যমের ছড়াছড়ির বদৌলতে, প্রতিনিয়ত মৃত্যুসংবাদ আমাদের সামনে আসে। মৃত মানবের সংখ্যাও ভীতিপ্রদ। মৃত্যুর মিছিলে যোগ দেয়া মানুষগুলোর মতো আমাদের সামনেও খড়্গ ঝুলে আছে (قُضِيَ الْأَمْرُ)।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে পর্যাপ্ত সময় দিয়েছেন। আমলের পুঁজি জোগাড় করে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। জুলুম থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। জালিম অবস্থায় না মরার উপায় বলে দিয়েছেন। আমি কি (قُضِيَ الْأَمْرُ) বলার আগে সতর্ক হয়েছি? কেয়ামতের দিন আফসোস আর পরিতাপ কোনো কাজে আসবে? আল্লাহ তা'আলা যদি কবরবাসীকে জীবিতদের সাথে কথা বলার সুযোগ দিতেন, মৃতরা আমাদের শুধু একটি উপদেশই দিত : সময়ের অপচয় কোরো না। প্রতিটি মুহূর্তকে নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করে নাও। আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়ার আগে আগেই আমল করে নাও। — রিয়াদাহ আওফাহ (বাহরাইন)

কুরআনের জন্য

কুরআনের কারণে আমি মানুষের সাথে অহেতুক কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিয়েছি। কুরআনের কারণে আমি সকাল সকাল ঘুমিয়ে আগে আগে উঠে পড়ার অভ্যেস গড়ে নিয়েছি। ফজরের আগেই নির্ধারিত কুরআন-পাঠ শেষ করে নেয়ার চেষ্টা করি। শেষ করতে না পারলে ফজরের পর পুরো করে নেই। কুরআনের জন্যই আমি নিজেকে শুধরে নিয়েছি। কুরআনের কারণে আমি অনেক 'মুবাহ' কাজ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। আমার এখন যত চাওয়া, সবই কুরআনকে ঘিরে। আমার যত সাধ, কুরআনকে নিয়ে। আমার যত সাধনা, সবই কুরআনকে নিয়ে। আমার সার্বক্ষণিক চিন্তা, কীভাবে আমি কুরআনে আরও ভালো হতে পারি, এ প্রচেষ্টাতেই আমি লেগে থাকি। কুরআনের জন্যই আমি এখন অনেক কাজ করি, যা আমি আগে করার কথা কল্পনাও করতাম না। কুরআন আমাকে শেখায়। কুরআন আমাকে প্রতিপালন করে। কুরআন আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে বাড়িয়ে তোলে। — নাওরাহ (আফগান উদ্বাস্তু শিবির, পাকিস্তান)

কুরআনের প্রভাবে

একদিন চরম অপ্রীতিকর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। ক্লাসে এক বান্ধবীর আচরণে প্রচণ্ড বেসামাল ক্রোধ উঠল। তার আচরণ এতটাই বেখাপ্পা ছিল, যে কেউ

রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়ার কথা। এত রাগ কীভাবে সামাল দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একটানা আউযুবিল্লাহ পড়ে যাচ্ছিলাম। স্থান ছেড়ে উঠে গেলাম। রাগের অগ্নিকোপ প্রশমিত হলেও চাপা আক্রোশ আর প্রতিশোধস্পৃহা কমছিল না। দাদুর পরামর্শমতো চোখ বন্ধ করে, কুরআন শরীফের পাতা কল্পনা করে, জোর করে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম। আস্তে আস্তে আক্রোশও কমে এল। আলহামদুলিল্লাহ।

এটা ছিল আমার দাদুর পরীক্ষিত পন্থা। তিনি শুধু রাগ নয়, যেকোনো মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হলেই চোখ বন্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিতেন। এতে তার ভেতরটা প্রশান্ত আর শান্তিময় হয়ে উঠত। কুরআনের প্রতিটি আয়াতেই এক প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে। কুরআনের আয়াতগুলো মানবাত্মাকে শীতল করে তোলে। ভেতরের আগুনকে নিভিয়ে দেয়। কুরআন তিলাওয়াত মানুষের ভেতরকার যেকোনো ক্ষতিকর আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কুরআন আসলে মানুষের ভেতর-বাহির উভয় জগৎকেই শাসন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। আমরা কাজে লাগাই না বলে টের পাই না। ইয়া আল্লাহ, আমাদের কলবকে কুরআনি নূর দ্বারা আলোকিত করে দিন। — উসওয়াতুন হাসানা (মিসর)

কুরআনি হিযব

পারিবারিক উৎসবের দিনে, প্রচন্ত ব্যস্ততার মাঝেও দৈনিক হিযব বাদ যেতে দিই না। আমি বিশ্বাস করি, দৈনিক হিযব আদায় করলে আত্মীয়তার বন্ধন আরও বেশি পোক্ত হবে। হিযব আদায়ের জন্য আত্মীয়দের থেকে কিছুক্ষণ দূরে অবস্থান করলেও, কুরআনের বরকতে তাদের সাথে নৈকট্য আরও বাড়বে। হিযব বাদ দিয়ে তাদের সাথে সময় কাটাতে গেলে, মনে সত্যিকার আনন্দ থাকবে না। মানসিক স্বস্তি থাকবে না। দৈনিক হিযব আদায় না করলে, ভেতরে কেমন জ্বালাপোড়া আর হাহাকার শুরু হয়ে যায়। মনটা খা-খা শূন্য অনুভূত হতে থাকে। এই অস্থিরতা নিয়ে আত্মীয়দের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেও কষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং হিযব আদায় করে নেয়াই নিরাপদ। — আশীরা কুরবা (জর্দান)

আল্লাহর রহমত

আমি দৈনিক হিযবের মধ্যে আল্লাহর রহমত খুঁজে পেয়েছি। দৈনিক হিযব আদায় আমাকে অনেক দোষত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে বাস করতে গেলে, কিছু মন্দ স্বভাব, কিছু ভ্রান্ত আকীদা, কিছু ভুল চিন্তা অগোচরেই আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাধারণ পড়াশোনা, গতানুগতিক ওয়াজ-নসীহত এসব সমস্যা সমাধান করা তো দূরের কথা, সমস্যাই চিহ্নিত করতে পারে না। একমাত্র দৈনিক হিযব আদায়ই এই দুরোরোগ্য জটিল সমস্যাগুলোর দূর করতে পারে।

অনেক সময় হিফয আদায়কারী জানতেও পারে না, কুরআন তার ভেতর থেকে কোন কোন বিষাক্ত দ্রব্য বের করে দিয়েছে। কুরআন সব সময় আমাকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যায়। কুরআনই এ কথা বলছে (إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল (ইসরা, ৯)।

— সালিহা আফরীন (লন্ডন)

কলবের 'রান'

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, বেশি বেশি তিলাওয়াত করা ও বেশি বেশি তিলাওয়াত শোনা, কলবের 'রান' বা গুনাহজনিত জং দূর করে দেয়। আমি যত বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব, তিলাওয়াত শুনব, আমার কলব ততই 'রানমুক্ত' হতে থাকবে। আমার কলব ততই প্রাণবন্ত হতে থাকবে। কলবের পাশাপাশি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সচল-সজীব হতে থাকবে। কুরআনের ছোঁয়ায় আমি আরও বেশি হক চিনব। হকের পথযাত্রী হব। আমি আরও বেশি দোয়া করতে পারব। আরও বেশি নেক আমল করতে পারব। কুরআনের ছোঁয়ায় আমার জীবনে নতুন স্বাদ আসবে।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের হক দেখিয়ে দিন। হক চিনিয়ে দিন. হকের অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমাদের সিরাতে মুস্তাকীমের পথে উঠিয়ে নিন। আমাদের সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখুন। — খাদীজা তুবরিল (আঙ্কারা, তুরস্ক)।

ফযল ও রহমত

একবোন বড় সুন্দর তাদাব্বুর করেছেন,

আমার হিফযের সবক এখন সূরা ইউনুসে। খুব দ্রুত সূরা ইউসুফে পৌঁছার চেষ্টা করছি। সূরাটি আমাকে বড় টানছে। এই সূরায় আছে (قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এক উপদেশ। তারপর আছে (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) বলুন, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত (ইউনুস, ৫৭-৫৮)।

দুটি আয়াত মিলিয়ে আমার মনে হলো, আমি কুরআন হিফয করছি, এটা তো আল্লাহ 'ফযল ও রহমত'। কুরআন পাওয়ার পর 'বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি' বলে শুকরিয়া প্রকাশ করতে বলেছেন আল্লাহ তা'আলা। সেদিনই বাক্যটা প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার করলাম। আমাদের শিক্ষিকা আপুর সাথে কথা বলার সময়। আমি দ্রুত সূরা ইউসুফে পৌঁছতে চাই, এটা নিয়ে আমাদের তিন বান্ধবীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। কে কার আগে সূরা ইউসুফ ধরবে।

আমাদের সাথে সাথে পুরো হালাকাও তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আমাদের অগ্রগতির প্রতি নজর রাখছে।

আমাদের হালাকায় আমরা ছিলাম চার জন। প্রতি হালাকায় ছয় জন করে থাকলেও, আমরা উস্তাযাহকে অনুরোধ করেছিলাম, আমরা চার জন আলাদা হালাকায় থাকতে চাই। অবরুদ্ধ গাযার, জামেয়াতুল ইসরার কুল্লিয়াতুত তিব্ব (চিকিৎসা অনুষদ)-এ আমরা চার জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ওখানেও আমাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। আমি আগে হিফয শুরু করেছি। আমার দেখাদেখি বাকি তিন জনও এসে যোগ দিয়েছে। কুরআন কারীম হিফযেও ওরা আমার চেয়ে পিছিয়ে থাকতে চায় না। চার জনের সবক সূরা তাওবা পর্যন্ত আসার পর, আমাদের একবোন—নাজিয়া রাফাত শহীদ হয়ে গেল। ইহুদীদের বিমান হামলায়। বাকি রইলাম তিন জন। বিমান হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে কিছুদিন হিফয বন্ধ ছিল। আমাদের মেডিকেল কলেজও বন্ধ ছিল।

নতুন করে আবার শুরু করলাম। জীবনের মতো শহীদী মরণও আমাদের গাযায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাণপ্রিয় বান্ধবী হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, আমরা আবার হিফযযুদ্ধ শুরু করলাম। বাকি দুজন আমাকে টেক্কা দিয়ে সূরা হুদে চলে গেছে। আমি এখনো ইউনুসে পড়ে আছি। হিফযের পাশাপাশি প্রতিদিনের সবক থেকে আমি কী শিখলাম, কী তাদাব্বুর করলাম, সেটাও আমাদের উস্তাযাহ আপু শুনতেন। ও হাঁ, তিনিও আমাদের জামেয়াতুল ইসরার ছাত্রী ছিলেন। ডাক্তার। গাযার আশ-শিফা হাসপাতালে চাকরি করেন। কেউ নতুন কোনো শিক্ষা বলতে পারলে, আপু খুব খুশি হন। পুরস্কৃত করেন। আপু বলেন, মসজিদে আকসায় যেভাবে বোনেরা উস্তাযাহ হানাদি হালাওয়ানির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কুরআনের দরস করেন, আমরাও এখানে, গাযায় কুরআনি হালাকা চালু রাখব, ইন শা আল্লাহ। ইহুদীরা আমাদের মসজিদে আকসায় যেতে দেয় না। গাযা থেকে বের হতে দেয় না। আমাদের কাছে কুরআন আছে। এই কুরআন আমাদের কাছে সারা বিশ্বকে এনে দেবে ইন শা আল্লাহ।

সবক শোনানোর পর, আপু জানতে চাইলেন, আজকের সবক থেকে কী কী শিখলাম। বললাম, 'বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি' শিখেছি। আপু অবাক, এ কেমন শেখা? খুলে বললাম। আপু ভীষণ খুশি। সাথে সাথে সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন। আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আজকের শিক্ষার কথা সবাইকে জানাতে বললেন। আমার দুই বান্ধবী আমার দিকে ভীষণ ঈর্ষা নিয়ে তাকাতে লাগল। আমি ভাব করলাম, কী আমাকে ফেলে আগে চলে গিয়েছ, না?

আলহামদুলিল্লাহ, আমি এখন কুরআনের কোনো অর্জন সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে 'বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি' বলে তারপর অর্জনের কথা বলি।

'বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি' আমার সূরা ইউনুস খতম হয়েছে। বান্ধবীরা আমার থেকে পাঁচ পৃষ্ঠা এগিয়ে আছে। সবার কাছে দোয়া চাই, 'বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি' খুব শীঘ্রই যেন তাদের ধরে ফেলতে পারি।

— উমামাহ্ আয়াত (গাযা, ফিলাস্তীন)

রহমানী সুর

আপনি হিন্দু হয়ে মাদরাসায় কুরআন উপহার দিচ্ছেন যে?
প্রশ্নটি আমাকে এক লহমায় শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

সেই কবেকার কথা, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আমরা যাচ্ছিলাম দিল্লি। পারিবারিক বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। অনেক দূরের যাত্রা। আমাদের টিকেট কাটা ছিল 'বাতানুকূল' কোচে। সমস্যার কারণে রেল কর্তৃপক্ষ বাতানুকূলের বদলে স্লিপার কোচ দিয়েছে। বাবা-মা পড়লেন ভীষণ বিপাকে। বাতানুকূল কোচে বিছানাপত্রের ব্যবস্থা থাকে। তাই বাড়ি থেকে কিছু আনা হয়নি। পরিবর্তিত স্লিপারে এই সুবিধা নেই। এখন কী হবে? দিনটা কেটে গেল কোনোমতে। রাতটা কাটবে কী করে? মধ্য জানুয়ারি চলছে। ভীষণ ঠান্ডা। বড়রা না হয় কোনোমতে রাতটুকু পার করে দেবে। কনকনে ঠান্ডায় এতবড় রাত ছোটরা কীভাবে কাটাবে? মা এক এক করে তার শাড়িগুলো বের করলেন। ওগুলো দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ঘুম পাড়াবেন। রাত আটটার দিকে আমাদের ট্রেন আজমির পৌঁছল। আমি জড়সড় হয়ে বাবার কোল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। ছোটবোন সুনীতা মায়ের কোলে।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে, বিছানাপত্রের বোঁচকা নিয়ে এক ভদ্রলোক উঠলেন। চুল-দাড়ি সব শাদা। জ্যোতির্ময় চেহারা। আজও চোখ বন্ধ করলে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তাঁর চেহারা। বাবার সাথে মিষ্টি হাসিতে কুশল বিনিময় করলেন। দিল্লির নিজামুদ্দীন মসজিদে যাচ্ছেন। তাবলীগে। বাবা আমাকে আগলে বসে আছেন। দেবতুল্য মানুষটি আমাদের অবস্থা আঁচ করতে পারলেন। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে বাবাকে বললেন, আমার কাছে আজকের কেনা পুরোপুরি নতুন কম্বল আছে। বাচ্চাদুটোর শীতে কষ্ট হচ্ছে বোধহয়। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার কম্বল নিতে পারেন। যদি এমনি এমনি নিতে সংকোচ হয়, তাহলে আপনি কম্বল কিনে নিতে পারেন বা আজ রাতের জন্য ভাড়া নিতে পারেন। মা'সুম দুই বাচ্চা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমুলে আমার ভীষণ ভালো লাগবে। আমার কাছে কয়েকটা কম্বল আছে। ইচ্ছে হলে আপনাদের জন্যও দুটো দিতে পারি। আব্বু প্রথমে না বলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর, মানুষটা আবার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ঠান্ডায় হি-হি করছি। মা এবার মুখ খুললেন। বাবাকে বললেন, কম্বল নিতে। বৃদ্ধ মানুষটা ভীষণ

খুশি। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বিছানা খুলে কম্বল বের করে দিলেন। মা পরম কৃতজ্ঞতার সাথে কম্বল গ্রহণ করলেন।

আমরা দুইবোন বেশ আরাম করে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। বাবা-মাও শেষতক নিজেদের জন্য কম্বল নিলেন। বৃদ্ধ মানুষটা বসে রইলেন। জানালেন, তিনি ঘুমুবেন না। রেলে দিনের বেলা লম্বা সময় ঘুমিয়েছি। রাতের ঘুম অত গভীর হলো না। যখনই ঘুম ভাঙত, কানে ভেসে আসত মধুর এক গুনগুন ধ্বনি। ট্রেনে সবাই ঘুমে বিভোর। একবার ঘুম ভাঙার পর দেখলাম বৃদ্ধ মানুষটা পেন্সিল লাইটের মতো কিছু একটা জ্বালিয়ে বই পড়ছেন। আমাদের সামনেই তিনি বসেছিলেন। চোখ খুললেই তাকে দেখা যাচ্ছিল। আগে কাউকে এভাবে তন্ময় হয়ে কিছু পড়তে দেখিনি। একবার মনে হলো তিনি পড়তে পড়তে কাঁদছেন। কান্নামাখা গুনগুন সুর আরও করুণ হয়ে আমার কানে আসছিল। অনেকক্ষণ ধরে একই লাইন পড়েছেন। একটা শব্দ বারবার কানে লাগছিল—ফাবিলাই। একটু পরপর তিনি যে লাইন পড়ছিলেন, সেখানে 'ফাবিলাই' শব্দটাও উচ্চারণ করছিলেন। পুরো বগিজুড়ে কেমন এক অপার্থিব আবহ তৈরি হয়েছে। পেন্সিল লাইটের হালকা মায়াবী নীলাভ আভা, ট্রেনের সুরেলা ঝিক ঝিক মেলোডি, ধর্মগ্রন্থের পবিত্র আবৃত্তি, শিশুমনের কচি নিষ্পাপ কৌতূহল, সব মিলিয়ে স্বর্গীয় অনুভূতি। আমার মনে হচ্ছিল আমি কোনো রূপকথার রাজ্যের রাজকন্যা। ঘোড়ায় চড়ে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে এক মহাযাত্রায় চলেছি। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে এক দেবতা। আমার যাত্রা শুভ ও নিরাপদ হওয়ার জন্য তিনি একনাগাড়ে 'মন্ত্রোচ্চারণ' করে যাচ্ছেন। আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। আসা-যাওয়ার পথে, ট্রেন আজমির থামলেই মনে হতো এই বুঝি সেই দেবতুল্য বৃদ্ধ মানুষটা উঠে বসবেন। সেদিন দিল্লি পৌঁছার পর, তিনি কম্বলগুলো ফেরত নিলেন। বাবা কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, দো মাসুম বাচ্চে আরামসে নীন্দ গ্যায়ে, ইস সে বড়া ইনআম আওর কেয়া হো সেকতা? দু-বোনের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে, বাবার সাথে হাত মিলিয়ে, মাকে হাতের ভঙ্গিতে সালাম জানিয়ে তিনি নেমে গেলেন।

একটি শিশুর মনে রেখে গেলেন অপূর্ব সুন্দর এক সুখস্মৃতি। বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি সেদিন কুরআন পড়েছিলেন। রাতের ট্রেনে চড়লে, কখনো কখনো সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে যেত। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, স্মৃতির গভীর থেকে, মানুষটির কুরআনপাঠের মন নাড়া দেয়া সুর ভেসে উঠত। আরেকটা বিষয়ও অবাক করার মতো, শীতের দীর্ঘ একটা রাত শুধু কুরআন পড়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। একটি বই এত লম্বা সময় ধরে পড়া যায়? মনোযোগ ছুটে যায় না? তাকে দেখে তো মনে হয়েছে, তিনি পুরো সময় কুরআনপাঠে পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিলেন। একটি বারের জন্যও তাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখিনি।

আমাদের ইউনিভার্সিটির এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে, জীবনের সুন্দর কোনো স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে, আমি সেই রাতের ঘটনা বলেছিলাম। বৃদ্ধ মানুষটির মহানুভবতার কথা ভুলতে পারিনি। তিনি নিজে না ঘুমিয়ে, আমাদের ঘুমুতে দিয়েছেন। শীতের রাতে এমন ত্যাগ ক'জন করতে পারে?

ইউনিসেফের এক প্রজেক্টের অধীনে কিছুদিন কাবুলে ছিলাম। আমাদের কাজ ছিল কাবুলে মেয়েদের শিক্ষার হার কেমন সেটার পরিসংখ্যান তৈরি করা। মেয়েরা কতটুকু ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে, কতটুকু জেনারেল শিক্ষা গ্রহণ করছে, সেটা দেখা। দুই শিক্ষার কোনটা মেয়েদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে, মেয়েরা কোন শিক্ষার প্রতি বেশি আগ্রহ বোধ করছে, সেটা যাচাই করে দেখা। ইউনিসেফ আফগানিস্তানে নারীশিক্ষার ওপর বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এই অর্থব্যয়ের আউটপুট কিছু বের হচ্ছে কি না, এটাই দেখার বিষয় ছিল।

কাবুলের এক মাদরাসায় যেতে হয়েছিল। ছোট ছোট মেয়েরা কুরআন পড়ছে। সময় নিয়ে ছোট ছোট খুকিদের সাথে কথা বললাম। তাদের পড়া শুনলাম। আমার সাথে ছিল ক্যাথারিন। সার্বিয়ার মেয়ে। কিছুটা দূরে বসে ক্যাথারিন আরেক ঝাঁক মেয়ের সাথে কথা বলছে। মাদরাসার এক শিক্ষিকা ভাঙাচোরা ইংরেজি জানেন, তাকে দিয়েই কাজ চলছে। আমাদের সাথে গাইড হিসেবে একজন আফগান মেয়েও এসেছে—ফাতিমা। সে অফিসে কথা বলছে। ক্যাথারিন একটি মেয়ের সাথে কথা বলে ভীষণ অবাক। মেয়েটি নাকি পুরো কুরআন মুখস্থ করেছে। একরত্তি একটি মেয়ে, এতবড় 'বই' মুখস্থ করে ফেলেছে? ক্যাথারিনের চোখেমুখে অবিশ্বাস দেখে, শিক্ষিকা বললেন, এটাই স্বাভাবিক। শুধু একজন নয়, মাদরাসার আরও অনেকেই এই ছোট্ট বয়সেই পুরো কুরআন হেফয করে ফেলেছে। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ক্যাথারিন কী পরীক্ষা করবে? আরবী কুরআন দূরের কথা, এর আগে কখনো এত কাছ থেকে এমন রক্ষণশীল মুসলিম দেখেছে কি না সন্দেহ। পুরো কুরআন মুখস্থ করা ছোট্ট খুকিটিকে তার শিক্ষিকা বললেন, কিছু পড়ে শোনাও। খুকিটি পড়া শুরু করল। খুকির পড়ার মিষ্টি আওয়াজ আমার কানেও আসছিল। খুকির পড়া শুনে কী যেন একটা চেনা চেনা লাগছে। কী একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। খুকি একটু পরপর একটা লাইন বারবার পড়ছে। আরও ভালো করে শোনার জন্য ক্যাথারিনের কাছে গিয়ে বসলাম। শুনতে শুনতে সেই সুদূর ছেলেবেলায় শোনা, একটি শব্দ ঝিক করে স্মরণে এল 'ফাবিআইয়ি'। সে-রাতে বৃদ্ধ মানুষটি আলো-আঁধারির মায়াবী রহস্যময় পরিবেশে কুরআন পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন আর একটু পরপর 'ফাবিআইয়ি' শব্দটি বলছিলেন। এখন খুকির পড়াতেও মনে হলো 'ফাবিআইয়ি' শব্দটি আছে। শিক্ষিকাকে আমার ঘটনা খুলে বললাম। তিনি কী বুঝলেন কে জানে, তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় সেদিন সূরা রহমান পড়তে শুনেছিলেন।

আর যে শব্দটা শুনেছেন সেটা 'ফাবিলাই' নয়, ফাবি আইয়ি আ-লা-ই। পুরো লাইনটা এমন,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে?

শিক্ষিকা আমাদের লাইনটার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। এর আগে পরে কী বলা হয়েছে, সেটাও বললেন। প্রশ্ন করলাম, বৃদ্ধ মানুষটি সেদিন কাঁদছিলেন কেন? শিক্ষিকা বললেন, যারা মহব্বত নিয়ে কুরআন কারীম পড়েন, তারা প্রায় সবাই কুরআন পড়তে পড়তে কাঁদেন।

আমার ইচ্ছা হলো, এই কচি খুকিদের জন্য কিছু করে যাই। করতে পারলে আমার ভালো লাগবে। তাদের কুরআন শরীফগুলো দেখলাম বেশ ছেঁড়া। আমি কুরআন শরীফ গিফট করলে, তারা গ্রহণ করবেন কি না জানতে চাইলাম। শিক্ষিকা সানন্দে সম্মতি দিলেন। শিক্ষিকা আমাকে বললেন, কুরআন শরীফ পড়ে দেখতে। আমি বললাম, এবার দিল্লি ফিরে আমি কুরআন সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করব। বিশেষ করে সে-রাতে দেবতুল্য মানুষটি যা পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন, সেটা নিজে পড়ে দেখার চেষ্টা করব। — মধুমিতা দাস (দিল্লি)

হারানো সুখ

কুরআন নিয়ে যখন বসি, আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই জগতেই তীব্র আলোড়ন অনুভব করি। কুরআনে আমি পেয়ে যাই জীবনের হারানো সুখ। কুরআনে আমি পেয়ে যাই অমূল্য রত্নভাণ্ডার। সত্যি সত্যি প্রতিনিয়ত আমি পেয়ে চলেছি। আমি যখন এক আরেক আয়াতে যাই, আমার মনে হতে থাকে, আমি এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাচ্ছি। আমি এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে সফর করছি। নতুন আয়াত শুরুর সময়টা আমার তীব্র ঔৎসুক্যময় প্রতীক্ষায় কাটে। আমি এবার কোন মহাসত্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি? এই দুর্নিবার কৌতূহল আমাকে অস্থির করে তোলে। কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর যেমন আমার চিন্তা-মননকে সমৃদ্ধ করে তুলতে থাকে, তদ্রূপ আমার হৃদয়কে সুস্থ-সবল করে তুলতে থাকে। হৃদয়ের অনেক কালো দাগ মুছে ফেলতে থাকে। মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকা দুশ্চিন্তা, রোগবালাই ক্রমান্বয়ে দূর হতে থাকে। — হামীদা খানম (করাচি, পাকিস্তান)।

প্রশ্নের পাল্লায়

প্রশ্ন করা যেমন মুক্তির উপায়, প্রশ্ন করা অনেক সময় বিপদেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের বক্রতার কারণে, অনেক সময় অহেতুক প্রশ্নাবলি মনে উঁকি দিতে শুরু করে। আমিও তরুণ বয়েসে একবার এই 'প্রশ্নের পাল্লায়' পড়েছিলাম।

আমার কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রশ্ন করা। অন্য কোনো বিষয়ে প্রশ্ন নয়, শুধু ধর্মঘেঁষা প্রশ্নই মাথায় গজাত। তাও জানার জন্য নয়, প্যাঁচানোর জন্য। আমার রক্তটগবগে তারুণ্যের জোয়ারে বাঁধ দিয়েছিলেন আমার দাদু। তিনি জানতেন এসব বয়েসের দোষ। আমার ভেতরে ঈমান আছে। দ্বীনি আবেগ আছে। সাময়িক হয়তো কোনো সঙ্গদোষে বা দুষ্ট পাঠদোষে আমার এমন মতিভ্রম ঘটেছে। দাদু আমাকে প্রায়ই গল্পচ্ছলে নানাকথা বলতেন। একদিন আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন। তাঁর তিলাওয়াত খুবই সুন্দর। আমাকেও তিলাওয়াত করতে বললেন। অর্থ নিয়ে ভাবতে বললেন। তিন দিন সময় দিলেন। তারপর আবার বসলেন,

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

তোমরা এমন-সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা প্রকাশ করা হলে, তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে (মায়িদা, ১০১)।

আমি অনেক ভেবেছি। এই আয়াতে বড় কোনো তত্ত্ব বলা হয়নি। খুবই সহজ-সরলভাবে অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মনে কুটিলতা থাকলে, এই আয়াত জ্ঞানতাত্ত্বিক কচকচিমূলক কোনো সমাধান দেবে না। কুরআনের বড় শক্তি কোথায়? কুরআনের নূরে। কুরআন সরাসরি আল্লাহর কালাম, এটাই কুরআনের সবচেয়ে বড় শক্তি। কুরআনের প্রতিটি আয়াত বা শব্দই কুরআনের বড় শক্তি। দাদুও বলে দিয়েছিলেন, আমি যে পন্থায় প্রশ্ন করে করে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাতে আমি আরও অসংখ্য প্রশ্নের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ব। এই অন্তহীন প্রশ্নজাল থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারব না। আমাকে যা করতে হবে, অহেতুক প্রশ্ন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কুরআন ও দ্বীন সম্পর্কিত সন্দেহমূলক প্রশ্নমালা জোর করে এড়িয়ে যেতে হবে। কৌতূহলী মনকে জীবন ও জগতের জন্য উপকারী বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। যেকোনো ঘটনায় কুরআন যা সমাধান দেয়, সেটাকে মাথা পেতে নেয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নইলে সারাজীবন শুধু প্রশ্ন করেই মরব, তৃপ্তিকর মনসুখ সমাধানে আসতে পারব না। তার মানে এই নয়, কুরআন প্রশ্ন করতে নিষেধ করে। কুরআন অহেতুক অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে নিষেধ করে। হক ও সত্য চেনার উদ্দেশ্যে বক্রতাহীন আন্তরিক প্রশ্ন করাকে কুরআন উৎসাহিত করে। কুরআন অজানাকে জানতে উৎসাহ দেয়। — যয়নব জারিয়া (বাহরাইন)

আল্লাহর রহমত

আল্লাহ তা'আলা রহমান রহীম। কুরআন কারীমে রহমতের অসংখ্য চিত্র আঁকা আছে। এমনকি যারা আল্লাহর দেয়া শরীয়ত উপেক্ষা করে, তাদের প্রতিও তিনি অপূর্ব রহমত প্রদর্শন করেছেন,

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ

তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) আপনাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী (আন'আম, ১৪৭)।

তিনি কতটা রহীম, আয়াতখানা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারা নবীজিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, আল্লাহর পাঠানো ওহীকে অস্বীকার করছে, তারপরও তাদের আল্লাহর ব্যাপক রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তারা যেন ফিরে আসতে আগ্রহী হয়। ফিরে আসাটা তাদের কাছে যেন নির্ভয় নির্ভার মনে হয়। ফিরে আসাটা প্রিয়তর হয়। হঠকারী অবাধ্য একগুঁয়ে ব্যক্তির প্রতি রহমতের এমন প্রকাশ হয়, যারা নামকাওয়াস্তে হলেও ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি রহমতের মাত্রা কেমন হবে? আর যারা মনেপ্রাণে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হয়েছে, তাদের প্রতি?

— যায়তুনী খাওলা (সুদানে অবস্থিত ইথিওপিয়ান উদ্বাস্তু শিবির)।

বন্ধুত্ব

দুনিয়াতে কত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, কত দহরম-মহরম। কত হাসিগল্প, সবই সেদিন শত্রুতায় পর্যবসিত হবে,

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

সেদিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে। কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া (যুখরুফ, ৬৭)।

আল্লাহর ছোঁয়াবিহীন বন্ধুত্ব সেদিন বড়ই আফসোস আর পরিতাপের হবে। তীব্র ফলহীন অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে হতে বলবে,

يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (ফুরকান, ২৮)।

এখনই সময়, নিজের বন্ধুত্বের তালিকার দিকে তাকানোর। এখনই সময় সংশোধনী আনার। হাতছাড়া হওয়ার আগেই, সর্বশেষ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ফেলতে হবে। — সারা হাদিয়া (সিরিয়ান উদ্বাস্তু শিবির, তুরস্ক)।

করোনায় করুণা

আমি কুরআনমুখী হয়েছি, আমি কুরআনের হাফেয হয়েছি, আমি কুরআন নিয়ে নিয়মিত বসতে পারছি, এটা অবশ্যই আমার জন্য বিরাট রহমত। কুরআন যেখানে খোদ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই রহমতস্বরূপ ছিল, সেখানে আমি কোন ছার! আমাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পড়তে শিখিয়েছেন,

এটাই তো বিশ্বজগতের অন্যতম বড় ঘটনা। আমার কি কুরআন পড়ার যোগ্যতা ছিল? নবীজিকে রাব্বে কারীম কী বলছেন?

وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

(হে রাসূল,) পূর্ব থেকে আপনার এ আশা ছিল না যে, আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের রহমত (কাসাস, ৮৬)।

হাফেয দেখলেই আমার এই আয়াতের কথা মনে পড়ে। কল্পনায় ভেসে ওঠে, তার ওপর আল্লাহর রহমতের অমিয় সুধা ঝরে ঝরে পড়ছে। কাউকে বসে বসে কুরআন পড়তে দেখলে, কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে দেখলে, আয়াতখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আগে হয়তো মানুষটা কুরআনমুখী ছিল না, বাবার মৃত্যুর পর, মায়ের মৃত্যুর পর বা সন্তানের মৃত্যুর পর, অন্য কোনো বিপদ আসার পর, মানুষটা কুরআনমুখী হয়েছে। বিপদটা তার জন্য রহমত বয়ে এনেছে। করোনার কারণে বহু মানুষ কুরআনমুখী হয়েছে। বহু গুড়াবুড়া হাফেয হয়ে গেছে। বহু মানুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হাফেয হওয়ার পথে আছে—করোনার করুণা।

— সাওদা (বাইরুত, সিরিয়ান উদ্বাস্তু শিবির)

কুরআনি হালাকা

আমার এখন প্রিয় কুরআনি হালাকায় (পাঠচক্রে) যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আজ সকাল থেকেই মনটা অজানা কোনো কারণে ভীষণ বিষণ্ন হয়ে ছিল। কুরআনি হালকায় যাওয়ার কথা মনে পড়তেই হৃদয় আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। মন কেন আনন্দে নেচে উঠল? আমার মনের বাড়িতে কি কুরআন থাকে? নাকি আমার মন কুরআনের বাড়িতে থাকে? কুরআনের জন্মভূমি কি জান্নাত? আমার জান্নাত কি কুরআনের সাথে? — হাবীবাহ ইয়াসিনভ (কাযান, তাতারিস্তান)

বড় নেয়ামত

সবচেয়ে বড় নেয়ামত? নিঃসন্দেহে আলকুরআন। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বড় পুরস্কার,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ

তোমাদের যে নি'আমতই অর্জিত হয়, আল্লাহরই পক্ষ হতে হয় (নাহল, ৫৩)।

আমার বান্ধবীকে আগামীকাল সম্মানের মুকুট পরানো হবে। আহ, কী অকল্পনীয় সম্মান! তার মাতাপিতার কী সৌভাগ্য, তারা একজন হাফেয সন্তান লাভ করলেন। আমি খুবই আনন্দিত, এমন বান্ধবীসৌভাগ্যে। আমার আনন্দ আর গর্বের পরিমাণ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শুবাইনা, তোমার এই অর্জনে আমি গৌরব বোধ

করছি। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও আমাকে আল্লাহর কালামের মর্যাদা বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। আমাদের কলবকে কুরআনি নূরে ভরপুর করে দিন।
—ইয়াসমীন আল-আনাযী (গাযা, ফিলাস্তীন)

শয়তানের পলায়ন

আমরা যে শিক্ষিকার কাছে হিফয করতাম, তিনি বলতেন, যখনই দেখবে তোমার আগ্রহে ভাটা পড়েছে, নিয়মিত কুরআনের রুটিন পালনে আলস্য লাগছে, শত ব্যস্ততাতেও আউযুবিল্লাহ পড়ে সাথে সাথে কুরআন নিয়ে বসে যাবে। জোর-জবরদস্তি করে হলেও কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করে নেবে। ইন শা আল্লাহ শয়তান পালাবেই। —যয়নাব (আরীশ, মিসর)

দৈনিক হিযব

জীবন-মরণ সংকল্প করে নাও, প্রতিদিন ফজরের পরপরই নিত্যদিনের 'হিযব' আদায় করে নেবে। এই সময়ের বরকতও বেশি। আমি সারাদিনের বিভিন্ন অংশে পরীক্ষা করে দেখেছি, বাদ ফজরের মতো উপযুক্ত ফলদায়ী আর কোনো সময় পাইনি। শেষ রাত হলে আরও ভালো।

—রাওদা সিবাঈ (কুরআন শিক্ষিকা। সিরিয়ান উদ্বাস্তু শিবির, জর্দান)

পুণ্যস্নান

প্রত্যহ নিত্যদিনের হিযব শেষ করার পর, কেমন যে অনুভূতি জাগে, বলে বোঝানো যাবে না। যদি বলি, কুরআন জান্নাত, তবুও সবটা বলা হয় না। কুরআন যখন পড়ি, মনে হয় আমার তনুমনের রং বদলে গেছে। আমার হৃদয় অন্য হৃদয়ে পরিণত হয়েছে। আমার আত্মা যেন পুণ্যস্নান সেরে সমস্ত কর্মশ্রান্তি আর পাপক্লান্তি থেকে পূতপবিত্র হয়ে উঠেছে। অন্তর্জগৎ যেমন শুষ্ক-নীরস মরুভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল বনবীথিকায় পরিণত হয়েছে। —হিদায়াহ আলওয়ানি (কায়রো, মিসর)

বন্ধুবৎসল কুরআন

প্রিয় ছাত্রীরা, আমার একটানা চার-চারটি বছরের ভাবনা আর সাধনার নির্যাস বলছি, কুরআনকে সর্বান্তঃকরণে আঁকড়ে ধরো। কুরআনের মতো বন্ধুবৎসল দয়ার্দ্রচিত্ত আর কোনো কিতাব পাবে না। আখেরাতবিমুখকারী বইপত্র ছাড়ো। কুরআন তাদাব্বুরে নিমগ্ন হও। আল্লাহর কসম—আনন্দনীয় ফল পাবে। সবদিক থেকেই বিস্ময়কর সব ফলাফল আসতে থাকবে। একসময় এমন হবে, তোমার চিন্তার প্রতিচ্ছবিই কুরআনের লাইনে লাইনে আবিষ্কার করবে। কুরআনের ভাব-ভাবনাই তোমার মন-মস্তিষ্কের গতিপ্রকৃতি হয়ে উঠবে।
—রিফাকাহ হুদা (পশ্চিম তীর, ফিলাস্তীন)

স্বপ্নের সারথি

আজ স্বপ্ন দেখলাম, হারাম শরীফ সবার জন্য আগের মতো সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। চারদিক থেকে উচ্চনিনাদে এই ঘোষণা ভেসে আসতে লাগল। ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই চারদিক থেকে পিলপিল করে শাদা পোশাকধারী হাজী সাহেবান জমায়েত হতে শুরু করেছেন। সবাই উচ্চ আওয়াজে তালবিয়াহ পাঠ করছেন। সবার হাতেই কুরআন। হাত উঁচিয়ে আকাশের দিকে কুরআন ধরে আছেন। থেকে থেকে তিলাওয়াত করছেন। সবাই এক আওয়াজে। এক ধ্বনিতে। অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইয়া আল্লাহ, আমাকেও স্বপ্নের সারথি বানান। শামিল করে নিন এই বিপ্লবী কাফেলায়। —হানানাহ যায়েদা (ইরবীল, ইরাক)

কালামুল্লাহর খাদেম

এতদিনে আমার একীন জন্মে গেছে, আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তাকে কালামুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত করেন। তার কাছে কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শ্রবণকে প্রিয়তর করে তোলেন। প্রতিনিয়ত গাইব থেকে তার অন্তরে কুরআনের প্রতি ভালোবাসার ইলহাম (বার্তা) আসতে থাকে। কুরআনের সাথে অনির্বচনীয় এক সখ্য-নৈকট্য অনুভব করেন। এমন ভালোবাসার জীবনই তো মুমিনের পরম আরাধ্য। এমন সাধনায় একটা জীবন কাটিয়ে দেয়াই যায়। অনায়াসে।

—রুকাইয়া তেলমীয (উইঘুর উদ্বাস্তু শিবির, তুরস্ক)

হৃদয়বাগানের ফুল

আমার জীবনে কুরআনের চেয়ে বড় নেয়ামত আর দেখিনি। যখনই দুনিয়াবি ঘূর্ণিঝড় সব লন্ডভন্ড করে দেয়, কুরআন এসে সব আগের মতো গোছগাছ করে দেয়। মনোজগতের সমস্ত উথালপাথাল পরিস্থিতি নিমেষেই শান্ত নিস্তরঙ্গ করে দেয়। দুনিয়াবি কালবৈশাখীর তোড়ে ভেঙে নুয়ে উপড়ে পড়া হৃদয়বাগানকে আবার ফুলে-ফলে সুশোভিত করে দেয় (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন (কাহফ, ১)।

—হাওয়া সুবাদি (মারাকেশ, মরক্কো)

মুক্তির মানচিত্র

যখনই কোনো আয়াতের পাশ দিয়ে যাই, অনুভব করি, আমি না জানলে কী হবে, এই আয়াতের মধ্যে কত শত রহস্য আর নিগূঢ় সত্য তথ্য যে লুকিয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমি আজ না জানলেও, একদিন অবশ্যই জানব। এ-কারণেই বারবার আয়াতের কাছে ফিরে ফিরে আসি। ঘুরে-ফিরে কুরআনে আসি। আয়াতগুলোতে এমন কিছু আছে, আমাকে তা আবিষ্কার করতেই হবে। আয়াতে

এমন এক অজানা স্বাদ আছে, আমাকে তা আস্বাদন করতেই হবে। পৃথিবী ত্যাগের আগেই, সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই তা আহরণ করে নিতে হবে। কুরআনই আমার প্রথম শিক্ষক। কুরআনই আমার মুক্তির মানচিত্র।

—রুফাইদা সুমেরী (কায়রাওয়ান, তিউনিসিয়া)

সবর ও সলাত

যখনই দেখি হিফয বা তিলাওয়াতে আলস্য জেঁকে ধরেছে, আগ্রহে ঘাটতি পড়েছে, সাথে সাথে দুই রাকাত সলাত আদায় করে নিই। (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) সবর সলাতের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো (বাকারা, ৪৫)। সালাম ফেরাতে-না-ফেরাতেই নবোদ্যম অনুভব করি। নতুন গতি পাই হিফযে ও তিলাওয়াতে। মনে আগ্রহের বান ডাকে। কুরআনি জীবন ফিরে আসে নবচেতনায়।

—সাঈদা হাসান (জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া)

সম্মানিত বস্তু

আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে, একরাতে দুইটা বাজে, আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেছিলাম। তিনি যেন আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু দান করেন। ছয় মাসের মাথায় আল্লাহ আমাকে কুরআন দান করেছেন। দোয়ার সময় কুরআনের কথা আমার মাথায় ছিল না। কুরআনের প্রতি আগ্রহও ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার দোয়া কবুল হয়েছে কি না। কুরআনের হিফয সম্পন্ন করে বুঝতে পারলাম, আমার দোয়া আল্লাহ এভাবেই কবুল করেছেন। এটাও বুঝতে পারলাম, আমার জন্য কুরআনই দুনিয়া আখেরাতের সবচেয়ে দামি আর সম্মানিত বস্তু।

—হালীমা নওশীন (মুযাফফরাবাদ, আযাদ কাশ্মীর)

কুরআনের সৌন্দর্য

সূরা ফুসসিলাত ও সূরাতুন নাজমের লালিত্যপূর্ণ ছন্দদোলাময় আয়াতগুলো আমার খুবই প্রিয়। প্রথম প্রথম মনে হতো, এমন মিষ্টি ও অর্থপূর্ণ আয়াত বুঝি কুরআনে আর মিলবে না। এরপর সূরা আম্বিয়া পড়তে গিয়ে এত ভালো লাগল, মনে হল এর চেয়ে প্রিয় সূরা বুঝি আর হবে না। এই সূরাই বাকিজীবন প্রিয়তম সূরা হয়ে থাকবে। সূরা ইসরা পড়তে বসে আগের সব ধারণা বদলে গেল। ইসরা আমাকে পুরোই দখল করে নিল। আমাকে মসজিদে আকসার জীবনসফরের মুসাফির বানিয়ে দিয়েছে। সূরা ইসরার সৌন্দর্য, রহস্য আমার গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। কুদসের সফরে ছুটে চলেছি। —নাজিয়া মুনীরাহ (মিউনিখ, জার্মানি)

গুনাহের দুষ্ট ক্ষত

যেদিন তিলাওয়াত অন্যদিনের তুলনায় পরিমাণে কম হয়ে যায়, বুঝতে পারি আমার কোনো গুনাহ হয়ে গেছে। আমার কলবে গুনাহের দাগ পড়ে গেছে। গুনাহ আমাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। গুনাহের দুষ্ট ক্ষত তিলাওয়াতকে কঠিন আর ভারী করে তুলেছে। আমাকে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতেই হবে। আমাকে গুনাহের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমাকে জান্নাতের অমিয় সুধা পান করতে হবে। তিলাওয়াতই সেই অমিয় সুধা। আমাকে আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হবে। তিলাওয়াতই সেই সান্নিধ্যসুখ এনে দেবে। আমাকে গুনাহ ছাড়তে হবে। কুরআনকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। কুরআন আমাকে সম্মান দেবে। শক্তি দেবে। আল্লাহর বান্দা বানাবে। —মুনা ওয়াঈ (কুয়েত)

আলোর ফোয়ারা

আকাশে আতশবাজি ফোটে। একটি গোলক থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছুটে যায়। দৈনিক হিযব আদায় করতে গিয়েও, মাঝেমধ্যে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। তিলাওয়াত করতে করতে, চট করে চিন্তাজগতে আলোর ফোয়ারা ছিটকে ওঠে। অনেক দিন ধরে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলাম না। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সমস্যার সমাধান মিলছিল না। কুরআনের কোনো আয়াত বা বাক্যের সূত্র ধরে জ্বলে ওঠে 'ফ্ল্যাশ লাইট'।

কোনো লাইন বুঝতে পারছিলাম না। তিলাওয়াত করতে করতে চট করে কুরআনি নূর ধক করে জ্বলে উঠেছে, এমন অনেকবার হয়েছে। এটা ব্যক্তিগত যোগ্যতায় হয় না। আল্লাহর খাস রহমতেই এই অমূল্য নেয়ামতপ্রাপ্তি ঘটে। কুরআনেই এ-কথা বলা আছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে বলেছেন,

"وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ"

(হে রাসূল,) পূর্ব থেকে আপনার এ আশা ছিল না যে, আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের রহমত (কাসাস, ৮৬)।

খোদ রাসূলের প্রতি কুরআন নাযিল হওয়া যদি আল্লাহর খাস রহমত হয়, তাহলে আমি যে কুরআনে সাথে জড়িয়ে আছি, এটাও আমার নিজের যোগ্যতায় নয়। একমাত্র আল্লাহর রহমতেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। —আলা দাউদ (সৌদি আরব)

সালসাবীল

দৈনিক হিযব আদায় আমাকে অনেক তাৎক্ষণিক সমস্যা থেকে বাঁচায়। একদিন ভীষণ মন খারাপ ছিল। একজন আমাকে কটুকথা বলেছিল। বিষণ্ন মন নিয়ে

তিলাওয়াত করতে বসেছি। সামনে এল (ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ) হে রাসূল, তারা যা-কিছু বলে তাতে সবর করুন (সোয়াদ, ১৭)। কুরআন আমার জন্য সব সময়ই এক 'সালসাবীল' প্রবহমান ঝরনাধারা। আমার যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে স্বচ্ছ-সজীব করে তোলে। —রাগাদ ফাতিমা (জর্দান)

কুরআনি আশ্বাস

এক নিকটাত্মীয়ের শত্রুতার কারণে পেরেশান ছিলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সমাধান বের করে দেবেন। যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, আমি কুরআন কারীম নিয়ে বসে পড়ি। তিলাওয়াত করতে থাকি। আজও তিলাওয়াতে বসলাম। মন না চাইলেও জোর করে। একটু তিলাওয়াত করতেই সামনে

পড়ল (إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে (হজ, ৩৮)। আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে রক্ষা করবেন, এটা তো জানি। তবুও দরকারের সময় মাথায় থাকে না। আর সরাসরি কুরআন থেকে আশ্বাসবাণী পড়লে আস্থার মাত্রাটা বেশি হয়। —রিয়ানাহ খলীফাহ (বাহরাইন)

কুরআনি আয়না

দৈনিক হিযব আদায়ের বড় সুবিধা এই, পুরো কুরআনের বক্তব্য নখদর্পণে থাকে। কিছুদিন পরপরই পুরো কুরআন একবার চোখ আর মনের নাগালে আসে। আমি মনে করতাম যে পথে চলছি, সেটাই সঠিক। দৃঢ়পদে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি আয়াত আমাকে ভাবিয়ে তুলল :

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

> *তারা (দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধূলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো (ফুরকান, ২৩)।*

আমি যে কাজ করছি তা আসলেই সঠিক? একজন আলিমের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, আপনার এই 'ব্যবসা' শরীয়তের মানদণ্ডে বৈধ নয়। আল্লাহর খাস রহমত, আমি ভুলপথে থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে মাঝেমধ্যে কুরআন নিয়ে বসার তাওফীক দিয়েছিলেন। আমি দান দান-খয়রাত করছি। মসজিদ-মাদরাসায় দান করছি, এসব আমল আল্লাহর মীযানে গ্রহণযোগ্য হবে তো? আমার উপার্জনই যদি হারাম হয়, দান-সাদাকার মূল্য কোথায়?
—মারয়াম সামা (তিউনিসিয়া)

উত্তম সবর

আমাদের বাসা থেকে মাদরাসা বেশি দূরে নয়। একজন লোকের আচরণে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতাম। প্রতিদিন ভার্সিটি থেকে ফিরেই বিকেলে মাদরাসায় যেতে হয়। হিফয করার জন্য। লোকটা যাওয়ার পথেই দাঁড়িয়ে থাকত। তেমন কিছুই করত না। তবুও তার হাবভাব স্বস্তিকর ছিল না। শিক্ষিকা আপুকে বললাম। আপু আয়াতটা পড়ে শোনালেন :

(وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا)

আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। বলো, তোমরা কি সবর করবে? তোমার প্রতিপালক সবকিছুই দেখছেন (ফুরকান, ২০)।

আপু বললেন, মাঝেমধ্যে কিছু মানুষ আমাদের উত্যক্ত করে। কারও কারও ধারণা সমস্যাটি মেয়েদের। মেয়েদের কারণেই দুষ্ট পুরুষেরা লোভাতুর আচরণ করে। এটা ভুল চিন্তা। আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় ফিতনা বা পরীক্ষার জন্য কোনো দুষ্ট পুরুষকে কোনো নেককার মেয়ের পেছনে লেলিয়ে দেন। আল্লাহ দেখেন মেয়েটা (أَتَصْبِرُونَ) কি সবর করে নাকি ফিতনায় পড়ে? তুমিও দুষ্টলোকের মুখোমুখি হলে সবর করবে। ফিতনায় পড়বে না। ওদিকে ভ্রুক্ষেপই করবে না। শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের অন্য শাখায়ও অনেক সময় আমাদের ওপর এমন ব্যক্তি চেপে বসে, এমন ব্যক্তি আমার ঊর্ধ্বতন হয়ে যায়, যে মানুষটা কোনো দিক দিয়েই আমার চেয়ে এগিয়ে নেই। আল্লাহ তা'আলা আমার সবর পরীক্ষা করার জন্যই এমনটা করে থাকেন বলে আমি ধরে নেব। তাহলে মনে কোনো অভিযোগ থাকবে না। কষ্ট থাকবে না। খেদ থাকবে না।

আলহামদুলিল্লাহ, মাদরাসা থেকে সম্পূর্ণ নতুন আমি বের হলাম। মাদরাসায় আসতে আমার আর কোনো সংকোচ থাকবে না। দ্বিধা থাকবে না। দুষ্টলোকের অভব্য আচরণেও আমি বিচলিত বোধ করব না। আমার আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। আমার দায়িত্ব শুধু সবরে জামীল (উত্তম সবর) অবলম্বন করে যাওয়া।

—হিন্দা আসমা (মিসর)

ভেতরকার ব্যাধি

আলহামদুলিল্লাহ। তিনি আমাদের ইসলামের অনুসারী বানিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তিনি আমাদের কুরআনের মতো কিতাব দান করেছেন। কুরআন আমাদের জন্য এক মহাসম্পদ। মনপ্রাণ সঁপে যখনই কুরআনের কাছে হাত পেতেছি, গভীর অভিনিবেশে তাদাব্বুরের সাথে তিলাওয়াতে ডুব দিয়েছি, কুরআন আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আমার অনুচ্চারিত সমস্যার সমাধান দিয়েছে। চুপটি

করে গভীর মনোযোগ দিয়ে যখন তিলাওয়াত শুনি, মনে হতে থাকে, আমার ওপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা অঝোরে বর্ষিত হচ্ছে। আমার ভেতরটা ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। কুরআনের আয়াতগুলো আমাকে একের পর এক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, দিক-নির্দেশনা বাতলে যাচ্ছে। আমার ভেতরকার ব্যাধিগুলো শুধরে দিচ্ছে। আল্লাহর দেয়া রহমতের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতে দেখি। কুরআন মানে রহমত,

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয় (আ'রাফ, ২০৪)।

—আয়েশা কাসসার (আরব আমীরাত)।

কুরআনের খাদেম

আমি চাইলে তাকে কুরআনের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পরি। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরায়েলের এক সাধক সম্পর্কে বলেছেন, (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا) আমি ইচ্ছা করলে, সেই আয়াতসমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। পুরো একটা দিন আমি আয়াতখানা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। বারবার চেষ্টা করেও সামনে এগুতে পারিনি। আল্লাহ চাইলে আমাকে কুরআন নিয়ে থাকার তাওফীক দান করতে পারতেন। আমাকে কুরআনের খাদেমা বানাতে পারতেন। আল্লাহ চাইলে আমাকে কুরআন নিয়ে জীবন কাটানোর সুযোগ দিতে পারতেন। কিন্তু স্বভাবদোষে আমি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি (وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল (আ'রাফ ১৭৬)। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুরআন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তবে সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। ইন শা আল্লাহ।

—খানসা সুরিনজান (মরক্কো)

কুরআনি বরকত

আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণায়, কুরআন কারীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিয়েছেন। আমি এটা টের পাই যেদিন আমি দৈনিক হিযব আদায় করতে পারি না বা দৈনিক নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম তিলাওয়াত করি। আমার ভেতরটাতে কেমন যেন অসম্পূর্ণতা অনুভব করি। কিসের যেন পিপাসা রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না, কেন এই হাহাকার। কিসের এত অতৃপ্তি। স্বামী-সন্তান-সংসার কিছুই ভালো লাগত না। কিছুতেই মন লাগত না। পরে যখন অসম্পূর্ণ তিলাওয়াত পূর্ণ করতাম, পাশাপাশি অতিরিক্ত এক বা দুই পারা তিলাওয়াত করতাম, মনের হা-হুতাশ দূর হয়ে যেত। দৈনিক হিযব আদায় আমার সংসারের

চিত্রও বদলে দেয়। বাড়তি ভালোবাসা-মহব্বত তৈরি করে। সন্তানরা বেশি অনুগত হয়। স্বামী বেশি যত্ন নেয়। —উম্মে আলা মুলহাম (কাত'র)

কুরআনের কারামত

আমি এটাকে কুরআন কারীমের কারামতই বলব। চার বছর আগে, ভার্সিটির পড়ার চাপে, শখের বশে শুরু করা কুরআন হিফয বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে আব্বু ইন্তেকাল করলেন। মন খারাপ ভাব দূর করার জন্য, পরীক্ষা মাথায় রেখেই আবার কুরআন হিফয শুরু করলাম। কিছুদিন পর শোক কমে এলে, আপনা-আপনি হিফয বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকদিন পর আব্বুকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, অসম্পূর্ণ হিফয পূর্ণ করো। তুমি যা করছিলে, আমার জন্য আরামদায়ক ছিল। ঘুম ভাঙার পর থেকেই আবার শুরু করলাম। পরীক্ষার তুমুল ব্যস্ততায়ও হিফয ছাড়িনি। পরিমাণে অল্প হয়েছে, তবুও একেবারে বাদ দিইনি। আলহামদুলিল্লাহ, পরীক্ষার কিছুদিন পরই হিফয শেষ হয়ে গেছে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, দৈনিক হিযব আদায় একদিনের জন্যও বাদ যেতে দিই না। এখন ঘর-সংসার হয়েছে। ব্যস্ততা বেড়েছে। তবুও তিলাওয়াতের রুটিন আগেরটাই বহাল রেখেছি। এমনকি বাসর রাতেও তিলাওয়াত করেছি। বর আসার আগের সময়টুকু একা একা বসে না থেকে ঘোমটার আড়ালে মৃদু স্বরে তিলাওয়াত করেছি। স্বপ্নের পর থেকেই মনে হতো, আমি তিলাওয়াত করলে, আব্বু কবরে শান্তি পাবেন। আমার তিলাওয়াত আব্বুর কবরে রহমত হিসেবে নাযিল হবে। সন্তানের তিলাওয়াত নিছক তিলাওয়াত থাকে না, হয়ে ওঠে মাতা-পিতার প্রতি 'ইহসান'—সদাচার।—আয়াত মুস্তাফা (আলজেরিয়া)

শেষরাতের ডাক

গতকাল শেষরাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তার পাশে বাসা। সারারাত গাড়ির আনাগোনার শব্দ কানে আসে। অভ্যেসবশে শব্দ-কোলাহলেই ঘুম এসে পড়ে। বাসার অদূরে পেট্রোল পাম্প আছে। সেখানে তেল নেয়ার জন্য একটা গাড়ি থামল। দরজা খুলতেই কুরআন তিলাওয়াত ভেসে এল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। সূরা যারিয়াত চলছে (كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত (যারিয়াত, ১৭)। মনে হলো আয়াতখানা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। কুরআন বুঝতে পেরেও কুরআন তিলাওয়াত করি না। কুরআনের আয়াত নিয়ে ভাবি না। আল্লাহ তা'আলা কতভাবে যে বান্দাকে জাগাতে চেষ্টা করেন। আমার এখন কেন ঘুম ভাঙল? ভাঙার কথা তো ফজরের আযান শুনে। তিনি আমাকে আয়াতখানা শোনানোর জন্যই কি ঘুম ভাঙিয়েছেন?
—সারাহ উতাইবী (রিয়াদ)

বাবার উপদেশ

ইন্তেকালের কয়েক মাস আগে, আব্বু একদিন ডেকে কিছু কথা বলেছিলেন। একটা কথা ছিল এমন, 'মানুষ কে কী করে, কে কীভাবে জীবনযাপন করে, সেদিকে তাকাবে না। নিজের আত্মিক উন্নতি আর কুরআন কারীম নিয়েই থাকবে।' আরও দশটা নসীহার মতো আব্বুর এই নসীহাও ভুলে গিয়েছিলাম। গুরুত্ব দিইনি। আমার এক বান্ধবী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে শোনাল,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

আমি আপনাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বারবার পড়া হয় এবং দিয়েছি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন। আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন লোককে মজা লোটার যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি তার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না এবং তাদের প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না (হিজর, ৮৮)।

চট করে মনে পড়ল, আব্বুও তো আমাকে প্রায় এই নসীহাই করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কি চাচ্ছেন, আমি সবকিছু ছেড়ে কুরআন নিয়ে থাকি? সবদিক গুটিয়ে সমস্ত মনোযোগ কুরআনে কেন্দ্রীভূত করি? যাই হোক, আব্বুর শেষ ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে, নিজেকে কুরআনের সাথে জুড়তে শুরু করলাম। আল-হামদুলিল্লাহ, দশ পারা হিফয হয়ে গেছে। অল্প সময়েই আল্লাহ অনেক বরকত দিয়েছেন। —রীমা ওদায়া (তিউনিসিয়া)

কুরআনের ছোঁয়া

আমি আমার নাফসের প্রতি দয়া করেছি। আমার আত্মার প্রতি ইহসান-অনুগ্রহ করেছি। কারণ, আমি আত্মাকে অপূর্ব এক উপহার এনে দিয়েছি। উপহারের নাম আলকুরআন। জীবনের বড় একটি অংশ আমি গুনাহে কাটিয়েছি। আমার নফসকে গুনাহের পঙ্কে ডুবিয়ে রেখেছি। বিরাট বড় একটি ধাক্কা খেয়ে যখন সংবিৎ ফিরল, চিন্তা হলো এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। জীবনের মোড় ফেরানোর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সহায়-সম্পত্তি যা ছিল, সব হিসেব-নিকেশ করে জড়ো করলাম। বেশির ভাগই হারাম পথে আসা। হারাম সম্পদের একরকম বিলিব্যবস্থা করলাম। চট করে গুনাহ ছেড়ে দিলে থাকব কী নিয়ে? একজন শায়খ পরামর্শ দিলেন, কুরআন আঁকড়ে ধরতে। প্রথম দিকে ভালো লাগত না। কিছু করার নেই। আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতেই হবে। কুরআন নিয়ে বসতে, মন যতই গড়িমসি করে, আমি আরও জোরে আঁকড়ে ধরি। এখন আলহামদুলিল্লাহ, আমি এক 'নাঈমে' বাস করছি। সুখময় জান্নাতে জীবন কাটাচ্ছি। যেখানেই যাই, যা-ই করি, কুরআন আমার সাথে সাথেই থাকে। আমার কলবে কুরআন। আমার মুখে কুরআন। আমার চোখে কুরআন। আমার কানে কুরআন। আর্থিক অনটন, জাগতিক বিপদাপদ কিছুকেই আর ভয় লাগে না। আমার কুরআন আছে না! আগে

সমস্যা দেখা দিলে আরও বেশি গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়তাম। এখন বিপদ দেখা দিলে আরও বেশি কুরআনে নিমগ্ন হই। কুরআন আমাকে নিয়ে যায় এক অপার্থিব জগতে। প্রশান্তির দুনিয়ায়। —হাদিয়া বুরসা (কুদস, ফিলাস্তীন)

মনোজগতের পরিবর্তন

যখন থেকে কুরআন হিফয ও নিয়মিত দৈনিক হিযব আদায় করতে শুরু করেছি, নিজের মধ্যে বিস্ময়কর এক পরিবর্তনের ছোঁয়া অনুভব করেছি। কুরআনি জীবনে প্রবেশের পূর্বে আমার কল্পনাতেও ছিল না, দুনিয়ার কোনো কিছু মানুষকে এতটা বদলে দিতে পারে। কুরআন আমার মনোজগৎকে ওলটপালট করে দিয়েছে। আমার চিন্তাকর্মের খোলনলচে পালটে দিয়েছে কুরআন কারীম। কুরআনি জীবনপূর্ব আমি আর কুরআনি জীবনময় আমিতে কত কত তফাৎ! সারাক্ষণ আফসোস হয়, আরও আগে কেন কেউ আমাকে বিস্ময়কর অপার্থিব কুরআনি জগতের সন্ধান দেয়নি? আগের জীবনের কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই কুরআনি জীবনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে! আগের জীবনের কত চরম আনন্দের কাজ এই কুরআনি জীবনে এসে অত্যন্ত ঘৃণিত হয়ে গেছে! কুরআন কারীম আমাকে পুরোই বদলে দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। —ফাতিহা আল্লিয়া (আমস্টারডাম, হল্যান্ড)

জীবনে বরকত

প্রথম দিকে দৈনিক হিযবের পরিমাণ খুবই অল্প ছিল। প্রতিদিন আধাপৃষ্ঠা কখনো একপৃষ্ঠা করে পড়েছি প্রথম প্রথম। তারপর দুই পৃষ্ঠা। তারপর তিন পৃষ্ঠা। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে এখন প্রতিদিন তিন পারা করে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমার সময়ের বরকত আরও বাড়িয়ে দেন। আমি দৈনিক হিযবের পরিমাণ যত বাড়িয়েছি, আমার জীবনে বরকতের পরিমাণও তত বেশি উপলব্ধি করেছি।—আমীনা গুলাব (পেশোয়ার, পাকিস্তান)

রহমানের রহমত

সবার উৎসাহে হিফয শুরু করলেও সুবিধা করতে পারছিলাম না। মুখস্থ হচ্ছিল না। যত মেহনত করি, পরিমাণমতো ফল আসে না। আমার বান্ধবীরা প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে হিফয করে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওস্তাজা আপুর কাছে কষ্টের কথা বললাম। তিনি বললেন, হুমাইরা, আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ ছিল। আমি কত রাত শুয়ে শুয়ে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে, কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছি, তার হিসেব নেই। আল্লাহ তা'আলা যে আমার দোয়া কবুল করেছেন, সে তুমি দেখতেই পাচ্ছ। আল্লাহ তা'আলা রহমান। বান্দার দোয়া রহমানের দরবারে ঢেউ তোলে। তিনি বলেছেন—(الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ)। আপুর কথামতো অনেক অনেক দোয়া শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমার বান্ধবীদের সাথেই খতম শেষ করতে পেরেছি।—হুমাইরা বিশবিশী (বাগদাদ, ইরাক)।

সংগ্রামী হাফেযা

বাবা স্থায়ী অসুস্থ ছিলেন। মা এটা-সেটা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। আমরা তিন বোন মাকে সাহায্য করতাম। এর মধ্যে স্কুলে যেতে হতো। স্কুল থেকে ফিরে আগামী দিন বিক্রির জন্য জিনিসপত্র জোগাড়-যন্ত্রে লেগে পড়তে হতো। আসরের পরে একটু সময়ের জন্য হিফযের সময় বের করা যেত। দুই বোন হাঁপাতে হাঁপাতে হাফেযা আপুর বাড়িতে যেতাম। তাকে সমস্যার কথা খুলে বললাম। তিনি আরও করুণ গল্প শোনালেন। তিনি স্কুলে পড়ার সুযোগই পাননি। রাজধানী সানার অলিগলিতে বাবার সাথে ঘুরে ঘুরে হরেকরকমের পণ্য বিক্রি করতেন। আপু বললেন, বাবা ছিলেন কিছুটা বয়স্ক। একা একা ঠেলাগাড়ি চালাতে পারতেন না। একজন পেছন থেকে ধাক্কা দিতে হতো। আমি সবার বড় হওয়াতে, আমাকেই বাবার হেল্পারের দায়িত্ব নিতে হলো। সকালে মায়ের কাছে কুরআন শরীফ পড়তাম। মা হাফেযা ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিতেন হাফেয হতে। সকালে যেটুকু মুখস্থ হতো, সারাদিন বাবার সাথে ঘুরতে ঘুরতে, বেচাবিক্রির ফাঁকে ফাঁকে পড়াটা মুখস্থ করতাম। একটা কুরআন শরীফ সাথে থাকত। স্কুলগুলোর গেটে আমরা খেলনাপাতি নিয়ে দাঁড়াতাম। ক্লাস শুরু হওয়ার পর, ক্রেতা না থাকলে আমি ঠেলাগাড়ির নিচের ছায়ায় বসে বসে কুরআন হিফয করেছি। পর্দার বয়েস হওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই কুরআন পড়ে কাটিয়েছি।

আপুর কথা শুনে মনে ভীষণ জোর এল। আমি এখন স্কুলে যেতে-আসতে তিলাওয়াত করি। দুই বোন একসাথে থাকায় সুবিধা হতো। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে, টিফিনের ছুটিতে, বাড়িতে বিক্রির পণ্য বানাতে বানাতে একনাগাড়ে কুরআন পড়তে শুরু করলাম। আমি একদিক থেকে হিফয শুর করেছি। ছোটবোন আরেকদিক থেকে। কাজ বা হাঁটাচলার সময় একজন আরেকজনের কাছ থেকে শুনে শুনে, এ-ওরটা শুনে মুখস্থ করতাম। দেখে পড়ার চেয়ে মুখস্থ শুনে শুনে পড়ায় হিফয বেশি দ্রুত হয়। সময়ের কোনো ফাঁককেই আমরা কুরআন ছাড়া কাটতে দিতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, বেশিদিন লাগেনি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফযে বরকত দিয়েছেন। এমনকি রিযিকেও। এবার *রিয়াযুস সালিহীন* হিফয শুরু করেছি।—আয়েশা যিরাব (কায়রো, মিসর)।

মুয়াল্লিমুল কুরআন

আব্বু আমার হাত ধরে ইলমুল কেরাতে অভিজ্ঞ এক শায়খের কাছে নিয়ে গেলেন। আব্বুর ইচ্ছা, পর্দার বয়েস হওয়ার আগেই পুরুষ শিক্ষকদের কাছে যতটা সম্ভব কুরআন শিখে নেব। আব্বু বিনীতভাবে শায়খের কাছে জানতে চাইলেন, সম্মানি কত দিতে হবে? শায়খের কথা আমার আজও মনে আছে। কথাটা সেই ছোট্ট বয়েসেও আমাকে এতটা প্রভাবিত করেছিল, মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, বড়

হলে শায়খের মতো নিঃস্বার্থ হব। ইন শা আল্লাহ। শায়খ বলেছিলেন, মুয়াল্লিমুল কুরআন কখনো মাল ও দুনিয়ার দিকে তাকায় না। তারা কখনো হাত পাতে না। কোনো ছাত্রকে টাকার জন্য ফিরিয়ে দেয় না। খুশিমনে কেউ কিছু দিলে সেটা গুনেও দেখে না।

আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, সত্যিকারের মুয়াল্লিমুল কুরআন এই অমূল্য নেয়ামত পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মুয়াল্লিমুল কুরআন সব সময় তার আমানত ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজেই মশগুল থাকে। তাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন বহনের যে সম্মান দিয়েছেন, তা নিয়েই সে পরিতুষ্ট থাকে।—আমাল কিলানী (আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর)

কুরআনি 'হাজ্জাহ'

আমরা তখন থাকতাম বসরায়। মহল্লায় একজন 'হাজ্জাহ' ছিলেন। কুরআন শিক্ষা দিতেন। স্বামী-সংসার নিয়ে ভরপুর জীবন তার। কিন্তু শত ব্যস্ততাতেও নির্ধারিত সময়ে আমাদের নিয়ে বসতেন। সাদ্দামের গোয়েন্দারা তার বড় ছেলেকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল, সেদিনও তিনি আমাদের নিয়ে বসেছেন। সবার হিফযের সবক শুনেছেন। পুরো সময়ে একবারের জন্য শোক প্রকাশ করতে দেখিনি। অথচ তার চোখই বলে দিচ্ছিল, তিনি পুত্রের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। কী দরদ আর মায়া দিয়েই-না আমাদের কুরআন শেখাতেন। গোয়েন্দারা অবশ্য তার ছেলেকে কয়েকদিন আটক রেখে ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক বড় এক অফিসার এসে, হাজ্জার কাছে ক্ষমাও চেয়ে গিয়েছিলেন। ভুল তথ্যের কারণে ছেলেকে আটক করা হয়েছিল। হাজ্জার নিঃস্বার্থ কুরবানির বিনিময়ে আমরা কত মেয়ে যে কুরআন শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি, হিশেব নেই। আমাদের ইরাক আজ ভেঙে গেছে, আমাদের হাজ্জাহ বেঁচে আছেন কি না, সেটাও জানি না। কিন্তু হাজ্জার শিক্ষা আমরা ছাত্রীরা আজও বহন করে চলেছি। আমি জর্দানে যেখানে থাকি, সেখানে হাজ্জার মতোই সম্পূর্ণ অবৈতনিক কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমীনা শারবাতী (ইরাক)

ভালোবেসে কুরআন

আমরা কুফায় থাকাকালে, একজন শিক্ষকের কাছে কুরআন শিখতে যেতাম। বড় কঠিন ছিল তার নিয়মকানুন। সামান্য ভুলেও কঠিন ধর-পাকড় করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিদিন টিকত না। তবে পড়া শিখলে, ভালো করে পড়া দিতে পারলে, খুব আদরও করতেন। তার একটা কথা এখনো মনে দাগ কেটে আছে, বেটিরা, কুরআন হিফয করবে ভালোবেসে। বাধ্য হয়ে নয়। —রাওদা আফরা (ইরাক)

লাজুক ইমাম

আমরা যে আপুর কাছে কুরআন শিখতে যেতাম, তিনি বড্ড লাজুক ছিলেন। তিনি আমাদের শুধু পড়া বলে দিতেন। ভুল করলে শুধরে দিতেন। নিজে কখনো আমাদের পড়ে শোনাতেন না। আমরা অনেক ধরাধরি জোরাজুরি করেও তাকে তিলাওয়াত করাতে পারিনি। আমরা প্রতিদিন তার বাসায় মাগরিবের নামাজ পড়তাম। জামাতের সাথে।[১] আপু একদিন একজনকে ইমামতি করতে দিতেন। নিজে কখনো সামনে যেতেন না। আমরা যারা ইমাম হতাম, তারা ফন্দি আঁটলাম, মাগরিবের আযানের একটু আগে, আমরা সবাই চলে আসব। ছোটরা থাকবে। আপুকে বাধ্য হয়ে ইমামতি করতে হবে। হলোও তা-ই। নামাজ শুরু হতেই আমরা সবাই হুড়মুড় করে ঘরে এসে নিয়ত বাঁধলাম। ইয়া আল্লাহ! এত্ত সুন্দর কেরাত আমরা জীবনেও শুনিনি। এত সুন্দর যার তেলাওয়াত, তিনি কিনা ইমামতি করতে চান না। শুধু কি সুন্দর, আপু প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। বুঝে বুঝে। স্বরের ওঠানামা থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম, তিনি প্রতিটি শব্দের অনেক গহিনে গিয়ে উচ্চারণ করছেন। দুষ্টুমিতে লাভ হলো এই, আমরা শিখতে পারলাম, কীভাবে সলাতে তিলাওয়াত করতে হবে। সলাতে কীভাবে ডুবে যেতে হবে। —উম্মে আইমান (রিয়াদ, সৌদি আরব)

পরার্থপরতা

ছোটবেলায় হাফেয হতে পারিনি। ঘরে দ্বীনের পরিবেশ ছিল না। বড় হয়ে হিফয শুরু করেছি। আল্লাহ তা'আলা গায়েবী ব্যবস্থাপনায় আমার হিফয সহজ করে দিয়েছিলেন। ভার্সিটির পরীক্ষার বন্ধে আমাকে দিনরাত কুরআন কারীম নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে দেখে, পাড়ার অন্য মেয়েদেরও উৎসাহ জাগল। মায়েরা এসে তাদের খুকিদের দিয়ে গেল। খুকিদের হেফয তদারক করতে করতে, আমার হিফযও পোক্ত হয়ে গেল। তারা আমাকে শোনাত, আমি তাদের শোনাতাম। অন্যদের তুলনায় আমার হিফযও দ্রুত হয়েছে। —নাজিয়া মুজতাবা (লখনৌ, ইন্ডিয়া)

দুর্বল সবল

আমরা একেবারে ছোটবেলায়, হিফয করতে যেতাম অনেকদূর পথ হেঁটে। প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটতে হতো। আসা যাওয়ার সময়টুকু আমরা পড়া ধরাধরি করে কাটাতাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমাদের দলে যারা গায়ে-গতরে শক্তিমান ছিল, আমরা যাদের সাথে হেঁটে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না, তারাই মাঝপথে ঝরে গেছে। আমরা যারা দুর্বল ছিলাম,

---

[১] (হানাফী মাযহাবমতে শুধু মহিলাদের জামাত, মাকরূহে তাহরীমি)

তাদের রাব্বে কারীম তার কালাম হিফযের তাওফীক দিয়েছেন। মেধা আর শক্তি নয়, আল্লাহর তাওফীকই আসল। —উনাইসা খাদরা (মৌরিতানিয়া)

দাওর

সূরা বাকারার হিফয শেষ করার পর, মনে হতো আমি কখনোই এ সূরা ভুলে যাব না। একটু পড়লেই নতুন পড়া মুখস্থ হয়ে যেত। এই আনন্দে আমি শুধু নতুন নতুন সূরা হিফযের পেছনে বুঁদ হয়ে ছিলাম। একবার মুখস্থ করলেই চলবে, আর পড়তে হবে না, এমন চিন্তায় বিভোর ছিলাম। পেছনের পড়া 'দাওর' করার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হতো না। কিছুদিন পর পুরোনো পড়া পড়তে গিয়ে দেখি, ঝাপসা হয়ে গেছে। উপলব্ধিতে এল, কুরআন হিফয আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ ছাড়া বান্দার কোনো উপায় সহায় নেই। যত ভালো হিফযই হোক, আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত থাকা দরকার। আত্মমুগ্ধতা বিপজ্জনক। নিজের কোনো অর্জন নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত নয়। অর্জিত কুরআনি ইলম নিয়ে আত্ম-অহংকার করা চরম ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়।—উকাইলা ইয়াসমীন (কুয়েত)

রিযিকের চিন্তা

আগাগোড়া ফরাসি কিন্ডারগার্টেনে পড়াশোনা করেছি। কুরআন পড়া শুদ্ধ ছিল না। নতুন করে কুরআন পড়তে শিখেছি। তাজবীদ শিখছি। পাশপাশি একটু একটু কুরআন বুঝতেও শিখেছি। তিলাওয়াত করার সময় তাজবীদের নিয়মগুলো খেয়াল রাখছিলাম। (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) আসমানেই আছে তোমাদের রিযুক এবং তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও (যারিয়াত, ২২)। এই আয়াতে কারীমায় (السَّمَاءِ) শব্দটিতে চার আলিফ মদ্দে মুত্তাসিল। কুরআনি জীবনে এসে, আগের জীবন ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন 'জিন্দেগী' শুরু করেছি। একটা চাকরি করতাম, পর্দার অসুবিধে হওয়াতে সেটাও ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহই চালাবেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবুও দুর্বল মনে শয়তান মাঝেমধ্যে 'কুচিন্তা' ঢুকিয়ে দেয়। আজ সকালেও আম্মু চাকরি ছাড়া নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন। মায়ের আশঙ্কা অমূলক হলেও, শঙ্কার কিছুটা রেশ মনে রয়ে গিয়েছিল। السَّمَاءِ মীমে চার আলিফ মদ্দে মুত্তাসিল টানতে টানতে পরের শব্দ رِزْقُكُمْ-এ চোখ পড়ল। আমার মনে হলো, চার আলিফ মদের শ্বাসের সাথে সাথে, রিযিকের শঙ্কাও ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে। কল্পনার চোখে দেখলাম, ধোঁয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে একসময় মিলিয়ে যায়, চার আলিফ মদ্দের সাথে সাথে রিযিক বিষয়ক দুশ্চিন্তাও السَّمَاءِ-তে মিলিয়ে গেছে। নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিলাওয়াত শুরু করলাম। দ্বীনের জন্য চাকরি ছেড়েছি, কুরআনের জন্য বাইরের জীবন ছেড়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। আমার কিসের এত ভয়? আল্লাহ আছেন না?

সুবহা-নাল্লাহ, কুরআন কারীমের প্রতিটি হরকত আর মদেও আল্লাহ তা'আলা অসীম হেকমত আর নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন। সূরার শুরুতে হুরূফে মুকাত্তাআতগুলোতে মদ্দ থাকে। সেগুলো টেনে পড়ার সময়ও আমি মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। মদ্দ টানতে গিয়ে আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না। বিস্ময়কর ব্যাপারই বলতে হবে, অনুভব করলাম, শ্বাসের সাথে সাথে আমার ভেতর থেকে যাবতীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ভীতি কলকল করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে আমার ভেতরটা পরম প্রশান্তি আর স্বস্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। আমি কুরআনের জন্য অনেক কিছু ছেড়েছি। বিনিময়ে কুরআনও আমাকে উপচে পড়া নেয়ামতে ডুবিয়ে দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

—সালমা উনাইয়া (তিউনিসিয়া)

অভিযোগ

তাহফীয মহলে, সহজে হিফয হতে চায় না, হিফয হলেও মনে থাকতে চায় না, এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের মাদরাসার মেয়েরাও এমন অভিযোগ করে। আমি তাদের পরামর্শ দিই : প্রথমে আয়াতখানা দেখে দেখে ভালো করে পড়ে নেবে। তারপর তরজমা বুঝবে। তারপর সাধ্যমতো তাফসীর। আগেপরের সাথে আয়াতের অর্থগত সম্পর্কটা জেনে নেবে। এটা জরুরি। তারপর প্রিয় কোনো কারীর মুখ থেকে আয়াতখানা শুনে নেবে। মুখস্থ হওয়া পর্যন্ত শুনতে থাকবে। নিজেও পড়বে। ইন শা আল্লাহ ইয়াদ হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম সময় লাগলেও পরের দিকে সময় লাগবে না।

আর হাঁ, হিফয করার সময় একটা বিষয় খেয়াল রাখবে, প্রতিটি আয়াতই আগের আয়াতের সাথে কোনো-না-কোনোভাবে অর্থগতভাবে যুক্ত। প্রায় সব আয়াতই আগের আয়াতের ব্যাখ্যা করছে বা আগের আয়াতে উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। কিছুদিন খেয়াল করে করে পড়লে, পরের দিকে এভাবে পড়াটা অভ্যেসে পরিণত হবে। মাথার মধ্যে আয়াতগুলোর অদৃশ্য ধারাবাহিকতা তৈরি হয়ে যাবে। শুধু অর্থ নয়, নাহু-সারফ, মানে ব্যাকরণও আয়ত্ত হয়ে যাবে। পড়তে গিয়ে হরকত মানে যবর-যেরে ভুল হলেও ধরে ফেলা যাবে। —ফারিহা তাবাসসুম (পাকিস্তান)

জীবন গড়া

প্রিয় ছাত্রীরা, তোমাদের একটি কথা বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো, আজীবনের জন্য মনের স্লেটে এঁকে নাও। তুমি কুরআনে হাফেযা হয়েছ। এ জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করো। তিনি তোমাকে বহুমূল্য এক নেয়ামতে বিভূষিত করেছেন। আল্লাহ তোমার প্রতি যে অপার অনুগ্রহ আর করুণা করেছেন, সে জন্য একটু পরপরই তার শানে হামদ ও সানা পাঠ করো। কুরআনের হিফয যেন

তোমার মনে অহংকার সৃষ্টি না করে। হিফযখানা থেকে ফারেগ হয়ে অন্য শিক্ষায় নিয়োজিত হয়ে যাওয়ার পর (لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে (ফাতির, ৫)। (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ো না (তোয়াহা, ১৩১)।

ভয় কোরো না। তোমার রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমার দুনিয়া-আখেরাতের প্রাপ্যও লিখিত আছে। যে কুরআন তুমি আল্লাহর অনুগ্রহে হিফয করেছ, সে কুরআনই তোমাকে মর্যাদাবান বানাবে। তোমাকে প্রাচুর্য দান করবে। তোমার দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় হাজতের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি শুধু কুরআনমতো জীবন গড়বে, আমার কাছে এই ওয়াদাটুকু করো। —সাইয়েদাহ বুশরা (খার্তুম)

মুসহাফমগ্নতা

ছোট-বড় যেকোনো কাজের আগে আমি কুরআন কারীম নিয়ে বসে পড়ি। ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যেস গড়ে উঠেছে। দাদুর দেখাদেখি আমিও এই আমল করে আসছি। যেকোনো ঘটনার আগে, অনুষ্ঠানের আগে, আমি সরাসরি 'মুসহাফ' নিয়ে একটুখানি তিলাওয়াত করে নিই। কোথাও বের হওয়ার আগে, পারিবারিক অনুষ্ঠানের আগে, মুসহাফ (কুরআন শরীফ) খুলে একটুখানি পড়ে নিই। আমার কাছে মনে হয়, কুরআনের ছোঁয়ায় আমার কাজটাও বরকতপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার মানসিক সমস্যা দেখা দিলেও আমি কুরআনের কাছে আশ্রয় নিই। অনেক সময় মন খারাপ থাকলে, কুরআন নিয়ে বসতে ইচ্ছে হয় না। মনে হতে থাকে, আগে মন ভালো হয়ে নিক, তারপর বসব। এটা ভুল চিন্তা। মন ভালো না থাকলে, জোর করে কুরআন নিয়ে বসে যেতে হবে। অনেকে মন খারাপ অবস্থায় কুরআন নিয়ে বসে একটু পর উঠে যায়। মন না বসার অভিযোগ করে। আরে, প্রথম প্রথম মন বসবে না। জোরযবরদস্তি করেই তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। মন সুস্থির হওয়ার পর্যন্ত তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে হবে। মনের কোনো চুঁ-চেরা, গাঁইগুঁইয়ে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

প্রচণ্ড ঠান্ডায় বা অন্য কোনো কারণে অনেক সময় গাড়ির ইঞ্জিন জমে যায়। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলে প্রথম প্রথম স্টার্ট নিতে চায় না। বারবার চাবি ঘোরানোর পর ইঞ্জিন একটু একটু সাড়া দিতে শুরু করে। শেষের দিকে স্টার্ট নিতে নিতেও আবার বন্ধ হয়ে যায়। অনবরত চেষ্টার পর একসময় পুরো স্টার্ট নিয়েও আবার বন্ধ হয়ে যায়। আবার চাবি ঘোরালে পুরোদমে স্টার্ট নেয়। চালক কিন্তু প্রথমেই স্টার্ট নিচ্ছে না বলে হাল ছেড়ে দেয়নি। আবার স্টার্ট নেয়ার পরও গাড়ি চালাতে শুরু করেনি। কিছুক্ষণ ইঞ্জিনকে রগড়াতে হয়। গরম করতে হয়। মনের অবস্থাও তা-ই। পুরো ভালো হওয়ার পর্যন্ত তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে।

আমি কুরআনে ফিরতে যত দেরি করব, আমার কল্যাণ আর বরকতও তত দেরি করে আসবে। আমি দ্রুত কুরআনে গেলে, বরকত-রহমতও দ্রুত দৌড়ে আসবে।

—লুবাইনা ইসরা (মুলতান, পাকিস্তান)

আধুনিকা

অনেক দিন পর এক স্কুলবান্ধবীর সাথে দেখা। মাধ্যমিক পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর একসাথে পড়েছি। একই স্কুলে। কলেজ জীবনে দুই জন দু-দিকে চলে গেছি। অনেক দিন পর, আরেক বান্ধবীর বাচ্চার আকীকার অনুষ্ঠানে ফের সেই বান্ধবীর সাথে দেখা। একদম পুরোদস্তুর আধুনিকা। আমি কলেজ জীবনের শেষদিক থেকেই কুরআনের পথে চলে এসেছি। কথায় কথায় জানতে পারলাম, সেও এই শহরেই থাকে। আসলে দুজনের পথ দু-দিকে হওয়াতে যোগাযোগ থাকেনি। দুজনের চলাফেরার জগৎ ভিন্ন হওয়াতে দেখাসাক্ষাৎও হয়নি। বান্ধবী আমাকে একপর্যায়ে বলল, আমি নাকি কুরআনের পথে এসে, বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে, আমার জীবন ও যোগ্যতার অপচয় করছি। এটা ঠিক, আমি পড়াশোনায় আমার বান্ধবীদের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে ছিলাম। পরীক্ষার নম্বর বিচারে আরকি। বান্ধবী হয়তো সেদিকে ইঙ্গিত করেই কথাটা বলেছে। ফরাসি সংস্কৃতি আমাদের জনজীবনকে কতটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, বান্ধবী ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফরাসি শিল্প-সাহিত্যের বোদ্ধা হয়ে ওঠা বান্ধবীটির কাছে কুরআন আজ 'অপচয়' হয়ে গেছে। অথচ নিষ্পাপ শিশুদের সাথে কুরআনি সময় কাটিয়ে আমি কী যে সুখ অনুভব করি, বান্ধবী কি তার পরিমাণ কল্পনা করতে পারবে? বিদায়ের সময় বান্ধবীকে শুধু এটুকু বলেছিলাম, কুরআন আমার কাছে 'অপচয়' নয়, এক অনন্ত জীবনের সঞ্চয়।

—ওয়াফা হাশারতী (তানজা, মরক্কো)।

হিযব আন্দোলন

আমাদের মহল্লায় আমরা দৈনিক হিযব আদায় আন্দোলন শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ বেশ সাড়া পেয়েছি। বড়দের চেয়ে ছোটদের পক্ষ থেকেই বেশি সাড়া মিলেছে। 'হিযব' আন্দোলন সফল করতে, আমরা সহায়ক আরও নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বার্ষিক। দৈনিক হিযব আদায়ের প্রতিবন্ধক হয় এমন অনেক বিষয় আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। আমরা পাড়ার বিভিন্ন ঘরে পালাক্রমে হিযব আদায়ের জন্য জড়ো হতাম। তিনবেলা। সকালে দুপুরে বিকেলে। দায়িত্বশীল ভাগ করা থাকত। দায়িত্বশীল সবার হিযব আদায় তদারক করত। একসাথে বসে আওয়াজ করে হিযব আদায় করে। দুপুরের পর্বে সদস্যদের হিযব আদায়ের পরিমাণ তুলনামূলক

কম হতো। অথচ শুরুতে আমাদের ধারণা ছিল ভিন্ন। সকালে স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকে, বিকেলে সারাদিনের ক্লান্তি থাকে। দুপুরে এসব নেই। তাই তিলাওয়াতের পরিমাণ বেশি হবে, এমনটাই স্বাভাবিক। সাপ্তাহিক বৈঠকের পর্যালোচনায় বিষয়টা ধরা পড়ল। শুরু হলো হলো কারণ অনুসন্ধান। সবার সাক্ষাৎকার নিয়ে, সবার সাথে বারবার বসে, কয়েক সপ্তাহ নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর ধরা পড়ল, দুপুরে ভরপেট খাবার খেয়ে আসার কারণে সবার মধ্যে একধরনের ঝিমুনি ভাব আসে। ঝিমুনি না আসলেও, পেটভর্তি থাকার কারণে একটু পড়লে হাঁপ ধরে যায়। লম্বা দমে পড়া যায় না। বারবার শ্বাস নিতে হয়। পড়ার গতি ব্যাহত হয়। পড়া আগায় না। আমরা সবাইকে পরামর্শ দিলাম, সুন্নত তরীকায় খাবার খেয়ে আসতে। ভরপেট না খেয়ে পেটের একভাগ খাবার, একভাগ পানি, একভাগ খালি রেখে উঠে যেতে। ভরপেটে কুরআন পড়লে, কুরআনের মজা পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কুরআন পড়তে বলছি না, আমরা বলছি, পুরোপুরি ভরপেট নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে না বসতে এটা পরীক্ষিত।

—রুবাইয়া আফিয়াত (আলজেরিয়া)

দুই বোন

দুই বোনের সম্পর্ক যেমন, তাহাজ্জুদের সাথে কুরআনের সম্পর্কও তেমন। আমি বারবার এর প্রমাণ পেয়েছি। একই বৃন্তে দুটি ফুলের মতো। একই কাণ্ডে দুটি মাথার মতো। কলকাতার বাংলায় যাকে বলে 'হরিহর আত্মা'। যেসব সূরা আমার ইয়াদ থাকতে চাইত না, অল্প অল্প করে তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতাম। তাহাজ্জুদের ছোঁয়ায় সূরাগুলোর তিলাওয়াত ও ইয়াদ একেবারে 'সালসাবীলের' মতো হয়ে যেত। সালসাবীল সতত সাবলীল বহমান জান্নাতের একটি নহর।

—রুকাইয়া আদনান (কানপুর, ইন্ডিয়া)

শূন্যতা পূরণ

যেসব দিনে জাগতিক ব্যস্ততা বেড়ে যায়, তিলাওয়াতের পরিমাণও বাড়িয়ে দিই। দৈনিক বিরদ/হিযব ছাড়া আরও বেশি করে তিলাওয়াত করি। যেদিন বান্ধবীদের সাথে কথাবার্তা বেশি হয়, অহেতুক কাজকর্ম বেশি হয়, সেদিন ভেতরটা কেমন শূন্য খাঁ খাঁ লাগে। আমি এই শূন্যতাকে কুরআন দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি। এই শূন্যতাকে কেউ কেউ গান দিয়ে পূর্ণ করে। কেউ মুভি দিয়ে পূরণ করে। কেউ গল্পের বই দিয়ে পূর্ণ করে। কেউ টিভি সিরিয়াল দিয়ে পূর্ণ করে। আমার বান্ধবীদের কথা বলছি। তাদের সাথে আমি এ-বিষয়ে কথা বলে দেখেছি। ঘটনাচক্রে একবার এই শূন্যতা 'হারাম' দিয়ে পূর্ণ হলে, সহজে সেখানে কুরআন প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় না।

আল্লাহর খাস রহমতে জোর করে কেউ হারামপূর্ণ অন্তরে, কুরআন প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে, বিস্ময়কর ফল হয়। হারামের রাজ্যে কুরআন রীতিমতো যুদ্ধ করে 'হালালের' জন্য জায়গা তৈরি করে নেয়। আরও হালাল আসার সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যস্ততা আর গল্পগুজবময় দিনগুলোতে আমারও ইচ্ছে জাগে বান্ধবীদের মতো একটু 'গা-ভাসাতে'। ওদের সাথে গলা মেলাতে। না, সরাসরি হারাম কিছু নয়। এই ওদের মতো চলতি ফ্যাশন নিয়ে কথাবার্তা, রান্নাবান্না, গহনাগাটি নিয়ে আলোচনা। আমি ওদের সাথে এসব নিয়েও আলোচনায় মাতি না। চেষ্টা করে এসব এড়িয়ে যাই। আমি দেখেছি, এসব কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত গুনাহের আলোচনার দিকে মোড় নেয়। একবার এসে মজাদার আলাপে মজে গেলে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। বন্ধুত্বের খাতিরে হলেও চালিয়ে যেতে হয়। বাসায় ফিরে দেখি কুরআনের সাথে আমার কেমন এক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। কুরআন কারীম এক অদ্ভুত কিতাব। কুরআনের সাথে নিয়মিত লেগে থাকলে কলবে গুনাহের হালকাতম ছোঁয়াও টের পাওয়া যায়।

বান্ধবীদের মায়া কাটিয়ে যেদিন কুরআন কারীমকে প্রাধান্য দিতে পারি, সেদিন আমার মধ্যে অবিশ্বাস্য এক শক্তির 'তড়ফ' অনুভব করি। ওই শক্তির তোড়ে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও দূর করতে পারছিলাম না, এমন কোনো বদভ্যেস কাটিয়ে ওঠার শক্তিও পেয়ে যাই। আগে যখন বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে গেমস খেলতাম, তখন দেখতাম শত্রুর আঘাত এড়িয়ে, প্রতিপক্ষকে মারতে পারলে, শক্তি যোগ হয়। যত শত্রু নিধন হয়, ততই শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুরআনবিরোধী আড্ডাগল্প এড়িয়ে কুরআনে সমর্পিত থাকতে পারলেও, আমার মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি হয়। —জূরী নাকা (তিউনিস)।

কুরআনের বান্ধবী

ইয়া রাব্বী, আপনার প্রশংসা শেষ করা যাবে না। আপনার যথাযথ ইবাদত করতে পারছি না। আপনার নেয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে পারছি না। আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আপনার উপযুক্ত প্রশংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন, আপনি তাই। আপনি আমাকে কুরআন কারীম দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আপনার। এমন নেয়ামত পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। আপনার খাস অনুগ্রহেই আমি এই নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি।

ইয়া আল্লাহ, আমাকে কুরআনের বান্ধবী বানিয়ে দিন। কুরআনকে আমার বন্ধু বানিয়ে দিন। কুরআনের সাথে থাকাকে আমার জন্য শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আনন্দের উৎস বানিয়ে দিন। কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। কুরআনের মাধ্যমে আমাকে হেদায়াত, তাকওয়া, সুবুদ্ধি ও প্রাচুর্যের রিযিক দান করুন।

কুরআনের উসীলায় আমাকে দুনিয়াবিমুখ বানিয়ে দিন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত আমার জীবনকে কুরআনের সাথে জড়িয়ে রাখুন।

—দুআনাহ্ তাহনিয়া (মরক্কো)

কুরআনের মৌমাছি

মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমি একটি মৌমাছি। এক ফুল থেকে আরেক ফুলে, এক সূরা থেকে আরেক সূরায় উড়ে উড়ে মধু আহরণ করছি। নিজেকে সুন্দর একটি প্রজাপতির মতো লাগে। উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। কখনো সূরা নামলে, কখনো সূরা নূরে, কখনো আহ্যাবে। আমি এক পাখি। প্রতিদিন আমার সামনে অনেক অনেক আকাশ উড়ে আসে। কুরআনের আকাশ। সূরার আকাশ। আমার আকাশকে আমি বড্ড ভালোবাসি। নিজে তিলাওয়াত করতে বসলে, কারও তিলাওয়াত শুনলে, মনে হয় যেন ডানা ঝাপটে আমি কোনো এক সুদূরপানে উড়ে চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। আলহামদুলিল্লাহ্। —উনাইসাহ্ হাম্মুদাহ্ (রাবাত, মরক্কো)

গায়েবী ব্যবস্থাপনা

কয়েকদিন যাবৎ, একটা বিষয় নিয়ে মনটা ভার ভার হয়ে ছিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাচ্ছিলাম না। একটা অবাক করা বিষয় ধরা পড়ল। কুরআনি হিযব বাদ দিলেই এমন ঘটনা ঘটে। প্রতিদিনের হিযব আদায় করতে বসলে, মনভার ভাব কেটে যায়। মনে কোনো খটকা থাকে না। এভাবে অনেক মানসিক সমস্যার সমাধানই আমি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে পেয়ে গেছি। কোনো মানবের সাহায্য ছাড়াই। সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সমাধান মিলে গেছে গায়েবী ব্যবস্থাপনায়! কুরআনের সামনে সমস্ত সমস্যাই 'পানি'। আগুনের সামনে মোম যেমন। কুরআনের সাথে জীবন বড় সহজ আর সুন্দর। আনন্দময়! —লাবীবাহ্ সাখলুন (দিল্লি, ইন্ডিয়া)

হিফযের নসীহাহ্

হিফযে আগ্রহী ভাইবোনের প্রতি এক বোনের বার্তা :

১. হাফেযে কুরআন অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য লালায়িত হয় না! কারও পদ নিয়ে টানাটানি করে না। অন্যের জিনিস নিজের জন্য কামনা করে না।

২. হাফেযে কুরআন কারও সাথে ঝগড়া করে না। কারও সাথে অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয় না। নিজে হকের ওপর থাকলেও, নিজের মত প্রতিষ্ঠায় তিক্ত ঝগড়ায় নেমে পড়ে না। হাফেযে কুরআন শুধু আল্লাহর দিকেই তাকায়। আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে। আল্লাহ্ তো তাকে জানেন। অন্যের সাথে ঝগড়া করে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় সময় কোথায় তার?

৩. আল্লাহর কালামের সাথে থাকতে পারছে, আল্লাহ সাথেই আছেন, এই শক্তি আর সম্পদই হাফেযে কুরআনের জন্য যথেষ্ট। দুনিয়াতে আর বাড়তি কিছু হাফেযে কুরআনের চাওয়ার থাকে না।

৪. হাফেযে কুরআনও মানুষ। ভুল করে, ভালো করে। ভালো করলে শুকরিয়া-হামদ আদায় করে। ভুল করলে তাওবা-ইস্তেগফার করে নেয় সাথে সাথে।

৫. হাফেযে কুরআন যতটুকু কুরআন শেখে ও হিফয করে, ততটুকু সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পঠিত ও হিফযকৃত আয়াতের ওপর আমল করা, বাড়তি হিফয করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শেখা ও জানার সাথে সাথে আমল করতে হবে। পাশাপাশি হিফয বাড়াতে পারলে ভালো।

৬. হাফেযে কুরআনের সম্মান আল্লাহর কাছে। দুনিয়ার কোনো কিছুই হাফেযে কুরআনের সম্মান আদায় করতে সক্ষম নয়। হাফেযে কুরআনের দৃষ্টি উচ্চাশা সব সময়ই উর্ধ্বমুখী। আল্লাহমুখী। তারকারাজ্যের নিচে হাফেযে কুরআনের দৃষ্টি নামেই না। হাফেযে কুরআন সর্বদা শয়তান ও নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। হাফেযে কুরআন সর্বদা পরিশ্রমী। অন্যের অনুকরণীয় আদর্শ।

৭. হাফেযে কুরআন তার কলবে কালামুল্লাহর নূর বহন করে। কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তার কলবে স্থান দেয়া উচিত নয়। কুরআনের সাথে মানানসই নয়, এমন কিছু কলবে থাকলে, বের করে দেয়াই হাফেযে কুরআনের বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার কোনো হারাম স্বাদ-মজা হাফেযে কুরআনের কলবে ঠাঁই পাওয়ার কথা নয়।

৮. অন্যরা কে কী বলল, হাফেযে কুরআন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। প্রশংসা করা হলে, তাকে আত্মম্ভরিতা পেয়ে বসে না। মানুষের প্রশংসা পেয়ে হাফেযে কুরআন আরও বেশি বিনম্র হয়। আল্লাহর প্রতি বিনয়-আনুগত্যে নুয়ে পড়ে। হাফেযে কুরআন জানে, তার যা কিছু কুরআনি অর্জন, সবই আল্লাহর অনুগ্রহ (قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ) বলে দিন, আল্লাহ চাইলে আমি এ-কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না (ইউনুস, ১৬)। বুকে কুরআন ধারণ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছায়।

—আয়িশা তুরকীয়াহ (তায়েফ, সৌদি আরব)

কুরআনমগ্নতা

আমার স্বামীর কুরআনমুখিতা দেখে বড় ঈর্ষা জাগে। কুরআনই যেন তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞানযপ। রাতদিন নেই, সুযোগ পেলেই কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দেন। একটু ফাঁক পেলেই আগে যতটুকু পড়েছিলেন, তারপর থেকে শুরু করেন।

বিড়বিড় করে। গুনগুন করে। সুর করে। একা হলে জোর আওয়াজে। মাশাআল্লাহ, তার লাহানও বেশ সুন্দর। শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে। তিনি পড়েন আমি শুনি। দুজনে হাঁটতে বেরোলে তিনি তিলাওয়াত করেন। আমি পাশে হাঁটতে হাঁটতে চুপটি করে শুনি। হাত ধরাধরি করে। গাড়িতে বসেও তিনি তিলাওয়াত করেন। পছন্দের কারীর তেলাওয়াত চালিয়ে দিয়ে তার সাথে সাথে পড়তে থাকেন। সিগন্যালে আটকা পড়লে, কেরাত বন্ধ করে খালি গলায় পড়েন। বাড়িতে সময় থাকলে নিজের তিলাওয়াত রেকর্ড করে রাখেন। গাড়িতে বসে শোনেন। যাচাই করেন। পরীক্ষা করেন। আমার মতামত জানতে চান। মনে মনে বলি, ইস্ আমি যদি আমার স্বামীর এই গুণটা রপ্ত করতে পারতাম!

উমামা রিফাঈ (কায়রো, মিসর)

নিত্যসঙ্গী কুরআন

একবার সফরে যেতে হয়েছিল। কয়েকদিনের পথ। তিলাওয়াত করতে পারিনি। মনে ভয় জাগল—এই ফাঁকে যদি আমার হিফয ছুটে যায়? গন্তব্যে পৌঁছার পরও অনেকের সাথে দেখাসাক্ষাতের কারণে কুরআন নিয়ে বসতে পারছিলাম না। ভয়ের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলছিল। হায়, এই বুঝি কুরআন আমাকে ছেড়ে চলে গেল! ব্যস্ততা কমলে কুরআন নিয়ে বসলাম।

মুসহাফ খুলতেই চোখে পড়ল (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে সেটা আল্লাহরই দিক (বাকারা, ১১৫)। ভয় কেটে গেল। আমার আল্লাহ আমার সাথেই আছেন। তিনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি যেখানেই থাকি, আল্লাহর ইলম ও কুদরতের আওতাতেই আছি। তার কুরআনও আমার সাথে থাকবে। এত সাত তাড়াতাড়ি আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। ইন শা আল্লাহ।

—সু'আদ যালমীর (তানজা, মরক্কো)

ইয়া হাসরাতান

একটা আয়াত আমাকে একবার বড্ড নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তখন আমি কুরআন থেকে অনেক দূরে ছিলাম। দ্বীন থেকেও দূরে সরে গিয়েছিলাম। একদিন পাশের গাড়িতে বাজতে শুনলাম, শায়খ সউদ শুরাইমের কণ্ঠে (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ) আফসোস এসব বান্দার প্রতি (ইয়াসীন, ৩০)।

মনে কী যে হয়ে গেল জানি না। আমার নিজেরও আফসোস হতে লাগল। আমিও তো এই দলে। কুরআনের এই বাক্য আমার ক্ষেত্রেও খাটে। সারাদিন মনের অলিগলিতে ঘুরপাক খেতে লাগল 'ইয়া হাসরাতান...। আল্লাহ আমার অন্তর আবার খুলে দিলেন। আমি আবার কুরআনের পথ ধরলাম। কুরআনমুখী হলাম।

আলহামদুলিল্লাহ। সুবহা-নাল্লাহ! কুরআনের একটি বাক্যও কত শক্তিশালী। কুরআনের প্রতি বাক্যের কী দাপট! কী প্রতাপ! —উম্মে আহনাফ (ব্রুনেই)।

কুরআনের নেশা

আমার এক বান্ধবী ছিল, তাকে আমার খুবই ভালো লাগত। তার সঙ্গ আমার জন্য খুবই উপকারী ছিল। কুরআন ছিল সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সে স্কুলের পড়ার পাশাপাশি কুরআন হিফয করত। আমরা বাগানে খেলতে গেলেও সে কুরআন পড়ত। আমাকে পড়া ধরতে বলত। স্কুলে আমরা গল্পে মজে গেলেও সে বেঞ্চের এককোণে বসে কুরআন পড়ত। কোত্থেকে যে সে এই নেশা পেয়েছিল, আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম। আজ আমি কুরআন পড়ি, সেটা তারই পরোক্ষ অবদান। একটি আয়াত আমার বারবার মনে পড়ে,

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ

আচ্ছা বলো তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে ফাসেক? (বলাবাহুল্য) তারা সমান হতে পারে না (সাজদা, ১৮)।

এখানেও আমার অনেক বান্ধবী হয়েছে। কিন্তু এ যে আল্লাহ বললেন (لَّا يَسْتَوُونَ) আসলেই তা-ই। সে ছিল আমার জন্য রহমতস্বরূপ। কিছু বন্ধু আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবেই জীবনে আসে। আবার কোথায় হারিয়ে যায়। রেখে যায় কিছু স্মৃতি। কিছু ব্যথা। কিছু প্রাপ্তি। যারা কুরআন হিফয করে, এ জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা করে, অন্যদের সাথে তাদের তুলনাই চলে না। এমন বন্ধু আল্লাহর পক্ষ থেকে গনীমত। তারা আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন্ত বার্তা হয়ে আসে। আমাকে ভালো করার জন্য আল্লাহ তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। —বুশরা ইয়াদী (আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর)

বুড়ি ছাত্রী

আমি এক 'তাহফীযুল কুরআন হালাকার' শিক্ষিকা ছিলাম। আমার শাখায় ছিল বয়স্ক মহিলারা। যাদের বয়েস ৪৫ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। হিফযের পাশাপাশি আমাদের মধ্যে তাদাব্বুর-তাফসীর নিয়েও কিছু সময় কথাবার্তা হতো। এক 'হাজ্জার' বয়েস সত্তরের ওপরে। হেফয করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, একটা আয়াত পড়ে বড় বেশি ভয় লাগছে,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না। এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (মারয়াম, ৭১)।

তাহলে কেউই বাঁচতে পারবে না? জি না, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীগণকে বাঁচিয়ে দেবেন। সবাই ওপর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। যে যার আমলনামা হিসেবে দ্রুতগতিতে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। অথবা মুত্তাকীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করলেও, জাহান্নামকে তাদের জন্য —সে পরীক্ষামূলক সময়ে— শান্তিময় করে দেবেন আল্লাহ তা'আলা। এর কিছুদিন পরই 'হাজ্জাহ' ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন খুবই ইবাদতগুজার। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হিফয করতে পারেননি। কিন্তু আমরা সবাই আশাবাদী, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হাফেয হিসেবে কবর থেকে তুলবেন। বয়েসের কারণে মনে রাখতে পারতেন না। কিন্তু চেষ্টায় বিন্দুমাত্র কসুর করতেন না। তার দেখাদেখি আমাদের হালাকায় আরও অনেক বৃদ্ধা যুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে তার ইন্তেকালের পর, এলাকায় তিনি বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন পুণ্যময় কার্যক্রম আর হিফযুল কুরআনের জন্য বিস্ময়কর চেষ্টা-মুজাহাদার কারণে। কুরআন কারীম হিফযের পেছনে তার অতুলনীয় মেহনত অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করত। ইন্তেকালের পর আরও বেশি করছে। বলতে গেলে এলাকার প্রতিটি মহিলাই এখন হাফেয হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। যারা নিয়মিত দ্বীন অনুশীলন করে না, তারাও এলাকার 'চলতি হাওয়ার' প্রভাবে হিফয শুরু করে দিয়েছে বা দেয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে।

—হাবীবা বুরকাবী (আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া)

সাগর তীরে

ছোট্ট একটি পদক্ষেপ থেকেই বড় কাজের সূচনা হয়। এক হাজার মাইল দূরের গন্তব্যযাত্রাও শুরু হয় ছোট্ট একটি পদক্ষেপ নিয়ে আমি কুরআনের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলাম একটি হাদীসের মাধ্যমে। আমাদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, আগে পড়ে যাওয়া আপুরাও উপস্থিত থাকেন। আমাদের শিক্ষাসফর ছিল আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত বাদশাহ হাসান মসজিদে। আমাদের এক আপুর বাবা-মাও সেই মসজিদের সাথে কর্মসূত্রে সম্পৃক্ত ছিলেন। আপু আমাদের তার মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপুর আম্মু কুরআনের হাফেযা। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছুর আয়োজন করেছিলেন। খাবারের মাঝেই তিনি এক অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। তিনি গল্পচ্ছলে আমাদের একটা হাদীস শোনালেন,

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

আল্লাহর যার ভালো চান, তাকে দ্বীন শিক্ষা দেন।

আমাদের স্কুল ছিল পুরোই সেক্যুলার। সরাসরি প্যারিস থেকে পরিচালিত হতো। সিলেবাসও পুরোপুরি ফরাসি ছিল। ধর্মের কিছুই ছিল না। আল্লাহর অদৃশ্য কোনো ইশারায় হয়তো স্কুল কর্তৃপক্ষ মসজিদ দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপুর আম্মু আমাদের আরেকটি হাদীস শোনালেন,

لا تحقِرَنَّ مِن المعروفِ شيئًا ولو أنْ تلقى أخاكَ بوجهٍ طَلْقٍ

কোনো ভালো কাজকেই খাটো করে দেখো না, হোক না সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা।

আমরা তার কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। হাদীসের ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার খাবার তুলে দিচ্ছিলেন। এবার তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কুরআনে হাফেয হতে চাও? এমন প্রশ্নের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা চুপ করে রইলাম। তিনি আবার বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাদের একটা দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছি। দোয়াটা তোমরা সবাই পারো। তারপরও আমার সাথে আরেকবার পড়ো। এই বলে তিনি (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) দোয়াটা পড়ালেন। তারপর বললেন, মনে করো তোমাদের কুরআন হিফয শুরু হয়ে গেছে। এই একটা দোয়াও তোমাদের আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তুলতে পারে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন (واتقوا النار ولو بشِقِّ تمرةٍ) খেজুরের একটা অংশ সাদাকা করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। আল্লাহকে ভালোবেসে করলে, ছোট্ট কাজও মুক্তি এনে দিতে পারে। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, অল্প অল্প করে কুরআন কারীম হিফয করে ফেলবে। দেখবে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই পুরো কুরআন হিফয হয়ে গেছে।

আপুর বাসাতেই আমাদের কয়েকজন প্রতিজ্ঞা করল, তারা কুরআনের হাফেয হবে। সেই থেকে আমি লেগে আছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার হিফয প্রায় শেষের দিকে। আনন্দের বিষয় হলো, আপুর আম্মু আমাদের সবার ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি ফোন করে আমাদের হিফযের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিতেন। আব্বু-আম্মু ভীষণ খুশি হয়েছিলেন তার চেষ্টা আর আগ্রহ দেখে। আব্বু-আম্মু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্কুল ছুটি থাকলে আমাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে আপুদের বাসায় যাবেন। যতটুকু মুখস্থ হয়েছে সেটা সরাসরি মুখোমুখি শুনিয়ে আসতে। আমার দেখাদেখি আরও বান্ধবীরাও তা-ই করতে শুরু করল। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে বেজায় নাখোশ হলো। আমরা প্রস্তাব তুললাম স্কুলে হিফযের জন্য একটা পিরিয়ড রাখতে হবে। অনেক চেষ্টার পর আমরা সফল। এখন আমাদের স্কুলেই আমরা হিফযের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাই। আমার তিন জন বান্ধবী আমার আগেই হাফেয হয়ে গেছে। আমি পিছিয়ে পড়েছি। দুঃখে-কষ্টে আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। সবার কাছে দোয়া চাই, শীঘ্রই যেন হাফেয হয়ে যেতে পারি। —রুফাইদা ঈমান (ক্যাসাব্লাঙ্কা, মরক্কো)।

হৃদয়পটে কুরআন

পুরো কুরআনই আমার প্রিয়। আলাদা করে কোনো আয়াত মনে পড়ছে না। কোনো সূরাও নয়। কুরআন কারীম আমার হৃদয়পটে আঁকা থাকে ছবির মতো।

প্রতিটি আয়াত আমার মধ্যে আলাদা ছাপ ফেলে। আলাদা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কিছু আয়াত নির্দিষ্ট ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। কিছু আয়াত স্মৃতিকে উস্কে দেয়। জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে কোনো-না-কোনো আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছি। যখনই আয়াত পড়ি ঘটনার কথা মনে পড়ে। যখন এ ধরণের ঘটনা ঘটে, আয়াতটা মনে পড়ে। জীবনটাকে বড় সুন্দর আর অর্থবহ মনে হয়। তৃপ্তি আর সুখের মনে হয়। — হানা লুবনানী।

আকসাকন্যা

আমার একটি একান্ত নিজস্ব খেলা আছে। আমার মন খারাপ থাকলে, কোনো সমস্যা দেখা দিলে, মনটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলে, খেলাটা খেলি। আসলে খেলা বলা ঠিক নয়। তবে আমি এটাকে মন ভালো করার খেলা হিসেবে নিয়েছি। আমার জন্য খেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মন খারাপ থাকলে, আমি খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করি, পরের ওয়াক্তে মসজিদে ইমাম সাহেব প্রথম রাকাত কোন আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন। এলাকার মসজিদের পাশাপাশি হারাম শরীফে কী পড়া হয়েছে সেটাও জানার চেষ্টা করি। ইমাম সাহেব যে আয়াত পড়েন, সেটাতে আমার মন ভালো করার মতো ওষুধ পেয়ে যাই। আয়াতটার তাফসীরে আমার সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই। এই আজকের কথাই ধরুন না। আব্বু চাচ্ছেন তার পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে। আম্মু চাচ্ছেন আরেকজন দ্বীনদার পাত্রের সাথে আমার বিয়ে দিতে। আমারও দ্বীনদার পাত্রই পছন্দ। এ-নিয়ে পরিবারে চাপা উত্তেজনা। আমারও মন খারাপ। সামনে পরীক্ষা মাথার ওপর। পড়ালেখায় মন বসছে না। আমার একান্ত নিজের খেলার জগতে ফিরে গেলাম। ঠিক করলাম, ইমাম সাহেব ফজরে প্রথমে কোন আয়াত পড়েন, সেটাতেই আমার সমাধান খুঁজব। আব্বুকে জোর করে মসজিদে পাঠালাম বলে রাখলাম মোবাইলে কল দিয়ে সলাতে দাঁড়াতে। আমাদের বাসা থেকে কুদস হাঁটার দূরত্বে। আব্বু মসজিদে আকসায় গিয়ে ফজর ধরলেন। আমি তীব্র উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছি। ইমাম সাহেব কোন কেরাত পড়বেন? সূরা ইউসুফ? বনী ইসরাঈল? নাকি আজ ইন্তেফাদা দিবস হিসেবে জিহাদের কোনো আয়াত পড়বেন? সূরা ফাতিহা শেষ হলো। আম্মুও আমার খেলার কথা জানেন। তিনিও তীব্র কৌতূহল নিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। ভেসে এল প্রিয় শায়খ সালাহুদ্দীন আবু আরাফার সমধুর তিলাওয়াত,

طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

তোয়া-হা। আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন (তোয়াহা, ১-২)।

আমার আগে আম্মুই আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠলেন। পেয়ে গেছি উত্তর। আমার উস্তাযাহ হানাদি হালাওয়ানিও বলেন, সমস্যা হলেই কুরআনে ফিরে আসবে।

আমিও কুরআন নিয়ে বসে পড়লাম। মনের ভার কেটে যেতে লাগল। পৃথিবীর সূর্যের পাশাপাশি মনের সূর্যও উদিত হতে থাকল। আব্বুও কী মনে করে, ফজর পড়ে এসেই ঘোষণা দিলেন, মায়ের পছন্দের পাত্রের সাথেই আমার বিয়ে দেবেন। এটা কি কুরআনের প্রভাব? নাকি কুদসের? নাকি ফজরের জামাতের?

—সাফিয়া শাত্বী (কুদস)

অদৃশ্য দেয়াল

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, নিয়মিত বিরদ-হিযব আদায় করলে, অনেক অনেক উপকারিতা। নিজে নিয়মিত হিযব আদায় করতে গিয়ে দেখি, আরও বহু উপকারের কথা লেখাই হয়নি আদৌ।

নিয়মিত 'হিযব' পাঠ করলে, নিজের চিন্তার পুনর্নিরীক্ষার সুযোগ ঘটে। নিজের বদ্ধমূল ধারণাবিশ্বাসগুলোর ভিতে ঘা পড়ে। পুরোনো ভ্রান্তচিন্তা ঝরে পড়া পালকের মতো পড়ে যায়। নতুন বিশুদ্ধ চিন্তা দানা বাঁধে।

নিত্য হিযবের সাহচর্যে মনোজাগতিক উথালপাথাল অবস্থা থিতু হয়ে আসে। উড়ুক্কু মনে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় উপকার হয়—গুনাহ ও তিলাওয়াতকারীর মাঝে অদৃশ্য এক দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

—মানাল রূহ (আলজেরিয়া)

ভালোবাসার সূরা

আমার অবস্থাও প্রায় এমনই। একসাথে অনেক সূরাকে ভালোবেসে ফেলি। জীবনের একেকটি ঘটনা সামনে আসে, একটি সূরা প্রসঙ্গক্রমে ভালো লাগতে শুরু করে। কখনো গাফির, কখনো ইয়াসীন, কখনো ইউসুফ, কখনো তোয়াহা, কখনো ইসরা, কখনো শুরা, কখনো নিসা, কখনো মুহাম্মাদ, কখনো ওয়াকিয়া, কখনো মুযযাম্মিল। এভাবেই জীবন বয়ে চলেছে। ভালোবাসাও বদলাচ্ছে। একেকটি সূরা একেকটি জীবন। একেকটি জগৎ। একেকটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। নতুন ভালোবাসার সাথে সাথে আমার চিন্তার জগৎও বদলে যায়। কিছুদিন বদলে যাওয়া জীবনে ডুবে থাকি। আবার নতুন ভালোবাসা আসে জীবনে। কখনো দুখান হয়ে, কখনো 'সূরা রহমান' বেয়ে, কখনো হুজুরাত ধরে। জীবন চলছে। ভালোবাসায়। ভালোবেসে।

—মীম রাহমা (মরক্কো)

হিযবের বৈচিত্র্য

দৈনিক হিযব আদায় করতে গেলে, একটি বিষয় আমাকে ভীষণ অবাক করে, প্রতিবারই একেকটি আয়াত, ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। আগের খতমে

আয়াতখানা অতিক্রম করার সময় যে ভাব-ভাবনা জেগেছিল, এবারের খতমে সম্পূর্ণ নতুন আরেক অর্থময়তা নিয়ে আয়াতখানা সামনে এসেছে। এই আয়াতে আগেরবার যে রহমত, নূর আর হেদায়াতের ছোঁয়া পেয়েছিলাম, এবারের রহমত, নূর আর হেদায়াতের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটি আয়াতই অফুরন্ত রহমত নূর আর হেদায়াতে ভরপুর। যারা খেয়াল করে, অনুভব করে করে তিলাওয়াত করে, তারাই শুধু এই বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়। একটি আয়াত যতবার তিলাওয়াত করি, প্রতিবারই আমার নাফস-কলব নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

—আসমা আবদুল্লাহ (জর্দান)

উপলব্ধি ও সান্ত্বনা!

১. একবোনের কথাটা কথাটা বেশ ভালো লেগেছে। তার গভীর উপলব্ধিটা হৃদয় ছুঁয়েছে। রাস্তাঘাটে কিছু মন্দ পুরুষের অশোভন আচরণে গাড়ি-ঘোড়ায় বোনেরা অতিষ্ঠ। খারাপ লোকগুলোর বিকৃতি রোধ করার কার্যকর কোনো উপায় বের করা যাচ্ছে না।

২: বোনটি বললেন,

'যখন কোনো পুরুষের বিকৃত আচরণের কথা পড়ি, আর রাস্তাঘাটে বেপর্দা আর অরুচিকর পোশাকে কোনো নারীকে দেখি, প্রথমেই আমার কুরআন কারীমের একটি আয়াতের কথা মনে পড়ে,

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

এবং তাদের একটু দাঁড় করাও। কেননা তাদের জিজ্ঞেস করা হবে (সাফফাত, ২৪)।

৩. কেয়ামতের দিন অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নেয়ার আগে দাঁড় করিয়ে হিশেব নেয়া হবে। অপরাধীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। দুর্বল-অসহায়দের এই আয়াত মনে রাখলেই, মনে সান্ত্বনা আসবে। অপরাধীদের চরম দৌরাত্ম্যেও নিজেকে অসহায় মনে হবে না। কারণ, তারা একদিন জিজ্ঞাসিত হবেই হবে।

—উরওয়া উসকা (কাতার)।

তাদাব্বুরে কুরআন!

[কুরআন তাদাব্বুর নিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু কথা বলা হয়েছে। লেখাটা একটু বড় হয়ে গেছে, তবুও ধৈর্য ধরে পড়ার বিনীত নিবেদন রইল। রাব্বে কারীম তাওফীক দান করুন।]

১. দাল-বা-রা (دبر) এই তিন হরফ যোগে গঠিত শব্দ কুরআন কারীমে সাত ধরনের শব্দে সর্বমোট ৪৪ বার এসেছে। এই শব্দমূলের মূল অর্থ : পেছন দিক। পরে আসা।

২. তাদাব্বুর (تَدَبُّر) অর্থ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। অনুধ্যান করা। সাধারণত কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তাদাব্বুর বলে।

এককথায় বলতে গেলে, তাদাব্বুর মানে, কুরআনের অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা। কুরআনের প্রভাবে কলব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইতিবাচক পরিবর্তনকে আল্লাহমুখী আমলে রূপান্তর করা।

৩. একটা কথা শুরুতেই বলে রাখি, কুরআন কারীম অর্থ না বুঝে পড়াও একটা ইবাদত। প্রতি হরফে দশ নেকি।

৪. কুরআন কারীম নাযিল করা হয়েছে, হেদায়াতের জন্যে। না বুঝলে কীভাবে হেদায়াত আসবে? সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কুরআন বোঝার মেহনত শুরু করা জরুরি।

৫. কুরআন বোঝার মেহনত শুরু করার আগে কিছু ধাপ আছে। সেগুলো অতিক্রম না করে, কুরআন বুঝতে যাওয়া নিরাপদ নয়। ফলপ্রসূও নয়।

৬. এই কুরআন ছোট্ট শিশু পড়ে, অবুঝ বালক পড়ে। কিছু না বুঝেই তারা পড়ে। তাবীল-তাদাব্বুর সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু বড় হওয়ার পরও এভাবে না বুঝে পড়তে থাকা যুক্তিসংগত নয়। ধর্মসংগতও নয়। একটু একটু করে হলেও বোঝার মেহনত শুরু করা উচিত।

৭. কুরআনের তাদাব্বুর শরীয়তের যাবতীয় ইলমের চাবিকাঠি। তাদাব্বুরের মাধ্যমে কুরআন থেকে কল্যাণকর দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়। ঈমান বৃদ্ধি পায়। কলবে নূর বৃদ্ধি পায়।

৮. মানুষ ডাক্তারি বিদ্যার বই পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই পড়ে, অন্য আরও বিদ্যার বই পড়ে। বোঝার জন্যেই পড়ে। পঠিত বইয়ের তথ্যজ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ

করার জন্যে পড়ে। তাহলে কুরআনকে কেন না বুঝে পড়া হবে? কুরআন থেকেই তো সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা হয়। ভালো ও মন্দ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ হয়। ধর্ম ও অধর্ম চেনার উপায় জানা হয়। অন্য বই অর্থ বোঝা ছাড়া পড়ে কোনো লাভ নেই কিন্তু কুরআন অর্থ বোঝা ছাড়া পড়লেও সওয়াব মেলে। তাই বলে শুধু পড়ার সওয়াব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কুরআনের হক আদায়ে যথেষ্ট নয়।

৯. একটা পাহাড়ের কথা কল্পনা করি। যদি কুরআন তার ওপর নাযিল হতো, সেটা ভয়ে ভারে চুরমার হয়ে যেত। পাহাড়ের তুলনায় মানুষের হৃদয় ছোট্ট একটি দানার মতো। কত কত কুরআন পাঠ শোনে, তবুও কেন বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না? কারণ একটাই, তাদাব্বুর করে না।

১০. ধীরে ধীরে কুরআন পাঠই তাদাব্বুরের জন্যে সহায়ক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তিলাওয়াত করতেন, উম্মে সালামা রা. অনুকরণ করে দেখিয়েছিলেন। সেটা ছিল ধীরে ধীরে তিলাওয়াত। প্রতিটি হরফকে আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট তিলাওয়াত। আনাস রা. বলেছেন, 'নবীজির তিলাওয়াত ছিল ধীরগতির। টেনে টেনে। থেমে থেমে।' ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেছেন,

আমি একবার ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে সফরে গিয়েছি। মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা দিয়েছি। তিনি রাতের কিছু অংশ নামাজ পড়ে কাটাতেন। নামাযে দীর্ঘ সময় নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন; প্রতিটি হরফকে আলাদা করে উচ্চারণ করতেন। কুরআন পড়তে পড়তে কাঁদতেন। দূর থেকেও তার ফোঁপানোর আওয়াজ ভেসে আসত। একবার ইবনে আব্বাস রাতে নিম্নোক্ত আয়াতটা তিলাওয়াত করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ,) এটাই সে জিনিস, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে (ক্বাফ, ১৯)।

তিনি এত বেশি কাঁদতেন, তার চোখের নিচে দাগ পড়ে গিয়েছিল : অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার জায়গাটা দেখতে অনেকটা চামড়ার পুরোনো ফিতার মতো দেখাত। (সিয়ার, ৩/৩৫২)।

১১. তাদাব্বুর করে করে কুরআন পড়ো। তাহলে অর্থ বুঝতে পারবে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদাব্বুর করো। আমলের নিয়তে পড়ো। অমনোযোগী হয়ে পড়ো না। পরিপূর্ণ সচেতনতার সাথে পড়ো। কোনো আয়াতে সন্দেহ লাগলে আলিমের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নাও।-ইবনে বায রহ.।

১২. আজ কুরআনবিমুখ মানুষের ছড়াছড়ি। কুরআন মেনে চলা মানুষ আজ চারদিকে লাঞ্ছিত। কুরআনের দিকে আহ্বানকারী আজ উপেক্ষিত. এটা দেখে তুমি

ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেয়ো না। প্রকৃত জ্ঞানী সাহসী ব্যক্তি সমালোচকদের ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় না। -শায়খ শানকীতি রহ.।

১৩. কুরআন পাঠকারীর মূল ভূষণ হবে বিনয়। নম্রতা। কুরআন দ্বারা তার চিত্ত উন্মুক্ত হবে। হৃদয় হবে আলোকিত। সালাফ একটি আয়াত নিয়েই পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদের কত রাত কেটে গেছে কুরআনের তাদাব্বুরে!

-ইমাম নববী রহ.।

১৪. একজন বুদ্ধিমান মুমিনের জন্যে কুরআন হবে আয়নার মতো। আয়নায় চেহারা দেখা যায়। সুন্দর অসুন্দর ফুটে ওঠে। কুরআন পাঠের সময়ও নিজের ভালো দিক মন্দ দিক স্পষ্ট হয়। কোনো আয়াতে ভালো একটা গুণের কথা আলোচিত হলে, আমার মধ্যে গুণটা আছে কি না, সেটা ধরা পড়ে। একজন মুমিন তিলাওয়াত করার সময়, ভয়ের আয়াত এলে ভয় পায়। আশার আয়াত এলে আশান্বিত হয়। কুরআনকে এভাবে পাঠ করলে কুরআন হবে তার জন্যে সুপারিশকারী। সাক্ষী। বন্ধু। রক্ষাকবচ। আর সে নিজেও হয়ে উঠবে সবার জন্যে উপকারী বন্ধু। দুনিয়া ও আখেরাতে তার পিতামাতার ওপর, তার সন্তানদের ওপর নেমে আসবে কল্যাণ। -ইমাম আ-জুররী রহ.।

১৫. দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। কার জন্যে? আল্লাহর জন্যে। রাসূলের জন্যে। কুরআনের জন্যে। মুসলিম ভাইয়ের জন্যে। কুরআনের জন্যে কল্যাণকামিতা হলো, কুরআনের প্রতি তীব্র ভালোবাসা থাকা। কুরআনের প্রতি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ থাকা। কুরআন বোঝার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকা। কুরআন তাদাব্বুরের প্রতি গভীর মনোযোগ থাকা। কেন? আল্লাহ কী বলেছেন সেটা জানার জন্যে।

১৬. একজন সাধারণ নসীহতকারীর কথা মানুষ বোঝে। তার পক্ষ থেকে কোনো চিঠি এলে তার মূলবার্তা উদ্ধার করতে পারে। বার্তা অনুযায়ী জীবন গড়ে। কুরআন কারীমের কল্যাণকামীও গুরুত্বের সাথে এর বাণী বোঝার চেষ্টা করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বাণীকে যদি আমরা না বুঝে বসে থাকি। এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

১৭. এক আরব অধ্যাপক বললেন, আমার আব্বু ছিলেন হাসপাতালে। বয়সজনিত নানা রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা-অসুখবিসুখ। কথা বলতে পারেন না। ডাক্তার বেশি বেশি ঘুমুতে বলেছেন। কিন্তু আমি যখনই তাকে দেখতে যেতাম, তার হাতে কুরআন দেখতাম! ডাক্তার আপনাকে বেশি বেশি ঘুমুতে বলেছেন। বাছা, কুরআন পড়ার আনন্দে ঘুম আসে না। কয় পারা পড়তে পারেন? সারা দিনে বেশি পড়া যায় না, সাত পারা পর্যন্ত হয়। আমি জানি, আব্বু প্রতিটি আয়াতকে কয়েকবার করে পড়েন। নিজেকে প্রশ্ন করেন। অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবেন।

১৮. কুরআনের সুর কী চমৎকার! কী মোহনীয়! কী কমনীয়! পাথরহৃদয়কেও নরম করে দেয়। কোমল করে দেয়। ভিজিয়ে দেয়। কুরআনের সামনে কোনো অহংকারী দাম্ভিক টিকতে পারে না। কাফের-মুনাফিক নাস্তিকও দাঁড়াতে পারে না। কুরআন হলো জীবন-নদী। প্রাণদায়িনী বারিধারা, উচ্ছল ঝরনা। আল্লাহর কাছ থেকে বয়ে এসে বান্দার হৃদয়সাগরে এসে মিলিত হয়। বান্দার হৃদয় হলো কুরআনের মিলন-মোহনা। কুরআন হৃদয়কে মুমিন বানায়। আল্লাহভীরু বানায়। হৃদয়কে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। সব ধরনের কল্যাণ দিয়ে টইটম্বুর করে দেয়। এ জন্য চাই কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর।

১৯. পথ চলতে চলতে দ্বিধা তৈরি হলে, জীবনে সংকট দেখা দিলে, সাথে সাথে কুরআনের কাছে ফিরব। আল্লাহ কী বলেছেন, বোঝার চেষ্টা করব। দূর হয়ে যাবে হয়রানি। দুশ্চিন্তা। মানুষ কষ্টের সময় আপনজনের কাছেই ফিরে আসে। আমাদের আপনজন আল্লাহ। তাঁর কালাম হবে আপন হয়ে ওঠার মাধ্যম।

২০. নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা তার রবের বেশি নৈকট্য অর্জন করতে পারে। কুরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠতম নফল। কুরআন শোনা, তাদাব্বুর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। খাব্বাব রা. একলোককে বলেছিলেন, যতটুকু সাধ্যে কুলোয় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করো। আর আল্লাহর কালামই নৈকট্য লাভের কার্যকর মাধ্যম।

২১. মুসলিম উম্মাহর যখনই দুর্দিন আসবে, তার উচিত কুরআনের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন, প্রথমে সেটা যাচাই করে নেয়া। সাধারণত উম্মাহর ওপর সমস্যা আসা শুরু হয় কুরআনের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর কুরআনের তাদাব্বুর কমে গেলেই উম্মাহর ওপর বিপদের ঘোর অমানিশা নেমে আসে। তখনো কিন্তু তিলাওয়াত ঠিকই চলতে থাকে। থাকে না শুধু 'তাদাব্বুর'।

২২. হেদায়াত চাইলে তাদাব্বুর করতেই হবে। কারণ, ইলম ও হিদায়াত হলো তাদাব্বুরের অধীনস্থ বিষয়। পথহারা কেউ যদি পথ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে বসে। তাদাব্বুরের মাধ্যমে পথের সন্ধান করে, তাহলে তার সামনে পথ খুলে যায়। বান্দার হেদায়াতের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যাই কুরআনে দেয়া আছে। আমি বুঝতে না পারলে, ধরে নিতে হবে, আমার কোথাও অসম্পূর্ণতা আছে।

২৩. মুসলিম-বিশ্বে এমনকি অমুসলিম দেশে হাজার-হাজার মাদরাসা আছে। যেখানে কুরআন হেফয করানো হয়। কিন্তু শুধু কুরআনের তাদাব্বুর নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করবে, এমন মাদরাসা বিরল।

২৪. জাহেলের কথার চেয়ে আলেমের কথা শোনা ভালো। অন্যের কথা শোনার চেয়ে স্নেহময় পিতার কথা শোনা ভালো। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় আলিম,

সবেচেয়ে বেশি স্নেহশীল। তার কথাও সবার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তাদাব্বুরের সাথে, ভালোবাসার সাথে।

২৫. মনোযোগের সাথে আল্লাহর কালাম, নবীজির কালাম শুনলে এবং তাদাব্বুর করলে, বুঝতে না পারার কথা নয়। প্রথম দিনেই সব হয়ে যাবে, এমন ভাবলে তো চলবে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগুতে হবে।

২৬. কুরআন তাদাব্বুরের বড় এক বাধা হলো 'গান'। সংগীত কলবকে হেদায়াতবিমুখ করে দেয়। কুরআনবিমুখ করে দেয়। কুরআন ও গান এক পাত্রে জমা হতে পারে না। গান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে 'প্রবৃত্তির' পূজার প্রতি। কুরআন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রবৃত্তির বিরোধিতার দিকে। কুরআন মানুষের মনে শুভবোধ তৈরি করে, গান তৈরি করে অশুভবোধ। কুরআন ডাকে হকের দিকে, গান ডাকে বাতিলের দিকে। কুরআন ডাকে সত্যের দিকে, গান ডাকে মিথ্যার দিকে। কুরআন ডাকে আল্লাহর দিকে, গান ডাকে শয়তানের দিকে।

২৭. কোনো আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করতে বসলে, শুধু এই আয়াতেই দৃষ্টিটা সীমাবদ্ধ না রেখে, আগের-পরের আয়াতের দিকেও গভীর মনোযোগের সাথে খেয়াল রাখা উচিত। তাতে কাঙ্ক্ষিত আয়াত বোঝা সহজ হবে।

২৮. কুরআন কারীম শুধু মুখস্থ তিলাওয়াত করলে সওয়াব আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধু তিলাওয়াতের জন্যে কুরআন নাযিল হয়নি। তাদাব্বুরও জরুরি।

২৯. কুরআন পাঠের সময় তাজবীদের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। কিন্তু তাজবীদ নিয়ে অতি ব্যস্ততা পাঠকারীকে আয়াতের অর্থ বুঝতে বাধা দেয়।

৩০. যে শিশু বা কিশোর বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই কুরআন কারীম হিফয করে ফেলে, তাকে বাল্যকালেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেকমত দিয়ে দেয়া হলো।-ইবনে আব্বাস।

এই শিশুটির মধ্যে একজন নবীর গুণাবলি চলে আসে। ঈসা আ.-কেও শৈশবে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল। একজন শিশু যদি কুরআন হিফযের কারণে এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে, তাহলে যে কুরআনকে তাদাব্বুর করে বোঝার চেষ্টা করে ও কুরআনের বাতলানো পথে চলতে চেষ্টা করে, তার মর্যাদা কেমন হবে? তার মর্যাদা তো আরও বহুগুণে বেশি হওয়ার কথা।

৩১. এক আরবের স্মৃতিচারণ, আমি ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। পাশেই বসেছিলেন একজন তুর্কি ভদ্রলোক। দীর্ঘ পথযাত্রা। তিনি ব্যাগ থেকে কুরআন বের করে পড়তে শুরু করলেন। একটু পর কাঁদতে শুরু করলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কেন কাঁদছেন? আপনি কুরআন কারীম বোঝেন? জি না, বুঝি না, তবুও কুরআন না বুঝে পড়লেও, মনে হয় কী যেন বুঝছি! কী যেন বুঝে যাচ্ছি! আফসোস হয়,

আহা! যদি আরবীটা বুঝতে পারতাম! আচ্ছা আপনারা তো আরব, আমার সাথে কয়েকজন আরব থাকেন, তাদেরও কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখি, তারা কুরআন বোঝেন, তবুও তারা কাঁদেন না কেন?

৩২. তোমরা আমাকে এসব ছাইপাঁশ বেদাতি কথাবার্তাপূর্ণ কিতাবপত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। আমি বলছি শোনো, এসব বই বর্জন করো। তোমরা সালাফের কিতাবাদি পড়ো। কুরআন পড়ো। আল্লাহর কিতাব যদি তোমাদের উপদেশের জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে এসব কিতাবে তোমাদের জন্যে গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নেই। -আবু যুরআ রাযী রহ.।

৩৩. কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বারবার তাকিদ দিয়েছেন, তার কালাম দিয়েই যেন মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয়।

ক. এবং আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি (وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ) নামল, ৯২। নবীজিকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন মানুষকে তিলাওয়াত করে শোনান। দাওয়াত দেন।

খ. বন্দী কাফের আল্লাহর বাণী শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দেবে (حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) তাওবা ৬। কাফের বন্দী হলে, তাকেও কুরআন কারীম শোনানোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। যাতে তার ঈমান আনার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

গ. হে নবী, ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করুন (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) আনকাবূত, ৪৫।

এসব আয়াত পড়লে বোঝা যায়, কুরআন কারীমের মাধ্যমে দাওয়াত দিলে বেশি ফলপ্রসূ হয়। এবং নিছক পাঠ নয়, বুঝে বুঝে পাঠের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৪. বান্দা যখন খালেস নিয়তে আল্লাহর কালাম শোনে, আল্লাহ তাকে কালাম বোঝার তাওফীক দিয়ে দেন। তার কলবকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দেন (ইমাম কুরতুবী)।

৩৫. হাদীসে আছে, কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে শিক্ষা বলতে শুধু শব্দশিক্ষা নয়; বরং অর্থও উদ্দেশ্য। কারণ অর্থ শিক্ষার ফলেই ঈমানের বৃদ্ধি হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেছেন, আমরা আগে ঈমান শিখতাম তারপর কুরআন শিখতাম। ফলে আমাদের ঈমানে বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু তোমরা এখন উল্টোটা করো। আগে শেখো কুরআন তারপর শেখো ঈমান। এ জন্যই তারা একেকটি সূরা শিখতে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দিতেন।

৩৬. কুরআন কারীমের প্রতিটি সূরা একটার সাথে আরেকটার যোগসূত্র আছে। এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের সংযোগ আছে। সূরার প্রথম আয়াতের

সাথে শেষ আয়াতের সংযোগ আছে। এক সূরার শেষ আয়াতের সাথে পরের সূরার প্রথম আয়াতের সংযোগ আছে। এগুলো একটু চিন্তা করে করে তিলাওয়াত করলে তাদাব্বুরটা সহজ হয়।

৩৭. আল্লামা ইকবাল রহ. শেষ-জীবনে তাদাব্বুরে কুরআনের প্রতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, কুরআন কারীম নিছক একটা কিতাব নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু।

৩৮. কুরআন কারীমের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এমন আলিম বর্তমানেও অনেক আছেন। একজন আলিম, বয়ান করতে গিয়ে, একটা বিষয় প্রমাণ করতে গিয়ে, বিভিন্ন আঙ্গিকে একশটা আয়াত উপস্থাপন করেছেন। শ্রোতাদের মনে হয়েছে, তাই তো এ-বিষয়ে এতগুলো আয়াত আছে, আমাদের কল্পনাতেই ছিল না।

৩৯. এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কুরআন কারীমের ব্যাখ্যায় যত সুন্দর ভাষা, যত আকর্ষণীয় শব্দই ব্যবহার করা হোক, আল্লাহর কালামের সব 'অর্থ' প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। বান্দার এ প্রয়াস হবে সিন্ধু থেকে বিন্দু আহরণের মতো। তাই একটা আয়াতের বাহ্যিক কিছু দিক বুঝে, সন্তুষ্ট হয়ে ভাবা ঠিক হবে না—এই আয়াতের সব বুঝে ফেলেছি। এই আয়াতে আর বোঝার কিছু বাকি নেই। এটা ভুল চিন্তা। একটি আয়াতের পুরোপুরি অর্থ অনুধাবন করতে পারা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য বাহ্যিক অর্থ বোঝার পরও একটি আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর চালিয়ে যেতে হবে।

৪০. কুরআন কারীমে ১৩০ বার 'কলব' শব্দটা উল্লেখ হয়েছে। কলবের সাথে ৩৬টারও বেশি 'আমল' ও গুণাবলিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে করে কলবের গুরুত্ব বোঝা যায়। কলবই হলো শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। মানুষ এই কলবের প্রতিই সবচেয়ে বেশি উদাসীন থাকে। কলব পরিশুদ্ধ করার কোনো উদ্যোগ সে গ্রহণ করে না। অথচ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নিয়ে তার ভাবনার শেষ নেই। এই কলবকে ঠিক করার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই হলো কুরআন। তিলাওয়াত ও তাদাব্বুরের মাধ্যমে।

৪১. কুরআন কারীম নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো :

لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ, ২৯)।

৪২. আমার ভীষণ অবাক লাগে, কুরআন তেলাওয়াত করে, অথচ তাদাব্বুর করে না, তাহলে সে কুরআন তিলাওয়াত করে কী মজা পায়? –ইবনে জারীর।

৪৩. আমাদের কুরআন কারীম দান করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা কুরআন কারীম বুঝব, বুঝে অনুযায়ী আমল করব। যার এমন হিম্মত নেই সে প্রকৃত দ্বীনদারই নয়।

৪৪. কুরআন কারীমের আলোচনা করতে গেলে তিন শ্রেণির মানুষ বের হয় :

ক. কুরআন তিলাওয়াত পরিত্যাগ করেছে। এদের বিরুদ্ধে নবীজি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছেন।

খ. কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেন। তবে তাফসীর জানেন না, তাদাব্বুরও করেন না। তাদের জীবনে কুরআন কারীমের কোনো প্রভাবও দেখা যায় না।

গ. কুরআন কারীম বোঝেন। তাফসীরও বোঝেন। কিন্তু তাদাব্বুর করেন না।

৪৫. যে তাদাব্বুর হৃদয়কে পরিবর্তন করে না, আমল পর্যন্ত নিয়ে যায় না, তা তাদাব্বুর হতে পারে না। হাসান বসরী রহ. বলেছেন, ইলম দুই প্রকার :

ক. কলবে বাস করে এমন ইলম। এটা উপকারী।

গ. যবানে বা জিহ্বায় থাকে এমন ইলম। এটার জন্যে বান্দা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে।

৪৬. আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারা, যারা জ্ঞানবান (আনকাবুত, ৪৩)।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

তাদাব্বুরকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এই আয়াতে। তাদেরকে জ্ঞানী বলেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহর বর্ণনা করা মেসাল (দৃষ্টান্ত) যে তারাই শুধু বোঝেন।

৪৭. কিছু সময় একান্তে নিজের সাথে কাটাব। প্রশ্ন করব, আমি কি তাদাব্বুর করি? এ-ব্যাপারে আমার শিথিলতা আছে? থাকলে আজ থেকে শুরু করব। নিজে নিজে নয়। উস্তাদের অধীনে। সালাফের রেখে যাওয়া আদর্শের ওপর থেকে।

৪৮. তাদাব্বুরের জন্যে ইখলাস ও নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তাদের কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে খালেস রেখে (বায়্যিনা, ৫)।

৪৯. তাদাব্বুরের আগে নিয়ত করে নিতে হবে। আমাকে যেন সরল পথে পরিচালিত করা হয়। কারণ, কুরআন হলো وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ঈমানদারদের

জন্যে হেদায়াত ও রহমত (নামল, ৭৭)। কুরআন কারীম আঁকড়ে ধরে থাকলেই আমরা সরল পথের ওপর থাকতে পারব। এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও বলে গেছেন,

تركتُ فيكم شيئينِ لن تضلوا بعدَهما كتابَ اللهِ وسنتي

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। সে দুটি আঁকড়ে ধরলে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না আল্লাহর কিতাব। আমার সুন্নাত।

৫০. তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করব, আমি যেন আল্লাহর পরিবারভুক্ত ও খাসলোক হতে পারি :

إنَّ للهِ أهلينَ من الناسِ هم أهلُ القرآنِ

আল্লাহর পরিবারভুক্ত বিশেষ কিছু মানুষ আছে! তারা কারা? তারা আহলে কুরআন! (আহমাদ)।

৫১. আমি কুরআন কারীম নিয়ে লেগে থাকছি, কুরআন কারীম আমার জন্যে যেন সুপারিশকারী হয়। হাদীসে আছে, তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কুরআন কেয়ামতের দিন তার ধারকদের জন্যে সুপারিশকারী হবে (*মুসলিম*)।

اقرَؤوا القرآنَ؛ فإنَّهُ يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابِهِ

কুরআনের তাদাব্বুর যে করে, তার চেয়ে বেশি কুরআনের ধারক আর কে হতে পারে?

৫২. তাদাব্বুরের সময় ভাবব, আমি কুরআনের সাথে আছি, যাতে আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তচিত্ত হতে পারি,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

এরা সেসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় (রা'দ, ২৮)।

৫৩. তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করব, আমি যেন যাবতীয় রোগ বালাই থেকে শিফা লাভ করি। কারণ, কুরআন তো আমাদের জন্যে শি'ফা,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

আমি নাযিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা (ইসরা, ৮২)।

৫৪. তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করব, আমি যেন আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকতে পারি,

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

(হে নবী,) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে আপনার অন্তর মজবুত রাখার জন্যে আর আমি এটা পাঠ করিয়েছি থেমে থেমে (ফুরকান, ৩২)।

৫৫. তাদাব্বুরের আরেকটি মাধ্যম হলো শব্দের অর্থ বোঝা। তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন কারীমের অর্থ বুঝতে হবে,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্যে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। এটা আরবী কুরআন, এতে কোনো বক্রতা নেই, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে (যুমার, ২৭-২৮)।

আরবী না বুঝলে কীভাবে তাদাব্বুর করবে? একজন অত্যন্ত বড় আলিম বলেছেন, তিলাওয়াতের সময় কোনো আয়াত না বুঝতে পারলে, ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ি। একজন আলিমের যদি এমন অনুভূতি হয়, আমার মতো যারা সাধারণ, তাদের কী অবস্থা হওয়া উচিত।

৫৬. সাহাবায়ে কেরাম কোনো আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারলে, থেমে যেতেন। না বুঝে সামনে অগ্রসর হতেন না। ইবনে যুবায়ের রা. বলেছেন, একটা আয়াত বুঝতে পারছিলাম না। নির্ঘুম রাত কেটে গেল। সকালে ইবনে আব্বাস রা. বুঝিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি ছিল,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে (ইউসুফ, ১০৬)।

৫৭. তাদাব্বুর করতে বসলে,

ক. তাদাব্বুরের সময় মূল কুরআনের পাশে তরজমা ও তাফসীর আছে এমন 'মুসহাফ' নিয়ে বসা।

খ. সাথে কাগজ রাখা। কোনো প্রশ্ন জাগলে সেটা টুকে রাখা। পরে জেনে নেয়ার জন্যে।

গ. এভাবে পড়তে গিয়ে এক পৃষ্ঠা শেষ করতে যদি দীর্ঘ সময়ও লেগে যায়, বিরক্ত না হওয়া।

৫৮. তাদাব্বুরের জন্যে একটা আয়াতকে বারবার আওড়ানো। তামীম দারী রা. একটা আয়াত পড়তে পড়তে পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন,

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা অসৎ কার্যাবলিতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদের সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে? তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই-না মন্দ (জাসিয়া, ২১)।

সালাফের অভ্যেসই ছিল এমন। তারা একটি আয়াত নিয়ে রাত ভোর করে দিয়েছেন।

৫৯. কুরআন পাঠের সময় কল্পনা করা, আমি এখন রবের কালাম পড়তে যাচ্ছি। আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব মনে হাজির রাখা। যদি পড়ার সময় তাদাব্বুরের দিকে মন না যায়, বারবার পড়তে থাকা। সায়ীদ ইবনু যুবায়ের রহ. একটা আয়াতকে বিশ বারেরও বেশি পড়েছেন :

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ

এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে (বাকারা, ২৮১)।

৬০. তাদাব্বুরের জন্যে তারতীলের সাথে পড়া। আলকামাহ খুব তাড়াহুড়ো করে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ইবনে মাসউদ দেখে বললেন :

رَتِّلْ فَإِنَّهُ زَيْنُ القرآن

তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করো। কারণ এভাবে পড়ার মাঝেই কুরআনের সৌন্দর্য নিহিত! (বায়হাকী)।

৬১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিলাওয়াতই আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি যেভাবে তিলাওয়াত করেছেন, আমাদেরও সেভাবে করা উচিত হাফসা রা. বলেছেন,

كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

আল্লাহর রাসূল থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর তিলাওয়াত একেকটি সূরা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকত (মুসলিম)।

৬২. আমি কুরআনকে আলাদা আলাদা অংশ করে দিয়েছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পারেন আর আমি এটা নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে (ইসরা, ১০৬),

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا

নাযিলই করা হয়েছে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে; এবং তিলাওয়াতও করতে হবে ধীরে ধীরে। থেমে থেমে।

৬৩. তাদাব্বুর করতে বসলে, নিজেকে শুনিয়ে তিলাওয়াত করব। বেশি জোরে নয়। আবার ফিসফিস করেও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

আপনি নিজের নামাজ বেশি উঁচু স্বরে পড়বেন না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবেন (ইসরা, ১১০)।

৬৪. হাদীস শরীফেও সুন্দর কথা আছে :

ما أذِنَ اللهُ لِشيءٍ ما أذِنَ لِنَبيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بالقُرآنِ يَجْهَرُ بِهِ

সুর করে জোর আওয়াজে নবীর কুরআন-পাঠ, আল্লাহ তা'আলা খুবই আগ্রহ করে শোনেন। অন্য কিছু এতটা আগ্রহের সাথে শোনেন না (মুত্তাফাক)।

৬৫. একরাতে নবীজি বের হলেন। আবু বাকরকে দেখলেন নিম্নস্বরে নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। উমারকে দেখলেন উচ্চ আওয়াজে নামাজে তিলাওয়াত করছেন। পরে আবু বকরকে বললেন, 'তোমাকে দেখলাম মৃদুস্বরে তিলাওয়াত করছ!'

'যার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করছি, তিনি তো আস্তে বললেও শোনেন!'
'আর উমার, তোমাকে দেখলাম বেশ জোরে তিলাওয়াত করছ!'
'ঘুমন্তদের জাগিয়ে দেয়ার জন্যে, শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে।'

'আবু বাকর তুমি আরেকটু জোরে পড়বে! উমার তুমি আরেকটু নিচু আওয়াজে পড়বে।' (*তিরমিযী*)

৬৬. তাদাব্বুরের সময় সাধ্যানুযায়ী সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়া। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সুর করে কুরআন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যারা সুর করে কুরআন পাঠ করতেন, তাদের প্রশংসা করতেন।

إنَّ من أحسنِ النّاسِ صوتًا بالقرآنِ الّذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله

যার কুরআন পাঠ শুনলে মনে হয়, সে আল্লাহকে ভয় করে করে পড়ছে, সে-ই সবচেয়ে সুন্দর তিলাওয়াতকারী (*ইবনে মাজাহ*)।

৬৭. তোমরা কুরআন পড়ার সময় স্বরকে সুন্দর করো (*আবু দাউদ*)।

زَيِّنُوا القرآنَ بأصواتِكم

৬৮. যে ব্যক্তি কুরআনকে সুন্দর করে পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্তই নয় (মুসলিম)

ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن

৬৯. বারা বিন আযিব রা. বলেছেন, নবীজি ঈশার নামাজে সূরা ত্বীন পড়েছেন। তার চেয়ে সুন্দর স্বর আর কারও শুনিনি (মুত্তাফাক)।

৭০. কুরআনকে সুন্দর করে পড়লে, ভাবটা হৃদয়ে ছাপ ফেলে। গলা সুন্দর না হলেও, সাধ্যমতো সুন্দর করার চেষ্টা করা। আবু মুসা আশ'আরী রা.-এর কুরআন পাঠ খুবই সুন্দর ছিল। নবীজি তার প্রশংসা করে বলেছেন, 'তোমাকে দাউদী বাঁশির সুরের কিছুটা দেয়া হয়েছে।'

'ইস্! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যদি জানতাম আপনি আমার কুরআন-পাঠ শুনছেন তাহলে আরও সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করতাম!'

৭১. কুরআন কারীমকে সুর করে পড়া দু-প্রকার :

ক. স্বাভাবিক সুর। কৃত্রিমতা নেই। এটা প্রশংসিত।
খ. কৃত্রিম সুর। গানের মতো করে পড়া। এটা নিন্দনীয়।

৭২. তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন পড়তে বসার আগে গুনাহমুক্ত হয়ে নেয়া। অহংকার হিংসা ও অন্যান্য আত্মিক রোগ থেকে শুদ্ধ হয়ে নেয়া। কারণ, এগুলো হলো মরিচা। কুরআনকে কলবে প্রবেশ করতে দেয় না। মনে অহংকার থাকলে কুরআনের আলো কলবে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ বলেন,

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদের আমি আমার নিদর্শনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব (আ'রাফ, ১৪৬)।

৭৩. ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন, কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তিনটি :

ক. গুনাহে লেগে থাকা।
খ. অহংকার থাকা।
গ. প্রবৃত্তির পূজারি হওয়া।
এগুলো কলবকে জং ধরিয়ে দেয়।

৭৪. তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন কারীমকে মুখস্থ পড়া। তাদাব্বুরের জন্যে এটা অত্যন্ত উপকারী। একজন দেখে পড়ে তাদাব্বুর করছে, আরেকজন মুখস্থ পড়ে তাদাব্বুর করছে, দুজনের মধ্যে তুলনাই চলে না। মুখস্থ পড়ার মানে হলো, সে এর আগেও আয়াতটা বহুবার পড়ছে। এই আয়াতের সাথে তার সম্পর্ক অনেক পুরোনো। গভীর।

৭৫. আল্লাহর আয়াত যাদের বক্ষে ধারণ করা আছে, তাদের চেয়ে সেরা আর কে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ

প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নিদর্শনাবলির সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সুস্পষ্ট (আনকাবুত, ৪৯)।

৭৬. কুরআন কারীম নিয়ে পরস্পর ঈর্ষামিশ্রিত প্রতিযোগিতা চলতে পারে। নবীজি বলেছেন :

لا حسدَ إلاَّ في اثنتَيْنِ: رجلٌ آتاهُ اللهُ القرآنَ فهو يقومُ به آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ

হিংসা নিন্দনীয়, তবে দুটি ব্যাপারে হিংসা (গিবতা) চলতে পারে, তার একটি হলো, এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন দান করেছেন, সে রাতে ও দিনে কুরআন পড়ে। (তাকে এ-কাজের জন্যে ঈর্ষা করা যেতে পারে) -মুসলিম।

৭৭. নিজের হিফজ থেকে মুখস্থ তাদাব্বুর করার বড় সুবিধা হলো, ইচ্ছেমতো যেকোনো সময় তাদাব্বুর করা যায়। ইচ্ছেমতো কুরআন কারীম থেকে আয়াত বের করে আনতে পারা। হাঁ, দেখে দেখে পড়লে সওয়াব বেশি।

প্রথমত, পড়ার ইবাদত।
দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমের দিকে তাকানোর ইবাদত।

তবে আমরা বলছি তাদাব্বুরের কথা। তিলাওয়াতের কথা নয়। তাদাব্বুর মুখস্থ করাই বেশি ফলদায়ক। কথা হলো, যদি দেখে দেখে তাদাব্বুর করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, তাহলে দেখে দেখে তাদাব্বুর করাই আমার জন্যে উত্তম। মুখস্থ পড়ার বাড়তি উপকার হলো, মনটা বিক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকে।

৭৮. তাদাব্বুরের জন্যে সহায়ক হলো, তাহাজ্জুদে কুরআন পাঠ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا

অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমনই কর্ম, যা দ্বারা কঠিনভাবে প্রবৃত্তির দলন হয় এবং কথাও বলা হয় উত্তমভাবে (মুযযাম্মিল, ৬)।

৭৯. রাতের গভীরে তিলাওয়াত সত্যিই প্রভাবশালী। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى
ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনো সিজদাবস্থায়, কখনো দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বলো, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান? (যুমার, ৯)।

৮০. কুরআন শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখেরাতেও বান্দাকে সাহায্য করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الصيامُ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ، يقولُ الصيامُ: أيْ رَبِّ ! إنِي مَنَعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ، فشَفِّعْنِي فيه، ويقولُ القرآنُ: مَنَعْتُهُ النومَ بالليلِ، فشَفِّعْنِي فيه؛ فيَشْفَعانِ

সিয়াম ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। কুরআন বলবে, রাব্বি, আমি তাকে রাতে ঘুমুতে বাধা দিয়েছি, আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! (আহমাদ)।

৮১. অন্তত দু-রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ পড়া দরকার। ছোট্ট একটা সূরা হলেও তাদাব্বুর করে করে তিলাওয়াত করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়!

৮২. তাদাব্বুরের স্তর আছে, চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষা গ্রহণ। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে এদিকে ইশারা আছে : হয়তো তোমরা চিন্তা করবে (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)।

চিন্তাশীল কওমের জন্যে রয়েছে নিদর্শনাবলি (لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)।

৮৩. সূরা আলে ইমরানের শেষদিকের আয়াতটি নাযিল হলে, নবীজি কেঁদে দিয়ে বললেন :

لقد نزلَت عليَّ الليلةَ آياتٌ ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكَّرْ فيها

আজ রাতে আমার ওপর একটা আয়াত নাযিল হয়েছে। দুর্ভোগ! যে এই আয়াত পড়বে অথচ আয়াতটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না।

আয়াতটি পড়ি,

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَٰتٍ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে বুদ্ধিমানের জন্য (আলে ইমরান, ১৯০)।

৮৪. ফিকর বা চিন্তা হলো কলবের আমল। কলবের নূর হলো চিন্তা-অনুধ্যান। তাদাব্বুর মানে একটা আয়াত নিয়ে চিন্তা করা। আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে ভাবা। শব্দটা কী কী অর্থ হতে পারে, সেটা নিয়ে ভাবনার গভীরে ডুব দেয়া।

৮৫. আমি তাদাব্বুর করার সময়, আমার অবস্থার সাথে সালাফের অবস্থা তুলনা করে দেখব। একটা আয়াতে কোনো গুণাবলির কথা বর্ণিত হলে, সেটা আমার

মধ্যে আছে কি না, যাচাই করে দেখব। নিজেকে প্রশ্ন করব, আমি কি প্রকৃত মুমিন? সূরা আনফালের শুরুতে বলা মুমিনের গুণাবলি কি আমার মধ্যে আছে?

৮৬. তাদাব্বুরের আরেকটি স্তর হলো, কুরআন কারীম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও হৃদয় বিগলিত হওয়া। আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তাদাব্বুরের পর আমার কলবে কোনো প্রভাব পড়ে? এর মধ্যে আমার চিত্তের কোনো ধরনের উত্তরণ ঘটেছে? চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে? মনটা নরম হয়েছে?

৮৭. নবীজি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আবু বকরকে ইমামতি করার জন্যে খবর পাঠালেন। আয়েশা রা. বললেন, আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ। নামায পড়াতে গেলে কান্না রোধ করতে পারবে না। (কুরআন পাঠ করতে গেলে, কান্না চলে আসবে)।

৮৮. হাসান বসরী রা. বলেছেন, মিষ্টতার খোঁজ করো তিন বস্তুতে। সলাতে, কুরআনে ও যিকিরে। যদি মিষ্টতা পাও, ভালো কথা। নইলে জেনে রাখো তোমার জন্যে আল্লাহর রহমতের দরজা বন্ধ। দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করো।

৮৯. তাদাব্বুরের আরেকটি স্তর হলো, সাড়াদান ও আনুগত্য। আমি যা পড়ছি, তা মানছি তো? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

(হে মানুষ,) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ করো (আ'রাফ, ৩)।

৯০. সাহাবায়ে কেরাম দশটি আয়াত শিখতেন। সেগুলোর ওপর আমল না করে সামনে বাড়তেন না। তারা প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন।

৯১. সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেছেন, মায়েদার এই আয়াতটিকে আমার অত্যন্ত ভারী মনে হয় :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

বলে দাও, হে কিতাবীগণ, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং (এখনো) যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই, (যার ওপর তোমরা দাঁড়াতে পারো) এবং (হে রাসূল,) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না (মায়িদা, ৬৮)।

এ-আয়াতে যথাযথ অনুসরণ মানে 'বোঝা ও আমল করা। আমরা কি কুরআন কারীমকে যথাযথ বুঝছি? আমল করছি?

৯২. ইবনে মুফলিহ রহ. বলেছেন, তোমার ঘরে কুরআন কারীম আছে, আর তুমি কুরআনে নিষেধকৃত বিষয়গুলোতে দেদারসে লিপ্ত হচ্ছ, আমার ভয় হয়, তুমি এই আয়াতের হুমকির আওতায় চলে আসো কি না,

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়) যখন আল্লাহ 'আহলে কিতাব' থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং এটা গোপন করবে না। অতঃপর তারা এ প্রতিশ্রুতিকে তাদের পেছন দিকে ছুড়ে মারে (আলে ইমরান, ১৮৭)।

৯৩. আমি কুরআন পড়ি কিন্তু মানি না, তাহলে আমি বড় জালিম,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? বস্তুত আমি (তাদের কৃতকর্মের কারণে) তাদের অন্তরের ওপর ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়েছি, যদ্দরুন তারা এ কুরআন বুঝতে পারে না এবং তাদের কানে ছিপি এঁটে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদের হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না (কাহফ, ৫৭)।

৯৪. তাদাব্বুর করলেই হবে না, কুরআনের হুকুমকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে,

خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟

আমি তোমাদের যা-কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধরো এবং (যা-কিছু বলা হয়, তা) শোনো (বাকারা, ৯৩)।

৯৫. আমরা কীভাবে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি? কুরআনের প্রতি গভীর আস্থা ও অনুরাগ নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, এই কুরআন আল্লাহর কালাম।

৯৬. বিশুদ্ধ তাদাব্বুরের জন্য প্রয়োজন পূত-পবিত্র গুনাহমুক্ত জীবন যাপন। যার কলবটা জীবন্ত সে-ই কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন, যা সত্যকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে দেয় (ইয়াসীন, ৬৯-৭০)।

৯৭. মনোযোগ দিয়ে কুরআন কারীম শোনা। তাহলে কলবটা নরম হবে। প্রভাবিত হবে। তাদাব্বুরটা আন্তরিক হবে :

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানানোর জন্যে এবং যাতে এটা (শুনে) স্মরণ রাখে সেই কান, যা স্মরণ রাখতে সক্ষম (হাক্কাহ, ১২)।

৯৮. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেছেন, ইলমের সূচনা হলো শোনার মাধ্যমে। তারপর বোঝা তারপর মুখস্থ তারপর আমল তারপর প্রচার।

আমি কোন ধাপে আছি? কুরআন কারীমকে শুধুই শুনছি? শুধুই মুখস্থ করছি? আমল করছি? প্রচার করছি?

৯৯. কুরআন কারীমকে ভালো করে বুঝতে হলে ভালো করে শুনতে হবে। কুরআনে মনোযোগ দিয়ে শোনার কথা বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে ও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদের সুসংবাদ শোনাও। যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে, তারাই এমন লোক, যাদের আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন (যুমার, ১৭-১৮)।

১০০. আল্লাহর প্রশংসিত বান্দা কারা?

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার ওপর পতিত হয় না (ফুরকান, ৭৩)।

১০১. মনোযোগ দিয়ে শোনা মুমিনের লক্ষণ পক্ষান্তরে কাফেরের লক্ষণ?

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

আরবী কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্যে যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এ কুরআন সুসংবাদদাতাও এবং সতর্ককারীও বটে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা শুনতে পায় না (ফুসসিলাত, ৩-৪)।

১০২. কাফেররা সব সময়ই কুরআনবিমুখ :

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

এবং কাফেররা (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর (পাঠের) মাঝে হট্টগোল করো, যাতে তোমরা জয়ী থাকো (ফুসসিলাত, ২৬)।

১০৩. না শোনার মানসিকতার অধিকারীকে আল্লাহ হুমকি দিয়েছেন :

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

দুর্গতি হোক প্রত্যেক এমন মিথ্যুক পাপিষ্ঠের, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তাকে পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঔদ্ধত্যের সাথে এমনভাবে (কুফরের ওপর) অটল থাকে, যেন আয়াতসমূহ শোনেইনি। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ শোনাও (জাসিয়া, ৭-৮)।

১০৪. তারা আল্লাহর আয়াত না শোনার কারণে অচিরেই অনুতপ্ত হবে। কিন্তু সেটা তাদের কোনো কাজে আসবে না :

وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ

এবং তারা বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তবে (আজ) আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গোনাহ স্বীকার করবে (মুলক, ১০-১১)।

১০৫. কুরআন কারীমকে উপেক্ষা করার মতো বড় পাপ আর হতে পারে না :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই এরূপ জালেমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব (সাজদা, ২২)।

১০৬. সত্যের অন্বেষী হয়ে শুনলে, উপকৃত হবেই। আল্লাহ আমার ডাকে কখন সাড়া দেবেন?

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ

কথা তো কেবল তারাই মানতে পারে, যারা (সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয়ে) শোনে (আনআম, ৩৬)।

১০৭. আমি যদি মুমিন হই, তাহলে কুরআন আমার জন্যে। আমাকে মনে করতে হবে, কুরআন আমাকেই সম্বোধন করছে :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান রয়েছে। এটা এমন কোনো বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেয়া হয়েছে; বরং এটা এর পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ (ইউসুফ, ১১১)।

১০৮. ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কুরআন তিলাওয়াতকালে যখনই তুমি দেখবে হে মুমিনগণ (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟), তুমি পরিপূর্ণ সজাগ হয়ে যাবে। সামনে কী বিধান আসছে সেটার গ্রহণ করার জন্যে। আদেশ হলে মেনে নেবে। নিষেধ হলে বিরত থাকবে।

১০৯. ইবনে কুদামাহ বলেছেন, 'কুরআন পাঠকারীর জানা উচিত, কুরআনের সম্বোধনের উদ্দেশ্য কী? হুমকিগুলোর উদ্দেশ্য কী? কুরআনের গল্পগুলো নিছক সময় কাটানোর জন্যে বিবৃত হয়নি। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে বর্ণিত হয়েছে। মনে করবে, আমি দাস, মনিবের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে! সেটা পড়ছি!'

১১০. ইমাম গাযালী বলেছেন, 'ভয়ের আয়াত পড়ার সময় এমন ভান করতে হবে, যেন ভয়ে মরে যাচ্ছি। আনন্দের আয়াত এলে এমন ভাব করতে হবে, যেন আনন্দে আকাশে উড়ছি! আল্লাহর গুণাবলির আয়াত এলে মাথা নিচু করে দিতে হবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। কাফেরদের বৈশিষ্ট্য এলে, লজ্জার ভান করে আওয়াজ নিচু করে ফেলতে হবে। যেন তাদের এহেন কর্মকাণ্ডে আমারও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।'

১১১. প্রতিটি আয়াতেই আমি থামব। ভাবব। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলে, চিন্তা করে দেখব, আমি কি এই গুণের অধিকারী? কাফির বা মন্দলোকদের বৈশিষ্ট্য হলে চিন্তা করব, আমি নই তো? আল্লাহর বড়ত্বের বর্ণনা হলে, চিন্তা করব, আমি কি তা অনুভব করতে পারছি? আমার মনে কি গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আছে?

১১২. কুরআন তাদাব্বুরের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধক হলো, তাজবীদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ। তাজবীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল বের করার প্রয়াস চালানো। হরফের মাখরাজের দিকে অতিরিক্ত নজর দিলে হরফের অর্থ বের হবে না। এ-ধরনের পড়া শয়তানের হাসির খোরাক হবে। এটা ঠিক, তাজবীদ অত্যন্ত জরুরি বিষয়। তাজবীদ কুরআন পাঠের অলংকার। তাজবীদ ঠিক করে পড়তে না পারলে গুনাহগার হবে। কিন্তু এটাই কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। তাজভীদ হলো মাধ্যম, তাদাব্বুরের স্তরে পৌছার সেতু। কুরআন পাঠের সময় শয়তানের একটা শক্তিশালী অস্ত্র হলো, সে তিলাওয়াতকারীর মনে দ্বিধা ঢুকিয়ে দেয়, হরফটা বোধ হয় সঠিকভাবে আদায় করা হয়নি। আবার শুদ্ধ করে পড়ি। হরফ শুদ্ধ করার দিকে তার মনোযোগ ফিরিয়ে, অর্থের দিক থেকে তার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়।

১১৩. ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, 'এক জমানা আসবে, ফকীহ কম হবে ক্বারী বেশি হবে। কুরআন কারীমের হরফ মুখস্থ করা হবে, কিন্তু তার বিধি-বিধান অবহেলিত থাকবে।'

১১৪. তাদাব্বুরের আরেকটি প্রতিবন্ধক হলো, 'কুরআন দ্বারা নিছক শিফা বা আরোগ্য লাভ করার নিয়ত করা'। কিছু মানুষ কুরআন কারীমকে হোমিও-এলোপ্যাথির দোকান বানিয়ে রাখে। তারা মনে করে রোগ-বালাই থেকে শেফা দেয়ার জন্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে। এটা ঠিক, কুরআন শারীরিক-মানসিক-বুদ্ধিবৃত্তিক সব ধরনের রোগ ভালো করার ক্ষমতা রাখে। তাই বলে আরোগ্য দান করাই কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

১১৫. তিলাওয়াত করতে গিয়ে আল্লাহর নামগুলো সামনে পড়লেই থমকে গিয়ে ভাবা, এখানে অন্য নাম না এনে ঠিক এই নামই কেন আনা হলো?

১১৬. কোত্থেকে তাদাব্বুর শুরু করব? উমার রা. বলেছেন, 'তোমরা যদি কুরআন শিখতে চাও, 'মুফাসসাল' সুরা থেকে শুরু করো। কারণ এগুলো ছোট ও সহজ। সূরা হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'মুফাসসাল' বলা হয়।

১১৭. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমি দশ বছরের বালক। আমি সবে মুহকাম ও মুফাসসাল সূরাগুলো পড়ে শেষ করেছি। এ-সূরাগুলো দিয়ে পাঠ শুরু করার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে :

ক. কলবে ঈমান পোক্ত হয়। কারণ, এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে উপদেশমূলক আয়াত আছে।

খ. ছোট ছোট আয়াত হওয়াতে বোঝার ক্ষেত্রেও সহায়ক। এসব আয়াতে শরীয়তের বিধিবিধানও খুব একটা নেই। বেশির ভাগই জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা। নবী-রাসূলগণের ঘটনা।

গ. আল্লাহর পরিচয়মূলক আয়াত আছে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা আছে।

ঘ. রাসূলের ঈমানের কথা আছে।

১১৮. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে সেই তালা, যা অন্তরে লেগে থাকে? (মুহাম্মাদ, ২৪)।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

ক. এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন কারীম নিয়ে তাদাব্বুর করা ওয়াজিব (ইমাম শাওকানী)।

খ. তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়ার অর্থ, কুরআনকে ছেড়ে দেয়া (*ইবনে কাসীর*)।

গ. আমরা তাদাব্বুর কেন করব, তার উদ্দেশ্যও এই আয়াত থেকে বের করতে পারি।

ঘ. তালাবদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হৃদয়ের মানুষরা তাদাব্বুর থেকে বিমুখ থাকে।

ঙ. পরোক্ষভাবে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, তারা কুরআনের তাদাব্বুরকে উপেক্ষা করে থাকে।

১১৯. (হে রাসূল,) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ, ২৯)।

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ, আপনার কওমের মধ্য হতে যাদের প্রতি আমি এই কুরআন নাযিল করেছি, তারা যেন 'তাদাব্বুর' করে (*তাবারী*)।

১২০. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা সেভাবে তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে (বাকারা, ১২১)।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ

যথার্থ তিলাওয়াত (حَقَّ تِلَاوَتِهِۦ) মানে? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এর অর্থ 'তাদাব্বুর' করা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

১২১. এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত করো (وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا) (মুযযাম্মিল, ৪)।

ক. এভাবে তিলাওয়াত করলে, কুরআন কারীম বুঝতে ও তাদাব্বুর করতে সহায়ক হবে (ইবনে কাসীর)।

খ. ধীরে ধীরে তাদাব্বুরের সাথে পড়তে থাকো (শাওকানী)।

১২২. আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (বাকারা, ২৮৬)। কুরআনের বিধি-বিধান বোঝা যদি আমাদের সাধ্যের বাইরে হতো, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাদাব্বুরের হুকুম দিতেন না (ইবনে হাযম)।

১২৩. আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দ্বীনের 'তাফাক্কুহ' (গভীর বুঝ) দান করেন (মুত্তাফাক)।

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দ্বীনের 'ফিকহ'-গভীর জ্ঞান হাসিলের সবচেয়ে বড় উপায় হলো, কুরআন কারীমের তাদাব্বুর।

১২৪. সাহাবায়ে কেরামের কুরআনি তাদাব্বুর ছিল ভিন্নধর্মী। তারা কতটা মনোযোগ দিয়ে কুরআনের তাদাব্বুর করতেন, উমার রা. এর ঘটনা তার সাক্ষী। তিনি বারো বছর সময় ব্যয় করে সূরা বাকারা শিখেছেন। শেষ হওয়ার পর, আনন্দে উট যবেহ করেছেন (*বায়হাকী*)।

১২৫. আমরা তাফসীর বা তাদাব্বুরে বসলেও কত দ্রুত একেকটা সূরা শেষ হয়ে যায়। আমাদের তাদাব্বুর মানে 'তরজমা'। বেশির চেয়ে বেশি সামান্য তাফসীর। ইবনে উমার রা. সূরা বাকারা নিয়ে আট বছর পড়ে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়টা তিনি সূরাটা শেখার পেছনে ব্যয় করেছেন (*মুয়াত্তা*)।

১২৬. উমার রা. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কোনো কোনো আয়াতের তাদাব্বুর তাকে ভীষণ বিহ্বল করে তুলত। কাঁদতে কাঁদতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত। কান্নার জন্যে দীর্ঘ সময় ঘর থেকে বের হতে পারতেন না। লোকজন মনে করত তিনি অসুস্থ। সবাই দেখতে আসত।

১২৭. আমি সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিন তিনবার পড়ে শুনিয়েছি ইবনে আব্বাস রা.-কে। প্রতিটি আয়াত পড়া শেষ হলে থেমে আমি তাকে প্রশ্ন করেছি। আয়াতটি সম্পর্কে তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছি। -মুজাহিদ রহ.।

১২৮. হিজরী চতুর্থ হিজরীর বিখ্যাত বুযুর্গ, আবুল আব্বাস বিন আতা রহ.। বেশি বেশি কুরআন খতম করতেন। একটি খতম শুরু করেছিলেন তাদাব্বুর করে করে শেষ করবেন। দশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। খতম শেষ করার আগেই মালাকুল মাউত এসে হাজির হয়ে গেছেন।

১২৯. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় মনোযোগ ধরে রাখা। অর্থের দিকে খেয়াল করে করে তিলাওয়াত করা। কুরআন কারীম থেকে কিছু আহরণের চেষ্টা করা।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে কুরআনের তাদাব্বুরে নিয়োজিত হবে, তার সামনে হকের রাস্তা খুলে যাবে।'

১৩০. তাদাব্বুর-তাফাক্কুর ছাড়া গড়গড় করে বেশি পরিমাণে তিলাওয়াত করা যায়। কিন্তু তাদাব্বুর ও গভীর চিন্তাভাবনা করে অল্প তিলাওয়াত করা আমার কাছে বেশি প্রিয়। -ইমাম আ-জুররি রহ.।

১৩১. তাদাব্বুর ও তাফাক্কুরের সাথে তিলাওয়াত করা সুন্নাত। এটাই কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাদাব্বুরমাখা তিলাওয়াতের মাধ্যমে বক্ষটা হেদায়াতের জন্যে প্রস্তুত হয়। হৃদয়টা রব্বানী নূরে নূরান্বিত হয়। -আল্লামা সুয়ূতী রহ.।

১৩২. যার মধ্যে ইলম নেই, ফাহম নেই, তাকওয়া নেই, তাদাব্বুর নেই, সে কুরআনের কোনো স্বাদই পায় না। -ইমাম যারকাশী রহ.।

১৩৩. কুরআনের ইলম হলো শ্রেষ্ঠ ইলম। সুতরাং কুরআনের বুঝ (ফাহম)-ই হলো শ্রেষ্ঠ বুঝ। -ইবনুল জাওযী রহ.।

১৩৪. কুরআনের তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়া, কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা না করা, কুরআন সম্পর্কে জানাশোনা বাড়ানোর প্রতি আগ্রহী না হওয়াও একপ্রকার (هجر) বা কুরআন-ত্যাগ। -আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.।

১৩৫. কুরআন কারীমের তাদাব্বুর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। এর মাধ্যমেই সমস্ত কল্যাণ লাভ হয়। এর মাধ্যমেই যাবতীয় ইলম আহরিত হয়। এর মাধ্যমেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। ঈমানী বৃক্ষের শেকড় গভীরে প্রোথিত হয়

-আল্লামা সা'দী রহ.।

১৩৬. কুরআন তাদাব্বুর করা তোমার জন্যে অপরিহার্য। কুরআন কারীমের অর্থ বোঝা পর্যন্ত তোমাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে। কুরআন কারীম আগাগোড়া পড়তে থাকো তাদাব্বুরের সাথে। আগ্রহ নিয়ে। আমলের নিয়তে।

-শায়খ বায রহ.।

১৩৭. যে ব্যক্তি কুরআনের তাদাব্বুর করবে এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তি লাভবানদের গুণাবলি কী কী তা জানতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্তদের গুণাবলি কী কী তাও সে বিস্তারিত জানতে পারবে। -শায়খ ইবনে বায রহ.।

১৩৮. তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে (সতর্ক করছে), যে অগ্রগামী হতে বা পিছিয়ে পড়তে চায় (মুদ্দাসসির, ৩৭),

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

এই আয়াতটা তাদাব্বুর করে দেখো। তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কোনো অবস্থাতেই থেমে পড়া যাবে না। সর্বাবস্থাতেই নিজের ঈমানের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। আমলের প্রতি নজর রাখতে হবে। পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতিটি মুহূর্তেই। এটাই কুরআনি আয়াত তাদাব্বুরের ফায়েদা। আমাকে সচেতন করিয়ে দেবে। আমার ভুলগুলো ভাঙিয়ে দেবে। আমাকে জাগিয়ে রাখবে। -শায়খ নাসের উমর।

১৩৯. হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো, তবে তিনি তোমাদের (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন (আনফাল, ২৯)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

সত্য আর মিথ্যা পার্থক্য করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানে মিথ্যা আসে নানামুখী রূপ নিয়ে। নিরূপণ করা কঠিন কোনটা হক আর কোনটা বাতিল! এই দুর্যোগে প্রকৃত ফুরকানই পারে আমাদের পথ দেখাতে। কুরআনই সেই ফুরকান। পথ দেখতে হলে তাদাব্বুর করতেই হবে।

১৪০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) ও রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো পাক-পবিত্র হতে পারত না (নূর, ২১),

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম রহমত ও ফযল কী? আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর।

১৪১. তিনি তো রহমানই, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (রহমান, ১-২)।

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ

তার মানে কুরআন শিক্ষা দেয়াটাও আল্লাহর বড় এক রহমত। কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করা, কুরআন বোঝার জন্যে কিতাবাদি পড়া, কুরআনি রহস্য উদঘাটনের জন্যে সময় ব্যয় করা, রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ।

১৪২. আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদের অবশ্যই শোনার তাওফীক দিতেন (আনফাল, ২৩)।

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

কুরআন কারীমের তাদাব্বুর না করার কারণ এই নয় তো, আল্লাহ আমাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন! তাদাব্বুর না করা, কুরআন কারীমের অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা না করার পরিণতি কী হতে পারে, এই আয়াতের দিকে খেয়াল করলে, কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে!

১৪৩. যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয় (আ'রাফ, ২০৪)।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আল্লাহর রহমত, অন্তরে প্রশান্তি, সৌভাগ্য ও ঈমানের ওপর অবিচলতা, রোগমুক্তি আসতে পারে, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত ও মনোযোগ দিয়ে তাদাব্বুরের সাথে কুরআন শোনার মাধ্যমে।

১৪৪. আল্লাহর কিতাবের তাদাব্বুরের মাধ্যমে বান্দার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। কুরআনের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক যত গভীর হয়, মজবুত হয়, ততই রবের প্রতি তার ইয়াকীন ও আস্থা বাড়তে থাকে।

১৪৫. কুরআন তাদাব্বুর করতে হলে, আগে কলবে কিছু বিষয়কে স্থান দিতে হবে, কুরআন কারীমের মহব্বত, তিলাওয়াতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, আমলের প্রতি দৃঢ় বাসনা। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তার কুরআনি নেয়ামতের ভান্ডার খুলে দেবেন। কুরআনের রহস্যের দ্বার উন্মোচিত করতে থাকবেন।

১৪৬. তাদাব্বুরের সাথে পড়লে আমরা দেখতে পাব, সূরা কাহফে ফিতনা থেকে বাঁচার চারটা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। দ্বীনের ফিতনা। মালের ফিতনা। ইলমের ফিতনা। রাজত্বের ফিতনা।

১৪৭. সূরা কৃফ শুরু হয়েছে (قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) কাফ, কুরআন মাজীদের কসম। আর সূরা কৃফ শেষ হয়েছে,

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে আপনি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকুন!

এই সূরারই এক জায়গায় আছে :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্যে উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে (৩৭)!

উপদেশ গ্রহণ করতে হলে, তাদাব্বুর করতে হবে। কুরআন কারীমের বাণীর অর্থ উদ্ধারে গভীর অনুধ্যানে চেষ্টা করতে হবে। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুরআন কারীম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত :

ক. জীবন্ত উন্মুখ হৃদয়!

খ. জাগ্রত মস্তিষ্ক!

আমাকে মনে রাখতে হবে, আমি যে তেলাওয়াত করছি, তা আল্লাহ তা'আলা খোদ শুনছেন। ইবনে কুতাইবা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

'অর্থাৎ সে আল্লাহর কিতাব শ্রবণ করেছে সজাগ মনোযোগের সাথে, বোঝার সুতীব্র ইচ্ছা নিয়ে, অচেতন গাফেল হয়ে নয়। এ-আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর কালামকে গুরুত্ব দিয়ে না শুনলে, না পড়লে এর প্রভাব অন্তরে পড়বে না।'

১৪৮. কুখ্যাত কুরাইশ নেতা, ওলীদ বিন মুগীরাহ। ঈমান নসীব হয়নি, কিন্তু কুরআনের সমঝদার। কুরআনের বিরোধিতা করতে এসে, কুরআন সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় উক্তি করে গেছে এই লোক,

إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه

'কুরআনের মধ্যে রয়েছে অন্য রকমের মিষ্টতা। কুরআনের বাহ্যিক রূপে আছে মনোহারিত্ব-লাবণ্য। কুরআনের উপরিভাগ ফলভারানত নিম্নভাগ পত্রপল্লবশোভিত! কুরআন বিজয়ী হয়, তার ওপর জয়ী হওয়া যায় না।'

একজন কাফের হয়ে কুরআনকে এভাবে বুঝল! কুরআনের চমৎকারিত্বকে এভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারল, আমরা মুসলমান হয়ে কী করছি?

১৪৯. ইসলাম গ্রহণের আগে, জুবাইর ইবনু মুতঈম রা. যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শুনলেন, তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার হৃদয়টা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল (كاد قلبي أن يطير)।' তিনি কী এমন পেয়েছিলেন কুরআনের মধ্যে, আশায় আনন্দে তার মনটা উড়ুউড়ু হয়ে গিয়েছিল! অথবা অপার্থিব এক অনুভূতি তার হৃদয়জুড়ে ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি (তখনো) একজন কাফের। তা সত্ত্বেও এমন নিখাদ আলোর ঝলক কীভাবে টের পেলেন? আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে দীর্ঘদিন কুরআনের সাথে জীবনযাপন করার পরও কেন এর ছিটেফোঁটা 'ঝলক' টের পাই না?

১৫০. জ্বিনেরা কুরআন কারীমকে প্রথম বার শুনেই কীভাবে এর মাহাত্ম্য টের পেয়ে গেল? স্বগতোক্তি করে উঠল (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا) আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি (জ্বিন, ১)। আমাদের এমন বোধ জাগে না কেন? আমরা উঠতে বসতেই কুরআন দেখি, কুরআন শুনি তবুও?

১৫১. কুরআন তাদাব্বুর বলতে আমরা বুঝি,

ক. কুরআন কারীমের শব্দগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা। এই চেষ্টার ফলে জীবনে আসে এক ইতিবাচক প্রভাব। আচরণে আসে অন্য রকম এক পরিবর্তনের ছোঁয়া।

খ. আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই আয়াতে কী বলতে চেয়েছেন, তা বোঝার চেষ্টা করা। আগের ও পরের আয়াতগুলোর সাথে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা।

গ. আয়াতে সুসংবাদ থাকলে মনে খুশি খুশি ভাব ফুটিয়ে তোলা। দুঃসংবাদ থাকলে মনে ভীতাবস্থা সৃষ্টি করা। পূর্বেকার জাতিসমূহের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

ঘ. কুরআনের সমস্ত কথাকে মনেপ্রাণে ইয়াকীন করা। সমস্ত আদেশকে মাথা পেতে নেয়া। যাবতীয় নিষেধাজ্ঞাকে মুখ বুজে মেনে নেয়া।

১৫২. মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে, তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে (আনফাল, ২)।

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

যারা তাদাব্বুর করে, কুরআন কারীম দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

১৫৩. কুরআন তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়া অহংকারের আলামত, 'এরূপ ব্যক্তির সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পারেনি, যেন তার কান দুটিতে বধিরতা আছে (লুকমান, ৭),

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا

শুধু তাদাব্বুরই তারা বর্জন করে না, তাদের কানেও সমস্যা। কুরআনের আয়াত তারা শোনে সত্য কিন্তু কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা বধিরতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৫৪. তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়ার ভীতিকর দিক হলো, মানুষ নগণ্য জড় পদার্থের চেয়েও হীন হয়ে পড়ে। কুরআন বলে 'আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোনো পাহাড়ের ওপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে (হাশর, ২১) :

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

বাক-বুদ্ধিহীন একটা জড় পাহাড়ও কুরআনের ভয়ে বেসামাল হয়ে ওঠে! আর আমরা মানুষেরা।

১৫৫. যাদের ওপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সে ভার বহন করতে পারেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে (জুমু'আ, ৫) :

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ

এ-আয়াতে তাওরাতের কথা বলা হলেও, পরোক্ষভাবে কুরআন কারীমও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। যারা কুরআন কারীম শুধু মুখস্থ পড়ে, আমলে আগ্রহ রাখে না, তারাও গাধার মতো।

১৫৬. খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো,

يَقرَؤُونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهم

তারা কুরআন পড়বে সত্য কিন্তু তার শিক্ষা তাদের গলা দিয়ে নামবে না (মুসলিম)।

তারা কুরআনের যথাযথ তাদাব্বুর করে না। কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। মনগড়া ব্যাখ্যা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।

১৫৭. কুরআন কারীমকে পরিত্যাগ করার শাস্তি ভয়াবহ! স্বয়ং নবীজি এমন লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেছেন,

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

ইয়া রাব, আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল (ফুরকান, ৩০)।

পরিত্যাগ করা বলতে, কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, কুরআন পড়েছে কিন্তু তাদাব্বুর করেনি। নিদেনপক্ষে কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি। কুরআনের হালাল-হারাম মেনে চলেনি।

১৫৮. তাদাব্বুর মানে? ইলম অর্জনের জন্যে কুরআন পাঠ করা। ইলম মানে? আল্লাহকে চেনা। তার সম্পর্কে জানা। আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত ইলম আমাকে ইস্তেগফার-অভিমুখী করে তুলবে।

১৫৯. আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত ইলম। আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়াই প্রকৃত অজ্ঞতা। -ইবনে মাসউদ রা.।

১৬০. তোমরা ইলম হাসিল করতে চাইলে এই কুরআন ঘেঁটে দেখো, কারণ তাতেই আছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যাবতীয় ইলম। -ইবনে মাসউদ রা.।

১৬১. তোমাদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছেন, তারা কুরআন কারীমকে মনে করতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা চিঠি। তারা রাতের আঁধারে কুরআনের

তাদাব্বুর করতেন। দিনের আলোতে কুরআনের বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কুরআনের ইলম অন্বেষণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। -হাসান বিন আলি রা.।

১৬২. তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কুরআন শেখো। তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দাও। কারণ তোমাদের এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এবং এ জন্য তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে। জ্ঞানীদের জন্যে উপদেশদাতা হিশেবে কুরআনই যথেষ্ট। -ইবনে উমার রা.।

১৬৩. আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আয়াত কেন নাযিল করেছেন, সেটা শিক্ষা দিতে ভালোবাসেন। তিনি চান বান্দা প্রতিটি আয়াত পড়ে পড়ে তার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করুক। -হাসান বসরী রহ.।

১৬৪. তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কুরআন হলো রহমানের সর্বশেষ কিতাব। তাতে আছে আকলের নির্যাস, প্রজ্ঞার আলো, যাবতীয় ইলমের উৎস।

-কা'ব আহবার রহ.।

১৬৫. আমি কুরআন পাঠ করি। গভীর দৃষ্টিতে আয়াতসমূহের দিকে নজর বুলাই। আমার কাছে অবাক লাগে, কীভাবে কুরআনের হাফেজগণ শান্তিতে ঘুমায়? -জনৈক সালাফ।

১৬৬. কুরআনে হাফেজদের দেখলে আমার অবাক লাগে, আল্লাহর কালাম পড়েও কীভাবে তারা দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হতে পারে? তারা যা তিলাওয়াত করে, তার অর্থ যদি তারা বুঝত তাহলে এর স্বাদ অনুভব করতে পারত। মুনাজাতে মজা পেত। তাকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তার প্রাপ্তির আনন্দে তার ঘুম দূর হয়ে যেত। -জনৈক সালাফ।

১৬৭. কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সময় যা মনে রাখা চাই, কুরআন পাঠ করবে আমলের নিয়তে। তুমি কুরআনকে এমন করে পড়ো, কুরআন-পাঠ যেন তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখে, তাহলে তুমি প্রকৃত কুরআন-পাঠক নও। -হাসান বিন আলি রা.।

১৬৮. একটা আয়াত নিয়ে তাদাব্বুরের চূড়ান্ত রূপ হলো, সে অনুযায়ী আমল করা, কুরআনের হরফগুলোকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করলেই তাদাব্বুর হয়ে যায় না। -হাসান বসরী রহ.।

১৬৯. কুরআন কারীম আল্লাহর কাছে মুনাজাতের নিয়তে পড়া, তিলাওয়াতকারী পড়ার সময় মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন। তার পড়া শুনছেন। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের কাছে তার প্রশংসা করছেন। তাকে নিয়ে গর্ব করছেন।

১৭০. তুমি যদি কুরআন কারীম দ্বারা পরিপূর্ণ উপকৃত হতে চাও, তাহলে তিলাওয়াত করা বা তিলাওয়াত শোনার সময় কলবকে পুরোপুরি সুস্থির করে নাও। তোমার তিলাওয়াত তুমি নিজেই মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহর সাথে কথা বলছ এমন তটস্থ ভাব ফুটিয়ে তুলবে। -ইবনুল কাইয়িম রহ.।

১৭১. আল্লাহর যথার্থ মর্যাদাবোধ যদি তোমার কলবে স্থান পেয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর কালাম শোনা ও পড়ার চেয়ে অধিক সুস্বাদু সুমিষ্ট সম্মানিত সমুন্নত কোনো কিছু আর হতে পারে না (সালাফ)।

১৭২. কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম। কুরআনের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর পরিচয় আমাদের সামনে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। এটা হতে পারে কয়েকভাবে :

ক. বড়ত্ব ও ভীতি প্রকাশের মাধ্যমে। ফলে আমাদের হৃদয় বিনম্র আর নতজানু হয়।

খ. সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা প্রকাশের মাধ্যমে। ফলে তার প্রতি মনটা পরম ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পড়ে। -ইবনুল কাইয়িম রহ.।

১৭৩. তাদাব্বুরে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, সওয়াবের নিয়তে কুরআন পড়লে ও পড়ালে। নবীজি বলেছেন,

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

যে ব্যক্তি কুরআন কারীম শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়, সে-ই সর্বোত্তম।

১৭৪. শিফা বা আরোগ্য লাভের নিয়তে কুরআন কারীম পড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ, তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত (ইউনুস, ৫৭)।

১৭৫. কীভাবে তাদাব্বুর করব? জোরে স্পষ্ট আওয়াজে সুর করে তিলাওয়াত করার মাধ্যমে।

ليس منامن لم يتغن بالقرآن يجهربه

যে ব্যক্তি কুরআনকে সুর করে ও জোর আওয়াজে পড়বে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী)।

১৭৬. একলোক সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, অমুক খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করে। ইবনে আব্বাস সে লোককে বললেন, তুমি যদি তিলাওয়াত

করতেই চাও, তাহলে এমনভাবে তিলাওয়াত করো, যাতে তুমি তোমার নিজ কানে শুনতে পাও। তোমার হৃদয় দিয়ে যা পড়ছ অনুভব করতে পারো।

১৭৭. তুমি যখন তিলাওয়াত করবে, তখন কান খাড়া করে রাখবে। তাহলে পড়াটা কলবে পৌছবে। আর কলব হলো কান ও জিহ্বার যোগসূত্র। -ইবনে আবি লায়লা রহ.।

১৭৮. তাদাব্বুর হতে পারে, তারতীলের সাথে পড়ার মাধ্যমে। তারতীল মানে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে তিলাওয়াত। আয়েশা রা. বলেছেন,

كان يقرأ السور فيرتلها حتى تكون أطول منها

তিনি (নবীজি) তারতীলের সাথে সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। আগের সূরার চেয়ে পরের সূরার তারতীল হতো আরও দীর্ঘ সময় নিয়ে (মুসলিম)।

১৭৯. হে বনী আদম, তোমার কলব কীভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নরম হবে, তোমার তো লক্ষ্য থাকে কখন সূরা শেষ করবে সেদিকে। -হাসান বসরী।

১৮০. তাদাব্বুর হতে পারে, একটি আয়াতকে বারবার পড়ার মাধ্যমে। একবার পড়ার পর কিছুক্ষণ থেমে ভাবনা-চিন্তা করে আবার আয়াতটি পড়ার মাধ্যমে। এভাবে বারবার অসংখ্যবার পড়ার মাধ্যমে। আবু যর রা. বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল নামাযে দাঁড়ালেন। সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুধু একটা আয়াতই বারবার পড়লেন। আয়াতটি ছিল,

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতে পরিপূর্ণ (মায়িদা, ১১৮)।

১৮১. হাসান বসরী রহ. একবার সারারাত ধরে একটি আয়াতই বারবার পড়েছেন,

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গুনতে শুরু কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (নাহল, ১৮)।

তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'এই আয়াত কেন? তিনি উত্তর দিলেন, চোখ তুলে যেদিকেই তাকাই, শুধু নেয়ামত আর নেয়ামত। জানি না, দৃষ্টির আড়ালে আরও কত নেয়ামত লুকিয়ে আছে।

১৮২. সারারাত দ্রুত পড়ে কুরআন খতম করার চেয়ে, সূরা যিলযাল ও কারি'আ বারবার তাদাব্বুর করে করে পড়া আমার কাছে অধিক প্রিয় (ইমাম কুরতুবী)।

১৮৩. একটি আয়াত বারবার পড়ার মধ্যে অনেক উপকারিতা, সালাফের অনুসরণ করা হবে। তারা এভাবে একটটি আয়াতকে বারবার করে পড়তেন।

বারবার পড়লে তাদাব্বুর করতে সুবিধা হয়। বুঝটা গভীর হয়। প্রথমবার না বুঝলে দ্বিতীয়বারে বোঝা যায়। নইলে তৃতীয়বারে, নইলে চতুর্থবারে। প্রতিবারেই কিছু-না-কিছু বুঝ বাড়তেই থাকবে। বারবার পড়লে, আত্মার শুদ্ধি হবে। কলবে ময়লা থাকলে দূর হয়ে যাবে। ঈমান বৃদ্ধি পাবে। কুরআনের স্বাদ অনুভূত হবে। কারণ, বারবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে 'গাফলত' দূর হয়। গাফেল কলবে কুরআন প্রবেশ করে না। একটা আয়াতকে যতবার পড়ব, ততই আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু-না-কিছু 'হেদায়াতের' নেয়ামত আমার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। ঈমানের নবতর কলি প্রস্ফুটিত হতে থাকবে।

১৮৪. তাদাব্বুর হতে পারে, আয়াতটাকে কোনোভাবে সীরাতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় কি না, দেখা। সীরাত পাঠের মাধ্যমে কুরআনের আয়াতগুলো অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুরআন বোঝার জন্যে সীরাতপাঠ অপরিহার্য।

১৮৫. তাদাব্বুর মানে, তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাড়া দেয়া। আয়াতে যা বলা হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ পালন করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। আয়াতের দাবি পূরণ করে করে সামনে বাড়তেন। তাসবীহের আয়াত এলে, তাসবীহ পাঠ করে নিতেন। প্রার্থনার আয়াত এলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে নিতেন। পানাহ চাওয়ার আয়াত এলে, আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে নিতেন।

১৮৬. তাদাব্বুর মানে, কুরআন পাঠের সময় শোকের কথা মনে করে, কান্নার ভান করা। আয়াতের অর্থের সাথে সাথে গলার স্বরও ওঠানামা করানো। আয়াতের আবেগ যেন গলায় ফুটে ওঠে। প্রতিটি আয়াত পড়ার সময় খেয়াল করা, আমি এখন কোন ধরনের আয়াত পড়ছি, হাসির? কান্নার? আনন্দের? বেদনার? চাওয়ার ? পাওয়ার? ভয়ের? আশার? চিন্তার? দুশ্চিন্তার? জান্নাতের? জাহান্নামের? আমলের? আদেশের? নিষেধের?

১৮৭. কুরআন পাঠের সময় কান্না হলো বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। এটা আল্লাহভিমুখী বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কান্না আনার সহজ উপায় হলো, জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা কল্পনা করা। কবরের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা ভাবনায় আনা। সে তুলনায় আমার নগণ্য আমল ও স্বল্প প্রস্তুতির কথা ভাবা।

১৮৮. তাদাব্বুর মানে, পড়ার সময় খেয়াল করা, কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতের লক্ষ্য আমি নিজেই। ইমাম কুরতুবি বলেছেন, 'যার কাছে কুরআন পৌঁছল, তার সাথে যেন আল্লাহ স্বয়ং কথা বললেন।'

১৮৯. উরওয়া বিন যুবায়ের রহ. বলেন, 'আমি দাদু (আসমা রা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কুরআন তিলাওয়াত শুনলে কেমন হতো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা? 'ঠিক যেমনটা কুরআন কারীম বলেছে, (تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم) তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন।

আসমা রা. দুটি আয়াতের দিকে ইশারা করেছিলেন,

প্রথম আয়াত : এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন তারা যেহেতু সত্য চিনে ফেলেছে, সেহেতু তাদের চোখসমূহকে দেখবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে (মায়িদা, ৮৩)।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

দ্বিতীয় আয়াত : আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী-এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস, যার বক্তব্যসমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে, তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে (যুমার, ২৩)।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রহ. বলেন, আমি ফজরের জামাতে শেষ কাতারে ছিলাম। সেখান থেকেই উমার রা.-এর ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তিনি নামাজে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি (ইউসুফ, ৮৬)।

পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর কান্না ধরে রাখতে পারলেন না।

১৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. সূরা মুতাফফিফীন পড়তে পড়তে,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে (৬)।

পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর সামনে বাড়তে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার সময় কী করি? কখনো কেঁদেছি? হেসেছি? মন খারাপ করেছি? আয়াতের প্রভাবে?

১৯২. আবূ জামরা রহ. বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম, আমি দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করি। তিন দিনে এক খতম হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি যেভাবে বললে, তার চেয়ে আমার কাছে ধীরস্থিরভাবে তারতীলের সাথে, তাদাব্বুর করে করে একরাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা বেশি প্রিয়।

-আখলাকু হামালাতিল কুরআন। আল্লামা আ-জুররী রহ.।

১৯৩. কুরআন তিলাওয়াতের সময়, একটা আয়াতের ন্যূনতম তরজমাটুকুও না বুঝে সামনে বাড়তে মনে সায় দেয় কী করে? বেশি আয়াত পড়লে বেশি নেকি? তাহলে একই আয়াতকে তরজমা বোঝার জন্য, বারবার পড়লেও তো বেশি নেকি। হরফপ্রতি দশ নেকির জন্য বেশি পড়তে চাইলে, এক আয়াতকে বারবার পড়লেও তো বেশি নেকি হওয়ার কথা। হরফপ্রতি দশ নেকির চেয়ে, বোঝার উদ্দেশ্যে একটি আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার নেকি অনেক বেশি। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআন কারীম না বুঝে পড়ার এই বিপজ্জনক মানসিকতা ঠিক কখন থেকে গেড়ে বসেছে? কুরআন কারীম কি ইবাদতের নিয়তে না বুঝে পড়ার জন্যই নাযিল হয়েছে? না বুঝে তিলাওয়াতই কুরআন কারীমের প্রধানতম কর্মসূচি হয়ে গেল কী করে? প্রথম প্রথম না বুঝে তিলাওয়াত করলে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু আজীবন এই কাজের পুনরাবৃত্তি? পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থ এভাবে না বুঝে পড়া হয় না। কুরআনের বেলায় কেন না বুঝে পড়ার নিয়মই প্রধান রীতিতে পরিণত হলো?

১৯৪. আমর বিন মুররা রহ. বলেছেন, কুরআন কারীমের কোনো আয়াত না বুঝলে, আমি বিষণ্ন হয়ে পড়ি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান (আনকাবূত, ৪৩)।

-তাফসীরে আবী হাতেম।

১৯৫. কুরআন বোঝার নেয়ামত সহজে ধরা দেয় না। আমরা অনেকেই কুরআন বোঝার মেহনত করি। কুরআনের হেদায়াত-নূরে প্রভাবিত হওয়ার চেষ্টা করি। কুরআনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করি। কুরআন বোঝার, কুরআনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করার কার্যকর উপায় হলো, তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত। আর তাহাজ্জুদটা যদি একাকী নির্জন কোনো স্থানে আদায় করা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। অনুচ্চ স্বরে সুর করে ধীরস্থির তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন সরাসরি হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়। এভাবে আল্লাহর নৈকট্য বেশি লাভ করা যায়।

১৯৬. সলাতের কেরাতগুলো যেন প্রাণবন্ত হয়। প্রতিদিনই যাতে নতুন কেরাত দিয়ে নামাজ পড়তে পারি, এ জন্য সচেষ্ট থাকা। প্রতিদিন একই কেরাতে নামাজ

পড়া থেকে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। নামাজের কেরাতে একটি আয়াতও যেমন মনোযোগ ছাড়া মুখ দিয়ে বের না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

১৯৭. কলবের ওপর নির্জন নীরব পরিবেশের বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে। গুনাহ বা অন্য কোনো জাগতিক কারণে মন অস্থির হয়ে পড়লে, একাকী নির্জনে কুরআন তিলাওয়াত অনেক উপকারী। কুরআন তিলাওয়াত মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। আল্লাহর সাথে একা একা কথা বলাই বেশি উপভোগ্য। সুখকর। আমি যখন ধরে-বেঁধে কলবকে কুরআনের সাথে জুড়ে দেবো, আমার সামনে কুরআনের রহস্যময় জগৎ উন্মোচিত হতে থাকবে। আমার কলব আরও আলোকিত হতে থাকবে। আমি আল্লাহর আরও কাছাকাছি যেতে থাকব। আমার অন্তরে আরও বেশি আল্লাহর মারেফাত (পরিচয়) ঝলকে উঠতে শুরু করবে।

১৯৮. কুরআনের সাথে জীবন কাটানোর মজা কেমন? তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াতে বান্দা কলবে প্রভূত শক্তি লাভ করে, প্রাণশক্তি আর প্রাচুর্যে বলীয়ান হয়ে ওঠে। বান্দার মন-মনন হাসি-আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাদাব্বুরে কুরআনের ছোঁয়ায়, বান্দা হয়ে ওঠে অনন্য। অন্যদের চেয়ে আলাদা। স্বতন্ত্র। - *মাদারিজুস সা-লিকীন* (ইবনুল কাইয়্যিম রহ.)।

১৯৯. আন্তরিক আগ্রহ ও আত্মিক শুদ্ধতা নিয়ে, ধীরস্থিরতা ও তাদাব্বুরের সাথে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে পারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নেয়ামত। কুরআন কারীম আগাগোড়াই শিফা, বরকত, রহমত, হেদায়াত ও সৌভাগ্যের আধার। কুরআন মুমিনের প্রাণশক্তির উৎস।

২০০. লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। একবার, শুধুই একবার যদি কোনো মুসলিম পুরো কুরআন কারীম তাদাব্বুরের সাথে পড়ে নেয়, তার মধ্যে জন্ম নেবে অবিশ্বাস্য এক বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি। তার মধ্যে তৈরি হবে সবকিছুকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার যোগ্যতা। চালচলন বদলে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনন্য হয়ে উঠবে তার সবকিছু। আল্লাহ তা'আলা হক ও হাকীকত ইলহাম করবেন; অন্তরে উদ্রেক করে দেবেন। কিন্তু আমার কলব দুনিয়ার ভোগতামাশায় বুঁদ। আখেরাতবিরোধী বইপত্রের চাপে কুরআন আজ একঘরে।

২০১. দুঃসাহসী নাবিক সমুদ্র অভিযানে বের হয়। অজানাকে জানতে। জীবিকার খোঁজে। কুরআন কারীমও একটি সাগর। ঈমানপিয়াসী, ইলমতিয়াষী নাবিকদের উচিত এই সাগরে অভিযানে বের হওয়া। এই সাগর কাউকে খালিহাতে ফেরায় না। এই সাগরের প্রতিটি হরকত-সাকানাতে, প্রতিটি হরফ-কালিমাতে মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে। শুধু তুলে নিলেই হলো।

২০২. প্রথম শেষ ও একমাত্র নসীহত হচ্ছে, খুবই যত্ন নিয়ে সলাত আদায় করবে। সিজদার সময় দীর্ঘ করবে। দীর্ঘ দোয়া করবে। খুবই আগ্রহ নিয়ে তাদাব্বুরের

সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবে। বেশি বেশি যিকির করবে। সব সময় মাথায় রাখবে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। -আলী তানতাবী রহ.।

২০৩. মাঝে মাঝে কিছু কিছু আয়াত, হৃদয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ফেলে। হৃদয়ের কোনো এক তন্ত্রীকে ছুঁয়ে দেয়। ভেতরটাকে নাড়া দেয়। জাগিয়ে তোলে। এক অপূর্ব স্বাদে অন্তর্জগৎ পরিপ্লুত হয়ে যায়। এ-এক দুর্লভ প্রাপ্তি। এই পাওয়াকে হারিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। ধরে রাখা জরুরি। কীভাবে? মাঝেমধ্যে আয়াতখানা কল্পনা করব। প্রাপ্তিক্ষণের অপূর্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বারবার রোমন্থন করব। মনে রাখব, আয়াতখানা আমাকে একসময় জাগিয়ে তুলেছিল। আমি একসময় আয়াতটাতে ডুবে ছিলাম। বুঁদ হয়ে ছিলাম। আয়াতটির সাথে আমার বিভোর সময় কেটেছিল। ওই প্রাপ্তি জীবনের এক অমূল্য গনীমত।

২০৪. হাজার বছর ধরে বাপ-দাদারা না বুঝেই কুরআন পড়ে এসেছেন। এখনো পড়ে যাচ্ছেন। একবিন্দু না বুঝে একমাত্র কুরআন কারীমই এতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়া হয়। না বোঝা সত্ত্বেও এতটা ভক্তিশ্রদ্ধা মহব্বত নিয়ে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় না। এটা কুরআন কারীমের অন্যতম মু'জিযা। কুরআন কারীম বুঝে পড়া উত্তম। পাশাপাশি কুরআন কারীম বুঝলেই 'মাহদি' (হিদায়াতপ্রাপ্ত) হয়ে যাবে, এমন নয়। যদি তাই হতো, আরব রাষ্ট্রগুলোতে হাজার হাজার আলিমকে কষ্টে পড়তে হতো না। শাসকরাও তো কুরআন বোঝেন, তাহলে তারা কেন হকপন্থী আলিমগণের প্রতি এমন খড়্গহস্ত হন? কুরআন বুঝলেই হবে না, বুঝের সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতও আসতে হবে।

কুরআন কারীম বুঝে পড়ার জন্যই নাযিল হয়েছে। আবার না বুঝে পড়লে কোনো লাভই নেই, এমন কথা যারা বলে বেড়ায়, তাদের চিন্তাও সঠিক নয়। আসল কথা হলো, বছরের পর বছর কুরআন না বুঝেই পড়ে গেলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কী বললেন, তা জানার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ না হওয়াও কাজের কথা নয়। না বুঝেও গভীর আবেগ নিয়ে কুরআন পড়েন, এমন দাদা-নানা, দাদু-নানুরা দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আবার এমন মানুষে ভর্তি গ্রাম-বাংলা দেখতে চাই। পাশাপাশি কুরআন বোঝার স্বপ্নে বিভোর নাতি-নাতকুরভর্তি বাংলাদেশ দেখতে চাই।

২০৫. যারা মোটামুটি কুরআনের অর্থ বুঝি, তারা রাতে শোয়ার সময় মৃদু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত চালিয়ে ঘুমুতে পারি। রাতে ঘুম ভাঙলে যাতে, কানে তিলাওয়াত ভেসে আসে। এ-এক চমৎকার অনুভূতি। কখনো কানে ভেসে আসে জান্নাতের কথা। কখনো জাহান্নামের। কখনো আকীদার কথা। কখনো ঈমানের কথা। একটানা পড়ে চলেছেন। গাড়ি চলছে। বিরামহীন।

কেউ না শুনলে, তিলাওয়াত চালিয়ে রাখলে, কুরআনের প্রতি অবহেলা হবে না? অভিজ্ঞ আলিমের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, শোনার জন্যই তো চালিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় সব বিখ্যাত কারীরই পুরো কুরআনের তিলাওয়াত একসাথে আছে। কোনোটা ২০ ঘণ্টার। কোনো ৩৫, কোনোটা ৩০। নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক 'আসর'-প্রভাব কাজ করে। দূরপাল্লার যাত্রা। গাড়িতে আরামদায়ক পরিবেশ। সহযাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে কাদা। মসৃণ রাস্তাঘাট। মাঝেমধ্যে ঘুম ভাঙলে দেখা যায় চালক জেগে আছে। সহকারীর সাথে টুকটাক কথা বলছে। তাদের আলাপের টুকরা-টাকরা খণ্ডিতাংশ কানে আসে। ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আবার কোন ফাঁকে ঘুম এসে যায়। আবার ঘুম ভাঙে। আবার কিছু কথা কানে আসে। চলতে থাকে ভাঙাগড়ার খেলা। কুরআন কারীমের রেকর্ড চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়াও অনেকটা এমন। এটা অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। অন্যদের ভিন্ন অভিজ্ঞতা অভিরুচিও হতে পারে।

২০৬. কুরআন কারীমের স্পর্শে থাকতে পারা অনন্য এক পাওয়া,

১. কুরআনের স্পর্শে থাকার সবচেয়ে বড় উপকার হলো, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, এই আকীদা পোক্ত হতে থাকে। তাওহীদবিরোধী যাবতীয় অশুভ চিন্তা ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে।

২. কুরআনের স্পর্শে থাকার অন্যতম উপকার হলো, আকীদা-বিশ্বাস থেকে শিরক দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তিনের এক নন, আল্লাহ শুধুই এক এবং অদ্বিতীয়। কুরআনে বারবার এসব পড়তে পড়তে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই 'আকীদায়ে তাওহীদ' কলবে সুদৃঢ় হতে থাকে।

৩. কুরআন কারীম বুঝে পড়া আবশ্যক। প্রথম প্রজন্ম কুরআন কারীম বুঝেই পড়েছেন। কিন্তু না বুঝে পড়লে কোনো সওয়াব নেই, উপকার নেই, এটা মারাত্মক রকমের ভুল কথা। প্রতিটি আয়াতের নিজস্ব একটি শক্তি আছে। তিলাওয়াতকারী যখন আয়াতখানা তিলাওয়াত করে, না বোঝার পরও, অদৃশ্য একটা শক্তি (রশ্মি) তার কলবকে আলোকিত করে তোলে। এমনকি আয়াতটার অর্থ না বোঝার পরও, আয়াতের অর্থগত একটা প্রভাব তার চিন্তায় ছাপ ফেলে, যদি হেদায়াত তলবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত হয়ে থাকে।

৪. আরবী না বোঝার পরও, গ্রামের অশিক্ষিত তিলাওয়াতকারী যখন তাওহীদের আয়াত পড়ে, তাওহীদের একটা পবিত্র ছাপ তার কলবে মুদ্রিত হতে থাকে। শিরকের আয়াত পড়ার সময়, তার কলবের গভীরে শিরকবিরোধী অগোচর চিন্তা চাড়িয়ে উঠতে থাকে। তবে শর্ত হলো, তিলাওয়াতটা গভীর ভালোবাসা আর পরম যত্ন নিয়ে হতে হবে। পাশাপাশি কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২০৭. কুরআন কারীম পড়ার সময় বোঝার চেষ্টা করা। আরবী না জানলেও, অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো হলেও অর্থটা অনুভব করার চেষ্টা করা, মনে মনে ভাবার চেষ্টা করা, আল্লাহ তা'আলা অনেক ভালো কথা বলেছেন এখানে। বহুত দামি কথা বলেছেন এই কিতাবে। কুরআন পড়া মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। তিলাওয়াতের সময় মনকে সমস্ত চিন্তা থেকে অবমুক্ত করে নিলে, অফুরন্ত লাভ। আমি আল্লাহর কথা বুঝতে না পারলেও, আল্লাহ তো আমার কথা বুঝতে পারছেন। আমি যে তাঁরই কথা উচ্চারণ করছি। আমার এই না-বোঝা আবৃত্তি শুনে তিনি কি খুশি না হয়ে পারেন? আমাকে তার নৈকট্য দান না করে পারেন? তবে আমাকে কুরআন কারীম বোঝার মেহনতেও শামিল হতে হবে। ইন শা আল্লাহ।

২০৮. কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতই অফুরন্ত শক্তির আধার। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করলে, বারবার একই আয়াত পড়তে থাকলে, মনের দুঃখ দূর হয়। যাবতীয় দুশ্চিন্তা উবে যায়। জীবন ও কর্মে প্রভূত বরকত আসে। আমরা চর্মচক্ষে এসব বরকত দেখতে পাই না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অগোচরেই নানাবিধ বরকতে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত পড়ে পড়েই সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। নবীজি ও সাহাবায়ে কেরাম কুরআন কারীম বুঝে বুঝে পড়ে, কুরআনের স্বাদ পেয়েছেন। আমাকেও সাধ্যানুযায়ী কুরআন বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন বোঝার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তারপরও কুরআন বোঝার কোনো ব্যবস্থা হয়নি, এমনটা হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা একটা-না-একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। ইন শা আল্লাহ।

২০৯. এমনিতে নিছক উপদেশ পড়তে বিরক্তি লাগে। কিন্তু কুরআনের কোনো কাসাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক উপদেশ পড়তে বিন্দুমাত্র অনাগ্রহ জাগে না। মনে হতে থাকে, আমি কুরআন পড়ছি। আল্লাহর দেয়া শিক্ষা পড়ছি। প্রিয়জনের ছোঁয়ায় নিতান্ত অপ্রিয় বস্তুও সুপ্রিয় হয়ে যায়। কুরআনের পরশে অস্পৃশ্য বস্তুও ইপ্সিত হয়ে যায়। আর কুরআন কারীম তো ভালোবাসার মতোই এক অপূর্ব কিতাব।

২১০. কুরআনের পিপাসা কখনোই নিবারিত হওয়ার নয়। ইসমাঈল সবরী। মিসরের মানুষ। তিনি প্রচণ্ড আক্ষেপ নিয়ে লিখেছেন, 'দুদিন আগে এক সুইডিশ ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। ইসলাম গ্রহণের পর, মিসরে এসেছেন আরবী শিখতে। কথাপ্রসঙ্গে জানতে চাইলাম, তার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না। তিনি বললেন, আমার কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। আমার শুধু আরবী শেখা দরকার। যত দ্রুত সম্ভব আরবী শিখতে চাই। যাতে আল্লাহ আমাকে তার কুরআনে কী বলেছেন, সেটা সরাসরি বুঝতে পারি।

২১১. মুনাফিকের আলামত কী? আমি কি মুনাফিক? আমার মধ্যে কি মুনাফিকের আলামত বিদ্যমান আছে? মুনাফিকের আলামত কী? আলামত তো অনেক, একটি আলামত হলো, কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর না করা।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা (মুহাম্মাদ, ২৪)

আয়াতে তাদাব্বুর না করা অন্তরকে তালাবদ্ধ বলা হয়েছে। আয়াতে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত মুনাফিকরা। মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়েই আল্লাহ তা'আলা আয়াতখানা নাযিল করেছেন।

আর হাঁ, মুনাফিকের আলামত নিজের মধ্যে বিদ্যমান থাকা আর মুনাফিক হওয়া এক কথা নয়। কিন্তু আমি জেনেশুনে নিজের মধ্যে মুনাফিকের আলামত জিইয়ে রাখব কেন? অল্প করে হলেও, প্রতিদিন তাদাব্বুর করতে পারি তো।

২১২. বড়দের অনেকেই শেষ-জীবনে এসে, অনুতাপ প্রকাশ করেছেন,

১. কুরআনের ভাব বোঝার মেহনত ছাড়া, অন্য কিছুতে জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করে আমি অনুতপ্ত। -ইবনে তাইমিয়া রহ.।

২. আমিও কি কুরআন বাদ দিয়ে, অন্য কিছুতে সময় কাটানোর জন্য অনুতপ্ত?

২১৩. যারা কুরআন কারীম বোঝে, তারাই সবচেয়ে শক্তিমান ও সুখী মানুষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। যাদের সাথে কুরআন আছে, তারাই সবচেয়ে শক্তিমান মানুষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কারণ? কুরআন শুধু বুঝলেই হয় না, আমলেও আনতে হয়। সাথে অস্ত্র থাকলেই হয় না, ব্যবহারও করতে হয়। পাক ও ভারত উভয়ের কাছেই পারমাণবিক বোমা আছে। উভয় দেশই একে অপরকে সমঝে চলে। কারণ? একদেশ পোখরানে, আরেকদেশ চাগাইয়ে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজের ক্ষমতার জানান দিয়েছে। আমার কাছে কুরআন আছে বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুললে কাজ হবে না। কুরআনের যথাযথ ব্যবহারও করা জরুরি। রাব্বে কারীম সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

[তাদাব্বুরে কুরআনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত লেখা থাকবে আগামী খণ্ডে। ইন শা আল্লাহ। দোয়ার বিনীত দরখাস্ত রইল।]

হিফজী মিনাল কুরআন!

আই লাভ কুরআনে নামটা ছিল 'হিযবী মিনাল কুরআন'। হিযব বলা হয় দৈনিক তিলাওয়াতের জন্য যেটুকু নির্ধারণ করা হয়। এটাকে 'বিরদ'-ও বলা হয়। যেমন আমি ঠিক করেছি, প্রতিদিন একপারা করে তিলাওয়াত করব, তাহলে আমার হিযব হলো একপারা। আমার বিরদ একপারা। হিফজ মানে মুখস্থ করা। কুরআন কারীম মুখস্থ করাকেই সাধারণত 'হিফজ' বলা হয়। আমরা হিযব ও হিফজ উভয়টা নিয়েই কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। শিরোনামের অর্থ, আমার কুরআন হিফজ। রাব্বে কারীম আমাদের হাফেজে কুরআন বানিয়ে দিন। নিয়মিত তাদাব্বুরের সাথে হিযব আদায়ের তাওফীক দান করুন।

১. কুরআন কারীম আল্লাহর দেয়া এক অপূর্ব নেয়ামত। জীবন চলার পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আসে। পদে পদে উঠতি-চড়তি সামনে পড়ে। শারীরিক-মানসিক নানান সমস্যা-অসুবিধে। এসব বাধাবিঘ্ন মনমানসিকতা, চিন্তাচেতনায় গভীর ছাপ রেখে যায়। অনেক সময় আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্তও হয়ে পড়ি। জীবনের গতিপথ ব্যাহত হয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় থেকে বাঁচার সহজতর একটি উপায় হলো—দৈনিক হিযব/বিরদ নিয়মিত আদায় করা। দৈনিক হিযবুল কুরআন সব ধরনের মানসিক সমস্যা দূর করার মহৌষধ। মানসিক বিপর্যয় কোনো সুফল বয়ে আনে না। নিত্যদিনের বিরদুল কুরআন আদায় আমাকে অপার্থিব এক কুরআনি জগতে নিয়ে যাবে। এই কুরআনি জগৎ দৃশ্যমান জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জগতের সবকিছুই আখেরাতের চিরন্তন জগতের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআনের সাথে জড়িয়ে থেকে, আমি একই সাথে ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ পার্থিব জীবন যাপনের পাশাপাশি চিরস্থায়ী জান্নাতী জীবনও যাপনের সুখ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারব। কুরআন আমাকে পার্থিব জীবনের নানাবিধ কলুষতার প্রভাব থেকে মুক্ত করে, আখেরাতের পবিত্র জীবনের আস্বাদ দান করবে। নিয়মিত হিযব আদায় আমাকে জীবনের সূচনালগ্নের শুচিশুভ্র জীবন দান করবে। জীবনকে সার্থক করে তুলবে।

২. হিফয শেষ হওয়ার পর, হেফযখানা থেকে বের হওয়ার পর, অনেক সময় 'মুরাজায়া-তাকরার-দাওরে শিথিলতা এসে যায়। শয়তানই ধীরে ধীরে কৌশলে হিফয ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রথম প্রথম মনে হয়, এত ইয়াদ, কখনো আমি কুরআন ভুলব না। এটা শয়তানের প্রথম সাফল্য। আস্তে আস্তে আসে ব্যস্ততার অজুহাত। আস্তে আস্তে কুরআন ছুটতে থাকে। একসময় সচেতনতা

এলেও, আজ নয় কাল করতে করতে পেরিয়ে যায় আরও কিছুদিন। একদিন জোর করে বসলে দেখা যায়, আগের মতো ইরাদ নেই যা পুরো ভুলে গেছে। পরিস্থিতি যা-ই হোক, আজ থেকেই মুরাজা'আ শুরু করে দিতে হবে। অল্প করে হলেও। কুরআন কারীমকে আঁকড়ে ধরতে হবে সার্বক্ষণিক সঙ্গীর মতো।

৩. কুরআন কারীমকে দিতে হবে সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু। কুরআনকে দিতে হবে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ মনোযোগটুকু। কুরআনকে দিতে হবে সবচেয়ে তীব্র আগ্রহটুকু। কুরআনকে দিতে হবে উদ্যম আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর সময়টুকু। কুরআন নিয়ে বসতে হবে, ফজরের পর দিনের শুরুতে। কুরআনকে সব সময়ই সাথে রাখতে হবে। তবে সব সময় দিনশেষে কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে, পরিশ্রান্ত ঘুমন্ত ঢুলুঢুলু সময়টুকু কুরআনের জন্য বরাদ্দ করলে, কুরআন আমার দিকে কতটা অগ্রসর হবে, বলা মুশকিল।

৪. কুরআনে হাফেয বা নিত্য তিলাওয়াতকারী যখন ফজরের পর, মুসাল্লায় বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করে, তখন তার অনুভূতি কেমন হয়? তার মধ্যে অপূর্ব এক জান্নাতী সুখ খেলা করতে শুরু করে। মনেপ্রাণে এক চাঞ্চল্যকর আরামদায়ক সুবাতাস বইতে থাকে। যেন জান্নাত থেকে এক পশলা সুরভিত দখিনা হাওয়া নেমে এসেছে। যে হাওয়ায় মিশে আছে জান্নাতের 'নায-নেয়ামত'। যে হাওয়া কানে কানে বলে যায় জান্নাতের সুখসম্ভারের কথা। যে হাওয়া তনুমনে বুলিয়ে দেয় সুখদ পরশ। কুরআন পাঠের সাথে সাথে বান্দা উড়তে থাকে অনন্য এক জগতের দিকে।

৫. বিশেষ কোনো অজুহাতে আজকের নির্ধারিত 'বিরদ-হিযব' আগামীর জন্য পেছানো, ভালো লক্ষণ নয়। যত ব্যস্ততাই থাক, বিরদ-হিযব থাকবে প্রধানতম কাজ। ব্যস্ততার অজুহাতে নিত্য বিরদ-হিযব পিছিয়ে দেয়ার মানে, কুরআনকে পিছিয়ে দেয়া। একবার পেছালে, পরে 'টালবাহানা' আরও পেয়ে বসবে। একসময় দেখা যাবে, সামান্য অজুহাতেই কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিতে হচ্ছে। শয়তানের এসব সূক্ষ্ম অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে অনড় অবস্থান নিয়ে। কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে। আমার এখনই ঠিক করতে হবে, আমি কি লড়াই চালিয়ে যাব নাকি 'থকে' যাব?

৬. কুরআন কারীম হিফয করতে ইচ্ছুকদের প্রতি অভিজ্ঞদের পক্ষ থেকে তিন নসীহত :

১. নতুন হিফযের পরিমাণ কম রাখা।
২. বেশি বেশি তাকরার পুনরাবৃত্তি বা আওড়ানো।
৩. উভয় কাজ নিয়মিত করতে থাকা।

৭. নিজের প্রিয়জন, বিশেষ করে পরিবারের কাউকে কুরআন কারীম হিফয করতে দেখা, দুনিয়াতে জান্নাতী নেয়ামত উপভোগের মতো। কুরআন তিলাওয়াত জান্নাতের ত্বরান্বিত 'নাঈম'। কুরআন তো জান্নাতি ফলের মতো। ইয়া আল্লাহ, আমাদের আপনার কুরআনি অনুগ্রহ দান করুন।

৮. ফজরের পরপর বা রাতের তৃতীয় যাম, কুরআন তিলাওয়াত ও হিফযের সর্বোত্তম সময়। এ-সময় কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ, প্রভাব, কার্যকারিতাই আলাদা। কুরআনের সাথে হৃদয়ের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় এ-সময়। রাতের তৃতীয় যামে, কলব যেন উন্মুখ হয়ে থাকে কুরআনের জন্য। তীর যেমন উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে এঁটে যায়, কুরআনও এই সময় হৃদয়পটে এঁটে যায়। কলবে গেঁথে যায়।

৯. হিফযের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটি বস্তু,

১. আল্লাহর প্রতি ইখলাসে ঘাটতি থাকা। ইখলাস মানে শুধু আল্লাহর জন্যই কোনো কিছু করা।

২. হিফযের সময় একমুখী হতে না পারা। মোবাইল বা অন্যকিছুর প্রতি এককান খাড়া থাকা।

৩. কোনো সময় নির্ধারণ না করে, পরিকল্পনাহীন সময় নিয়ে হিফয করতে বসা। সবচেয়ে ভালো হয়, আধাঘণ্টার বেশি একটানা নতুন 'সবক' হিফয না করা।

৪. ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে হিফয করতে বসা। হিফযের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাই বরাদ্দ রাখতে হবে।

১০. আমি আজ শয়তানকে প্রতিরোধ করতে পারছি না, সামান্য ছুতোয় কুরআনের 'বিরদ' ছেড়ে দিচ্ছি, নিয়মিত পঠিত 'হিযব' না পড়ে দিন পার করে দিচ্ছি, আগামীকাল শয়তান আরও বড় অজুহাত হাজির করবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়? কোনো ক্রমেই 'হিযব' ত্যাগ করা যাবে না।

১১. নিয়মিত বিরদ আদায়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটি বিষয়,

১. একদিনেই সব তিলাওয়াত করে ফেলার চেষ্টা করা। আগ্রহ থাকতে থাকতে তিলাওয়াত সমাপ্ত করা। আগ্রহের শেষবিন্দু পর্যন্ত তিলাওয়াত না করা।

২. মস্তিষ্ক অন্যকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় বিরদ আদায় করতে বসা। সবচেয়ে ভালো হয় ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর তিলাওয়াত করতে বসা। এই সময় মনমেজায পরিচ্ছন্ন থাকে।

৩. কখন সূরাটা শেষ হবে, এই চিন্তাতাড়িত হয়ে তিলাওয়াত না করা। ধীরেসুস্থে তিলাওয়াত করতে থাকা।

১২. সারাদিনের এলোমেলো রুটিনকে ফেলেগেঁথে বিন্যস্ত করে তুলতে হবে। ছড়ানো-ছিটানো সময়গুলো একসুতোয় গাঁথতে হবে। সময়ের মালায় নানা কর্মপূর্তির ফাঁকে ফাঁকে কুরআনি মুক্তোও গেঁথে দিতে হবে। কুরআন পড়তে হবে সর্বোচ্চ আগ্রহে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে। সর্বোচ্চ দামি সময়ে। দুনিয়া হামাগুড়ি দিয়ে নয়, দৌড়ে আসবে আমার দিকে।

১৩. অনেকেই নিত্যদিনের 'হিযব' তিলাওয়াতে বাধার সম্মুখীন হন। নিয়মিত 'বিরদ' আদায় করা হয়ে ওঠে না। সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে অল্প করে নির্ধারণ করা। শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় সপ্তাহে বা পক্ষে আধাপারা। এভাবে বাড়াতে থাকা। মনকে তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করে তুললে পরে আর সমস্যা হয় না। মনকে তিলাওয়াতপোষ করে তুলতে হয় ক্রমান্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করে। পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ইন শা আল্লাহ সন্তোষজনক ফল আসবেই। কুরআন কাউকে খালি হাতে ফেরায় না।

১৪. একজন হাফেযের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো, আশেপাশে হিফয শোনানোর মতো একজন মানুষ থাকা। পরিবারের বা বাইরের। যে আগ্রহ করে তিলাওয়াত শুনবে। কখনোই বিরক্তি অনুভব করবে না। শুনতে বললে দ্বিরুক্তিও করবে না। তার মিলবে শোনা ও তিলাওয়াতের দুই প্রকার সওয়াব।

১৫. কখনো দেখা যায়, এক ঘণ্টায় তিন পারা তিলাওয়াত হয়ে গেছে। কখনো কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলে, আধা ঘণ্টাও সহজে কাটতে চায় না। তিলাওয়াতও এগোয় না। এটা কেন হয়? কলবের ওপর চেপে বসা গুনাহের কারণে। অথবা খালেস নিয়তের অভাবে আমলটা বাতিল হয়ে যায়। আমল করা দুর্বহ হয়ে যায়।

১৬. যে চায়, কুরআন তার জন্য এমন নূর-হেদায়াত-ইলমের দরজা খুলে দিক, তাহলে তাকে দুটি কাজ করতে হবে।

১. কুরআন কারীম পড়তে হবে হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি শব্দ পড়ার সময় মনে হাজির-নাজির রাখতে হবে, এই শব্দে আমার জন্য হেদায়াত রেখে দেয়া আছে। আমি আপাতত না বুঝলেও, আল্লাহর কাছে আমি এই শব্দে নিহিত হেদায়াত প্রার্থনা করছি।

২. দীর্ঘসময় ধরে কুরআনে তাকিয়ে থাকতে হবে। একটি আয়াত আওয়াজ করে করে পড়ার পর, চুপটি করে দীর্ঘসময় আয়াতখানার দিকে তাকিয়ে ভাবতে হবে, রাব্বে কারীম এই আয়াতে আমাকে কী বলতে চেয়েছেন। রবী বিন সুলাইমান রহ. বলেছেন, আমি ইমাম শাফেঈ রহ. এর দরবারে যতবার গিয়েছি, প্রায় সব সময় তার সামনে কুরআন কারীম খোলা দেখতে পেয়েছি। তাকে কুরআনে নিমগ্ন পেয়েছি।

১৭. প্রতিদিনের 'বিরদ' আদায়কে কষ্টকর রুটিন মনে না করা। অনিচ্ছা আর অনাগ্রহ নিয়ে, না পারতে মন শাসিয়ে কষিয়ে, মনের ওপর জোর খাটিয়ে বিরদ আদায় না করা। বিরদকে জাগতিক ও পারত্রিক উন্নতির মাধ্যম মনে করে পরম আগ্রহ নিয়ে বিরদ আদায় করা। বিরদকে নিজের প্রাণশক্তির আধার মনে করা। বরকত আর সৌভাগ্যের উৎস মনে করা। তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে আজকের বিরদ শেষ করার জন্য উঠেপড়ে না লেগে, ধীরেসুস্থে মহব্বতের সাথে তিলাওয়াত করতে থাকা।

১৮. পড়তে বা লিখতে বসলে, কোথাও আটকে গেলে, শব্দ বা বাক্যের অর্থ না বুঝলে, লেখার সময় উপযুক্ত শব্দ মাথায় না এলে, মুসহাফ খুলে তিলাওয়াত শুরু করে দেয়া। কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করলে, আপনাআপনি মাথার জট খুলে যায়। লেখা বা পড়ায় নতুন গতি আসে।

১৯. আমি ভালো হাফেয হয়েছি। ভালো মুফাসসির হয়েছি। কুরআন বিষয়ে ভালো কথা বলতে পারি। লিখতে পারি। চারপাশ থেকে মানুষের প্রশংসা ভেসে আসতে শুরু করেছে। এসব দেখে আমার মধ্যে বাষ্প জমছে। নিজের মধ্যে হামবড়া ভাব সৃষ্টি হয়েছে। এটা আমার পতনের সূচনা। আমাকে আল্লাহ যে কুরআনি নূর দান করেছেন, সেটা ছিনিয়ে নেয়ার সময় হয়েছে। মানুষের সামান্য কথাতে অহংকারী হয়ে পড়ার মতো ন্যক্কারজনক স্বভাব আর হতে পারে না। বিশেষ করে অল্পবয়েসে হাফেয হয়ে গেলে, এই সমস্যা তৈরি হয়। এখন তো একটু ভালো ইয়াদ হলে, গলা একটু সুন্দর হলে, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের ত্রিমুখী প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। অনেক হাফেযের শিক্ষাজীবন এভাবেই শেষ হয়ে যায়। পড়াশোনা আর আগায় না। মিডিয়ার চাকচিক্যময় প্রচারে ছোট্ট হাফেয সাহেব বেসামাল হয়ে পড়েন। আল্লাহর কালাম ধারণ করেও কুরআনের নূর থেকে বঞ্চিত হওয়া বড়ই কষ্টের।

২০. অভ্যেস না থাকলে, প্রথম প্রথম তিলাওয়াত অনেক ভারী মনে হয়। জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। এমনকি কলবও কুরআনকে গ্রহণ করতে চায় না। দুয়েক আয়াত পড়তে-না-পড়তেই ক্লান্তিবোধ হয়। জিহ্বা জড়িয়ে আসতে চায়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। একটু পরেই হাঁপ ধরে যায়। যারা দৈনিক হিযব আদায় করার সংকল্প করেছে, প্রথম দিকের এমন ক্লান্তি-হাঁপ দেখে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসবে। শুরুতে তিলাওয়াতের পরিমাণ অল্প রাখতে হবে। ধীরে ধীরে জিহ্বা, কলব তৈরি হয়ে উঠবে। প্রথম দিকে সবর করে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। একসময় সহজ হয়ে যাবে। একপারা, দুইপারা, তিনপারা বা আরও বেশি তিলাওয়াত অনায়াসে শেষ করা যাবে।

২১. কুরআনে আমার সমস্যার সমাধান আছে। এই সমাধানের ধরন কিছুটা ভিন্ন। কুরআন সরাসরি হুবহু নাম চিহ্নিত করে সমাধান বাতলায় না। কুরআন আমাদের

সঠিক পথে পরিচালিত করে। তবে অনেক সময় এমন হয়, কুরআন আমাকে আক্ষরিক অর্থে সুস্পষ্ট পথ দেখিয়ে দেয় না। কুরআনের 'আচরণগুলো' হয় সাধারণত গভীর।

ধরা যাক আমি একটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম। আল্লাহর কাছে উদ্ধারের দু'আ করে যাচ্ছি। পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করছি। মুক্তির উপায় খুঁজছি কুরআনে। পড়তে পড়তে কোনো প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক কোনো আয়াত সামনে আসে, যার প্রভাবে দীর্ঘদিনের লালিত কোনো ভ্রান্ত ধারণা, অভ্যেস বা স্বভাবে পরিবর্তন আসে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসারে। কখনো তিলাওয়াত করতে করতে মনে ভাবনার উদয় হয়, আমি যে পথে চলছি, সেটা সঠিক নয়। পাশাপাশি সঠিক পথ সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মায়।

কুরআন চট করে, দুম করে, তেলেসমাতি কাণ্ড আর ভোজবাজির মতো আকস্মিক কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কুরআন রূঢ়ভাবে কিছু করে না। কুরআন কাজ করে নরমকোমলভাবে। ধীরেসুস্থে অথচ কার্যকর, ফলপ্রসূ আর অব্যর্থভাবে।

২২. দৈনিক হিযব আদায়ের সময়, আমার প্রধান মনোযোগ পারা-সূরা-পৃষ্ঠা সংখ্যার দিকেই যেন কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়ে। একলাইন পড়তে-না-পড়তেই কদ্দূর পড়লাম আর কদ্দুর বাকি আছে, এই হিসেবে যেন ব্যতিব্যস্ত না হয়ে পড়ি। তিলাওয়াত করতে বসলে, হিযব শেষ করাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে দাঁড়ায়। আমি গুনে গুনে তিলাওয়াত করলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়ও তেমন হবে।

২৩. আমার তিলাওয়াত হতে হবে গভীর। কুরআনের মাঝে ডুবে যেতে হবে। এমনভাবে কুরআনে ডুব দিতে হবে, যেন আমি আর কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কারও অস্তিত্ব নেই। একাকী নির্জনবাসের মতো। কুরআনকে সাথে নিয়ে জনতার মাঝে নির্জনতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। প্রতিটি আয়াত হয়ে উঠবে পরম সঙ্গী। চিন্তাচেতনায় থাকবে শুধুই কুরআন। এ জন্য কুরআন নিয়ে বসার সময়টাও এমন হবে, যখন লোকজনের আনাগোনা থাকে শূন্যের কোঠায়। সব ব্যস্ততা ফুরিয়ে যায়। এমন হলেই কুরআন হয়তো কিছু রহস্য আমার সামনে উন্মোচন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি দয়া করলেও করতে পারেন।

২৪. কুরআন কারীম সাধ্যানুযায়ী সুর করে পড়াই সুন্নত। যথাসম্ভব বিশুদ্ধ তাজবীদে, আপন যোগ্যতার সর্বোচ্চ সীমায় সুন্দর করে তিলাওয়াত করলে, কুরআন তিলাওয়াতে বাড়তি মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসা কাছে ঘেঁষতে পারে না। কুরআনের প্রতি বান্দার আগ্রহ দেখে আল্লাহ তা'আলাই শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে তিলাওয়াতকারী থেকে দূরে হটিয়ে দেন,

ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে (আন-নাস)

২৫. সফরে-ঘরে সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখা উচিত। কোনো অবস্থাতেই তিলাওয়াত ছাড়া উচিত নয়। এটাই উম্মাতে মুহাম্মদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্য কওমের কথা বলে আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করছেন,

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

(তবে) কিতাবীদের সকলে এক রকম নয়। কিতাবীতের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা (সঠিক পথে) প্রতিষ্ঠিত, যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সিজদাবনত হয় (আলে ইমরান, ১১৩)।

২৬. যেকোনো কাজে সফল হতে গেলে সবর লাগে। দৈনিক হিযব আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্যও প্রথম কিছুদিন সবরের সাথে লেগে থাকতে হয়। হিফয করতে গেলে সবরের প্রয়োজন হয়। হিফয শেষ হওয়ার পর, ইয়াদ ধরে রাখতেও সবরের প্রয়োজন হয়। কুরআনের সাথে লেগে থাকার জন্য সবরের বিকল্প নেই।

২৭. আল্লাহ তা'আলার কাছে কুরআনের অনেক সম্মান। যারা কুরআন নিয়ে থাকেন, তাদেরও আল্লাহ তা'আলা অনেক সম্মান দান করেন। হাসাদ বা হিংসা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হাসাদ না বলে, গিবতা বা ঈর্ষা বলা যেতে পারে। দুটি বিষয়ে ঈর্ষা বৈধ, একব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে ব্যক্তি দিনরাত সলাতে কুরআন তিলাওয়াত করে। আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন। মানুষটা দিনরাত এক করে দান-খয়রাত করে। এই দুই ব্যক্তির আমল নিয়ে ঈর্ষা করা যেতে পারে। নিজেও এমন হওয়ার আশা পোষণ করা যেতে পারে (মুত্তাফাক)।

২৮. বয়েস হয়েছে, এতদিন পর ভালো ইয়াদ থাকার কথা নয়, তবুও পুরো কুরআন টাটকা ইয়াদ। অবাক লাগল। রহস্যটা কী? সারাদিন খুবই ব্যস্ত থাকেন। আলাদা করে তিলাওয়াত করতে দেখি না। নামাযের আগে-পরে হয়তো কিছু তিলাওয়াত করেন। ইয়াদের রহস্য তিনিই ভাঙলেন। বসে তিলাওয়াত করতে না পারলেও, হাঁটাচলায় তিলাওয়াত করেন। বিশেষ করে মাদরাসায় আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিন অনেকটা তিলাওয়াত হয়ে যায়। অথচ দেখে মনেই হতো না, তিনি এই সময় তিলাওয়াত করেন বা করতে পারেন। আল্লাহর কালামকে আল্লাহর বান্দারা কতভাবে যে সংরক্ষণ করে!

২৯. আমি কুরআন হিফয না করলে, তবে আর করবে কে? কুরআন আমার, আমি কুরআনের। আমার মা-বাবার সম্মান সমাদর করার দায়িত্ব আমার। আমার হিফয আখেরাতে মা-বাবার জন্য সম্মান বয়ে আনবে। আল্লাহর দরবারে মা-বাবার মর্যাদা বুলন্দ করবে। মা-বাবার সুবিধার্থে আমি এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে না নিলে, কে নেবে? আমি আমার মা-বাবার দিকে তাকিয়ে হলেও হিফযুল কুরআন শুরু করে দিতে পারি। সময়-মেধা-সুযোগ-বয়েসের কারণে যদি হিফয শেষ করে নাও উঠতে পারি, সন্তানরা আমাকে দেখে প্রেরণা লাভ করবে। সন্তানের হিফয আমার পরকালের পাথেয়। দুনিয়ার কত কিছুই তো আমার পছন্দের তালিকায় থাকে। আল্লাহর কালামের হিফয কেন এই তালিকায় স্থান পাবে না? আমার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য কেন হিফযুল কুরআন নয়, এই প্রশ্ন কি নিজেকে কখনো করেছি?

৩০. কলব শক্ত হয়ে আছে? অন্তর নরম করার সবচেয়ে সহজ কার্যকর আর সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে নিজে তিলাওয়াত করা বা অন্যের তিলাওয়াত শোনা। তাদাব্বুরের সাথে। কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণে আছে অপূর্ব প্রশান্তি। অভিজ্ঞতা না থাকলে, বলে বোঝানো কঠিন।

৩১. বয়েস হয়ে গেলে, ব্যস্ততা বেড়ে গেলেও হিফয করার ফলপ্রসূ পদ্ধতি আছে। শেষদিক থেকে শুরু করতে হবে। মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত একটানা শুনে যেতে হবে। শোয়ার সময়। খাওয়ার সময়। পাশাপাশি কুরআন কারীম হাতে নিয়েও পড়তে হবে। প্রথমে ছোট ছোট সূরা, তারপর ধীরে ধীরে বড় বড় সূরা। মুখস্থ হলে প্রথমে নিজেকে শোনাতে হবে, তারপর অন্যকে। সুযোগ পেলেই সূরাটা পড়তে হবে। সলাতে পড়তে হবে। চলতে ফিরতে পড়তে হবে। শুয়ে শুয়ে, বসে বসে, হাঁটতে হাঁটতে পড়তে হবে। অর্থ বুঝে বুঝে পড়তে হবে। চিন্তা করে করে, তাদাব্বুরের সাথে পড়তে হবে। তাহলে একবার মুখস্থ করা সূরা, সহজে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

৩২. কুরআনের মৌলিক পাঠ একজন শিক্ষকের কাছে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুরুতেই শিক্ষক নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। মৌলিক দক্ষতার জন্য, জীবনের শুরুতে, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিষ্যত্ব বরণ করে নেয়াই নিরাপদ। আর এই পর্বটা দীর্ঘমেয়াদে হওয়া উপকারী। তাহলে শুধু শব্দ নয়, অর্থও শেখা হয়ে যাবে।

৩৩. গুনাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে হিফযের। অনেক দক্ষ হাফেযও গুনাহের কারণে কুরআন ভুলে যায়। গুনাহের প্রভাবে কী হয়? কুরআনের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয়। কঠিন কঠিন পরিস্থিতি সামনে আসতে থাকে। ফলে কুরআন নিয়ে বসার সুযোগ হয় না। কুরআন থেকে দূরে সরার কারণে, একের পর এক সমস্যা আসতে থাকে। এক সমস্যার হাত ধরে আরও নানা সমস্যা হাজির হয়। এতসব ঘটনা ঘটতে থাকে অগোচরে। তার মনে হতে থাকে, সমস্যাগুলো এমনি এমনি

ঘটছে। কুরআননিরোধী গুনাহগুলো সাধারণত গোপন হয়ে থাকে। প্রথম দিকে এগুলোকে গুনাহ বলেই মনে হয় না। আমার সতর্ক হওয়া উচিত, আমিও এমন কোনো গুনাহে লিপ্ত নই তো, যা আমাকে কুরআন কারীম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? আমাকে কুরআন থেকে বিমুখ করে রাখছে?

৩৪. আমি কুরআন অভিমুখী হতে পারছি না, নিয়মিত কুরআন নিয়ে বসতে পারছি না। কুরআনি ওযীফা আদায় করতে পারছি না। দৈনিক হিযব/বিরদ আদায় করতে পারছি না, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হচ্ছে না। এর একটাই কারণ, আমার গুনাহ আমাকে কুরআন কারীম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। গুনাহ আমার আর কুরআনের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। গুনাহ আমাকে কুরআনের কাছে যেতে বাধা দিচ্ছে। গুনাহ আমাকে কুরআন বুঝতে বাধা দিচ্ছে। গুনাহ আমাকে কুরআন অনুযায়ী আমল করতে, জীবন গড়তে বাধা দিচ্ছে।

৩৫. একজন হাফেযে কুরআন কখনোই অন্যের প্রশংসা বা নিন্দায় প্রভাবিত হয় না। আত্মমুগ্ধতা বা আত্মহংকারে ভোগাও কুরআনে হাফেযের জন্য শোভনীয় নয়। নিজের সুন্দর সুর নিয়ে, নিজের হিফযের যোগ্যতা নিয়ে অহংকারে ভুগবে না। কুরআন পড়তে পারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ) আল্লাহ চাইলে আমি এ কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না এবং আল্লাহ তোমাদের এ সম্পর্কে অবগত করতেন না (ইউনুস, ১৬)। আল্লাহ চাইলে আমার কুরআনি যোগ্যতা যেকোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন। আমার সতর্ক থাকা উচিত।

৩৬. আমি যত ভালো হাফেযই হই, যত ভালো মুফাসসিরে কুরআনই হই, আমার মধ্যে কখনোই যেন এই চিন্তা না আসে, আমি হিফযের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছি। আমি কুরআনের সমস্ত তাফসীর-তরজমা জেনে গেছি। আমি যাবতীয় সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে গেছি। কুরআনি যোগ্যতা যদি আমার মধ্যে বিনয় সৃষ্টি না করে, তাহলে বুঝতে হবে, আমি শয়তানের পাল্লায় পড়ে আছি।

৩৭. কুরআন তিলাওয়াতকারীর এটা জানা থাকা উচিত, কুরআন কারীমে যা-কিছু বলা হয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। কুরআনের প্রতিটি হুমকি-ধমকির উদ্দেশ্যও সে। কুরআনে গল্পগুলো এমনি এমনি বলা হয়নি। এগুলো শিক্ষা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

(মিনহাজুল কাসিদীন, আল্লামা ইবনে কুদামাহ রহ.)।

৩৮. কুরআন কারীম আগাগোড়া রহমত। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে তার কুরআনি রহমত দ্বারা বেষ্টন করে না নেন, তাহলে আমি শেষ। কীভাবে বুঝব আমি তার কুরআনি রহমতের বেষ্টনীতে আছি কি না? যদি দেখি নিয়মিত দৈনিক

হিযব আদায় করতে পারছি, ভেতর থেকে কুরআনের বিধিবিধান মেনে চলার পূর্ণ সায় পাচ্ছি, কুরআনের সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগছে, তাহলে ধরে নিতে পারি, আমি আল্লাহর কুরআনি রহমতের বেষ্টনীতে আছি। আলহামদুলিল্লাহ।

৩৯. প্রতিদিন তিলাওয়াত ও হিফযের আগে, নিয়ম করে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করে নেয়া জরুরি। একটু পরপর আল্লাহর তাওফীক চেয়ে দোয়া করা। আমার মেধা ভালো, আমার স্মরণশক্তি প্রখর, আমি মেধাবী—এটা মোটেও কাজ দেবে না, যদি আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ না থাকে। তিলাওয়াত তাদাব্বুর ও হিফযের জন্য আমাকে আল্লাহর রহমত চেয়ে আনতে হবে। কারণ, রহমানই আমাকে কুরআন শিক্ষা দেবেন। কুরআন শেখার পেছনে আল্লাহর রহমত গুণই বেশি কার্যকর থাকে

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ

তিনি তো রহমানই। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (সূরা আর রহমান)।

৪০. কুরআনি রুটিনের কখনো কিছুতেই ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়। হিফযের সময় হিফয করতে বসে যাওয়া, হিফয শোনানোর সময়, কমবেশ যতটুকু হিফয হয়েছে শুনিয়ে ফেলা, হিযব আদায়ের সময় হলে সবকিছু স্থগিত রেখে তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়া। কোনো কারণে হিযব ছুটে গেলে, ঘুমের আগে হলেও কাযা আদায় করে নেয়া। কুরআনি রুটিন রক্ষায় নাছোড়বান্দা না হলে, কুরআন আসবে না। এলেও থাকবে না।

৪১. যার কাছে কুরআনের একটা হরফও শেখা হয়েছে, তাকে কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ছেলেবেলা থেকে এই পর্যন্ত, কার কার কাছে আমি কুরআনি শিক্ষা লাভ করেছি? আমার কি মনে আছে? আমি কখনো কুরআনের ভালোবাসায়, কুরআনের শিক্ষকদের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করেছি? তাদের জন্য আলাদা করে দোয়া করেছি? তাদের সাথে যোগাযোগ করার কথা ভেবেছি? তাদের খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করেছি? তাদের বিপদাপদে পাশে দাঁড়িয়েছি? কুরআনের প্রতি ভালোবাসার তাগিদেই আমাকে এটা করতে হবে। কোনো কুরআনি শিক্ষকের প্রতি মনে ক্ষোভ, অবজ্ঞা, অবহেলা বা অনীহা থাকলে, কুরআনের জন্যই তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। তার ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

৪২. একা একা হিফয না করে, একজন শিক্ষকের অধীনে হিফয করা ভালো। আক্ষরিক অর্থে শিক্ষক না পেলে, একজন সহযোগী খুঁজে বের করা তো কঠিন কোনো কাজ নয়। তবে প্রথাগত শিক্ষক হলেই বেশি ভালো। তিনি চাপ দিয়ে পড়া আদায় করে নেবেন।

৪৩. আশেপাশের সবাই কুরআনের প্রতি উদাসীন, এই অজুহাতে নিজেও কুরআনের প্রতি অবহেলার মানসিকতা রাখা ঠিক নয়। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ, পরিচিত গণ্ডির প্রায় সবাই কুরআন হিফযের প্রতি আগ্রহী নয়, এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না। আমাকেই আমার ব্যবস্থা নিতে হবে। কুরআনের হাফেয হতে হবে, দৈনিক হিযব আদায় করতে হবে, এটাই হবে আমার প্রধানতম প্রতিজ্ঞা। নিজের স্বার্থেই এটা করতে হবে। আমার আখেরাতকে সাজিয়ে তুলতেই আমাকে কুরআনের পথে পা-বাড়াতে হবে।

৪৪. কুরআনের পথে, হিফযের পথে, দৈনিক হিযব আদায়ের পথে, আমার চেয়ে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলার মনোভাব পোষণ করা সীমাহীন ক্ষতিকর। শুরুতে মাঝে এগিয়ে থেকেও কতজন শেষে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। আমিও সেই দলে পড়ে যাব না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমাকে আল্লাহর কাছে বিনয়ের দোয়া করতে হবে।

৪৫. কুরআন হিফযের জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা প্রয়োজন। হিফযুল কুরআন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। শ্রেষ্ঠতম অর্জন। শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি। যেনতেন চেষ্টায় এই বিশাল সম্মান অর্জন করা সম্ভব নয়। মরিয়া হয়ে না লাগলে, কুরআন সহজে ধরা দেবে না। আর এই দুর্লভ অর্জন এক-দুদিনেই সম্ভবপর হয়ে যাবে না। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর কাছে চেয়ে চেয়ে এই নেয়ামত লাভ করতে হবে।

৪৬. যা হিফয করছি, সেটার অর্থ ও তাফসীর বোঝা খুবই জরুরি। আল্লাহ তা'আলা নিছক না বুঝে মুখস্থ করার জন্য কুরআন নাযিল করেননি। নাযিল করেছেন কুরআন বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে। আমি যা বুঝতে পারছি না, সেটা অন্ধের মতো হিফয করা, যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি নয়। হিফযের জন্য আমি মরণপণ হলে, কুরআন বোঝার জন্য জীবনপণ হতে পারব না কেন?

৪৭. আমাদের দেশে কুরআন হিফযের সনদ নেয়ার প্রচলন নেই। হাদীস শরীফের যেমন সনদ আছে, ইলমুল কেরাতেরও সনদ আছে। হাদীসের সনদে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, কেরাত বা হিফযের সনদেও থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কুরআনে হাফেয হওয়ার তাওফীক দিলে, চেষ্টা করব একজন অভিজ্ঞ মুত্তাকী ওস্তাদের কাছ থেকে হিফযের সনদ নিতে। সমস্যা হলো, আমাদের দেশে হিফয সনদ গ্রহণের তেমন প্রচলন না থাকায় বড়ছোট বেশিরভাগ হাফেযের কাছেই হিফযের সনদ নেই। আমরা মাদরাসা বা বোর্ডের সনদের কথা বলছি না। সনদ মানে 'ইজাযাহ'। আরবে এই সনদের ব্যাপক প্রচলন। অনলাইনেও ইজাযাহ লাভ করা যায়। সবচেয়ে ভালো হয়, হিফযের পাশাপাশি আল্লাহর কাছে 'বায়তুল্লাহ' যেয়ারতের

তওফীক চেয়ে দোয়া করা। মক্কা-মদীনা উভয় মসজিদেই সরকারি ব্যবস্থাপনায়, অনেক সনদধারী হাফেয/ক্বারী সাহেবান বসে থাকেন। আগ্রহীগণ তাদের কাছে পড়া শুনিয়ে সনদ গ্রহণ করতে পারেন।

আমিও মসজিদে নববীতে প্রতিদিন ফজরের পর, ২৬০ নম্বর জুতার বাক্সের কাছে, এক ওস্তাদের কাছে বসতাম। কিন্তু সনদ নেয়ার সৌভাগ্য হয়নি। ইয়া আল্লাহ, আমাকে আপনার নবীর দেশে গিয়ে, হিফযের সনদ লাভের সৌভাগ্য দান করুন। এই লেখা যারা পড়বে, তাদেরও তাদের উপযুক্ত ওস্তাদের কাছ থেকে হিফযের সনদ লাভের অপূর্ব সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

হিফযের সনদ বা ইজাযাহ নেয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমি কুরআনে হাফেয হয়েছি, এর স্বীকৃতি লাভ করা। আমি এখন অন্যকেও কুরআন শিক্ষা দিতে পারব, এই অনুমোদন লাভ করা। আমি যা শিখেছি, সেটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবীগণ তাবেয়ীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমিও শিক্ষা লাভ করেছি। আমি সনদের সূত্র ধরে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকেই কুরআন শিক্ষা লাভ করেছি। সনদ হাসিলের পেছনে এমন একটা প্রতীকী রূপ থাকে।

আমাদের দেশে কি কোথাও এভাবে সনদ দেয়ার রেওয়াজ বিদ্যমান আছে? কুষ্টিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, ড. এবিএম হিযবুল্লাহ সাহেব, এ-বিষয়ে বেশ উচ্চকিত। তিনি পরিচিত সবাইকে এ-সনদের ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা করেন। কারী হিসেবে হয়তো অতটা পরিচিত নন। অথচ যোগ্যতার বিচারে তিনি দেশের একজন প্রধানতম কারী। মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ইলমুল কেরাতে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন। আমাদের জানামতে তিনিই দেশের একমাত্র ইলমুল কেরাতে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ব্যক্তি। রাব্বে কারীম তাকে দুনিয়া আখেরাতে খাইর ও বরকত দান করুন। তার পরিবার-পরিজনকে আমন ও আমানে রাখুন। আমীন।

৪৮. কুরআনি মাদরাসা, হিফযখানাগুলো ওস্তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর কথা খুব বলা হয়। বলার দরকারও আছে। পাশাপাশি আরেকটা দিকও গুরুত্বের সাথে বলা দরকার, কুরআনি মাদরাসায় পড়তে আসা তালিবে ইলমরাও সম্মান পাওয়ার হকদার। তারা আল্লাহর মেহমান। তারা আল্লাহর কালাম শিখতে এসেছে। তাদের সম্মান করা মানে, আল্লাহকে সম্মান করা। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা মানে আল্লাহর সাথে দুর্ব্যবহার করা। তাদের দোষত্রুটি দুষ্টুমি উৎপাত সাধ্যমতো সবরের সাথে মেনে নেয়ার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। অহেতুক শাসন করে, তাদের কুরআনবিমুখ করে দেয়া মহাপাপ।

৪৯. কুরআনের পথিককে সব সময় তার কলবের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। কলবে রিয়া এসে গেল কি না, কলবে অহংকার এসে গেল কি না। আল্লাহর একান্ত বাছাই করা ব্যক্তিরাই কুরআনের পথিক হতে পারে। কুরআনের হাফেয হতে পারে। নিয়মিত দৈনিক হিযব আদায় করতে পারে। এ জন্য শয়তান সর্বশক্তি ব্যয় করে, তাদের পেছনে পড়ে থাকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করাই আমাকে শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচাতে পারে।

৫০. কুরআন শিক্ষার্থীকে সব সময় তার ওস্তাদের আদব বজায় রাখার প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখতে হয়। বর্তমানে একটা প্রবণতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অনেক সময় দীনি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। ইলম শেখার উদ্দেশ্যে নয়। যার কাছে নিয়মিত কুরআন শেখার সুযোগ হয়, নিয়মিত ইলম শেখার সৌভাগ্য হয়, তাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ। নিজেকে কুরআনি ইলম থেকে বঞ্চিত করার পূর্বাভাস। ইলমের পথ পুরোটাই আদব-ইহতিরামের ওপর নির্ভরশীল। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই ধারা চলে আসছে। ইলম আসে আদবের পথে।

৫১. এখন টাকা দিয়ে সনদ কেনা যায়। দুনিয়াবি শিক্ষার মতো, কুরআনের বেলায়ও এমন পন্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যোগ্যতা ছাড়াই সনদ ইজাযাহ লাভ করা, নিজের প্রতি জুলুম করারই নামান্তর। দীনকেও টাকাপয়সা দিয়ে কেনাবেচার বিষয়ে পরিণত করা, কেয়ামতের লক্ষণ। ভুয়া লাইসেন্স বাগিয়ে হাতুড়ে ডাক্তারি করার চেয়েও, টাকায় কেনা সনদ দিয়ে, দীন বেচে খাওয়া আরও বেশি ভয়াবহ।

৫২. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দ কী? কুরআনের হিফয সম্পন্ন করার আনন্দ। একজন তালিবে ইলম যখন হিফযের শেষ সবক ইয়াদ করতে বসে, শেষ সবক শোনানো শেষ করে, সেই সময় তার আবেগ উচ্ছ্বাস আর আনন্দের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একজন হাফেয পুরো কুরআন হিফয করে, এক আয়াত এক আয়াত করে পড়ে, জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করারই আগাম ট্রায়াল দিলো।

৫৩. কুরআন কারীম হিফয করতে পারা, আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। আল্লাহর এই বিরাট অনুগ্রহ লাভ করতে হলে, মরিয়া হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার বিকল্প নেই। কুরআন হিফযের প্রধান সহায়ক শক্তি দোয়া, ছাত্রের মেধাশক্তি নয়। উঠতে-বসতে আল্লাহর কাছে তাওফীক চেয়ে দোয়া করা। কোনো সূরা সহজে মুখস্থ হতে না চাইলে দোয়ায় মশগুল হয়ে পড়া। কোনো পারা মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে, কালবিলম্ব না করে, আল্লাহর দরবারে হাত পেতে বসে থাকা। আমার আত্মনিবেদন দেখে, আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরে ঢেউ উঠবে। তিনি আমাকে অনায়াসে হাফেয বানিয়ে দেবেন। ইন শা আল্লাহ।

৫৪. ইমাম দাহহাক রহ. বলেছেন, কেউ যখন কুরআন (হিফয করে বা পড়তে) শেখার পর ভুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ 'গুনাহ'। কুরআনে আছে,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয় (শুরা, ৩০)।

কুরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মুসীবত আর কী হতে পারে?

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা রহ.)।

৫৫. কুরআন তিলাওয়াত ও হিফযে দক্ষতা অর্জনের পথ তিনটি। বেশি বেশি অভিজ্ঞ কারী সাহেবানের কেরাত শোনা। নিজে বেশি বেশি পড়া। যা পড়া হয়েছে, হিফয হয়েছে, আরেকজনকে শোনানো।

৫৬. কুরআন হিফযের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আশপাশ। বেশির ভাগ হাফেযে কুরআনই মা-বাবা বা আশেপাশের প্রভাবে কুরআন হিফয করেন। আবার চেষ্টা করেও হাফেয হতে না পারা অধিকাংশ ব্যক্তিও হিফয ছেড়ে দেন, আশেপাশের কথা বা আচরণে প্রভাবিত হয়ে। কুরআন হিফয করতে চাইলে, আশপাশ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কী হবে এত কষ্ট করে? হাফেয হওয়া ফরয ওয়াজিব কিছুই নয়, কেন এত কষ্ট করছ? তার চেয়ে বরং কুরআন বোঝার চেষ্টা করো, তাফসীর পড়ো, বেশি ফায়েদা হবে। এমন আরও নানা পরামর্শ আসতে থাকবে। এসবকে পেছনে ঠেলেই হিফযের দিকে পা বাড়াতে হবে।

৫৭. আমি কুরআন কারীম পড়তে শেখার সময়, হিফয করার সময়, যেসব ভুল করেছি, সেগুলো যত্ন করে লিখে রাখা বা মনে রাখা। ওস্তাদজি আমার পড়া বা পড়ার পদ্ধতিতে যেসব ভুল ধরিয়ে দেন, সেগুলোও মাথায় রাখা। নিজে অন্যকে পড়ানোর সময় সেগুলো কাজে লাগবে।

৫৮. অভিজ্ঞ ওস্তাদের কাছে, একটা তাজবীদের কিতাব খুবই ভালো করে পড়ে নেয়া। মশক করে করে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ইলমে-আমলে অনেক বড় হলেও, কুরআন পড়া শুদ্ধ নয়, এমন মানুষও সমাজে দেখা যায়। পেছনে মুক্তাদি হলে, নামাজে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। অথচ দীর্ঘসময় লাগিয়ে মাদরাসায় পড়েছেন। অবশ্য এই চিত্র এখন কিছুটা বদলাচ্ছে।

৫৯. ছেলেকে ভর্তি করিয়ে, মাদরাসায় রেখে আসার সময়, আলিম বাবা পুত্রকে অশ্রুভেজা গলায় শেষ উপদেশ দিলেন, কোনো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত ছাড়বে না। তুমি যত ইলম-কালামই শেখো, সবই কুরআনের জন্য। তুমি যতটুকু তিলাওয়াত করবে, অন্য ইলমে সে পরিমাণ বরকত তুমি আল্লাহর কাছ থেকে পাবে।

৬০. কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি কথাবার্তা শুনলে বেশ অবাক লাগে। তারা মুয়াল্লিমুল কুরআনকে সত্যিকারের মানুষ বলেই মনে করে না। তারা মনে করে, মুয়াল্লিমুল কুরআন সমাজের নিচুস্তরের লোক। সন্তানকে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি শিক্ষা দেয়ার জন্য টাকার মায়া করে না। টাকার যত মায়া মুয়াল্লিমুল কুরআনের বেলায়। দুনিয়ার পেছনে টাকা ঢালতে মন বাধে না, কুরআনের জন্য যাবতীয় অভাব-অনটনের ফিরিস্তি শুরু হয়ে যায়। সবারই জানা আছে, কুরআনের জন্য ব্যয় করা টাকার পুরোটাই আল্লাহর কাছে জমা থাকবে। তবুও দুনিয়া তাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখে।

৬১. কুরআন শিখতে গেলে, এমন শিক্ষকের কাছে যাওয়া, যার কাছে ইলমের আগে আমল শেখা যাবে। পেশাদার মুয়াল্লিমুল কুরআনের চেয়ে নেশাদার মুয়াল্লিমুল কুরআন বেছে নেয়া উত্তম। কুরআন কারীম যাদের নেশায় পরিণত হয়েছে, এমন শিক্ষক না পেলে অগত্যা পেশাদার মুয়াল্লিমুল কুরআনের দ্বারস্থ হতে হবে। নেশা ও পেশা একসাথে আছে, এমন শিক্ষক পেলে সোনায় সোহাগা।

৬২. আমি যত দক্ষ হাফেযই হই, আমার মধ্যে বিনয়নম্রতা না থাকলে, আমি ক্ষতির মধ্যে আছি। এমন হাফেযও দেখা যায়, তারা শুধুই কুরআনে হাফেয। অল্পবয়েসেই মিডিয়া-খ্যাতির পাল্লায় পড়ে, হিফযের পর আর পড়তে পারেননি। আল্লাহর ইচ্ছায় দেশে-বিদেশে ঘোরার কারণে টাকাপয়সা হয়েছে। এখন দেশের বড় আলিমকেও ছেড়ে কথা বলেন না। যথাযথ সম্মান বজায় রাখেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমন বেয়াড়া আচরণ হাফেযে কুরআনের সাথে যায় না। গলা আর টাকার জোর স্থায়ী কোনো 'অবলম্বন' নয়। শুধু কুরআন মুখস্থ করলেই হবে না, কুরআনের শিক্ষা জীবনে ধারণ করা উচিত।

৬৩. দৈনিক হিযব নিয়মিত আদায় করার একটি উপায় হলো, হিযব আদায়কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মতো আবশ্যকীয় অভ্যেসের মতো করে নেয়া। নামায ছুটে যাওয়ার কথা মনে হলে যেমন ভয় লাগে, হিযব ছুটে গেলেও যাতে সে-রকম ভয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে। নামায আদায় না করলে যেমন অস্থির অস্থির লাগে, হিযব ছুটে গেলেও যেন সে রকম অস্থিরতা তৈরি হয়।

৬৪. হেফযখানার ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকের সমালোচনা করার প্রবণতা কাজ করে। এই প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহারযোগ্য। মা-বাবাকেও এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। সন্তান যেন কিছুতেই ওস্তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে। বেশির ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ওস্তাদ যৌক্তিক কারণে শাসন করলেও, দুষ্ট সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে, ভালো শিশুরাও ওস্তাদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। অভিভাবকদের এ-বিষয়টা খুবই গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা জরুরি।

৬৫. হিফযের সবক শোনাতে গেলে, ভুল করলে ওস্তাদ অনেক সময় সবক না শুনে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হেফযখানার পরিভাষায় বলা হয় 'উঠিয়ে দেন'। একই সবকের জন্য বারবার উঠিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। ছাত্রকে এমন পরিস্থিতিতে মন খারাপ করতে নেই। ভেঙে পড়তে নেই। মা-বাবা আর ওস্তাদকেও ছাত্রের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রাখা জরুরি। ছাত্র যেন বিগড়ে না যায়। ছাত্রকে বলতে হবে, কুরআন শরীফ বারবার পড়তে পারা, আল্লাহর নেয়ামত। বাধ্য হয়ে পড়ার মানে এও হতে পারে, আল্লাহ তোমার পড়াটা বারবার শুনতে চাচ্ছেন। তাই সহজে সবকটা মুখস্থ হচ্ছে না। যতবার পড়ছ তোমার সওয়াব হচ্ছে। আল্লাহর দরবারে তোমার মর্যাদা বুলন্দ হচ্ছে।

৬৬. অতিব্যস্ত জীবনে দৈনিক হিযব আদায়ের জন্য একটানা লম্বা সময় পাওয়া না গেলেও সমস্যা নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প করে হিযব আদায় করে নেয়া যেতে পারে। একবারে এক পৃষ্ঠা আধা পৃষ্ঠা করে পড়া সহজ। কাজের ফাঁকে সামান্য তিলাওয়াত কাজেও নতুন শক্তি উৎসাহ মনোযোগ এনে দেবে। কাজের অবসাদ দূর করতেও কুরআনি টনিক ব্যবহার করা যায়। প্রচণ্ড কাজের চাপে, ত্রিশ সেকেন্ড বিরতি দিয়ে কুরআন কারীম খুলে একটা লাইন পড়ে নিতে পারি। এটা হতে পারে, গুমোট পরিবেশে বিশুদ্ধ বাতাস।

৬৭. শরীরের মতো আমার মাথা ও মনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। কুরআন তিলাওয়াতই হতে পারে সেই বিশ্রাম। হাঁটাচলায় কুরআন পড়তে পারি। হাঁটার কষ্ট অনেকটাই দূর হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা তৈরি হলে, মুসহাফ খুলে একটু কুরআন পড়ে নিতে পারি। কুরআনকে বানাতে হবে সার্বক্ষণিক সঙ্গী। একবারের বসায় বেশি পড়ার দরকার নেই। একটা আয়াত পড়েই মুসহাফ রেখে দিতে পারি। তবুও কুরআনের সাথে সংযোগ অটুট থাকুক।

৬৮. কারও কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময়, ঘুণাক্ষরেও ভুল ধরার মানসিকতা মনে স্থান দেয়া যাবে না। ভুল ধরা পড়লে, আমি 'পারি', অন্যে 'পারে না' এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। এক ছোট্ট হাফেয তার ওস্তাদকে বলল, হুজুর আমি ওমুক বিখ্যাত কারীর পুরো কুরআন শুনে, সর্বমোট পাঁচটি ভুল ধরেছি। হুজুর উত্তর দিলেন, সুবহানাল্লাহ পুরো ত্রিশ পারায় মাত্র 'পাঁচটি'? তাহলে তো তিনি বহু উর্ধ্বে উঠে গেছেন।

বুদ্ধিমান ওস্তাদ ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রের ভুল প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেননি। কুরআনের সাথে কোনোভাবেই অহংকারকে মেশানো যাবে না। কুরআনের সাথে থাকতে হবে বিনয় নিয়ে।

৬৯. তৃতীয় হিজরীর বিখ্যাত বুযুর্গ, সাহল তুস্তরী রহ.। তাঁর এক ছাত্রের কাছে জানতে চাইলেন, কুরআন হিফয করেছ? জি না। সুবহা-নাল্লাহ! এ কেমন মুমিন,

কুরআন হিফয করে না? তাহলে তুমি কী দিয়ে গুনগুন করবে? কী নিয়ে আনন্দ উদযাপন করবে? কী দিয়ে তোমার রবের সাথে কথা বলবে?

৭০. আল্লাহ তাওফীক দিলে কী না সম্ভব? ইমাম আল্লামা কাযি ইযযুদ্দীন বিন জামা'আহ রহ.। ৮১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বেশি বয়েসে ইলম শেখা শুরু করেছিলেন। মাত্র এক মাসে পুরো কুরআন হেফয করে ফেলেছিলেন।

-বুগইয়াতুল উ'আত, আল্লামা সুয়ূতী রহ.।

৭১. মুয়াল্লিমুল কুরআনের কী অপূর্ব সৌভাগ্য! প্রতিদিন তার কাছে কত ছাত্র কুরআন পড়তে আসে। ছাত্ররা হাজার হাজার হরফ তিলাওয়াত করে। সবগুলোর সওয়াব ওস্তাদের আমলনামায় লেখা হয়। মুয়াল্লিমুল কুরআনের এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?

৭২. তাজভীদ শেখার পর, প্রথম প্রথম কিছুদিন কুরআন তিলাওয়াত সাবলীল থাকে না। মুখে আটকায়। বারবার আটকাতে হয়। ইলমুল কেরাতে অভিজ্ঞ কোনো ওস্তাদের কাছে পড়তে গেলেও প্রথম প্রথম এত ভুল ধরা পড়ে, অনেক সময় মনে হয়, ইহজনমে বুঝি শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারব না। ধৈর্য ধরে কয়েক দিন মশক চালিয়ে গেলে, আর সমস্যা থাকে না। সহজ হয়ে ওঠে। মুখের আড় ভাঙতে থাকে। তিলাওয়াতও সাবলীল ফুরফুরে হয়ে ওঠে। ওস্তাদের কাছে অনুশীলনের পাশাপাশি বেশি বেশি অভিজ্ঞ কারী সাহেবানের তিলাওয়াত শুনতে হবে। বেশি বেশি নিজে তিলাওয়াত করতে হবে।

৭৩. মুতাশাবিহাত আয়াত নিয়ে হাফেযদের অনেক ভুগতে হয়। পাকাপোক্ত ইয়াদ আর বেশি বেশি চর্চা ছাড়া, মুতাশাবিহাতের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ভিন্ন কোনো পথ নেই। বাজারে এ-বিষয়ে বহু কিতাব আছে। সেগুলোর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি, নিজেও মুতাশাবিহাতের খাতা বানিয়ে নিতে পারি। নিজে বানালে সুবিধা হলো, বিষয়টা বেশি চর্চা হয়। জেহেনে বসে। অন্য কিতাব সামনে রাখলে, চর্চা কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়।

৭৪. হাফেযে কুরআন বড় আলেম হয়ে গেলেও, ছোটবেলার হিফযের শিক্ষককে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নূরানী-হিফয বিভাগের ওস্তাদকে সব সময় আদর-যত্ন, আদব-ইহতিরাম করে যাওয়া জরুরি। তারা আমার ভিত গড়ে দিয়েছেন। প্রতিটি দোয়ায় তাদের কথা স্মরণ রাখা জরুরি। তারা আমার মাতা-পিতার মতোই। আমার পেছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

৭৫. বড় ও বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে যেতে অনেক সময় ভয় কাজ করে। তারা আমার মতো ছোট ছাত্রকে গ্রহণ করবেন কি না, এ-নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়। সংকোচের কারণে তাদের কাছ থেকে কিছু শেখা হয়ে ওঠে না। সংকোচ ঝেড়ে

ফেলে, সরাসরি তাদের দরবারে হাজির হয়ে যাওয়া উচিত। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায়, আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি খুবই বিনয়ী। ছাত্রবৎসল। কুরআনি ইলমের জন্য মনে কোনো ভয় বা জড়তা রাখা উচিত নয়। কুরআনি ইলমের জন্য মরিয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৭৬. মুয়াল্লিমুল কুরআনের দায়িত্ব, জরুরি ভিত্তিতে একটি কাজ নিয়মিত করা। শিষ্যদের সামনে কুরআন-বিষয়ক আয়াতগুলো নিয়মিত তুলে ধরা। আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাদের মনে গেঁথে দেয়া। বিশেষ করে এই আয়াত,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ

আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে রব্ব, তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে (ত্বহা, ১২৪-১২৬)।

৭৭. হিফযখানায় ওস্তাদজি কুরআনের আয়াত দিয়েই শিষ্যদের উপদেশ দেবেন। পঠিত আয়াত সাধ্যমতো নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন, তাদের যেকোনো সমস্যার সমাধান কুরআন থেকে দেয়ার চেষ্টা করবেন। অন্তত সরাসরি প্রাসঙ্গিক না হলেও, ধারেকাছের অন্তত একটি আয়াত পাঠ করবেন।

৭৮. কুরআন কারীম হিফয অনেকেই করতে পারে। কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষ আছে, যারা আল্লাহর প্রতি নতজানু হয়ে, সমর্পিত চিত্তে, বিনয়ন্ম্রতার মনোভাব নিয়ে হিফয করে। প্রতিটি সূরা শুরুর আগে, প্রতিদিন নতুন হিফয করতে বসার আগে, নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা উচিত। নিছক নিজের মেধামেহনতের ওপর আত্মবিশ্বাস রেখে আল্লাহর ভূমিকাকে গৌণ করে ফেলা মুমিনের কাজ নয়। হিফয করার সময়, প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখা দরকার, আমার কোনো শক্তি নেই, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ আর তাওফীকের বদৌলতেই আমি হিফয করতে সমর্থ হব। একজন সুদক্ষ হাফেয হতে গেলে, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ওপর তাওয়াক্কুলের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর মহা কুদরতের কাছে নিজের দুর্বলতা অসহায়ত্ব স্বীকার করা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।

৭৯. কুরআনে হাফেযের উচিত, নিজের নেক আমলের কথা মনে না রাখা। যথাসম্ভব নিজের নেকবাজগুলো ভুলে থাকা নিরাপদ। নিজের নেক আমলকে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত মনে করার মানসিকতা থাকলে, পরিহার করা জরুরি। পাশাপাশি

পুরো কুরআন হিফয হয়েছে বা এত এত পারা হিফয হয়েছে, এটা নিয়ে মনের মধ্যে গরম ভাব রাখাও বিপজ্জনক। এমন মানসিকতা থেকে অহংকার জন্মায়। আল্লাহ তা'আলা অহংকারী থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। আল্লাহ না করুন, কুরআনের হিফয ছিনিয়ে নিলে, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর হতে পারে না।

৮০. কুরআনের প্রতি উদাসীন বা কুরআন হিফযের প্রতি আগ্রহী নয়, এমন কাউকে কুরআনের প্রতি আগ্রহী করে তোলার কার্যকর একটি উপায় হচ্ছে, নিজের হিফয করা অংশ থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে তাকে শোনানো। সে কুরআন খুলে পড়া ধরবে। ভুল হলে বলে দেবে। নিয়মিত কিছুদিন কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। ইন শা আল্লাহ কুরআনের প্রতি তার আগ্রহ বাড়বেই।

৮১. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরআন হিফযে কোনো টাকা খরচা নেই। কুরআন হিফযে সময়ের অপচয় হওয়ার ভয় নেই। পৃথিবীর যাবতীয় শাস্ত্র মুখস্থ করলে, তার সবটা কাজে না লাগারও সম্ভাবনা থাকে। একমাত্র কুরআন কারীম ব্যতিক্রম। যতটা মুখস্থ করব, তার পুরোটাই কাজে লাগবে। এখানে দুনিয়াতে, ওখানে আখেরাতেও। কুরআন হিফযের পেছনে সময় ব্যয় করলে, আমার অন্য কাজে ব্যাঘাত ঘটবে, এমনটা ভাবা উচিত নয়। আমি মুসলিম হলে, আমার জীবন-মরণ, সময়মেধাশ্রম সবই তো কুরআনের তরে হওয়া উচিত ছিল। কুরআনের সাথে সময় কাটানোকে জীবনের জন্য, রুজি-রোজগারের জন্য ক্ষতিকর ভাবছি কী করে? কুরআন কি নিজেই 'মুবারক' নয়? বরকতময় নয়? এ তো আল্লাহ তা'আলারই স্বীকৃতি।

৮২. প্রতিজ্ঞা করার পরও দৈনিক হিযব আদায় করা হয়ে উঠছে না? বারবার চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হচ্ছি? আমাকে দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখতে হবে। ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে, আমি কোনো গুনাহে লিপ্ত আছি কি না। আমি এমন কোনো কাজ করছি কি না, যা অজান্তেই আমাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এমন কোনো বই পড়ছি কি না, যার বিষয়বস্তু মনে 'অন্ধকার' সৃষ্টি করে। মোবাইল/টিভি/ল্যাপটপে এমন কিছু দেখছি কি না, যা দুনিয়া-আখেরাতে কোনো কাজেই আসে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কারও সাথে যুক্ত কি না, যার সাথে যোগাযোগ রাখা সম্পূর্ণ হারাম। এমন কোনো বন্ধু আছে কি না, যার সাথে ওঠাবসা করলে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়ার দিকে মন বেশি ঝুঁকে পড়ে? এমন কোনো আড্ডায় বসি কি না, যেখানে শুধু দুনিয়া আর দুনিয়া নিয়েই কাজকারবার হয়? আমার পাতে যে খাবার উঠছে, সেখানে সুদঘুষজুলমের চিহ্ন নেই তো? নামাযের সময় এসে চলে যাচ্ছে দেখেও দুনিয়াবি কাজে মশগুল থাকছি না তো? এসব ঠিক থাকলে, দৈনিক হিযব এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে।

৮৩. কুরআন হিফয করলে দুনিয়ার বড় কোনো পদমদ লাভ হবে না। কুরআন হিফয আমাকে হয়তো দুনিয়াবি প্রাপ্তি জুটিয়ে দেবে না। তবে, কুরআন হিফয

আমাকে আল্লাহর রহমত এনে দেবে। আমাকে আল্লাহর খাস আর বিশেষ বান্দায় পরিণত করবে। আমাকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে। আমাকে আত্মিক রোগব্যাধি থেকে পবিত্র রাখবে। আমাকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। আমাকে সঠিক-সরল পথে পরিচালিত করবে। আমাকে শুধু হিফযের পাশাপাশি একটু একটু করে বোঝার চেষ্টাও করতে হবে।

৮৪. আমাকে আগে ঠিক করতে হবে, কুরআন কারীম আমার কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কি না এটা নির্ধারিত হলে, অনেক প্রশ্নের উত্তর এমনি এমনি স্পষ্ট হয়ে যাবে। কুরআন কারীম আমার কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হলে, দৈনিক হিযব আদায়ে ব্যস্ততার অজুহাত থাকবে না। কারণ, তখন যত ব্যস্ততাই থাকুক, সব কুরআনের নিচে।

৮৫. দৈনিক হিযব আদায়ের অন্যতম উপকারিতা হলো, কলবকে প্রশান্ত করে তোলে। মনের অস্থিরতা দূর করে। মনের আঁধারকে আলোয় ভরিয়ে তোলে। ভেতরের পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে। নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গপূর্ণ করে তোলে। সর্বোপরি জীবনকে বরকতময় করে তোলে।

যেমনটা কুরআনে আছে (كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ)এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি (সোয়াদ, ২৯)।

৮৬. তিলাওয়াতের আগে ও পরে, হিফযকারী ও দৈনিক হিযব আদায়কারীর কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

১. তিলাওয়াত শুরুর আগে, নিয়ত দুরুস্ত করে নেয়া। ইখলাস বিশুদ্ধ করে নেয়া। ইখলাস মানে, শুধু আল্লাহর জন্যই কোনো আমল করা। আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা দুর্বলতা তুলে ধরা। নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে সাহায্য প্রার্থনা করা।

২. তিলাওয়াত শুরুর আগে বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। মনকে আল্লাহমুখী করে তাওফীক চেয়ে দোয়া করা। এতে তিলাওয়াত সহজ হয়ে উঠবে। হিফয করলে দ্রুত মুখস্থ হবে। ইন শা আল্লাহ।

৩. যদ্দূর হিফয হয়েছে, সেটাকে সলাতে পড়ার চেষ্টা করা। আগে যা হিফয হয়েছে, যতটুকু সম্ভব সেটাও সলাতে তিলাওয়াতের চেষ্টা করা।

৪. গুনাহ থাকলে, হিফয থাকে না। তাই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। নজরের হেফাজত করা। জবানের হেফাযত করা। অনর্থক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা।

তিলাওয়াত-পরবর্তী কিছু করণীয়,

১. নির্দিষ্ট পরিমাণ হিফয ও তিলাওয়াত শেষে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করা। অন্তর থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করা। তিনি তাওফীক দিয়েছেন, এ জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ গদগদ থাকা।

২. তিলাওয়াতের সময় যেসব আয়াত ভাবিয়ে তুলেছিল, সেসব আয়াত আবার ভাবনায় আনা। সম্ভব হলে ভাবনাগুলো লিখে রাখা বা অন্য কারও সাথে কথা বলে নেয়া।

৩. আগ্রহের শেষসীমা পর্যন্ত তিলাওয়াত না করা। আগ্রহ একটু বাকি রেখেই তিলাওয়াত শেষ করা।

৪. যা তিলাওয়াত করেছি, যা হিফয করেছি, সেটা আমলে আছে কি না, যাচাই করে দেখা। আমল না থাকলে ইলমে বরকত থাকে না।

৮৭. দৈনিক হিযব আদায় করতে পারছি, প্রতিদিন কিছু কিছু হিফয করতে পারছি, এ জন্য আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা। উঠতে বসতে এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। ইলমের পূর্ণতা আমল ও শোকরে। ইলমে বরকত আসে আমল আর শোকরের দ্বারা,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদের আরও বেশি দেবো (ইবরাহীম ৭)।

৮৮. আমি কি কুরআনে হাফেয? হাফেয না হলেও, আমার কি সাধারণের তুলনায় একটু বেশি কুরআন মুখস্থ আছে? আমি কি আমার মুখস্থ থাকা সূরা বা আয়াতগুলো নিয়মিত নামাজে তিলাওয়াত করি? কেন করি না? নামাজে পড়ার মতো মুখস্থ নেই বলে? নামাজেই যদি তিলাওয়াত না করলাম, তাহলে এই মুখস্থের কী দাম রইল?

৮৯. ছোট ছোট সূরা দিয়ে নামাজ পড়ার বাইরে গিয়ে, তিলাওয়াত করাকে কঠিন কাজ মনে হয়? এটা ভুল ধারণা। কাজটা মোটেও কঠিন নয়। প্রয়োজন সদিচ্ছার। আমাকে প্রথমে ঠিক করতে হবে, কোন কোন সূরা বেশি ইয়াদ আছে। প্রথমে সেগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে। হিম্মত না হলে, নামাজে দাঁড়ানোর আগে কাঙ্ক্ষিত সূরাটা বারবার ইয়াদ করে নিতে হবে। পরিমাণ অল্প করে হলেও কাজটা শুরু হোক। কাজটা কঠিন মনে হলেও, মোটেও কঠিন নয়। আস্তে আস্তে পুরো কুরআনকে নামাজের তিলাওয়াতে নিয়ে আসতে হবে। তাহাজ্জুদে, আগে-পরের সুন্নত নফলে। ইন শা আল্লাহ।

৯০. কুরআন হিফযের সময় একটা ভুল প্রায় সবাই করে, প্রতিদিন নতুন আয়াত হিফযের প্রবল আগ্রহে পুরোনো হিফযের কথা ভুলে যায়। নতুনের মতোই পুরোনো হিফযকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।

৯১. আল্লাহর অশেষ রহমত, তিনি আমাদের এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। হায়াত আর কতটুকু বাকি আছে, সেটা আমরা কেউ জানি না। আমি চাইলে কুরআনের হাফেয হয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হতে পারি। এখনই প্রতিজ্ঞা করে হিফয শুরু করে দিতে পারি। শেষ করতে পারি আর না পারি, হিফয-প্রত্যাশীদের তালিকায় তো একবার নাম উঠিয়েছি শেষবিচারের দিন এই তালিকায় নাম থাকাও নাজাতের উসীলা বনে যেতে পারে। আর দেরি কেন?

৯২. কুরআন কারীম হিফয করতে পারা আল্লাহর দেয়া এক বড় নেয়ামত। আমি কুরআনকে সীনায় সংরক্ষণ করলে, কুরআনও আমাকে নিচু অনৈতিক কাজ থেকে রক্ষা করবে। অনর্থক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করবে। মিথ্যা-ভ্রান্ত চিন্তা থেকে রক্ষা করবে। অনৈতিক অশ্লীল আচরণ থেকে রক্ষা করবে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করবে। কুরআন হিফয আমাকে আকাশের উচ্চতায় উন্নীত করবে।

৯৩. ভালো হাফেয হতে পারলে, ভালো কারী হতে পারলে, অনেক সময় মনে অহংকার জন্মায়। তখন তিলাওয়াতে রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমি কীভাবে বুঝব আমার কুরআনি মেহনতে রিয়ার সংমিশ্রণ আছে কি না?

আমি অন্যকে তিলাওয়াত শোনানোর সময়, অন্যকে নিজের কুরআন-বিষয়ক যোগ্যতার কথা বলার সময়, যদি তাকে মুগ্ধ করা, নিজের কৃতিত্ব জাহির করা হয়, তাহলে এটা রিয়া। আর যদি সওয়াবের আশায় হয়, অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য হয়, এটা ইবাদত। আশা করা যায়, আল্লাহ্ কবুল করবেন।

৯৪. যখন আমি আত্মমুগ্ধ হয়ে তিলাওয়াত করি, অন্যদের চেয়ে নিজেকে সেরা শ্রেষ্ঠ মনে করে, অন্যদের মুগ্ধদৃষ্টি আর প্রশংসা লাভ করতে চাই—আমি রিয়াকারী। যখন আমি অন্যদের কুরআনের নূর বিতরণের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করি, অন্যদের আনন্দ দেয়ার জন্য তিলাওয়াত করি, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিলাওয়াত করি—আমি ইবাদতকারী। ইন শা আল্লাহ্।

৯৫. বড় হয়ে হিফয শুরু করলে, প্রথম দিকে যাকে-তাকে বলে বেড়ানো ঠিক নয়। অনেক সময় মুখদোষ লাগে বা নেতিবাচক মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়। যাদের কাছে দোয়া পাওয়া যাবে, উৎসাহ প্রেরণা পাওয়া যাবে, তাদের বলা যেতে পারে। তবে যতটা সম্ভব গোপন রাখাই নিরাপদ। হিফযের শুরুতে নিজের 'ইখলাস' ঠিক করে নেয়া। বারবার যাচাই করে নেয়া, আমি আল্লাহর জন্যই হিফয করছি তো?

অনেক সময় হিফযের শুরুতেই ইখলাস দুর্বল হয়ে যায়। হিফয শুরু করার পর, অন্যদের বলার জন্য মন নিশপিশ করতে থাকে। কেউ গান শিখলে, সুযোগ পেলেই সেটা অন্যদের শুনিয়ে মুগ্ধদৃষ্টি দেখতে চায়। কুরআন যেন গানের মতো হয়ে না যায়।

৯৬. কুরআন কারীম হিফয করতে পারা, আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। এই নেয়ামত পেয়ে আনন্দিত হওয়াও ইবাদত। কিন্তু আনন্দ যেন রিয়া আর তাকাব্বুর হয়ে না যায়, সেদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখা জরুরি। শয়তান সব সময় ওত পেতে আছে। তবে জোর করে গোপন করাও ঠিক নয়, যার-তার কাছে প্রকাশ করাও ঠিক নয়। স্বাভাবিকভাবে আপন কাজ করে যাওয়াই ভালো। শুধু খেয়াল রাখা, ইখলাস ঠিক আছে কি না। নিয়মিত আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দোয়া করে গেলে, আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইতে থাকলে, লোকে জানলেও সমস্যা নেই। শয়তানও সুবিধা করতে পারবে না। আল্লাহই রক্ষা করবেন।

৯৭. দৈনিক হিযব আমার জন্য নেয়ামত। আমার ওপর বোঝা নয়। নিয়মিত আমার নিয়তের অবস্থা যাচাই করে নেব। আমি কেন হিযব আদায় করি? এই প্রশ্নের উত্তর সব সময় মনে হাজির রাখলে, হিযববিরোধী অনেক সমস্যা এমনি এমনি সমাধান হয়ে যাবে। অনীহা নিয়ে হিযব আদায়ে উপকার কম। কুরআন বড় আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন কিতাব। উদাসীন কলবে কুরআন বসে না। ধীরস্থির তিলাওয়াত, বিনয়নম্র সুর কুরআনকে কাছে টানে।

৯৮. তিলাওয়াতের আগে, আমার মনে বসিয়ে নিতে হবে, আমি সাধারণ কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে যাচ্ছি না। আমি মহান রাব্বুল আলামীনের কালাম তিলাওয়াত করতে যাচ্ছি। আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর শক্তি উপলব্ধিতে জাগরূক রেখে তিলাওয়াত শুরু করতে হবে। একটু পরপর মনে হাজির করতে হবে, তিলাওয়াতকালে আমি প্রতিনিয়ত রহমত নূর হেদায়াত শিফা লাভ করছি।

৯৯. দৈনিক হিযব আদায়ের অন্যতম একটি উপকার হলো, আমি অনুভব করেছি, দীর্ঘদিন ধরে আমার মধ্যে থাকা কিছু বদভ্যেস, যেগুলো আমি শতচেষ্টা করেও দূর করতে পারছিলাম না, দৈনিক হিযব শুরু করার পর, আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো সহজেই দূর হয়ে গেছে। দৈনিক হিযব আদায়ে নিজেকে সহজেই ভালোর দিকে পরিচালিত করা যায়। নিজেকে অনায়াসে নেক আমলের দিকে বাড়ানো যায়। নিজের মধ্যে থাকা নানাবিধ সমস্যা দূর হতে শুরু করে।

১০০. আমি অটল-অচল প্রতিজ্ঞা করে নিই, যেকোনো মূল্যে ফজরের পরপরই দৈনিক হিযব আদায় করে ফেলব। এই সময়ে বেশি বরকত পাওয়া যায়। এই সময়ের তিলাওয়াতের প্রভাবও মনের ওপর বেশি পড়ে। শেষ-রাতে আদায় করতে

পারলে আরও উত্তম। একান্ত অপারগ হলে, এই দুই সময় ছাড়া অন্য সময় হিযব আদায় করা যেতে পারে।

১০১. কুরআন হিফযের দশ সূত্র :

১. নিয়ত সহীহ্ করা। নিয়তে ইখলাস আনা। শুধুই আল্লাহর জন্য হিফয করছি। একমাত্র আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্য হিফয করছি।

২. আল্লাহর কাছে ইস্তে'আনত-সাহায্য চাওয়া।

৩. কাকুতিমিনতি করে আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করে দোয়া করা।

৪. যেটুকু হিফয করব, একজন অভিজ্ঞ শায়খের কাছ থেকে শুনে নেয়া।

৫. সরাসরি কুরআন হাতে নিয়ে বারবার তাকরার আওড়ানো। দোহরানো। রিপিট করা। পুনরাবৃত্তি করা।

৬. কুরআন বন্ধ করে বারবার তাকরার করা।

৭. তাহাজ্জুদে-নফলে-সুন্নতে পড়া।

৮. নতুন পড়ার সাথে সাথে পেছনের পড়া নিয়মিত ইস্তেহযার—নতুন করে যাচাই করে দেখা।

৯. আয়াতের তরজমা-তফসীর দেখে নেয়া।

১০. আয়াতকে আমলে পরিণত করা।

১০২. আমি কুরআন কারীমের একটি আয়াত হেফয করতে পারলে, একটি আয়াতের তরজমা-তাফসীর বুঝতে পারলে, এর কৃতিত্ব কখনো কিছুতেই নিজের দিকে টেনে নেব না। আমার ছোট থেকে ছোট অর্জনও আল্লাহর অপার কৃপা ও অশেষ অনুগ্রহেই অর্জিত হয়েছে, এই মনোভাব সব সময় মনে হাযির-নাযির রাখা। ছোট অর্জনের জন্যও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়া।

১০৩. জাগ্রত হৃদয়ে দৈনিক 'বিরদ' আদায় করলে, আমার মধ্যে পরিবর্তন আসবেই। নিয়মিত 'হিযব' আদায় আমাকে হকের পথে অটল-অবিচল রাখবে। মাথার ওপর দুঃখ-দুশ্চিন্তার পাহাড় জমে থাকলেও, দৈনিক বিরদ সবকিছু দূর করে দেবে। অনেক চিন্তা ও বিশ্বাস এমন আছে, যেগুলো বাস্তবে ভ্রান্ত হলেও, সেগুলোর ভ্রান্তি আমার কাছে পরিষ্কার নয়, দৈনিক হিযব আদায়, আমার মাথা থেকে এসব ভ্রান্ত চিন্তাগুলো দূর করে দেবে। চিন্তাগুলোর ভ্রান্তি আমার কাছে পরিষ্কার করে দেবে। কিছু ভ্রান্তি থাকে, পরিবার-পরিবেশ থেকে আসে। জন্ম থেকেই এসব ভ্রান্ত আচার দেখে দেখে বড় হয়। এসব ভ্রান্ত চিন্তা-আচারকে সঠিক অভ্রান্ত মনে করেই বড় হয়। এমন শেকড় গেড়ে বসা ভ্রান্তিও নিয়মিত আন্তরিক হিযব আদায়ে দূর হয়ে যায়। ইন শা আল্লাহ্।

১০৪. আমাকে দৃঢ়সংকল্প করে নিতে হবে, ফজরের আগে বা পরেই দৈনিক হিযব/বিরদ আদায় করে ফেলব। এই সময় তিলাওয়াতের অন্যরকম এক শক্তি থাকে। আগের হিফয ধরে রাখার জন্যও এই সময়ের তিলাওয়াত বেশি উপকারী। অভিজ্ঞজনের পরামর্শও এমন।

১০৫. দৈনিক হিযব আদায়ের অপূর্ব এক প্রভাব লক্ষ করেছি আমার জীবনে। কুরআনি হিযবের প্রভাবে আমার চারপাশের সবকিছু সহজ হয়ে যায়। প্রতিটি কাজে পদক্ষেপে আল্লাহর অনুগ্রহ আর করুণা অনুভব করি। নিয়মিত হিযবের প্রভাব অনেক বন্ধ দুয়ারও সহজে খুলে যেতে দেখেছি। দৈনিক বিরদের বরকতী ছোঁয়ায় আমল-আখলাকেও উন্নতি দেখেছি। ফরয-নফল ইবাদতে উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করেছি। কুরআনের প্রভাবে কেমন যেন মনে হয়, আমার অদৃশ্য কিছু সহযোগী সেবক খাদেম আছে। তারা অগোচরে আমার কাজগুলো এগিয়ে রাখে। মানুষ যদি জানত, কুরআনের সাথে লেগে থাকার কী বরকত আর হাকীকত, তাহলে কুরআন ছেড়ে উঠতেই চাইত না। দৈনিক হিযব/বিরদের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়েই চলত। — নুসাইবা ঈমান (কায়রোয়ান)।

১০৬. দৈনিক হিযবের পরিমাণ একেকজনের একেকরকম। হাফেয আর অ-হাফেযের দৈনিক হিযবের পরিমাণে তারতম্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। সব হাফেয মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারেন না। দশ দিনে খতম করলে দৈনিক হিযব হবে তিন পারা। পনেরো দিনে খতম হলে, দৈনিক দুই পারা। তবে ২৯-দিনে মাস ধরাই নিরাপদ। তাহলে মাসটা কয়দিনের হবে, সেটা নিয়ে বাড়তি ভাবনা করতে হয় না।

১০৭. নিয়মিত হিযব আদায় শুরু করলে, প্রথম প্রথম বাহ্যিকভাবে এর প্রভাব চোখে পড়ে না। কিছুদিন যাওয়ার পর দৈনিক হিযবের প্রভাব পরিস্ফুট হতে শুরু করে। প্রথম কিছুদিন চলে যায়, মনকে পোষ মানাতে। কলবকে পরিষ্কার করতে। একটা আয়না দীর্ঘদিন মাটিতে পড়ে থাকলে, মাটি থেকে তুলেই চেহারা দেখা যায় না। ভালো করে মুছতে হয়, পালিশ করতে হয়। হিযবের প্রথম দিকটাও এমন। কিছুদিন কলবের মরিচা ঘষে সাফ করতে হয়। দীর্ঘদিন শুকনো পড়ে থাকা চৌবাচ্চা পানিভর্তি করতে গেলে, প্রথমে ঢালা পানিগুলো দেখা যায় না। শুকিয়ে থাকা মাটির দেয়াল, পানিগুলো শুষে নেয়। পরে আস্তে আস্তে পানি জমতে শুরু করে। দৈনিক হিযবও এমন। শুরুর দিকের তিলাওয়াত, কলবে লেগে থাকা গুনাহের কালিমা, নিফাক, প্রবৃত্তি, ভ্রান্ত চিন্তা সাফসুতরো করে তোলে। তারপর কলবকে কুরআনি নূরে সাজাতে শুরু করে। কলবের নূর আস্তে আস্তে বাইরে উপচে পড়তে শুরু করে। নিয়মিত হিযব আদায়কারীর আশেপাশের মানুষও তার কুরআনি বারাকাহ লাভ করে।

১০৮. আমরা যারা কুরআন কারীম বুঝি না, তারা শুরুতে না বুঝে দৈনিক হিযব আদায় করলেও, কিছুদিন যাওয়ার পর, কলব নিয়মিত হিযব আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, কুরআন কারীম অল্প অল্প বোঝার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। নইলে হিযব আদায়ও একসময় দরবেশদের তাসবীহ টিপে যিকিরের মতো হয়ে যাবে। না বুঝে তিলাওয়াত করলেও উপকার আছে। তবে সামর্থ্য থাকলে, কেন বোঝার চেষ্টা করব না?

১০৯. নিয়মিত হিযব আদায়ে, অজান্তেই কলবের অনেক রোগ সেরে যায়। হিযব আদায়কারীও টের পায় না। অনেকের কলবে দীর্ঘদিনের দুরারোগ্য নানাবিধ মানসিক ব্যাধি বাসা বেঁধে থাকে। কুরআন আস্তে আস্তে এসব ব্যাধি থেকে কলবকে মুক্ত করতে শুরু করে। কলব পুরোপুরি সাফসুতরো হলে, পরের ধাপে কলবকে ওহীর নূর দ্বারা পূর্ণ করতে শুরু করে। ওহীর নূর যখন কলব ছাপিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, বান্দা পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

১১০. কুরআন হিফযের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকা চরম ভুল চিন্তা। হিফয শুরু করার সময় এখনই। এই মুহূর্তেই। কখন সময় আসবে, কখন শরীর সুস্থ হবে, কখন ব্যস্ততা কমবে, এটার কোনো ঠিক আছে? এর আগে মরে গেলে? একলাইন হলে একলাইন করে হলেও, হিফয শুরুর সময় এখনই।

১১১. আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দৈনিক হিযব প্রতিদিন তিনপারা করে হওয়া দরকার। একপারা তো অবশ্যই। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেলে, দৈনিক হিযব তিনপারায় উন্নীত করা সম্ভব। কুরআন আমাকে যা দিবে, পৃথিবীর অন্য কিছু আমাকে তা দিতে পারবে না। তাহলে কেন আমি কুরআনের সাথে সময় কাটাতে দ্বিধান্বিত থাকব?

১১২. ১৮৫ জন বন্দীর মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়েছিল। তাদের শর্ত দেয়া হয়েছিল, কুরআন হেফয করতে পারলে মুক্তি দেয়া হবে। সাধারণভাবে সাজা ভোগ করে যেসব অপরাধী মুক্তি পেয়েছিল, তাদের অনেকেই পুনরায় কারাগারে এসেছে। আবার কোনো অপরাধ করে। কিন্তু হিফযের শর্ত পূরণ করে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের পুনরায় অপরাধ করে জেলে আসার হার ছিল শতকরা ০%।

১১৩. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায আদায় করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশাবাদী, যাতে কখনো লোকসান হয় না (ফাতির, ২৯)।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

আল্লাহর কিতাব পাঠ করা লাভজনক ব্যবসা।

১১৪. আমি হাফেয হব, কারণ :

১. কুরআনের হাফেয হতে পারা অনেক বড় নেয়ামত। প্রতিটি মুসলমানের এই নেয়ামত লাভের জন্য লালায়িত হওয়া জরুরি। মাদরাসায় পড়িনি, বয়েস বেড়ে গেছে, ব্যস্ততার জন্য সময় নেই, এসব খুবই ঠুনকো অজুহাত। সব অজুহাত ছেড়ে হিফয শুরু করে দিতে পারি।

২. আমার দায়িত্ব তাওয়াক্কুল করে শুরু করে দেয়া। দিনে এক আয়াত বা আধা আয়াত? নিদেনপক্ষে তিন দিনেও এক আয়াত? অসম্ভব কিছু? শুরু না করার যুক্তিসংগত কোনো অজুহাত আছে?

৩. ইমাম যুফার বিন হুযাইল রহ.। ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ। তিনি একটু বেশি বয়েসেই ইমাম আযমের দরবারে এসেছিলেন। পড়াশোনাও দেরি করে শুরু করেছিলেন। প্রথম জীবনে হাফেয হতে পারেননি। জীবনের শেষ দুই বছরে, অন্য সব কাজে সময় কমিয়ে, হিফযুল কুরআনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

৪. আল্লাহর অপূর্ব মহিমা। হিফয শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই মারা গেলেন। মৃত্যুর পর এক পরিচিতজন তাকে স্বপ্নে দেখলেন। অবস্থা জানতে চাইলেন। ইমাম যুফার রহ. বললেন,

-শেষের দুই বছরের জন্য রাব্বে কারীম মাফ করে দিয়েছেন। শেষ দুই বছরের হিফযুল কুরআনের আমল না থাকলে, যুফার ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল! (শরহু মুসনাদি আবি হানীফা, ১/৪৫)

৫. চাকরির ফাঁকে ফাঁকে, গার্হস্থ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে, হিফযুল কুরআন চলতে পারে। এখন তো কত সহজ। কত কত অ্যাপ। একটি আয়াতকে বারবার পড়ে শোনায়। প্রতিটি শব্দকে ভেঙে ভেঙে পড়ে শোনায়।

৬. কুরআন পড়তে পারি না, কুরআন শুদ্ধ নেই, এসব অজুহাত ধোপে টিকবে? প্লে-স্টোরে হিফয সহায়ক কত কত অ্যাপ ছড়িয়ে আছে! কুরআন একদম পড়তে না জানলেও আজকাল হাফেয হওয়া খুবই সহজ। অন্ধরা শুনে শুনে হাফেয হচ্ছে না?

৭. রাব্বে কারীমের ওপর তাওয়াক্কুল করে শুরু করে দিতে পারি না? ইন শা আল্লাহ।

কিয়ামুল লাইল : তাহাজ্জুদ!

ভোররাত ও তাহাজ্জুদ!

আমার প্রিয় মুহূর্ত কোনটি? কেন শেষ-রাত! এ-আবার প্রশ্ন করতে হয়? এর চেয়ে মহার্ঘ মুহূর্ত একজন মুমিনের কাছে আর কী হতে পারে? আমরা মাদরাসার তালিবে ইলমরা তো সারাজীবনই 'আর্লি রাইজিং'-এ অভ্যস্ত। সেই নুরানী খানা থেকে। হিফযখানায় এসে তো সেটা রীতিমতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তির পর্যায়ে চলে যায়। মাদরাসা জীবনে কত শত গল্প, শেষ-রাতে জেগে ওঠা নিয়ে, রাতজাগা নিয়ে, ভোর রাত নিয়ে। শেষ-রাতে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে বেড়ায়। শীতল একটা আবহ ছড়িয়ে থাকে। গা-জুড়োনো মায়াময় একটা আপন আবেশ-পেখম মেলে থাকে।

প্রথম প্রথম জেগে উঠতে কষ্ট লাগে। অভ্যেস হয়ে গেলে, আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। রাতে সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেই হলো। ভোর রাতে চোখ খুলতে কষ্ট হলেও, জোর করে বিছানা ছাড়লে আর সমস্যা হয় না। ভোর রাতের ফযীলত, গুরুত্ব, মর্যাদা নিয়ে অনেক কিছু পড়েছি। জেনেছি। শুনেছি। দেখেছি। অনুভব করেছি। কিন্তু ভোর রাতের কথা মনে হলেই, আমার কেন যেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে মনে পড়ে। তিনি একজায়গায় শেষ-রাতের অনন্যসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। যেমনটা উৎসব বাড়ির অচিন্তনীয় বর্ণনা দিয়েছিলেন সমরেশ বসু, তার 'যুগ যুগ জীয়ে' বইটাতে। আবার গ্রামীণ হাটের অবিস্মরণীয় বর্ণনা পড়েছি দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'। তারাশঙ্করের দৃষ্টি দিয়ে শেষ-রাতকে একটু দেখা যাক :

'রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দ-সঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মতো। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ-সময় কিছুক্ষণের জন্যে তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব-জীবনের চৈতন্যলোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে

জ্যোতির্লোক হয় পান্ডুর: সে-লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে– ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা– অন্ধ রাত্রিদেবতা ললাটচক্ষুর মতো। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতা 'নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিয়াও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মতো দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল'।

আমাদের কুরআন কারীমও কম? কুরআনে রাতের বর্ণনাগুলো অসাধারণ! মানবরচিত লেখার সাথে তুলনা করছি? অসম্ভব। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা চলে বুঝি? একবার জামালপুর গিয়েছি। কাজ শেষ। ঢাকায় ফিরব। শেষ-রাতে ট্রেন। স্টেশন অনেক দূরে। রওনা দিতে হবে বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে, আমাদের ভ্যানে চড়তে হবে। তখন রাত প্রায় দুইটা। হালকা শীত পড়ছে।

শুরু হলো পথচলা। নিশুতি রাত। প্রত্যন্ত গ্রামের নির্মল বাতাস। অত্যন্ত হালকা আর সুবাসিত। বাতাসে বনজ ঔষধি গাছের গন্ধ মিশে আছে। ভেজা ভেজা। আর্দ্র। সুবাসটাতে অনেকটা দারুচিনি আর ত্রিফলা ভেজানো পানির আবছা আঁশটে সোঁদা গন্ধ। চাঁদের মৃদু মায়াবী জোছনা আছে। রাস্তার এক পাশে প্রাচীন কবরস্থান। গাছ-গাছালিতে আকীর্ণ। আরেক পাশে ধু-ধু চিটয়াল। রাস্তাটা সামনের দিকে সোজা গড়িয়ে চলে গেছে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

আমরা চুপচাপ পথ ভাঙছি। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় পেয়ে বসেছে সবাইকে। পথসঙ্গী কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলল,

'দেখ তো দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

ভালো করে ঠাহর করে দেখলাম অনেক লম্বা এক অবয়ব হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে ইয়া বড় এক মুসা-লাঠি। গা শিউরে উঠল। ছমছমে ভাব। অজান্তে আমাদের হাঁটার গতি মন্থর হয়ে গেল। এক পা এগোই তো দুই পা পেছাই। সামনের অবয়বটা আরেকটু স্পষ্ট হলো। লম্বা একজন মানুষ, নুহ-পুত্র কেনানের মতো। হাতের লাঠিটাও প্রমাণসাইজ লম্বা। কাঁধে একটা ঝোলা। এক হাতে ধরে পিঠের পেছন দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমরা সাহস করে এগুতে থাকলাম। দুরু দরু বুকে পাশ কাটালাম। আমাদের এগিয়ে দিতে আসা দুই জনকে জিজ্ঞেস করলাম। তারাও এ লোককে আগে কখনো দেখেনি। তাহলে ইনি কে? এতরাতে গহিন এক গ্রামের পথ ধরে চলছেনই-বা কোথায়? এত লম্বা একজন মানুষ, সারাদিনে কারও চোখেই কি পড়েন নি? কই কেউ তো তার কথা আলোচনা করেনি? আশেপাশে বড় কোনো বাজার নেই, খেয়াঘাট নেই। গাড়িঘোড়া নেই। আসবেন কোত্থেকে? জীবনে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল।

আমাদের মাদরাসা মহলে তো দুষ্টুমির পরিধি সীমিত। এ সসীমের মাঝেই আমাদের অসীমকে খুঁজে বের করতে হতো। স্বল্প পরিসরেই আমরা নানাবিধ 'হাসিখুশি' বের করার কসরত চালাতাম। সাধারণ বিষয় থেকেও আমরা অসাধারণ সব দুষ্টুমি বের করে ফেলতাম। অবশ্য এসব দুষ্টুমি কারও ক্ষতি করে নয়। একান্তই নির্দোষ আনন্দ বলা যায়।

আমরা চেষ্টা করতাম, আমাদের নিরানন্দ নীরস ভোর রাতটাকে সরস করে তুলতে। জাগার পর পনেরো বিশ-মিনিট সময় পাওয়া যেত। সেটাই আমরা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চেটেপুটে খেতাম। আমাদের মাদরাসার হাম্মাম (বাথরুম) ছিল একটু দূরে। পুকুর পাড়ে। পুকুরের চারপাশে ছিল অসংখ্য আমগাছ। কয়েকটা গাছ ছিল একেবারে পুকুরের দিকে শোয়ানো। আমরা বুদ্ধি করে চাঁদা তুললাম। বড়সড় দেখে কয়েকটা তক্তা সংগ্রহ করলাম। চাঁদার টাকা দিয়ে দোলনা বানালাম। ব্যস, আমাদের বিনোদনের ব্যাপক আয়োজন হয়ে গেল।

হুযুর একদিন অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, ছেলেগুলো দেখি আগের মতো মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে না, ব্যাপার কী? শেষ-রাতে ডাকার আগেই সবাই উঠে যায়? তদন্তের পর বের হলো, দোলনা-রহস্য। সবাই দোলনা চড়ার জন্যেই এত হুটোপুটি করে বিছানা ছাড়ে।

দোলনায় তাহাজ্জুদ

আমাদের একবার শখ চাপল, আমরা দোলনায় চড়ে তাহাজ্জুদ পড়ব। আমাদের দোলনার তক্তাগুলো ছিল বেশ বড়সড়। অনায়াসেই ছোটরা নামায পড়তে পারত। শুরু হলো কসরত। প্রথম প্রথম কেউ পারছিল না। একটু দাঁড়াতে পারলেও, নতুন করে ধাক্কা দিলে তাল সামলাতে পারে না।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। আমরা দুজনে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। কয়েকদিন আসরের পর নিয়মিত অনুশীলন চলল। ঘোষণা দিলাম, আমরা পারব। সাহস করে উঠে পড়লাম। রাত তখন প্রায় তিনটা। জুমাবার ছিল। সামনের সবকের তাড়া নেই। সোনায় সোহাগা হিসেবে বড় হাফেয সাহেব হুযুর রাতে বাড়ি গেছেন।

সবাই আসার আগেই আমাদের কয়েক রাউন্ড (রাকাত) হয়ে গেছে। নাহ, পারব বলেই মনে হচ্ছে। সাঈদ প্রথমে দাঁড়াল। কনকনে শীত। নিচে হিমশীতল পুকুরের পানি। নামাযের নিয়ত বাঁধল। দোলনা চালিয়ে দেয়া হলো। বেশ জোরেই ধাক্কা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ওর পায়ে যেন আঠা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। উঁহু, যত জোরেই ধাক্কা দিই সে পড়ে না। মনে হয় তার খুশু-খুযু আরও বাড়ে। একজন হেঁচকা টান দিল, তবুও কাজ হলো না। একজন বলে উঠল, এ্যাই ব-হুযুর আইয়ের রে!

আমরা অবাক, হুযুর তো আজ আসার কথা নয়। অন্য দিন হলে, হুযুর বাড়ি গেলেও, ভোর রাতে চলে আসেন। আমাদের ঘুম থেকে তুলে, সবক শুনে ঘুমুতে যান। আজ জুমাবারে ব্যতিক্রম কেন হলো? এত কিছু ভাবার সুযোগ ছিল না। আমরা সবাই পালিয়ে চলে এলাম। সাঈদ তখনো দোলনায়। তার নামার উপায় নেই। দোলনার দুলুনি থামলেও, সেটা থামে পাড় থেকে দূরে, মাটির কাছে আনতে হলে, দোলনায় লাগানো রশি ধরে টান দিতে হয়। হুযুর কাছে এসে দেখলেন পুকুরের মধ্যখানে কী একটা নড়াচড়া করছে। লাইট মেরে দেখার পর, নিশ্চিন্ত হলেন, ওটা জীন নয়, মানুষ। এবার হুংকার,

'এমুই আয়। নামি আয় তা-তাই'।

এ অবস্থায় কেউ নামে? হুযুর রশি ধরে দিলেন জোরে টান, ব্যস! আর কী? সাঈদ ঝপ্পাস করে এন্টার্কটিকার বরফে! কোনোরকমে সাঁতরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠল। হুযুর আর মারবেন কী, তার কাঁপুনি দেখেই মুচকি হেসে মাফ করে দিলেন।

আশার কথা হলো, হুযুর কেন যেন, আমাদের দোলনা চড়ুনিতে বাধা দেননি। মৃদু সায় ছিল। আমরা পরদিন থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে দোলনা-নামায শুরু করে দিয়েছি। অসংখ্য মজার গল্প ঘিরে দোলনাটাকে ঘিরে।

বটগাছে তাহাজ্জুদ

আমাদের হেফযখানাটা ছিল রাস্তার কোল ঘেঁষে। একটা অতিকায় বটগাছ ছিল সামনেই। হলে কী হবে, আমরা গাছটাকে তেমন ভয় পেতাম না। সাধারণত বটগাছগুলো ভয়-জাগানিয়া হতে ওস্তাদ। ওটা ছিল আমাদের পোষা বট। চেনা। কাছের। মোটা মোটা ডালে বিকেলে বসে বই পড়তাম। গল্প করতাম। এমনকি শোয়াও হতো। কিছুদিন যাওয়ার পর, আমাদের দোলনা তাহাজ্জুদের উৎসাহে ভাটা পড়ল। কী করা যায় ভাবছি। আমাদের এক 'বিগ থিং ট্যাংক' প্রস্তাব পাড়ল, 'আচ্ছা, বটগাছে তাহাজ্জুদ পড়লে কেমন হয়'?

'আরে তাই তো! এ কথা আগে মাথায় এল না কেন?'

শুরু হলো। আবার কিছুদিন ভোররাতে ওঠাটা মজাদার সুস্বাদু হয়ে রইল। এর মধ্যে বড় হুযুর বাড়ি গেলেন। আমরা এই সুযোগে 'আন্তঃদেশীয় গাছ-তাহাজ্জুদ চ্যাম্পিয়নশীপের' আয়োজন করলাম। কে কত উঁচু চিকন মগডালে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। আমাদের সলীম ছিল বলতে গেলে গেছো বানর। সে বলল,

'এটা একটা প্রতিযোগিতা হলো? আমি তো এমনিতেই এটা পারি!

সবাই যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী ডাল বেছে নিলাম। শুরু হলো। এক দুষ্ট ছাত্র করলো কী, সলীমের ডালে গিয়ে একটা পিঁপড়ার বাসা রেখে এল। প্রথম রাকাত শেষ করে উঠে দাঁড়ানোর পরই, তার নর্তন-কুর্দন শুরু হলো, একটা ডানহাতে

পিঁপড়া ধরে তো পরেরটা বাম হাতে। শেষে আর থাকতে না পেরে, নামায ছেড়ে দিতে হলো। আর আমরা দুজন যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন হলাম। যদিও ম্যাচটা পাতানো ছিল। যদিও বুকি-বাজিকরদের পিঁপড়া ষড়যন্ত্র ছিল। তা হোক, জেতা নিয়ে কথা! সারভাইবেল অব দ্যা ফিটেস্ট। সেটা যেভাবেই হোক। যে কৌশলেই হোক। ছলে-বলে-কৌশলে। ছেলেবেলায় এসব ম্যাকিয়াভেলিয় দুষ্টুমি দুয়েকবার হয়তো চলতে পারে, প্রকৃত জীবনে ইবনে খালদুনীয় মুকাদ্দিমার অনুসারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হাস্নাহেনা-তাহাজ্জুদ

কারও কি হাস্নাহেনা ফুলের সুবাস মেখে তাহাজ্জুদ পড়ার ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য হয়েছে? উফ! সে এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। আমাদের মাদরাসা-মসজিদটা ছিল একতলা। দক্ষিণ পাশে কবরস্থান। কবরে ছিল অনেকগুলো হাস্নাহেনা গাছ। জানালা খুললেই, ফুরফুর করে সুবাস আসত। ঈশা আর ফজর নামাযের সময় রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে যেত, কে জানলার ধারে বসবে। সময়টা ফুলের সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে কাটাবে।

কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে যে আমরা তাহাজ্জুদ পড়তাম! তখন তো এখনকার মতো ফ্যান-পাখা ছিল না। বিদ্যুৎ ছিল না। আমরা হারিকেন দিয়ে পড়তে বসতাম। গরমকালটা ছিল খুবই কষ্টের। আমাদের মাথায় বুদ্ধি চাপল, এভাবে গরমের মধ্যে ঘেমেনেয়ে তাহাজ্জুদ পড়ার মানে হয় না। মসজিদের ছাদে গিয়ে পড়ব। তা-ই হলো। আবার আমাদের মরা গাঙে বান এল। ভোর রাতে ডাকার সাথে সাথেই, তাড়াতাড়ি ওজু-ইস্তিঞ্জা করে, সোজা ছাদে।

ছাদে ওঠারও কি সিঁড়ি ছিল? উঠতে হতো লাগোয়া একটা নারকেল গাছ বেয়ে। তাতে কি আমরা দমে গেছি? মোটেও না। প্রথম দিন ছাদে গিয়ে দেখি, চাঁদের আলোতে পুরো ছাদটা শাদা হয়ে আছে। মনোরম এক পরিবেশ। ফকফকা চান্নির পসর রাইত। দক্ষিণ পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাদের মাদকতায় পেয়ে বসল। হাস্নাহেনা ফুলের সুবাস যে, মসজিদের ছাদে এত গভীর হয়ে ওঠে, সেটা তো জানা ছিল না! ইস, কী অসাধারণ বিষয়ই-না এতদিন না জেনে হাতছাড়া করে এসেছি। সেদিন থেকে দক্ষিণ-ছাদটা আমাদের তাহাজ্জুদের জন্যে জন্যে লোভনীয় 'হোমগ্রাউন্ড' হয়ে উঠল। এখানে হুযুরেরও পৌঁছার সাধ্য নেই। হুযুর তো আর গাছ বেয়ে বেত নিয়ে তেড়ে আসবেন না।

তারা ঝিলমিল তাহাজ্জুদ।

আমরা তালিবে ইলমরা মারকাযুদ দাওয়াহতে গিয়েছি। হযরতপুরে। তিন দিনের জন্যে। মারকায তখন বন্ধ ছিল। গ্রামীণ পরিবেশ। আশেপাশে বাড়িঘর নেই। দিগন্তজোড়া ধানখেত। মারকাযের একদম শুরুর দিকে। রাত তিনটা বাজে আমরা

উঠে পড়লাম। টিনের মসজিদের সামনে বড় খোলা জায়গা। ঘাসের পুরু আস্তর। দূর্বাই হবে। কাঁচা হলেও ঘাসের ওপর দাঁড়ালে মনে হবে পুরু জাজিমে পা ফেলেছি। আরাম আরাম অনুভব। আকাশজুড়ে তারার মেলা। নিযুত-কোটি তারা। এমন খোলা আকাশের নিচে, ঘাসের বিছানায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সুযোগ সব সময় হয় না। বিশেষ পরিস্থিতিতেই শুধু হয়। বুঝ হওয়ার পর, প্রথম বার খোলা আকাশের নিচে, ঘাসের জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামায পড়া হয়েছিল পটিয়াতে। শুধু তা-ই নয়, পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েও হয়েছিল। আমরা তখন সাপ্তাহিক 'তাদরীব' নিতে যেতাম শরনায়। রাত দুইটার পরে, আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তাহাজ্জুদ পড়তাম। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ময়দানের তাহাজ্জুদের মতো মজার আর উপভোগ্য স্বাদ, দুনিয়ার আর কোনো কিছুতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয়বার সুযোগ হলো, মারকাযে। মৃদুমন্দ বাতাস থাকলে, আকাশে মিটিমিটি তারা থাকলে, আবহাওয়া শরীর জুড়ানো হলে, খোলা আকাশের নিচে তাহাজ্জুদ বা নামায পড়ার স্বাদই ভিন্ন। হাঁ, মনটাও নির্ভার হতে হবে। কোনো কিছুর তাড়া থাকলে হবে না। দুনিয়াবি কোনো পিছুটান পেছন থেকে আস্তিন টেনে ধরে থাকলে হবে না। কুরআন কারীম জোরে জোরে পড়ার স্বাধিকার থাকতে হবে। লজ্জা-সংকোচের বালাই থাকা চলবে না। কিছুটা সুর এনে তিলাওয়াত করতে হবে। গলায় সুর থাক বা না থাক।

আরও রয়ে গেল নৌকার তাহাজ্জুদ। নদী পারের তাহাজ্জুদ। চলন্ত ট্রেনের ছাদের তাহাজ্জুদ। দিনশেষে মনে হয়, আখিরাতটা আসলে শুধু ভয়েরই নয়, অনেক সময় আনন্দেরও বটে। উপভোগেরও। অনুভবেরও। এসব আসলে আমাদের বর্ণিল ছেলেবেলার গল্প। আমাদের হাসিগল্পের অংশ।

তাহাজ্জুদের গল্প

শায়খ আবদুর রশীদ সূফী। তখন আযহারে পড়াশোনা করেন। পরীক্ষার পর ছুটি হলো। হাতে কিছু টাকা এল। আগপিছ বিচার না করে মুক্তহস্তে কিতাব কিনে ফেললেন। বিমানের নিয়মকানুন জানা ছিল না। সব নিয়েই বাড়িমুখো হয়েছেন। এত কিতাব দেখে ইমিগ্রেশন অফিসারের দু-চোখ ছানাবড়া।

'আপনি দেখছি কায়রোর সব কিতাব বগলদাবা করে বাড়ির পথ ধরেছেন। এত কিতাব নেয়া যাবে না।'

'দয়া করে একটু দেখুন না,কিতাবগুলো দেয়া যায় কি না। কিতাবগুলো আমার খুবই প্রয়োজন। সুদূর আফ্রিকায় বাড়ি। আবার ফিরে আসতে পারব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিতাবগুলো থাকলে, ইলমচর্চায় সহায়ক হতো।'

'একজন যাত্রীর জন্য এত 'ওয়েট' অনুমোদিত নয়। আপনার সামনে দুটি পথ খোলা। হয় কিতাব কমিয়ে আপনি আর কিতাব যাবেন, না হয় শুধু কিতাব।'

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার এহেন উপসংহারে শায়খ বিচলিত হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই সামলে উঠলেন। তার সামনে ভেসে উঠল কুরআন কারীমের একটি আয়াত,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরুপায় হয়ে) সে তাঁকে ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ তিনি দূর করে দেন এবং তিনি পৃথিবীতে তোমাদের তাঁর প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো (নামল, ৬২)।

শায়খ বললেন, মনে মনে আয়াতখানা পড়ে নিলাম। কোত্থেকে কী হল জানি না, মুহূর্তেই মনের ভয় কেটে গেল। অফিসারকে বললাম,

'আমিও যাব, আমার কিতাবও যাবে। ইন শা আল্লাহ।'

অফিসার আমার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। চরম আক্রোশে বলল,

'আমি দেখে নেব কীভাবে এই কিতাব কার্গোতে ওঠে।'

তখন গভীর রাত। ফ্লাইটের তখনো অনেক দেরি। মসজিদে চলে এলাম। তাহাজ্জুদ আর দোয়ার ফাঁকে ফাঁকে আয়াতখানা পড়তে লাগলাম। মনে দৃঢ় একীন জন্মে গেল আল্লাহ তা'আলাই আমার কিতাবের একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। ফজরের সময় পোশাক-আশাক দেখে মুসল্লিরা আমাকে ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলো। সালামবাদ মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসতেই দেখলাম একজন অফিসার বসা। দু-চোখ অশ্রুভেজা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, বড় কোনো কর্মকর্তা হবেন। আমার পাসপোর্ট-টিকেট পাশেই রাখা ছিল। তিনি হাত টেনে পাসপোর্ট খুলে দেখে বললেন,

'আপনার ফ্লাইটের তো আর বেশি দেরি নেই। আপনি কি দয়া করে, সলাতে যেভাবে তিলাওয়াত করেছেন, কষ্ট করে আরেকবার সেভাবে তিলাওয়াত শোনাতে পারেন? আমি দ্বিধা না করে তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম। তখন মনের অবস্থা ভিন্ন ছিল। অত্যন্ত দরদের সাথে তিলাওয়াত শুরু করলাম। কুরআনের আয়াত অফিসারের হৃদয়তন্ত্রীতে দোলা জাগাল। তিনি কালামুল্লাহর প্রভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তার অফিসে নিয়ে গেলেন। দরজায় নেমপ্লেট দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি পুরো বিমানবন্দরের নিরাপত্তাপ্রধান। নাস্তার ব্যবস্থা

করলেন। কথাবার্তার ফাঁকে কিতাবের কথা জানতে পেরে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। আমাকে দেখে ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিমেষেই কিতাব-সমস্যার সমাধান। অসহায় বান্দার ডাকে আল্লাহ অবশ্যই সাড়া দেন। যেকোনো সমস্যাতেই আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবণতা ছোটবেলা থেকেই অভ্যেস গড়ে তোলা জরুরি।

কিয়ামুল লাইল

কিছু মানুষ থাকে, তাদের সাথে কথা বলতে দাঁড়ালে কোন ফাঁকে সময় পেরিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। এশার পর থেকে কুরআন নিয়ে কথাবার্তা শুরু হলে, কোন ফাঁকে রাত গভীর হয়ে যায়, টেরটিও পাওয়া যায়। কুরআনি গল্পগাছার এই বিশেষ 'কিয়ামুল লাইলে' অনেক বেশি আকর্ষণীয় আর উপাদেয়। যত বিষয় নিয়েই আমাদের কথা হোক, শেষ মুহূর্তে এসে কুরআন কারীমে ঠেকবেই। সেদিনও তা-ই হলো। কালও একই অবস্থা। প্রতিবারই সবশেষে প্রশ্ন হয়,

'নিয়মিত তিলাওয়াতের তাওফীক হচ্ছে তো?'

আসলে কুরআন কারীম নিয়ে যতই সময় কাটানো হোক, গবেষণামূলক বই লিখে, বইয়ের বিশাল স্তূপ বানিয়ে ফেললেও, তিলাওয়াতের বিকল্প কিছুই নেই। বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেই হবে। এটার মতো শক্তিশালী আমল আর কিছু নেই। তিলাওয়াত মানে হলো, ডিরেক্ট কল। ডাইভার্ট কল নয়। প্রতিবার আমাদের কুরআনি গল্পগাছার 'কিয়ামুল লাইলের' পর তিলাওয়াতের মান ও পরিমাণ বেড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ। মাঝেমধ্যে সবারই এমন রাতজাগা কুরআনি গল্পগাছার আয়োজন করা দরকার।

এক বুযুর্গ বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে চাইলে, আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে চাইলে, কুরআনের স্বাদ পেতে চাইলে, সময়ের বরকত উপভোগ করতে চাইলে- শেষরাতে তাহাজ্জুদের বিকল্প নেই। আমি রাতের শেষভাগে যত দোয়া করেছি, নিকট ভবিষ্যতে তার প্রভাব হাতেনাতে পেয়েছি। অনেক দোয়া সরাসরি আক্ষরিকভাবে কবুল হয়নি, কিন্তু দোয়ার ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি অনুভব করেছি। শেষ-রাতে আমি যাই তিলাওয়াত করি, মনে হতে থাকে, কুরআন যেন আমার উপরই এইমাত্র নাযিল হলো। শেষ-রাতের যেকোনো ইবাদতই ভিন্নমাত্রার শক্তি ধারণ করে। ধন্যি এই কুরআনি উম্মাহ! তারাই একমাত্র শেষ-রাতের মহার্ঘ উপহার উপভোগ করতে পারে। শেষ-রাতের অমূল্য উপহার লাভ করতে হলে, কুরআনের ছোঁয়া থাকতেই হবে। কুরআনের ছোঁয়া ছাড়া, শেষ-রাত বড় নির্জীব। নিষ্প্রাণ। শেষ-রাতকে প্রাণবন্ত করে তুলতে, কুরআনের বিকল্প নেই। শেষ-রাত এই উম্মতের একান্ত একার সম্পদ।

কিয়ামুল লাইল ও কুরআন একই বৃন্তে দুটি ফুল। কুরআন কিয়ামুল লাইলকে জীবন্ত করে তোলে। কিয়ামুল লাইল কুরআনকে জীবন্ত করে তোলে। কিয়ামুল লাইলময় দিন আর কিয়ামুল লাইলহীন দিনে আকাশ-পাতাল তফাত। যেদিন কিয়ামুল লাইলের তাওফীক হয়, সেদিন হিযব আদায়ে বাড়তি নূর অনুভব করি। তাহাজ্জুদের প্রভাবে মনে হয় যেন, কুরআন আমার কলবে গিয়ে মিশছে। তাহাজ্জুদমাখা দিনগুলোতে বিরদ আদায় করতে বসলে, সময়ে আজীব বরকত দেখা দেয়। কলবও কুরআনের ডাকে দ্রুত সাড়া দেয়। তাহাজ্জুদহীন দিন তিলাওয়াত শুরু করার সাথে সাথেই কলব তিলাওয়াতে একাত্ম হয় না। তাহাজ্জুদ আর কুরআন যেন 'মেইড ফর ইচ আদার'।

হাফেজ হতে পারলে, তাহাজ্জুদের আসল স্বাদমজা পাওয়া যায়। একজন প্রকৃত কুরআনে হাফেয কখনোই তাহাজ্জুদ কাযা করতে পারে না। একজন প্রকৃত হামিলে কুরআন কখনো শেষ-রাতে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। একজন কুরআনপ্রেমীর পক্ষে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বিছানায় গা এলিয়ে থাকা সম্ভবপর হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কুরআন দিয়েছেন, সে আল্লাহ আমাকে শেষ-রাতে ডাকছেন আর আমি শুয়ে ঘুমিয়ে আছি? আমি কুরআনের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ পেয়ে আল্লাহর কী শোকর আদায় করছি? ইলমের শোকর তো আমলে। আমি শেষ-রাতে কুরআন মুখে তাহাজ্জুদে দাঁড়ালেই কুরআনি ইলমের শোকর আদায় করেছি বলে ধরে নেয়া যাবে।

আমি শায়খ শানকীতি রহ.-কে দেখেছি, তিনি প্রতিরাতে—শীত হোক গ্রীষ্ম হোক—নির্দিষ্ট পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদে। তিনি বলতেন, রাতের নামাযে পড়া ছাড়া, কুরআন বোঝা যায় না। বুঝলেও সে বুঝ স্থায়ী হয় না-শায়খ আতিয়া সালেম রহ.।

পাঁচটি বিষয় থাকলে, যাবতীয় মনঃকষ্ট, মানসিক সমস্যা কাছে ঘেঁষারই সুযোগ পাওয়ার কথা নয়

১. তাদাব্বুরের সাথে নিয়মিত কুরআন কারীম তিলাওয়াত।

২. পরিপূর্ণ উদরপূর্তি করে ভোজন থেকে বিরত থাকা।

৩. কিয়ামুল লাইল। তাহাজ্জুদ আদায় করা।

৪. শেষ-রাতে ও সুযোগ পেলে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। মুনাজাতে কান্না না এলেও, জোর করে কান্নার ভান করা।

৫. সালেহীন-সাদেকীন-নেককারদের সঙ্গ-সাহচর্য। যার কাছে গেলে ভালো হতে ইচ্ছে করে, নিজেকে শোধরাতে ইচ্ছে করে, নিজের আমল-আখলাক উন্নত করার ইচ্ছা জাগে, সুন্নত তরীকায় জীবনযাপনের আশা জাগে, এমন ব্যক্তিই 'সালেহীন-সাদেকীনের' অন্তর্ভুক্ত।

পড়ালেখায় মনোযোগ বসে না, আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না, নজরের হেফাযত হয় না, আরও আরও নানা সমস্যা! চারপাশে চরম বৈরী প্রতিকূল পরিবেশ, দ্বীন মানা যাচ্ছে না। সমাধান কী? কেউ কেউ এই প্রশ্নটি করেন। গতকালও একজন করল। কুরআন কারীমে এর সমাধান দেয়া আছে। এসব সমস্যার প্রায় সবগুলোই ইসলামের শুরুর দিকে ছিল। বিশেষ করে প্রতিকূলতা। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে একটা অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন।

'তাহাজ্জুদ'

সালাত ফরয হওয়ার আগে, জিহাদ ফরয হওয়ারও আগে, আল্লাহ তা'আলা নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্যে, তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, তাহাজ্জুদ পড়াকে, কুরআন কারীমে, জ্ঞানের মানদণ্ড আখ্যায়িত করা হয়েছে। একটু গভীরে যাওয়া যাক।

ঈমানি ইনসমনিয়া!

অনিদ্রারোগকে (Insomnia) বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ইনসমনিয়ার নানা রকমফের আছে। মোটাদাগে তিন প্রকার:

১. ঘুমের প্রস্তুতি নিয়ে শুয়েছেন, কিন্তু আসি আসি বলে ঘুম ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘ সময় এপাশওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন।

২. একটু পর পর ঘুম ভেঙে যায়। ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা ঘুম হয়। স্নায়বিক উত্তেজনার কারণেই এমনটা ঘটে থাকে।

৩. রাতের শেষ ভাগে ঘুম ভেঙে যায়। একবার কোনো কারণে ঘুম ভেঙে গেলে আর আসতে চায় না। বিশেষ করে বৃদ্ধদের এমনটা হয়।

অনিদ্রারোগ নিয়ে সংবাদপত্রে, মিডিয়ার নানা ভার্শনে প্রতিনিয়ত আলোচনা হয়। প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় বাতলানো হয়। কিন্তু চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় আরেকটি 'ইনসমনিয়া' কখনোই ধরা পড়ে না। এটা বিশেষ ধরনের ইনসমনিয়া। কী সেই 'অজ্ঞাত ইনসমনিয়া'? হাঁ, সে অজ্ঞাত ইনসমনিয়াকে আমরা 'ঈমানী ইনসমনিয়া' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কুরআন কারীমই এই ইনসমনিয়ার কথা আমাদের জানিয়েছে। কুরআনি ইনসমনিয়াও বলা যেতে পারে,

১. সূরা যারিয়াত। যারিয়াত মানে? এমন দমকা বাতাস, যা ধুলোবালি উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সূরার শুরুতে বাতাসের চারটি কর্মপ্রক্রিয়া উল্লেখ করে চারবার কসম করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

২. এভাবে কসম দিয়ে শুরু করা প্রথম সূরা হলো 'আস-সাফফাত'। তেইশ পারায়। সূরা ইয়াসীনের পরের সূরা। ফেরেশতাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মকে প্রকাশ করে কসম করা হয়েছে।

৩. কোনো বস্তুর গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে, কথাকে বলিষ্ঠ, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও অলংকারপূর্ণ করার জন্যে, আল্লাহ তা'আলা কসম করেন। পাশাপাশি এই আকীদাও পোষণ করতে হবে, কোনো কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলা কসমের মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবকিছু থেকে বেনিয়ায। অমুখাপেক্ষী।

৪. কসমের পর সাধারণত কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কুরআন কারীমের যেখানেই কসম আছে, তারপর রাব্বে কারীম কী বলেছেন, সেটা গভীর মনোযোগের সাথে খেয়াল করা উচিত। সাধারণত কসমের পর, তাওহীদের আলোচনা থাকে। কখনো কেয়ামতের আলোচনা থাকে। কখনো ভীতি-প্রদর্শন থাকে।

৫. সূরা সাফফাতে কসমের পরপরই চতুর্থ আয়াতে তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে,

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একই।

৬. সূরা যারিয়াতে, চারটি কসমের পর, দুই আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহতার রূপ চিত্রায়ণ করা হয়েছে। সপ্তম আয়াতে বহু পথবিশিষ্ট আকাশের কসম করে পরবর্তী সাতটি আয়াতে আবার কেয়ামতের ভীতিপ্রদ আলোচনা করা হয়েছে।

এটুকু পড়ার পর একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। সামনে কী আলোচনা আসছে, সেটা গ্রহণ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশ্যে।

৭. কসম, কেয়ামতের পর শুরু হয়েছে একদল মহা সৌভাগ্যবান মানুষের কথা। আশার কথা। চিরন্তন সুখের কথা। স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। পুরস্কারের কথা। প্রতিদানের কথা। কীভাবে এই সুখের দেশে পৌছা যাবে, তার উপায়ের কথাও আছে!

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রসবণসমূহের ভেতর থাকবে। তাদের প্রতিপালক তাদের যা-কিছু দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল। (১৫-১৬)

মুত্তাকীগণই হবেন উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের (جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) মালিক। তাদের এই মহাসৌভাগ্য লাভের চাবিকাঠি কী? দুটি কারণ বলা হয়েছে,

৯. তারা সৎকর্মশীল ছিল। আরেকটি কারণ?

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত। এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তেগফার করত। (১৭-১৮)

৮. রাতের ঘুমকে হুজু' (هجوع) বলে। রাতে অল্প ঘুমুনোকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলা হয়েছে। জান্নাতে পৌঁছার উপায় বলা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কি এটাকে ইনসমনিয়া বলবে? এই স্বল্পনিদ্রা কি রোগ?

৯. কল্পনার চোখে দেখলে, কেমন লাগে না! সবাই ঘুমুচ্ছে, একজন মানুষ ঘুমায়নি। জেগে আছে। তিনি রাতে অল্প কিছু সময় ঘুমিয়েছেন। বাকি সময় কী করেছেন? তিনি বাকি সময় জেগে জেগে আল্লাহর ইবাদত করেছেন। যিকির করেছেন। কাকুতি-মিনতি করে মুনাজাত করেছেন। রবের সম্মানে তাসবীহ পাঠ করেছেন। ইস্তেগফার করেছেন। অসীম ক্ষমতাবানের দরবারে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন। রুকু করেছেন। সিজদা করেছেন। কিয়াম করেছেন। বিনম্রচিত্তে আত্মসমাহিত হয়ে প্রভুর দরবারে ধরনা দিয়ে পড়ে আছেন। এভাবেই রাতের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। অল্পকিছু সময় ঘুমিয়ে বাকি সময়টুকু রবের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটা আবারও পড়ি?

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

একবার কেন বারবার পড়ি! পড়তে পড়তে রাতের চিত্রটা হৃদয়পটে আঁকার চেষ্টা করি। নিজেকেও তার জায়গায় কল্পনা করে দেখি!

ইলমের মানদণ্ড

১০. এ তো গেল সূরা যারিয়াতের কথা। সূরা যুমারের দিকে একটু তাকাই। শুরু থেকে জাগতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে নবম আয়াতে গিয়ে 'ঈমানি জাগরণের' অবতারণা করেছেন। ভিন্ন শব্দে। এখানে 'রাতজাগাকে' অপূর্ব এক সম্মানে বিভূষিত করেছেন। রাতজাগা ব্যক্তিকে 'জ্ঞানীর' অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন। এই সম্মান অর্জন করা প্রতিটি মুমিনের পক্ষেই সম্ভব। আয়াতটা দেখি,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনো সিজদাবস্থায়, কখনো দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে? এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে?

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে।

১১. শুনতে কেমন অবাক লাগে না? বিস্ময়ে কারও কারও দুই চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। রাতজেগে তাহাজ্জুদ পড়াকে জ্ঞানের অন্যতম মানদণ্ড হিশেবে দেখানো হয়েছে। এ কী করে সম্ভব? সাধারণ ধার্মিকের মনেও প্রশ্নটা উঁকি দেয়া বিচিত্র কিছু নয়, তাহাজ্জুদ পড়া ধার্মিকতা হতে পারে, তাকওয়া হতে পারে, তাই বলে জ্ঞানের মানদণ্ড? পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত চিন্তায় বিষয়টাকে আসলেই প্রশ্নবিদ্ধ মনে হতে পারে।

১২. রাতজেগে রুকু-সিজদা করা ব্যক্তিকে কানিত (قَانِتٌ) বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লাহ তা'আলা। বিনয়-নম্রতার সাথে আনুগত্য করে, পরম আন্তরিকতায়, ধারাবাহিক ইবাদত-বন্দেগী বা গভীর মনোযোগে সালাতে মশগুল হওয়াকে কুনুত (قُنُوتٌ) বলা হয়।

১৩. কুনূতের সাথে রাতজেগে ইবাদত করাকে 'জ্ঞানীর' কাজ বলা হয়েছে। আয়াতে। প্রকারান্তরে বিপরীত আচরণ (কুনূতের সাথে রাতজাগা ইবাদত না করা)-কে অজ্ঞতা বলা হয়েছে।

১৪. প্রশ্ন হতে পারে, আমরা সমাজের বেশির ভাগ মানুষকেই দেখি, রাতজেগে ইবাদত করেন না। বস্তুবাদী জাগতিক বিচারে তারা বড় বড় ডিগ্রিধারী। তারা কি তবে জাহেল?

(ক). রাতজাগা কানিতকে আলিম বলা হয়েছে। এবং প্রশ্ন করা হয়েছে,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

যারা জানে (মানে রাত জাগা কানিত) আর যারা জানে না (রাত জাগা কানিত নয়), উভয়ে কি সমান?

যারা রাতজাগা কানিত নয়, তারা হয়তো জাগতিক বিচারে জ্ঞানী, কিন্তু কুরআনি বিচারে তারা প্রথম স্তরের জ্ঞানী নয়। তাদের সরাসরি জাহেল বলা না গেলেও, অন্তত এটুকু তো বলা যাবে, তারা প্রকৃত জ্ঞানের দৌড়ে এখনো পিছিয়ে আছে।

(খ). দুটি বিষয়,

১. ইলম বা জ্ঞান।

২. জ্ঞানের ফলাফল বা জ্ঞানের বাস্তবায়ন।

এভাবেও বলতে পারি, একটি হলো ইলম আরেকটি হলো ইলম অনুযায়ী আমল।

মূল লক্ষ্য কোনটা? ইলম না আমল? অবশ্যই আমল। ইলম হলো 'পথ ও পন্থা'। আমল হলো সিদ্ধি বা লক্ষ্য।

১৫. ইলম বা জ্ঞানার্জনের মূল লক্ষ্য কী? আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর দাসত্ব (عُبُودِيَّة) করা। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে, নিছক ইলমের মূল্য কী? যে জ্ঞান বা ইলম আমাকে আল্লাহর উবূদিয়্যত বা দাসত্ব পর্যন্ত নিয়ে গেল না, সেটাকে ইলম বলি কী করে? আমি অনেক কিছু জেনেও যদি আল্লাহর দাসত্ব করতে অভ্যস্ত হলাম না, রাতজেগে ইবাদত করলাম না, তাহলে আমি জাহেলই রয়ে গেলাম।

১৬. নিছক রাতাজাগা ইবাদতের কথাই বলেননি, পাশাপাশি ইবাদতের ধরনও বলেছেন। তারা ইবাদত করেন, কখনো সিজদাবস্থায়, কখনো দাঁড়িয়ে (سَاجِدًا وَقَآئِمًا)। তারা মানে তারা দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম করেন ও সিজদা করেন। এবং খুব কুনূতের সাথেই করেন।

১৭. ইবাদতের বাহ্যিক অবস্থা রুকু ও সিজদার কথাই শুধু বলেননি আল্লাহ তা'আলা। কানিতের ভেতরকার অবস্থাও তুলে ধরেছেন। রুকু ও সিজদায় কানিতের অবস্থা কেমন থাকে? দুটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন,

ক. যে আখেরাতকে ভয় করে (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ)।

খ. এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে (وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ)।

আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থার কথা ভেবে, তাহাজ্জুদগুজার ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। সেদিন কী হবে, কেমন হবে, এ নিয়ে শঙ্কিত থাকে। পাশাপাশি ভয় তার মধ্যে কোনো প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি করেই না, উল্টো রবের রহমতের আশা তাকে আরও বেশি ইবাদতমুখী করে দেয়। এমন ভয় ও আশা শুধু সামান্য সময়ের জন্যেই নয়, ইবাদতের পুরো সময়কাল জুড়েই ব্যাপ্ত থাকে।

১৮. চারপাশে মানুষজন গভীর ঘুমে বিভোর। তাহাজ্জুদগুজার কানিত প্রশান্তচিত্তে সালাত আদায় করে চলেছেন। কায়মনোবাক্যে মুনাজাতের পরম স্বাদ আস্বাদন করে চলেছেন। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে তাহাজ্জুদগুজারের এমন অপূর্ব ঈমানি চিত্র কেন এঁকেছেন? গভীর রাতের নির্জন অন্ধকারের এই চিত্র দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদের কী বার্তা দিতে চেয়েছেন?

আল্লাহ তা'আলা কি, আমাদেরকেও এমনটা করতে উৎসাহিত করেননি? আয়াতের ভাষ্য কি এটাই বলছে না, বান্দা! তুমি যদি প্রকৃত জ্ঞানী হতে চাও, তাহলে এভাবে রাতের আঁধারে সাজিদ-কায়িম-কানিত হও?

১৯. আয়াতের শেষে এসেও আমাদের উৎসাহ আগ্রহকে উস্কে দিতে চেয়েছেন। আমাদের জ্ঞানের পথ, জ্ঞানীগণের পথ অবলম্বন করতে বলেছেন। প্রকৃত জ্ঞানীর মতো উপদেশ গ্রহণ করতে বলেছেন। উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)।

২০. সূরা সাজদায় এসে দেখি রাতজাগার অন্যরকম চিত্র। কথা শুরুই হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। একেবারে মূল ধরে টান দেয়া হয়েছে। মুমিন কারা? আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি যারা ঈমান আনে, তারা কেমন হয়? কেমন হয় তাদের আমল?

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

আমার আয়াতসমূহে তো ঈমান আনে কেবল তারা, যারা এর দ্বারা যখন উপদেশপ্রাপ্ত হয়, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অহংকার করে না। (১৫)

এটি সিজদার আয়াত। এই আয়াত পড়লে সিজদা দিতে হয়।

২১. এ তো গেল প্রকৃত মুমিনের সার্বক্ষণিক চিত্র। তাদের যখন উপদেশ দেয়া হয় তারা,

ক. সিজদায় লুটিয়ে পড়ে

খ. রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে।

গ. তারা অহংকার করে না। বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়।

কিন্তু রাতের বেলা এই সত্যিকারের মুমিনগণ অভূতপূর্ব এক কাজ করেন। কী সেটা? আয়াতে দেখি,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশা (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। আর আমি তাদের যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে (১৬)।

২২. ইশার নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন মানুষটা। আশেপাশের লোকজন তখনো জেগে। আস্তে আস্তে রাত গভীর হলো। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। চারদিক সুনসান। কীভাবে যেন মানুষটা জেগে গেলেন। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আর বিছানার সাথে পিঠ লাগিয়ে রাখতে পারলেন না। তড়াক করে উঠে গেলেন। মশগুল হয়ে গেলে রবের ইবাদতে। রবের ভয় আর আশার দোলাচলে দোল খাওয়া হৃদয়ে কিয়াম-রুকু-সিজদা-মুনাজাতে ডুবে গেলেন। আবার পড়ি,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

রাত গভীর হলেই বিছানা যেন কন্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই মানুষগুলো আর শুয়ে থাকতে পারেন না। পিঠে যেন কাঁটা বিঁধতে থাকে। শুয়ে থাকতে একটুও স্বস্তিবোধ হয় না। অদ্ভুত রকমের অস্থির অস্থির লাগতে শুরু করে। মাথাটা বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। বুকের ভেতরটা ভয়ে কেমন ধড়ফড় করতে করতে

থাকে। আবার অসম্ভব কিছু পাওয়ার আশা মনের গহিনে কোথাও ঝিকিয়ে উঠতে থাকে। আর শুয়ে থাকা যায় না। দু'আ পড়তে পড়তে আরামের শয্যা ছেড়ে বসে পড়েন।

২৩. এই আয়াতে যে মুমিনের কথা বলা হয়েছে, জীবনে কখনো কি আমি তার দলে শামিল হতে পেরেছিলাম? রবের ভালোবাসা আমাকে এতটা মাতোয়ারা আর বেচাইন করে তুলতে পেরেছিল? আয়াতে যে চিত্রকল্পটা আঁকা হয়েছে, আমার সামনে কি সেটা যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে? আঁধার রাত! একজন ঘুমন্ত মানুষ! অস্থিরতা! আচানক বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া? আসে কল্পনায়? চিন্তায়? অনুভবে? এমন কিছু? স্বচক্ষে এমন কাউকে দেখার সুযোগ হয়েছিল? সৌভাগ্য এসেছিল জীবনে এমন দৃশ্য দুই নয়নে সরাসরি দেখার?

২৪. এই আয়াতটি পড়ার সময়, কখনো নিজেকে আয়াতের দৃশ্যকল্পে কল্পনা করে দেখেছিলাম? আয়াতটি তিলাওয়াত করতে গিয়ে, থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল কখনো? গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, কখনো কি আয়াতটি মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল? বিজন রাতে কখনো এই আয়াত আমাকে বিছানা ছাড়তে বাধ্য করেছিল? এই আয়াত কখনো কি আমার দুগ্ধফেননিভ ফুলশয্যাকে শরশয্যায় পরিণত করেছিল? এই আয়াত কি আমাকে কখনো নিকষ কালো রাতে, ওজুখানায় ছুটে যেতে বাধ্য করেছিল? তারাহীন রাতে এই আয়াত কি কখনো আমার হৃদয়াকাশে জ্বলজ্বলে তারা হয়ে ধরা দিয়েছিল? চাঁদহীন কোনো রাতে, আকাশজুড়ে কি (تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) আয়াতটি ভেসে উঠেছিল? ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে থাকা, কোনো জোছনামাখা রাত আমাকে (خَوْفًا وَطَمَعًا) ভয় ও আশায় উদ্বেল করে তুলতে পেরেছিল?

২৫. ঈমানি জাগরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, এমন বেশ কিছু আয়াত আছে। কিন্তু এই আয়াত? এটার ধরনই আলাদা! এই আয়াতের প্রভাবই আলাদা। এই আয়াতের আবেদনই ভিন্ন। অস্থির করে তোলে। নিজের অতীত পাপের শাস্তির ভয় শঙ্কিত করে তোলে। রাব্বে কারীমের অসীম ক্ষমার প্রতি পরম আশাবাদী করে তোলে। আবারও পড়ি,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

আসলেই কি এই আয়াত আমার রাতকে এমন সুবর্ণ করে তোলে? নাকি আর দশটা শূন্য দিনের মতো, নিশুতি রাতটাও আঁধারে আঁধারে কেটে যায়?

২৬. আমি কে? আল্লাহর বান্দা। রহমানের বান্দা। আসলেই কি তা-ই? রহমানের বান্দা হতে হলে যে যোগ্যতা লাগে, আমার কি সেই যোগ্যতা আছে? কুরআন কারীমে রহমানের বান্দাগণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তার কোনোটা আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে? রহমানের বান্দাগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

এবং তারা (রহমানের বান্দারা) রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনো) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনো) দণ্ডায়মান অবস্থায় (ফুরকান, ৬৪)।

২৭. দুনিয়ার সবাই রাত কাটায়। রাত যাপন করে। রাত অতিবাহিত করে। কিন্তু সবার রাত কাটানো আর রহমানের বান্দাগণের রাত কাটানোতে আকাশ-পাতাল তফাত। কেউ রাত কাটায় বেঘোরে ঘুমিয়ে। কেউ রাত কাটায় অনলাইনে। কেউ রাত কাটায় ইউটিউবে। কেউ রাত কাটায় মোবাইলে। কেউ রাত কাটায় গল্পের বইয়ে। কেউ রাত কাটায় অন্য কোনো গুনাহে! কেউ রাত কাটায় গুনাহপূর্ণ দৃশ্য দেখে। কেউ রাত কাটায় অহেতুক গল্পগুজবে। কেউ কাটায় অনর্থক ঘোরাফেরায়।

এমনকি অনেকে ভালো কাজেও রাত কাটায়। কেউ দ্বীনি বইপত্র পড়ে, কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে, কেউ ওয়াজ-নসীহত শুনে, কেউ দ্বীন সম্পর্কে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে। কিন্তু রহমানের বান্দারা রাত কাটায়, তাদের রবের প্রতি (سُجَّدًا وَقِيَامًا) (কখনো) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনো) দণ্ডায়মান অবস্থায়।

২৮. এই আয়াতে রাতের নির্দিষ্ট কোনো অংশের কথা বলা হয়নি, পুরো রাত জুড়েই একটানা ইবাদত-বন্দেগীর কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় জুড়ে তারা রুকুতে পড়ে থাকে! দীর্ঘ সময় জুড়ে তারা সিজদায় লুটিয়ে থাকে। ইলমচর্চা, জ্ঞানচর্চার বাহ্যিক উপকরণ তাদের ইলমচর্চার আসল মাধ্যম থেকে বিমুখ করতে পারে না। তারা জানে, প্রকৃত ইলমচর্চা রাতজেগে রুকু-সিজদা করার মাঝেই নিহিত।

২৯. ঈমানি জাগরণের সবচেয়ে কোমল আর সুন্দর চিত্র ফুটে আছে, সূরা মুযযাম্মিলে। আল্লাহ তা'আলা একান্ত আপন ভঙ্গিতে নবীকে সম্বোধন করছেন। আয়াতে ফুটে আছে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ সুর,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

হে চাদরাবৃত, রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকি রাত (ইবাদতের জন্যে) দাঁড়িয়ে যান, রাতের অর্ধাংশ থেকে কিছু কমিয়ে নিন। বা তা থেকে কিছু বাড়িয়ে নিন এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত করুন (১-৪)।

৩০. নবীজি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন বা বসে আছেন। আমাদের মতোই। কেন? তখন কি শীতকাল ছিল? এত গরমের মধ্যে চাদর মুড়ি দেয়া কেন? সে যাক। আল্লাহ তা'আলা এমন অবস্থাতেই ওহী পাঠালেন। ওহীর শব্দমালায় নবীজির তাৎক্ষণিক অবস্থার চিত্র চিরকালের জন্যে আঁকা হয়ে গেল। আমরা

সান্ত্বনা পেতে পারি, তিনিও আমাদের মতো চাদর মুড়ি দেন। আমাদের মতো শুয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর অত্যন্ত আপন-আপন সম্পর্ক। নবীজি নিজের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন। পরিবারকে সময় দিচ্ছেন। এ সময় ওহী পাঠালেন আল্লাহ। কী বললেন? ঘুম-বিছানা-আরাম-স্ত্রী-কন্যাদের ছেড়ে উঠে পড়ুন। সালাতে দাঁড়িয়ে যান।

৩১. ইসলামের অভিযাত্রা সবে শুরু হয়েছে। তখনো দাওয়াতের কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়নি। কাফেরদের প্রবল প্রতিরোধ আসতে শুরু করেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে, রাব্বে কারীম জানেন। প্রবল ঝাপটার মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। তাহাজ্জুদ ছিল সে প্রস্তুতির শক্তিশালী উপাদান। জাহেলী যুগে, চরম অন্ধকার থেকে আলোতে আসা নবমুসলিমদের জন্যে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যে, তাহাজ্জুদের আমল দিয়েছিলেন। সম্বোধন নবীজিকে করলেও, আরেক আয়াতে বোঝা যায়, আমলে সাহাবায়ে কেরামও সঙ্গী হতেন।

৩২. এমন আমল আসার কথা ছিল দ্বীনের দাওয়াতের শেষ দিকে। লোকজন ইসলামে আসার পর, ইসলামকে বোঝার, কুরআন কারীমের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার পর, নবীজিকে ভালো করে জানার পর, গভীর রাতের তাহাজ্জুদের যিম্মাদারি আসার কথা ছিল। কিন্তু একেবারে শুরুতেই এমন উচ্চ পর্যায়ের আমল? উঁচুদরের সাধনা? একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কেন এই আমল শেষে না দিয়ে শুরুতেই দিয়েছিলেন। তাহাজ্জুদের আমলে বান্দার আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। রব্বের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। রাতের ইবাদতে দিনের গ্লানি মুছে যায়। প্রথম দিকে দিনের বেলা প্রকাশ্যে ইবাদত করা নিরাপদ ছিল না, ইবাদত রাতে করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল।

৩৩. দ্বিতীয় আয়াতের অর্থটা খেয়াল করেছি? অল্পকিছু সময় ছাড়া, বাকি রাতের পুরোটাই ইবাদতের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে নবীজিকে। অল্প (قَلِيلًا) মানে? তিনভাগের একভাগ? নাকি আরও কম? বাকি এত দীর্ঘ সময় ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতেন? সুবহানাল্লাহ!

৩৪. এই হুকুম কিন্তু শুধু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই ছিল না। সাহাবায়ে কেরামও শরীক ছিলেন। প্রথম দিককার সেই কষ্টের দিনগুলোতে, সাহাবায়ে কেরামও নবীজির সাথে তাহাজ্জুদের আমলে শরীক হতেন। প্রায় পুরো রাত, নিঝুম আঁধারে, নবীজির সাথে একদল নবদীক্ষিত মুসলিম, সালাতে দাঁড়িয়েছেন! দৃশ্যটা কল্পনা করতে কেমন লাগে না? আলী আছেন! আবু বকর আছেন! উসমান আছেন। আম্মাজান খাদীজা রা.-ও আছেন! আহ কী সব দিন ছিল! সারাদিনের কষ্ট, নির্যাতন সয়ে রাতে এসে মনিবের কোলে আশ্রয় নিয়ে একদল মানুষ হেঁচকি দিয়ে কেঁদে কেঁদে ইবাদত করছে! আয়াতটা পড়ি,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

(হে রাসূল,) আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে, (কখনো) অর্ধ রাতে এবং (কখনো) রাতের এক-তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে) জাগরণ করেন এবং আপনার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে) ২০।

৩৫. প্রথম দিকের সাহাবীগণের তাহাজ্জুদগুজারি, আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। পছন্দ হয়েছিল। তিনি তাদের কথা সরাসরি আয়াতে উল্লেখ করে, অবিস্মরণীয় করে দিয়েছেন। আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যারা নবীজির সাথে রাতের আমলে শরীক হতেন, তারা কত সৌভাগ্যবান? রাতের বেশির ভাগ অংশ ইবাদতে কাটানো চাট্টিখানি কথা নয়। তাদের এই আমলের কারণে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের আলোচনাকে চিরন্তন করে দিয়েছেন। আমরা যদি এমন আমল করি, আমরাও রাব্বে কারীমের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হব। আমরা দুনিয়াবি কাজে দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে পারলেও, দুই রাকাত তাহাজ্জুদের জন্যে একটুখানি সময় ব্যয় করতে পারি না। আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কাজে রাতকে রাত জাগতে পারি, আল্লাহর অতি নিকটে এনে দেবে, এমন কাজে পুরো রাত নয়, অর্ধেক রাত নয়, ঘণ্টা নয়, সামান্য কিছু সময় ব্যয় করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

৩৬. এরচেয়েও দুঃখজনক ঘটনা আছে। সারা রাত জাগে। নামাজী ব্যক্তি। তাই রাতজেগে দুনিয়া ঠিক রাখে, আখেরাতও ঠিক রাখে। যা তা কথা নয়, ফজর পড়ে তারপর ঘুমুতে যায়। কিন্তু ফজর নামাজ কীভাবে পড়ে?

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ

তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায় (নিসা, ১৪২)।

৩৭. উপরোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা সালাত আদায় করে আলস্যের সাথে। শুধু দুনিয়াদার নয়, দ্বীনদারদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ আছে, রাত জেগে কুরআন-হাদীস পড়েছেন, ইলমচর্চা করেছেন, কিন্তু ফজরের সালাতে ইবহু উক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তাহলে কী লাভ হলো এত কুরআন-হাদীস চর্চা করে?

৩৮. কুরআন কারীমে রাতজাগা নিয়ে এত গুরুত্ব, এত তাকিদ, আধুনিক যুগে এসে কেন যেন বিষয়টি অনেকের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছে। একেবারে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমকালীন একজন বিখ্যাত 'দায়ীর' বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছিল। তিনি আবার 'মোটিভেশনাল' বক্তা হিশেবেও বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। কথা বলছিলেন, 'টাইম ম্যানেজম্যান্ট' সময়-ব্যবস্থাপনা নিয়ে। সময়

নিয়ন্ত্রণের সাথে কীভাবে ব্যক্তিত্বের শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়, বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। শ্রোতারাও বিমুগ্ধচিত্তে শুনছে। কথা বলতে বলতে ঘুম প্রসঙ্গে এলেন। তিনি দায়ী, তার শ্রোতারাও বেশির ভাগ দাওয়া ঘেঁষা। অবাক লাগল, তিনি ঘুম প্রসঙ্গে কথা বললেন পুরোপুরি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ঢঙে; বরং বলা ভালো, তিনি তাদের চেয়েও আগে বেড়ে বললেন, একটি কর্মমুখর দিবসের জন্যে একটি ঘুমশ্রান্ত রাত দরকার। একজন দায়ীর চিন্তার যদি এই হাল হয়, মাদউ বা দাওয়াতপ্রাপ্তদের হালত কেমন হবে? দ্বীন ইসলামের খোলনলচেকে এভাবে 'পাশ্চাত্যের' রূপ-রং-রসে জারিত করে ফেললে চলবে? তিনি কুরআন হাদীসে সুপণ্ডিত, তারপরও তার সামনে থেকে কুরআন কারীমের আয়াতগুলো কীভাবে সরে গেল?

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

আমার চিন্তাচেতনায় কুরআন কারীমের রঙদার প্রভাব প্রবল না হয়ে পাশ্চাত্যের জং ধরা ধ্যান-ধারণা কীভাবে প্রবল হয়?

৩৯. হাঁ, তাহাজ্জুদ হলো নফল। ঐচ্ছিক। পড়তে পারলে ভালো, না পড়লে ধরপাকড় নেই। কিন্তু তাই বলে এতটা হেলাফেলায় ছেড়ে দেয়ার মতোও তো নয়? সবকিছুতে ছাড় চাই। শরীয়তের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আমলেও কেন ছাড়গ্রহীতা বনে বসে আছি? আল্লাহর কালামে যা আছে, সেটাকে কেন আমরা ছাড়ের তালিকায় শীর্ষস্থান দিয়ে রেখেছি? পাশ্চাত্যের মানদণ্ডের ঘুম যদি মানবজাতির জন্যে অধিক উপকারী হতো, তাহলে কুরআন কারীম কেন বারবার রাতজাগার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে? আল্লাহ তা'আলা কেন তাঁর পাক কালামে বারবার মুমিনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাজ্জুদের আমলের প্রতি আগ্রহী করার প্রয়াস পেয়েছেন?

৪০. আমরা যদি তাহাজ্জুদ বিষয় আয়াতগুলো গভীরভাবে তাদাব্বুরের সাথে পড়ি। তারপর নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখি,

'আমি কীভাবে রাতদিন কাটাব?'

কুরআনের আদর্শ ধারণ করে যদি উত্তরটা খুঁজতে যাই, তাহলে মুমিনের দিনযাপন পদ্ধতি আর পাশ্চাত্যের আদর্শ জীবনযাপন পদ্ধতি খুবই সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের চিন্তাবলয় থেকে কল্পনা করাই মুশকিল, রাতজেগে ইবাদত করার, দীর্ঘ কিয়াম-রুকু-সিজদা করার মাঝে কী উপকারিতা নিহিত আছে।

৪১. শায়খগণের কাছে মুরীদেরা প্রশ্ন করেন,

'আমি কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত নই। আগে কখনো তাহাজ্জুদ পড়িনি। প্রথম রাতে জাগতে পারি। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে, আর জেগে উঠতে পারি না। পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকায়, আমলটাকে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়।'

'বৎস! তুমি আগে আল্লাহর কাছে দু'আ করো। সাহায্য চাও। তাওফীক কামনা করো। তারপর প্রতিজ্ঞা করো আজ রাতেই আমলটা করব। দেখবে সহজেই হয়ে গেছে। আর মনে রাখবে, জীবনের প্রথম দিনের তাহাজ্জুদে অন্যরকমের স্বাদ আছে। ভিন্ন রকমের আনন্দ আছে। আল্লাহর খাস বান্দাগণই শুধু এই আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। তুমি আল্লাহর দিকে আসতে চাইলে আল্লাহ তোমাকে এগুতে সাহায্য করবেনই। শুধু প্রথম দিনই নয়, প্রতিদিনই, তাহাজ্জুদগুজারগণ তাদের মনে অপূর্ব স্বাদ আর আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষ করে ঘুম থেকে উঠে, ওজু করে, তাহাজ্জুদের দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত সময়টাতে প্রিয় 'মাহবূবের' সামনে দাঁড়ানোর যে প্রতীক্ষা চলতে থাকে, সে মিষ্টি প্রতীক্ষার মিষ্টতা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রস্তুতি শেষ করে তুমি যখন 'মাহবূবের' সামনে সালাতে দাঁড়াবে, তোমার তনুমন বর্ণনাতীত প্রশান্তিতে ছেয়ে যাবে। মনে হবে তুমি তীব্র গরম থেকে এইমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রবেশ করলে। প্রবল শত্রুর ধাওয়া খেয়ে পরম নিরাপদ আশ্রয়ে এসে প্রবেশ করলে। প্রতিদিন তাহাজ্জুদ শুরুর সুবর্ণ মুহূর্তটাকে সালাফগণ তাহাজ্জুদ শুরুর অপূর্ব স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে পুরো দিন উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করতেন। জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর একটা উক্তি সুফিমহলে বেশ বিখ্যাত। ইবনুল কাইয়িম রহ. তার *মাদারিজুস সালিকীনে*ও বাক্যটা উল্লেখ করেছেন,

وَشَوْقَاهُ إِلَى أَوْقَاتِ الْبِدَايَةِ

আহা! কী অধীর প্রতীক্ষামাখা উন্মুখ ব্যাকুলতা, (তাহাজ্জুদ) শুরুর (অপূর্ব) ক্ষণগুলোর প্রতি!

৪২. উপরোক্ত আয়াতগুলোতে, কিয়ামুল লাইলের দুটি স্তর আছে। আয়াতে বর্ণিত কিয়ামুল লাইল থেকে দুটি সম্ভাবনা বের করা হয়,

১. কিয়ামুল ফরয (قِيَامُ الفرض)। ফরয কিয়াম। ঈশার সালাতের কিয়াম।
২. কিয়ামুল কামাল (قيام الكَمال)। পূর্ণতার কিয়াম। এটা তাহাজ্জুদ।

একটুখানি তত্ত্বকথা

৪৩. প্রথমে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিই। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা মাথায় থাকলে, সালাফ ও খালাফ (পরবর্তী)-এর তাফসীরের মধ্যে আপাত বিরোধগুলোর সুন্দর সমাধান জানা হয়ে যাবে। কুরআন কারীমের তাফসীরকে

বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। কোনো মুফাসসিরই সালাফের তাফসীরকে পাশ কাটিয়ে, নিজে স্বতন্ত্র তাফসীর করতে পারেন না। তাদের সালাফের দ্বারস্থ হতেই হয়। সালাফের উক্তি নকল করতেই হয়। এটা মাথায় রেখে এবার জানি, তাফসীর দুই প্রকার,

ক. তাফসীরে তামসীল (تفسير التمثيل)। নমুনামূলক তাফসীর। একটি আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মুফাসসির নমুনাস্বরূপ একটি উক্তি নকল করলেন। বাকি আরও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলেন না। এটাই তাফসীরে তামসীল।

খ. তাফসীরুল হাসরি ওয়াল হাদ্দি (تفسير الحصر والحد)। সীমা-চৌহদ্দি নির্ধারক তাফসীর। একটা আয়াতে যতগুলো সম্ভাবনা সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো বর্ণনা করা।

৪৪. সালাফের তাফসীরগুলো হয় সংক্ষিপ্ত। তারা সাধারণত তাফসীরের প্রথম প্রকারকে মানে তাফসীরে তামসীলকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকলেও, পছন্দের মতটাকে নিজের তাফসীরে স্থান দেন। বাকিগুলো এড়িয়ে যান। তার মানে এই নয়, তারা বাকিগুলোকে ভুল মনে করেছেন বা দুর্বল মনে করেছেন।

৪৫. খালাফ (পরবর্তীরা) যখন সালাফের তাফসীর পড়তে বসেন, তাদের কেউ কেউ ভুল করে, সালাফের তাফসীরে তামসীলকে মনে করে বসে তাফসীরে হাসর ও হাদ্দ। এখানেই সমস্যা বাঁধে। এ বিষয়টাকে সর্বপ্রথম সুন্দর ও আলাদা করে নির্ণয় করে দেখিয়েছিলেন, আল্লামা ইবনে আতিয়্যাহ আন্দালুসি রহ.। মৃত্যু ৫৪২ হিজরী। তার বিখ্যাত তাফসীর *আল মুহাররারুল ওয়াজীযে* (المُحَرَّرُ الوجيز)। তিনি লিখেছেন,

> وَإِنَّمَا عَبَّرَ عُلَمَاءُ السلَفِ فِي ذلك بِعِبارات على جِهَةِ المِثالاتِ، فَجَعَلَها المُتَأَخِّرُونَ أَقْوالاً
>
> *সালাফ (কোনো আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে) দৃষ্টান্ত হিশেবে কিছু কথা বর্ণনা করেন, পরবর্তীরা সেটাকে (তাফসীরের ক্ষেত্রে) চূড়ান্ত উক্তি ঠাওরে বসে।*

৪৬. আল্লামা ইবনে আতিয়্যাহ রহ.-এর এই চমৎকার উক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পরবর্তীকালে অনেকেই নিজেদের তাফসীরকে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর আলোকে তাফসীরের একটা কায়েদাও বানিয়েছেন। সালাফের তাফসীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ منهم مِن الاسم العامِّ بَعضَ أنواعِه على سبيلِ التمثيلِ، وتنبيهِ المستمع على النوعِ، لا على سبيل الحَدِّ المُطابِقِ للمَحدود في عُمومه وخُصوصه

ক. কিছু শব্দ থাকে আম। ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট। শব্দ একটি তবে অর্থ বহু।

খ. সালাফ তাফসীর করতে গিয়ে, আম শব্দটির সব অর্থ উল্লেখ করেন না।

গ. তারা এমনটা করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ। শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ভাবটা এমন, দেখো শব্দটির আরও অর্থ আছে, তার একটি বা কয়েকটি নমুনা হলো 'এই' 'এই'।

ঘ. শব্দটির অর্থের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ করা তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। মানে আমি যা বললাম, এগুলোই সাকুল্যে শব্দ বা বাক্যটির অর্থ, এর বাইরে আর কোনো অর্থ নেই। সালাফ এমনটা বোঝাতে চান না।

৪৭. একটা উদাহরণ টানা যাক। কুরআন কারীমের বিখ্যাত একটি শব্দবন্ধ হলো অবশিষ্ট সৎকর্ম (الباقيات الصالحات)। মানে যা টিকে থাকবে। বাকি থাকবে। সালাফকে শব্দবন্ধটির অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদের একেকজন একেক অর্থ বলেছেন। বাকিয়াতুস সালিহাত মানে,

ক. কেউ বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
খ. কেউ বলেছেন, সুবহা-নাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ।
গ. কেউ বলেছেন, পাঁচ নামায। ইত্যাদি।

পরবর্তীদের কেউ কেউ ভুলবশত ভেবে বসেছেন, সালাফের যিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি এটাকেই বাকিয়াতুস সালিহাতের অর্থ বলে মনে করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এমন নয়। সালাফ শুধু নমুনাস্বরূপই একটি বা দুটি অর্থ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। অর্থের বাকি সম্ভাবনাগুলোকে নাকচ করেননি।

৪৯. সালাফের কেউ যদি রাতজাগে ইবাদতের আয়াতগুলোর তাফসীরে ঈশার নামাযের কথা লিখে থাকেন, তারা সেটা বলেছেন তাফসীরে তামসীল হিশেবে। তাফসীরের দ্বিতীয় প্রকার হিশেবে নয়। তারা এসব আয়াতের একটা অর্থ যে তাহাজ্জুদও হতে পারে, সেটাকে নাকচ করেননি।

তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে আসি

৫০. আচ্ছা, ঈশা হোক আর তাহাজ্জুদ হোক, রাতজেগে ইবাদতের কথাই বলা হয়েছে আয়াতগুলো—এ নিয়ে তো কারও দ্বিমত নেই? আর সূরা মুযযাম্মিল নাযিলের সময় তো ঈশার সালাত ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো, এত উৎসাহ জোগানো 'ঈমানি জাগরণের' মূল অর্জন কী?

এই ঈমানি জাগরণের অর্জনের তালিকা করতে বসলে, শেষ করা যাবে না। এই জাগরণের উপকারিতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। আমরা তাফসীরে তামসীল হিশেবে একটা অর্থ নিতে পারি। ইস্তেমদাদ (الاستمداد)। সাহায্য সংগ্রহ। রসদ সংগ্রহ। আমি যখন আরামদায়ক ওমমাখা লেপ-তোষকের মায়া ছেড়ে, তড়াক

করে উঠে পড়ে, কনকনে শীতে, প্রচণ্ড ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু সেরে, প্রাণাধিক 'মাহবুবের' সামনে দাঁড়াই, শুরু হয়ে যায় আসমানি 'ইস্তেমদাদ'। রাব্বে কারীমের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ও প্রাপ্তির সূচনা হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতের অসীম ভান্ডার থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হতে থাকে রিযিক, ইলম, তাওফীক, হেদায়াত।

৫১. আল্লাহর রহমতের ভান্ডার একবার খুলে গেলে, সেটা বন্ধ করার সাধ্য কারও আছে?

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

আল্লাহ মানুষের জন্যে যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই (ফাতির, ২)।

৫২. আমি কি আজ থেকেই অনন্ত অসীম খাযানা (ধনভান্ডার) থেকে ইস্তেমদাদ শুরু করতে পারি না? অল্প কিছু করে হলেও?

৫৩. ঈশার ও ফজরের সালাত জামাতের সাথে পড়লেও সারারাত জেগে ইবাদতের ফযীলত অর্জিত হয়। কিন্তু শহীদ হওয়া এক কথা আর অন্য কোনো আমল করে শহীদের ফযীলত অর্জন করা কি এক?

(দুজনেই ডক্টর। একজন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছে। আরেকজন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছে। দুজন সমান হতে পারে না)।

৫৪. ইলমের চূড়ান্ত মানদণ্ড রাতজেগে ইবাদতে নিহিত। রাতজেগে কিতাবপাঠে নয়। কিতাবপাঠের জন্যে তো সারাদিন, রাতের প্রথমভাগ রয়েছেই। প্রকৃত নবীওয়ালা আলিমের কখনো তাহাজ্জুদ কাযা হতে পারে না। মুত্তাকী আলিম রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ ছেড়ে কিতাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারেন না।

৫৫. তাহাজ্জুদের লযযত বা স্বাদের বিভিন্ন স্তর আছে। সবাই সব স্তরের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। তাহাজ্জুদের সর্বোচ্চ স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন ময়দানের মুজাহিদগণ। তারপরের স্তরে আছেন নজর ও যবানের হেফাযতকারী গৃহীরা। নজর ও যবান হেফাযত করতে না পারলে, তাহাজ্জুদের মজা পাবে না, এমন নয়। আমরা বলেছি সর্বোচ্চ স্বাদের কথা।

৫৬. কুরআন কারীম তাহাজ্জুদের প্রাণভোমরা। সূরা মুযযাম্মিলের চতুর্থ আয়াতের কথা মনে আছে না? রাত জাগার হুকুম দিয়ে, পাশাপাশি তারতীলের সাথে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে বলেছেন।

৫৭. সূরা মুযযাম্মিলের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, তাহাজ্জুদে কুরআন কারীম স্পষ্ট আওয়াজে, ধীরেসুস্থে তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে সুর করে। কান্নার ভান

করে তিলাওয়াত করা। আবার আওয়াজ যাতে বেশি উচ্চ না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখা. অন্যের ঘুমের ক্ষতি হতে পারে।

৫৮. আমরা দুর্বল। পুরো রাত জাগা সম্ভব নয়। কিন্তু অল্পকিছু সময় বের করা তো সম্ভব। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে, ভোর রাতে জেগে ওঠা কঠিন কিছু নয়। ভোর রাতে উঠলে, স্কুল-কলেজ, অফিসে সারাদিন ঝিমুনি আসবে? উঁহু, হিশেব করে, নিয়তান্ত্রিকভাবে ঘুমুলে, সমস্যা হবে না। ইনশাআল্লাহ।

৫৯. ও হ্যাঁ, ইনসমনিয়া রোগ। কিন্তু ঈমানি ইনসমনিয়া রোগ নয়। এটা বরং সর্বোচ্চ সুস্থতার লক্ষণ। ঈমানি ইনসমনিয়া মানসিক সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

৬০. সবচেয়ে বড় কথা, শেষ রাতে, আমি আর আল্লাহ! দুজনের মাঝে আর কেউ নেই। কারও আওয়াজ নেই। কারও চোখের শ্যেনদৃষ্টি নেই। এ এক অপূর্ব মহব্বতের সওদা।

সুইটহার্ট কুরআন!

১. শিফা

কুরআন কারীম 'শিফা'। আরোগ্য। কিসের আরোগ্য? আত্মিক রোগের আরোগ্য। কুরআন কারীম মানসিক রোগের আরোগ্য। কুরআন বুদ্ধিবৃত্তিক রোগের আরোগ্য। দৈনিক বিরদ-হিযব নিয়মিত আদায় করলে, এসব রোগের আরোগ্য এমনি এমনি হয়ে যায়। রোগ দেখা দিলে যেমন ডাক্তারের কাছে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলতে হয়। মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা দেখা দিলে, কুরআনের কাছে সমস্যার কথা খুলে বলতে হবে। কুরআন কি মানুষ, তার কাছে সমস্যার কথা বলব? আসল কথা হলো, নিয়মিত বিরদ-হিযব মনোযোগ দিয়ে আদায় করা মানেই, কুরআনের কাছে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলা। প্রথম কয়েকদিন হয়তো দৃশ্যত কোনো ফল দেখা যাবে না। আসল কথা হলো, নিয়মিত বিরদ-হিযব আদায় করলে, কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না। আমি ডাক্তারের কাছে যতটুকু প্রকাশ করব, ততটুকুই চিকিৎসা হবে। আমি কুরআনের কাছে যতটা ভিড়ব, আমার মনশ্চিকিৎসাও ততটুকু হবে। মানুষ জন্মগতভাবে ফিতরাহর অনুসারী। মানুষ জন্মগতভাবে তাওহীদের অনুসারী। শিরক-কুফর-ইরতিদাদ মানুষের স্বভাবজাত নয়। এগুলো আরোপিত। কুরআনের চিকিৎসা স্বভাবজাত। কুরআনি স্বভাবজাত চিকিৎসার সামনে দুনিয়ার কোনো আরোপিত রোগই টিকতে পারার কথা নয়।

২. কুরআনের পথে

এক যুবককে চিনি। বড় ঘরের সন্তান। ধন-সম্পদে ভরপুর। প্রাণ ও প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে। পরিবারের সবাই জাগতিকভাবে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু সে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—কুরআনে হাফেয। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। পরিবারের ভোগ-বিলাসী যিন্দেগীর কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বেশির ভাগ সময় কুরআন পড়ে। কুরআনের কথা বলে। কুরআনের দিকে দাওয়াত দেয়। যেহেতু আর্থিক চিন্তা নেই, পুরো সময়টা সে এ কাজেই ব্যয় করতে পারে। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম,

'তুমি কীভাবে এ পথে পা বাড়াতে পারলে? পরিবারের প্রথায় আরামের জীবন ছেড়ে?'

'কীভাবে এসেছি ঠিক বলতে পারব না! তবে আমার কাছে কীভাবে যেন কুরআনকে ভালো লেগে গিয়েছিল। আব্বু আমার জন্যে বিদেশ থেকে সুন্দর একটা কুরআন শরীফ এনেছিলেন। ওটা ছিল কারুকার্যখচিত। আব্বু ধার্মিক নন। কিন্তু

তার কী মনে হয়েছিল, আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন। সবার জন্যে দামি খেলনা এনেছেন। ব্যতিক্রমভাবে শুধু আমার জন্যেই কেন কুরআনখানা আনলেন। কুরআন শরীফ যখন কিনতে গেলেন, পাশে আরেকজন ক্রেতা ছিলেন। আব্বু দোকান থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই পাশের ভদ্রলোক আব্বুকে প্রশ্ন করলেন

'কার জন্যে কিনলেন?'

'আমার ছোট্ট ছেলের জন্যে। কিনতে এসেছিলাম খেলনা। কিন্তু এত সুন্দর কুরআন শরীফ দেখে রেখে যেতে মন চাইল না।'

'বেশ করেছেন। আপনার ছেলেকে বলবেন,

'তোমার অদেখা চাচ্চু বলেছেন, কুরআন কারীম বাইরে দেখতেই শুধু সুন্দর নয়, এর অর্থ আরও অনেক বেশি সুন্দর।''

ব্যস, আব্বু ফিরে এসে হুবহু সেই চাচ্চুর কথা আমাকে বলেছেন। আমি আব্বুর কথা শোনার সাথে সাথে বললাম, 'আব্বু, আমি কুরআনের অর্থ শিখব।' আব্বু ভীষণ অবাক হলেন। সাথে সাথে বললেন, ঠিক আছে। তোমার দাদুর সাথে কথা বলে নিই। এরপর আর কী, কুরআন কারীম নিয়েই আছি।

—শায়খ আবদুর রহমান আকল।

৩. কুরআনি সাক্ষ্য

কুরআন আমার পক্ষের সাক্ষী হবে অথবা আমার বিপক্ষের সাক্ষী হবে। (মুসলিম)

القرآن حجة لك أو عليك

যাকে কুরআনের ইলম দান করা হয়েছে, কিন্তু সে এর দ্বারা উপকৃত হলো না, কুরআনের নিষেধসমূহ জানার পরও বিরত হলো না, কুরআন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। (কুরতুবী)

৪. কুরআনমুখিতা

অনেকে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে, চিত্তশুদ্ধির জন্যে কসীদা শোনে, গান শোনে, সামা শোনে। এ ধরনের লোকদের কুরআনের প্রতি আগ্রহ দিনদিন কমে যায়। একসময় কুরআনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। মনের শান্তির জন্যে বেশি বেশি গযল শোনাও ক্ষতিকর। কুরআনের প্রতি উদাসীনতা চলে আসে।

৫. একমাত্র চাওয়া

ঈসা বিন ওয়ারদান রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, দুনিয়াতে আপনার একমাত্র চাওয়া কী? প্রশ্নটা শুনেই তিনি কেঁদে দিয়ে বললেন,

'আমার চাওয়া হলো, আমার বক্ষটা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, যাতে আমি দেখতে পারি, সারা জীবন কুরআন তিলাওয়াতের কী প্রভাব সেখানে পড়েছে।'

আমাদের সালাফগণ কুরআন কারীম নিয়ে এমনই বুঁদ ছিলেন।

৬. গানের সুর

কুরআন কারীমকে গানের সুরে প্রচার করার জন্যে একদল লোক উঠেপড়ে লেগেছে। এমনকি ইহুদি-নাসারাদের পরিচালিত টিভি-রেডিওতেও এর বহুল প্রচার হচ্ছে। কারণ? তারা জানে, এই গীতালি কুরআন মৃতকে জীবিত করা তো দূরের কথা, যারা জীবিত আছে তাদেরকেও মৃত বানিয়ে ছাড়বে।

৭. কলবের প্রাণ

সবকিছুর যেমন প্রাণ আছে, কলবেরও প্রাণ আছে। কুরআন হলো সে প্রাণ। কুরআন কলবকে নূর-হেদায়াত-আদব-প্রাণশক্তি সরবরাহ করে। হকের ওপর অবিচলতা দান করে। অনেক আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত আছে।

৮. সাফাইয়ে কলব

কুরআন কারীম পবিত্র। কুরআনকে রাখতে হয় পবিত্র জায়গায়। কুরআন থাকে মানুষের কলবে। গুনাহের কারণে কলব কলুষিত হয়ে গেলে, কুরআন কলব ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। মসিলিপ্ত কলবকে শুদ্ধ করতে ইস্তেগফারের বিকল্প নেই। ইস্তেগফার কলবকে ধুয়ে মুছে সাফসুতরো করে তোলে। পরিশুদ্ধ কলব পেয়ে কুরআন আবার ফিরে আসে। হিফয ভুলে গেলেও বেশি বেশি ইস্তেগফার করা জরুরি। কুরআনকে ফিরিয়ে আনার জন্য কলবকে পরিষ্কার করে রাখবে। হিফয ধরে রাখার জন্যও ইস্তেগফার উপকারী। কলবে কোনো ময়লা জমলে তা দূর করে দেবে।

৯. কুরআনের বরকত

কুরআনের বরকত কেমন? সবচেয়ে বড় কথা, কুরআন রাব্বে কারীমের পক্ষ হতে এসেছে। এর চেয়ে বড় বরকতময় আর কিছু হতে পারে না।

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ

(এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি (আন'আম, ১৫৫)।

বারাকাহ মানে, প্রভূত কল্যাণ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য। কুরআন কারীমকে (مُبَارَكٌ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন কারীম আগাগোড়া মুবারক-বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সবদিক থেকে কুরআনকে মুবারক করেছেন। পবিত্র পরিশুদ্ধ

করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত বরকত জমা করেছেন। সর্বকালে সর্বযুগে কুরআনের সাথেই বরকত জড়িয়ে ছিল। নিহিত ছিল। কুরআন নাযিল হয়েছে মুবারক মাসে। মুবারক রাতে।

কুরআনের শব্দে শব্দে বরকত। কুরআনের অক্ষরে অক্ষরে বরকত। কুরআনের সাগরসম বিপুল অর্থ ও উপদেশ ভান্ডারে বরকত। কুরআনের প্রতিটি আয়াতে সূরায় বরকত। কুরআনে লুকিয়ে আছে বরকতের মণিমাণিক্য। উপচে পড়া কুরআনি বরকতে ডুবে থাকে—যে কুরআন শিক্ষা করে, শিক্ষা দেয়, কুরআনি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, কুরআনি ইলমচর্চায় ডুবে থাকে, কুরআনি জীবনযাপনে সচেষ্ট থাকে।

কুরআনি বরকত জড়িয়ে থাকে—যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, যে কুরআনি হেদায়াত লাভ করতে চায়, যে কুরআন থেকে শিফা-আরোগ্য হাসিল করতে চায়, যে কুরআন থেকে আখেরাত কামাতে চায়। যারা কুরআনি মজলিসে বসে, তাদের ওপর কুরআনের কারণে বরকত আসে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সকীনা-প্রশান্তি নাযিল হয়। তাদের আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে। তাদের ফেরেশতারা আদরের বেষ্টনীতে ঘিরে রাখে,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ

(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে (সোয়াদ, ২৯)।

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ

এটা (অর্থাৎ এই কুরআন) বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি নাযিল করেছি (আম্বিয়া, ৫০)।

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ

এবং এটা এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী আসমানি হেদায়াতসমূহের সমর্থক (আনআম, ৯২)।

১০. মনোজগতের বদল

কলবে যখন কুরআন কারীম বাস করতে শুরু করে, কলব এমনিতেই আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়ে পড়ে। কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নানাভাবে বান্দার সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো ভয় জাগানিয়া বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। কখনো বড়ত্ব, সম্মান-সমীহ জাগানিয়া সিফাত বর্ণনা করেছেন। কুরআনের এসব আয়াত পড়ে, মুমিন বান্দার মনোজগতে বিচিত্র রূপবদল ঘটতে থাকে। হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্ম হয়। আল্লাহর প্রতি

শ্রদ্ধা, ভয় ও ভালোবাসায় মাথা নুয়ে আসে। মন থেকে গর্ব-অহংকার দূর হয়ে ভেতরটা বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে। লবণ যেমন পানিতে গলে যায়, মনটাও আল্লাহর বড়ত্বের সামনে বিলীন হয়ে যায়।

১১. আমি ও কুরআন

কুরআন কারীমের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন? নিজেকে প্রশ্ন করি।

আমি কি সাধ্যমতো সুর করে কুরআন তিলাওয়াত করি?
আমি কিছুটা সময় অর্থ বুঝে বুঝে তাদাব্বুরের সাথে তিলাওয়াত করি?
আমি কি কুরআনের সান্নিধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভাবি?
আমি রোগবালাইয়ে কুরআনে শিফা-আরোগ্য খুঁজি?
আমি কি আচারে-বিচারে কুরআনের দ্বারস্থ হই?
আমি ন্যায়ে-অন্যায়ে কুরআনের কাছে বিচারপ্রার্থী হই?
আমি কি নিজের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ হলেও ধারণ করি?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যার মধ্যে কুরআন নেই, সে বিরান ঘরের মতো

إنَّ الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ

এই কুরআন আল্লাহর দিকে চলা পথিকের প্রধানতম পাথেয়।

আমি আল্লাহর দিকে পথচলা শুরু করেছি? আমি কি পাথেয় সাথে নিয়েছি?
আমি প্রতিদিন কুরআন নিয়ে বসি?
আমি সন্তান ও সমাজকে কুরআনের বার্তা পৌঁছাই?
এই কুরআন আলোকোজ্জ্বল পোশাক। আমি কীভাবে এই পোশাক পরি?
এই কুরআন ঈমানের এক সুরক্ষিত দুর্গ। আমি কি এই দুর্গে আশ্রয় নিই?
এই কুরআন এক বিস্ময়কর ঔষধি। আমি কীভাবে এই ওষুধ সেবন করি?
এই কুরআন দুনিয়ার সর্বোচ্চ আদালত। আমি কি এর হালাল-হারাম মেনে চলি?
মুমিনের কর্তব্য সর্বদা কুরআনের সাথে থাকা। কুরআন থেকে দূরে থাকা প্রকৃত মুমিনের পক্ষে অসম্ভব। কারণ কুরআন তার ও স্রষ্টার মাঝে যোগসূত্র।

ইউসুফ আ. যখন দেখলেন কারাগারই তার জন্য উত্তম। শান্তিমতো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে পারবেন। বাইরের লোভ-লালসার হাতছানিমাখা স্বাধীন জীবনের চেয়ে, স্বাধীনভাবে ইবাদত করতে পারা বন্দীজীবনই বেশি উত্তম নয় কি? এমন কিছু বিবেচনা করেই হয়তো তিনি বলেছিলেন, "ইয়া রাব্ব, তারা আমাকে যেদিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে বেশি প্রিয়" (ইউসুফ, ৩৩)।

এই মহান কিতাবের ফলফলাদি যেমন বৈচিত্র্যময়, এই কিতাব নিয়ে আলাপ-আলোচনাও নানারঙা। এই কিতাবের বক্তব্য-উপদেশও বহুমুখী।

এই কিতাবের কিছু কথা সুখ-সৌভাগ্য, মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে।

এই কিতাবের কিছু কথা সাধ-সংকল্পকে সুদৃঢ় করে।

এই কিতাবের কিছু কথা মানুষকে অজ্ঞতার আঁধার থেকে জ্ঞানের আঙিনায় নিয়ে আসে।

এই কিতাবের কিছু কথা মানুষের অন্তরে প্রচণ্ড শক্তিশালী নসীহার কাজ করে।

এই কিতাবের প্রতিটি কথা শরীয়ত ও সংবিধানের কাজ করে।

কুরআন কারীমের এতসব ভূমিকায় আমার অবস্থান কোথায়?

১২. সবার আগে কুরআন

কুরআন কারীমকে সবকিছু থেকে প্রাধান্য দেবো। জাগতিক প্রাপ্য থেকেও কুরআনকে প্রাধান্য দেবো। আল্লাহর মর্জি থাকলে, জাগতিক প্রাপ্য আমার কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিজে থেকে কাছে না গেলে, কুরআন আমার কাছে আসবে না। কুরআনকে আমার সর্বোচ্চটুকু না দিলে, কুরআন আমাকে দেবে না। আমাকে বুঝেশুনে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

১৩. কুরআনের মর্যাদা

কুরআনের হরফ, কুরআনের শব্দ, কুরআনের ইলম বড় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আমি পুরো মনোযোগ আর গুরুত্ব না দিলে, কুরআন আমার কাছ থেকে ছুটে যাবে। আমি টেরটিও পাব না। আমার অগোচরেই কুরআন আর আমার মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে। আমার কাছে মনে হতে পারে, কুরআনের হরফ সহজ। কুরআন মুখস্থ করা সহজ। আমার এটা জানা নেই—কুরআনের হরফগুলো ধরা যেমন সহজ, আমার সামান্য অবহেলার ফলে, কুরআনের হরফগুলোও সহজে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে।

১৪. কুরআনি আনন্দ

কুরআন নিয়ে আনন্দের কোনো শেষ নেই। কখনো একটা আয়াত শুদ্ধ করে পড়তে পারার আনন্দ। কখনো একটা আয়াত বুঝতে পারার আনন্দ। কখনো একটা সূরার তিলাওয়াত শেষ করার আনন্দ। কখনো একটি পারা শেষ করার আনন্দ। শুধু আনন্দ আর আনন্দ। একের পর এক। ধারাবাহিক। এতদিন আনন্দ না হলে, আজ থেকে এসবকে আনন্দের উপলক্ষ্য বানিয়ে নেব। ইন শা আল্লাহ।

১৫. শূন্য কলব

কলব একটি শূন্য পাত্রের মতো থাকে। কুরআন ছাড়া ভিন্ন কিছু দিয়ে ভর্তি করে রাখলে, কুরআন প্রবেশ করবে কী করে? আগে কলবকে খালি করতে হবে। কুরআনের জন্য কলবে রাজসিংহাসন বানিয়ে, কুরআনকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

১৬. জীবন্ত হৃদয়

জীবন্ত হৃদয় কোনটা? কুরআনপূর্ণ জীবন। কুরআনমুখী জীবন। কুরআনময় জীবন। এমন হৃদয়ের অধিকারী কীভাবে হওয়া যায়? কলবকে কুরআনবিরোধী বস্তু থেকে সুরক্ষিত রাখা। চোখকে বদনজর বা পাপদৃষ্টি থেকে হেফাযত করা। কানকে কুরআনবিরোধী শ্রবণ থেকে দূরে রাখা। অন্তরকে পাপ থেকে মুক্ত রাখা। এ সবকিছু করা কুরআনের জন্য। কুরআনের ভালোবাসায়। কুরআনের উপকার লাভের আশায়।

১৭. আহলে কুরআন

প্রকৃত আহলে কুরআন নিজের কলবে কুরআনকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত কত চেষ্টা-মুজাহাদা করতে থাকে, সেটা যদি অন্যরা জানতে পারত, তাহলে বুঝতে পারত, আহলে কুরআনের জগৎ আর তাদের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আহলে কুরআন জানে, ছোট্ট একটি আয়াত রক্ষার জন্য, তারা জীবনের সমস্ত স্বাদমজা ত্যাগ করতে পারবে।

১৮. কুরআনের ভালবাসা

কুরআন কারীমের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এভাবেও হয়, আহলে কুরআন কোনো ভুল করে ফেললে, কোনো গুনাহ করে ফেললে, ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে, এই বুঝি তার কাছ থেকে কুরআন চলে গেল! এই বুঝি আমার আর কুরআনের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো! আহলে কুরআন সব সময় চেষ্টা করে, তার জীবনাচার যেন কুরআনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। প্রকৃত ভালোবাসার দাবিই এটি।

১৯. হৃদয়ের হালচাল

কুরআনের সাথে হৃদয়ের সম্পর্কের হালচাল দিনকাল কেমন যাচ্ছে? রহমানের আয়াত পড়তে আগ্রহ জাগছে কি? কুরআন ছেড়ে অন্য ব্যস্ততায় ডুবে থাকছি না তো? কুরআনের সাথে লেগে থাকার কথা কিছুতেই ভোলা যাবে না। শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট। পাশাপাশি কুরআন বোঝার জন্য প্রয়োজন সুন্নাহ।

২০. গুনাহরোধী

কুরআন কারীমের মতো আর কোনো কিছুই মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে না। কুরআন মুমিনকে অত্যন্ত কোমলভাবে পাপ থেকে দূরে রাখে। কুরআন বান্দাকে গুনাহ ছাড়ার জন্য কঠোরতা বা জোরাজুরি করে না। কুরআনের কোনো আয়াত বা বিধান বান্দার কলবে বসে গেলে, আর কিছু লাগে না। কালামুল্লাহর প্রভাবে বান্দা আপছে-আপ গুনাহ থেকে হটে যায়। কলব যখন কুরআনি নূরে নূরানী হয়ে যায়, কলব থেকে এক ধরনের রশ্মি বিকিরিত হতে থাকে। কেমোথেরাপি যেমন ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংস করে, কুরআনি নূরও গুনাহের জীবাণু দূর করে। কুরআনি নূর কলবকে হালালে অভ্যস্ত আর হারামে অনভ্যস্ত করে তোলে। সহজেই।

২১. কুরআনি সালসাবীল

রাতের শেষ প্রহরে যারা তাহাজ্জুদে বা হিফযে তিলাওয়াতে কুরআন নিয়ে মশগুল থাকে, তারাই ভালো করে বুঝতে পারবে (إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْـًٔا) অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমন যা কঠিনভাবে প্রবৃত্তি দলন করে (মুযযাম্মিল ৬)।

এই মহার্ঘ মুহূর্তে কুরআনের আয়াতগুলো 'সালসাবীলের' মতো সাবলীল গতিতে জিহ্বা থেকে অন্তর্দেশে গড়িয়ে যেতে থাকে। পাথর যেভাবে ধীরলয়ে গিয়ে পানির তলদেশে গিয়ে স্থির হয়ে বসে যায়—আয়াতগুলোও এমন। আস্তে গিয়ে কলবে বাসা বেঁধে বসে। এটাই শেষ-রাতের অপার রহস্য।

২২. কুরআনের বসন্ত

পৃথিবীতে বসন্ত আসে বছর ঘুরে একবার। কুরআনের বসন্ত আসে বারবার। কুরআন নিজেই একটি জীবন্ত বসন্ত। কুরআনের প্রতি সূরা-আয়াত-বাক্য এমনকি প্রতিটি হরকতেই বসন্ত আছে। বৃষ্টির পর পাতাময় গাছ ঝাড়া দিলে কেমন ঝুরঝুর করে পাতা থেকে অবশিষ্ট বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ে। শীতের সকালে গাছ ঝাঁকালে কেমন টুপুরটাপুর শিশিরবিন্দু হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে। কুরআনের আয়াত নাড়া দিলেও এভাবে বসন্ত ঝরে। রহমত, হেদায়াত, ক্ষমা, সওয়াব ঝরে পড়ে। ভাই গাছে উঠে বড়ই পাড়লে, গাছ ঝাঁকি দিলে কীভাবে বড়ই ঝরে? পাকা বড়ই হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিচে ফেললে ছোট্ট খুকি ফ্রকের আঁজলা দিয়ে বড়ইগুলো কুড়িয়ে নেয়। কুরআনও এমনি মুষলধারে করুণাধারা বর্ষণ করে। আঁজলা ভরে কুড়িয়ে নিলেই হলো। কুরআনি বসন্তের কোনো খরার মৌসুম নেই। কুরআন বারোমাস ফল দেয়।

২৩. হৃদয়ের গভীরে

আমি অবাক হয়ে ভাবি, কুরআন হৃদয়ের কত্ত গভীরে পৌঁছে যায়! দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে মাঠঘাট শুকিয়ে খটখটে। সব ঠনঠনা। কোথাও পানির চিহ্ন

নেই। চিটিয়াল ধু-ধু চারদিক। সূর্যের প্রখর গনগনে উত্তাপ। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো মাটি কেমন গোগ্রাসে শুষে নেয়? পরের ফোঁটাগুলো শুকনো মাটির কত কত গভীরে পৌঁছে যায়? মাটির তলদেশের পানির স্তরে কত দ্রুত পৌঁছে যায়? পাপী-তাপী সকলের হৃদয়েও কুরআন কারীম এভাবে পৌঁছে যায়। দীর্ঘদিন ধরে মনের গভীরে ঘাপটি মেরে থাকা 'অসুখ' গোষ্ঠীসুদ্ধ 'মনছাড়া' করে ছাড়ে। মাটি কাটার জন্য পানি সেচে ফেলা শুকনো গরু-ভেড়া চরে বেড়ানো পুকুর যেমন বর্ষায় কানায় কানায় ভরে ওঠে, কুরআনের ছোঁয়ায় অসুখী মনগুলোও সুখে তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

২৪. কুরআনে ফেরা

আমি এখন সুসময়ে আগ্রহ নিয়ে কুরআন নিয়ে বসছি না, এমন সময় আসতে পারে, আমাকে একান্ত বাধ্য হয়ে কুরআনের দ্বারস্থ হতে হবে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় অশান্তি আমাকে ছেঁকে ধরবে। তখন একটুখানি স্বস্তির জন্য, সামান্য আশ্রয়ের জন্য কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। ভারসাম্যহীন জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য কুরআনের কাছে আসতে হবে। বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন দেখে আমার মনে হতে পারে, আমি কুরআন ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। আমাকে মনে রাখতে হবে, কুরআন ছাড়া আমি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হব। আমাকে কুরআনের কাছে ফিরে আসতেই হবে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগে আগে সাগ্রহে ফিরে আসাই উত্তম।

২৫. কুরআনি শিশির

কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম। কুরআনের সংস্পর্শে এলে বান্দার মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়ই। কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করলে, কুরআনের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করলে, কুরআনকে আপন করে নিলে, কুরআনের কাছে নিজেকে সঁপে দিলে, কুরআন মানুষকে বদলে দেয়। এর মাঝেও কিছু আয়াত এমন আছে, গভীর অভিনিবেশের সাথে পড়তে গেলে, হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, এই আয়াত বুঝি এখন এই মুহূর্তে আমার ওপর নাযিল হয়েছে। সরাসরি আসমান থেকে আমার কলবে নেমে এসেছে। এতটাই তরতাজা আর টাটকা, মনে হতে থাকে শিশিরভেজা সর্ষেফুল মনের বাগানে আন্দোলিত হচ্ছে।

২৬. আত্মার সংযোগ

কুরআন কারীমের সাথে, আত্মার সংযোগে তৈরি হয় এক বিস্ময়কর রসায়ন। তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াতে কলবে একধরনের আলো তৈরি হয়। এই আলো প্রকাশ পায় কাজেকর্মে বরকতরূপে, চিন্তাচেতনায় উপদেশরূপে। ওই আলোর প্রভাবে সৃষ্টি হয় ইস্তেকামত। আল্লাহর আদেশ পালনের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।

তৈরি হয় অন্তর্দৃষ্টি। সহজ হয়ে যায় দীন ও দুনিয়ার পাথেয় অর্জন। কুরআনের তাদাব্বুর সুন্দর ও সঠিক পথ দেখায়,

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল (ইসরা ৯)।

২৭. দুঃখজনক অবহেলা

কুরআন কারীম বড় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। নিতান্ত হেলাভরা কুরআনচর্চা আমাকে কুরআনের নিকটবর্তী করবে না। আন্তরিকতাহীন কুরআনচর্চা আমাকে কুরআনের রাজ্যে দাখিল করবে না। আমার সর্বোচ্চ মেধা ও চেষ্টা ব্যয় করলে, কুরআন আমার কাছে এলেও আসতে পারে। আমি কুরআনকে মাথায় করে রাখলে, কুরআন আমার মাথায় আসতে পারে। আমি কুরআনের যথাযথ মর্যাদা দিলে, কুরআনও আমাকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারে। উদাসীন হৃদয়ে কুরআন আসে না। থাকে না। কুরআন কারীম সম্মানিত কিতাব। কুরআনের শিক্ষা ও হেদায়াতও সম্মানিত। এই সম্মানিত কিতাব অর্জন করতে হলে, আমাকেও সম্মানজনক ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে। নিজের আচার-বিশ্বাসকে সম্মানজনক করে তুলতে হবে।

২৮. কলবে সলীম

কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে, কলবকে সলীম করতে হবে। কলবকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত করতে হবে। একসাথে সম্ভব না হলে, সাফাইয়ে কলবের মেহনত ধীরে ধীরে চালিয়ে যেতে হবে। কুরআনি বসীরত বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে হলে, অন্তরের বাধাগুলো দূর করতে হবে। শরীর অসুস্থ হলে, পেট খারাপ হলে, পুষ্টিকর খাবারেও কোনো কাজ হয় না। মুখে রুচি থাকে না। খাবার পেটে থাকে না। সব বেরিয়ে যায়। ধরে রাখতে পারে না। কলব পেটের চেয়েও বেশি স্পর্শকাতর। কলব কালিমাযুক্ত হলে, পাপযুক্ত হলে, কলবেও কুরআনি শিক্ষা, কুরআনি হেদায়াত, কুরআনি বসীরত পিছলে যায়। কলবে স্থির হয়ে জমতে পারে না।

৩০. কুরআনের শত্রু

পাপ কুরআন কারীমের ঘোরতর শত্রু। পাপীর কাছে কুরআন আসে না। যার পাপ যত বেশি, কুরআন তার থেকে তত দূরে। একমাত্র (الْمُطَهَّرُونَ) পবিত্ররাই কুরআন কারীম স্পর্শ করতে পারে। কুরআন কারীম স্পর্শ করতে ওজু লাগে। পবিত্রতা লাগে। এই পবিত্রতা শুধু শারীরিক নয়, আত্মিকও বটে। হাত দিয়ে ধরতে যেমন পবিত্রতার প্রয়োজন, অন্তর দিয়ে কুরআনের হেদায়াত ছুঁতেও আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রয়োজন। পাপমুক্ত কলব প্রয়োজন। আত্মিক পরিশুদ্ধি বলতে, শতভাগ পাপমুক্ত

কলব হতে হবে এমন নয়, তবে পাপযুক্ত কলবকে পাপমুক্ত করার সদিচ্ছা থাকলেও, আপাত পাপযুক্ত কলবও কুরআনি হেদায়াতকে ছুঁতে পারবে। কারণ কলব তখন পাপী থেকে তাপীতে পরিণত হয়েছে। দাগি থেকে নিদাগ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে।

৩১. সগীরা গুনাহ

সগীরা গুনাহ নামে সগীরা হলেও, কামে কবীরা। সগীরা গুনাহর কাজ স্লো পয়জনের মতো। ধীরে ধীরে কাজ করে। নীরবে। সগীরা গুনাহর সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি হলো, ইবাদত-বন্দেগীর 'হিম্মত' দুর্বল করে দিতে থাকে। ক্যান্সার যেভাবে ক্রমশ শরীরকে ক্ষইয়ে দিতে থাকে, সগীরা গুনাহও ইবাদতের ইচ্ছাশক্তিকে মেরে ফেলতে থাকে। সগীরা গুনাহ প্রথম প্রথম ইবাদতের সময়কে সংক্ষিপ্ত করে। তারপর ইবাদতের সময়কে পিছিয়ে দিতে শুরু করে। একসময় ইবাদত থেকেই দূরে সরিয়ে দেয়। নয়তো ইবাদতকে প্রাণহীন করে দেয়। সহীরা গুনাহ বেশি আঘাত হানে কুরআন আর মুনাজাতের ওপর। তিলাওয়াত ও মুনাজাতের স্বাদ নষ্ট করে দেয়। তিলাওয়াত ও মুনাজাতকে নামকাওয়াস্তের রূপ দেয়। মুমিন সচরাচর কবীরা গুনাহ করে না। সগীরা গুনাহই একসময় বান্দাকে কবীরা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। সগীরা গুনাহে লিপ্ত হতে হতে, গুনাহের সাথে একধরনের চিন-পরিচয় তৈরি হয়। একসময় কবীরা গুনাহকেও সগীরা মনে হতে থাকে। কবীরা গুনাহর প্রভাবে কলব শক্ত হয়ে যায়। তিলাওয়াত মুখে মুখেই থেকে যায়, কলব পর্যন্ত পৌঁছে না (لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ) কুরআনকে স্পর্শ করে কেবল তারাই, যারা অত্যন্ত পবিত্র (ওয়াকিয়া ৭৯)। কুরআন কারীম শুধু পবিত্র কলবেই বাসা বাঁধে। অপবিত্র কলবে কুরআনি নূর দানা বাঁধতে পারে না। জমাট হয়ে বসে না।

৩২. অন্তরায়

মানুষের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা কঠিনতম এক আযাব হলো 'গাফলত'। উদাসীনতা। ইবাদতে উদাসীনতা। তিলাওয়াতে উদাসীনতা। তাদাব্বুরে উদাসীনতা। কুরআনের আয়াত শুনেও বোঝার চেষ্টায় উদাসীনতা। কুরআনের আয়াত শুনেও শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উদাসীনতা। এই গাফলত বা উদাসীনতা আল্লাহর দেয়া আযাব। আমার গুনাহের কারণে এই আযাব নেমে এসেছে আমার ওপর। আমার গুনাহই আমার কলবকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে। গুনাহের জং আমার কলবের 'অন্তর্দৃষ্টি' কেড়ে নিয়েছে। গুনাহের পর্দা কলব ও কুরআনের মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছে।

৩৩. সত্যিকার ভালবাসা

কুরআন কারীমের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা জন্মালে, আপনা-আপনিই আমার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। বিশুদ্ধ ভালোবাসার সাথে সাথে ভয়ও আসে।

প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুকে হারানোর ভয়। কুরআনের ভালোবাসাও আমার মধ্যে হারানোর ভয় সৃষ্টি করবে। গুনাহর মুখোমুখি হলে মনে ভয় জাগবে, গুনাহে লিপ্ত হলে আমার কাছ থেকে কুরআন চলে যাবে। নিজেকে মন্দ কাজে জড়াতে গেলে ভয় জাগবে, কুরআন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কুরআনবিরোধী আখলাকে জড়াতে ভয় লাগবে, কুরআনবিরোধী মজলিসে বসতে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী বইপত্র পড়তে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী বন্ধু রাখতে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী স্বামী/স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পড়তে/চাকরি করতে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী সমাজে/রাষ্ট্রে বাস করতে ভয় লাগবে। কুরআনবিরোধী আড্ডায় জুড়তে ভয় লাগবে। কারণ, আল্লাহ আমাকে সব সময় দেখছেন। আমার ভেতরটা প্রতিনিয়ত অবলোকন করছেন।

৩৪. বিশদ কিতাব

ইয়া আল্লাহ, পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আপনি আমাদের কুরআনের মতো এক মহাগ্রন্থ দান করেছেন। আপনার সীমাহীন প্রশংসা, আপনি আমাদের একটি বিশদ (مُفَصَّلًا) বর্ণনা-সংবলিত কিতাব দান করেছেন। যে কিতাবে আমাদের জন্য রেখেছেন হেদায়াত, রহমত, হেকমত ও শেফা। ইয়া আল্লাহ, আপনার অন্তহীন শোকর, আপনি আমাদের কুরআন কারীম বোঝার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সুন্নাহ দান করেছেন।

৩৫. মাওইযাহ

কুরআন আগাগোড়া এক 'মাওইযাহ'। উপদেশ। কুরআনের উপদেশ পাথরদিলকে গলিয়ে মোমের মতো নরম করে দেয়। কুরআনের উপদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়জ্ঞানীকেও সতত সতর্ক করে। কুরআনের উপদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষকেও প্রতিটি মুহূর্তে আখেরাতের ভয় দেখায়। অথচ আমি কত গাফেল, হাতের কাছে কুরআন পেয়েও তিলাওয়াত করি না। নিয়মিত কুরআন পড়েও উপদেশ গ্রহণ করি না। আমি কত দুর্ভাগা। আমি কি তাহলে কুরআনি হেদায়াতের উপযুক্ত নই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে আপনি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকুন (ক্বাফ, ৪৫)।

আমি যে কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করছি না, তবে কি আমার মনে আল্লাহর সতর্কবাণীর ভয় নেই?

৩৬. কুরআনি ভ্রমণ

কুরআন খতম করা এক মুবারক সফরে বের হওয়ার মতো। এ-এক অপূর্ব জগতে ভ্রমণ। পথ চলতে চলতে কত কিছু যে চোখে পড়ে। কখনো হাসি, কখনো কান্না। কখনো বিপদ, কখনো ভয়, কখনো স্বস্তি। ভ্রমণে বের হলে অর্ধেক পথে থেমে যাওয়া উচিত নয়। মূল গন্তব্যপানে সফর অব্যাহত রাখা জরুরি। ভ্রমণপথে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দ্রষ্টব্য স্থান ভালো করে না দেখে সামনে বাড়া উচিত নয়। আবার ভ্রমণকে অহেতুক ধীরগতির করাও ঠিক নয়। যথাসময়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছার তাড়া থাকতে হবে। আবার চোখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সফর করাও চলবে না। সব দেখেশুনে, জেনেবুঝে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। আয়াতের সৌন্দর্য অবলোকন করতে হবে। আয়াতে আয়াতে আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করতে হবে। জান্নাত-জাহান্নামের যথার্থ উপলব্ধি মাথায় হাজির করতে হবে। আমি দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারি। এর অর্থ হলো, আমি কল্পনাতীত জগতে ভ্রমণের পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। এমন দুর্লভ পাসপোর্ট পেয়েও, ঘরে বসে থাকা, সুস্থ স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে না। তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক এক অনন্য বিশ্বভ্রমণে? রাব্বে কারীম তাওফীক দান করুন।

৩৭. আখেরাতের সঞ্চয়

আল্লাহ তা'আলা আমাকে যতটুকু কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন, একজন মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করে, সেটুকু অন্যকে শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। কুরআন শেখা ও শেখানো উভয়টাই আখেরাতের সঞ্চয়। আমি যার কাছে শিখেছি, তার প্রতি সকৃতজ্ঞ আচরণ করা, আমি যা শিখেছি তা অন্যকে বিনম্রচিত্তে শিখতে সহযোগিতা করা, এটা কুরআনি ইলমে বরকত আসার মূলকথা।

৩৮. কুরআনের উসীলায়

আমি কুরআনকে আমার সময়-শ্রম দিলে, কুরআন আমার জন্য বরকত নিয়ে আসবে। ইহজীবনে আমি কুরআনের জন্য আরাম হারাম করলে, পরকালে কুরআন আমার জন্য আরাম হালাল করে রাখবে। বিশিষ্ট মিসরীয় নাহুবিদ দাউদ বিন ইয়াজীদ রহ.। তার মৃত্যুর পর এক পরিচিতজন তাকে স্বপ্নে দেখলেন। জানতে চাইলেন, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উসীলায় তিনি আমার প্রতি রহম করেছেন।

৩৯. হামিলে কুরআন

কুরআনের বাহক—হামিলে কুরআন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আল্লাহর কালামের মর্যাদা রক্ষায় কারও নিন্দামন্দের তোয়াক্কা করে না। ফুযাইল

বিন ইয়ায রহ. বলেছেন, হামিলে কুরআনের উচিত ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হওয়া। হামিলে কুরআনের উচিত নয়, অনর্থক গল্পগুজবকারীদের সাথে যোগ দেয়া, উদাসীনদের সাহচর্যে থাকা, কুরআনের সম্মানহানিকর কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যাওয়া। হামিলে কুরআনকে হতে হবে সমাজে আদর্শস্থানীয়।

৪০. ত্যাগ-তিতিক্ষা

আরাম-আয়েশ করে সাধারণত কুরআন শেখা যায় না। কুরআনকে পেতে হলে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়। সাময়িকের জন্য হলেও নিজের সবচেয়ে মূল্যবান জানমাল কুরআনের জন্য ব্যয় করা জরুরি। সবচেয়ে বড় কথা, জানমাল আল্লাহর দেয়া। আল্লাহর কুরআনের জন্য আমি আল্লাহর দেয়া বস্তু খরচ করতে পারব না কেন?

৫০. কুরআনি হালাকা

শায়খ শা'রাবীর তাফসীরের দরস বিশ্ববিখ্যাত। তার তাফসীর দরসের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন শায়খ হুনাইদী। তিনি কিছুদিন তাফসীর দরসে অনুপস্থিত ছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার কারণে অসুবিধায় পড়েছিলেন। সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পর, আগের মতো নিয়মিত কুরআনি হালাকায় শামিল হতে শুরু করলেন। শায়খ শা'রাভী রহ. অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। শায়খ হুনাইদি পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা জানালেন। দরসে শরীক হওয়ার বিনিময়ে ওস্তাদের সম্মানি আদায় করার মতো আর্থিক সংগতি ছিল না। শায়খ শা'রাবী উত্তর দিলেন, আমরা কুরআনের শিক্ষকরা হলেম রাজার মতো। হাত খালি থাকলেও কারও কাছে কিছু চাই না। কাউকে খালিহাতে ফিরিয়ে দিই না। ইমাম শাতেবী রহ.-এর মতো বলেছেন,

'আমরা আহলে কুরআনরা 'কুরআন বেচে খাই না।'

৫১. নিয়ত

কুরআন শিখতে এসে, সব সময় নিয়তের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সূরা ও পারার পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে নফস ও শয়তানের দৌরাত্ম্যও বাড়তে থাকে। বারবার যাচাই করতে হয়, মনে হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া-অহংকার বাসা বেঁধে আছে কি না। যতবেশি পারা বা সূরা ইয়াদ হবে, মনে মনে মানুষের প্রশংসা লাভের ইচ্ছাও প্রবল হতে থাকবে। সতর্ক থেকে নিয়মিত তাওবা-ইস্তেগফার করে যেতে হবে।

৫২. প্রশ্নোত্তর

কুরআন কারীম বুঝে বুঝে পড়তে গেলে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমাতে শুরু করবে। আশেপাশে অভিজ্ঞ আলিম থাকলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর জেনে নিতে

হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে উত্তর চেয়ে দোয়া করতে হবে। আশেপাশের কারও কাছে উত্তর না পেলেও সমস্যা নেই। থেমে না থেকে পড়া চালিয়ে যেতে হবে। প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর কোথাও না পেলে, ধরে নিতে হবে, কুরআনি হেদায়াত লাভের জন্য প্রশ্নটির উত্তর জানা আপাতত আমার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নটির উত্তর জানা আমার মৌলিক হেদায়াত লাভের জন্য জরুরি হলে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই গায়েবীভাবে উত্তরের ব্যবস্থা করে দিতেন। তবে উত্তর জানার চেষ্টা ও দোয়া অব্যাহত রাখা জরুরি। অনেক সময় কুরআন প্রশ্নগুলোর উত্তর আল্লাহ এমনি এমনি জানিয়ে দেন। কুরআন পড়তে পড়তেই একসময় চট করে উত্তরটা মাথায় জেগে ওঠে। তবে কুরআন বিষয়ক নিজস্ব যেকোনো চিন্তাই অভিজ্ঞ কারও সাথে আলোচনা করে নেয়া নিরাপদ।

৫৩. সুরের মায়া

নাশীদ-সংগীতের টান অনেক সময় কুরআনবিমুখ করে দেয়। সুরের মোহ পেয়ে বসলে, কুরআন কারীমও শোনে সুরের জন্য। আল্লাহর কালাম উপলব্ধির জন্য নয়। কুরআন কারীম সুর করে পড়া সুন্নাহ। কিন্তু সুরটা মুখ্য হয়ে গেলে, কুরআনের তাদাব্বুর আর হেদায়াতটা গৌণ হয়ে যায়। তিলাওয়াত যত সুন্দরই হোক, মনকে সুর থেকে অর্থের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তিলাওয়াতের সুরেই যেন আটকা না পড়ি, সুর ছাড়িয়ে যেন আরও গভীরে যেতে পারি, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। প্রথম প্রথম কিছুদিন সুরের স্তরে থাকলে সমস্যা নেই। পরে মনকে শুধু সুরেই তৃপ্ত থাকতে না দিয়ে আয়াতে কী বলছে সেদিকেও চিন্তা করতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি।

৫৩. অটুট ভালোবাসা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আদম বিন ইয়াস রহ.। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কুরআন খতম হতে আরও কিছুটা বাকি আছে। শুয়ে শুয়ে তিলাওয়াত করে খতম করলেন। তারপর কুরআন কারীমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজীবন তোমার প্রতি ভালোবাসা অটুট ছিল। তুমিও ভালোবেসে আমার সাথে এই পর্যন্ত থেকেছ। আমিও আজকের দিন পর্যন্ত তোমার পবিত্র সঙ্গ কামনা করে এসেছি। তোমার সাথে আমার ভালোবাসার বাসনা পূরণ হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপর তিনি মারা গেলেন -মাজমূউর রাসায়েল, ৩/১১৯, ইবনে রজব রহ.।

৫৪. আল্লাহর মহব্বত

কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির উপায়। কুরআন আল্লাহর কালাম। তার কালাম আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে, আল্লাহর ভালো লাগে। আমি যত বেশি তিলাওয়াত করব, তত বেশি আমার হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

অপরদিকে আমার প্রতিও আল্লাহর মহব্বত রহমত বৃদ্ধি পাবে। কাউকে যখন তিলাওয়াত করতে দেখব, ধরে নেব তিনি আল্লাহর মহব্বতে মশগুল আছেন। আমি যতক্ষণ তিলাওয়াতে মশগুল থাকব, আল্লাহ মহব্বতের ছায়াতেই অবস্থান করব। কুরআনের সাথে সময় কাটানোর পরিমাণই বলে দেবে, আমি আল্লাহর কতটা মহব্বত চাই। আমি কতক্ষণ আল্লাহকে মহব্বত করতে চাই।

৫৫. যোগ্যতার ধোঁকা

কুরআনের পথিককে নিজের যোগ্যতা নিয়ে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। বর্তমানের কেউ যত বেশি কুরআনি ইলমই ধারণ করুক, তারা ইলম-আমলে, যোগ্যতা-সভ্যতায় প্রথম কয়েক শতাব্দীর কুরআনি আলিমদের মতো হতে পারবে না। তাদের তুলনায় বর্তমানের আল্লামা-ডক্টরেটরা কিছুই নয়। কুরআনি আলেমকে অন্যের প্রশংসায় একদম কর্ণপাত করা উচিত নয়। অন্যদের প্রশংসায় গলে যাওয়াও কুরআনি আলিমের জন্য শোভনীয় নয়।

৫৬. ব্যতিক্রমী সম্মান

কুরআনের একটি বিশেষণ 'কারীম'। সম্মানিত। কুরআনের সম্মান ব্যতিক্রমী। সাধারণ কোনো বই একবারের বেশি পড়লে, বিরক্ত লাগে। রাজাদের দরবারে কোনো কথা একবারের বেশি বলা যায় না। কিন্তু কুরআন সম্পূর্ণ ভিন্ন। যতই তিলাওয়াত করা হোক, বিরক্তির উদ্রেক করে না। যত বেশি তিলাওয়াত করা হোক, কুরআন পুরোনো হয় না। কুরআন যত পড়া হয়, আরও বেশি তাজা হতে থাকে। কুরআন যত বেশি পড়া হয়, ততই কুরআনের সম্মান আরও সমুন্নত হতে থাকে। অন্য বই যত পুরোনো হয়, ততই তার কদর কমতে থাকে। পক্ষান্তরে যত দিন গড়াচ্ছে, কুরআনের সম্মান আরও বাড়ছে।

৫৭. সুপারিশকারী

কিতাবুল্লাহ বিশ্বস্ততম সুপারিশকারী। কিতাবুল্লাহ মুক্তহস্তে দানকারী। কিতাবুল্লাহ অঢেল প্রাচুর্যের অধিকারী। কিতাবুল্লাহ শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। কুরআনের সাথে কথা বলে কখনোই বিরক্তি আসে না। কুরআনের সাথে সময় কাটালে আত্মিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। মানবিক গুণাবলি উন্নত হয়। কুরআন কারীম সুন্দরতম কথা, যেমনটা রাব্বে কারীম বলেছেন, (ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ) আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী (যুমার, ২৩)।

৫৮. অগ্রাধিকার

কুরআন তিলাওয়াতই শ্রেষ্ঠতম যিকির (أفضل الذكر تلاوة القرآن)। মানুষের সত্যিকার উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিটি জ্ঞানশাস্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন শাস্ত্র?

অবশ্যই কুরআন। অন্যান্য শাস্ত্র প্রয়োজনবোধে চর্চা করতে হলেও, সর্বাবস্থায় কুরআনই অগ্রাধিকার পাবে। জীবনের চাহিদা মেটাতে জ্ঞানের অন্য শাখায় বাধ্যতামূলক বিচরণ করতে হলে, উক্ত শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর, কুরআনচর্চায় ফিরে আসা কাম্য।

৫৯. কুরআনি আবহ

সাহাবায়ে কেরামের দিনরাত কাটত কুরআন ও সুন্নাহর আবহে। তারা বাস করত কুরআনি সমাজে। তারা রাতে ঘুমুতে যেত, আগামীদিন নতুন কোনো আয়াত নাযিলের উন্মুখ প্রত্যাশা নিয়ে। তারা জানত, তাদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর কাছে পাবে। কখনো সরাসরি কুরআনের আয়াতে, কখনো রাসূলুল্লাহর সুন্নাহতে। তারা দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করত, যেসব প্রশ্ন তারা উচ্চারণ করতে পারছে না, মনে মনে রেখে দিয়েছে, সেসবের উত্তরও আল্লাহ তা'আলা কোনো-না-কোনোভাবে দিয়ে দেবেন।

কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আত্মসমর্পণের এই মানসিকতা, সাহাবায়ে কেরাম থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মে। সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেই উম্মাহ আসমানি ওহীর সাথে আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে আছে। তাদের অবচেতনেই গাঁথা আছে—যাবতীয় সমস্যার সমাধান আছে কুরআন ও সুন্নাহয়।

কালক্রমে উম্মাহর বৃহত্তর একটি অংশ, দুনিয়ার লোভলালসার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তারা অন্তরের শুদ্ধতা হারাতে শুরু করল। ওহীর প্রতি সমর্পণচিত্ততার যে আজন্ম শিক্ষা তাদের মর্মমূলে গেঁথে দেয়া ছিল, সেটার ওপর পার্থিব কলুষতার পলেস্তারা পড়তে শুরু করল। শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাবে তারা সমস্যা সমাধানে কুরআন-সুন্নাহমুখী না হয়ে, পার্থিব নানা বাদ-মতবাদমুখী হতে শুরু করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। যে উম্মাহ একসময় চোখের পলকও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করত, তাদের আজ এ কী বেহাল দশা! তাদের সূচনায় যে অকৃত্রিম ওহীশুদ্ধতা ছিল, তা থেকে তারা আজ কত দূরে! এই করুণ দশা থেকে মুক্তির একটাই উপায়, আবার কুরআন-সুন্নাহয় ফিরে আসা।

৬০. মনোব্যাধির আরোগ্য

কুরআন কারীম যাবতীয় মনোব্যাধির আরোগ্য। কুরআন শয়তানের যাবতীয় শয়তানি থেকে রক্ষা করে। দুষ্ট মানব ও জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। প্রবৃত্তির কুচাহিদা, নাফসের অসৎ বাসনা থেকেও কুরআন রক্ষা করে।

ওস্তাদ নির্ধারণের আগে দেখে নেয়া উচিত, আকীদা দুরস্ত আছে কি না, শরীয়তের পাবন্দি আছে কি না। ইলম অনুযায়ী আমল আছে কি না। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা

কাম্য। তিনি কুরআনের শব্দের পাশাপাশি অর্থ মানে আমলও শিক্ষা দিতে পারেন কি না, এটা দেখা জরুরি। নিজে ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ছাত্ররা কী শিখবে?

৬১. কুরআনি ফিতরাহ

কুরআন কারীম শিক্ষা লাভ করা মুসলিম শিশুর অন্যতম মৌলিক অধিকার। কুরআন একটি 'ফিতরী' বিষয়। স্বভাবজাত বিষয়। কুরআনি ইলম মানবশিশুর জন্মগত প্রকৃতির মতোই শুদ্ধ আর গ্রহণযোগ্য। একটি শিশু কুরআনের স্পর্শে এসে আরও বেশি শুদ্ধ হয়ে ওঠে। কুরআনের ছোঁয়ায় আরও বেশি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। শিশুমন আর কুরআন দুটোই 'ফিতরাহ'। উভয়টাই সাবলীল সহজাত। সব ধরনের কৃত্রিমতামুক্ত। কুরআন শিশুর হৃদয়ে ওহীর নূর ছড়িয়ে দেয়। পার্থিব কলুষতা কালিমা স্পর্শ করার আগেই, শিশুমনে কুরআনি নূর বসিয়ে দেয়া জরুরি। তাহলে মুসলিম উম্মাহ পাবে এক যোগ্যতর প্রজন্ম। বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো একদল সুশিক্ষিত নওজোয়ান।

৬২. বসিরাহ

দীর্ঘদিন কুরআন থেকে দূরে থাকলে, মনে একধরনের জং ধরে যায়। আবার নতুন করে শুরু করতে গেলে, অসুস্থ ব্যক্তির তিতা ওষুধ পান করার মতো অনুভূতি হয়। পড়া সামনে আগাতে চায় না। গিলতে কষ্ট হয়। একটু পড়েই হাঁপ ধরে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে পড়া চালিয়ে যেতে হয়। অসুস্থ শরীরে ঠিক যেমন পুষ্টিকর মজাদার খাবার বিস্বাদ আর তিতকুটে লাগে। জোরদার তিলাওয়াতের কারণে, আস্তে আস্তে জং, কালিমা, বাতিল, ভ্রান্তি দূর হয়ে গেলে, তিলাওয়াতে মিষ্টতা আসতে শুরু করে। কুরআনি সময়গুলো মজাদার লাগতে শুরু করে। কুরআনের প্রভাবে কলব হয়ে ওঠে স্বচ্ছ নিটোল ঝরঝরে ফুরফুরে। কলব আলোকিত হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় অন্তর্দৃষ্টি-বাসীরাহ।

৬৩. কুরআনি জীবন

মনেপ্রাণে কুরআন গ্রহণ করলে, জীবনের অনেক হিসেবনিকেশ বদলে যায়। কুরআনমতো জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নিলে, ঘরে-বাইরে অনেক পরিবর্তন আসে। এতদিন যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, এমন অনেক কিছুই এখন গুরুত্বহীন হয়ে যায়। কুরআনপূর্ব জীবনে এতদিন যারা সেরা বন্ধু ছিল, তারাও কুরআনি জীবনে গৌণ আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পুরোনো বন্ধুদের স্থানে আল্লাহ তা'আলা নতুন কুরআনি বন্ধু জুটিয়ে দেন। কুরআন আমাকে নতুন করে গড়েপিটে নেয়। কুরআন আমার জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। কুরআন আমার ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক রদবদল নিয়ে আসে। পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তন জীবনকে আরও সুন্দর করে তোলে। আরও অর্থবহ করে তোলে। আরও

আখেরাতমুখী করে তোলে। কুরআনের জন্য আমি আগের প্রিয়তম যা কিছু ত্যাগ করেছি, তার বিনিময়ে আল্লাহ আরও উত্তম বদল দান করেন। কুরআন কখনোই তার অনুসারীকে হতাশ করে না। ক্ষতিগ্রস্ত করে না। পিছিয়ে দেয় না।

৬৪. কুরআনি নূর

আগুন পানি যেমন একসাথ হয় না, কুরআন আর গুনাহও একসাথ হয় না। দুটি বিষয়, কুরআনি তথ্যজ্ঞান আর কুরআনি নূর। গুনাহ থাকলেও কুরআনি তথ্যজ্ঞান আসতে পারে। তবে কুরআনি নূর আসে না। এ জন্য কাফেরও কুরআন শিখতে পারে। কুরআন-বিষয়ক গবেষণা করতে পারে। গুনাহ কুরআন বুঝতে উপলব্ধিতে আনতে বাধা দেয়। কুরআনে আছে,

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

আমি তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা তা বোঝে না; তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি (আন'আম, ২৫)।

৬৫. কুরআনি সঙ্গ

এখন কতকিছু আমার সাথে আছে। ভাই-বেরাদর। মা-বাবা। বিবিবাচ্চা। বন্ধু-বান্ধব। একটা সময় আসবে, আমার আশেপাশে কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু আমার আমল। থাকবে শুধু কুরআন কারীম। কুরআন আমাকে কবরে সঙ্গ দেবে। কুরআন আখেরাতে আমার মর্যাদা বুলন্দ করবে। কুরআন আমাকে কেয়ামতের মহাবিপদের দিন আগলে রাখবে। কুরআন আমার মা-বাবাকে সম্মানিত করবে। কুরআন আমাকে মহাসম্মানে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

৬৬. কুরআনচর্চা

হাদীসে বর্ণিত আহলে কুরআন কারা? আহলে কুরআন কুরআন হিফয করে। যারা কুরআন কারীম বেশি বেশি তিলাওয়াত করে। সাহাবায়ে কেরামের মতো কুরআন কারীম চর্চা করে। যাদের পুরো সময়ই কুরআন নিয়ে কাটে। যারা রাতের শেষাংশে কুরআন নিয়ে সলাতে দাঁড়ায়।

৬৭. তিলাওয়াতের বাঁধ

গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোথাও পেশাগত কারণে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করে নেয়া নিরাপদ। কলবে কুরআনের নূর ভর্তি করে নিয়ে গেলে, গুনাহ এড়িয়ে থাকা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

৬৮. কুরআনি অনুগ্রহ

ইয়া আল্লাহ, না চাইতেই কুরআনের মতো নেয়ামত দান করেছেন। যোগ্যতা ছাড়াই যেহেতু কুরআনের মতো মহামূল্য অনুগ্রহ দান করেছেন, বাকিটুকুও নিজ

অনুগ্রহে করে দিন। কুরআন কারীমকে হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। হৃদয়ের আলো বানিয়ে দিন। কুরআনের মাধ্যমে আমার ঈমান-ইয়াকীন বাড়িয়ে দিন। আমার মর্যাদা বুলন্দ করে দিন। আমাকে কুরআন, কুরআনের ইলম ও বুঝ দান করুন, যেমনটা আপনার নেককার বান্দাদের দান করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমার মাকাম উঁচু করে দিন, আকাশকে খুঁটিবিহীনভাবে যেভাবে উঁচু করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমাকে হকের ওপর অটল অবিচল রাখুন, ঠিক পর্বতমালাকে যেভাবে সমুন্নত-অবিচলিত রেখেছেন। আমীন।

৬৯. ওহীর বরকত

কুরআনের শব্দে বরকত, হরফে বরকত, প্রতিটি সূরায় বরকত, আয়াতে বরকত, সাগরসম মুক্তোসদৃশ অর্থে বরকত। ইবাদতের নিয়তে যে কুরআন শিখবে তার ওপর বরকত নেমে আসবে। যে হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে বোঝার জন্য কুরআন নিয়ে মশগুল হবে, তার ওপর বরকত নেমে আসবে। যে নিজেকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে বসবে, তার ওপর বরকত নেমে আসবে। যে ইলম ও হিকমত লাভের উদ্দেশ্যে কুরআনে ডুব দেবে, তার ওপর নেমে আসবে ইলম ও হিকমতের বরকত।

৭০. আল্লাহর রেজামন্দি

যে কুরআন আঁকড়ে ধরবে তার সাথে বরকত লেপ্টে থাকবে। যে হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে কুরআনের সাথে জড়িয়ে থাকবে, হেদায়াতের বরকত তার সাথে লেগে থাকবে। যে শিফা লাভের উদ্দেশ্যে কুরআনের দ্বারস্থ হবে, আসমানি শিফার বরকত তাকে আরোগ্য দান করবে। যে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে থাকবে, আল্লাহর রেজামন্দির বরকত তাকে বেষ্টন করে থাকবে। কুরআন চর্চার উদ্দেশ্যে যারা মজলিসে বসে, তাদের ওপর নেমে আসে বরকতময় প্রশান্তি ও রহমত। তাদের বরকতময় বেষ্টনীতে জড়িয়ে নেয় রহমতের ফেরেশতারা।

৭১. আলোকিত কুরআন

গুনাহের প্রধান ক্ষতিকর দিক হলো, কলবকে কুরআনবিমুখ করে দেয়। গুনাহ কলবকে কুরআনি হেদায়াত ও শিফা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। গুনাহ কলবকে কালো করে দেয়। কলব হয়ে যায় কৃষ্ণকালো ঘনঘোর কালো রাতের মতো। কুরআন আলোকিত। রাত আর দিন এক হয় না। আলোকিত কুরআনও অন্ধকার কলবে আসে না।

৭২. কুরআনের চারাগাছ

কলবে কুরআন আনতে হলে, আগে কলবকে সাফসুতরো করে নিতে হবে। গুনাহযুক্ত কলব সাফাইয়ের প্রধান উপায় ইস্তেগফার। বেশি বেশি কার্যকর

অনুভূতিময় ইস্তেগফার কলবের কলুষতা দূর করে। গুনাহের কারণে কলব মরে যায়। মৃত কলবকে জীবিত করা সহজ কাজ নয়। ইস্তেগফারের পাশাপাশি তিলাওয়াতের পানি সিঞ্চন করে যেতে হবে অনবরত। শুরুতে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাবে না। বীজ বপন করার পর, পানি দিয়ে যেতে হয়। চারা বের হতে সময় লাগে। কলব থেকে কুরআনের চারাগাছ বের হতেও সময় লাগবে। ইস্তেগফার তিলাওয়াতের পানি দিয়ে যেতে হবে। লেগে থাকলে একসময় কুরআনি নূরের চারা দেখা দেবে। চারা দেখা দিলেও পানি দেয়া বন্ধ করা যাবে না। চালিয়ে যেতে হবে। ফসল কাটা পর্যন্ত মেহনত খেদমত চালিয়ে যেতে হবে। মুমিন ফসল কাটবে মৃত্যুর পর থেকে।

৭৩. একনিষ্ঠ ভালোবাসা

কুরআনকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। নিজের ওপর, নিজের পরিবার-পরিজন, নিজের বিবিবাচ্চা সবকিছুর ওপর। দুনিয়ার সবকিছুর ওপর। দুনিয়াবি কাজকর্মের ওপর। দুনিয়ার পেছনে অন্ধের মতো না পড়লেও, আল্লাহ তা'আলা আমার তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন, তা আমার কাছে পৌছবেই। কিন্তু আমি কুরআনের কাছে যেচে না গেলে, কুরআন আমার কাছে আসবে না। আমি আমার সবটা না দিলে, কুরআন আমাকে সামান্যও দেবে না। আমি সত্যি সত্যি কুরআনকে ভালোবাসলে, কুরআনের জন্য আমার সবকিছু উজাড় করে দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হওয়ার কথা নয়। কুরআনের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসাই আমাকে কুরআনের দিকে ধাবিত করবে। কুরআনের প্রতি নিখাদ ভালোবাসাই আমাকে কুরআনের জন্য সময়-মেধা-শ্রম উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কুরআন ছাড়া দুনিয়ার বাকি সব ইলম নশ্বর। কুরআন ছাড়া বাকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র কুরআন আখেরাত পর্যন্ত আমার সাথে যাবে। তবে কুরআন চর্চাটা হতে হবে সুন্নাহর অনুসরণে। নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করে।

৭৪. আহলুল্লাহ

আল্লাহর পরিবারভুক্ত কারা? আহলে কুরআন। যারা সুন্নাহ অনুযায়ী কুরআনচর্চা করে। আহলে কুরআনের পাঁচ রব্বানী স্তর। পাঁচটি পুরস্কার :

১. শাফা'আত (فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)। কেয়ামতের দিন কুরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে (হাদীস শরীফ)।

২. রিফ'আহ (فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)। আহলে কুরআন উচ্চমর্যাদা লাভ করবে। আখেরাতে আহলে কুরআনকে বলা হবে, তুমি পড়তে থাকো, যত আয়াত পড়তে পারবে, তুমি তত উঁচু প্রাসাদ ও মর্যাদায় উন্নীত হবে (হাদীস শরীফ)।

৩. সুহবাহ (مع السفرة الكرام البررة)। আখেরাতে আহলে কুরআন সম্মানিত নেককারদের সুহবত-সাহচর্য লাভ করবে (হাদীস শরীফ)।

৪. খাইরিয়্যাহ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)। আহলে কুরআন সর্বোত্তম মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়, তিনিই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি (হাদীস শরীফ)।

৫. আহলিয়্যাহ (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)। আহলে কুরআন আল্লাহর পরিবারভুক্ত। তারা আল্লাহর খাস লোক। একান্ত কাছের লোক (হাদীস শরীফ)।

৭৫. থমকে দাঁড়ানো

মন নড়ে তন নড়ে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কুরআনের অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর জগতের সামনে থমকে দাঁড়াও। (সাড়া দিয়ে জেগে ওঠে) হৃদয়কে নাড়া দাও। কুরআনকে শুকনো খেজুরের মতো ঠনঠন ঘড়ঘড়ে আওয়াজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ো না। কবিতার মতো দ্রুতগতির বিড়বিড়ে হুমহাম পাঠ কোরো না। থেমে থেমে অনুধাবন করে করে উপলব্ধিতে এনে এনে তিলাওয়াত করো। সূরা কখন শেষ হবে, এই যেন তোমাদের মূল অভিজ্ঞান হয়ে না ওঠে।

৭৬. সজীব প্রকৃতি

কুরআন নিয়ে জীবন কাটানো মানে, এক জীবনের মধ্যে আরেকটি জীবন যাপন করা। কুরআন আমার কলবকে জাগিয়ে তোলে। কলব আমার জীবনকে জাগিয়ে তোলে। আমি যখন একটি আয়াত তিলাওয়াত করি, আমার কলব আয়াতের ছোঁয়া পেয়ে লকলকিয়ে জেগে ওঠে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে ঘাসপাতা কীভাবে নড়ে ওঠে? সজীব হয়ে ওঠে? বৃষ্টির ছোঁয়ায় পুরো প্রকৃতি কীভাবে জেগে ওঠে, খেয়াল করেছি কখনো? কুরআনের একটি আয়াতের স্পর্শেও আমার কলব সেভাবে জেগে ওঠে। তবে আমি কেন কুরআন তিলাওয়াত করে কলবে কোনো সাড়া পাই না?

৭৭. প্রাণস্পন্দন

ধরা যাক এক গভীর কূপ। আমাকে কূপটি পানিভর্তি করার দায়িত্ব দেয়া হলো। পানি ঢালার কাজ শুরু হলো। প্রথম প্রথম কি আমি বুঝতে পারব, পানি ভর্তি হচ্ছে কি না? দীর্ঘদিন পানিহীন থাকার কারণে, প্রথম পানিগুলোর কিছু খাবে কূপের তলানি। কিছু শুষবে কূপের দেয়াল। তারপর আস্তে আস্তে পানি জমতে শুরু করবে। আমার কলবও দীর্ঘদিন কুরআনের আলোহীন থাকার কারণে, প্রথম দিকের তিলাওয়াতের তাৎক্ষণিক কোনো ফল দেখতে পাবো না। আমার অগোচরে ঠিকই কাজ হচ্ছে। গুনাহের অসংখ্য পরত জমতে জমতে এমন অবস্থা হয়েছে, গণ্ডারের মতো কাতুকুতু দিলেও একসপ্তাহ পরে হাসি আসে। তারপরও বিল-আখের হাসি আসে তো। আমার পাপাসক্ত কলবও এমন। কুরআন পড়ি কিন্তু

কোনো ফল পাই না, এটা ভুল কথা। ফল ঠিকই হয়। আমি টের পাই না। আমাকে পানি ঢালা অব্যাহত রাখতে হবে। ধৈর্যহারা হওয়া চলবে না। কুরআন আমার কলবে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলবেই। ইন শা আল্লাহ।

৭৮. কুরআনের মজা

নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারছি, হিফযও করতে পারছি, কিছু কিছু বুঝতেও পারছি, তাদাব্বুর করারও অভ্যেস গড়ে উঠছে, কুরআন তিলাওয়াতে মজাও লাগে, কুরআন শুনতেও আরাম লাগে। তাহাজ্জুদে গতানুগতিকতার বাইরে বেশি পরিমাণে তিলাওয়াত করতে পারি, এ তো রাব্বে কারীমের অকল্পনীয় নেয়ামত। যার মধ্যেই কমবেশ নেয়ামতগুলো আছে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়া দরকার।

৭৯. আল্লাহর নেয়ামত

অঢেল জ্ঞান-গরিমা। গভীর আর সূক্ষ্ম বুঝশক্তি। চট করে যেকোনো বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতে পারেন। যা পড়েন, সবই মনে থাকে। কুরআন কারীমের যেকোনো আয়াতের তাফসীর বলে দিতে পারেন। সালাফ-খালাফের প্রামাণ্য সমস্ত তাফসীর থেকে তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন। কথায় কথায় কুরআনের আয়াত বলতে পারেন। এক আয়াতের সূত্র ধরে আরও অসংখ্য আয়াত টেনে আনতে পারেন। এমন ঈর্ষণীয় যোগ্যতার কারণে, লোকজন তাকে সীমাহীন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। মানুষের আদর-সমাদর দেখে, তার মনে ধীরে ধীরে অহংকার জন্ম নিল। আল্লাহ তা'আলা বান্দার অহংকারকে ভীষণ অপছন্দ করেন। অহংকারী হৃদয়ে কুরআন থাকে না। মানুষটার কলব থেকে কুরআন চলে গেল। তার উচিত ছিল কুরআনের নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। নিয়মিত শোকর আদায় করা। যেকোনো ইলমই আল্লাহর দান। আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর নেয়ামত। নেয়ামতের শোকর আদায় না করলে, নেয়ামত তো চলে যাবেই।

৮০. বিশুদ্ধ আমি

কুরআন আমাকে বিশুদ্ধ 'আমিকে' ফিরিয়ে দেবে। সেই (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)-পর্বের শুদ্ধতম 'আমিকে'। পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত আমিকে। জটিলতা কুটিলতামুক্ত 'আমিকে'। আমিও ফিরে পাব আমার প্রকৃত 'আমিকে'। শুদ্ধতম 'আমিকে'। পাপাচারদুষ্ট হয়ে পড়ার পর, কুরআনি গোসলশুদ্ধ 'আমিকে'। কুরআনি হিযব আমাকে চিনিয়ে দেবে প্রকৃত 'আমিকে'।

৮১. অপার্থিব কুরআন

কুরআন কারীমকে আমার নিজের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। বৈধ পার্থিব চাহিদার চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিতে হবে কুরআনকে। আল্লাহর অনুমোদন

থাকলে, দুনিয়ার প্রাপ্য অংশ আমার কাছে ধরা দেবেই। কিন্তু আমি অগ্রসর না হলে, কুরআন আমার কাছে যেচে আসবে না। আমি আমাকে না দিলে কুরআন নিজেকে দেবে না। কুরআনের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা থাকলে, কুরআনের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, সেটা অন্তর থেকেই জানা হয়ে যাবে। কারও কাছ থেকে জেনে নিতে হবে না। ভেতরে বাস করা সত্তাই আমাকে জানিয়ে দেবে, কীভাবে কুরআনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। কীভাবে পার্থিব বিষয়ের ওপর অপার্থিব কুরআনকে প্রাধান্য দিতে হবে। কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ভালোবাসাই আমাকে বলবে, কুরআন ছাড়া বাকি সব ভিত্তিহীন। অস্তিত্বহীন।

৮২. আখিরাতভীতি

কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা রহমত। কুরআনকে সাথে নিয়ে যাপিত জীবনে আছে প্রশান্তি আর নিরাপত্তা। এই শান্তি কারও ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। ক্ষমতাও নেই। কুরআন আমাকে যাবতীয় সমস্যার আগাম সমাধান দিয়ে রাখে। কুরআন আমার অন্তর থেকে দুনিয়াপ্রীতি দূর করে অন্তরে আখিরাতভীতি তৈরি করে। কুরআন আমার চিন্তাচেতনাকে শালীন সুশীল করে তোলে। কুরআন আমার মনে ওহীর নূর ছড়িয়ে দেয়। কুরআন আমার শিরা-উপশিরায় আল্লাহর রহমত মিশিয়ে দেয়। আল্লাহর রহমতে আমার জীবন হয়ে ওঠে শান্ত। আরামদায়ক।

৮৩. হুযুরে কলবী

কুরআন কারীম সবার ওপর প্রভাব ফেলে। কুরআন কারীম সবাইকে প্রভাবিত করে। তবে প্রভাবিত হওয়া ও প্রভাবিত করার মাত্রায় পার্থক্য আছে। সবাই কুরআন কারীম দ্বারা সমান প্রভাবিত হয় না। এর মূল কারণ 'হুযুরে কলবী'। যে যত বেশি হুযুরে কলবী নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করবে, সে তত বেশি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হবে। কোনোরকমে পারা শেষ করার উদ্দেশ্যে, দৈনিক হিযব আদায়ের লক্ষ্যে যেনতেন প্রকারে তিলাওয়াত করা আর পরিপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে, ভক্তিশ্রদ্ধা, মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াতে অনেক পার্থক্য। আমি যখন নিজেকে প্রতিটি আয়াতের সম্বোধনের পাত্র কল্পনা করে, গভীর আগ্রহ নিয়ে সাধ্যমতো বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করব, আমার ওপর কুরআনের প্রভাব হবে অপরিসীম। এমন তিলাওয়াত আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুরআনের নূর পৌঁছে দেবে। আমার অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছে দেবে কুরআনের আলো। যে তিলাওয়াতে ইয়াকীন ও হুযুরে কলব মিশে থাকে, সে তিলাওয়াত থেকে জন্ম নিতে পারে, যুগ বদলে দেয়া প্রজন্ম। আর সাদামাঠা তিলাওয়াতে বড়জোর হরফপ্রতি দশনেকী আর কিছু ফযীলত জুটবে। আমি কোন ধরনের তিলাওয়াত করি?

৮৪. আরামদায়ক ছোঁয়া

আমি যখনই রাতের তৃতীয় যামে তিলাওয়াতে মশগুল হয়েছি, আমার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে অপার্থিব এক আরামদায়ক ছোঁয়া অনুভব করেছি। দিনের আলোর তিলাওয়াতে এমন অনুভূতি পাইনি। দিনের তিলাওয়াত আর রাতের তিলাওয়াতে অনেক তফাত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ-ব্যাপারে বলেছেন (إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا)। যে কেউ একটু খেয়াল করলেই শেষ-রাতে ও দিনে তিলাওয়াত করে পার্থক্যটা ধরতে পারবে।

৮৫. পরাজিত নাফস

দুনিয়ার ভোগবিলাসে রসনাতৃপ্ত অন্তর কুরআনি নূরের নাগাল পায় না। প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে পরাজিত 'নাফস' কুরআনি নূরের নাগাল পায় না। রাতদিন ঘুমিয়ে কাটানো অলসের পক্ষেও প্রকৃত কুরআনি হেদায়াতের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। দুর্বল ইচ্ছাশক্তি আর অনাগ্রহ অনাদরে নিতান্ত অবহেলা নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে বসা ব্যক্তির পক্ষে সত্যিকারের কুরআনি নূরের দেখা পাওয়া কঠিন। কুরআন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কিতাব। অদম্য বাসনা, দুর্মর প্রচেষ্টা, বিরামহীন লেগে থাকা ছাড়া, কুরআন কারও কাছে তার রহস্য উন্মোচন করে না। কুরআনের নিজস্ব জগতে প্রবেশ করতে চাইলে, নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। নিজেকে কুরআনি জগতে প্রবেশের উপযোগী বানাতে হবে। দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা আর কুরআনের একান্ত নিজস্ব ভুবনে প্রবেশ করতে পারা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

৮৬. ভার লাঘব

কুরআন কারীম আমাকে আগলে রাখে। কুরআন আমার সময়গুলোকে অপচয় থেকে বাঁচায়। কুরআন আমাকে ঢিলেমি শিথিলতা থেকে হেফাযত করে। কুরআন আমাকে নফসে আম্মারার অনিষ্ট থেকে বাঁচায়। কুরআন আমাকে নফসের অফুরন্ত বাসনা থেকে বাঁচায়। কুরআন আমাকে নফসের ক্লান্তিকর লোলুপতা থেকে বাঁচায়। কুরআন আমাকে ভুল পথ থেকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসে। পৃথিবীর যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে কুরআন আমার জন্য একাই এক শ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন আমাকে ভ্রান্তির সয়লাবে রক্ষা করে। কুরআন আমাকে এমন কিছু দেয়, যা অন্য কারও পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে কুরআন আমাকে আল্লাহর রহমতের বন্দরে পৌঁছে দেয়। কুরআন আমার কাঁধ থেকে জীবনযুদ্ধের দুর্বহ বোঝার ভার লাঘব করে দেয়।

৮৭. দোয়া

ইয়া আল্লাহ, আমাদের হাদীসে বর্ণিত আহলে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করুন। যারা আপনার পছন্দনীয় পদ্ধতিতে রাতে-দিনে কুরআন তিলাওয়াত-তাদাব্বুর করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মেনে কুরআন চর্চা করেন।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের কুরআনের মাধ্যমে সম্মান দান করুন। আমাদের কুরআন দ্বারা উপকৃত করুন।

ইয়া আল্লাহ, কুরআনের মাধ্যমে আমাদের শরহে সদর (বক্ষকে উন্মুক্ত) করে দিন। কুরআনের মাধ্যমে আমাদের কলবকে হেদায়াত দান করুন। কুরআনের মাধ্যমে আমাদের কলবকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন।

ইয়া আল্লাহ, কুরআনের মাধ্যমে আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিন। কুরআনের মাধ্যমে আমাদের মনমেজায ভালো করে দিন। আমাদের মন-মানসিকতা পরিশুদ্ধ করে দিন। কুরআনের মাধ্যমে আমাদের সুখী-সৌভাগ্যবান করে দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

৮৮. খোলস ছাড়া

যে কুরআনকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে, সে তার জীবনকে কুরআন অনুযায়ীই সাজিয়ে নেবে। তার সারাদিনের রুটিনও হবে কুরআনকে ঘিরে। যে বলে তার হাতে কুরআনের জন্য সময় নেই, সে আসলে আল্লাহর আযাবের মধ্যে আছে। তার ওপর শয়তান চেপে বসেছে। তাকে অলসতার দরিয়ায় ডুবিয়ে রেখেছে। তার কলবকে একটা বদ্ধ ঘেরাটোপে ঢুকিয়ে দিয়েছে শয়তান। নাহলে, কুরআনের উম্মাহর কী করে কুরআনের জন্য সময় হাতে থাকে না? তার হাতে খাবারের সময় থাকে, ঘুমের সময় থাকে, আড্ডার সময় থাকে, শুধু কুরআনের বেলাতেই হাত খালি? স্রেফ শয়তানে পেয়েছে তাকে। শয়তানের চাপানো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

৮৯. কলবে নূর জারি

আল্লাহ আমাকে ভালোবাসলে, আমার যবানে নূর জারি করে দেবেন। কুরআন জারি করে দেবেন। এই নূর যবানকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ আমাকে ভালোবাসলে আমার কলবে নূর জারি করে দেবেন। কুরআন জারি করে দেবেন। আমি বিভিন্ন বস্তুর হাকীকত বুঝতে পারব। আল্লাহ আমাকে ভালোবাসলে আমার কানে কুরআন জারি করে দেবেন। কুরআন আর আল্লাহর পছন্দনীয় কথা ছাড়া কান অন্যকিছু শুনতেই চাইবে না। শোনা পছন্দ করবে না। শুনে স্বস্তি পাবে না। এই নূর আল্লাহর 'ইখতিয়ারী'। আল্লাহ ইচ্ছার অধীন (يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ) আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরে উপনীত করেন (নূর, ৩৫)।

৯০. ভালোবাসার যাকাত

ভালোবাসারও যাকাত আছে। ফুলেরও কাঁটা আছে। ভালোবাসলে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কুরআনের প্রতি আমার ভালোবাসার পরিমাণ অনুযায়ী আমার দিকে পরীক্ষা আসবে। আমাকে কুরআনবিমুখ করার জন্য, নানা বাধা আসতে শুরু

করবে। প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়াবি নানা প্রলোভন হাতছানি দেবে। আমার শানমানের উপযোগী নয় এমন অনেক মুবাহ হালাল বস্তু সহজলভ্য হয়ে আমার হাতে ধরা দিতে আসবে। আমার সততা পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। আমাকে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দৃঢ়তা অবিচলতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আমার সবর-শোকর দেখে আল্লাহই আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবেন।

৯১. আচরণ

কুরআনের সাথে একেক জনের আচরণ একেক রকম। কারও সাথে কুরআনের সম্পর্ক খাবার-পানীয়ের মতো; বরং আরও দৃঢ়তর-শ্বাস প্রশ্বাসের মতো। সার্বক্ষণিক। কারও সাথে কুরআনের সম্পর্ক অবসরের 'নেই কাজ তো খই ভাজ'। কিছু করার নেই? আচ্ছা, একটু কুরআন পড়ে নেয়া যাক। কারও সাথে কুরআনের সম্পর্ক দুর্বহ বোঝার মতো। কুরআন পড়ার কথা মনে হলেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আমি কোন দলে?

৯২. কুরআনের আগমন

কুরআন কি যার-তার কাছে আসে? কুরআন কি যার-তার ঘরে যায়? কুরআন কি যার-তার কাছে ধরা দেয়? কুরআন যে (وَإِنَّهُ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ)। কুরআন এক মর্যাদাপূর্ণ কিতাব (ফুসসিলাত, ৪১)।

৯৩. হৃদয়ে কুরআন

যে হৃদয়ে কুরআন বাস করে, সে হৃদয়কে কি কোনো বালা-মুসীবত দুর্বল করতে পারে? মোটেও না। কুরআনের সাথে সুন্দরভাবে সময় কাটালে, জীবনও সুন্দর হয়ে ওঠে। আগে থেকেই নিজের জীবনপথকে কুরআনি নূরে আলোকিত করে রাখলে, ফিতনার সময় অন্ধকারে থাকতে হয় না।

৯৪. কুরআনময় সলাত

কুরআনের সাথে লেগে থাকলে, সলাত রক্ষা পায়। সলাতের সাথে লেগে থাকলে কুরআন রক্ষা পায়। তবে উভয়ের সাথে সালাফের মতো করে লেগে থাকতে হবে। সালাফের কুরআন ছিল সলাতময়। সালাফের সলাত ছিল কুরআনময়।

৯৫. স্বাধীনচেতা

কুরআনের আয়াত বড় স্বাধীনচেতা। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। অহংকারীর কাছে কুরআনের আয়াত আসে না। কুরআন আসে বিনয়ীর কাছে। যে নিজ থেকে কুরআনের কাছে যায়, কুরআন তার কাছে আসে। যে কুরআনের কাছে আসতে নাক-উঁচু ভাব দেখায়, কুরআনও তাকে এড়িয়ে চলে। কুরআনের জগতে বিনয়ের দাম আছে, অহংকারের কানাকড়ি মূল্যও নেই।

৯৬. আল্লাহর নৈকট্য

ইলম তলব আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইলম তলব অনেক বড় ইবাদত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন জীবন্ত সার্বক্ষণিক তালিবে ইলম। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে ইলম তলবের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يلتمسُ فيه عِلمًا سهَّلَ اللهُ له طريقًا إلى الجنةِ وأنَّ الملائكةَ لَتضعُ أجنحتَها لِطالِبِ العِلمِ وأنَّ العالِمَ لَيستغفِرُ له مَن في السمواتِ ومَن في الأرضِ حتى الحوتُ في الماءِ

ইলম তলবের পথে হাঁটলে, আল্লাহ জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন। ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান-জমীনের সবাই সুপারিশ করতে থাকে। এমনকি পানির মাছও (সহীহ)।

তিলাওয়াতকারী তো আসলে 'তালিবে ইলম'। ইলম তলবকারী। জ্ঞানান্বেষী। সত্যান্বেষী। হেদায়াত-প্রত্যাশী,

فضلُ العالِمِ على العابدِ كفَضلِ القمرِ على سائرِ الكَواكبِ إنَّ العُلماءَ ورثةُ الأنبياءِ إنَّ الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولا دِرهمًا إنَّما ورَّثوا العِلمَ فمن أخذَ بِهِ فقد أخذَ بحظٍّ وافرٍ

আলেম ও (জাহেল) আবেদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আলিমের মর্যাদা আবেদের ওপর এমন, ঠিক যেমন চাঁদের ওপর বাকি সব তারকার মর্যাদা। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ দিরহাম-দীনারের ওয়ারিস করেন না। নবীগণ মূলত ইলমের মীরাস রেখে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে নবীর মীরাসের বিরাট অংশ লাভ করে।

৯৭. কারী

উমার রা.-এর পক্ষ থেকে নাফে বিন হারেস ছিলেন মক্কার গভর্নর। নাফের সাথে খলীফার দেখা হলো উসফান নামক স্থানে। খলীফা জানতে চাইলেন, মক্কায় কাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ? ইবনে আবজাকে। ইবনে আবজা কে? তিনি একজন আজাদকৃত দাস। তুমি একজন আজাদকৃত দাসকে মক্কাবাসীর শাসক নিয়োগ করে এসেছ? তিনি কিতাবুল্লাহর একজন 'কারী'। রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

إنَّ اللهَ يَرفعُ بهذا القرآنِ أقوامًا ويضعُ به آخرين

নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কুরআনের মাধ্যমে এক জাতিকে সম্মানিত করেন, আরেক জাতিকে অসম্মানিত করেন (ইবনে মাজাহ)।

৯৮. সুখের নমুনা

জান্নাতে গিয়ে মুমিনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলবেন (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন

(ফাতির, ৩৪)। জান্নাতে গেলে আমাদের কলবসমূহ সবধরনের হিংসাবিদ্বেষমুক্ত হয়ে যাবে। জান্নাতে আমাদের সমস্ত ভয়ভীতি, দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। জান্নাতে আমাদের সব ধরনের ক্লান্তিশ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও একটি জান্নাত আছে। এই জান্নাতে যথাযথভাবে প্রবেশ করলে পারলে, জান্নাতি সুখের কিঞ্চিৎ নমুনা উপভোগ করা সম্ভব। কুরআন কারীমই দুনিয়ার জান্নাত। আমি যদি শুদ্ধ দিলে শুদ্ধ নিয়তে উপযুক্ত সময়ে, যথাযথ পদ্ধতিতে কুরআনের গভীর প্রবেশ করতে পারি, আমি জান্নাতের সন্ধান পেতে পারি।

৯৯. অন্তরায়

কুরআন তাদাব্বুর ও কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হলো গুনাহ। গুনাহ অন্তরকে তালাবদ্ধ করে দেয় (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ) (মুহাম্মাদ, ২৪)।

১০০. ভুল কেরাত

ইমাম কিসাঈ রহ.। ইলমুল কেরাত, ইলমুন নাহুসহ আরও বহু শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, একদিন ইমামতি করছিলাম। পেছনে খলীফা হারুনুর রশীদ রহ.। সেদিন কী হয়েছিল বলতে পারব না, নামাজের কেরাতে এমন এক ভুল করলাম, একটি ছোট্ট শিশুও এমন ভুল করবে না। আমি (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) এর স্থলে পড়লাম (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعِينَ)। আল্লাহর কসম, আমীরুল মুমিনীন ওলামায়ে কেরামকে কত বেশি সম্মান করতেন, তাদের সাথে কতটা সম্মান বজায় রেখে কথা বলতেন, সেদিন সলাতের পর তার প্রশ্ন দেখে কিছুটা অনুমান করেছি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, আমি ভুল করেছি। কিন্তু তিনি আমি ভুল করেছি, সেটা সরাসরি না বলে, প্রশ্ন করলেন, এটা কোন 'লুগাহ'? মানে এটা কোন কবীলার ভাষারীতি (কোন কেরাত)? আমি বিনয়ের সাথে উত্তর দিলাম,
'আমীরাল মুমিনীন, অনেক সময় অতি দক্ষ ঘোড়াও দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খায়।
তিনি বললেন, জি উত্তরটা বেশ হয়েছে।

১০১. কুরআন আঁকড়ে ধরা

কুরআন আমাদের। আমরা কুরআন আঁকড়ে না ধরলে, আল্লাহ তা'আলা অন্যদের আমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন।

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا أَمْثَٰلَكُم

তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের স্থানে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না (মুহাম্মাদ, ৩৮)।

১০২. জীবন ওয়াকফ

আবু বকর ইবনে আইয়াশ রহ. বর্ণনা করেছেন। আমি ইলমুল কেরাতের ইমাম আসেম রহ.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। সলাতে যেভাবে কেরাত পড়েন, সেভাবে বারবার পড়ছেন,

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ

অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রকৃত মনিবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয় (আন'আম, ৬২)।

সুবহানাল্লাহ! তারা সারাজীবন কুরআনের জন্য ওয়াফক করে দিয়েছে। তাই শেষ সময়েও কুরআন তাদের ছেড়ে যায়নি।

(গায়াতুন নিহায়াহ, ১/৩৪৬)

১০৩. ঈমানের শস্যক্ষেত্র

আমার কলব ঈমানের শস্যক্ষেত্র,

ক. কুরআন কারীম আমার কলবে কী রোপণ করছে? কুরআন হলো মুমিনের বসন্ত। বৃষ্টি যেমন যমীনের বসন্ত। আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। শুকনো বীজ থেকে, খটখটে শুকনো ডাঁটা থেকে, বৃষ্টির ছোঁয়ায় বীজ জন্ম নেয়। দুর্গন্ধময় মাটি, পচা কাদা, থকথকে পুঁতি ময়লা, কিছুই বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঠেকাতে পারে না। সব বাধা দলে ঠনঠনে বীজ থেকে অঙ্কুর লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। আমার কলব যতই ময়লাযুক্ত হোক, কুরআনী বীজ সেখানে সুন্দর কিছু ফলাবেই।

খ. কুরআন আমার কলবে কেমন বীজ রোপণ করছে? একেকটি সূরা অমিত সম্ভাবনাময় বীজ। একেকটি আয়াত অফুরন্ত ফল-ফসলের বীজ। এই বীজ আমার কলবে কিছু উৎপন্ন করছে তো? নাকি আমার কলবের বীজতলা এতটাই ঊষর, কুরআনের মতো বীজও সেখানে দাঁত বসাতে পারছে না?

গ. আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহর লেগে না গেলে, পৃথিবীতে এমন কলব পাওয়া অসম্ভব, যাতে কুরআন কোনো প্রভাব ফেলে না। আমার মধ্যে যেটুকু কুরআন আছে, আমি কি সে অনুযায়ী আমল করছি?

১০৪. কুরআন নাযিল

আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি দাগ কাটা উপদেশটি ছিল আমার পিতার। তিনি বলেছিলেন,

-বেটা, এমনভাবে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবে, যেন কুরআন তোমার ওপরই এখন নাযিল হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন আর তুমি গভীর মনোযোগে শুনে শুনে, বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করছ।-আল্লামা ইকবাল রহ.।

১০৫. প্রিয়তমের ভালোবাসা

প্রিয়তমকে যতটুকু ভালোবাসি, তার কথাও সে পরিমাণে প্রিয় হয়। আল্লাহকে যতটা ভালোবাসি তার কালামও সে পরিমাণে প্রিয় হবে আমার কাছে। কুরআন নিয়ে মেহনতের পরিমাণই বলে দেবে আমি আল্লাহকে কতটা ভালোবাসি!

১০৬. আল্লাহর সাথে ব্যবসা

কুরআন নিয়ে থাকা মানে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় নামা। আল্লাহ তা'আলা এ-ব্যবসায় কত হারে লাভ দেবেন, সেটা বান্দা কল্পনাও করতে পারবে না। এই ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখেরাতেও এর মেয়াদকাল ব্যাপ্ত থাকবে। লাভ আসতে থাকবে দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও।

১০৭. কুরআনের স্বাদ

কুরআন কারীমের স্বাদ পেতে হলে, জীবনটা গুনাহমুক্ত হতে হবে। গুনাহ হলো জংয়ের মতো। কলব আয়নার মতো। গুনাহর প্রভাবে কলবে কালিমা পড়ে যায়। কুরআন জং-ধরা কলবে প্রতিফলিত হয় না।

১০৮. পাথরহৃদয়

তিলাওয়াতের সময় কাঁদা মুস্তাহাব। কান্না না এলে কান্নার ভান করা। অতীতের দুঃখ-শোকের কথা চিন্তা করে কান্না আনার চেষ্টা করা। যদি শোক-দুঃখের কথা কল্পনা করার পরও মনে দুঃখবোধও না আসে, তাহলে এই না আসার জন্যেই আগে কাঁদা দরকার! কারণ, এটা আরও বড় বিপদ! পাথরহৃদয় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে কুরআনে। হাদীসে।

১০৯. সন্দেহের নিরসন

নাগরিক জীবনে যত সমস্যা দেখা দেয়, এর অন্যতম কারণ হলো, কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া। নিয়মিত কুরআনের সাথে লেগে থাকলে যাবতীয় সন্দেহ-দ্বিধা কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। এমনিতেই সুখ নেমে আসবে।

১১০. নূর ও শিফা

একজন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন, কুরআন কারীম হলো বান্দার জন্যে হেদায়াত, নূর ও শিফা?'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বেশির ভাগ মুসলমান শুধু রমযান এলেই কুরআনের কথা স্মরণ করে। অনেকেই তো তাও করে না। যেন বাকি এগারো মাস হেদায়াত নূর ও শিফার প্রয়োজন নেই।

১১১. বড় ওষুধ

পাপী হৃদয়ের জন্যে কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের চেয়ে বড় ওষুধ আর কিছু হতে পারে না।

১১২. কুরআনি ফিকির

হৃদয়কে নাড়া দেয় এমন করে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। সূরা বা পারা শেষ করা যেন কোনোভাবেই উদ্দেশ্য না হয়। এ জন্য কুরআনের রুটিনটা পারাভিত্তিক নয়, সময়ভিত্তিক হলে ভালো। আমি প্রতিদিন এতক্ষণ সময় কুরআন নিয়ে ফিকির করব।

১১৩. মুয়াল্লিমুল কুরআন

এক মুয়াল্লিমুল কুরআনকে প্রশ্ন করা হলো, কপর্দকশূন্য কোনো তালিবে ইলম আপনার কাছে কুরআন শিখতে এলে আপনি কি তাকে তাড়িয়ে দেবেন? ওস্তাদ উত্তর দিলেন, এমন করলে তো আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আমি আযাবের উপযুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে, তাদের আপনি তাড়িয়ে দেবেন না। তাদের হিসাব (-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসমূহ) থেকে কোনোটির দায় আপনার ওপর নয় এবং আপনার হিসাব (-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসমূহ) থেকে কোনোটিরও দায় তাদের ওপর নয়, যে কারণে আপনি তাদের বের করে দেবেন এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন (আন'আম, ৫২)।

১১৪. মুবারক কিতাব

কুরআন মুবারক কিতাব। বরকতময় গ্রন্থ। বরকত মানে পর্যাপ্ত কল্যাণ। সুখ-সমৃদ্ধি। প্রাচুর্য। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ

(এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি (আন'আম, ১৫৫)।

কুরআন কারীম নাযিল হয়েছে বরকতময় মাসে। বরকতময় রাতে। কুরআন কারীম 'মুবারক'। পুরো কুরআনে প্রায় চারবার কুরআনকে 'মুবারক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমকে বরকতময় করেছেন। পবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। সব ধরনের পার্থিব অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। অন্য ধর্মগ্রন্থের মতো বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে কুরআনের মাঝে বরকত নিহিত রেখেছেন। সর্বকালে সর্বত্র আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সাথেই বরকত জড়িয়ে রেখেছেন।

তাযকিয়া নাফস : আত্মশুদ্ধি!

পাথর-দিল

১. আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একটি হলো দৈনন্দিন জীবন। আরেকটি ঈমানি জীবন। আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাব, দৈনন্দিন জীবনের মতো ঈমানি জীবনেও চড়াই-উতরাই আছে। ছন্দ ও পতন আছে। উত্থান ও পতন আছে। আগু ও পিছু আছে।

২. কখনো আমাদের মনে হয়, আমার কলবে ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার কলবটা অত্যন্ত নরম হয়ে গেছে। আল্লাহমুখী হয়ে গেছে। কলবটা নেক-আমলের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। বদ-আমলের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা নাফরত (ঘৃণা) অনুভব করছে।

৩. আবার কখনো মনে হয়, আমার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। নেক আমলের ইচ্ছা শিথিল হয়ে গেছে। বদ-আমলের প্রতি কলব বেশি ঝুঁকে আছে। আল্লাহর হুকুম মানতে কলব গড়িমসি করছে। মসজিদের দিকে পা উঠতে চায়ই না। ভালো কাজের দিকে পা সরতেই চায় না। মনে হয় যেন পায়ে আশিমণি বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছে।

৪. প্রতিটি মুমিনই এমন মিশ্র অনুভূতির সম্মুখীন হয়। সবাই-ই প্রাত্যহিক জীবনে এই দুই অনুভূতির সম্মুখীন হয়। প্রশ্ন হলো, আমাদের কলব কতটা শক্ত হতে পারে? আমাদের ঈমান কতটা শীতল আর জমাটবদ্ধ হতে পারে? কলব শক্ত হয়ে পড়ার সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ পরিমাণ কী? কলবে ঈমানি সজীবতা নির্জীব হয়ে পড়ার মাত্রা কতটুকু?

৫. কলব শক্ত হওয়ার মাত্রা ও ধরন নিয়ে ভাবতে বসলে আমি দেখব, কলব একেক সময় ভয়াবহ রকমের শক্ত হয়ে যায়,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মতো; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। (কেননা) পাথরের মধ্যে কিছু তো এমনও আছে, যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে কিছু এমন আছে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার তার মধ্যে এমন (পাথর)-ও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। (বাকারা, ৭৪)।

৬. কী ভয়ংকর কথা! মানুষের কলবটা কখনো কখনো শুধু পাথরের মতো নয়; বরং পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত কলব হতে পারে? অত্যন্ত বেদনাদায়ক তুলনা। আল্লাহ তা'আলা পাথরকে কিছু মানুষের কলবের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পাথরের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। পাথর কখনো নরম হয়। নিজে বিদীর্ণ হয়ে পানি বেরিয়ে আসার সহজ রাস্তা করে দেয়। কোনো কোনও পাথর আল্লাহর ভয়ে উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়ে।

৭. কাতাদাহ বিন দা'আমাহ সাদূসী (১১৮ হি.) রহ.। তিনি নিজ সময়ে তাফসীরের ইমাম ছিলেন। তিনি পাথর ও কলবের তুলনার ব্যাপারটা গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন,

'পাথর শক্ত হলেও আল্লাহ তা'আলা তার স্বপক্ষে ওযর (যুক্তি) পেশ করেছেন। কিন্তু পাথর-দিলের স্বপক্ষে কিছু বলেননি। (তাবারী, ২/১৩৬)।

৮. প্রশ্ন হতে পারে, কলব পাথর বা তার চেয়েও শক্ত হয়ে গেলে কী ঘটে? শক্ত কলবের পরিণতি কী? কারও কলব শক্ত হয়ে গেলে, তার কি কোনো বিরূপ প্রভাব দেখা যায়?

'কলব শক্ত হয়ে গেলে, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, সেই কলব আল্লাহর সাথে ইত্তেসাল বা যোগাযোগ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সলাতে খুশু-খুযু আনতে পারে না। মুনাজাতে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে পারে না। মুনাজাতে চোখে পানি আনতে পারে না। কুরআন তিলাওয়াতে স্বাদ পায় না।'

৯. বান্দা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, তার কলব পুরোপুরি আল্লাহর প্রতিই সমর্পিত থাকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারা, দুনিয়া-আখেরাতের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য। বান্দার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আর উজ্জ্বলতম সময় হলো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মুহূর্তটা। সবচেয়ে বেশি ঈমানী সময়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু এমন মহার্ঘ ক্ষণেও শক্ত-দিলের মানুষ কোনো মজা পায় না। মনোযোগ পায় না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তি। এ-কারণে, আল্লাহর সাথে গভীরভাবে যুক্ত হতে পারে না। কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে পারে না। ইবাদতগুলো হয় খোলসসর্বস্ব আর ফাঁপা,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(হে নবী,) আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর আমি (তাদের অবাধ্যতার কারণে) তাদের অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুনয়-বিনয় করে। অতঃপর যখন

তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তাকে তাদের কাছে শোভনীয় করে দিলো (আনআম, ৪৩-৪৪)।

১০. কী ভয়ানক কথা! আল্লাহ তা'আলা পাপের কারণ শাস্তি দিয়েছেন। যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহভিমুখী হয়। কিন্তু তারা তাদের কলব শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কাকুতি-মিনতি করতে পারল না। ভেতর থেকে না এলে কীভাবে করবে? এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

১১. রোগ-বালাই, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, দারিদ্র্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহর চান, বান্দা যেন এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে। বান্দা যেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। বান্দা যেন পরিপূর্ণ দাসত্বের চাদরাবৃত হয়। কিন্তু বান্দার সেই সৌভাগ্য হয় না। কারণ তার কলব শক্ত হয়ে আছে। শক্ত কলব যেন তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে দেয় না। আরেকবার পড়ে দেখি না,

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল।

১২. কলব শক্ত হয়ে গেলে, বান্দা ঈমানের স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। শক্ত-দিলের কারণে অপ্রাপ্তির বঞ্চনা কি শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে? জি না, এরচেয়েও ভয়ংকর বিষয় আছে। বান্দার কলব যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর আনুগত্যে শিথিলতা করতে শুরু করে। ইবাদত-বন্দেগীতে পিঠটান দিতে শুরু করে। ঘটনা এখানেই থেমে গেলে কথা ছিল না, পরে একসময়-না-একসময় অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হয়ে ফিরে আসার ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বান্দা শিথিলতা করতে করতে একপর্যায়ে, নিজের শৈথিল্য-আলস্যের স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল খুঁজতে শুরু করে দেয়। দলীল না পেলেও, বিপরীতার্থক আয়াত বা হাদীস নিয়ে হলেও নিজের পছন্দমাফিক তাবীল-ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখে, নিজের সুবিধামাফিক কোনো ছোটখাটো ইমাম বা মুজতাহিদের ভিন্নমত আছে কি না। পেয়ে গেলে তাকে আর পায় কে। এতদিন তার যে আমল শৈথিল্য আর আলস্যের দোষে দুষ্ট, সেটা এখন হয়ে গেল, শরয়ী নস ও মুজতাহিদের সমর্থনপুষ্ট। কেউ তাকে কিছু বলতে গেলেই, সে আয়াত-হাদীসকে ঢাল হিশেবে ব্যবহার করে। ভিন্ন মতাবলম্বী মুজতাহিদের বক্তব্য দিয়ে দলীল দেয়। এটা সুস্পষ্ট বিকৃতি,

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

তাদের অন্তর কঠিন করে দিই। তারা (তাওরাতের) বাণীসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় (মায়িদা, ১৩)।

১৩. কুরআন কারীমে দুই রকমের আয়াত আছে।

ক. আয়াতে মুহকামাহ। এগুলোর অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এগুলোই কুরআন কারীমের মূল।

খ. আয়াতে মুতাশাবিহ। এগুলোর অর্থ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বোঝা যায় না। এসব আয়াত একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

(হে রাসূল,) সে আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার ওপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা, অথচ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তা'আলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান (আলে ইমরান, ৭)।

১৪. আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হেকমতবশত কুরআন কারীমের দুই প্রকার আয়াত স্থান দিয়েছেন। শয়তান আয়াতে মুতাশাবিহ দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার প্রয়াস পায়। সে মানুষকে ক্রমাগত প্ররোচনা দিতে থাকে, বান্দা যেন আয়াতে মুতাশাবিহ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়। সেগুলোর তাবীল-তাফসীর নিয়ে সময় ব্যয় করে। শয়তান নানা ভঙ্গিতে আয়াতে মুতাশাবিহকে বান্দার সামনে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলে। মানুষ দেখে, সে সহজেই মুফাসসির হয়ে যাচ্ছে, সহজেই কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারছে, কিছু মানুষ তার অনুসারীও হচ্ছে। ব্যস, আর কী চাই!

১৫. যাদের কলব ঈমানে পরিপূর্ণ, তারা শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেয় না। তারা সব সময় মুহকাম আয়াতের গণ্ডিতেই থাকে। দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর পেছনে সময় ব্যয় করে না। কিন্তু শক্ত-দিলের অধিকারী যারা, তাদের অবস্থা ভিন্ন। তারা ঘুরেফিরে আয়াতে মুতাশাবিহের কাছেই আসে। তারা নিজের শৈথিল্য আর আলস্যের স্বপক্ষে আয়াতের মুতাশাবিহের মনগড়া তাবীল-তাফসীরকে দাঁড় করায়,

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

তা এ জন্য যে, শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে, আল্লাহ্ তাকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর শক্ত, তাদের জন্য ফিতনায় পরিণত করেন (হাজ্জ, ৫৩)।

১৬. শয়তান মানুষের মনে নানা চিন্তা প্রবিষ্ট করায়। এটা শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, নবীগণের মনেও শয়তান প্রতিবন্ধ ফেলার চেষ্টা করত। আগের আয়াতেই ব্যাপারটা বলা আছে। এই প্রতিবন্ধের কারণেই মানুষ ফিতনায় পড়ে যায়। হক চিনতে ব্যর্থ হয়। আয়াতটা পড়ে দেখতে পারি,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ

مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

(হে নবী,) আপনার পূর্বে যখনই আমি কোনো রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তার ক্ষেত্রেও এ রকমই ঘটেছে যে, তাদের কেউ যখন কোনো আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখন শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় বিপত্তি সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের সৃষ্ট বিপত্তি অপসারণ করে নিজ আয়াতসমূহকে আরও দৃঢ় করতেন।

১৭. সাধারণত মনে করা হয়, গুনাহের কারণে কলব শক্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা চাই, আল্লাহ তা'আলা শাস্তি হিশেবেও অনেক সময় বান্দার কলবকে শক্ত করে দেন,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদের আমার রহমত থেকে বিতাড়িত করি ও তাদের অন্তর কঠিন করে দিই (মায়িদা, ১৩)।

১৮. অনবরত গুনাহ করতে থাকলে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ তাকে আরও বেশি সেই গুনাহে লিপ্ত করে দেন। গুনাহের বদলে গুনাহ। পাপের শাস্তি পাপ। এমনটা বলা হয়েছে কুরআন কারীমে,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ

عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদের তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্খলনে লিপ্ত করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু (আলে ইমরান, ১৫৫)।

১৯. বান্দা বক্রতার পথে হাঁটলে আল্লাহ তা'আলা তার বক্রতা বাড়িয়েই দেবেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না (সাফ্ফ, ৫)।

২০. আমার কলব রোগগ্রস্ত। আমি কলবের রোগকে সারিয়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করছি না। আল্লাহ রোগ আরও বাড়িয়ে দেবেন,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন (বাকারা, ১০)।

২১. আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বক্রতার বদলে বক্রতা বাড়িয়ে দেন। কলবের মরযের শাস্তিস্বরূপ মরয (ব্যাধি) আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাপের শাস্তি আরও দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত করার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। শুধু সাধারণ পরিস্থিতিতে নয়, যখন তারা বিপদগ্রস্ত ছিল, তখনো শাস্তি পেয়েছে। কলব শক্ত হয়ে যাওয়ার পরও যখন বান্দা সতর্ক হয়নি, কলবকে সংশোধন করে নিতে সচেষ্ট হয়নি, তার কলবকে আরও বেশি শক্ত করে দেয়া হয়েছে।

২২. দুই ব্যক্তির কলব শক্ত হয়ে গেল। দুজনের কলব শক্ত হওয়ার ধরন এক? কলবটা কীভাবে শক্ত হয়? কীভাবে একটা কলব ঈমানে পরিপূর্ণ থাকার পরও শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়? সজীব একটা বস্তু ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে যায়, কেমন গা-শিউরানো ব্যাপার। কলকলে টলটলে দিঘি শুকিয়ে গেলে বিস্ময় জাগে না? কলবের শুকিয়ো যাওয়া তো আরও বেশি বিস্ময়কর!

২৩. উপর্যুপরি পাপের কারণে কলব শক্ত হয়ে আসে। এ-ছাড়া আর কোনো কারণ কি হতে পারে? জি, কলব শক্ত হয়ে যাওয়ার আরও বড় একটি কারণও আছে। আল্লাহর যিকির থেকে দূরে সরে যাওয়া। হাঁ, আল্লাহকে ভুলে গেলে, আল্লাহও আমাকে ভুলে যান। আল্লাহর যিকির না করতে করতে একসময় কলব শক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর যিকিরই কলবকে আলোকিত রাখে। সজীব রাখে। সতেজ রাখে। আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকলে যে কলব শক্ত হয়ে যায়, ব্যাপারটি এক আয়াতে উঠে এসেছে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মতো হবে না, যাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর যখন তাদের ওপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য (হাদীদ, ১৬)।

২৪. দীর্ঘসময় ধরে আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে থাকার কারণে, তাদের কলব শক্ত হয়ে গিয়েছে। কুরআন কারীম পূর্বেকার কওমের এই ঘটনা কি নিছক গল্প বলার জন্য উল্লেখ করেছে? জি না, আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঘটনাটি বলা হয়েছে। আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকলে যে কলব শক্ত হয়ে যায়, আরও একটি আয়াতে আছে,

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাণদের জন্য, যারা আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ (যুমার, ২২)।

২৫. আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজালে ভাবটা এমন দাঁড়ায়,

১. কিছু কলব পাথরের চেয়েও শক্ত (বাকারা, ৭৪)।

২. কলব শক্ত হয়, পাপীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা শাস্তির কারণে (মায়িদা, ১৩)।

৩. কলব শক্ত হয়ে গেলে, বান্দা আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে পারে না (আন'আম, ৪৩)।

৪. কলব শক্ত হয়ে গেলে, সহজেই শয়তানের ফিতনায় পতিত হয়ে যায় (হাজ্জ, ৫৩)।

৫. আল্লাহর যিকির থেকে দূর সরে থাকলে, কলব শক্ত হয়ে যায় (যুমার, ২২)।

২৬. গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি, কলব শক্ত হয়ে যাওয়া যা-তা ব্যাপার নয়। কুরআন কারীম সাধারণ তুচ্ছ নগণ্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। কুরআন আমাদের কলব শক্ত হওয়ার ধরন কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে রেখেছে। যাদের কলব শক্ত হয়ে গেছে, তাদের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেছে। আমরা কীভাবে কলব শক্ত হওয়ার বিষয়টাকে হেলাফেলা করতে পারি? গুরুত্বহীন বিষয়ের মতো ভুলে থাকতে পারি?

২৭. আমার মধ্যে যদি কলব শক্ত হওয়ার আলামতগুলো থাকে, আমার কি উচিত নয়, আজই এখনই সতর্ক হয়ে যাওয়া? আমি আজ, এই মুহূর্তে মারা গেলে, আমার কী পরিণতি হবে? আল্লাহর হুমকিটা আরেকবার দেখি না,

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাণদের জন্য, যারা আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ।

২৮. আমার অবশ্যকর্তব্য, এখনই শক্ত কলবের চিকিৎসা করানো। আমি কীভাবে এই আযাব আর গযব থেকে মুক্তি পাব? রাব্বে কারীম সেই সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। খুবই সহজ সমাধান। কুরআন তিলাওয়াতই সেই অব্যর্থ সমাধান,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী—এমন এক কিতাব—যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসামঞ্জস্য, (যার বক্তব্যসমূহ) পুনরাবৃত্তিকৃত, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এর দ্বারা তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে (যুমার, ২৩)।

২৯. কান্না কখন আসে? কলব যখন নরম হয়। কলব কখন নরম হয়? আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করলে। নবীগণ কীভাবে আল্লাহর কালাম শুনে কাঁদতেন, তার একটা চিত্র কুরআন কারীমে আঁকা আছে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

আদমের বংশধরদের মধ্যে এরাই সেই সকল নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। এদের কতিপয় সেই-সব লোকের বংশধর, যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম এবং কতিপয় ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়া'কূব)-এর বংশধর। আমি যাদের হেদায়াত দিয়েছিলাম ও (আমার দীনের জন্য) মনোনীত করেছিলাম, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হতো, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত (মারয়াম, ৫৮)।

এটি সাজদার আয়াত।

৩০. কলবকে নরম করতে, আসলেই আল্লাহর কালামের কোনো বিকল্প নেই। শুধু নবীগণই নন, আগের যুগের নেককারগণও আল্লাহর কালাম শুনে কাঁদতেন,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ

এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন দেখবেন তাদের চোখসমূহকে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, যেহেতু তারা সত্য চিনে ফেলেছে (মায়িদা, ৮৩)।

৩১. কলব শক্ত হয়ে যাওয়া যত কঠিন শাস্তি, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা ততটাই সহজ। কুরআন কারীম আমাদের সবার হাতের নাগালে। হাত বাড়িয়ে নিলেই হলো। নবীগণ আল্লাহর কালামের প্রভাবে কেঁদেছেন। আগের যুগের নেককারগণ কেঁদেছেন। আমি কেন কাঁদব না? আল্লাহর কালামের প্রভাবে আমার শক্ত কলবও নরম হয়ে যাবে। আমার দু-চোখ বেয়ে নামবে শুকরিয়ার অশ্রুধারা। আনুগত্যের ফল্গুধারা। ইনশাআল্লাহ।

হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

দারফুরে এসেছেন। ইউনেস্কোর শিশু-বিষয়ক কর্মসূচিতে। রাজধানি জুবার কাজ সেরে খার্তুমে এলেন। এখানকার কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিয়ে দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাজ করবেন। এপারে মুসলিম রিফিউজি ক্যাম্প ওপারে খ্রিষ্টান। মুসলিম এলাকায় কাজ করতে গিয়ে একটা বিষয় লক্ষ করলেন, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা অদ্ভুত উপায়ে চিকিৎসা নেয়। এখানে কোনো ডাক্তার নেই। ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে সব রোগের চিকিৎসা করা হয়। ঝাড়ফুঁকের জন্যে আলাদা মেডিকেল সেন্টারও আছে। লোকজন লাইন ধরে চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছে। কাদেরিয়া তরীকার সাধকরা এসব মেডিকেল সেন্টার পরিচালনা করেন। সবার হাতে পানির বোতল। সাধকের কাছে গেলে তিনি রোগ জেনে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিছু একটা বিড়বিড় করে পড়ে রোগির শরীরে ফুঁক দিচ্ছেন সাথে পানিতেও। মেডিকেল সেন্টারগুলোর নামটাও বেশ আকর্ষণীয়,

'হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট'

মানুষগুলোকে দেখে খুবই সুখী মনে হয়। এত অভাব সত্ত্বেও হাশিখুশি থাকে কীভাবে। জাতিসংঘ কর্মকর্তা অফিসের কাজ সেরে এক মেডিকেল সেন্টারে গেলেন। এক বৃদ্ধ লোক বসে আছেন। হাতে বিরাট এক তাসবীহ। চোখবুজে কী যেন পড়ছেন। আগন্তুকের পদশব্দে চোখ খুললেন। বিদেশি দেখে নড়েচড়ে বসলেন। সাদরে বসতে দিলেন। কুশল বিনিময়ের পর আগমনের হেতু জানতে চাইলেন,

'আমি আপনাদের 'হার্ট ফাউন্ডেশন' সম্পর্কে জানতে এসেছি।'

'কী জানতে চান?'

'এখানে আপনারা কী করেন?'

'আমরা রোগের চিকিৎসা করি।'

'কোনো যন্ত্রপাতি-ওষুধপত্তর ছাড়া?'

'আমরা গরিব। এই মরু অঞ্চলে ডাক্তার আসতে চায় না। আসলেও থাকতে চায় না। অসহায় মানুষগুলো রোগে মারা যায়। এহেন অবস্থা দেখে, আমাদের

কাদেরিয়া তরীকার খানকাগুলো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, মানুষকে যতটা সম্ভব ভালো চিকিৎসা দিতে হবে। পাশাপাশি 'শরয়ী রুকইয়া' করা হবে।

'শরয়ী রুকইয়া কী?'

'আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও নবীজির হাদীস থেকে সংগ্রহ করা কিছু দু'আ পড়ে রোগীকে ফুঁক দেয়া। এভাবে শত শত বছর ধরে আমরা মানুষের সেবা করে আসছি। আমাদের প্রথম পীর ছিলেন শায়খ ইদরীস বিন আরবাব রহ.। তার জন্ম ৯১৩ হিজরীতে। ১০৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ১৪৭ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। এখন চলছে ১৪৫৩ হিজরী।

'তাই, অনেক প্রাচীন পদ্ধতি দেখছি। আপনারা কোন কোন রোগের চিকিৎসা করেন?'

'সব রোগের।'

'মানুষ সুস্থ হয়?'

'বেশির ভাগই হয়। তবে আমাদের এই চিকিৎসাটা মূলত জাদুটোনা বদনজর জিনের ক্ষেত্রে কাজ করে। আমরা সব ধরনের রোগীকেই রুকইয়া করি, কারণ এটা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। আপনারা আসার পর আমরা কিছুটা আধুনিক চিকিৎসা পাচ্ছি। আপনারা চলে গেলে সেই আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

'আমার চিকিৎসা করতে পারবেন?'

'রোগ বলুন।'

'আমার শরীরে কোনো রোগ নেই। আমি পুরোপুরি সুস্থসবল। ফিট না হলে আমি এখানে নিয়োগ পেতাম না।'

'তাহলে কিসের চিকিৎসা করাবেন?'

'আমার রোগটা মনে। মানে হার্টে। আমার সব সময় মন খারাপ থাকে। মন ভালো করার জন্যেই এই সেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িয়েছি।'

'কাছে আসুন।'

বৃদ্ধ অনেক সময় লাগিয়ে হাতের শিরা দেখলেন, চোখের মণি দেখলেন, জিহ্বা দেখলেন। বুকে কান লাগিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলেন। একটু চোখ বুজে থেকে বললেন,

'আপনার হার্টবিট স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি দ্রুত হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই। আপনার রোগের চিকিৎসা আমাদের কাছে আছে। বলা ভালো, এ-ধরনের রোগই

আমরা মূলত সারিয়ে তুলতে পারি। বাকি রোগগুলোর চিকিৎসা আমরা না পারতে বাধ্য হয়ে করি। মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। তারাও বিনে পয়সার চিকিৎসা সেবা নিয়ে তুষ্ট থাকে।

'রুকইয়া' পদ্ধতির চিকিৎসায় আমরা 'কলবকে' কয়েক ভাগে বিভক্ত করি,

১. উন্মুক্ত হৃদয় (قلب مشروح)।

২. যখমী হৃদয় (قلب مجروح)।

৩. যবেহকৃত হৃদয় (قلب مذبوح)।

৪. বিভক্ত হৃদয় (قلب رحيق)।

৫. বিচূর্ণ হৃদয় (قلب سحيق)।

৬. দগ্ধ হৃদয় (قلب حريق)।

৭. ডুবন্ত হৃদয় (قلب غريق)।

৮. পরিতুষ্ট হৃদয় (قلب منقوع)।

৯. আঘাতপ্রাপ্ত হৃদয় (قلب مفجوع)।

১০. সুস্থ হৃদয় (قلب سليم)।

১১. রোগাক্রান্ত হৃদয় (قلب عليل)।

১২. ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয় (قلب سقيم)।

১৩. উচ্ছল হৃদয় (قلب فياض)।

১৪. উদ্দীপ্ত হৃদয় (قلب جياش)।

১৫. ধোঁকাগ্রস্ত হৃদয় (قلب مغرور)।

১৬. হাসিখুশি হৃদয় (قلب مسرور)।

'য়েসাস ক্রাইস্ট! থামুন থামুন, এত এত হৃদয়ের নাম শুনে আমার মাথা ঘুরছে। এসেছি একটা হৃদ্‌রোগ নিয়ে, এখন না জানি আরও কয়টা রোগ বের হয়। দয়া করে বর্তমান রোগের চিকিৎসা করে দিন।'

তার কথা শুনে বৃদ্ধ হেসে দিলেন। অভয় দিয়ে বললেন,

'আপনি সঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। হৃদয়ের যত প্রকারই বের হোক, এক চিকিৎসায় সব সেরে যাবে। মূল চিকিৎসার আগে আপনাকে কিছু 'পথ্য' বাতলাব। সেগুলো মানতে পারলে অর্ধেক বা পুরো রোগই সেরে যাবে। আপনার কাছে নোটবুক আছে?

'জি না নেই। কিছু লিখতে হলে বলুন, আমি মোবাইলে লিখে নিচ্ছি। ভয়েস রেকর্ডও চালু রেখেছি।'

'তাহলে শুনুন, আমাদের খানকার সবকগুলো আপনাকে শুনিয়ে দিই। এগুলো আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও উপদেশগুলো আছে। রোগ সারাইয়ের জন্যে কথাগুলো মান্য করা অবশ্যক।'

১. রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টন করাই আছে। রিযিকের জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।

২. আপনার কী হবে না হবে, সবই তাকদীরে লেখা আছে। অস্থির হয়ে পড়বেন না।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ এলে, আপনার আপনজন বন্ধুবান্ধব ঠেকাতে পারবে না। তাদের আশায় বসে থাকবেন না।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এলে, বিশ্বের সেরা শক্তিমানও রোধ করতে পারবে না।

৫. কলবকে তিনটা বস্তু থেকে মুক্ত করে ফেলবেন : হিংসা, বিদ্বেষ, লোক-দেখানো মনোভাব।

৬. কলবকে তিনটা গুণে গুণান্বিত করবেন : সত্যবাদিতা, স্রষ্টার প্রতি নিষ্ঠা, প্রভুর ভয়।

৭. মনে তিনটা বিষয় ধরে রাখবেন,

ক. প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ।

খ. আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আস্থা।

গ. সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

'আমি তো খ্রিষ্টান। মুহাম্মাদকে কীভাবে ভালোবাসব?'

'ও আচ্ছা। উমম, মুহাম্মাদকে একজন ভালো মানুষ হিশেবে মেনে নিলে কোনো সমস্যা আছে?'

'জি না নেই।'

'আপাতত তাতেই চলবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একজন ভালো মানুষ মনে করেই ভালোবাসবেন।'

৮. অন্যের দোষত্রুটি না খুঁজে, আত্মসংশোধনে ব্রতী হোন। মানুষের দোষের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন।

৯. তিনটি বিষয় সাথে রাখতে হবে :

ক. সদা প্রভুর স্মরণ।

খ. ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু শরীর।

গ. চিন্তাশীল অন্তর্ভেদী সত্যসন্ধানী মেধা।

১০. তিনটি বিষয়কে যমের মতো ভয় করে চলবেন,

ক. অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অহেতুক আলোচনা। এমন আলোচনা নিজের মানসিক দৈন্যকে ফুটিয়ে তোলে।

খ. অন্যের ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা।

গ. যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, ভালো কিছু নেই, তার সাথে ওঠাবসা করা।

'এগুলো মেনে চলতে পারলে, সব রোগই ভালো হয়ে যাবে। এগুলোই আপনার পথ্য। ওষুধের সাথে পথ্যও গ্রহণ করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে শেফা এসে যাবে। ইন শা আল্লাহ।

'ঠিক আছে, এবার ওষুধ দিন।'

'কাছে আসুন।'

বৃদ্ধ জোরে জোরে সাতবার সূরা ফাতিহা আর সর্বশেষ তিনটা সূরা পড়ে ফুঁক দিয়ে দিলেন। সাথে বলে দিলেন,

'আপনার কেন এই রোগ হয়েছে সেটা তো আপনি জানতে চাইলেন না?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! দয়া করে কারণটা বলুন।'

'এই রোগ অনেক কারণে হতে পারে।'

'না না, আগের মতো আবার লম্বা ফিরিস্তি দিতে শুরু করবেন না। দয়া করে প্রধান কারণটা বলে দিন, দেখি সেটা দূর করতে পারি কি না।'

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয়, আপনি বেশি বেশি গান শোনেন। আপনার কানে সারাক্ষণ হেডফোন লাগানো দেখি।'

'জি, আমি প্রায় সব সময় গান শুনি। মন ভালো রাখতে।'

'মন ভালো হয়েছে?'

'কই ভালো হলো।'

'গান শুনলে কখনো কখনো সাময়িক আরাম মেলে হয়তো, কিন্তু তা মনের মধ্যে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করে দেয়।'

'আপনার মতো যারা আছেন, তাদেরও তো দেখি নেচেকুঁদে গান গাইছেন?'

'ও সামাসংগীত? আমাদের সবাই কিন্তু ঢোলতবলা বাজিয়ে, নেচেকুঁদে গান গায় না। আমাদের এখানে এসব দেখেছেন? আমরা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ মানার চেষ্টা করি। কুরআন সুন্নাহ ও ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্যের বাইরে আমরা পারতপক্ষে যাই না। এভাবে নর্তনকুর্দন করে গান গাওয়া ও শোনা বেদাত।

মারাত্মক গুনাহ। তারা গান কেন গায় জানেন? তারাও আপনার মতো শান্তি খোঁজে। কিন্তু শান্তির খোঁজ তারাও পায় না। উল্টো সুরের নেশায় মজে যায়।'

'গান শুনলে মন কেন খারাপ হয়?'

'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তি। আমাদের কুরআনের আয়াত শুনবেন?'

'জি শুনব।'

'শুনুন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্যে খরিদ করে এমন-সব কথা, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্যে আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি (লুকমান, ৬)।

এই আয়াতে লাঞ্ছনাকর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তিটা শুধু পরকালেই নয়, ইহকাল থেকেই শুরু হবে। মন বিষণ্ণ হয়ে থাকা সেই আযাবেরই একটা অংশ।'

'আপনি কী পড়ে আমার বুকে ফুঁক দিয়েছেন? বড় শান্তি শান্তি লাগছে!'

'সূরা ফাতিহা পড়েছি। কুরআন কারীমের প্রথম সূরা। এটা যিকির। মানে আল্লাহর স্মরণ। যিকির করলে, মন যতই অস্থির হোক, প্রশান্ত হয়ে যায়। কুরআনে আছে,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

স্মরণ রেখো, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় (রা'দ, ২৮)।

আপনি কয়েকদিন গান শোনা বন্ধ রাখুন। নিয়মিত আমাদের (مركز تصليح وعلاج القلوب) মেডিকেল সেন্টারে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ পুরোপুরি সেরে যাবে।

মুস্তাগফির

১. আফ্রিকার জঙ্গলে প্রতিভোরে একটি হরিণ ঘুম থেকে জেগে উঠলেই চট করে তার মনে পড়ে যায়, তাকে এক্ষুনি দৌড় শুরু করতে হবে। নইলে ঘুমভাঙা ক্ষুধার্ত সিংহ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জীবন বাঁচাতে হলে তাকে যেকোনো মূল্যে সিংহের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে।

২. প্রতিভোরে ঘুম ভাঙলেই সিংহের মনে পড়ে, তাকে এক্ষুনি প্রাণপণে দৌড় শুরু করতে হবে। নইলে দুষ্টু হরিণগুলো নাগালের বাইরে চলে যাবে। জীবনবাজি রেখে হলেও হরিণকে দৌড়ে হারাতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

৩. আমি তো হরিণ নই। নই সিংহও। থাকিও-না আফ্রিকার জঙ্গলে। আমার কী করণীয়? আমি হরিণ বা সিংহ না হলেও, আমাকে ঘুম ভাঙলে দৌড় শুরু করতে হয়। নইলে আমিও যে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ব!

৪. আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবনকে সৃষ্টির পর তাকে তার জীবনচলার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন,

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

এবং যিনি সবকিছুকে এক বিশেষ পরিমিতি দিয়েছেন, তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন (আ'লা, ৩)।

৫. তিনি হরিণকে শিক্ষা দিয়েছেন, প্রতিভোরে দৌড়াতে হবে। সিংহকেও তা-ই দিয়েছেন। আমাকেও প্রতিভোরে কিছু কাজ দিয়েছেন। প্রতিভোরে আমার দৌড়টা কেমন হবে? আমার দৌড়টা শারীরিক হবে না। হবে মানসিক। আমি দৌড়ুব ফজরের জন্য। তাহাজ্জুদের জন্য।

৬. দৌড়াতে দৌড়াতেই আমাকে একটি কাজ দিয়েছেন। আমি মুত্তাকীর তালিকায় নাম ওঠাতে চাইলে আমাকে হতে হবে,

الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

সাহরীর সময় ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-কারী (আলে ইমরান, ১৭)।

৭. হরিণ ভোরে উঠে রব্বের শিক্ষামাফিক দৌড়ায়। সিংহও তাকে দেয়া শিক্ষার সদ্ব্যবহার করে। আমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম বান্দা হয়েও কেন হব না,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তেগফার করত (যারিয়াত, ১৮)।

৮. আমি কি সকালবেলার পাখি? আমি কি প্রতিভোরের মুস্তাগফির (ইস্তেগফারকারী)? আমি হরিণ-সিংহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?

'তাসবীহ', ছায়ানিবিড় প্রশান্তি

১. বয়েসের সাথে যিকিরের একটা অদৃশ্য সম্পর্ক আছে। ছোটবেলার যিকির আর বড়বেলার যিকিরে গুণগত মানে পার্থক্য হয়ে যায়। একজন বালকের বা যুবকের যিকির আর একজন বৃদ্ধের যিকিরে তফাত আছে। একজন বৃদ্ধ যতটা মনোযোগ আর আন্তরিকতা দিয়ে যিকির-তাসবীহ পাঠ করেন, সাধারণত যুবকের যিকিরে ততটা দরদ-মহব্বত থাকে না।

২. খেয়াল করলে দেখতে পাব, পরিণত বয়েসি কেউ যখন যিকির করেন, বা তাসবীহ পাঠ করেন, তার চেহারায় অপূর্ব এক দ্যুতি ও পরিতৃপ্তি খেলা করতে থাক। তার যিকিরের আওয়াজ যাদের কানে যায়, তাদের মধ্যেও অন্যরকম এক সুখী সুখী উপলব্ধি ছড়িয়ে যায়। কেমন এক প্রশান্তিময় অনুভূতিতে ভেতরটা শীতল হয়ে ওঠে।

৩. মৌখিক উচ্চারণের সাথে হৃদয়ের বিশ্বাসের গভীর সংযোগ আছে। বয়স্ক কেউ যিকির করলে, তার যিকিরের সাথে কলবের দৃঢ়বিশ্বাসও যুক্ত থাকে। অল্পবয়েসিদের যিকিরেও কলবের সংযোগ থাকে, তবে বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় কম থাকে সাধারণত।

৪. একজন জ্ঞানী ঈমানদার বৃদ্ধের 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার' আর একজন যুবকের 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার'-এর কেমন পার্থক্য, সেটা আশেপাশে তাকালেই বুঝতে পারব।

৫. শেষ-রাতে কোনো জ্ঞানী বৃদ্ধের জিকিরের গুঞ্জরণ শোনার তাওফীক হয়েছিল? তিনি যখন গভীর রাতের নিঝুম ক্ষণে গুণগুণ করে তিলাওয়াত করেন, তাসবীহ পাঠ করেন, আল্লাহর যিকির করেন, চারপাশটা কেমন যেন আরও নীরব হয়ে যায়। সবকিছু যেন উৎকর্ণ হয়ে যিকির শোনে।

৬. এমন চিত্রের সাথে কি পরিচয় আছে? আমি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি। সুবহে সাদিক হয়েছে। আশেপাশের একটি দুটি মসজিদের মিনার থেকে ফজরের সমুধুর আযান ভেসে আসতে শুরু করেছে। আযান শেষ। এবার মুসল্লিদের মসজিদমুখী হওয়ার পালা। বাড়িটা রাস্তার পাশে। একটু পর, মহল্লার বৃদ্ধ মানুষটি যিকির করতে করতে মসজিদে যাচ্ছেন। আমি শুয়ে শুয়ে তার যিকিরের আওয়াজ শুনছি। নীরব চরাচরে যিকিরের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো ধ্বনি নেই। এমনটা হয়েছিল কখনো?

৭. নিয়মিত যিকির করেন, এমন কোনো বৃদ্ধকে যখন সামনা-সামনি পাই, গভীর দৃষ্টিতে তাদের চোখ বোলাই। তাদের মুখাবয়বে সব সময় এক গভীর পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে থাকতে দেখি। শুধু কি বৃদ্ধ? যেকোনো যিকিরকারীর মধ্যেই বৈশিষ্ট্যটা থাকে। বৃদ্ধদের কথা আলাদা করে বলার কারণ, তারাই অন্যদের তুলনায় বেশি যিকির করেন।

৮. তাসবীহ-যিকিরের সাথে আত্মিক পরিতৃপ্তির এক গভীর সম্পর্ক আছে। বিষয়টা আগে তেমন পরিষ্কারভাবে জানা ছিল না। শুধু যিকিরকারী সুখী বৃদ্ধদের দেখে মনে মনে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, যিকির করলে, মন সুখী হয়। কিন্তু একটা আয়াত পড়ে চমকে উঠলাম,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাকুন এবং রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান (তোয়াহা, ১৩০)।

৯. তবে যিকিরটা হঠাৎ হঠাৎ করলে হবে না। দিনরাত যিকিরে বুঁদ হয়ে লেগে থাকতে হবে। তাহলেই সুখীমনের অধিকারী হওয়া যাবে। আয়াতে বলতে গেলে একটা মুহূর্তও বাদ যায়নি. সূর্যোদয়ের আগে, সূর্যাস্তের পরে, গভীর রাতে, দিনের শুরুতে, দিনের শেষে যিকির করতে বলা হয়েছে। তাসবীহ পড়তে বলা হয়েছে। তাহলে সন্তুষ্টি মিলবে.

১০. এ জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত সময়গুলোতে শ্রেষ্ঠতম তাসবীহ 'সলাত' ফরয করে দিয়েছেন। আয়াতে (لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ) সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টা শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সন্তুষ্টি আখেরাতেও থাকবে। দুনিয়ার তাসবীহের সুফল আমি দুনিয়া তো বটেই, আখেরাতেও ভোগ করতে পারব।

১১. একজনের সাথে আয়াতটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। যিকির-তাসবীহের সাথে মানসিক প্রশান্তির বিষয়টা বললাম। তিনি আরেকটা আয়াতের সন্ধান দিলেন। সেটাতেও প্রসঙ্গটা উঠে এসেছে,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

নিশ্চয়ই আমি জানি তারা যেসব কথা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। (তার প্রতিকার এই যে,) আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন (হিজর, ৯৭-৯৮)।

১২. মন খারাপ? নানা দুশ্চিন্তা এসে মনের ডালে বাসা বেঁধেছে? সারাক্ষণ মনটা ভার ভার হয়ে থাকে? নানামুখী মানসিক চাপে জর্জরিত? কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অব্যর্থ সমাধান দিয়েছেন। ব্যবস্থাপত্রটা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। তাসবীহ পাঠ আর যিকিরই হবে সমস্ত দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের সংহারক।

১৩. কত সেকেন্ড, কত মিনিট, কত ঘণ্টা, কত সপ্তাহ, কত মাস চলে গেছে! আমি শুধু শুধু চিন্তা করে নষ্ট করেছি। অহেতুক কুচিন্তায় মনকে অস্থির করে রেখেছি। অথচ তাসবীহ-যিকির করলে, নিমেষেই সেসব উবে যেত। আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়ার জীবনকে পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন। আমি কি নেক আমল করি

নাকি বদ-আমল করে জীবন কাটাই সেটা যাচাই করতে চেয়েছেন। আমি কেন এত মূল্যবান একটা উপহারকে হেলায়-ফেলায় দুশ্চিন্তায় নষ্ট করে ফেলব। পরীক্ষার হলে এক মিনিট সময় চলে গেলে সেটা আর ফিরে পাওয়ার সুযোগ থাকে?

১৪. যিকির-তাসবীহের কথা শুনলে মনে হয়, এই আমল শুধু মানুষই করে, মানবসমাজের বাইরে আর কেউ যিকির করে না। এটা ভুল ধারণা। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর যিকির করে। তাঁর তাসবীহ জপে।

ক. বজ্রধ্বনি তাসবীহ পাঠ করে,

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে (রা'দ, ১৩)।

খ. পাহাড় ও পাখি তাসবীহ পাঠ করে,

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

আমি পর্বতসমূহকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাতে তারা পাখিদের সাথে নিয়ে তাসবীহ-রত থাকে (আম্বিয়া, ৭৯)।

গ. সাত আসমান ও যমীন তাসবীহ পাঠ করে। এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবই তাসবীহ পাঠ করে, তবে আমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝি না, এই যা।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

সাত আসমান ও যমীন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না (বনী ইসরাঈল, ৪৪)।

ঘ. কায়েনাতের প্রতিটি বস্তু তাসবীহ পাঠ করে। তাদের তাসবীহ পাঠের আলাদা ধরন আছে। স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

আপনি কি দেখেননি আসমান ও যমীনে যা-কিছু আছে, তারা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে এবং পাখিরাও, যারা পাখা বিস্তার করে উড়ছে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ নামায ও তাসবীহের পদ্ধতি জানা আছে (নূর, ৪১)।

১৫. কারও কারও কাছে অবাক লাগে, এ কী করে সম্ভব? একটা জড়পাথর, সেটাও তাসবীহ পাঠ করে? মনে হয় কুরআন কারীমে ভিন্ন কিছু বোঝানো হয়েছে বা তাসবীহের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এভাবে বলা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। এমন চিন্তা ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেয়া যাবে না। ঈমান চলে যাবে। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, বাস্তবেই জড়পদার্থও যিকির করে। তাসবীহ পাঠ করে। পাথরকে জড়পদার্থ কে বলেছে? বিজ্ঞানীরা। আমি কুরআন কারীমকে পাশ কাটিয়ে বিজ্ঞানীদের কথাকে ধ্রুবক ধরে নিচ্ছি? হাদীসেই এর নযীর আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

ولقد كنا نسمَعُ تسبيحَ الطعامِ وهو يؤكَلُ

আমরা খাওয়ার সময় খাবারের তাসবীহ শুনতে পেতাম (বুখারি, ৩৫৭৯)।

১৬. সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ সময়ে জড়পদার্থের তাসবীহ শুনেছেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ বলেই দিয়েছেন (وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো কারণে, জড়পদার্থকে মানুষের মতো যবান দিয়ে দেন, তখন মানুষ তাদের কথা শুনতে পারে। দাউদ আ. সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

হে পাহাড়-পর্বত, তোমরাও দাউদের সঙ্গে আমার তাসবীহ পড়ো এবং হে পাখিরা তোমরাও (সাবা, ১০)।

১৭. সূরা সোয়াদেও দাউদ আ.-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ

আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছিলাম, যাতে তারা তার (দাউদের) সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ও সূর্যোদয়কালে তাসবীহ পাঠ করে। এবং পাখিদেরও, যাদের একত্র করে নেওয়া হতো। তারা তার সঙ্গে মিলে আল্লাহর (অভিমুখী হয়ে) যিকিরে লিপ্ত থাকত (১৮-১৯)।

১৮. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে নুড়ি পাথরও তাসবীহ পাঠ করেছিল। আবুদ দারদা ও সালমান ফারেসী রা.-ও রান্নার হাঁড়ির তাসবীহ পাঠ শুনেছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ বলেছেন,

إنِّي لأعرفُ حجرًا بمكَّةَ كان يسلِّمُ عليَّ قبل أنْ أُبعثَ . إنِّي لأعرفُهُ الآنَ

আমি মক্কার একটি পাথরকে এখনো চিনি, সেটা আমাকে নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে সালাম দিত (মুসলিম, ২২৭৭)।

১৯. কুরআন কারীমের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে একজন মুমিন কিছুতেই তাসবীহ পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারে না। পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে যেখানেই মুমিন থাকবে, তার মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাবে, আমি যে পাটিতে বসেছি, সেটা তাসবীহ পাঠ করছে। আমি যে আসনে বসেছি, সেটা তাসবীহ পাঠ করছে। আমি যে গাছ দেখতে পাচ্ছি, সেটা তাসবীহ পাঠ করছে। আমি যে পাখি দেখছি, সেটা তাসবীহ পাঠ করছে। আমি কেন বসে থাকব? আমি কী করে চুপচাপ বসে থাকতে পারি?

২০. সূরা ইসরা, হাদীদ, হাশর, সফফ, জুমু'আ, তাগাবুন, আ'লা। এই সাত সূরা শুরু হয়েছে তাসবীহ দিয়ে। ইসলামের সবচেয়ে বড় কর্মগত ইবাদতও মূলত তাসবীহ। রুকুতে গিয়ে আমরা বলি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম'। সিজদায় তাসবীহে পড়ি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'।

২১. নবীগণও বেশি বেশি তাসবীহ পড়তেন। এটা তাদের নবুওয়াতি ওযীফা ছিল। মুসা আ.-এর দু'আটা খেয়াল করলেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। তিনি আল্লাহর কাছে সাতটি বিষয় প্রার্থনা করেছেন,

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ খুলে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে। আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করে দিন এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন (তোয়াহা, ২৫-৩২)।

২২. এতগুলো চাওয়া পেশ করেছেন। কেন? দুটি কাজের জন্য,

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا

যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ করতে পারি এবং বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি (তোয়াহা, ৩৩-৩৪)।

২৩. ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাগরের তলদেশে আছেন। মাছের পেটে। বাঁচার আপাত কোনো আশা নেই। তখন ইউনুস আ. কী করলেন? তাসবীহ পাঠ করলেন,

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আর মাছ-সম্পর্কিত (নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম)-কে দেখুন, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ,) আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী (আম্বিয়া, ৮৭)।

২৪. ইউনুস আ. যদি তাসবীহ পাঠ না করতেন, তাহলে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেতেন না। তাসবীহ পাঠের কারণেই আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে মৃতদের পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে সেই মাছের পেটে থাকত (সাফফাত, ১৪৪)।

২৫. ফেরেশতাগণও ক্লান্তিহীনভাবে তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন,

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহতে লিপ্ত থাকে, কখনো অবসন্ন হয় না (আম্বিয়া, ২০)।

২৬. আল্লাহর আরশের চারপাশে যারা থাকে, তারা নিশ্চয়ই সবচেয়ে সেরা কাজই করবে, তারাও তাসবীহ পাঠ করেন,

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

আপনি ফেরেশতাদের দেখতে পাবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করছে (যুমার, ৭৫)।

২৭. যেসব ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করে আছেন, তাদের বৈশিষ্ট্যও বলা হয়েছে তাসবীহ পাঠ,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

যারা (অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ) আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে (মু'মিন, ৭)।

২৮. তাসবীহ পাঠ শুধু কি দুনিয়ার কাজ? জি না, জান্নাতে পর্যন্ত মুমিনগণ তাসবীহ পাঠ করবেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

(অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের এমন স্থানে পৌছাবেন যে, প্রাচুর্যময় উদ্যানরাজিতে তাদের তলদেশ দিয়ে নহর বহমান থাকবে। তাতে (প্রবেশকালে) তাদের ধ্বনি হবে এই যে, হে আল্লাহ, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে আপনি পবিত্র (ইউনুস, ৯-১০)।

২৯. আমি আশরাফুল মাখলূকাত। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আমাকে (أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٍ) উৎকৃষ্টতম ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে সৃষ্টিই করেছেন (لِيَعۡبُدُونِ) তাঁর ইবাদত করার জন্য। সেই আমিই কেন তার তাসবীহ পাঠ করতে ভুলে যাই? অন্য যা কিছু আছে, সেসবকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমার সেবার জন্য। তারা পারলে আমি কেন পারব না?

অ্যাকাউন্ট

ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা অ্যাকাউন্ট খুলি। তিল তিল করে পয়সাকড়ি জমাই। সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট আরও কত কত অ্যাকাউন্ট খুলি! সবই আগামীর কথা ভেবে। নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। আখেরাতের জন্যে কি কোনো অ্যাকাউন্ট খুলেছি? প্রকৃত মুমিন, এমনকি নবীগণ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট খোলেন,

فَلَوۡلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطۡنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ

সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে মৃতদের পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে সেই মাছেরই পেটে থাকত (সাফফাত, ১৪৩-৪৪)।

কী বিপজ্জনক কথা! ইউনুস আ. নিয়মিত তাসবীহ পাঠ করতেন। মাছের পেটে যাওয়ার পরও তাসবীহ পাঠ করে গেছেন। এই তাসবীহ তাঁর জন্যে রক্ষাকবচ হয়েছে। মাছের পেট থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, পূর্বেকার তাসবীহের কারণে। নইলে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতে হতো।

আমি যদি বিপদে পড়ি, আমার কি বাঁচার মতো এমন কোনো আমলের অ্যাকাউন্ট আছে?

শোকর

চারদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি! কোথাও কোথাও পানিতে তলিয়ে গেছে গ্রাম-জনপদ। ঈদের আনন্দ বানের জলে ভেসে গেছে। উৎসব দূরস্থান, জান নিয়ে টানাটানি। বাঙলাদেশের মানুষ পানিহীনতার কষ্ট কমই বোঝে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে, পানযোগ্য পানি সংগ্রহের জন্যে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হয়। তারপরও কি সহজে পানি জোটে? অনেক কসরত করে দু-ফোঁটা 'প্রাণ' সংগ্রহ করে আনতে হয়।

নেয়ামত অফুরন্ত হলে তার কদর বোঝা যায় না। কিন্তু কুরআনি বিধান হলো, নেয়ামত যত বেশি, শোকরও তত বেশি করতে হবে। নইলে শাস্তিস্বরূপ একসময় নেয়ামতে ভাটার টান ধরে,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

তোমরা আমার শোকর আদায় করলে, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেবো (ইবরাহীম, ৭)।

এই যে আমি আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতে ডুবে আছি, এটা ভেবে কখনো আলাদা করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছি?

আর হাঁ, মুখে মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেই শুধু শোকর আদায় হয়ে যায় না। সাথে সাথে মনপ্রাণ জুড়েও 'আলহামদুলিল্লাহ' থাকতে হয়। আর ভেতরটা রব্বে কারীমের প্রতি কৃতজ্ঞ গদগদ হয়ে উঠলে, মুখে উচ্চারণ করা লাগে না। উভয়টা হলে সোনায় সোহাগা! আলহামদুলিল্লাহ!

যিকির

সবচেয়ে সহজতম ইবাদত কী?

যিকির!

একেবারে মুমূর্ষু ব্যক্তি, প্রাণ আসে আর যায়, সেও যিকির করতে পারে। যিকির মানে শুধু তাসবীর দানা টিপে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করা নয়, মনে মনে রবের স্মরণ, রবের মাহাত্ম্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও যিকির।

আমার যিকিরের পরিমাণ কেমন? মুনাফিকের মতো নয়তো?

মুনাফিক কি যিকির করে?

অবশ্যই করে। আল্লাহ তা'আলাই তার স্বীকৃতি দিয়েছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহই তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায়।

আর?

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে (নিসা, ১৪২)।

মুনাফিকও আল্লাহর যিকির করে। তবে অল্প করে। অল্প যিকির করা মুনাফিকের আলামত। আমার মধ্যে কি আলামতটা আছে? তাহলে সেটা দূর শীঘ্রই দূর করতে সচেষ্ট হওয়া জরুরি।

আমার 'যবান' যদি আল্লাহর যিকিরে উৎসাহী না হয়, আমার বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে আল্লাহর ইবাদতে উদ্যমী হবে?

তাকওয়া

রমযানের মূল সুর কী? কুরআন কারীম কী বলে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয় (বাকারা, ১৮৩)।

রমযানের মূল সুর হলো 'তাকওয়া'। আমি এই জীবনে কয়টা রমযান পেয়েছি? হিশেব করে দেখেছি? এতগুলো রমযান পেয়ে, আমি কতটা মুত্তাকী হতে পেরেছি? আমি এবার কতটা তাকওয়া অর্জন করার নিয়্যত করেছি? আদৌ তাকওয়া অর্জন করার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছি? রমযানের মূল সুর যে 'তাকওয়া' সেটা কি আমার মাথায় ছিল? থাকলে এবার আমার লক্ষ্যমাত্রা কী? আগত রমযানে আমি আমার তাকওয়ার স্তরকে কোন পর্যায়ে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখছি?

আমি মনে রাখব, সিয়ামের মূল সুরই হলো 'তাকওয়া'। তাকওয়া অর্জন হওয়ার মানে, আমার রোজা রাখা সার্থক। তাকওয়া মানে কী? আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয়ে কোনো ধরনের গুনাহের ধারেকাছে না ঘেঁষা।

আর হাঁ, তাকওয়া কোনো মৌসুমী বিষয় নয়। মাসখানেক ভালো থাকলাম, তারপর আবার যে কে সেই। এটাকে তাকওয়া বলে না।

তা'আল্লুক মা'আল্লাহ

আমি মানুষের সাথে সম্পর্ক পোক্ত করার উপায় খুঁজি। মানুষের শত্রুতায় বিপর্যস্ত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি। অথচ এর সহজ সমাধান কুরআন কারীমেই দেয়া আছে,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা (মারয়াম, ৯৬)।

১. ঈমানকে পোক্ত করলে, নেক আমল করতে থাকলে, দয়াময় আল্লাহই মানুষের মনে আমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেবেন।

২. আমরা সমাজেও দেখি, যারা ইবাদত-বন্দেগী করেন, তাদের প্রতি মানুষের অন্যরকমের ভক্তি ও ভালোবাসা থাকে।

৩. আল্লাহ তা'আলা এই পরামর্শ দিয়েছেন। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভয়-অভয়

আসরের পর কাজ ছিল না। আগেই ঠিক করে এসেছি, মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে কাটাব। কুরআন কারীম তিলাওয়াত করব। নিরিবিলির জন্যে এক কোণে গিয়ে বসলাম। একে একে সবাই চলে গেল। আমি একা একা কুরআনে ডুবে আছি। সূরা হাক্কাহ পড়ছিলাম।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

অতঃপর যখন শিঙ্গায় একটিমাত্র ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উত্তোলিত করে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে, সেদিন ঘটবে সেই ঘটনা, যা অবশ্যম্ভাবী (১৩-১৫)।

এমন সময় মসজিদের বাইরে কোথাও বিকট আওয়াজ হলো। চারদিক কেঁপে উঠল। জানলার শার্সিগুলোও ঝনঝন করে উঠল। প্রচণ্ড ভয়ে মন কুঁকড়ে গেল। শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কিসের আওয়াজ? বোমার? বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে? কোনো গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়েছে? আমি কি মারা যাচ্ছি? অন্তিম মুহূর্ত চলে এসেছে? পরপর আরও কয়েকটা আওয়াজ হলো। কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম বিকট নয়। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর জানতে পারলাম, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আওয়াজ। কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল। সামান্য একটা আওয়াজে যদি আমি এতটা ভড়কে যাই, কেয়ামতের শিঙ্গার ফুৎকার দেয়া হলে আমার অবস্থা কেমন দাঁড়াবে?

আরামদায়ক তন্দ্রা

শায়খ সারাজীবন কুরআন হাদীস পড়িয়েছেন। এখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত। কিন্তু যবান এখনো বেশ সচল। যিকির দ্বারা তরতাজা সজীব থাকে সব সময়। অসুখে পড়ার পর থেকে বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। হুঁশ ফিরে পেলেই ঠোঁট নড়ছিল। একেবারে শেষ অবস্থা। খেদমতের জন্যে সাথে কয়েকজন তালিবে ইলম আছে। তারা দেখল শায়খ হুঁশ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই কিছু একটা পড়ছেন। মুখের কাছে কান পাতল একজন। অনেক কষ্টে বোঝা গেল, তিনি বারবার কুরআন কারীমের একটা বাক্যই আওড়াচ্ছেন :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

(স্মরণ করো), যখন তিনি নিজের পক্ষ হতে স্বস্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন (আনফাল, ১১)।

বদর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা ছিল তিনগুণ। এই অসম যুদ্ধে মুসলমানদের মনে কিছুটা হলেও ভয় জাগা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা এই ভয় বা শঙ্কা দূর করতে মুজাহিদগণকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। ঘুমুলে ভয়ডর কেটে যায়। তনুমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শায়খও বারবার হুঁশ হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি ভেবেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করে তাকে বেহুঁশ করে দিচ্ছেন। সেটা উপলব্ধি করেই তিনি বারবার আয়াতাংশটা বিড়বিড় করে আওড়ে যাচ্ছিলেন।

মুখোমুখি

জান্নাত শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী সুখের কিছু নমুনা বান্দাকে দেখিয়ে দেন।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত, এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা (নাযি'আত, ৪০-৪১)।

দুটি বিষয়,

ক. আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়।
খ. প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

ফলাফল? জান্নাত।

আর যারা দুনিয়াতে ইচ্ছামতো চলে, তারাও কিছু পার্থিব ভোগ-সুখ লাভ করে। তবে এই ভোগ সুখ জান্নাতের তুলনায় কিছুই নয়। অপরদিকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই মানসিক প্রশান্তি দান করেন। যার স্বাদ নাফরমানরা পায় না।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ

সমাজে যালেম আছে, অবধারিতভাবে মাযলুমও আছে। আল্লাহ তা'আলা মাযলুমকে প্রতিরোধ করার অধিকার দিয়েছেন। কেউ মন্দ আচরণ করলে তার বদলাও অনুরূপ মন্দ। তবে ক্ষমা করে দিতে পারলে ভালো,

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, তো এটা অবশ্যই অত্যন্ত হিম্মতের কাজ (শুরা, ৪৩)।

আমার প্রতি যুলুম করছে, আমি যুলুমের বদলা না নিয়ে ক্ষমা করে দেবো? এই ক্ষমা যালেমকে আরও যুলুমের প্রতি উৎসাহিত করবে না? যালিম যদি পেশাদার না হয়, ভুলে বা সাময়িকভাবে স্বার্থান্ধ হয়ে জুলুম করে ফেলে, তাহলে ক্ষমাটা প্রশংসনীয়। কিন্তু যুলুম করাটাই যার নিয়মিত পেশা ও আচরণে পরিণত হয়েছে, তাকে ক্ষমার করার চেয়ে তার যুলুমের প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম।

প্রতিশ্রুতি

আমার অনেক দায়দায়িত্ব। তার মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পূরণ করা। ওয়াদা পূরণ করা পুণ্যের আলামত। আমার কাঁধে তিন ধরনের ওয়াদা চাপানো আছে,

১. আল্লাহ তা'আলাকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি।
২. আমার নিজেকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।
৩. অপরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا

(ওই ব্যক্তিরাও পুণ্যবান) যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে (বাকারা, ১৭৭)।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার বিষয়টাকে ব্যাপারে কুরআন কারীমে চমৎকার এক উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

যে নারী সুতা মজবুত করে পাকানোর পর পাক খুলে তা রোয়া রোয়া করে ফেলেছিল, তোমরা তার মতো হয়ো না (নাহল, ৯২)।

আমাকে মনে রাখতে হবে, প্রতিশ্রুতিগুলো নিছক কথা নয়। বলার সময় দৃঢ়ভাবে বললাম, পরে ভুলে গেলাম, এমন হলে আমি আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হব।

আমাকে মনে রাখা জরুরি, আমি কখন কাকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কাকে কী কথা দিয়ে রেখেছি। এসব অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি আখেরাতে আমার জন্যে ভয়ানক বিপদ হয়ে দেখা দেবে।

ভাবনা

১. কিছু বিষয় থাকে, তাতে কোনো ইতরবিশেষ নেই। সবাই সমান। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আল্লাহর দেয়া বাতাস সবাই সমানভাবে অবাধে গ্রহণ করে। আল্লাহর দেয়া পানি সকলেই অবাধে ব্যবহার করে।

২. আমল-ইবাদতের ক্ষেত্রেও একই কথা। কিছু আমল-ইবাদত আছে, কোনো বাছবিছার ছাড়া সবার জন্য প্রযোজ্য।

৩. কুরআন কারীমের আয়াতের বেলায় একই কথা। কিছু আয়াত আছে, কোনো মুসলিমই তার আওতামুক্ত নয়। তেমন একটি আয়াত হলো,

تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا

তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো (নূর, ৩১)।

৪. আল্লাহ বলেছেন (جَمِيعًا) সকলেই। কেউ বাকি নেই। এই কুরআনি বাক্যটি সমস্ত আমিত্বকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। প্রতিটি মুসলিম তাওবার মুহতাজ (মুখাপেক্ষী)। কারণ, নবীগণ ছাড়া কেউই নিষ্পাপ নয়।

৫. এই আয়াত আমার মধ্যে তাওবার প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে না তুললে, আমার ঈমানে ঘাটতি আছে বুঝতে হবে। কেউ নিজেকে এই আয়াতের আওতামুক্ত ভাবলে ধরে নিতে হবে, তার মধ্যে চরম মাত্রার অহংকার বিরাজমান।

৬. তাওবা কি শুধু পাপীর? আমি ইমাম, আমি হুজুর, আমি দাঈ, আমি মুবাল্লিগ, আমি পীর, আমি মুজাহিদ কমান্ডার, আমি গাড়ি নিয়ে ইস্তেশহাদী হতে যাচ্ছি, আমি তাহাজ্জুদগুজার, আমি দানবীর, আমি হাজী, আমি গাজী, আমি যা-ই হই, আমাকে তাওবা করতে হবে। তাওবা করে যেতে হবে।

৭. দুনিয়ার কেউই তাওবার বিধানের আওতামুক্ত নয়। জামী'আন—সকলকেই তাওবা করতে বলা হয়েছে। আমি বড় হুজুর হলেও, আমাকে নিয়মিত তাওবা করতে হবে। আমি বড় নেতা হলেও, আমাকে সব সময় তাওবার ওপর থাকতে হবে। আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি।

নাহের ধরন

আলিমের গুনাহ আর আওয়াম মানে যে আলেম নয়, এমন ব্যক্তির গুনাহের ধরন কি এক?

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ

তাদের অনেককেই আপনি দেখবেন, তারা পাপ, জুলুম ও অবৈধ ভক্ষণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে তা অতি মন্দ। তাদের মাশায়েখ ও উলামা তাদের গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করছে না কেন? বস্তুত তাদের এ কর্মপন্থা অতি মন্দ (মায়িদা, ৬২-৬৩)।

১. সাধারণ মানুষের গুনাহ ও পাপকর্মে লিপ্ত হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'আমল'। (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

২. সাধারণ মানুষ (অনালেম) গুনাহে লিপ্ত হলে আলিমের উচিত মানুষকে সতর্ক করা। গুনাহের কাজে নিষেধ না করাকে আল্লাহ তা'আলা সানআ (صنعة) বলেছেন। (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)।

৩. স্বাভাবিক কাজকে 'আমল' বলা হয়। যেকোনো কাজই 'আমল'। কাজ করতে করতে নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করাকে বলা হয় 'সানআ'। আল্লাহ তা'আলা নিজের সৃষ্টিকুশলতা সম্পর্কে বলেছেন,

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

এসবই আল্লাহর কর্ম-কুশলতা, যিনি সকল বস্তু সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করেছেন (নামল, ৮৮)।

৪. এই আয়াতে আল্লাহ (إتقان) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (صنعة) শব্দের সাথে। ইতক্বান অর্থ নৈপুণ্য। দক্ষতা। কুশলতা।

৫. জনসাধারণের গুনাহ দেখেও আলিমের চুপ থাকা সাধারণ পাপ নয়; গুরুতর পাপ। শুধু তা-ই নয়, পাপে বাধা না দিয়ে চুপ থাকাটা কুরআনের ভাষায় পাপে নৈপুণ্য আর দক্ষতা অর্জন বলেই বিবেচিত হবে।

৬. আলিম হয়েও যদি অন্যায়কে অন্যায় না বলি, তাহলে আমি এই আয়াতের ভাষ্যমতে আল্লাহর কাছে নিন্দার পাত্র। মন্দকে মন্দ না বললে আমি যেন মন্দকে ভালো বলে স্বীকৃতি দিলাম। বাতিলকে হক বললাম। কুরআনের বিপরীতে অবস্থান নিলাম। এমন করা কুরআনের ভাষায় সুস্পষ্ট জুলুম। (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) জালিমের ওপর আল্লাহর লা'নত (হূদ, ১৮)।

৭. তাদের কাজের নিন্দা করলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের 'রব্বানী' (মাশায়েখ) আর 'আহবার (উলামা) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার মানে সর্বজনস্বীকৃত 'শায়খ' হয়েও আল্লাহর দরবারে 'নিন্দিত' আর বিকৃত হতে পারেন।

৮. পাপকাজে বাধা না দেয়া বা চুপ থাকাকে এতটা খারাপভাবে চিত্রিত করার কারণ কী? আলিমের মূল কাজই হলো, সৎকাজে আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা। আলিম জানে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। জেনেশুনেও পাপ কাজে বাধা না দেয়ার অর্থ, পাপকে মেনে নেয়া।

৯. হাঁ, মন্দ কাজে বাধা প্রদানের সর্বনিম্ন স্তর 'মনে মনে' ঘৃণা করা। এটুকুও যদি কোনো আলিমের মধ্যে না থাকে, চিন্তার বিষয়।

দম্ভের চিহ্ন

কাউকে অহংকার করতে দেখলে, বুঝে নিতে হবে, সে ব্যক্তি হয় সলাত কম আদায় করে, না হয় সলাতই আদায় করে না,

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে (ফাতহ, ২৯)।

১. অধিক সিজদা আর অহংকার এক ব্যক্তির মাঝে জমা হতে পারে না।

২. ইমামুত তাফসীর, বিশিষ্ট তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. বলেছেন, (هو التواضع) আয়াতের সিজদার চিহ্ন বলে তাওয়াজু বা বিনয় বোঝানো হয়েছে।

৩. সিজদা হলো আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্যের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়। বিনয়ে বিগলিত হয়ে স্রষ্টা সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়া মানে, প্রতীকীভাবে আমার সবকিছু আল্লাহর জন্য সমর্পণ করলাম।

৪. আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে সিজদা দিলে, কলবে অহংকার বাসাই বাঁধতে পারবে না। নিয়মিত নামাজ পড়ে আবার অহংকারও করে, এমন কেউ থাকলে ধরে নিতে হবে, মানুষটা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও মনোযোগ দিয়ে সিজদা করে না। কোনোরকমে দায়িত্ব আদায় গোছের নামাজ পড়ে।

৫. আসলে যথাসাধ্য আন্তরিকতা নিয়ে সলাত ও কুরআন তিলাওয়াত করলে অন্তরে কোনো রোগই উঁকি দেয়ার সাহস পাবে না।

৬. মনে কখনো অহংকার এলে, সিজদা দিয়ে দেখতে পারি। আন্তরিকভাবে বিনয়ের সাথে সিজদার তাসবীহ পাঠ করলে, ইন শা আল্লাহ অহংকার দূর হয়ে যাবে। এই সিজদাকে আমরা সিজদায়ে শোকর ধরে নিতে পারি।

যখনই অহংকার তখনই সিজদা। ইন শা আল্লাহ।

সাদাকা

আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য যা কিছুই দান করি, সবকিছু আমি আবার ফেরত পাব। আল্লাহর জন্য দান করলে, সম্পদ ফুরোয় না,

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেকোনো সৎকর্ম প্রেরণ নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যেকোনো কাজ করো, আল্লাহ তা দেখেন (বাকারা, ১১০)।

১. একটাকা দান করলে স্বাভাবিক অবস্থায় দশটাকা দান করার সওয়াব পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

২. ঈমান, নিয়্যত ও ইখলাসের গভীরতার সাথে সাথে, আমলের গভীরতা আর গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যায়। আমরা নামাজ পড়ি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নামাজ পড়েছেন। কিন্তু আমাদের নামাজ আর তাঁর নামাজে আকাশ-পাতাল তফাত। কারণ, ঈমান-নিয়্যাত ও ইখলাসের তারতম্য।

৩. আমি দান করলেই সওয়াব পেয়ে যাব। কিন্তু একজন শীতার্ত মানুষকে গরম বস্ত্র দান করা আর গরমকালে একজন ছেঁড়া পোশাকের গরিবকে জামা দান করার মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

৪. এ ছাড়াও আরেকটি দিকও লক্ষণীয়, মূল দানের সওয়াব তো সাথে সাথেই আমলনামায় লেখা হয়ে যাবে। পাশাপাশি দানগ্রহীতা যদি পরম কৃতজ্ঞচিত্তে আমার জন্য নিয়মিত দু'আ করে, তাহলে বাড়তি ফযীলত অর্জিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উদাসী মন

আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন হয়ে পড়ার পরিণতি খুবই ভয়ংকর হয়। আল্লাহর যিকিরমুক্ত 'কলব' শয়তানের দখলে চলে যায়। কলব কখনো খালি থাকে না। কলবকে খালি রাখলে, কিছু-না-কিছু এসে খালি স্থান পূরণ করেই নেয়। আল্লাহর যিকির ও খেয়ালখুশি-মতো চলা, দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

আপনি এমন কোনো ব্যক্তির কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজে খেয়াল-খুশির পেছনে পড়ে রয়েছে (কাহফ, ২৮)।

১. আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল ব্যক্তির অনুসরণ করতে নবীজিকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ। অথচ আমি কথায় ও কাজে গাফেল তো বটেই, কাফেরকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে পিছপা হই না।

২. যিকির মানে শুধু মৌখিক উচ্চারণ এমন নয়। মনে মনে আল্লাহর কথা, কুরআনের কথা, মাযলুমের কথা, সীরাতের কথা স্মরণ করাও যিকির।

প্রত্যাবর্তন

যেকোনো সফরেরই একটা শেষ আছে। দুনিয়ার যিন্দেগীও একটা সফর। সফরে বের হলে মানুষ বিশেষ অবস্থায় থাকে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামানা ছাড়া আর কিছু সাথে রাখে না। বাজারে যত সুন্দর জিনিসই দেখুক, কেনে না। বোঝা বেড়ে যাবে যে! গাড়ি ধরার তাড়ায় বেখবর হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বার বার আমাদের গন্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

১. সেদিন সকলের যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট (কিয়ামাহ, ৩০)।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

২. এটা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে (আলাক, ৮)।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

৩. নিশ্চয়ই তাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে (গাশিয়াহ, ২৫)।

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ

৪. আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারি, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন (বাকারা, ২৮৫)।

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

আমি কি গন্তব্যের পাথেয় তৈরি করছি? ওখানে গিয়ে আরামে থাকার ব্যবস্থা করছি? উত্তর মেরুতে যেতে হলে আমি সবার আগে কী নেব? শীতবস্ত্র। নইলে একদিনও তো দূরের কথা, কয়েক ঘণ্টাও টিকব কিনা সন্দেহ। আমি আখেরাতে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে কী করছি?

নানা সামানপত্র নিয়ে নিজের ব্যাগ ভারী করে ফেলছি না তো? যা সাথে নিয়ে পথ চলছি, এগুলো পথচলার জন্যে আবশ্যক? গন্তব্যে পৌছার পর এসব কাজে লাগবে নাকি ফেলে দিতে হবে?

আল্লাহর ডাক

মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। থাকেও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দান ও অনুগ্রহ সীমাহীন। কুরআন কারীমে আছে,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো (মু'মিন, ৬০)।

সমস্ত বান্দাদের তিনি বলেছেন, আমাকে ডাকো (ادْعُونِي)। ধনী-গরিব, শাদা-কালোর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। ভেদাভেদ রাখেননি।

আমার কাছে চাও (ادْعُونِي)। কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেননি। বান্দার যা ইচ্ছা, তা-ই চাইতে বলা হয়েছে। সীমা নেই, পরিমাণ নেই।

প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে (ادْعُونِي)। কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই দু'আ করা যাবে। চাওয়া যাবে। প্রার্থনা করা যাবে।

চাইতে বলা হয়েছে (ادْعُونِي)। কোনো স্থান নির্ধারণ করে দেননি। যেখানে ইচ্ছা চাইতে পারব। ঘরে বাইরে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, মসজিদে বাজারে। সব জায়গায়। একটানা চেয়ে যেতে পারব। না থেমে সারাদিন চাইতে পারব। ওদিক থেকে কোনো বিরক্তি প্রকাশ করা হবে না।

গন্তব্যে পৌঁছা

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুবিধার জন্যে বহু জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাহন তৈরি করে দিয়েছেন। নিজেরা যা বহন করতে পারি না, বাহনের সাহায্যে সেসব গন্তব্যে নিয়ে যাই। পায়ে হেঁটে পৌঁছতে কষ্ট হয়, এমন দুর্গম স্থানেও আমাদের মালামাল পৌঁছে দেয়। এটা আল্লাহর নেয়ামত।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ

এবং তারা তোমাদের ভার বয়ে নিয়ে যায় এমন নগরে, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না (নাহল, ৭)।

আখেরাত আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। আমরা সেখানে পৌঁছার জন্যে বাহন তৈরি করতে পেরেছি? দুনিয়াতে বোঝা বহনের জন্যে নানাবিধ বাহন আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আখেরাতের বাহন হিশেবে দিয়েছেন নেক আমল। আমরা আখেরাতের বাহনকে কাজে লাগাচ্ছি? নইলে কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারব না। সময় থাকতে বাহন প্রস্তুত করে না রাখলে, পরে বিপাকে পড়তে হবে।

পার্থিব-অপার্থিব

১. হে নবী, আপনি সিজদা করুন (وَاسْجُدْ)।

৩. আপনি এই সিজদার মাধ্যমে আপনার রবের নিকটবর্তী হতে থাকুন (وَاسْجُدْ)।

৪. আল্লাহ তা'আলা বান্দাকেও বিপদে-আপদে সিজদা দিতে বলেছেন। বিষয়টা ভাবতেই কেমন লাগে। মাথাটা দুনিয়ার মাটিতে। আর সিজদাকারীর হৃদয়? উর্ধ্বজগতে। রাব্বে কারীমের কাছে। আহা!

৫. সিজদার বাহ্যিক রূপ কত চেনা, কত কাছের, কত পার্থিব! আর তার হৃদয়? কত অপার্থিব! কত সুদূরের!

৬. সিজদার মাধ্যমে আমি যুগপৎভাবে পার্থিব ও অপার্থিব দুই সত্তাকে একসাথে, এক মুহূর্তে ধারণ করতে পারি।

৭. রাব্বে কারীমকে সিজদার জন্য কোনো উপলক্ষ্য লাগে না। যখন-তখন সিজদায়ে শোকর দিতে পারি। আমার প্রতি তার নেয়ামতের কোনো সীমা-পরিসীমা আছে? যেকোনো একটা নেয়ামতের কথা স্মরণ করেই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়তে পারি। (সূরা আলাক, সিজদার আয়াত)

দাম্পত্য-পরিবার।

প্রেয়ারটাইম, স্কুলটাইম

১. দুটি চিত্র বড্ড ভাবিয়ে তোলে। চিত্র না বলে দুটি সময় বলাই ভালো। পাঁচটা ও ছয়টা। অথবা পাঁচটা ও সাতটা। দুটি সময়ে কত পার্থক্য।

২. ফজরের সময় হয় সাধারণত পাঁচটায়। একদল লোক আরামের বিছানা ত্যাগ করে। আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দেয়। ধীরস্থিরভাবে প্রশান্তচিত্তে। যেতে যেতে কেউ তাসবিহ পাঠ করে। কেউ মেসওয়াক করে। কেউ তাকবিরও পাঠ করে।

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করে (নূর :৩৬)

৩. ভোরে মসজিদে গমনকারীর সংখ্যা কত? শতকরা হার কত? অত্যন্ত কম। সমাজের বেশিরভাগই ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকে। কোনও কোনও বাড়িতে বাবা-মা ফজর পড়েন, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে থাকে। এভাবে সালাত আদায় না করে সন্তানের ঘুমিয়ে থাকটা অনেক বাবা-মায়ের কাছে দোষণীয় মনে হয় না। যেন ঘুমিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক।

৪. ফজরের সময় শেষ হওয়ার পরই চিত্র বদলে যায়। ছয়টা বা সাতটায় যখন স্কুলের সময় হয়, বাবা-মায়ের ভূমিকা বদলে যায়। যে বাবা-মা ফজরের সময় সন্তানের ঘুমিয়ে থাকাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল, নির্বিকারচিত্তে মেনে নিয়েছিল, একই বাবা-মা স্কুলের সময় সর্বোচ্চ তৎপর হয়ে উঠেছে। সন্তানকে বিছানা ছাড়াতে একেকজন বাবা-মা জীবন-মরণ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন।

৫. ফজরের সময় মরণ ঘুমে ছিল যারা, স্কুলের সময় তারাই পড়িমরি করে বিছানা ছাড়ে। ছয়টা বা সাতটা বাজতে না বাজতেই বাড়িঘরগুলোতে যে তোড়জোর শুরু হয়, দেখলে মনে হবে, অদৃশ্য কোথাও সাইরেন বাজানো হয়েছে। এখনই পৌঁছতে হবে, নইলে মহা ক্ষতি হয়ে যাবে।

৬. একঘণ্টা আগেও যে পাড়া মৃত্যুপুরী ছিল। এক ঘণ্টার ব্যবধানে রাস্তাঘাট জনাকীর্ণ হয়ে গেল। কোন ভোজবাজিতে এটা সম্ভব হলো? রাস্তা দিয়ে পিলপিল করে হাঁটছে, কেউ স্কুলব্যাগ কাঁধে, কেউ টিফিনবক্স হাতে। ছুটছে ছুটছে। গন্তব্যের পানে। ফজরের সময় এই ছুটে চলা কোথায় ছিল?

৮. অনেক বাবা-মা এমন আছেন, তার মনে মনে কামনা করেন, তাদের সন্তানরাও সালাত আদায় করুক। এই কামনা করা পর্যন্তই সার। এর চেয়ে আগে বাড়েন না। সন্তানকে ঘুমন্ত রেখেই তারা নামাজ পড়ে নেন। কিন্তু সন্তান যদি স্কুলে যেতে না চায় বা যেতে একটু দেরি করে, এই বাবা-মা রণমূর্তি ধারণ করেন। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। যত কায়দা-কৌশল আছে, সবই খাটায়, যাতে সন্তান ঠিকমতো স্কুলে যায়। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। এটা-সেটার প্রলোভন দেখায়। এতেও কাজ না হলে, উত্তম মধ্যম দেয়।

৯. সন্তান পড়াশোনা করবে, মানুষ রুজি-রোজগারে বেরোবে, এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু একজন মুমিনের কাছে সালাতের চেয়েও পড়াশোনা ও রুজি-রোজগার বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কী করে?

Reminder

১০. আমরা জামাতের সাথে সালাতের কথা বলছি না। জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব কি ওয়াজিব নয়, এ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে ওয়াজিব। আমরা যে মাসয়ালা নিয়ে কথা বলছি, সেটাতে গত পনেরো শ বছরে কেউ মতভেদ করেননি। কোনও ইমাম বলেননি, সালাতের সময় হলে, সালাত আদায় না করে, ওয়াক্ত পার করে দেওয়া জায়েজ। এটা সর্বসম্মত মাসয়ালা, সময়মতো সালাত আদায় না করা শিরকের পর, সবচেয়ে বড় (কবীরা) গুনাহগুলোর অন্যতম। ইমাম আহমাদ রহ. এবং আরও কয়েকজন ইমামের মত, সালাত আদায় না করলে, ঈমানই চলে যাবে।

১১. বাবা-মায়ের এই দ্বৈত ভূমিকা কেন? সন্তান ফজর না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে, কিছু মনে হয় না, কিন্তু পড়ার সময় ঘুমিয়ে থাকলে, চারদিক আঁধার হয়ে যায়? কোনও কোনও বাবা-মা, ফজরের সময় হলে, সন্তানকে দায়সারা গোছের এক বা দুই ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হন। ছেলে-মেয়ে না উঠলে তেমন কিছু বলেন না। কিন্তু এক ঘণ্টা পর যখন স্কুলের সময় হয় তখন ডাকাডাকির শেষ থাকে না।

১২. সরকারি চাকুরি করেন। নামাজি হিশেবে পরিচিত। তিনি বললেন, ফজরের সময় উঠতে পারি না। জোর করে উঠলে ঘুম পুরো হয় না। আবার ফরজ নামাজ বাদ দিই কি করে, আমি করি কি, প্রতিদিন অফিসের যাওয়ার আগে ফজরের নামাজ পড়ে নিই। গত দশ বছরই এমনটা করে আসছি। কোনও দ্বিধা বা অপরাধবোধ ছাড়াই তিনি কথাটা বললেন। যেন বড় কোনও দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন। কৃতিত্বের কাজ করে ফেলেছেন।

১৩. ব্যতিক্রম চিত্রও আছে। এক পরহেজগার যুবক বলল, আমি বন্ধুদের এক আড্ডায় খোঁজ নিয়েছিলাম। কে কে নামাজ পড়ে? বিশেষ করে ফজরের নামাজ। আড্ডার সবাই বলল, তারা কেউই ফজর তো দূরের কথা, নামাজই পড়ে না। শুধু

একজন বলল, সে ফজর পড়ে। কারণ, তার স্ত্রী তাকে জোর করে ঘুম থেকে জাগিয়ে, রীতিমতো ঠেলেঠুলে মসজিদে পাঠিয়ে দেয়। ঘুমিয়ে থাকার উপায় নেই।

১৪. মুসলিম উম্মাহর অবস্থা বদলে গেছে। বেশির ভাগ বাবা-মায়ের কাছে আজ সার্টিফিকেট লাভের পড়াশোনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ সালাত তাদের কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে।

১৫. ঠিকমতো অফিসে, সময়মতো স্কুলে যাওয়ার জন্যে সবার সে কি তুমুল ব্যস্ততা! একদিন সময়মতো অফিসে বা স্কুলে হাজির হতে না পারলে, ভয়-আফসোসের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু দিনের পর দিন সালাত কাজা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। মাথাব্যথা নেই। আমরা এতটাই দুনিয়ামুখী হয়ে গেছি? ইসলাম আমাদের কাছে এতটাই হেলার বস্তু হয়ে গেছে?

১৬. সালাতের সময়ের চেয়ে স্কুল আর কর্মের সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ কুরআন আমাদেরকে এর বিপরীত শিক্ষা দেয়। কুরআন বলে, দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ

(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন (তাওবা : ২৪)।

১৭. এই আয়াতে কোনও কিছু কি বাদ পড়েছে? দুনিয়ার সবকিছুই আয়াতের আওতায় এসে গেছে। দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং জিহাদকে বেশি ভালোবাসতে হবে। এর বিপরীত হলে, আমার জন্যে ভয়ানক শাস্তি অপেক্ষা করছে। ধন-জন, সনদ-সার্টিফিকেট কেন আমার কাছে সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে? এসব কি চিরদিন আমার সাথে থাকবে?

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ

তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী (নাহল : ৯৬)।

১৮. ভোর পাঁচটায় নাক ডাকার আওয়াজ আর ভোর ছয়টা বা সাতটার কর্ম তৎপরতার আওয়াজ। দুটো আওয়াজই দুনিয়ার ওপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়ার আওয়াজ। হ্যাঁ, আমি পাঁচটার নাক ডাকা বন্ধ করে সালাতে শরিক হতাম, তাহলে সাতটার আওয়াজটা অনিন্দ্য হয়ে যেত। দুই আওয়াজকে তুলনা করার সময় আয়াতটা পড়তে পারি,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী (আ'লা : ১৬-১৭)।

১৯. আমি যখন ফজরের সময় নাক ডেকে ঘুমুই, আর কাজের সময় শ্বাস ছেড়ে দৌড়াই, তখন কি আয়াতটা মনে পড়ে না,

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

তারা তো (দুনিয়ার) নগদ জিনিসকে ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করছে (দাহর : ২৭)।

২০. আমি দুনিয়ার তুচ্ছ নগণ্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আর আখিরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেজায় উদাসীন। এ-বিষয়ে আহলে ইলম (জ্ঞানীগণ)-এর নসিহত স্মরণ করতে পারি। কুরআন কারিম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সেই জ্ঞানীগণের কথা উল্লেখ করেছে,

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

আর যারা (আল্লাহর পক্ষ হতে) জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক, তোমাদেরকে! (তোমরা এরূপ কথা বলছ, অথচ) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব কতই না শ্রেয়! (কাসাস : ৮০)।

আমি ঘুমিয়ে থাকলে, আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াবের ভাগীদার কীভাবে হতে পারব? ফজরের সময় উঠলাম না, কিন্তু একটু পরে কাজের জন্যে ঠিকই উঠলাম, স্কুলের জন্যে সন্তানকে ঠিকই জাগিয়ে তুললাম, আমি আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়াকে অবজ্ঞা করলাম না?

২১. আমাদের আশেপাশে অহরহ চিত্র দেখতে পাবো। বাবা-মা সন্তানকে সালাতে আগ্রহী করছে না। স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে নামাজি বানানোর চেষ্টা করছে না। আমাদের সামনে কুরআনি চিত্রটি রাখতে পারি,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

এবং এ কিতাবে ইসমাঈলের বৃত্তান্তও বিবৃত করুন। নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং রাসূল ও নবী। সে নিজ পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত এবং সে ছিল নিজ প্রতিপালকের সন্তোষভাজন (মারইয়াম : ৫৪-৫৫)।

২২. আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করেছেন ইসমাঈল আ.-এর। কেন? তিনি পরিবারকে সালাতের আদেশ করতেন, তাই। এর বিপরীতে আমরা কল্পনার চোখে দেখি, বর্তমানে একই পরিবারে, একই ঘরে থেকেও, বাবা-মায়েরা সন্তানকে সালাতের হুকুম করে না।

সন্তানকে সালাতের হুকুম করা বাবা-মায়ের প্রধানতম দায়িত্ব। এজন্যই ইসমাঈল আ.-এর কথা উল্লেখ করেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি। আরো একজন নেককারের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে। সন্তানের প্রতি লুকমানের আদেশের কথা বর্ণনা করেছে কুরআন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

বাছা! নামাজ কায়েম কর (লুকমান : ১৭)।

২৩. আমাদের পেয়ারা নবীজিকেও আল্লাহ তাআলা আলাদা করে হুকুম করেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন (তোয়াহা : ১৩২)।

২৪. ইসমাঈল আ. নিজ পরিবারকে সালাতের আদেশ করেছেন। লুকমান করেছেন। আমাদের নবীজি সা.-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই তিন কুরআনি চিত্রের পাশাপাশি আমাদের বর্তমানের অবস্থা কল্পনা করি? কী আকাশ-পাতাল তফাত? আমরা কতটা বেপরোয়া হয়ে গেছি সালাতের ব্যাপারে? পরিবারকে সালাতে উঠিয়ে আনার ব্যাপারে?

২৫. এক ব্যক্তি বলেছিল, 'আপনারা হুজুররা ছোটখাটো ধর্মীয় বিষয়গুলোকে বড় করে দেখেন। আপনাদের চোখে আমরা যারা দুনিয়া নিয়ে আছি, তারা মোটেও ধর্ম-কর্ম পালন করি না। আমরা একেকজন জাহান্নামের চৌরাস্তায় বসে আছি সারাক্ষণ। দেখুন, বড় বড় বিষয় নিয়ে ভাবতে শিখুন। তাহলে দেখবেন, আমরাও কম ধার্মিক নই। ধর্ম-কর্মে আমরাও কম যাই না।'

২৬. এই বেচারার কথার সাথে যখন স্কুলটাইমের তোড়জোড় আর প্রেয়ারটাইমের নাক ডাকার তুলনা করি, পরিষ্কার একটি চিত্র বেরিয়ে আসে। মুসলিম সমাজ কতটা ধার্মিক, তা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। সমাজের ধর্মীয় চিত্র বের করার জন্যে, এই দুটি সময়ের তুলনার কোনও বিকল্প নেই।

২৭. আমরা আপাতত দাড়ির কথা বলছি না। বলছি না গান-বাদ্যের কথাও। এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা বলছি, ইসলামের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক সালাতের কথা। নবীজি সা.-এর রূহ কবজ হচ্ছে, তখনও তিনি (الصلاة . الصلاة) সালাত সালাত (বারবার) বলে, উম্মতকে ওসিয়ত করে গেছেন। এটিই ছিল নবীজির সর্বশেষ কথা।

২৮. মুসলিম নামধারী অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করে, সালাত-বিষয়ক আলোচনা করবে ওয়াজকারী ও পীর-দরবেশরা। তাদের মতো 'উঁচু চিন্তার' অধিকারী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সালাতের মতো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা শোভা পায় না। তারা কেন সালাত নিয়ে আলোচনা করে, তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে? পৃথিবীতে আলোচনা করার মতো বিষয়ের অভাব পড়েছে? তারা মুক্তচিন্তার মানুষ। তারা আলোচনা করবে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তারা তাদের কফি হাউজের আড্ডায় বা ক্যাফেটেরিয়ার চাড্ডায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘণ্টা কে ঘণ্টা গুলতানি মারছে। সেসব গালগপ্পিতে, আখিরাত তো বহুত পরের কথা, দুনিয়াতেও কোনও ফায়েদা নেই।

২৯. হ্যাঁ, তারা ধর্মকে নিয়েও আলোচনা করে বৈ কি। ইউরোপিয়ান কেউ বা নাস্তিক কেউ ইসলাম ও মুসলমানকে কটাক্ষ করে কিছু লিখলে, তারা সেটাকে সাদরে বরণ করে নেয়। সেটা নিয়ে আলোচনা করে। নাস্তিক বা প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে, সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, মোল্লারা তাদের কাছে এতদিন ধর্মের অনেক তথ্য লুকিয়ে রেখেছে। এবার সত্যটা প্রকাশ পেয়েছে। এই বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীরা, ধর্ম নিয়ে সন্দেহ, শরিয়তের বিধানের বিকৃতি, নবী সা.-এর চরিত্র হনন ও ইসলামি ইতিহাসের বিকৃতির চর্চার নাম দিয়েছে 'মুক্তচিন্তার চর্চা'। ভাবান্দোলন। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। চিন্তার আন্দোলন।

৩০. ৯০-বারেরও বেশিবার সালাতের আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান, আজ আমাদের সমাজে গৌণ হয়ে পড়েছে। মুসলিম চিন্তক, আলোচকদের কাছে সালাত হয়ে পড়েছে অবহেলিত। অথচ দুনিয়া আখিরাত উভয়টার সাফল্য নিহিত রয়েছে সালাতে। আত্ম-চিত্ত সংশোধনও রয়েছে এই সালাতে। সমাজ-রাষ্ট্র সংশোধনও রয়েছে এই সালাতে।

৩১. একজন মানুষের কলবে কতটুকু দ্বীন আছে আর কতটুকু দুনিয়া আছে, সেটা বোঝার জন্যে জটিল কোনও কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে না। কুটিল কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে না। শুধু ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। তার প্রেয়ারটাইম আর স্কুল বা ওয়ার্কটাইম যাচাই করে দেখতে হবে। গড়গড় করে সমাধান বেরিয়ে আসবে।

৩১. এই আয়াতটা নিয়েও একটুখানি ভাবতে পারি,

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো এমন লোক, যারা নামাজ নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সাক্ষাৎ পাবে (মারইয়াম : ৫৯)।

৩২. আমি সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করে যেতে না পারলে, আমার সন্তান সালাতকে নষ্ট করবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। তার শাস্তি ভোগ করতে হবে আমাকেও। আখিরাতে আমাকে 'গাই' জাহান্নামি গর্তে ফেলা হবে।

৩৩. কোনও অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যাবে না। নিজের সালাতও না, সন্তানের সালাতও না। যত কাজই থাকুক, যথাসময়ে সালাত আদায় করেই ফেলতে হবে। সন্তানকেও এতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কাজ-কারবার, চাকরি-বাকরি, ক্ষেত-খামারি, চাষাবাদ, বাবা-মার সেবা, জনসেবা, দ্বীনের সেবা, কোনও কিছুর জন্যেই সালাতকে ছাড়া যাবে না। এমনকি এসবের জন্যে সালাতকে পেছানোও যাবে না। সময় হলে সালাত আদায় করে তবে দ্বীনের সেবায় নামতে হবে। কোনও কোনও ইমাম এমনও বলেছেন, কেউ যদি বলে,

'আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত, সূর্য ডুবে যাক,
সমস্যা নেই, আমি পরে পড়ে নেব'।

এমন ব্যক্তিকে খলিফা চাইলে হত্যা করতে পারবে।

৩৫. নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার কথা বললে, একদল 'আলোকিত' মানুষ বলে,

'আমরা ধর্মকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে মুসলমানদের দুনিয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছি'।

আমরা বলি, সালাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করলে, দুনিয়া নষ্ট করা হয়ে যায়? ইসলামের শক্তিশালী স্তম্ভ সালাতই যদি না রইল, তাহলে দ্বীনের বাকি রইলটা কি?

৩৬. কেউ কেউ আবার বলে, 'সালাত নিয়ে এত উঠেপড়ে লাগার কিছু নেই। অফিস আওয়ারে সালাত পড়লে কাজ করবে কখন'?

তারা আরও বলে, 'মুসলমানদের দ্বীনদারিতে কোনও সমস্যা নেই। বেশ আর কম সবাই ধার্মিক। মুসলমানদের সমস্যা হলো 'দুনিয়ায়'। তারা দ্বীন পালন করতে গিয়ে দুনিয়াতে পিছিয়ে পড়েছে'।

আমরা বলি, 'মুসলমানরা মোটেও দ্বীন পালন করতে গিয়ে দুনিয়া বিনষ্ট করে ফেলেনি। ব্যাপারটা বরং সম্পূর্ণ উল্টো। মুসলমানরা দ্বীন বাদ দিয়ে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়েই দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টা খুইয়ে বসেছে। মুসলমানদের দ্বীনের

হালত কতটা শোচনীয়, সেটা প্রেয়ারটাইম আর স্কুল-ওয়ার্কটাইমের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে'।

বাবার ডাক

এক পরিচিত জনের বাড়িতে বিশেষ কাজে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাতে থাকা পড়ল। ঘুমুতে ঘুমুতে অনেক রাত। এক ঘুমে ফজর। ঘুম ভাঙার পরও শুয়ে আছি। সবে আজান হয়েছে। মেজবানের বাড়ি মসজিদসংলগ্ন। গৃহকর্তার আওয়াজ ভেসে এল। তিনি কোমল স্বরে কলেজপড়ুয়া ছোট ছেলেকে ডাকছেন। এখনকার ছেলে যেমন হয়, সারারাত জেগে শেষ রাতে ঘুমুতে যায়। কলেজীও ব্যতিক্রম নয়। হয়তো একটু আগে বালিশে মাথা ছুঁইয়েছে। কাঁচা ঘুম সহজে ভাঙার নয়। বাবা পইপই করে বলেন, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে। এই বয়েসে বেশি শাসনও করা যায় না। হিতে বিপরীত হতে পারে। আর সন্তানদের প্রতি কঠোর আচরণ করা বাবাটির স্বভাবও নয়। নরম তবিয়তের মানুষ। তবে লাগামহীন নন। সন্তানদের তারবিয়তে হরক্ষণ চৌকান্না থাকেন। বড় ছেলেগুলোকে নিয়ে চিন্তা নেই। সবার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা নামাজ আদায় করে। ছোটটাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। সব ঠিক আছে, শুধু ফজরের সময় বোমা মেরেও তোলা কঠিন হয়ে যায়। বিছানার সাথে সুপার গ্লু দিয়ে সাঁটানো থাকে যেন।

আমি কান পেতে উৎকর্ণ হয়ে আছি। বাবা মোলায়েম স্বরে সন্তানকে ডেকে চলেছেন। আমি মেহমান হয়েছিলাম মেজো ছেলের। ছোট ছেলে আরেক রুমে। বাবা সন্তানকে ডেকে দেওয়ার জন্যে রীতিমতো আয়োজন করে বসেছেন। চেয়ার নিয়ে বসেছেন ছেলের দরজার সামনে। হাতে তাসবিহ। আওয়াজ করে করে জিকির করছেন। একটু পর পর আদর করে ছেলের নামকে সংক্ষেপ করে 'ওবু' 'ওবু বাবা' করে ডাকছেন। মিষ্টি স্বরে। সন্তানকে ডাকার জন্যে বাবার আন্তরিক প্রয়াস দেখে মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠল।

এক দুই মিনিট নয়, পাঁচ মিনিটও নয়, কখনো দশ মিনিট, কখনো পনেরো মিনিটও গড়িয়ে যেত। কিন্তু বাবা একটুও অধৈর্য না হয়ে, একটুও না রেগে পরম স্নেহে ছেলেকে ডেকে চলতেন। আমি শুধু ওই অসাধারণ বাবাটির 'ফজরি' শোনার জন্যে আরও কয়েকবার বিভিন্ন ছুতোয়, যেচে গিয়ে ওই বাড়িতে 'তুফাইলি' হয়েছি। কয়েকবারের পর্যবেক্ষণে বুঝতে পেরেছি, বাবার ডাক কয়েক ধাপে সমাপ্ত হয়।

প্রথম ধাপেঃ নাম ধরে ডাকেন। মৃদু স্বরে। থেমে থেমে। উনি কর্মজীবনে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। ঢাবি থেকে অনার্স-মাস্টার্স করা। এ-ব্যাপারে তার নিজস্ব যুক্তি ছিল। প্রথমেই হাঁক-ডাক করা যাবে না। ধীরে ধীরে ডেকে 'ধ্বনির' একটা তরঙ্গ তৈরি করতে হবে। সেই ধ্বনিতরঙ্গ-আস্তে আস্তে ঘুমন্ত ব্যক্তির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তির সুপ্ত চেতনার সাথে কমিউনিকেশন তৈরি করবে।

আমি ভীষণ অবাক হলাম সন্তানকে ফজরে ডাকার জন্যে একজন বাবার এত গভীর অনুধ্যান দেখে।

দ্বিতীয় ধাপ: জোরে জোরে জিকির শুরু করেন। বাবার যুক্তি হলো, শয়তান ছেলের ঘুম ভাঙতে দিচ্ছে না। আমার ছেলে খুবই ভালো। ছেলেটা ইচ্ছা করে ফজরের জামাত বাদ দেবে, এটা মোটেও বিশ্বাস্য নয়। জোরে জোরে ইস্তেগফার করেন। কালিমা পড়েন। দুরুদ পড়েন। বাবা শুধু যুক্তিই নয়, কথাগুলো জোর আওয়াজেও বলেন,

'আমাদের 'ওবু' এমন নয়। সে আসলে 'ওদো' পাচ্ছে না। জেগে থাকলে কত আগে ওঠে মসজিদে চলে যেত। ও আল্লাহ! আমার ছোট বাবাটাকে জাগিয়ে দিন। তাকে জামাত ধরার তাওফিক দিন। তার চারপাশ থেকে শয়তানকে দূর করে দিন।'

তৃতীয় ধাপ: এই ধাপে বাবা শুরু করেন জামাতের ফজিলত-বিষয়ক ওয়াজ। সালাত-বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত পড়েন। হাদিস পড়েন। তরজমাও করেন। অল্পস্বল্প ব্যাখ্যা করেন। সবই করেন তার অভ্যেসমতো তাবলীগি বয়ানের খান্দানি রীতিতে। থেমে থেমে। অত্যন্ত কোমল আর আন্তরিক ভঙ্গিতে।

এই পর্যায়ে ছেলের পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। বাবা অবশ্য তাতে ক্ষান্ত হন না। ছেলেকে অজু-ইস্তিঞ্জা করিয়ে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যান। না হলে, বাবা বের হলেই ছেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

একবার অবশ্য ভিন্ন চিত্রও দেখেছি। সেদিন বোধ হয় ছোট সাহেব একটু বেশি পরিমাণেই রাত জেগে ফেলেছিলেন। কিছুতেই ঘুম ভাঙছিল না। এদিকে জামাতের সময় হয়ে গেছে। মুয়াজ্জিন সাহেব জামাতের আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে, ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন। আমরা সবাই বের হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। সুন্নত পড়া শেষ। বাবা পেরেশান। তাকবিরে উলা ছুটে যায় কি না। ছেলের ঘুম ভাঙার নামগন্ধ নেই। হঠাৎ ধুপধাপ আওয়াজ হলো। রীতিমতো হুড়োহুড়ি অবস্থা। দুদ্দাড় করে আমাদের কামরার দরজা খুলে গেল। ছোট সাহেব হুড়মুড় করে কামরায় ঢুকে হাঁপাতে লাগল। চোখে ঘুম, মুখে লাজুক দুষ্টু হাসি, হাতে লুঙ্গি, পরনে কাঁথা।

কী হলো, কী হলো? আর কিছু না, বাবার এত ধৈর্যভরা ডাক শুনেও গুণধর ছেলে উঠছে না দেখে, মা চুলা থেকে চেলাকাঠ নিয়ে তেড়েফুঁড়ে এসেছেন। ছেলে জান নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। বাবা এসে ছেলেকে রীতিমতো সামরিক নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে গেলেন। মায়ের চেলাকাঠ থেকে বাঁচিয়ে।

বাসায় মাস্তুরাত জামাত আসত। সবাই অবাক হয়ে যেত বাপ-বেটার এমন মধুর প্রভাতীগাঁথা দেখে। বাবার এমন অনুপম আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করত। একবার

গিয়েছিলাম, তখন বাবা-মা দুজনেই মাস্তুরাতে গেছেন। বাসায় শুধু ছেলেরা। অবাক হয়ে দেখলাম, ছোটবাবু সময়মতো জামাতে শামিল হয়েছেন। খুব বেশি ডাকাডাকি করতে হয়নি।

বাবার সাথে কথা বলেছিলাম। ফজরের জন্যে সন্তানকে এত কোমলভাবে ডাকার প্রেরণা তিনি কোথায় পেয়েছেন? অসাধারণ বাবাটির অবিস্মরণীয় উত্তর—

'আমি সৌভাগ্যক্রমে একবার আরব জামাতের সাথে পড়লাম। আমাদের আমির ছিলেন এক জর্ডানি অধ্যাপক। তিনিই একদিন মাগরিবের পর আম বয়ানে, তার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। এর স্বপক্ষে একটা আয়াতও বলেছিলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন (তোয়াহা : ১৩২)।

আমির সাহেব বলেছিলেন, আমি যখন প্রথম প্রথম তাবলীগে এলাম, পেরেশান হয়ে গেলাম। বাচ্চাদেরকে কীভাবে নামাজি বানাব এই চিন্তায়। এই মেহনতে শামিল হওয়ার আগে আমাদের ঘরের কেউ নামাজ আদায় করত না। জুমা পড়ত শুধু। যাক, আল্লাহর রহমতে বাচ্চারা আমার ডাকে সাড়া দিল। বাচ্চাদের মা অবশ্য আগে থেকেই কিছুটা ধার্মিক ছিল। আমাদের পাল্লায় পড়ে সাময়িক পিছিয়ে ছিল। সমস্যা দেখা দিল ফজরের জামাতে। বাচ্চারা কিছুতেই উঠতে চাইত না। আমাদের আমির ছিলেন এক পাকিস্তানি আলিম। তার কাছে পরামর্শ চাইলাম। তিনিই আমাকে আয়াতটা পড়ে নসিহত করেছেন। আমাকে ধৈর্য ধরে জাগাতে বলেছেন। নরমকোমল আওয়াজে বয়ান করতে বলেছেন। সবরের সাথে কাজ করে গেলে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বরকত দেবেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত (যুমার : ১০)।

পাকিস্তানি হজরত বলেছিলেন, আপনি যে বিষয়ে সবর করবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সেই বিষয়ে হিশাব ছাড়া প্রতিদান দেবেন। অন্য বিষয়ে তো দেবেনই। আপনি সন্তানকে ধৈর্য ধরে ডাকলে, প্রথম প্রথম বিরক্তি লাগলে, একসময় অনেক বরকত আসবে। ছেলে নামাজি হয়ে যাবে। ঘরওয়ালি নামাজি হয়ে যাবে। মহল্লাওয়ালে ভী নামাজি বন জায়েগা। ইনশাআল্লাহ।

সেই অসাধারণ বাবার সাথে ফজর পড়ে ঘরে ফিরছি। হাসতে হাসতে বিবির চেলাকাঠের ব্যাখ্যাও দিলেন,

'সে (বিবি) বয়ানে হাদিস শুনেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,

مُروا أولادَكم بالصلاةِ، وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضربُوهم عليها وهم أبناءُ عشرِ سنينَ.

তোমরা সন্তানদের বয়েস সাত হলে তাদের নামাজের আদেশ করো। বয়েস দশ হলে, (প্রয়োজনে চেলাকাঠ দিয়ে) প্রহার করো -আবদুল্লাহ বিন উমার রা.।'

বাবা রসিক ছিলেন। তিনিই তরজমার সময় চেলাকাঠ ব্যবহার করেছিলেন। আমি ভাবি, নিজে হলে কোন ভূমিকা নিতাম? তাঁর মতো বাবা হতে পারব তো? কুরআন কারিমের আয়াত মেনে? সবরের সাথে? নাকি শুরুতেই 'চেলাবাবা' বনে বসব?

তাগাফুল: অপূর্ব কুরআনি আখলাক

শুধু কি কুরআনি? নববি আখলাকও বটে।

সালাফে সালেহীনের আখলাক। বুজুর্গগণের আখলাক।

তাগাফুল (التغافل) সুখী সংসার ও সুখী জীবন গড়ার অন্যতম প্রধান 'হাতিয়ার'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-কে বলা হলো,

'অমুক ব্যক্তি বলেন, তাগাফুল উত্তম আখলাক বা সুখী ও সুস্থ জীবনের দশভাগের নয়ভাগ।'

'উঁহু, সুস্থ সুখী জীবনের পুরোটাই 'তাগাফুলে' নিহিত'।

হাসান বসরী রহ. বলেছেন,

'তাগাফুল মহৎ ব্যক্তিগণের 'আখলাক'।

তাহলে তাগাফুল মানে কী?

গাফেল থাকার ভান করা। জেনেও না জানার ভান করা। দেখেও না দেখার ভান করা। কারো দোষত্রুটি দেখার পরও এড়িয়ে যাওয়া। কুরআন কারিমে তাগাফুলের কিছু নমুনা আছে,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

এবং স্মরণ কর, যখন নবী তার কোনও এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। তারপর সেই স্ত্রী যখন সে কথা (অন্য কাউকে) বলে দিল এবং আল্লাহ তা নবীর কাছে প্রকাশ করে দিলেন, তখন তিনি তার কিছু

অংশ জানালেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন। তখন সে (স্ত্রী) বলতে লাগল, আপনাকে একথা কে জানাল? নবী বললেন, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবগত (তাহরীম : ৩)।

لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে (মায়িদা : ১০১)।

অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। অহেতুক প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ

তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বলল, এ ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ (ইউসুফ : ৭৭)।

ছোট ভাইয়ের সামানার মধ্যে হারানো পানপাত্র পাওয়া গেল। বড় ভাইয়েরা ফস করে বলে দিল, সে (বিন ইয়ামিন) যদি চুরি করে তবে (আশ্চর্যের কিছু নেই)। কেননা এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল। ডাহা মিথ্যা অপবাদ। তারপরও ইউসুফ আ. এড়িয়ে গেলেন। বিষয়টা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না। ভাইদের দোষকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলেন।

সূরা তাহরীমে আমাদের নবীজি সা.-এর আচরণে চমৎকার তাগাফুল ফুটে উঠেছে। নবীজি প্রতিদিন আসরের পর প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে কিছু সময় কাটাতেন। একদিন যায়নাব রা.-এর ঘরে গেলেন। আম্মাজান নবীজিকে মধু দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তারপর আয়েশা ও হাফসা রা.-এর কাছে গেলেন। তারা দুজনেই জানতে চাইলেন,

'আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন'?

মাগাফির এক প্রকার উদ্ভিদ। তাতে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে।

নবীজি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন,

'কই না তো'!

'তাহলে আপনার মুখে গন্ধ কীসের'?

স্ত্রীদ্বয়ের কথা শুনে, নবীজির মনে সন্দেহ উদ্রেক হলো, যয়নবের ঘরে যে মধু পান করেছেন, তাতে মৌমাছি হয়তো মাগাফিরের রসও রেখেছিল। তাই মুখে গন্ধ লেগে আছে। মুখে গন্ধ থাকা নবীজির বেজায় নাপছন্দ ছিল। তিনি কসম করে বললেন,

'আর কখনও মধু পান করবেন না'।

আরেক বর্ণনায় আছে, নবীজি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে হাফসাকে বলেছিলেন,

'তুমি কাউকে বলো না, উম্মে ইবরাহিম (মারিয়া কিবতিয়া) আমার জন্যে হারাম'।

'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, আপনি তা নিজের উপর হারাম করছেন'?

'আল্লাহর কসম সে (মারিয়া) আমার জন্যে হারাম'।

নবীজির কসমের কথাটা শুধু হাফসা রা. জানতেন। তাকে বিষয়টা গোপন রাখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আয়েশা রা.-এর কাছে বলে ফেলেছিলেন। দুই বিবির গোপন কথাবার্তার বিস্তারিত সংবাদ আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে নবীজিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পরে নবীজি হাফসাকে বিষয়টা রেখেঢেকে জানিয়েছেন। হাফসা অবাক। তার আর আয়েশার গোপন কথা নবীজি কীভাবে জেনে ফেললেন? তারা দুজনে আরও কত কথা বলেছেন, সবই কি নবীজি জেনে ফেলেছেন? লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই বোধ হয়, নবীজি ওহির মাধ্যমে যা জেনেছেন, তার সবটা হাফসাকে বলেননি। এটাই তাহরীমের তৃতীয় আয়াতে আলোচিত হয়েছে। নবীজির এই চমৎকার আদর্শ (তাগাফুল) থেকে আমাদের শেখার কী আছে?

১. তাগাফুল অর্থ কিন্তু এই নয়, একদম বেখবর হয়ে থাকা। ওটা বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। মুমিন কেমন হবে? চমৎকার একটা হাদিস পড়তে পারি,

المؤمنُ غرٌّ كريمٌ، والفاجرُ خبٌّ لئيمٌ

ক. মুমিন ধোঁকা খেয়েও মহত্ত্ব বজায় রাখে (আবু দাউদ)।

ঈমান মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অন্তরের বিশুদ্ধতা আচরণেও প্রকাশ পায়। গিরর (الغِرّ) যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি সুধারণার কারণে ধোঁকা খায়। মনে করে, তাকে কেউ ঠকাবে না। তাই তার কথাবার্তা হয় একজন কারিম (كريم)-এর মতো। মহৎ মানুষের মতো। ক্ষুদ্রতার লেশমাত্র থাকে না।

খ. ফাজের বা পাপী ব্যক্তি হয় নীচ ধোঁকাবাজ।

ফাজের ব্যক্তির কাজই হলো মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। হীন আর নীচ আচরণ করে মানুষের অনিষ্ট সাধন করা। আশেপাশে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ানোই তার স্বভাব।

গ. হাদিসে নবীজি কারিম (كريم) শব্দটা ব্যবহার করেছেন। মুমিন কারিমই হয়ে থাকে। মহৎ হয়ে থাকে। কোনও ধরনের ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে থাকে না। কারিম

মানে? যে ক্ষমা করে। উদারতা দেখায়। তার মানে, মুমিন আশপাশ সম্পর্কে বেখবর থাকবে না। তবে সাধ্যানুযায়ী ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাবে।

২. মুমিন কারিম হবে। পাশাপাশি সচেতনও হবে। আশপাশ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকবে না। নবীজি বলেছেন,

لا يُلدَغُ المؤمنُ مِن جُحرٍ واحدٍ مرّتَين

মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার ছোবল খাবে না (বুখারি : ৬১৩৩)।

ক. মুমিন সদা সতর্ক থাকবে। তার সহজ-সরলতার সুযোগে কেউ বারবার ধোঁকা দিয়ে পার পেয়ে যাবে, এমনটা হওয়া উচিত নয়। একই ভুল বারবার করবে, এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। হতেই পারে না। হওয়া উচিত নয়। এটা দুনিয়াবি বিষয়ে যেমন প্রযোজ্য, দ্বীনি বিষয়ে আরও বেশি প্রযোজ্য।

খ. বদর যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল বিশিষ্ট কবি আবু ইজ্জাহ। লোকটা কবিতায় লোকজনকে নবীজির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলত। নবীজির কুৎসা রটনা করত। তারপরও নবীজি তার প্রতি বেশ অনুগ্রহ করেছিলেন। আর কখনো এমন কবিতা রচনা করবে না, এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা, ওই ব্যাটা মুক্ত হয়ে আগের মতোই লাগামহীন কবিতা রচনা করতে শুরু করল। ওহুদ যুদ্ধে খবিস কবি আবার ধরা পড়ল। কাকুতি-মিনতি করে নবীজির কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করল। তখন নবীজি তার এই বিখ্যাত হাদিসটি বলেছিলেন।

গ. মুমিন একই ভুল বারবার করবে না। আগের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। নবীজির হাদিস থেকে আমরা এই শিক্ষাটাই পাই।

৩. তাগাফুল শব্দের মধ্যে দুটি বিষয় আছে,

ক. জানা।

খ. জেনেও না জানার ভান করা।

এখন প্রশ্ন হলো, পুরোপুরি না জানার ভান করে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবে?

নবীজি কিন্তু পুরোপুরি এড়িয়ে যাননি। তিনি কিছু জানিয়েছেন, কিছু গোপন রেখেছেন।

৪. কতটুকু প্রকাশ করবে, কতটুকু এড়িয়ে যাবে, সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। অপর পক্ষ বেশি বাড়াবাড়ি করলে, তাগাফুল করা ক্ষতিকর। বরং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।

৫. তাগাফুলে সাময়িক কষ্ট হলেও, আখেরে লাভের পাল্লা অনেক ভারী হয়। আমার সামান্য তাগাফুলের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় সম্পর্কও টিকে যাবে।

৬. অনেক দুষ্টলোক আছে। তার জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো হিম্মত বা কুউয়াত কোনওটাই আমার নেই। তখন পুরোপুরি তাগাফুল করাই হিতকর।

৭. দূরের মানুষের চেয়ে নিকটজনের ব্যাপারেই তাগাফুল বেশি প্রয়োজন। স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, পরিচারক, ছাত্র, সহকর্মী, প্রতিবেশী। এদের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাগাফুল করাই সামাজিক সহাবস্থানের জন্যে বেশি সহায়ক।

৮. স্বামী বা স্ত্রী একই ভুল বারবার করছে, সহ্য ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তাগাফুল করা অনেক জরুরি। সে সংসারে যত বেশি তাগাফুল, সে সংসার তত বেশি সুখী। কথায় কথায় দোষ ধরা, যখন তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে সংশোধনের চেষ্টা করা, দাম্পত্য জীবনে কলহ বাড়িয়ে তোলে।

৯. পকেট থেকে টাকা সরাচ্ছে? কাছের কেউ? থাক না। তবে পকেটে টাকাটা গুনে রাখলেই হয়। শুধু কোনও দিন সময় বুঝে কাঙ্ক্ষিতজন শোনে মতো করে বল, 'পকেটে এত টাকা ছিল, কোথায় যে পড়ে গেল' (এক পরিচিত জনের জীবন্ত তাগাফুল অভিজ্ঞতা)।

১০. এক মহিলা মাসয়ালা জানতে এল। হাতেম আসাম্ম (রহ.)-এর কাছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত বায়ুর আওয়াজ বেরিয়ে গেল। মহিলা লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। হাতেম রহ. এমন ভাব ধরলেন, যেন তিনি কিছুই শুনতে পাননি। কানে কম শোনার ভান করে বললেন, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলেছেন? জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না'। বেচারির লাজ ভাঙল। 'যাক, শুনতে পায়নি'। এই ঘটনার পর থেকে হাতেম রহ.-এর লকবই হয়ে গেল আসাম্ম (الأصم)। বধির। এই ছিল সালাফের আখলাক। তাগাফুল ছিল তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

১১. সন্তান লালন-পালনে, ছাত্র গঠনে, তাগাফুলের মতো শক্তিশালী আর কার্যকর মাধ্যম নেই। যে উস্তাদ যত বেশি তাগাফুল করতে পারেন, তার ছাত্র তত বেশি যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। যে পিতা বা মাতা যত বেশি তাগাফুল করতে পারেন, তাদের সন্তান তত বেশি উপযুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে। আবার বলছি, তাগাফুল মানে কিন্তু সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে থাকা নয়। তাগাফুল মানে পরিমিত পরিমাণে জানাটা প্রকাশ করা, পরিমিত পরিমাণে না জানার ভান করা।

১২. একজন 'কারিম (মহৎপ্রাণ) কখনো, নিকটজনকে জেরা করতে গিয়ে, সবকিছু জেনে ফেলার জন্যে বাড়াবাড়ি করেন না। অপরাধ যদি জটিল বা গুরুতর কিছু না হয়, 'কারিম' অল্পকিছু জেনেই অপরাধীকে সতর্ক করে ছেড়ে দেন।

১৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন,

'মুমিন সব সময় চেষ্টা করে, ওজর-আপত্তি গ্রহণ করে মাফ করে দিতে। মুনাফিক সব সময় চায় অন্যে ভুল করুক। তার পদস্খলন ঘটুক। তার পতন হোক'।

১৪. তাগাফুল কুরআনি সুন্নাহ। তাগাফুল নববি সুন্নাহ। কুরআন কারিম ও সুন্নাহ উভয়ের সমন্বয়ে বর্ণিত গুণাবলির মর্যাদা ও ওজন অনেক ভারী। তাই এই গুণ অর্জন করার জন্যে মেহনত করা, মুজাহাদা করা, সওয়াবের কাজ।

১৫. এই মহৎ কুরআনি গুণটি এক দিনে অর্জিত হবে না। দীর্ঘদিনের সাধনা ও প্রচেষ্টারই পরই এই নববি গুণটি অর্জন করা সম্ভবপর হবে। আমি যত বেশি এই গুণ অর্জন করতে পারব, তত বেশি সুখী হব। আমার ছাত্র তত বেশি যোগ্য হবে। আমার পরিবার তত বেশি সুখী হবে। আমার সন্তান তত বেশি ভালো হয়ে গড়ে উঠবে। আমার স্বামী বা স্ত্রী তত বেশি সুখী হবে।

সন্তান জন্মদানের লক্ষ্য

সন্তান হওয়ার আগে থেকেই কত পরিকল্পনা। ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, এই হবে, সেই হবে। আমার সন্তান আল্লাহর জন্যে হবে, এমনটা ভাবে কজন?

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে আপনার জন্যে উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি (সকল কিছু) শোনেন ও (সকল বিষয়ে) জানেন (আলে ইমরান : ৩৫)।

১. তারা সন্তান জন্ম লাভের আগেই, নিয়ত দুরস্ত করে ফেলেন। সন্তান বড় হয়ে কী করবে।

২. সন্তান হবে শুধুই আল্লাহর জন্যে। আল্লাহর দ্বীনের জন্যে। আখিরাতের জন্যে।

৩. ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েও দ্বীনের কাজ করা যায়। বাবা-মা সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর নিয়্যাত করে, আল্লাহর জন্যে কুরবান করতে পারেন। সেটা নির্ভর করবে আম্মু-আব্বুর নিয়্যাতের উপর। কজন আব্বু-আম্মু সন্তানকে আল্লাহর জন্যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন দেখেন?

৪. আব্বু-আম্মু নিয়্যাত না করলে কী হবে, আল্লাহর কী আজিব ফয়সালা! বর্তমানে ময়দানি মেহনতে অংশ নেওয়া বড়-ছোট অনেকেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। উভয় ঘরানাতেই একই অবস্থা।

৫. দুআর সাথে সাথে রাব্বে কারিম বান্দার পক্ষ থেকে প্রশংসা শুনতে চান। ইমরান রহ.-এর স্ত্রী মানে মারইয়াম আ.-এর আম্মুও তা-ই করেছেন।

৬. তার মানে সে সময় আকসা অঞ্চলে, বনী ইসরাঈলের ব্যাপক অধঃপতন স্খলন সত্ত্বেও, কিছু পরিবারে ঈমান-আকিদা ও দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থা বেশ পোক্ত ছিল। ঈসা আ.-এর নানির এমন কায়দাসম্মত দুআ দেখে এমনটাই মনে হয়।

৭. দ্বীনদার পরিবারগুলোতে, বিয়ে-শাদিও মনে হয় যাচাই-বাছাই করে দেওয়া হতো। দুই ভায়রার দিকে লক্ষ করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়।

ক. যাকারিয়া আ. ছিলেন ঈসা আ.-এর নানা, মারইয়ামের খালু।

খ. দুই হামজুল্ফ (ভায়রা)-এর একজন নবী। আরেকজন (ইমরান) ছিলেন নবীর নানা এবং মসজিদের আকসার ইমাম। বাবা অবশ্য কন্যা মারইয়ামের জন্ম দেখে যেতে পারেননি।

গ. ঈসা আ.-এর মামা ইয়াহয়া আ.ও নবী। মামা মানে মারইয়ামের খালাত ভাই।

৮. সন্তান জন্ম লাভের আগেই যদি, সন্তানকে আল্লাহর জন্যে 'নজরানা' দেওয়ার নিয়্যাত করা হয়, সে সন্তান অবশ্যই অবশ্যই নেক সন্তান হবে (ইনশাআল্লাহ)।

৯. কন্যাসন্তান? তো কী হয়েছে? মারইয়ামের মা কন্যাসন্তান দেখে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে কীভাবে আল্লাহর রাস্তার খাদেম হবে? ব্যাপারটা মনে মনেই রইল না, মুখ ফুটে উচ্চারণও করে ফেললেন,

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ

হে আমার প্রতিপালক! আমি যে কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম!

আক্ষেপের কারণ, কন্যাশিশুর প্রতি অবজ্ঞা নয়, সে সময়কার রেওয়াজ অনুযায়ী কন্যাশিশুকে মানত হিশেবে গ্রহণ করা হতো না।

১০. মায়ের এমন হাহাকার ভরা কথার উত্তরে আল্লাহ তাআলা কী বললেন?

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

আর ছেলে তো মেয়ের মতো হয় না!

১১. আল্লাহ তাআলা একথা বলে, বোঝাতে চেয়েছেন,

মারইয়ামের আম্মু! তুমি কী পুণ্যবতী কন্যা জন্ম দিয়েছ, তা তোমার জানা নেই। তুমি যে (গুণ ও মানের) পুত্র সন্তান কামনা করেছিলে, সে (গুণে-মানে) মারইয়ামের তুলনায় কিছুই নয়। সে হবে এক অসাধারণ ভাগ্যবতী ও মহিমাময়ী নারী। সেই সঙ্গে তার সত্তায় নিহিত আছে এক মহান নবীর অস্তিত্ব, যার জন্ম হবে কুদরতের অভূতপূর্ব এক নিদর্শন।

১২. আল্লাহর বিশেষ এক মহিমা! মারইয়ামের নানার দুই মেয়েই প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পরে বিশেষ দুআ আর নজরের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা উভয় ভায়রাকে সন্তান দিয়েছেন।

ইমরানকে দিয়েছেন 'মারইয়াম'।

যাকারিয়্যাকে দিয়েছেন বৃদ্ধ বয়েসে 'ইয়াহয়া'।

১৩. এই দুই বুজুর্গ পরিবারের ঘটনা থেকে একটা চমৎকার বিষয় বের হয়, দুই পরিবারই দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে সন্তান মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন।

১৪. কন্যা মানেই অপাঙ্‌ক্তেয় এমন নয়। পুত্র মানেই 'গর্বের ধন' এমনও নয়।

মজার কাকতাল

আলে ইমরানের আয়াতগুলো নিয়ে বুঁদ হয়ে আছি। সকালে নাস্তা হয়নি। ব্যবস্থা নেই। গরিবের আর কিছু না থাক, কুরআন আছে না। কুরআনই পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচার মোক্ষম উপায়। পড়তে পড়তে ৩৭ আয়াতে এলাম। আল্লাহ বলছেন,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا

যাকারিয়া যখনই তার কাছে তার (মারইয়ামের) ইবাদতখানায় যেত, তার কাছে কোনও রিজিক (খাবার ফলমূল) পেত!

যাকারিয়া অবাক হতেন, মেয়েটা এমন ফল কোথায় পায়? প্রশ্ন করলেন,

يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا

মারইয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে?

আয়াতটা শব্দ করেই পড়ছিলাম। এমন সময় কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই একজন তালিবে ইলম প্লেটভর্তি 'ফলমূল' নিয়ে কামরায় এল। চোখ ছানাবড়া। শিষ্যও মাশাআল্লাহ, সাথে সাথে উত্তর দিল,

هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ

এটা আল্লাহর নিকট থেকে!

আমার মুখ দিয়ে সাথে সাথে বের হয়ে এল আয়াতের শেষাংশ,

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিজিক দান করেন (আলে ইমরান : ৩৭)।

হোক না বড়ই, আনারস। আমার জন্যে এই মুহূর্তে এটাই অপরিমিত। অপ্রত্যাশিত।

বিধবার হাহাকার

১: স্বামী মারা গেছেন। সদ্য বিধবা মানুষটা প্রয়াত স্বামীর শোক কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। নিকটাত্মীয়রা অবাক। স্বামীর জন্যে শোক অবশ্যই থাকবে! তাই বলে এতটা? এতদিন পরও স্বামীর জন্যে লুকিয়ে চুরিয়ে আঁসু মোছা?

২: স্বামী 'তানজা'-র একটি ফরাসিমালিকানাধীন কফিশপে কাজ করতেন। তানজা মরক্কোর পর্যটনবহুল একটি শহর। ফ্রান্স আর স্পেন থেকে স্রোতের মতো পর্যটক এই শহরে বেড়াতে আসে। অনেক স্পেনিশ বংশীয় মানুষও বাস করে। বিধবা স্বামীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন,

'তার দোকানে সারাদিন ভিড় লেগেই থাকে। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে, এর আকর্ষণে সাগরের ওপার থেকে দলে দলে মানুষ বেড়াতে আসত। এত সুন্দর সুন্দর মানুষের সাথে দিনমানের পুরো সময় কাটালেও, ঘরে এলে তিনি একজন নিতান্ত সেই আগের যুগের গ্রামীন স্বামীদের মতোই থাকতেন। আমার মতো নিতান্ত সাধারণ গোবেচারা মানুষের সাথেও তিনি আচরণ করতেন 'রাজকন্যার' মতো। তিনি অনর্গল স্পেনিশ আর ফরাসি বলতে পারতেন। ইংরেজিও পারতেন। চমৎকার কফি বানাতে পারতেন। আমি আমাদের গাঁয়ের বারবারি ভাষা আর আরবি ছাড়া বেশি কিছু পারতাম না। যোগ্যতায় তার মতো গুণী মানুষের ধারেকাছেও ছিলাম না। বিয়ের প্রথম রাতে ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বাঁধাই করা একটি আয়াত আমাকে দেখিয়ে বলেছেন,

'আমার শায়খ তোমাকে এটা দেখাতে বলেছেন। শায়খ বলেছেন, আমি যদি এই 'আয়াতের' বিপরীত কিছু করি, তাহলে শায়খকে জানাতে। শায়খই আমাকে সব সময় আয়াতটা মনে রাখতে বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর (নিসা : ১৯)।

৩: আল্লাহর কসম! আমার স্বামী কখনোই এই আয়াতের বিপরীত কোনও আচরণ আমার সাথে করেননি। আমাকে গালি দেননি। আমার সাথে কখনো কঠোর বা রূঢ় আচরণ করেননি। আমার 'বারবারি' পরিবার নিয়েও অসম্মানসূচক মন্তব্য করেননি। অনেক স্বামী দুষ্টুমি করে স্ত্রীকে ক্ষেপানোর জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলে, তিনি তাও করেননি। তিনি আমার জীবনের একমাত্র ও শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। আহ, তার সাথে কাটানো জীবনটা কতইনা সুন্দর ছিল!

মহিলা 'ইমাম'

১. মহিলারা কি পুরুষেরও 'ইমাম' হতে পারবেন? জি, কুরআনে এমনটাই আছে। তবে কথা আছে।

২. কুরআন কারিমে ইমাম শব্দটা সর্বমোট ১২ বার উল্লেখিত হয়েছে। ৭টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে,

ক. কল্যাণ কাজের নেতা বা আদর্শ।

খ. শয়তান বা কাফিরদের নেতা।

গ. মানুষের আমলনামা।

ঘ. লওহে মাহফুজ।

ঙ. তাওরাত।

চ. সুস্পষ্ট প্রশস্ত রাজপথ।

৩. ইমাম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, মসজিদের ইমাম বা নামাজের ইমাম। এই প্রচলিত অর্থে 'ইমাম' শব্দটি কুরআন কারিমে একবারও ব্যবহৃত হয়নি।

৪. কুরআন কারিমের দুআগুলো সবার জন্যে। অবাধ। উন্মুক্ত। উদার। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে। দুআগুলো প্রতিটি মুমিনের জন্যে। এমনকি প্রতিটি মানুষের জন্যে। কাফেরও ইচ্ছে করলে কুরআন কারীমের দোয়াগুলো পড়তে পারে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কোনও কাফের ভক্তিভরে কুরআনের কোনও দোয়া পড়লে, তার ঈমান নসীব হয়ে যাবে। ইন শা আল্লাহ। কুরআন তো সবার জন্যে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করুন নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন (ফুরকান : ৭৪)।

৫. এই দোয়া নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। দোয়ার শেষাংশে আছে (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)। আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন। একজন নারীও মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারেন।

৬. ইমাম হতে হলে, মিম্বর মেহরাবে দাঁড়াতে হবে? এমন শর্ত কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও নেই। আমি ইমাম হতে পারি মুচকি হাসিতে। আমি ইমাম হতে পারি পরোপকারে। আমি ইমাম হতে পারি সবরে।

৭. হ্যাঁ, মসজিদে নামাজের ইমাম হতে হলে পুরুষ হওয়া শর্ত। ঈমানে, আমলে, সততায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, আদর্শে ইমাম হতে হলে, পুরুষ হওয়ার শর্ত নেই। একজন নারীও পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের, সমস্ত মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারেন। আদর্শ হতে পারেন। আম্মাজান আয়েশা রা. আমাদের ইমাম। উমার বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর সহধর্মিণী আমাদের ইমাম। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবায়দা আমাদের ইমাম। তারা আদর্শ দিয়েই আমাদের ইমাম হয়েছেন।

শিশু মুফাসসির

বিয়ে হয়েছিল এক ধনকুবেরের সাথে। বয়স্ক মানুষ। বাবা-মা টাকা-পয়সা দেখে বিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর আরও তিনটা বিবি আছে। আমাকে বাড়ি-গাড়ি সবই

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একজন তরুণীর মন কি শুধু বাড়ি-গাড়ি দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়? আমার ইচ্ছা ছিল ছোটদের স্কুলের শিক্ষক হওয়ার। স্বামীর সেটা মোটেও পছন্দ নয়। তিনি আমাকে শোপিস হিশেবে বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। তাও মেনে নেওয়া যেত। বিয়ের পর যদি স্বামীকেই কাছে না পেলাম, তাহলে বিয়ে করে কী লাভ? তিনি নানা কাজে বিভিন্ন শহরে দৌড়াদৌড়ি করেন। দিনের পর দিন তার দেখা নেই। এদিকে আমার জীবন-যৌবন সব শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সিদ্ধান্ত নিলাম, এভাবে জীবন কাটাব না। কিছু একটা করতেই হবে। স্বামীর অন্য আরো স্ত্রী থাকবে, সেটাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অন্তত তিন দিন পরপর তো তাকে কাছে পাওয়ার অধিকার আমার আছে? তিন দিন যদি পনেরো দিনে ঠেকে, কেমন লাগে? কোনও কাজকর্ম নেই। স্বামীকে পাওয়া যায় না, সন্তানও নেই, কী নিয়ে বাঁচি?

বাবা-মাকে ধরে অনেক কষ্টে 'তালাক' নিতে পেরেছি। বাচ্চাদের স্কুলের চাকুরির সুযোগ আগে থেকেই ছিল। সেখানে যোগ দিলাম। আল্লাহ তাআলা ভালো একটা বিয়ের সুযোগ করে দিলেন। ছেলে সন্তানও দান করলেন। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নিজেরাই একটা স্কুল খুললাম। শুরু হলো স্বপ্নের জীবন। আমরা দুজনে ঠিক করেছি, শুধু প্রাথমিক কয়েকটা ক্লাস নিয়েই আমরা কাজ করব। শেকড় গড়ায় থাকব।

ছেলেবেলা থেকেই কুরআন কারিমের প্রতি আমার খুব আগ্রহ। রিয়াদের বিভিন্ন কুরআনি হালকাগুলোতে আমি সুযোগ পেলেই অংশগ্রহণ করেছি। সে সুবাদে স্কুলের বাচ্চাদেরকেও কীভাবে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, সেটা নিয়ে দুজনে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। স্কুলে প্রতিদিন একটা ঘণ্টা কুরআন কারিম হিফজের জন্যে বরাদ্দ ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, কুরআন তাদাব্বুরের জন্যেও দৈনিক কিছু সময় আলাদা করে রাখব। প্রথম প্রথম আমাদের মনে বেশ দ্বিধা ছিল, বাচ্চারা কুরআনের তাদাব্বুরের প্রতি আগ্রহ পাবে তো? অন্য স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করেও ইতিবাচক কোনও সাড়া পাইনি। সবাই নিরুৎসাহিত করেছে। আমরা পিছপা হইনি। আল্লাহর উপর ভরসা করে শুরু করে দিয়েছি।

প্রতিদিন কোনও একটি বিষয় নিয়ে আমরা একটি বা দুটি আয়াত শোনাতাম। আশেপাশের ঘটনার আলোকে কুরআন কারিম থেকে আয়াত বের করে ছাত্রদেরকে পড়তে দিতাম। সহজ ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে দিতাম আল্লাহ তাআলা কী বলতে চেয়েছেন। তাদেরকেও উৎসাহিত করতাম আয়াত বের করার প্রতি। শিশুরা এটাকে খেলার মতো গ্রহণ করেছে। একটা আয়াত বলে তাদেরকে প্রশ্ন করতাম,

'বলো তো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কী বলেছেন'?

তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলত। নানা শিক্ষার কথা বলত। যে যার বুঝ মতো। কুরআন কারিম তাদাব্বুর শুরু করার পর থেকে, তাদের আচার-আচরণেও বিপুল পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। আগের দুষ্ট ছেলেটাকেও দেখতাম নিবিষ্ট মনে কুরআন কারিমের আয়াত নিয়ে সহপাঠীদের সাথে কথা বলছে। সে তার তাদাব্বুর জানাচ্ছে। তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

১. আগে মনে করতাম তাড়াতাড়ি পড়লে কুরআন কারিম দ্রুত মুখস্থ হয়। শিশুদেরকে তাদাব্বুরে অভ্যস্ত করাতে গিয়ে, তাদের ধীরে ধীরে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে বললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, আগের তুলনায় এখন তাদের মুখস্থের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

২. বড়দের চেয়ে শিশুরা কুরআন কারিম দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তাদের মধ্যে কুরআনি শিক্ষার প্রভাব বেশি কাজ করে। বড়দের চেয়ে শিশুরাই বেশি কুরআন মানতে আগ্রহী হয়।

৩. অন্য বিষয় পড়ানোর সময় ক্লাশরুমের অবস্থা আর কুরআন পড়ানোর সময়ের অবস্থা এক নয়। কুরআনের সময় শিশুরা বেশি শান্তশিষ্ট থাকে। ক্লাশরুম জুড়ে কেমন যেন একটা শান্তি শান্তি ভাবও বিরাজ করতে থাকে।

৪. অন্য পড়া একবারের বেশি পড়ালে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু কুরআন কারিমের একটা আয়াত বা ছোট্ট একটা সূরাকে বারবার পড়ালেও তাদের আগ্রহে ঘাটতি দেখা যেত না।

৫. অবশ্য তাদেরকে একটা কথা বারবারই বলে দিতাম, কুরআন কারিম নিজের ইচ্ছামতো মনের খুশিমতো ব্যাখ্যা করা গুনাহ। বড়দের কাছ থেকে শিখে শিখে কুরআন পড়তে হয়।

৬. আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষার অবস্থা অনেক ভালো। কুরআন তাদেরকে অনেক শক্তি জোগায়। অনেক সাহস দেয়। অনেক আশাবাদী করে তোলে।

মায়ের অবদান

আমি এখন হাঁটাচলা করছি। খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘোরাফেরা করছি। আনন্দে জীবন কাটাচ্ছি। মনেই থাকে না, আমার এই আনন্দের জন্যে একজন মানুষ কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। কত বিনিদ্র রজনি যাপন করেছেন। কত অসহ্য ব্যথা মুখ বুঝে সয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মায়ের এই সীমাহীন কষ্ট স্বীকারকে অনেক বড় মর্যাদার সাথে বিবেচনা করেন। তিনি কুরআন কারিমে মায়ের কীর্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মায়ের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

(কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে (লুকমান : ১৪)।

এখানে শুধু গর্ভে ধারণের কথা আছে। আরেক আয়াতে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের যন্ত্রণা উভয়টার কথা পাশাপাশি বলেছেন,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে (আহকাফ : ১৫)।

আমি বড় হয়ে গেলেও মায়ের কষ্টের কথা ভুলব না। কুরআন কারিম আমাকে বারবার মায়ের কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মায়ের অবদানের কথা ভুলে যেতে নিষেধ করছে। মায়ের হক আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে।

ব্যথার উপশম

আমরা অনেকভাবে কষ্ট পাই। কষ্ট শুধু শত্রুর পক্ষ থেকেই আসে না, বন্ধুর কাছ থেকেও কষ্ট আছে। শত্রুর কষ্টটা শারীরিক। বন্ধুর কষ্টটা বেশিরভাগ সময়ই মানসিক। আপনজনের দেওয়া কষ্টগুলো হৃদয়কে বেশি বিক্ষত করে। স্ত্রী, স্বামী, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া কষ্টগুলো হজম করে ফেলতে হয় অনেক সময়। পাল্টা জবাব না দিয়ে, চুপচাপ শুনে যেতে হয়। ক্ষমা করে দিতে হয়। উপেক্ষা করতে হয়।

মন থেকে ক্ষমা করতে না পারলে, অনেক সময় ভেতরে আস্তে আস্তে জন্ম নিতে থাকে 'হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, মানসিক অস্থিরতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য। এসব থেকে বাঁচার উপায় কী? কুরআন কারিম তিন জায়গায় এর সমাধান পেশ করেছে।

১. নিশ্চয় আমি জানি তারা যে সব কথা বলে, তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়। (তার প্রতিকার এই যে,) আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবিহ পাঠ করতে থাকুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন (হিজর : ৯৭-৯৮)।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

২. সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর করুন এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবিহ ও হামদে রত থাকুন এবং রাতের মুহূর্তগুলোতে তাসবিহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান (ত্বহা ১৩০)।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

৩. সুতরাং (হে রাসুল!) তারা যা কিছু বলছে, আপনি তাতে সবর করুন এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবিহ পাঠ করতে থাকুন (ক্বাফ : ৩৯)।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

তিনটা আয়াতে একটা বিষয় বেশ অবাক করা। তারা যা বলছে (يَقُولُونَ) বলার সাথে সাথে আদেশ করা হয়েছেঃ আপনি তাসবিহ পাঠ করুন (سَبِّحْ)। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবিব সা.-কে আদেশ করছেন:

মন খারাপ? তাসবিহ পাঠ করুন।
লোকে কটু কথা বলে? তাসবিহ পাঠ করুন।
মুনাফিকরা গালি দেয়? তাসবিহ পাঠ করুন।
মুশরিকরা পাগল বলে? তাসবিহ পাঠ করুন।
বেদুইনরা অপমানসূচক কথা বলে? তাসবিহ পাঠ করুন।
ইয়াহুদিরা অশ্লীল কবিতা লিখে? তাসবিহ পাঠ করুন।
তার মানে রাব্বে কারিম আমাকেও বলছেন,
বান্দা, মন ভালো নেই? তাসবিহ পাঠ করো।
আত্মীয়-স্বজন কষ্ট দিচ্ছে? তাসবিহ পাঠ করো।
স্বামী কষ্ট দিচ্ছে? তাসবিহ পাঠ করো।
স্ত্রী অবাধ্যতা করছে? তাসবিহ পাঠ করো।
শত্রু বদনাম ছড়াচ্ছে? তাসবিহ পাঠ করো।
গালি-গালাজ করে বিরুদ্ধে লিখেছে? তাসবিহ পাঠ করো।
তাসবিহ মুমিনের কলবকে শান্ত করে। মনোবেদনা দূর করে।
মনের ক্ষতস্থানে আরামের পরশ বোলায়!

কনিতা

বিয়ের আগে কত আগ্রহের সাথে নামাজ পড়া হতো। কী আন্তরিকতার সাথে রোজা রাখা হতো। নামাজে দাঁড়ালে শুধু মন চাইতো আরো পড়ি, আরো পড়ি। তিলাওয়াতে বসলে উঠতেই ইচ্ছে করতো না। মুনাজাতে হাত উঠালে, দুচোখ দিয়ে অঝোরে পানি বইতো। আর এখন? কোনও এবাদতেই আগের মতো মনের সায় পাই না। কোনওরকমে দায়সারা গোছের বন্দেগী। এ-নিয়ে তার মনে ভীষণ অস্থিরতা। স্বামীকেও বিষয়টা খুলে বলল। স্বামী কোনও সমাধান দিতে পারলেন না। দুজনে ঠিক করলো, সামনের বার মাস্তুরাত জামাতে গেলে আমির সাহেবের

স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নেবে। তিনি একটা সমাধান দিতে পারবেন। আগেও এমন হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করলে সমাধান পাওয়া যায়। তিনি না জানলে, অন্যদের কাছ থেকে হলেও জেনে নেন।

প্রতি মাসে তিন দিনের জন্যে বের হলে, সারাদিন অফিস করে বিকেলে মসজিদে ফেরা যায়। নিয়ম আছে। জামাতের রোখও ওভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক মাস পর মাস্তুরাতে গেলে, ছুটি নিতে হয়। জামাতের আমির সাহেব অফিসে যাওয়ার সুযোগ দিলেও, স্ত্রীকে রেখে স্বামী সাধারণত অফিসে যান না। ঘরে একনাগাড়ে খুব একটা থাকার সুযোগ হয় না। দ্বীনের আলোচনাও নিয়মিত হয়ে ওঠে না। হলেও ততটা গুরুত্ব থাকে না। নানাবিধ ব্যস্ততার তাড়া থাকে। জামাতে এলে স্বামী যতটা সম্ভব আমার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন।

প্রথমদিন তালিমে-তাসবিনে কেটে গেল। পরদিন ইনফেরাদি আমলের সময় সুযোগ এলো। আমীর সাহেবের স্ত্রীর কাছে কাছে সমস্যাটা খুলে বললাম,

'আমি বিয়ের পর আগের মতো আমলে স্বাদ পাই না। এটা কেন হয়'?

'স্বামীর প্রতি তোমার আচরণ কেমন? তার প্রতি তুমি কতটা যত্নবান'?

'কিছু মনে করবেন না, আমার ইবাদত-বন্দেগীর সাথে স্বামীর কী সম্পর্ক'?

'আছে আছে, নইলে কি আর এ-প্রশ্ন করি। হাদিসে আছে,

'মহিলারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা স্বামীর হক যথাযথ আদায় করে' (সহিহ তারগীব : ১৯৩৯)।

'তুমি ভেবে দেখো। তোমার কোনও আচরণ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কি না'।

'আমি স্বামীর হক আদায়ের চেষ্টা করি! তবুও হকগুলো কী কী একটু শুনে নিলে মিলিয়ে দেখতে পারতাম'

'সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ.। তার স্ত্রী বলেছেন,

'তোমরা রাজাদের সাথে যেভাবে কথা বলো, আমরা স্বামীর সাথে এমন আদবের সাথে কথা বলতাম'।

তার মানে স্বামীর সাথে কথা বলার সময় অত্যন্ত সম্মানের সাথে কথা বলা জরুরি। তার তার সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্কে না জড়ানো। তাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করা। তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখা।

একবার নবীজি সা.-এর কাছে এক মহিলা সাহাবি এলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন,

'তুমি বিবাহিতা'?

জি।

তার প্রতি তোমার আচরণ কেমন?

আমি তার আনুগত্য করার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি করি না।

সব সময় খেয়াল রাখবে, তুমি তার কেমন আচরণ করছো। সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম! (সহিহ তারগীব: ১৯৩৩)।

একটু সময় নিয়ে সুস্থির হয়ে চিন্তা করবে। তুমি কেমন স্ত্রী। স্বামীর অনুগত? তাহলে জান্নাত। স্বামীর অবাধ্য? তাহলে জাহান্নাম। আয়াতটা পড়েছ কখনো?

কোন আয়াত?

'সূরা নিসার, নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে (৩৪),

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ '

এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা বলেছেন,

'অনুগতা (কানিতাত) মানে? স্বামীর প্রতি অনুগতা। এখানে শব্দটা লক্ষণীয়। সাধারণত অনুগতা বোঝানোর জন্যে বলা হয় (তই'আত)। এখানে শব্দটা না বলে তার পরিবর্তে বিশেষ শব্দ বলা হয়েছে। কা-নিতাত (قَٰنِتَٰتٌ)। কুনূত অর্থ, পরিপূর্ণ আনুগত্য। সর্বান্তঃকরণে আনুগত্য। শতভাগ পরিপূর্ণ আনুগত্য। মানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আনুগত্য করতে হবে। নইলে আল্লাহ তাআলা তই'আত (طائعات) দিয়েই কাজ সারতেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, একজন স্ত্রী কখন 'কনিতাহ' বলে বিবেচিত হবে? হাদিসে তার একটা মানদণ্ড আছে। তুমি চাইলে নিজেকে সেই নিক্তিতে ওজন করে নিতে পারো।

১. স্বামী কিছুর আদেশ করলে, তা মান্য করে।
২. তার দিকে তাকালে স্বামী মনে প্রফুল্লতা অনুভব করে।
৩. স্বামী তার ব্যাপারে শপথ করলে, সে তা পুরো করে।
৪. স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে (ইবনে মাজাহ)।
৫. স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় কোনও কাজ করে না।
৬. স্বামীর অপছন্দের কোনও খাতে ব্যয় করে না।
৭. স্বামীর ইচ্ছার কমবেশ করে না।

এমন স্ত্রীকেই হাদিসে বলা হয়েছে 'সালিহা'। শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

নবীজি আরও বলে গেছেন,

আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের নারীদের সম্পর্কে বলবো?

অবশ্যই বলুন ইয়া রাসুলাল্লাহ।

তারা হবে, অধিক প্রেমময়ী। অধিক সন্তানবতী। বারবার স্বামীর কাছে আসবে। যখন সে রাগ করবে, বা কষ্ট পাবে। অথবা স্বামী তার প্রতি কোনও কারণে রাগ করবে, তখন স্বামীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলবে,

এই যে আমার হাত আপনার হাতে। আপনি খুশি না হওয়া পর্যন্ত চোখে সুরমাও দেব না (আর কোনও কাজ করবো না) নাসাঈ। সহিহ তারগীব: ১৯৪১।

একজন 'সলেহা' স্ত্রী কখনোই নবীজির হাদিসটা বিস্মৃত হতে পারে না,

আল্লাহ তাআলা এমন নারীর দিকে তাকান না, যে তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না (নাসাঈ)।

কনিতা হতে হলে, সলেহা হতে হলে, ভুলে গেলে চলবে না,

আমি যদি কোনও মানুষকে সিজদা দিতে হুকুম করতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম, তার স্বামীকে সিজদা করতে (তিরমিজি)

তুমি কি বুঝতে পারছো, তোমার আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তোমার প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট থাকা? তুমি যতই ইবাদত-বন্দেগী করো, তোমাকে মনে রাখতে হবে এহটা হাদিস,

স্বামীর হক পুরোপুরি আদায় করা ছাড়া, একজন স্ত্রী আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না (সহিহ তারগীব:১৯৪৩)।

পাশাপাশি এই হাদিসটাও পড়ে রাখতে হবে,

দুই ব্যক্তির সালাত তাদের কাছ থেকে যাবে না,

ক. মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া দাস ফিরে আসা পর্যন্ত।

খ. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত (সহিহ তারগীব: ১৯৪৮)।

ইলম শেখার বহু মাধ্যম আছে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে আমল আনতে হলে, মাস্তুরাত জামাতে বের হওয়া অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। দ্বীনের সঠিক বুঝ আনার অনেক উপায় আছে। নামাজ শেখারও সহজ রাস্তা আছে। কিন্তু নামাজে খুশু-খুজু বা গভীর মনোযোগ আনতে হলে, মাস্তুরাত জামাত বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বামী ও সন্তানের হক আদায়ের উপায় জানতে, বাজার থেকে একটা বই কিনে আনলেই হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টাকে নিজের সার্বক্ষণিক চিন্তায় ও নেশায় পরিণত করতে হলে, মাস্তুরাতে বের হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। এ ছাড়া মেয়েদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত 'মাহফিল'-ও উপকারী। নেককার কোনও মহিলার সাথে কিছু সময় কাটাতে পারলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়!

গুণবিচারি দর্শনধারী!

১. একটা কথা প্রচলিত আছে, 'আগে দর্শনধারী তারপর গুণবিচারী।' মানে, আগে দেখতে শুনতে ভালো লাগে কি না দেখতে হবে। তারপর গুণাগুণ বিচার করতে হবে।

২. পাত্রী দেখতে গেলে, বাজার করতে গেলে, এ ছাড়াও নানা প্রসঙ্গে অনেকেই এই বাক্য আওড়ায়। পাত্রী সুন্দর না গুণধর? রূপবতী না গুণবতী? আগে কোনটা বিবেচনায় আসবে? রূপ না গুণ?

৩. কুরআন বলে আগে গুণ তারপর রূপ। জীবনসঙ্গী নির্বাচনে কুরআনি মূলনীতি অনুসরণ করাই নিরাপদ। জান্নাতি হুরদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

সেই উদ্যানসমূহের (জান্নাতে) মধ্যে থাকবে এমন আনতনয়না (নারী), যাদেরকে জান্নাতবাসীদের আগে না কোনও মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোনও জিন (আর-রহমান ৫৬)।

৪. দৃষ্টি অবনত রাখা, জান্নাতি নারীর বৈশিষ্ট্য। জান্নাতি নারীগণ শুধু স্বামীর দিকেই তাকাবেন। অন্য কোনও পরপুরুষের দিকে তাকাবেন না। এটা তাদের তাকওয়া। এটা তাদের স্বভাব। এটা তাদের ধার্মিকতা। এটা তাদের গুণ। আল্লাহ তাআলা আগে গুণের কথা বলেছেন। তারপর বলেছেন,

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ

(সৌন্দর্যে) তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল (৫৮)।

৫. ইফফত বা চরিত্রের সূচিতা না থাকলে, নিছক সৌন্দর্য দিয়ে কী হবে? এমন সৌন্দর্য প্রথম প্রথম ভালো লাগলেও পরে বিষের মতো হয়ে যায়। কুরআনের অনুসরণে বললে, বলতে হবে,

'আগে গুণবিচারী তারপর দর্শনধারী'।

৬. একটা বিশেষ আয়োজনে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এক ডক্টর তার অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত তিনি অনেক অনেক কথা বললেন। মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে তার অসংখ্য পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। আধাঘণ্টা পর আমি আবিষ্কার করলাম, আমি এর মধ্যে তার জন্ম থেকে শুরু করে, তার দাদার নাতির বাপের দাদা থেকে শুরু করে, তার মায়ের নানার মায়ের সব আত্মীয় সম্পর্কেও জেনে গেছি। পূর্বপুরুষের ফিরিস্তি শেষ করে, এবার উত্তরপুরুষের বিবরণীতে গেলেন। শুরু হলো নিজের সন্তানদের নিয়ে, পাশের গ্রামের ছলিমুদ্দীর নাতিকে নিয়ে তার কী কী পরিকল্পনা তার ফিরিস্তি।

৭. ডক্টর সাহেবের পরিকল্পনার তোড়ে ভেসে যেতে যেতে একটু ফাঁক পেয়ে ফস করে প্রশ্ন করলাম,

'ঘরে নিয়মিত কুরআন কারিম তিলাওয়াত হয়'?

একটু যেন থমকে গেলেন। কী ভেবে বললেন,

'আমি চেষ্টা করি। তবে ঘরের অন্যদেরকে চেষ্টা করেও কুরআন নিয়ে বসাতে পারি না'।

৮. ডক্টর সাহেবের কথার গতি এবার ঘরমুখো হলো। নিতান্ত সাধারণ পোশাকের অতি সামান্য এক আলিমকে পেয়ে, কোনও কারণে হয়তো এতদিন ধরে জমে থাকা কষ্টের ক্ষত জেগে উঠেছিল! তিনি আক্ষেপ করে বললেন,

'বিয়ের সময় দ্বীন না দেখে, শুধু বাহ্যিক রূপ দেখে বিয়ে করে কী যে ভুল করেছি ভাই। কত চেষ্টা করলাম, ঘরের মানুষটাকে দ্বীনমুখী করতে! কিছুতেই কিছু হলো না। বেশি জোরাজুরি করলে, সংসার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা'।

৯. মনের সমস্ত কষ্টের কথা বলে তিনি থামলেন। পরামর্শ চাইলেন। সমাধান তো খুবই সহজ। আমাদের শায়খ (প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা. বা.) এসব ক্ষেত্রে সব সময় ঘরোয়া মাহফিলের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর সাহেবের বাসার কাছেই, আমাদের শায়খ প্রতিমাসে একবার যান। পরিবার নিয়ে হযরতের মাহফিলে হাজির হতে বললাম। পাশাপাশি ঘরোয়া মাহফিল আয়োজন করতে বললাম। মাহফিলের কথা শুনে ডক্টর সাহেব রীতিমতো আঁতকে উঠে বললেন,

'ভাই, যদি বুঝতে পারে, তাকে সংশোধন করার জন্যে মাহফিলের আয়োজন করেছি, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে'।

'আপনি তাহলে কষ্ট করে, যে কোনওভাবেই হোক, আহলিয়াকে আমাদের হযরতের মাহফিলে নিয়ে আসুন। ইনশাআল্লাহ, সমাধান হয়ে যাবে। রাব্বে কারিম দয়া করবেন।

১০. এক বোনের কথা জানি। দ্বীনদার। দেখতে শুনতে হয়তো অতটা সুন্দর নন। স্বামী গরিব অবস্থায় (টাকার জন্যে) তাকে বিয়ে করেছেন। এখন স্বামীর টাকা হয়েছে। স্ত্রীকে আর ভালো লাগে না। স্বামীর মন পাওয়ার জন্যে, দ্বীনের সীমায় থেকে, এমন কিছু নেই, যা করেননি! তিনি আক্ষেপ করে তার বান্ধবীকে বলেছেন,

'বিয়ের পর এত বছর কেটে গেল। এখনো চেহারা নিয়ে কথা শুনতে কার ভালো লাগে বল? চেহারাই কি সব? এতদিন একসাথে ঘর করার পরও, জীবনসঙ্গীর মনের সৌন্দর্য, স্বভাবের সৌন্দর্য যে আবিষ্কার ও উপভোগ করতে পারে না, তার সাথে ঘর করা যে কী কঠিন, ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝানো যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয়। কিছু পুরুষ কেন যে এতটা অবুঝ হয়! কেন যে তারা স্ত্রীর কষ্টগুলো বুঝতে চায় না!

১১. দুনিয়াতেই জান্নাতি জীবন কাটতে চাইলে, রূপ নয়, গুণকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি। উভয়টা পেয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ।

বাবার শিক্ষা!

১. সন্তানের প্রথম শিক্ষক হলেন বাবা আর মা। বাবা সৎ হলে, সন্তান সাধারণত সৎ হয়ে থাকে। বাবার সততার প্রভাব সন্তানের উপর বেশি পড়ে। আদর্শিক ক্ষেত্রে। মায়ের প্রভাব বেশি পড়ে আখলাকের ক্ষেত্রে।

২. আদর্শ আর আখলাকের মধ্যে পার্থক্য কী? আদর্শ চিন্তাগত দিক। আখলাক হলো আচরণগত দিক। এ হলো মোটাদাগের কথা। নইলে সন্তান বাবা-মা উভয়ের কাছ থেকেই আদর্শ-আখলাক শেখে। কুরআন আদর্শ ও আখলাক উভয় ক্ষেত্রেই বাবাকে সামনে এনেছে। বাবার ভূমিকাকে প্রধান করে দেখিয়েছে,

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

আর তাদের দুজনের পিতা ছিল সালিহ (পুণ্যবান)। কাহফ ৮২।

৩. এক পিতা সম্পর্কে সন্তানের শ্রদ্ধামুগ্ধ স্মৃতিচারণ,

'আমার আব্বুর কাছ থেকে জীবনের অনেক পাঠ পেয়েছি। আব্বু চেতনে-অবচেতনে আজীবন আমাদের শিখিয়ে গেছেন। আব্বুর কাছ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটা পেয়েছি, তা হলো, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল। তিনি শুধু মুখেই বলতেন, নিজের জীবনেরও এর বাস্তবায়ন ঘটাতেন। তিনি বলতেন,

'তুমি যখন বিপদে বা সংকটে পড়বে আর তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে শুরু করবে, প্রথমেই তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমার মন-মগজ থেকে 'গাইরুল্লাহকে' বের করে দিতে হবে। গাইরুল্লাহ মানে হলো, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, সব। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাকে বের করে দেবে। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র আশা রাখবে না। কেউ তোমাকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই পারেন তোমাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে। এই শুদ্ধতম তাওয়াক্কুল ও বিশ্বাস নিয়ে রাব্বে কারিমের দরবারে নতজানু হবে। ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই সংকট কেটে যাবে।

যখন দেখবে তুমি কায়মনোবাক্যে দুআ করার পরও সংকট কাটছে না, তাহলে বুঝে নেবে, তোমার ভেতরের কোথাও 'গাইরুল্লাহ' ঘাপটি মেরে আছে। আবার নবচিন্তায় ভেতরটাকে সাফ-সুতরো করে নেবে। তারপর দুআয় বসবে। ইনশাআল্লাহ বিপদ কেটে যাবে।

৪. ওই ভাই বলেছেন, আমি জীবনে বহুবার এটা পরখ করে দেখেছি। ফল পেয়েছি হাতেনাতে। অবিশ্বাস্যভাবে বিপদ কেটে গেছে। পেয়ারা নবীজি সা. অত্যন্ত সত্য বলেছেন,

ومن تعلّق بشيء وُكِل إليه

যে যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে, তাকে তার কাছে সোপর্দ করা হয় (নাসাঈ ৪০৭৯)।

৫. উপরের হাদিসকে কেউ কেউ যঈফ বলেছেন, কেউ হাসানও বলেছেন। কিন্তু রাব্বে কারিম তো অবশ্যই অবশ্যই সত্য বলেছেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

আর যে কেউ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, তিনি তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন (তালাক ৩)।

৬. ওই ভাই তার বাবার যবানীতে আরেকটা কথা যোগ করেছিলেন। তার বাবা এও বলেছিলেন,

'বাছা, তোমাকে আরেকটা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। আমি সংকট বলে কোন ধরনের সংকট বুঝিয়েছি, সেটার স্বরূপ না জানলে, পরে আবার ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেবে। আমি সংকট বলে বুঝিয়েছি ধরো, হঠাৎ অসুখে পড়লে বা হঠাৎ আর্থিক সংকটে পড়ে গেলে বা হঠাৎ নির্জন পথে তোমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে বা তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বা তোমার ব্যবসা মার খাচ্ছে ইত্যাদি'।

৭. 'কিছু বিপদ আছে 'তাকবীনি'। মানে জগৎপরিচালনা সম্পর্কিত। যেমন ধরো, আমাদের ফিলিস্তিনের উপর চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। বিভিন্ন স্থানে আমাদের ভাইরা ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হচ্ছে। আমাদের উইঘুর ভাইয়েরা জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের মুখে পড়েছে। এ-ধরনের ব্যাপক বিপর্যয়ে, শুধু দুআ করলে সাধারণত তাৎক্ষনিক ফলোদয় হবে না। এ-ধরনের বিপর্যয়গুলোর সাথে অসংখ্য কারণ জড়িত থাকে। তুমি এমন বিপদে পড়লেও অবশ্যই দুআ করবে। তখন সাথে সাথে কবুল না হলে, এই দুআর প্রতিদান অবশ্যই অন্যভাবে পাবে। হয় দুনিয়াতে, নয় আখিরাতে। ব্যক্তিগত বিপদাপদে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছি, সেভাবে দুআ করবে, অবশ্যই ফল পাবে। জাতিগত বিপদ থেকে উত্তরণ একার দুআয় হয় বলে মনে হয় না।

হামাদাহ!

১. সালাফের ফকিহগণ কল্পনা করে করে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করতেন। তারপর সেগুলোর সমাধান ইজতিহাদের উসুল মেনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বের করার চেষ্টা করতেন। বর্তমানের ফকিহগণও এমন করেন।

২. এটা ছিল তাদের ইলমচর্চচার অন্যতম ধরন। বেয়াদবি না হলে বলা যেতো, এভাবে ইলমচর্চা করাটা তাদের আনন্দ (বিনোদন) লাভেরও প্রধান মাধ্যম। সালাফের অনুসরণে, একাকী বসে থাকলে, কল্পনায় একটা বিষয় ভেবে নিয়ে, কুরআন কারিম থেকে তার সমর্থনে আয়াত বের করার চেষ্টায় নামা প্রিয় একটি অভ্যেস। শতকরা ৯৮% ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হই, তাতে কি, গেমস খেলে সময় নষ্ট করার চেয়ে, আল্লাহর কালাম চষে ব্যর্থ মনোরথ হওয়াতেই অনেক আনন্দ। অনেক লাভ। অনেক সওয়াব (ইনশাআল্লাহ)।

৩. আজ একটি বিষয়ে আয়াত খুঁজতে বসলাম। বারবার মনের খাতায় সূরা আহযাব-তাহরীম-তালাক-নূর ওল্টাচ্ছিলাম। ব্যর্থ হয়ে মোবাইলে চেষ্টা করলাম। বের করতে পারলাম না।

৪. বিষয়টা ছিল, আজকাল বিয়ে করার জন্যে খাস পর্দাকারী মেয়ে পাওয়া যাওয়া কঠিন কিছু নয়। আন্তরিকভাবেই তারা পর্দা-নিকাব পালন করেন। কিন্তু সবদিক দিয়ে দ্বীনদার হওয়ার পরও, কেউ কেউ গরিব ঘরে যেতে চান না। অন্যকথায় বলতে গেলে, কেউ কেউ পরিপূর্ণ পর্দানশীন হয়েও আরাম-আয়েশে থাকতে চান। সংসারে কষ্ট করা মেনে নিতে পারেন না। না না, এই চাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই। ভালো থাকতে চাইলে গুনাহ হবে কেন।

৫. সমস্যা হয়, কিছু দ্বীনদার ভাই, বা আমাদের মতো দ্বীনি ঘরানায় বাস করা মানুষ, যাদের গড়পড়তা মাসিক সম্মানী ৫ থেকে ৮ হাজারের মধ্যে, তাদের নিয়ে। তারা পর্দানশীন মেয়ে বিয়ে করে যদি দেখেন, নববধূর প্রসাধনী বা অন্য চাহিদা পূরণ করতেই পুরো 'মাহিনা' চলে যাচ্ছে, তাহলে সংসারে সুখ থাকবে?

৬. একটা মেয়ের প্রসাধনীর প্রতি আগ্রহ থাকা কি খারাপ? নাহ, তা কেন হবে। এটা তার স্বভাবজাত বিষয়। মৌলিক চাহিদার অংশও বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা স্বামী বেচারার কথা বলছি। পাত্রী দেখার সময় শুধু পর্দানশীন দেখলেই হবে না, পাত্রীর 'কানা'আত' বা অল্পেতুষ্টির গুণ আছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। পাত্রীর দ্বীনদারির পাশাপাশি দেখা জরুরি, তার চাওয়া-পাওয়ার মাত্রা পাত্রের সংগতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কি না?

৭. একজন মেয়ে বিয়ের পর সুখে থাকতে চাইবে। মেয়ের অভিভাবকও চাইবেন, মেয়েটা সুখে থাকুক। তাই তারা তেমন পাত্রই খোঁজেন। আমাদের মতো গরিব পাত্রের উচিত হলো, পর্দা-হিজাব-নিকাব দেখেই, নিজের সামর্থ্যের কথা ভুলে 'হ্যাঁ' বলে না দেওয়া।

৮. পাত্রীর অভিভাবক বা পাত্রীরও উচিত, পাত্রের দ্বীনদারি দেখেই 'হ্যাঁ' বলে না দেওয়া। অবশ্য এমনটা খুব কমই হয়ে থাকে।

৯. বড়লোক ঘরের মেয়ে হলেই গরিব স্বামীর সাথে ঘরতে পারবে না এমন নয়। আবার গরিব ঘরের মেয়ে হলেই যে গরিব স্বামীর সাথে ঘর করতে পারবে, এমনও নয়! গরিব ঘরের অনেক মেয়েও স্বামীর ঘরে এসে 'অন্যরূপী' হয়ে যায়। তাদের চাহিদার শেষ থাকে না! শুরু হয় টানাপোড়েন।

১০. আমাদের মাদরাসায় পড়ে যাওয়া এক তালিবে ইলম। তাদের বাবা নেই। গরিব! তারা দুই ভাই মিলে বোনকে মাদরাসায় পড়িয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বোনকে ঈর্ষণীয় ফল করেছে। শিক্ষকতা করতে গিয়ে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের বড় বড় কিতাব পড়িয়েছে। তার যোগ্যতা দেখে যোগ্য যোগ্য আলিম-মুফতিরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে! কিন্তু পাত্রীর এককথা, হুজুর জামাইয়ের কাছে বিয়ে বসবে না। হুজুর জামাই ঠিকমতো তার খরচ চালাতে পারবে না। শুধু তা-ই নয়, সে কোনও দাড়িওলার কাছেও বিয়ে বসবে না! গরিব ঘরেও না। দরকার হলে বিয়ে ছাড়াই থাকবে। ভাইয়েরা পড়ল ভীষণ বিপাকে। মাদরাসা পড়ুয়া সব মেয়েই হয়তো এমন নয়। এটা হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা! তবে উদাহরণ হিশেবে উল্লেখযোগ্য।

১১. আজ জানলা দিয়ে ঝুমঝুমে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে ভাবছিলাম, মেয়েরা স্বামীর ঘরে গেলে, স্বামীর সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাহিদা দেখাবে না। বেয়াড়া বায়না ধরে স্বামী বেচারাকে বিপদে ফেলবে না, এই প্রসঙ্গে কোনও আয়াত পাওয়া যায় কি না। সরাসরি কোনও আয়াত বের করতে পারিনি! এসব হলো অভিজ্ঞ ও যোগ্য আলিমের কাজ। আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হওয়ার কথা নয়। আর দ্বীন ও দুনিয়ার সবকিছু কুরআনে থাকবেই এমন নয়।

১২. এভাবে বের করতে না পেরে, কানা'আত বা অল্পেতুষ্টি বিষয়ে আয়াত আছে কি না, সেটা খুঁজতে বসলাম। প্রথমেই মনে এল বিখ্যাত সেই দুআখানা,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন (বাকারা ২০১)।

১৩. এই আয়াত মনে আসার কারণ কী? সামান্য যোগসূত্র আছে। আয়াতে বর্ণিত 'হাসানাহ' শব্দটাই সেই যোগসূত্র! মুফাসসিরীনে কেরাম এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বাতলে গেছেন,

১. দুনিয়া আখিরাতের নাজ-নেয়ামত! সুখ-শান্তি। অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মত এটাই।

২. দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ ও সুস্থতা! পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ—কাতাদাহ রহ.!

৩. দুনিয়ার হাসানাহ হলো 'ইলম' মানে আল্লাহর কিতাবের সঠিক বুঝ, আখিরাতের হাসানাহ 'জান্নাত। ইবাদত-বন্দেগীর তাওফিক। হাসান বসরী ও সুফিয়ান সাওরী রহ.।

৪. দুনিয়ার হাসানাহ 'সম্পদ। আখিরাতের হাসানাহ 'জান্নাত'। ইবনে যায়েদ ও সুদ্দী রহ.।

৫. দুনিয়ার হাসানাহ মানে আমালে নাফি' বা উপকারী আমল। ঈমান ও আনুগত্য। আখিরাতের হাসানাহ মানে আল্লাহর দিদার (দর্শন) লাভ, আল্লাহর জিকির, আল্লাহর মহব্বতমাখা অন্তহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ—ইমাম রাযি রহ.।

৬. দুনিয়ার হাসানাহ মানে (المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) নেককার স্ত্রী। আলি রা.।

৭. দুনিয়ার হাসানাহ মানে (الرِّزْقُ الوَاسِعُ) অফুরন্ত রুজি-রোজগার।

—মুকাতিল বিন সুলাইমান রহ.।

৮. দুনিয়ার হাসানাহ মানে, যা আছে তা নিয়ে তুষ্ট থাকা (القَنَاعَةُ بِالرِّزْقِ)। সার্বিক কল্যাণের তাওফিক। গুনাহমুক্তি। নেকসন্তান। ঈমান ও আমলের উপর অবিচলতা। আনুগত্যের মিষ্টতা। সুন্নাহর অনুসরণ। মানুষের প্রশংসা। সুস্থতা। নিরাপত্তা। যোগ্যতা-দক্ষতা। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়। সুহবতে সালেহীন বা নেককার ব্যক্তিবর্গের সংশ্রবর—বাহরে মুহীত। ইমাম আবূ হাইয়ান রহ.।

৯. আখিরাতে হাসানাহ মানে, কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শান্তি ও নিরাপত্তা। কঠিন হিশেব থেকে মুক্তি। হিশেব সহজ হওয়া। হুর-গিলমান। নবীগণের সাহচর্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ—বাহরে মুহীত। ইমাম আবূ হাইয়ান রহ.।

১০. আখিরাতে হাসানাহ মানে, ইখলাস ও মুক্তি। কানা'আত ও শাফা'আত। কবর থেকে ওঠার সাথে সাথে সুসংবাদ—ইমাম নাসাফী রহ.।

১৪: কানা'আত বা অল্পেতুষ্টি আরেকটি আয়াতের পরোক্ষভাবও মাথায় এল,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, নেককারগণ অবশ্যই প্রভূত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে (ইনফিতার ১৩)।

১৫. আয়াতে বর্ণিত 'নাঈম' শব্দটার অর্থ নিয়ামত। নিয়ামতের নির্দিষ্ট কোনও রূপ নেই। বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারে আসে, এমন সবকিছুই নিয়ামত বা নাঈম,

ক. নাঈম মানে কানা'আত বা অল্পেতুষ্টি—ইমাম রাযি রহ.।

খ. নাঈম মানে অল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুল—ইমাম নীসাপূরী রহ.।

১৬. যাক, স্বামীর ঘরে স্ত্রীর 'অল্পেতুষ্টি'-বিষয়ক আয়াত না পেলেও সমস্যা নেই। অন্য কেউ হয়তো পাবেন বা পাবেন না। নবীজি সা.-এর ঘরে উম্মুল মুমিনিনের মাঝেই তো প্রকৃত 'কানা'আতের' আদর্শ আছে। সূরা আহযাবের ২৮ নাম্বার আয়াতে এই প্রসঙ্গে আলোচনা আছে।

১৭. এই 'হাসানাহ'-এর দুআখানা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এক দুআতেই প্রায় সবকিছু। নেকবিবির দুআ আছে। নেক সন্তানের দুআ আছে। কানা'আতের দুআ আছে।

১৮. স্ত্রীর মধ্যে কানা'আত না থাকলে, সংসারে সুখ আসে না। আযহাবের যুদ্ধের পর, মদীনার জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এল। প্রতিটি ঘরই পর্যাপ্ত পরিমাণে গনিমত লাভ করল। উম্মুল মুমিনিনের মনেও খেয়াল এল, এতদিন দারিদ্র্য-দৈন্যের মধ্য দিয়ে সংসার করেছি। এখন তো আগের মতো আর্থিক সমস্যা নেই। আমরাও চাইলে অন্যদের মতো আরেকটু ভালোভাবে থাকতে পারি। তারা নবীজির কাছে মনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল। তাদের প্রস্তাবে কোনও অভিযোগ ছিল না। এই প্রস্তাবটা শরিয়তের মানদণ্ডে দোষণীয়ও ছিল না। তবে একজন নবীর স্ত্রী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে,তাদের এভাবে চাহিদা পেশ করাকে শোভনীয় মনে করা হয়নি।

১৯. সাধারণ মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি আর একজন নবীর জীবনযাপন-পদ্ধতি কিছুতেই এক হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ওহি পাঠালেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহারসামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিই (আহযাব ২৮)।

২০. আল্লাহু আকবার! কী ভয়ানক ব্যাপার। উম্মুল মুমিনিন কোনও অভিযোগ করেননি। তারপরও বিষয়টা আল্লাহর ইজ্জতে লেগেছে। যারা নবীর অবর্তমানে নবীওলা কাজে ব্যস্ত (আলিম বা অনালিম), তাদের বিবিদের জন্যে কি শোভনীয় হবে, দ্বীনি কাজে মশগুল থাকা স্বামীকে টাকার জন্য পেরেশান করা? যারা বলে 'আলিম' বা হুজুর জামাইয়ের কাছে বিয়ে বসব না, কারণ তাদের কাছে টাকা-পয়সা নেই, তাদের তাওবা করা উচিত। হ্যাঁ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। টাকা-পয়সার জন্যে কাউকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

২১. গরিব স্বামীর ঘরে কষ্ট ও কানা'আতের সাথে ঘর করলে কী হবে? উম্মুল মুমিনগণকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও আখিরাতের নিবাস কামনা কর, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, সেই নারীদের জন্যে মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন (আহযাব ২৯)।

২২. আমরা বলছি না, নিজ থেকে যেচে গরিব স্বামী বেছে নিতে। এমন করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। আমরা বলছি, বিয়ের পর যদি দেখা যায় স্বামীর আর্থিক অবস্থা দুর্বল, তখন উম্মুল মুমিনিনগণের আদর্শ গ্রহণ করার কথা।

২৩. গরিব স্বামীর ঘরে কানা'আতের সাথে থেকে, আল্লাহর প্রস্তুত করা 'আজরে আজিম' বা বিরাট প্রতিদানের মালিক হওয়া কি উত্তম নয়?

গৃহে অবস্থাননীতি।

১. কুরআন কারিম আমাদের সংবিধান। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে। কুরআন বলছে, পুরুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে বাইরে যাবে, নারী ঘরদোর সামলাবে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারী বাইরের কাজে জড়াবে না।

২. মুসলিম নারী ঘরে অবস্থান করবে কীভাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন,

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ

তোমরা নিজগৃহে অবস্থান কর (আহযাব ৩৩)।

৩. আয়াতে বর্ণিত (قَرْنَ) ক্বারনা ক্রিয়াটি ইলমুল ক্বিরাতের আলিমগণ দুইভাবে পড়েন।

ক. ইমাম নাফি, ইমাম আসিম ও ইমাম আবু জা'ফর রহ. পড়েন 'ক্বারনা' (قَرْنَ)। আমরা তাদের মতোই পড়ি। এই ক্রিয়াটি (قرار) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। স্থির থাকা। অবস্থান করা। সুস্থির হওয়া। তোমরা তোমাদের ঘরে সুস্থির হয়ে অবস্থান কর। প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ো না।

খ. ইলমুল কিরাতের বাকি আলিমগণ ক্রিয়াটিকে পড়েছেন (قِرْنَ) ক্বিরনা। এই ক্রিয়াটি (وقار) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভাবগাম্ভীর্য। সম্মান। সমীহ জাগানিয়া আচরণ। তোমরা ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গৃহ অবস্থান কর। সম্মান ও সমীহ জাগানিয়া আচরণের সাথে গৃহে অবস্থান করো। যাতে দুষ্ট পুরুষও তোমার আচরণ দেখে সম্মান জানাতে বাধ্য হয়।

৪. প্রথম কেরাতে নারীকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কেরাতে নারীকে গৃহে অবস্থানের ধরন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই কেরাত মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াল (قرار بوقار)। ভাবগাম্ভীর্য ও সম্মানের সাথে অবস্থান।

৫. জান্নাতুন সাওদা রা.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

'আপনি ঘর থেকে বের হন না কেন?'

'আল্লাহ তাআলা আমাকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কীভাবে নির্দেশ অমান্য করে বের হই?'

৬. আয়েশা রা. এই আয়াত পড়ার সময় কাঁদতে শুরু করতেন। জামাল যুদ্ধে আলী রা.-এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের কারণে আফসোস করতেন।

৭. ওয়াকার (وَقَار) শব্দটি অনেক অর্থবহ। শব্দটির যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না জানা নেই।

ক. উচ্চ আওয়াজে কথা বলা ওয়াকার বা ভাবগাম্ভীর্যবিরোধী আচরণ।

খ. অন্যের গীবত করা, অন্যের সাথে ঝগড়া করা, অহেতুক রাগ দেখানো, অপ্রয়োজনীয় কাজ করা ওয়াকার বা ভাবগাম্ভীর্যবিরোধী আচরণ।

গ. পরপুরুষের সাথে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা ওয়াকারবিরোধী আচরণ। সন্তানকে অহেতুক বকাবকি করা, স্বামীর সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া ওয়াকারবিরোধী আচরণ।

ঘ. ঘরে অবস্থান করে, (অনলাইনে-অফলাইনে) বেগানা পুরুষের সাথে ঝগড়া বাঁধানো, মুসলিম নারীর স্বভাব হতে পারে না। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মুসলিম নারী, পরপুরুষের সংশ্রব সর্বাত্মঃকরণে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। জীবনের তাকিদে বা শিক্ষার প্রয়োজনে শরিয়তের সীমায় থেকে প্রশ্ন হতে পারে।

৫. আয়াতটি উম্মুল মুমিনিন সম্পর্কে নাজিল হলেও সমস্ত মুসলিম নারী এই হুকুমের আওতায় আসবে।

৮. ঘরে অবস্থান করা হলো, ওয়াকার বজায় রাখা হলো না, তাহলে আয়াতের অর্ধেকের উপর আমল হলো। বাকি অর্ধেক ছুটে গেল।

৯. আমরা নফল ইবাদত বা সুন্নত মুস্তাহাবগুলোর কথা জানি। সচেতনভাবে আমল করি। এসব ইবাদতের ফজিলত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখি। কিন্তু কুরআনি আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখি না।

১০. আত্মসম্মানের সাথে গৃহে অবস্থান করা কুরআনি নির্দেশ। বেশিরভাগ মুসলিম নারীই ঘরে অবস্থান করেন। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে আসেন না। এমনকি বেশিরভাগ মুসলিম নারী 'ওয়াকারবিরোধী' আচরণ করেন না।

১১. প্রতিটি আমলের জন্যে নিয়্যাত অপরিহার্য। নিয়্যাত না থাকলে, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১২. কুরআনের ভাষ্য মতে মুসলিম নারীর গৃহে অবস্থান করা একটি স্বতন্ত্র 'ইবাদত'। সচেতন নিয়তে গৃহে অবস্থান করে, প্রতিটি মুসলিম বোন, ছোট-বড় সবাই অনেক বড় ইবাদতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

১৩. কিছু ইবাদত সাময়িক। সময়সাপেক্ষ। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ। কিছু ইবাদত সার্বক্ষণিক। যেমন পুরুষের দাড়ি। নারীর গৃহে অবস্থান। মুসলিম সচেতন নিয়্যাতে ঘরে অবস্থান করলে, সারাক্ষণ ইবাদতের সওয়াব পেতে থাকবেন।

১৪. যারা নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে বের হন, তারাও বাকি সময়টুকু নিয়্যাত করতে পারি, আমি আল্লাহর হুকুম পালনার্থে গৃহে অবস্থান করছি। তাহলে ঘুমের সময়টাও ইবাদতের আওতায় চলে আসবে।

১৫. আমলের কথা মনে হলে, আমরা হাদিসের দিকে নজর দেই। এটাই সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু কুরআনেও আমল আছে। ইবাদত আছে। গৃহে অবস্থানও তেমন এক ইবাদত।

১৬. মেয়েসন্তানকে ছোটবেলা থেকেই এই আয়াতের সাথে পরিচিত করে দিতে পারি। তার মানসে বসিয়ে দিতে পারি, সে ভাইয়ের মতো বাইরে খেলতে যাচ্ছে না, মায়ের সাথে ঘরে থাকছে, এটা কুরআনের নির্দেশ মেনেই করছে। মায়ের সাথে থাকার কারণে, সে সারাক্ষণ কুরআনি ইবাদতে মশগুল আছে। প্রতিনিয়ত সে সওয়াব পাচ্ছে। কন্যাশিশুকে ছোটবেলা থেকেই সচেতন নিয়্যাতের সাথে এই ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলা মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য।

১৭. ওয়াকার ও কারার। দুটি বিষয়। একজন নারীর উভয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে পুরুষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পুরুষের সক্রিয় ও সচেতন সহযোগিতা ছাড়া, এ-দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করা নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। নারী যাতে ঘরে অবস্থান করতে পারে, নারী যাতে সম্মান ও সমীহবোধ নিয়ে ঘরে থাকতে পারে, এটা নিশ্চিত করা পুরুষেরই অবশ্য কর্তব্য।

১৮. নারী ঘরে অবস্থান করল। সম্মান ও সমীহবোধ বজায় রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু পুরুষ নারীকে কষ্ট দিয়ে উত্যক্ত করতে থাকলে, আয়াতের উপর আমল করা নারীর জন্যে অসম্ভব হয়ে যাবে। নারীকে পরিপূর্ণভাবে এই আয়াতের আমলে উঠিয়ে আনতে হলে, বাড়ির পুরুষকেই সক্রিয় হতে হবে।

১৯. নারী গৃহে অবস্থান করার মানে এই নয়, জীবনেও ঘর থেকে বের হবে না। নারী নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র হবে ঘর, এটাই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

২০. কুরআন বলে নারী ঘরে থাকুক। কুফরি বিশ্বব্যবস্থা বলে নারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসুক। নারীর বিয়ের বয়েস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক

বৃদ্ধি করে, একজনের আয়-রোজগারে সংসার চালানো কঠিন করে তোলা হয়েছে, কিছু অমানুষ পুরুষের নির্যাতনকে ফলাও করে প্রচার করে, নারীর মনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করা হয়েছে।

২১. মিডিয়ার মাধ্যমে পুরুষের প্রতি অনাস্থা তৈরি করে, নারীকে চাকুরির প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়েছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা নিজের চাকুরি না থাকলে, শেষজীবনে পথের ভিখারী হতে হবে, এমন আশঙ্কা সৃষ্টি করা হয়েছে।

২২. প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার ফাঁদ পেতে, নারীর সবচেয়ে সুন্দর সময়টাকে উষর করে তোলা হয়েছে। ডিগ্রিসর্বস্ব শিক্ষাকে লোভনীয় করে তুলে, নারীকে বিয়েবিমুখ করে তোলা হয়েছে।

২৩. কর্মমুখী করে নারীকে সংসারবিমুখ করে তোলা হয়েছে। স্বামী-সন্তান-সংসারকে অপমানজনক করে তোলা হয়েছে। চাকুরিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির মূল সোপানে পরিণত করা হয়েছে।

২৪. এমন এক গোলকধাঁধা তৈরি করা হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে সব সময় কাছে পায় না, সন্তানও যখন তখন মায়ের আদর পায় না। স্বামী ও সন্তান বহির্মুখী হয়ে পড়ে। তৈরি হয় দূরত্ব আর অনাস্থা।

২৫. উচ্চশিক্ষা বলতে, কিছু উচ্চডিগ্রিকে বোঝানো হয়। এসব ডিগ্রি অনেক সময় নারীর মনে অপ্রয়োজনীয় বাষ্প তৈরি করে। স্বামী-সংসারকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুচ্ছ আর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সময় পেরিয়ে যায়। বিয়ের বয়েস থাকে না। সন্তান ধারণের সোনালি সময় কেটে যায় ডিগ্রির কবলে পড়ে। নারীশিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সেটা ডিগ্রিসর্বস্ব নয়, জীবনের প্রয়োজনসর্বস্ব হওয়া কাম্য। আর ডিগ্রিসর্ববস্ব শিক্ষাব্যবস্থা শুধু নারীর নয়, পুরুষের জন্যেও ক্ষতিকর।

সুকন্যা!

মেয়েশিশুর সুশিক্ষায়, মূলত তিনজনের ভূমিকা থাকে প্রধান। কোনও পরিবারে, মা-বাবা ও ভাইয়েরা নেককার হলে, বোনেরা অবশ্যম্ভাবীরূপেই নেককার হয়। খুব কমই ব্যতিক্রম দেখা যায়,

يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا

ওহে হারুনের বোন! তোমার পিতাও কোনও খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অসতী নারী (মারইয়াম : ২৮)।

১. ঈসা আ. জন্ম নেওয়ার পর, তাকে কোলে নিয়ে লোকালয়ে নেমে এলেন মারইয়াম। লোকজন অবাক, যার বিয়েই হয়নি, সে সন্তান পেল কোথায়? তারা মারইয়ামকে সম্বোধন করেই উক্তিটি করেছিল।

২. তার মানে, বনী ইসরাঈলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো, মা-বাবা, ভাই ভালো থাকলে, মেয়েটিও ভালো হবে।

৩. হারুন বলে, সম্ভবত পূর্বপুরুষ হারুন আ.-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা হতে পারে হারুন নামে মারইয়ামের কোনও ভাই ছিলেন। তিনি নেককার ছিলেন।

৪. বর্তমানেও দেখা যায়, বোনেরা ঘরে থাকে। ভাইদের কাছেই বোনেরা বাইরের বিভিন্ন খবরাখবর পায়। ভাই ভালো হলে, বোনেরা ভালো খবর পাবে। বোনেরা ভালো বইপত্র পাবে। ভালো মানুষের কথা শুনবে। ভাই মন্দ হলে, বোনও মন্দ সংস্পর্শ পাবে। দ্বীনদার হওয়ার পথে, ঘরের পরিবেশ বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আত্মীয়ের হক!

ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক নেই, কিন্তু দুনিয়ার মানুষের সাথে তার গলায় গলায় ভাব। এটা সম্পূর্ণ কুরআন কারিম বিরোধী চিন্তা ও আদর্শ।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ

সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও (রূম : ৩৮)।

আল্লাহ তাআলা 'আত্মীয়কে' দিয়ে শুরু করেছেন। তারপর বলেছেন মিসকিনের কথা। মুসাফিরের কথা। মুজাহিদ রহ. বলেছেন,

'যার নিকটাত্মীয় নিঃস্ব, তার সাদাকা কবুল করা হবে না'।

বিবিজানের নিরাময়ী 'সম্পদ'!

অসুস্থ?

দীর্ঘদিন ধরে?

কিছুতেই আরোগ্য লাভ হচ্ছে না?

কোনও 'ফিকর' নেই।

এক অব্যর্থ দাওয়াই আছে?

কী সেই দাওয়াই?

'জেনে রাখো, তোমাদের স্ত্রীদের সম্পদে তোমাদের 'শিফা' নিহিত আছে'।

না না, এটা আয়াত নয়।

সালাফের মধ্যে এমন কথা প্রচলিত ছিল,

'স্ত্রী তার সম্পদ ব্যয় করে খাবার ক্রয় করে স্বামীকে খাওয়ালে, ইনশাআল্লাহ, স্বামী আরোগ্য লাভ করবে।'

কীভাবে?

মনগড়া কথা নয়, রীতিমতো আসমানি দাওয়াই। কুরআন কারিম থেকেই এমনটা বোঝা যায়। তাও যে সে লোকের বুঝ নয়,

আল্লামা আলূসী রহ. তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ রূহুল মা'আনিতে বলেছেন। একলোক আলি রা.-এর কাছে এসে অনুযোগ করল,

'আমার পেটে শুধু ব্যথা করে।'

'তুমি ঘরে যাও। স্ত্রীর কাছ থেকে (তার মালিকানার) কিছু টাকা নাও। সে টাকা দিয়ে মধু কিনে, বৃষ্টির পানি মিশিয়ে পান করো।'

উক্ত ওষুধে চারটা ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়েছে। ফর্মুলাগুলো এসেছে তিনটি আয়াত থেকে। প্রথমে ওষুধ তৈরির কৌশল বলা যাক,

'কেউ অসুস্থ হলে, সে স্ত্রীর কাছ থেকে তিন দিরহাম বা প্রয়োজনমতো চেয়ে নেবে। সে টাকা দিয়ে মধু কিনবে। তারপর বৃষ্টির পানির সাথে পরিমাণমতো মিশিয়ে পান করবে। ইনশাআল্লাহ, আরোগ্য লাভ করবে'।

এবার ফর্মুলাগুলোর উৎস বের করা যাক। প্রথম দুটি ফর্মুলা এসেছে সূরা নিসা থেকে,

১. (هَنِيئًا)। শব্দমূলটার (هنأ) অর্থ: কোনও প্রকার কষ্ট-পরিশ্রম ছাড়া কল্যাণ লাভ করা। সহজে ও আমামে ভক্ষণ করা যায়, এমন খাবার বা পানীয়কে (هَنِيء) বলা হয়।

২. (مريئًا)। শব্দমূলটার (مَرِيء) অর্থ, কণ্ঠনালী থেকে অন্ত্র পর্যন্ত খাবার যাওয়ার নল। সহজে গেলা যায় এমন খাবারকে (مريئ) বলা হয়। যে খাবার গলা দিয়ে সহজে নামে, যে খাবার খেলে কোনও রোগ-বালাই হয় না, এমন খাবারকেও মারিউন বলা হয়।

আয়াতটা স্ত্রীর মোহরানা আদায় প্রসঙ্গে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

নারীদেরকে খুশি মনে তাদের মাহর আদায় কর। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার (৪)।

৩. তৃতীয় উপাদান (شِفَاءٌ) আরোগ্য। এই উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে,

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ

মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার ভেতর মানুষের জন্যে আছে শেফা (নাহল ৬৯)।

৪. চতুর্থ উপাদান (مُّبَارَكًا) বরকতময়।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি বরকতপূর্ণ পানি (ক্বফ ৯)।

বিশিষ্ট তাবেয়ী আলকামাহ রহ. তার স্ত্রীকে বলতেন,

'ওগো, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, আমাকে 'হানী' ও 'মারী' দাও'।

বলাবাহুল্য, তিনি এই 'বউনৈবেদ্য' সূরা নিসার আয়াত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কারো রোগবালাই থাকলে, পদ্ধতিটা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, জোরজবরদস্তি করলে ওষুধ ক্রিয়া করবে না। কারণ বলা হয়েছে,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়।

জোর করলে, উল্টো রোগ আরও বেড়ে যাবে। সাবধান। এটা পড়ে কিছু দুষ্টলোক বলবে,

'তাহলে তো স্ত্রীর মোহরানা পুরোটা আদায় না করে, কিছু বাকি রেখে দিতে হবে'।

'সেক্ষেত্রে আপনি খেয়ানতকারী জালিমে পরিণত হবেন। অপরের প্রাপ্য না দিয়ে নিজের স্বার্থে 'টালবাহানা' করছেন'।

আর অবিবাহিতরা কী?

'কেন, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে চিকিৎসা শুরু করবে'

সুইট হোম!

আমি বিবিবাচ্চা নিয়ে যে ঘরে থাকি, সেটা কার? কাগজে-কলমে বা রাষ্ট্রীয় আইনে যাই থাক, পরিচয় দেওয়ার সময় কার বাড়ি বলব?

আমার বাড়ি নাকি স্ত্রীর বাড়ি?

অবশ্যই আমার বাড়িই বলব।

কিন্তু কুরআন কারিম বলছে ভিন্ন কথা।

কুরআন কারিমের যেখানেই 'স্ত্রী' ও 'ঘর'-এর আলোচনা এসেছে, সেখানেই ঘরকে বলা হয়েছে, স্ত্রীর ঘর। স্বামীর ঘর নয়।

১. ইউসুফ আ. বড় হলেন প্রাসাদে। তার অপার সৌন্দর্যে জুলায়খা মুগ্ধ।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ

যে নারীর ঘরে তিনি থাকতেন, সে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করল (ইউসুফ ২৩)।

জুলায়খা ছিলের শাসকের স্ত্রী। স্বামীর ঘরেই তার বসত। তা সত্ত্বেও স্ত্রীবাচক সর্বনাম ব্যবহার করে বলা হলো 'জুলায়খার ঘর'।

২. দাম্পত্য জীবনে মন কষাকষি হয়। পরস্পরে বিবাদ হয়। দুজনের বিরোধ সীমাতিরিক্ত হয়ে গেলে, স্বামীকে তালাকে রজয়ী দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তালাকে রজয়ী মানে, এক তালাক দিয়ে স্বামী তার স্ত্রীর ইদ্দত পূরণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, স্ত্রী সংশোধিত হয় কি না দেখবে। সংশোধিত হলে আগের মতো ঘর-সংসার করবে। দুজনের মধ্যে চলতে থাকা এমন ঘরসংসারভাঙা তীব্র সংকটময় মুহূর্তেও কুরআন কারিম ঘরকে বলেছে স্ত্রীর ঘর,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ

হে নবী! আপনারা যখন নারীদেরকে তালাক দেন, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দেবেন এবং ভালোভাবে ইদ্দতের হিশেব রাখবেন এবং আল্লাহকে ভয় করবেন, যিনি আপনাদের প্রতিপালক। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেবেন না (তালাক ১)।

আয়াত থেকে বোঝা যায়, তালাকটা দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর দোষের কারণে। স্বামী অপারগ হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন মুহূর্তেও বলা হয়েছে, স্ত্রীর ঘর।

৩. প্রশ্ন হতে পারে, এসব ক্ষেত্রে হয়তো, ঘরের মালিকানা সত্যি সত্যিই স্ত্রীদের ছিল। কিন্তু অন্য আয়াত ভিন্ন কথা বলছে,

ক. নবীজি সা.-এর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

নিজ গৃহে অবস্থান কর (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না, যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো (আহযাব ৩৩)।

খ. আরেক আয়াতে আছে,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হেকমতের কথা পাঠ করা হয়, তা স্মরণ রাখ (আহযাব ৩৪)।

নবীজির স্ত্রীগণের ঘরগুলোর মালিকানা তো নবীজিরই ছিল। তারপরও ঘরগুলোকে বলা হয়েছে নবীজির স্ত্রীগণের ঘর।

৪. একটি আয়াত ব্যতিক্রম আছে। সেখানে ঘরকে স্বামী বা স্ত্রী কারও সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়নি।

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী রাখ। তারা যদি (তাদের অশ্লীল কাজ সম্পর্কে) সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ রাখ, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্যে কোনও পথ সৃষ্টি করে দেন (নিসা ১৫)।

কুরআন কি তবে ঘরকে স্ত্রীর মালিকানায় দিয়ে দিয়েছে?

জি না। ঘর স্বামীর মালিকানাতেই আছে। ঘরকে স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হিশেবে অভিজ্ঞজনেরা বলেছেন,

ক. স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে এমনটা করা হয়েছে। তার মনে নিরাপত্তা বোধ তৈরি করার জন্যেও করা হয়ে থাকতে পারে।

খ. নারীর আবেগ অনুভূতি পুরুষের চেয়ে কোমল হয়ে থাকে। যে ঘরে নারী বাস করে, সেটাকে সে একান্ত নিজের মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিয়ের আগে বাবার বাড়িকে, বিয়ের পর স্বামীর বাড়িকে। এজন্য দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পরও, অনেক স্ত্রী প্রয়াত স্বামীর বসতভিটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। ছেলেমেয়ের শহুরে বিলাসবহুল 'ভিলা' ছেড়ে গ্রামের জীর্ণ-পর্ণ 'ভিটা'-ই তার বেশি পছন্দ। কুরআন কারিম এদিকটা লক্ষ করেছে।

গ. ঘরে সাধারণত স্ত্রীই বেশি থাকে। পুরুষ তো বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকে।

ঘ. পাশাপাশি স্ত্রীর মনে এটাও উদ্রেক করে দেওয়া, তুমি তোমার ঘরে আছ। তোমার ঘর ছেড়ে যেতে হয়, এমন কিছু করো না। তুমি তোমার ঘরকে কলুষিত করো না। তোমারই তো ঘর, এটাকে শান্তির নীড় করে তোল। কাগজেকলমে পুরুষ মালিক হলেও ঘরের আসল দায়দায়িত্ব কিন্তু তোমার উপরই বর্তায়।

তাহলে সূরা নিসাতে ব্যতিক্রম হলো কেন?

সূরা নিসাতে আলোচ্য প্রসঙ্গ ছিল নারীর অশ্লীল কাজ। নারী ঘরে থেকে, আরেকজনের স্ত্রী হয়েও যখন এমন অপরাধ করে বসল, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান ছিনিয়ে নিলেন। ঘরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করলেন না।

ঘরে থাকাই নারীর জন্যে সম্মানের।
ঘরই নারীর আসল কর্মক্ষেত্র।
স্বামীর ঘর মূলত তারই ঘর।
কুরআন কারিমই এই স্বীকৃতি দিয়েছে।

লাজনম্র বধূ!

মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবতে বসি, কী এমন গুণ দেখতে পেলেন, যার জন্যে নিজের জীবনের অতি মূল্যবান দশ দশটা বছর মজুর হিশেবে 'ব্যয়' করে দিলেন? চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খেতো।

সামান্য সময়ের পরিচয়। একটু আগে দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে নামমাত্র। একটা কি দুইটা বাক্য বিনিময় হয়েছে এর বেশি কিছু নয়। পাত্রীকে ভালো করে দেখেছেন, এমন কোনও প্রমাণও নেই। শুধু হাঁটার ভঙ্গিটা হয়তো আবছা লক্ষ করে থাকবেন। ব্যস এটুকুই। তারপরও এমন অস্পষ্ট পাত্রীর মোহরানা বাবদ দশ বছর কাটিয়ে দেবেন? কী সেই মহার্ঘ্য 'ডিসিসিভ পয়েন্ট'? সিদ্ধান্তসূচক দিক?

মাথার মধ্যে এমনিতেই সব সময় একটা না একটা আয়াত ঘুরপাক খেতেই থাকে। সেই সাথে প্রশ্নটাও মাথায় নিয়ে ঘুরঘুর করছিল। দীর্ঘদিন। কিছুদিন আগে মজলুম ভাইদের খেদমতে টেকনাফ যাচ্ছিলাম। মাইক্রোর পেছনের আসনে বসে আমি আর আরেক ভাই গল্প করছিলাম। নানা বিষয়ে। দীর্ঘ পথযাত্রায় দুজনের গল্পের তরি নানা বাঁক পেরিয়ে শেষে এসে ভিড়ল 'দাম্পত্য জীবনে'। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

'বিয়ের সময় আমার আহলিয়ার বয়েস ছিল চৌদ্দ, সে যে কী লাজুক ছিল বলে বোঝাতে পারব না। পুরো এক বছরেরও বেশি সময় সে আমার সাথে ঠিকমতো কথাই বলতে পারেনি। অতি লাজুক স্বভাবের কারণে। সব সময় চুপচাপ থাকত। মাথা নিচু করে থাকত। মুখে সারাক্ষণই লাজনম্র হাসি লেপ্টে থাকত। দেখে কী যে মায়া লাগত। বলে বোঝাতে পারব না।

আপনার খারাপ লাগেনি? জীবনসঙ্গীর সাথে মনখুলে কথা বলতে পারছেন না, ভাব-ভালোবাসা বিনিময় করতে পারছেন না?

নাহ। জানেন, ও কিছুদিন আগে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

কেন?

সে বলেছে, 'আমি প্রথম বছর আপনার অনেক হক নষ্ট করে ফেলেছি।'

কী হক নষ্ট করেছ?

মানুষ বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে কত কথা বলে। কত ভাবের বিনিময় করে। আপনি

সেসবের কিছুই পারেননি। এটা ভাবলে সত্যি সত্যি আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। আপনাকে ঠকিয়েছি বলে মনে হয়।

আরে নাহ, তুমি ভুল বুঝছ। লজ্জাশীলতার কারণে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

ওই ভাইয়ের সাথে গল্প করার সময় কী একটা কথা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছিল না। তাদের এই দাম্পত্য কড়চা আমার বেশ লেগেছিল। টেকনাফ থেকে বাড়ি ফিরে তাদের গল্প করলাম। গল্প শেষ করতেই মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল, দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত এক প্রশ্নের উত্তর। ঠিক উত্তর নয়, মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটা আয়াতাংশ,

تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে (কাসাস ২৫)।

দুই বোনের এক বোন ব্রীড়াবনত ভঙ্গিতে এলেন। কৃতজ্ঞতাবশত। উপকারের প্রতিদান দেওয়ার জন্যে। বৃদ্ধ বাবার পক্ষ হতে।

আহ, লাজনম্রতা এমন এক গুণ, তার সৌরভে একজন নবীও মুগ্ধ। রাব্বে কারিমের কাছেও গুণটা এতই পছন্দ হলো, তিনি সেটাকে শেষ আসমানি কিতাবে বিশেষভাবে স্থান দিয়ে চিরায়ত করে রাখলেন। আসলেই পুরুষের মধ্যে মুসা আ.-এর মতো মানবিকতাই যদি না থাকল, তো আর রইল কি? নারীর মধ্যে লজ্জাই যদি না থাকল, তো আর রইল কি?

তারুণ্য!

লা ইয়ানি

১. একজন মুসলমানের ইসলাম কখন সুন্দর হবে? উত্তরটা নবীজি সা. দিয়েছেন 'লা ইয়ানি বা অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন বস্তু বর্জন করা। এড়িয়ে যাওয়া'। দ্বীনের মানদণ্ডে কোনটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় সেটা ঠিক করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

২. এক বয়েসে যেটা প্রয়োজনীয় মনে হয়, আরেক বয়েসে সেটাকেই ঘোরতর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এজন্যই উস্তাদ বা মুরুব্বী দরকার। তারাই জোর করে অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত রাখবেন। অপ্রয়োজনীয় অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য,

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

মুমিন তারা যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে (মুমিনূন ৩)

৩. অনেক বন্ধু-বান্ধব জীবনে আসে, যাদের কাছ থেকে আসলেই কিছু পাওয়া যায় না। না দুনিয়া, না আখিরাত। মা-বাবা পইপই করে বলেন, ওর সাথে একদম মিশবি না। তার সাথে কথা বলবি না। কিন্তু আমরা লুকিয়ে আরও বেশি করে মিশি। ফলে হয় কি, অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে।

৪. অনেক বই পড়া হয়ে যায়, যেগুলো পড়লে না ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়, না চরিত্রজ্ঞান অর্জিত হয়, না দ্বীনি জ্ঞান অর্জিত হয়। কোনওটাই হয় না। অভিভাবকগণ এসব বই পড়তে নিষেধ করেন। কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে আরও বেশি পড়া হয় সেসব বই। অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষতিও হয়ে যায়।

৫. কিছু অনলাইন-ফ্রেন্ড এমন আছে, যাদের কাছ থেকে ক্ষতি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। আবার কিছু 'ফ্রেন্ড' আছে, লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রা বেশি। বিশেষ করে গাইরে মাহরাম, মানে যার সাথে বিয়ে বৈধ, এমন 'বন্ধু' দ্বারা ঈমান-আমল সব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এটা অপ্রয়োজনীয় বন্ধুত্ব। এমন ক্ষতিকর বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়লেও, আস্তে আস্তে সরে আসাটা কাম্য। তাকওয়ার জন্যে আবশ্যকও বটে। অন্তত চিন্তার বিশুদ্ধতার জন্যে হলেও। একসময় এসব বন্ধুর জন্যে আফসোস করতে হবে,

يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (ফুরকান ২৮)।

৬. অহেতুক তর্কযুদ্ধে নামা, কাউকে জোর করে কিছু বোঝাতে যাওয়া, চিন্তার সাথে মিল নেই, এমন কারও কমেন্ট-গালি-আক্রমণ-খোঁচার জবাব দিতে যাওয়া, শুধুই সময়ের অপচয়। অপ্রয়োজনীয় কাজ। আমার কাছে যদি একটা বিষয় পরিষ্কার হয়, তাহলে যে যাই বলুক, মন্তব্য করুক, গায়ে না মাখা। স্রেফ সময়ের অপচয়। আবার কাউকে আক্রমণও না করা।

৭. আরেকটা অপ্রয়োজনীয় কাজ হয়ে যায়, স্তর ও ধরন না বুঝে তর্কে নেমে। এটা অনলাইন-অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন একবার পরিচিত একজনকে দুষ্টুমি করে উল্টো করে উত্তর দিয়েছিলাম। ব্যস আরেক জন রেগে ব্যোম। ভাই আপনি অভদ্র ভাষায় কথা বললেন কেন? যিনি রাগলেন তাকে আমি চিনি না। তিনি আমাদের দুজনের সম্পর্ক ধরতে পারেন নি। তাই বিশাল এক আক্রমণাত্মক বক্তব্য ঝেড়ে দিলেন। এসব ক্ষেত্রে রাগলেই শেষ। কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় নষ্ট।

৮. প্রায়ই এমন হয়, একটা বিষয় নিয়ে লিখলাম। সাধারণত একটা লেখা প্রকাশ করার আগে, কমপক্ষে তিন দিন সময় নেই। গতকালের কুরআন-বিষয়ক লেখাটা তো সেই তিন মাস আগে কুরবানির সময় থেকেই মাথায় ঘোরাচ্ছিলাম। মূল আরবি লেখাটা আরও আগে পড়া। আজকের লেখাটা শুরু করেছি প্রায় দেড়মাস আগে। একসাথে অসংখ্য লেখা চলতে থাকে। আস্তে আস্তে পরিণতির দিকে এগোয়। এসবের কারণ হলো অপ্রয়োজনীয় ভাবনা যেন লেখায় ঢুকে না পড়ে। তারপরও ভুল থেকে বাঁচা যায় না। ভাষাগত ভুল তো থাকেই। সেটা না থাকাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তথ্যগত ভুলও থেকে যায়।

৯. দেখা গেল এত ভাবনাচিন্তার পর লেখাটা কারও খারাপ লাগলো বা তার চিন্তার সাথে মিলল না, ব্যস আলটপকা মন্তব্য ঝেড়ে বসলো। তাকে বোঝাতে যাওয়া চূড়ান্ত বোকামিরই নামান্তর। অপ্রয়োজনীয়। অহেতুক তর্কযুদ্ধে নামার চেয়ে নতুন আরেকটা লেখা তৈরিতে মনোযোগ দেওয়াই বুদ্ধিমানের। একটা আপ্তবাক্য মনে রাখা দরকার 'বিতর্ক করে কট্টর ভিন্ন মতাবলম্বীকে কখনো বোঝানো যাবে না। যায়নি। যাচ্ছে না। সবাই নিজের মতটা নিয়েই গোঁ ধরে থাকে,'

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

প্রতিটি দল নিজেদের ভাবনা মতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা নিয়েই উৎফুল্ল (মুমিনুন ২৩)।

১০. অনেকে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে প্রশ্ন করেন। সেসবের জবাব দিতে গেলে নিজের অতীব প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিতে হয়। অনলাইন হলো এমন, এখানে যত বেশি কম জড়ানো যায়, ততই ভালো। কচুপাতার মতো হওয়াটাই নিরাপদ। অন্তত যারা অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান তারা। আপনজনের কাছে অভদ্র হয়ে, অচেনা মানুষের কাছে ভদ্র হওয়ার কোনও মানে হয় না। নিজের প্রাতিষ্ঠানিক ফরজ কাজ বাদ দিয়ে, নফল প্রশ্নের জবাব দেওয়া ভালো কথা নয়। আমানতদারির পরিচায়কও নয়। ছাত্রদের হক নষ্ট করে কারো কাছে পণ্ডিত সাজা, কাজের কথা নয়। ফরজ কাজ আদায় করার পর যদি সময় সুযোগ মেলে, তখন ভিন্ন কথা।

১১. একজন দায়ী কখনোই অপ্রয়োজনী কাজে জড়াবেন না। গালিগালাজে লিপ্ত হবেন না। আবার হক কথা বলার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকবেন না। কতজন কতকথা বলবেন, সেসবে কান দেওয়া দায়ীর কাজ নয়। এ-পরিস্থিতিতে নিয়ম হলো 'তাগাফুল' মানে উদাসীন হয়ে পড়া। না শোনার ভান করা। না দেখার ভান করা। তারা গালি দিক। তারা কটুকাটব্য করুক। উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করুক। না বুঝেও বোকাবুদ্ধিমান সেজে প্রশ্ন করুক।

১২. আমাদের নবীজি সা. কেমন ছিলেন? মক্কার কাফিররা কতো রকমের গালি দিয়েছে। অপবাদ দিয়েছে। কষ্ট দিয়েছে। তিনি সেসবের উত্তর দিয়েছেন কখনো? কক্ষনো না। চুপচাপ শুনে গেছেন। নয়তো উপেক্ষা করে গেছেন। আবু লাহাবের স্ত্রী বলতে গেলে সারাক্ষণই নবীজিকে 'মুজাম্মাম' বা নিন্দিত বলে প্রচার করতো। নাঊযুবিল্লাহ। মিসেস লাহাব রীতিমতো কবিতাই আওড়ে বেড়াতো 'মুজাম্মামের অবাধ্য হয়েছি। তাকে অমান্য করেছি। তার দ্বীনকে ঘৃণা করেছি'।

১৩. নবীজি এসব যে শুনতেন না তা নয়। একবার কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের অবতারণাও করেছিলেন,

'তোমাদের কি অবাক লাগে না, আল্লাহ তাআলা কীভাবে আমার থেকে কুরাইশদের নিন্দা-অভিশাপকে হটিয়ে দিয়েছেন? তারা আমাকে মুজাম্মাম বলে গালি দিতো। মুজাম্মাম বলে অভিশাপ দিতো। অথচ আমি মুহাম্মাদ। প্রশংসিত'।

১৪. বিরোধীদের সব কথার উত্তর দেওয়া। সারাক্ষণ তাদের পেছনে লেগে থাকা। তাদের সাথে সমান তালে বাকযুদ্ধ-কমেন্টযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বোকামি। আলি রা. বলেছেন, 'যে আশপাশের মানুষের উৎপাত থেকে উদাসীন থাকতে পারে না, তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে'।

১৫. কুরআন কারিমে একটু চোখ বোলানো যাক। মুসা আ.-কে আমরা রাগী নবী বলেই জানি। কুরআন কারিমের 'গজব' শব্দটার অর্থ আমরা বাঙলায় 'রাগ' বলে

করে থাকি। যদিও তা একশ ভাগ ভাব প্রকাশ করে না। পুরো কুরআনে দুইজন মানুষের ব্যাপারে 'গজব' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। ইউনুস আ.-এর সম্পর্কে একবার। আর মুসা আ. সম্পর্কে কয়েকবার। বাকি সব আল্লাহর নিজের সম্পর্কে।

১৬. মুসা আ. সম্পর্কে শুধু গজব নয় 'গাজবান' ব্যবহার করা হয়েছে। মানে অতি রাগান্বিত। না না, ব্যক্তিগত কিছু নয়। প্রতিবারই তিনি বনী ইসরাঈলের লটঘটের কারণেই রেগেছেন। একজন নবী কিছুতেই ব্যক্তিগত বিষয়ে উম্মাহর প্রতি রাগতে পারেন না। রাগেনও না। মুসা আ.-এর মতো জালালি তবিয়তের মানুষ হলেও না।

১৭. তারা শিরক দেখলে তীব্র রাগে ফেটে পড়লেও, ব্যক্তিগত আক্রমণের সময় ঠিকই ভীষণ শান্ত হয়ে পড়েন। ফিরআউনের সাথে কথোপকথনটার দিকে নজর দিলেই পরিষ্কার হবে:

ফিরআউন: রাব্বুল আলামীন কে (وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ)?

মুসা: তিনি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে সবকিছুর রব। যদি তোমরা বিশ্বাস করো আরকি!

رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ফিরআউন তার আশেপাশের লোকদেরকে বলল:

তোমরা শুনতে পাচ্ছ সে কী বলছে (أَلَا تَسْتَمِعُونَ)?

মুসা: তিনি তোমাদের রব, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।

رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

ফিরআউন: তোমাদের প্রতি যে রাসুল পাঠানো হয়েছে, সে আস্ত পাগল।

إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

সূরা শু'আরা। শুরু থেকেই দেখা যেতে পারে। দারুণভাবে পুরো বিষয়টা চিত্রিত আছে।

১৮. এরপর মুসা আ. কী বললেন? কিছুই বললেন না। এতক্ষণ আল্লাহকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনিও জবাব দিয়ে গেলেন। যখনই তাকে পাগল বলা হলো, তিনি চুপ হয়ে গেলেন। অন্তত কুরআনে আর আগে বাড়া হয়নি। অথচ মুসা আ. চাইলে জবাব দিতে পারতেন। নিদেনপক্ষে নিজের প্রতি ধেয়ে আসা 'পাগল' অপবাদের ব্যাপারেও বলতে পারতেন,

'নাহ, আমি পাগল নই'।

১৯. মুসা আ. স্রেফ এড়িয়ে গেলেন। ভ্রুক্ষেপই করলেন না। ফিরআউনের তুচ্ছতাচ্ছিল্যমূলক বক্তব্যে কান দিলেন না। তিনি ব্যক্তি আক্রমণ গায়ে না মেখে, নিজ লক্ষ্যে অটল থেকে আরেকটা তির ছুড়লেন,

'তিনি উদয়াচল ও অস্তাচল ও এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, সবকিছুর রব। তুমি যদি বোঝ আরকি।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

এরপর ফিরআউন আরো খেপে গেল। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে, ন্যূনতম ভদ্রতার ধার না ধেরে সরাসরি রাজসভাতেই হুমকি দিয়ে বসল,

'তুই যদি আমাকে ছাড়া অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিস, তোকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করবো!'

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

২০. আমরা এখানে ভাবটুকু তুলে ধরলাম : পুরো বিতর্কটা উপভোগ করতে চাইলে সূরা শু'আরা পড়ে দেখতে হবে। আমাদের মাদরাসা থেকে আমরা কিছু বিতাকা বা কার্ড ছাপাই। ভিজিটিং কার্ডের মতো। সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। একেকটা কার্ডে একেক বক্তব্য লেখা থাকে। একটি বক্তব্য এমন—

'আমি যাবতীয় অপ্রয়োজনীয়তাকে পরিহার করে চলবো।'

২১. কিছু অনুসিদ্ধান্তে আসা যায়,

ক. অনলাইনে অহেতুক সময় নষ্ট করা যাবে না।

খ. অচেনা মানুষের সাথে তর্ক করা যাবে না।

গ. ভিন্ন ও ভ্রান্ত চিন্তার কাউকে বন্ধুতালিকায় রাখা যাবে না। এতে উভয়পক্ষের লাভ। শুধু শুধু মনকালাকালি থেকে বাঁচা যায়।

ঘ. যত খারাপ ভাষাতেই আক্রমণ করুক, উত্তেজিত হওয়া চলবে না। এড়িয়ে যেতে হবে। এটা নবীওয়ালা সুন্নাত।

ঙ. অন্যকেও আক্রমণ করে বক্তব্য বা উক্তি করা যাবে না।

চ. অন্যায় শ্রদ্ধা করে, এমন কাউকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবে না। হ্যাঁ, তার চিন্তায় অসংগতি থাকলে, সেটা ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করতেই হবে।

ফেকবন্ধু।

আজ আমার চারপাশে কত বন্ধু! কত বান্ধব! কত হিতাকাঙ্ক্ষী! মোবাইলের কন্টাক্টলিস্টে আর জায়গা নেই। কিন্তু কাজের বন্ধু কজনা?

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

পরিণামে আমাদের না আছে কোনও রকম সুপারিশকারী। আর না এমন কোনও সহৃদয় বন্ধু (শু'আরা ১০০-১)।

কিন্তু সেদিন তাদের কোনও বন্ধু থাকবে না। সবাই ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি! করে হা-হুতাশ করতে থাকবে। তবে কোনও কোনও মুমিন বান্দা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে। হাসান বসরি রহ. বলেছেন,

'তোমরা বেশি বেশি মুমিন বন্ধু বানাও। কারণ কিয়ামতের দিন মুমিনকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে'।

আমার বন্ধুতালিকায় সুপারিশ করার অনুমতি পাবে, এমন কজন আছে? নাকি সবাই...?

কান্না/No

১.'না' বলতে পারা অনেক বড় একটি গুণ। অনেক বড় একটি শক্তি। আমরা অনেক সময়, প্রয়োজনের মুহূর্তে 'না' বলতে পারি না। কোথাও যেন বাধো বাধো ঠেকে।

২. রামাদানের শেষ দিন, একটু পরেই ইফতারের সময়, বড় বেসামাল অবস্থায় আছি, তখনো প্রায় বারো পৃষ্ঠার মতো বাকি। নাকে মুখে তিলাওয়াত করছি। তনমনধন দিয়ে। এক ধ্যানে। এক জ্ঞানে। এক মনে। গভীর অভিনিবেশে। পরম মমতায়। বুঁদ হয়ে। নিমগ্নচিত্তে। অভিভূতের মতো।

৩. সুন্দর করে, হরফের মাখরাজ আদায় করে, তিলাওয়াতের প্রাণপণ কোশেশ করছি। পুরো শরীর টানটান হয়ে আছে, 'পারবো তো'? ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি না, যদি সময় না থাকে, এ ভয়ে। মসজিদের এক কোণে ঢুলে ঢুলে মাথা কুটে মরছি। মনের ঈশান কোণে ভয়, এই বুঝি আজান দিয়ে দিল। আরেকটা খতম বুঝি রামাদানের মধ্যে শেষ করা গেল না।

৪. এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে, একজন এলেন। মাসআলা জানতে। তাও সামান্য একটা বিষয়ে। উনি ওজু ছাড়া মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন কিনা? এ মাসায়ালা ওনার জানা আছে, তবুও.......। ভাবভঙ্গি দিয়ে বোঝালাম, উত্তর তো বললাম এবার বিদেয় হোন? লোকটা সম্মানিত। উচ্চশিক্ষিত। আমি যতই কুরআন পড়তে উদ্যত হই তার প্রশ্নের ঝাঁপি থেকে আরও বেশি, একটার পর একটা প্রশ্ন বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। এহেন পরিস্থিতিতে ভেতরে ভেতরে গোস্বায় ব্যাঙের মতো ফোলা ছাড়া আর কিছু করার থাকে?

৫. অথচ সহজ সমাধান 'না' বলে দেওয়া। মুখের ওপর। রূঢ়ভাবে হলেও। আবার সরাসরি 'না'-ই বলতে হবে এমনটা নয়, ঘুরিয়েও না বলা যায়। ভদ্রভাবে, সহনীয় করে।

ক. আমার একটু ব্যস্ততা আছে। আমরা পরে কথা বলি?

খ. ঠিক আছে আজ থাক, পরে সময় করে বসা যাবে।

গ. মাফ করবেন, আমার একটু তাড়া আছে।

ঘ. বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো।

ঙ. আঁতকে ওঠার ভান করে, ফোন বের করে বলা,
'ওহহো! আমার জরুরি একটা ফোন করতে হবে।'

চ. ফোনে কথা বলতে বলতে উঠে অন্য দিকে চলে যাওয়া।

৬. 'না'-এর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল একেবারে ছোটকালে। যখন হিফ্জ পড়ি তখন। সবে পাগড়ী পেয়েছি। কিতাব বিভাগে ভর্তি হবো তখন। আম্মা রান্না করার জোগাড়যন্ত্র করছেন। চুলোতে আগুন দেওয়ার জন্যে কিছু কাগজ সব সময় উনুনের পাশেই থাকে। আমাদের যেহেতু বইদোকান আছে, তাই কাগজের অভাব ছিল না। আমি আম্মার পাশে বসে আছি। রান্নাবান্নার আয়োজন দেখছি। একটা সুন্দর ছবিওলা কাগজের ওপর চোখ পড়লো। হাতে তুলে নিয়ে দেখি ওপার বাংলা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত এক পত্রিকার একটি ছেঁড়াপাতা। পাতাটাতে সময়মতো 'না' বলতে পারা নিয়ে সুন্দর এক প্রবন্ধ। খুবই সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে। সেই ছোট আমি পর্যন্ত বুঝে গিয়েছিলাম 'না'-এর গুরুত্ব। কিন্তু বুঝলে কী হবে? ঠিক সময়ে তো মুখ ফুটে আজও না বলা অভ্যেস করতে পারি নি। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা নিয়েই যতসব ফ্যাকড়া।

৭. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একটি গল্প, নামটা ঠিক মনে নেই। একজন বামুন-পুরুতকে নিয়ে গল্পটা। পুরুত মশায়কে সব সময় একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়। পরকালে মৃত ব্যক্তির সদ্গতি হওয়ার জন্যে, তার হৃদপিণ্ড না শরীরের কী একটা অংশ খেতে হয়। তার বিনিময়ে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তাকে টাকা দেয়। সমাজে এ কাজটাকে খুবই ঘৃণিত দৃষ্টিতে দেখা হতো। বামুন মশায় প্রতিদিনই সিদ্ধান্ত নিতো,

'অ-নে-ক হয়েছে। আর নয়, এবার একটু সম্মানের সাথে বাঁচতে চাই। আর কারো কোনও আব্দারে টলবো না।' কিন্তু যে-ই কেউ এসে চোখের সামনে টাকার তোড়া নেড়ে, জোর করে, না বলতে পারে না। তারাশঙ্কর বড়ই চমৎকারভাবে, একটা মানুষের সময়মতো 'না' বলতে না পারার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন সে-গল্পে।

৮. বাসে করে যাবো উত্তরা। শায়খের খানকায়। অর্ধেক পথ থেকে বাসে উঠলে 'আসন' পাওয়া যায় না। সেজন্য করি কি, বিশ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে মূল বাসকাউন্টারে চলে যাই। যাতে মনের মতো আসনে বসে যাত্রা করা যায়। বাসের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আসন হলো 'সি-ওয়ান;। সব সময় চেষ্টা করি এ-আসনটা দখল করতে। দরজার দিকের সারিতে। অবশ্য সূর্যের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। রোদের আশঙ্কা থাকলে অগত্যা সি-ফোরে গিয়ে বসি। চালকের পেছনের সারি।

৯. এত আয়োজন করে আমি যেদিনই সি-ওয়ান দখল করি, সেদিনই একটা না একটা বিপত্তি বাঁধবেই। হয়তো কোনও অসুস্থ ব্যক্তি এসে বলবে,

'হুজুর, একটু পেছনে গিয়ে বসবেন? আমার ঝাঁকিতে সমস্যা হয়?'

হয়তো একেবারে আমার আসনের পাশেই একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তার সম্মানার্থে বাধ্য হয়েই আসন ছেড়ে দাঁড়াতে হয়।

বেশির ভাগ সময় সুস্থ-সবল মানুষের অনুরোধের ঢেঁকি গিলেই উঠে যেতে হয়। ওই যে 'না' বলতে পারি না। তারাশঙ্করের সে-মেরুদণ্ডহীন বামুনের মতো। অথচ 'না' বলতে না পারার কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাসে পছন্দসই আসন দখল করার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো, নিরাপদে-আরামে ঝাঁকিমুক্ত থেকে বই পড়া বা চিন্তায় ডুব দেওয়া।

১০. সামান্য একটা শব্দ 'না', এটা উচ্চারণ করতে না পারার কারণেই বাসযাত্রার সময়টা মনের মতো কাটানো যায় না। অবশ্য জিকির করা যায়, মুখস্থ তিলাওয়াতও করা যায়। সেটা করিও। কিন্তু এত সাধের আসনটা হারালে মেজাজটা তিন-চার রকমের হয়ে যায়। এমন খাট্টা দিলে মিঠ্‌ঠা জিকির মুখে রোচে?

১১. ক্রিকেট আম্পায়ার যেমন বোল্যারের নো বল দেখে, চিৎকার করে 'নো' বলে ওঠেন, আমিও যদি 'নো' বলতে পারতাম। তাহলে জীবনের অনেকগুলো বাজে বাজে সময়, সুন্দর হতো। ফলেল-ফুলের হতো।

১২. সময়মতো, জায়গামতো 'না' বলতে পারার দুর্ঘটনা কি একটা দুইটা? অসংখ্য। হাজার-হাজার। সব বলতে বসলে কট্টর আরববিদ্বেষী শী'আ কবি ফেরদৌসির শাহনামা ফেল হয়ে যাবে।

১৩. যা হোক, আমি আজ থেকে ঠিক করেছি, 'যেমনই হোক, যেই হোক, আমার ক্ষতি দেখলে, দ্বীনি ও দুনিয়াবি কোনও ফায়েদা না দেখলে, মুখের ওপর যতটা সম্ভব 'নো' বলে উঠবো, ইনশাআল্লাহ। এটাই কুরআনি সুন্নাহ। নবীজি সা. দৃঢ়ভাবে কাফিরদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে 'না' বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

হে সত্য-অস্বীকারকারীগণ! আমি সেই সব বস্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর (কাফিরূন ১-২)।

১৪. কুরআন কারিমে কোনও বিষয়ে কঠিন অস্বীকৃতি বোঝাতে কাল্লা (كَلَّا) ব্যবহৃত হয়েছে। কক্ষনো না, অসম্ভব বা এ-ধরনের তীব্র মাত্রার অস্বীকৃতি জানাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নবীগণ সব সময় শিরকের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে 'না' বলে গেছেন। আমাকেও তাওহিদবিরোধী সমস্ত মতবাদ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করে, আত্মবিশ্বাসের সাথে 'না' বলতে পারতে হবে। 'না' বলতে জানতে হবে। 'না' বলতে শিখতে হবে।

১৫. গুনাহের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইউসুফ আ. কঠোরভাবে বলে দিলেন (مَعَاذَ ٱللَّهِ) আল্লাহর পানাহ। এটাও 'না' বলার আরেক রূপ। গুনাহের মুখোমুখি হলেই আমি নববি আদর্শ অবলম্বন করব। ইনশাআল্লাহ।

আসহাবে উখদুদ!

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কুরআন কারিমের আওতায় আনা মুমিনের দায়িত্ব। নিজের চিন্তার লাগামের নিয়ন্ত্রণ কুরআন কারিমের হাতে ছেড়ে দেওয়া, একজন শিক্ষিত মানুষের কর্তব্য। চিন্তা ও কর্ম জুড়ে কুরআন কারিম থাকা, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি। কিন্তু এই দুর্লভ অর্জন অধরাই থেকে গেল। কুরআন কারিমকে ধারণ করতে না পারার এক অতৃপ্তি সারাক্ষণ কুরে কুরে খায়। বিশ্বের নানাদিকে অত্যাচারিত মুসলিম জনপদগুলোর অবস্থা দেখে, সূরা বুরূজের কথা মনে পড়লো। হাদিস শরিফে এ-বিষয়ে একটা ঘটনার কথা বলা হয়েছে। সেটা একটু পড়ে দেখা যাক। উখদুদ অর্থ গর্ত। শিরোনামের অর্থ দাঁড়ায়: গর্তজীবীরা।

যু-নাওয়াস। নাজরানের বাদশা। নাজরান প্রাচীন আরবের বিখ্যাত শহর। এখানে জাদুবিদ্যার বেশ প্রচলন। এখনকার সরকারি বা দরবারি আলেমের মতো, তখন রাজদরবারে থাকতো জাদুকর। রাজার পক্ষে জাদুকরী ফলাতো। এখন যেমন সরকারি আলেমগণ শাসকের পক্ষে 'কাজ' করেন, ফতোয়া দেন। রাজ জাদুকরের বয়েস হয়ে গেছে। এখনো যোগ্য কোনও উত্তরসূরি তৈরি হলো না। এ-নিয়ে তার আক্ষেপের শেষ নেই। কী হবে তার মৃত্যুর পর? সারা জীবনের সঞ্চিত 'জাদুবিদ্যা' কি তবে বৃথা যাবে? নাহ, একটা বিহিত করতেই হবে,

'জাঁহাপনা, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। কখন মরে যাই তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমাকে একজন নবীসের ব্যবস্থা করে দিন না। তাকে গড়েপিটে নিতাম'।

কথাটা রাজার মনে বেশ ধরলো। পুরো শহর চষে উপযুক্ত এক বালককে নিয়ে আসা হলো। শুরু হলো জাদুবিদ্যা শিক্ষাদান। বালক প্রতিদিন গুরুর কাছে আসে। জাদুর তালীম নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

বালকের আসা-যাওয়ার পথেই এক রাহেব (সংসারত্যাগী আল্লাহভীরু)-এর আবাস ছিল। ঘটনাক্রমে রাহেবকে ভালো লেগে গেল বালকের। রাহেবের কথা শুনে মুগ্ধ হলো। জাদুগুরুর কাছে যাওয়ার পথে, রাহেবের কাছেও ধর্না দিতে শুরু করলো। এজন্য মাঝেমধ্যে জাদুগুরুর আখড়ায় পৌছতে বিলম্ব হয়ে যেত। বুড়ো ভেল্কিবাজ গুরু ছিল রগচটা স্বভাবের। শাগরেদের দেরি দেখলে নিজেকে সামলাতে পারত না। ধমাধম কিলঘুষি বসিয়ে দিত। নিত্যদিন দু-চার ঘা বালকের পিঠে পড়তে লাগল।

বালক পড়লো বিপদে। বুজুর্গ রাহেবের কাছে না গেলে তার ভালো লাগে না। আবার জাদুগুরুর কাছেও যেতে হবে। রাজ-ফরমান বলে কথা। এখন উপায়? শেষমেশ বুজুর্গের কাছেই কথাটা পাড়ল,

'ও আচ্ছা, এই ব্যাপার। একদম চিন্তা করবে না। জাদুগুরুকে বলবে, ঘরের লোকেরা আসতে দেয়নি। আর ঘরের লোকদের বলবে। গুরু আসতে দেননি, তাই দেরি হয়েছে'।

আপাতত একটা সমাধান হলেও, বালকের মনে প্রশ্ন উদয় হলো, কে ভালো? জাদুগুরু না ধর্মগুরু? আল্লাহ তাআলা খটকা দূর করার ব্যবস্থা করলেন। শহরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। লোকজন চলাচলের বড় রাস্তায় কোথেকে এক বিরাট অজগর এসে ঠাঁই নিল। প্রাণভয়ে লোকজন পথচলা বন্ধ করে দিল। জনজীবনে দেখা দিল অচলাবস্থা। রাস্তার দুই পাড়েই মানুষজন আটকা পড়ে রইল।

বালকের মাথায় একটা চিন্তার উদয় হলো, এবার জানা যাবে দুজনের কে ভালো। একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। মনে মনে বলল, হে আল্লাহ! রাহেব যদি আপনার কাছে সাহের (জাদুকর)-এর চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে অজগরটাকে মেরে দেখান।

পাথরটা ছুড়ে মারলো সাথে সাথে সাপটা মারা গেল। রাহেবের প্রতি বালকের আস্থা ও বিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল, জাদুগুরুর অসারতা। রাহেবের কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলল বালক। রাহেব সবকথা শুনে বললেন,
'বাছা, তুমি আজ আমার চেয়েও আগে বেড়ে গেছো। তোমার বিষয়টা আজ বড় আকার ধারণ করেছে। তুমি যদি পরীক্ষার সম্মুখীন হও, তাহলে আমার কথা কাউকে বলে দিয়ো না'।

পাথর ছুড়ে সাপ মারার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ভাবলো নিশ্চয় বালক অপার্থিব শক্তির অধিকারী। দলে দলে অসুস্থ মানুষেরা বালকের কাছে আসতে শুরু করলো। জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগীরা ধর্না দিতে শুরু করলো। রাজার এক সভাসদও বালকের কাছে এলো। তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। সাথে নিয়ে এল অগাধ ধনরত্ন,

'আমাকে ভালো করে দিতে পারলে, এসব হীরে-জহরত তোমার হয়ে যাবে।'

'আমি সুস্থ করার ক্ষমতা রাখি না। সুস্থ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, তাহলে আমি আরোগ্যের জন্যে দুআ করতে পারি।'

'ঠিক আছে ঈমান আনলাম।'

আল্লাহ সভাসদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন খুশিমনে দরবারে হাজির হলেন সভাসদ। রাজা অবাক।

'তোমার চোখ ভালো হলো কী করে?'

'আমার রব ভালো করে দিয়েছেন'।

'আমি ছাড়াও তোমার আর রব কে?'

'তিনি আমার ও আপনার রব- আল্লাহ।'

সভাসদকে গ্রেফতার করা হলো। চরম নির্যাতন চালানো হলো। সভাসদ সইতে না পেরে, শেষে বাধ্য হয়ে বালকের কথা বলে দিলেন। রাজা এবার বালকের দিকে মনোনিবেশ করলেন,

'কী ব্যাপার, খবর পেলাম তুমি নাকি সর্বরোগের আরোগ্য দানকারী'?

'আমি কাউকে আরোগ্য দান করার ক্ষমতা রাখি না। আল্লাহই সবাইকে আরোগ্য দান করেন'।

রাজার হুকুমে বালককে গ্রেফতার করা হলো। কোথায় পেয়েছে এই নতুন ধর্মবিশ্বাস, সেটা বের করার জন্যে দিনরাত নির্যাতন চালানো হলো। বালক বাধ্য হয়ে রাহেবের নাম বলে দিল। গ্রেফতার করা হলো রাহেবকে। তাকে বলা হলো,

'তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এসো।'

'আমি কিছুতেই আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না'।

করাত দিয়ে রাহেবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দু-টুকরা করে ফেলা হলো। রাজার সভাসদও একই পরিণতির শিকার হলেন। এবার বালকের পালা,

'তুমি আগের দ্বীনে ফিরে এসো'।

'আমি কিছুতেই আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না'।

রাজা হুকুম দিল,

'এই বালককে নিয়ে অমুক পাহাড়ে যাও। চূড়ায় ওঠার পর, তাকে আরেকবার তার ধর্মত্যাগ করতে বলবে। ফিরে এলে ভালো, নইলে পর্বতশিখর থেকে ছুড়ে নিচে ফেলে দেবে।

রাজার লোকেরা বালককে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেল। চূড়ায় চড়ার পর, বালক তার রবের কাছে দুআ করলো,

'আল্লাহুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা (اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ)। ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছামতো, তাদের বিরুদ্ধে আমার জন্যে আপনি যথেষ্ট হয়ে যান।

দুআ শেষ হতে না হতেই পাহাড়টা প্রবলভাবে কেঁপে উঠলো। রাজার লোক-লস্কর ছিটকে পড়ে বেঘোরে মারা পড়লো। মুমিন বালক বহাল তবিয়তে ফিরে এলো। রাজা সীমাহীন অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,

'অন্যদের কী হলো'?

'আল্লাহ তাআলাই আমার পক্ষ হয়ে তাদের ব্যবস্থা করেছেন'।

রাজা গেলেন আরো ক্ষেপে। এবার আরো বেশি লোক দিয়ে বালককে বন্দি করে পাঠালেন। বলে দিলেন,

'তাকে নিয়ে গভীর সমুদ্রে চলে যাও। ধর্মত্যাগ করলে ভালো, অন্যথায় বন্দি অবস্থাতেই ফেলে দেবে'।

বালক আগের দুআটাই আবার পড়লো। সাথে সাথে নৌকা উল্টে গেল। সবার সলিল সমাধি হলেও, বালক কুদরতি শক্তিতে বেঁচে গেল। রাজা যারপরনাই অবাক,

'বাকিরা কোথায়'?

'তাদের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। শুনুন রাজামশায়, আপনি আমাকে শত চেষ্টা করলেও হত্যা করতে পারবেন না। তবে আমাকে মারার একটা উপায় বাতলাতে পারি'।

'কী উপায়'?

'নগরবাসীকে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। তারপর আমাকে শূলে চড়িয়ে তির ছুড়ে হত্যা করতে হবে। তির ছোড়ার আগে একটা দুআ পড়তে হবে।

'কোন দুআ'?

'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম'। বালকের রব্বের নামে।

নগরবাসী আগে থেকেই সাহসী বালকের প্রতি গুণমুগ্ধ ছিল। তার প্রতি রাজার এই নির্মম জুলুম দেখে, তারা বালকের প্রতি আরো বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়লো। বালকের ধর্ম সম্পর্কে শহরবাসী কমবেশি জানতে পেরেছিল। তাকে হত্যার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদও জানতে পেরেছিল। এসব কারণে তাদের মনে বালকের ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ তৈরি হলো। বালক শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই সবাই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

রাজার দরবারে সংবাদ পৌছতে দেরি হলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজা হুকুম দিলেন,

'বিরাট বড় করে লম্বালম্বি একটিট গর্ত খোঁড়ো। গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালাও'।

যারা বালকের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করলো, তাদের সবাইকে ধরে ধরে অগ্নিগর্তে ছুড়ে ফেলা হলো। শিশুসন্তান-সহ এক মাকে ধরে আনা হলো। মা আগুনে ফেলার ভয়ে কাঁপছিলেন। তখন শিশুসন্তান মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আম্মু ভয় পেয়ো না, তুমি হকের ওপর আছো'।

গল্পের মূল বক্তব্য হাদিস শরিফ থেকে নেওয়া। কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফ উভয় নসেই ঘটনাটার উল্লেখ আছে। এজন্য ঘটনাটা গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। কিছু ঘটনা শুধু কুরআনে আছে, হাদিসে নেই, আবার কিছু ঘটনা হাদিসে আছে কুরআনে নেই। ঘটনাটা পড়লে কিছু ভাবনা মাথায় আসে। সেগুলো সেঁচে আনা যাক।

প্রথম ভাবনা : গল্পের মূল চরিত্র হলো একজন গোলাম মানে বালক। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, একজন কিশোরও বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছোটকাল থেকেই 'দাওয়াত ও কিতালের' মেজাজে গড়ে তুলতে পারলে, ভবিষ্যতে তারা উম্মাহর অমূল্য রতনে পরিণত হবে। মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী রহ. বলেছেন,

'আজকের কাঁচারাই আগামী দিনের পাকা'।

আজকের শিশুরাই আগামীকালের পুরুষ। প্রতিটি শিশুই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাবা-মায়ের হাতেই তার ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। সন্তানের সাথে সম্পর্কটা হওয়া চাই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। ভয় ও ভালোবাসার মিশেলে। স্নেহ ও শ্রদ্ধার যৌথ আয়োজনে। পিতার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা একটা বাক্যেই বলে দিয়েছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

তোমরা নিজেকে ও পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো (তাহরীম: ৬)।

নবীজি সা.-ও বলে গেছেন:

প্রতিটি শিশুই 'ফিতরাতের' উপর জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি বানায়। খ্রিস্টান বানায়। মজুসি বানায় (মুসলিম)।

দ্বিতীয় ভাবনা : শিষ্যের কথা শুনে রাহেব বললেন,

'তুমি আজ আমার চেয়ে এগিয়ে গেছো'।

চমৎকার একটা দিক ফুটে উঠেছে। উস্তাদ অম্লানবদনে স্বীকার করে নিলেন- শাগরেদের শ্রেষ্ঠত্ব। তাও সরাসরি শাগরেদের সামনে। এ-দিকটাতে আমাদের সমাজ আজও পিছিয়ে আছে। শিষ্যকে স্বীকৃতি দিতে বেজায় অনীহ আমরা। অথচ হাজার বছর আগেই এই মূল্যবোধ চর্চিত ও অর্জিত হয়েছিল। একজন বিনয়ী উস্তাদের চিত্র ফুটে উঠেছে। ছাত্ররা যদি শিক্ষকদের চেয়ে বেশি যোগ্য হয়ে না ওঠে, তাহলে সমাজ আগে বাড়বে কী করে? স্থবিরতা দেখা দেবে না সমাজে ও রাষ্ট্রে? একজন যোগ্য শিষ্যকে উস্তাদের চেয়েও যোগ্য হতে হয়। উস্তাদের সমান হওয়াও চলবে না। তাহলে বড় হয়ে কী করবে? উস্তাদের বইয়ের নোট লিখবে। অথবা উস্তাদের লিখিত বইয়ের সারসংক্ষেপ লেখায় নিরত হবে। শিষ্যকে আগে বাড়াতে হলে উস্তাদের প্রেরণার বিকল্প নেই। আলি তানতাবী রহ. বলেছেন,

'গত শতাব্দীতে সিরিয়ায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, উৎসাহদানের অনুপস্থিতি'।

শুধু শুকনো প্রশংসা নয়, পিঠ চাপড়ে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাতে হবে শিষ্যকে। এটা সুন্নাতও বটে। নবীজি সা. সব সময় এমনটাই করতেন। তিনি একবার বলেছিলেন,

'তোমাদের সেরা কারী হলো উবাই, সেরা ফরায়েজ বিশেষজ্ঞ হলো যায়েদ' (তিরমিজি)।

এ ছাড়া বড় বড় প্রায় সব সাহাবি সম্পর্কেই এক বা একাধিক প্রশংসাবাক্য-উৎসাহবাক্য উচ্চারণ করেছেন নবীজি। এটা যে সুন্নাত, সেটাই তো মাথায় থাকে না। শুধু উস্তাদ-শাগরেদই নয়, যে-কোনও গুণীর কদর ও সমাদর করা, তার গুণের স্বীকৃতি দেওয়া সুন্নাত।

তৃতীয় ভাবনা : বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা। তার ওপর তাওয়াক্কুল করা। বালক বয়েসে ছোট্ট হলেও রাহেবের কাছে এই অমূল্য শিক্ষাটা পেয়ে গিয়েছিল। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পেরেছিল,

আমাদের শিশুদের মধ্যেও এই বোধটা গভীরভাবে চারিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থ ভাবনা : একজন দায়ী কেমন হবে? বাধা পেয়ে থেমে যাবে? না তা হবে না। শত বাধা পেলেও দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। ঘটনা পড়ে জানা যায়, বারবার হত্যাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও, বালক রাজার কাছে ফিরে এসেছে। জান নিয়ে পালিয়ে যায় নি। ভয়ে পিছুও হটে নি। রাজার দরবারে ফিরে এসেছে। দমে যায় নি। হটে যায় নি।

পঞ্চম ভাবনা : দায়ীর কাজ হলো দাওয়াত দানের সুযোগ তৈরি করা। দাওয়াতের সুযোগ পেলেই কাজ শুরু করা। এমনকি নিজের জীবন দিয়ে হলেও। এটা নবীওলা সুন্নাত। নবীজি সা. কী করেছেন? সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশদেরকে আহ্বান করেছেন। মুসা আ. কী করেছেন? সুযোগ পেয়ে বলেছেন,

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى

তোমাদের নির্ধারিত সময় হলো: উৎসবের দিন। পূর্বাহ্নে লোকজনকে জমায়েত করা হবে (ত্বহা ৫৯)।

বালক কী করলো, তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, দাওয়াতের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। শুধু সম্ভ্রান্ত শ্রেণি নয়, সাধারণ জনগণের মাঝেও দাওয়াতের ফিকির করেছে মহান বালকটি।

ষষ্ঠ ভাবনা : বিজয় বা নসর মানে কী? ব্যক্তির মুক্তি? না, প্রকৃত নসর-বিজয় মানে, চিন্তা-মতবাদ ও মূল্যবোধের বিজয়। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা দলের নসরকে প্রকৃত নসর বলা যায় না। বালকটি চাইলে নিজের মুক্তি ও বিজয় নিশ্চিত করতে পারতো। কিন্তু তা না করে, সবার বিজয়ের কথা ভেবেছে।

এগারো নাম্বার আয়াতে প্রকৃত বিজয় বা বড় সফলতা বলা হয়েছে, ঈমান আনা ও সৎকর্ম করাকে। বালকটি সবার জন্যে প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করতে চেয়েছিল।

সপ্তম ভাবনা : ঘটনার এক জায়গায় ছোট্টশিশু মাকে অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছে। ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচলতা বড় বেশি জরুরি। এ-ব্যাপারে একটু শিথিলতা দেখা দিলেই সর্বনাশ। দাওয়াতের কাজ করতে গেলে, বিপদ আসবেই। তখন সবর জরুরি। নবীজি তাই বলে গেছেন,

'মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকেলে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য প্রাপ্তির বিনিময়ে সে তার দ্বীনকে বিকিয়ে দেবে' (মুসলিম)।

প্রাণঘাতি বিপদের মুহূর্তে অন্তরের ঈমান ঠিক রেখে, মৌখিকভাবে কুফুরিবাক্য উচ্চারণ করা জায়েয আছে। নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে। তবুও হিম্মত থাকলে, নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া ভালো।

অষ্টম ভাবনা : সূরা বুরুজ মক্কী সূরা। মক্কার মুসলমানরা চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। এই সূরা নাজিল করে, আল্লাহ তাআলা মুমিনগণের হিম্মত বাড়াতে চাইলেন। সাহসী বালকের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, সবরের তালকীন দিলেন। বিপদে টলে না যাওয়ার সবক দিলেন।

আমরাও বর্তমানে এই সূরা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। রোহিঙ্গা ভাইরা পারেন। কাশ্মীরি ভাইয়েরা পারেন। উইঘুর ভাইয়েরা পারেন। আল্লাহ তাআলার শিক্ষাদান পদ্ধতির দাবিও এটা। তিনি এভাবেই নবীজি সা. ও সাহাবায়ে কেরামকে গড়ে তুলেছেন। মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া আয়াত ও সূরাগুলো নাজিল হওয়ার ধারাবাহিকতা খেয়াল করলে, বড় আজিব চিত্র ফুটে ওঠে। আল্লাহ তাআলা কীভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করে তুলেছেন। ঈমানে। আকিদায়। হিম্মতে। সবরে। সাহসিকতায়।

নবম ভাবনা : সতেরো নাম্বার আয়াতে ফিরআউন ও সামূদ জাতির দিকে ইশারা করে বোঝানো হয়েছে, এত শক্তিশালী জাতি হয়েও তারা আজ কোথায়? হে রাশা! হে আমেরিকা! সূরা বুরূজে তোমাদের কথাই বলা হয়েছে। সাবধান হয়ে যাও।

দশম ভাবনা : তবে হ্যাঁ, যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, আত্মহত্যা করা যাবে না। নিজের সাধ্য অনুযায়ী শত্রুর মোকাবিলা করে যাবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবে। হিম্মত করে শত্রু থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবে। বালকটিও আগাম মৃত্যু কামনা করেনি।

এগারোতম ভাবনা : সবকিছুই উস্তাদের কাছে শিখতে হয়। একা একা শেখা 'ফিতরাতবিরোধী' ব্যাপার। এমনকি মন্দকাজ বা মন্দজ্ঞান হলেও, উস্তাদ লাগে। বালকের জাদুবিদ্যা শেখা থেকে সেটাই পরিষ্কার হয়। ব্যাবিলনের দুই ফিরিশতাও পরীক্ষামূলক জাদুবিদ্যা শিখিয়েছিলেন।

বারোতম ভাবনা : ভালোমন্দ শিক্ষা একসাথে চলতে পারে। সেটা হতে পারে মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা অবস্থায়। জানার পর, মন্দশিক্ষা আর গ্রহণ করা যাবে না। বালকও জাদু শিখেছিল। পাশাপাশি ঈমানও শিখেছিল। আল্লাহর কাছে কে বেশি প্রিয়, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর, বালক আস্তে আস্তে ঈমানি দাওয়াতের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। নির্যাতনের মুখে দুআ-দুরূদই পড়েছিল। ভ্রান্ত মন্ত্রতন্ত্র নয়।

তেরোতম ভাবনা : দাওয়াত দিতে গেলে, অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে। কারামাত প্রকাশ পেতে পারে। যেমনটা বালকের ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে দায়ী এসবকে গুরুত্ব না দিয়ে আপন কাজ চালিয়ে যাবে।

চৌদ্দতম ভাবনা : যাচাই-বাছাই করেই উস্তাদ গ্রহণ করা উচিত। বালক দুই উস্তাদের মাঝে তুলনা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। কে বেশি ভালো, সেটা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।

পনেরোতম ভাবনা : একজন দায়ী একা একা কাজ করবে না। একজন অভিজ্ঞ মুরুব্বীর অধীনে কাজ করাই ভালো। বালক তা-ই করেছে। নিয়মিত উস্তাদের সাথে পরামর্শ করেছে।

ষোলোতম ভাবনা : সবকিছু আল্লাহই করেন। বান্দা কিছুই করতে পারে না। এই বিশ্বাস রাখা। অন্যদের মাঝেও এই বিশ্বাসের প্রসার ঘটানো। বালক রাজা ও জনগণকে এটাই বোঝাতে তৎপর ছিলো।

সতেরোতম ভাবনা : একজন দায়ী আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দানের বিনিময়ে কোনও প্রতিদানের আশা করবে না। নির্লোভ থেকে কাজ করে যাবে।

আঠারোতম ভাবনা : দায়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান। তারপর আল্লাহর কাছে দুআ। এই দুই গুণ না থাকলে, পূর্ণতা আসবে না।

উনিশতম ভাবনা : জালেম শাসকরা সাধারণত বেকুবই হয়ে থাকে। পাশাপাশি তারা নির্দয়ও হয়ে থাকে। রাজা ভেবেছিল, নিজেই রোগীকে আরোগ্য দান করবে। অন্য কেউ নয়।

বিশতম ভাবনা : নিজের মতে না চললে, জালিমের শেষ অস্ত্র হলো জুলুম-নির্যাতন করা। ভয় দেখানো। ত্রাসের সঞ্চার করা। চাপ প্রয়োগ করে মানুষের টুটি চেপে ধরা। গণহারে হত্যা করা। হকের আওয়াজ বুলন্দকারীর আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।

একুশতম ভাবনা : দায়ী যখন দুআ করেন, আল্লাহ সেটা কবুল করেই নেন। বালকের দুআও আল্লাহ কবুল করেছেন।

হাইতা লাকা , মা'আযাল্লাহ!

১. সত্য আর মিথ্যা। হক আর বাতিল। ঈমান ও কুফর। তাওহিদ ও শিরক। এতদুভয়ের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। সূরা ইউসুফে অনেক বিষয়ের মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাকওয়া ও ফিসকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। যেটা প্রকাশ পেয়েছে 'জুলায়খা ও ইউসুফের' ঘটনায়। গুনাহ আমাকে ডাকছে,

'হাইতা লাকা। কাছে এসো।

আমাকে সুন্নাতে ইউসুফি মেনে দৃঢ় উত্তর দিতে হবে,

'মা'আযাল্লাহ। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই'।

আল্লামা জামি রহ.-এর ইউসুফ *জুলায়খা* মহাকাব্য না পড়লে, প্রেম কি জিনিস তা বোঝার দাবি করা বৃথা। ফারসি ভাষা না জানা আসলেই বড় এক অসম্পূর্ণতা। কী চমৎকার এক ভাষা। ইউসুফ আ. খুবই সুন্দর ছিলেন। সে যুগে রূপ-সৌন্দর্যের খুব কদরও ছিল। রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠায় সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। আশেপাশের নারীরা তো বটেই, খোদ মন্ত্রীপত্নী জুলায়খা পর্যন্ত পাগলপারা। তাঁর প্রেমে বুঁদ। অন্ধ ভালোবাসার চোরাটানে, তিনি সমাজ-সংস্কৃতি, মান-ইজ্জত সব ভুলে গেলেন। খুইয়ে বসলেন আত্মসম্মান। ইউসুফকে একটা ঘরে বন্দি করে বললেন,

'হাইতা লাকা'।

এমন মোহনীয় ছলনাময় আহ্বানে ইউসুফ আ.-এর মনেও সামান্য দ্বিধা তৈরি হয়ে গেল। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলেন,

'মা'আযাল্লাহ'।

২. এ-বিষয়ক ঘটনা হাদিসেও আছে,

তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। বৃষ্টি এলো। তারা দৌড়ে পাশের এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। পানির তোড়ে পাথরের বড় এক চাঁই এসে গুহামুখ বন্ধ করে দিল। বের হওয়ার উপায় রইল না। তারা ঠিক করলো, নিজেদের অতীতের নেক আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবে। একজন বলল,

'আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে অন্ধের মতো ভালোবাসতাম। প্রেমটা দানা বাঁধতে বাঁধতে গভীর প্রণয়ে রূপ নিল। সব সময় তার কথা চিন্তা হয়। তাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। থাকতে না পেরে তাকে প্রস্তাব দিলাম,

'হাইতে লাকা'।

সে দৃঢ়ভাবে বলল,

'মা'আযাল্লাহ'।

মেয়েটা খুবই অর্থকষ্টের মধ্যে ছিল। বাধ্য হয়ে আমার কাছ থেকে একশো দীনার করজ চাইল। আমি এক শর্তে করজ দিতে রাজি হলাম। টাকাটা তার সত্যিই দরকার ছিল। সে উপায়ান্তর না দেখে রাজি হয়ে গেল। আমি তার দু-পায়ের মাঝে বসলাম। সে চট করে বলে উঠলো,

'মা'আযাল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো'।

আমি মা'আযাল্লাহ বলে উঠে চলে এলাম।

৩. মাদরাসার নিয়ম অনুযায়ী জায়গির (লজিং) থাকতে হতো। মারুফও ছিল। আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথেই ছিল তার জায়গির বাড়ি। আসা-যাওয়ার পথে তার

কাছে প্রায়ই যাওয়া হতো। এমনিতেই। কখনো বৃহস্পতিবারে। ছুটি কাটাতে। বিশাল দিঘির পাকা ঘাটলায় চাঁদের আলোতে বসে গল্প করতে। পাশেই ছিল তালগাছ। গভীর রাতে পাকা তাল ঝরে পড়তো। সেগুলো কুড়ুনোর লোভও কাজ করতো। বড়ই মিষ্টি আর মজার ছিল তালগুলো। সামান্যতম তিতকুটে ভাবও ছিল না।

আমরা গেলেই দেখতাম মারূফ রীতিমতো জামাই আদরে আছে। কিছুক্ষণ পরপর নাস্তা আসছে। ডাবের পানি আসছে। তালের পিঠা আসছে। আমরা মেহমান হলে সাথে মোরগ জবাই হচ্ছে। ভালো ভালো বাড়তি পদ রান্না হচ্ছে। আমাদের হিংসেই হতো। কী সুখেই না আছে। আর আমরা মাদরাসায় 'পাইন্না ডাইল' খেয়ে খেয়ে মড়ার ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছি।

বাড়ির মালিক বিদেশে থাকেন। ঘরে বৃদ্ধা মা আর দুই সন্তান। বাড়িউলিই ছিলেন বর্তমান কর্তা ও হর্তা। বাজার খরচ থেকে শুরু করে ঘরের বাইরের সব কাজ মারূফকেই করতে হতো। সে গরিব ছিল। তার সব খরচ এমনকি তার পরিবারের খরচও অনেকটা বহন করতো দয়াবতী বাড়িউলি। এক শনিবারে দেখি মারূফ কিতাবপত্রের সাথে বিছানাপত্রও নিয়ে মাদরাসায় হাজির।

কি রে, সব নিয়ে এলি যে?

'আমি আর জায়গির থাকব না'।

'কেন কী হয়েছে'?

'ভালো লাগছে না!'

পরে জেনেছিলাম, সেই পুরনো সমস্যা'।

'হাইতা লাকা'।

মারূফ ইউসুফী পৌরুষ দেখিয়ে বলে এসেছে,

'মা'আযাল্লাহ'।

৪. গ্রামের বিয়েশাদিতে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এককাঁথাতে লম্বালম্বি করে দশ-বিশজনকে ঘুমুতে হয়। পর্দা-পুশিদার বালাই থাকে না। জায়গা সংকট, আসবাবের সংকটই মূল কারণ। দ্বীনের বুঝের ঘাটতিও অন্যতম কারণ। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততাও অন্যতম কারণ।

আমরা সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছি। ইচ্ছেমতো পুকুরে দাপিয়েছি। আঁখ ক্ষেত থেকে আঁখ খেতে খেতে জিহ্বা ঘা করে ফেলেছি। জমিনের মটরশুটি সেদ্ধ খেয়ে উদর কানায় কানায় পূর্ণ করে ফেলেছি। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। রাতের দিকে খেজুর রসও একদফা হয়ে গেছে। এবার শোয়ার পালা।

আমরা ছিলাম ছোট। আমাদেরকে শুইয়ে দেওয়া হলো। খাটের কোণের দিকে বড় একজনও ঘুমুতে এলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে শুনে না শুতেই ঘুমিয়ে কাদা। রাত তখন একটা কি দেড়টা। একটা তীক্ষ্ণ ডাকে ঘুম ভেড়ে গেল। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে না পেরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে উঠে দেখি ওপাশের বড় মানুষটা নেই। পরে জেনেছি, তিনি রাতে তার আম্মুকে ডেকে এনে তার কাছে ঘুমুতে চলে গেছেন। কেউ একজন তাকে বলেছিল,

'হাইতে লাকা'।

তিনি চক্ষুলজ্জার ধার ধারেননি। ভয় পাননি। দিশেহারা হননি। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেছেন,

'মা'আযাল্লাহ'।

মানুষটাকে বড় শ্রদ্ধা হয়। এখনো হয়। আজীবন হবে। তাকে কখনো বলা হয়নি তার প্রতি আজীবন কী অসম্ভব এক শ্রদ্ধা হৃদয়ে ধারণ করে আছি। ইফ্‌ফত ও ইজ্জত নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়া মেয়েগুলোর প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা।

৫. বাসে করে যাচ্ছি। শুরু থেকেই লক্ষ করছি, মানুষটা উসখুশ করছে। কারণ পাশের আসনে একজন বেগানা যুবক। রাতের গাড়ি। একজন মেয়ে একা একা দূরপাল্লার যাত্রায় কেন বের হবে? শরিয়ত ও প্রচলিত সমাজ কোনওটাই এর পক্ষে যাবে না। হয়তো বাধ্য হয়েই কোথাও যাচ্ছে। টিকেট চেক করার পর, বাতি বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর 'মানুষটা' রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়াল। চালককে গাড়ি থামাতে বলল।

'আমি এখানে বসবো না। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে দিন।

এটাই ছিল তার মা'আযাল্লাহ বলার 'স্টাইল'। কিন্তু তারও আগে কি উচিত ছিল না, একটি জানোয়ারকে 'হাইতা লাকা' বলার সুযোগ না দেওয়ার? হাইতা লাকা ও মা'আযাল্লাহ-এর প্রকাশ শুধু উপরের ক্ষেত্রগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু। প্রতিটি মন্দ ও হারাম কাজেই এর প্রায়োগিক প্রাসঙ্গিকতা বর্তায়।

আমাকে ঘুষ অফার করা হলো,

'হাইতা লাকা'।

আমি বলবো,

'মা'আযাল্লাহ'।

আমাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলা হলো,

'হাইতা লাকা'!

আমি দৃঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করে বলবো,

'মা'আযাল্লাহ'।

যে-কোনও গুনাহের আহ্বানই একেকটি 'হাইতা লাকা'।

আমাকে যে-কোনও গুনাহের বিরুদ্ধেই 'মা'আযাল্লাহ' বলতে হবে।

ইনশাআল্লাহ।

হালাল খাবার।

কুরআন কারিমের প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি শব্দ ও হরফে, বান্দার জন্যে অফুরন্ত শিক্ষা উপদেশ ও বিধান লুকিয়ে আছে। সূরা কাহফ তিলাওয়াতের সময়, একটা বিষয় অবাক করল। আসহাবে কাহফ দ্বীন রক্ষার জন্যে ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছেন। প্রাণ হাতে নিয়ে পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন।

গুহার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বের হলে, শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা। এহেন সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতেও তারা 'হালাল' খাবারের সন্ধান করা থেকে বিরত থাকেননি। বিপদ হতে পারে জেনেও, তারা উত্তম হালাল রুচিসম্মত খাবারের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছেন,

فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ

এখন রুপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক, তার কোনও এলাকায় ভালো খাদ্য আছে, সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আনুক (কাহফ ১৯)।

১. মুত্তাকিগণ শতকষ্টেও হালাল খাবার খাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। বিপদাপদ উপেক্ষা করেও হালাল খাবারের ব্যাপারে আপস করেন না।
২. মুত্তাকিগণ সুদী ব্যাংকে চাকুরি করেন না। হারাম উপার্জনকারীর কাছে মেয়েও বিয়ে দেন না।
৩. মুত্তাকিগণ খাবার গ্রহণের আগে যাচাই করে নেন, হালাল না হারাম।
৪. মুত্তাকি যুবক প্রয়োজনে রিকশা চালায়, তবুও সুদ-ঘুষের চাকরি নেয় না।
৫. মুত্তাকি যুবক হারাম রোজগারে প্ররোচিত করবে, এমন পাত্রীর ধারেকাছেও ঘেঁষে না।
৬. মুত্তাকি যুবতি হারাম থেকে বাঁচতে, সুদী ব্যাংকে লাখ টাকার চাকুরির প্রস্তাবকেও ফিরিয়ে দেয়।
৭. মুত্তাকি কাউকে ধোঁকা দিয়ে রুজি করে না, অপরের হক আত্মসাৎ করে না, বোনের হক জোর করে রেখে দেয় না।

৮. মুত্তাকি ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের সময়, রমজানের সময়, মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য কিনে, মজুত করে রাখে না। লাভ বা ব্যবসা কম হলেও, হালালের উপরই থাকে।

৯. নবীজি সা. বলেছেন,

ومن يستعفف يُعِفَّهُ اللهُ.

যে ব্যক্তি (আল্লাহর উপর ভরসা করে) নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, আল্লাহও তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন (আবু সাঈদ খুদরি রা.। মুসলিম ১০৫৩)।

১০. কুরআন কারিমে আসহাবে কাহফের যুবকদের ঘটনা কেন বলা হয়েছে? বর্তমানের তাকওয়া প্রত্যাশী যুবকগণ যেন তাদের আদর্শ থেকে প্রেরণা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

কুরআনি নিয়ন্ত্রণ

একজন মুমিনের জীবন কেমন হবে? কুরআনময় হবে। মুমিনের দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কুরআনময় হবে,

১. কুরআন কারিম আমাদের হাঁটাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না (ইসরা ৩৭)।

ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে না চলার কথা, হুবহু আরও একবার বলেছেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না (লুকমান ১৮)।

২. কুরআন কারিম আমার হাঁটাচলাকে সুন্দর করতে বলেছে।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

৩. কুরআন আমার গলার আওয়াজ (স্বর)-কে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর (লুকমান ১৯)।

৪. কুরআন কারিম আমার নজরকে সংযত করতে বলেছে,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

আপনি (পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে) চোখ তুলে তাকাবেন না (তোয়াহা ১৩১)।

৫. কুরআন কারিম আমার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে শুদ্ধতর (নূর ৩০)।

নারীদের কথাও আলাদা করে বলা হয়েছে,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে (নূর ৩১)।

৬. কুরআন কারিম আমার শ্রবণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

وَلَا تَجَسَّسُوا

তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না (হুজুরাত ১২)।

৭. কুরআন কারিম আমার পানাহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

এবং খাও ও পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না (আ'রাফ ৩১)।

৮. কুরআন কারিম আমার কথা বা উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে (বাকারা ৮৩)।

৯. কুরআন কারিম আমার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

তোমরা অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোনও কোনও অনুমান গুনাহ (হুজুরাত ১২)।

১০. কুরআন কারিম আমাদের বৈঠক-মজলিসকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না (হুজুরাত ১২)।

ক. কুরআন কারিম আমার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নিয়ন্ত্রণ সানন্দে মেনে নেওয়ার মধ্যেই আমার চূড়ান্ত সাফল্য।

খ. কুরআন কারিমের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলেই আমি ইহকাল ও পরকালে সুখী ও সৌভাগ্যবান হতে পারব।

ময়দানের সালাত!

১. সালাত ছাড়া মুসলিম জীবন কল্পনাই করা যেত না একসময়। কিন্তু আজ মসজিদ বেড়েছে, মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে, বাড়েনি নামাজির পরিমাণ। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই মুসলিম সমাজ ও জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। এক আরব শায়খ বলেছে,

আমার কাছে ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতো। আমিও যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম। একবার একছাত্র বেশকিছু জটিল প্রশ্ন নিয়ে এল। বোঝা যাচ্ছিল, বেচারাকে 'আধুনিক ইসলামের' ভূতে পেয়েছে। মানে চৌদ্দশ বছরের পুরোনো কুরআনি বিধান এখন আর পুরোপুরি ফিট নয়। ঠান্ডা মাথায় তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কী বুঝেছে আল্লাহ মালুম। কথা বাড়ায়নি। যাওয়ার আগে তার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি যেসব খটকা নিয়ে এসেছ, ভার্সিটির অন্য ছাত্ররাও কি এসব নিয়ে ভাবে? বর্তমানে তোমাদের মতো উঠতি যুবকদের কোন চিন্তাগুলো বেশি নাজেহাল করে?

'শায়খ সত্যি বলতে কি, আমাদের বয়েসি বেশির ভাগ ছাত্র তেমন করে চিন্তাই করে না। তাদের ভাবনা হলো কোনও রকমে পড়াশোনা শেষ করে বিয়েশাদি করে, টাকা-পয়সার ধান্ধা করা'।

তাদের সবাই ধার্মিক? দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকর্ম মানে?

জি না। বেশির ভাগই ধর্মকর্মের অত ধারধারে না।

তোমার মতো সংশয়বাদীর সংখ্যা কেমন হবে?

খুব বেশি নয়। তবে যা আছে, তাও কম নয়।

তুমি দ্বীনের উপর চলতে চাও বলেই আমার কাছে এসেছ। তোমার কী মনে হয়, তোমাদের মধ্যে এসব সংশয় কেন জাগে? এর উৎস কী?

শায়খ, আমি এসব সংশয়ের উৎস নিয়ে অনেক ভেবেছি। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের বইপত্র পড়া, প্রাচ্যবিদদের বই পড়াসহ আরও বেশ কিছু কারণ আছে। তবে এসব

হলো বাইরের কারণ। শরীরে রোগ আসে বাহির থেকে। শরীরের প্রতিরোধশক্তি কমে যাওয়ার কারণেই রোগ বাসা বাঁধার সুযোগ পায়। চিন্তার আগ্রাসনগুলোও তেমনি। আমরা যেসব সংশয়ের আঘাতে জর্জরিত, তার সবটাই এসেছে বাহির থেকে। এগুলো আমাদেরকে আক্রান্ত করতে পারত না, যদি আমাদের চিন্তাগুলো আগে থেকে সুরক্ষিত থাকত। আমাদের চিন্তাগুলো আগে থেকেই প্রতিরোধশক্তিহীন হয়ে ছিল। সংশয়গুলো এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে। মূলত দুটি কারণে আমাদের চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়েছে,

ক. কুরআন কারিম থেকে দূর সরে যাওয়া।

খ. সালাত আদায় না করা।

সালাতে অবহেলা করলে মুসলমান তার চিন্তা-কর্মে মারাত্মক সব হুমকির সম্মুখীন হয়। আমি নিজের জীবন দিয়ে এটা বুঝতে পারছি।

২. একজন বললেন, আমি একবার ভূমি অফিসে গিয়েছিলাম। কাজ শেষ হতে হতে জোহরের সময় হয়ে গেছে। একজন অফিসকর্তাকে দেখতে শুনতে বেশ পরহেজগার মনে হলো। তিনি এককোণে গিয়ে আজান দিলেন। ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে দ্রুত কাতারও বানিয়ে ফেললেন। সুন্নত পড়া শেষ। জামাত দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকজন এসে জামাতে যোগ দিল। সালাম ফিরিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, অফিসের বেশিরভাগ কর্মকর্তা নিজ নিজ টেবিলে বসে আছেন। অধিকাংশই কোনও কাজ করছেন না। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছেন, না হয় গল্প করছেন। দুপুরে কাজের চাপ একটু কমই থাকে। এতগুলো মানুষ কেন জামাতে শরিক হলেন না? এত সহজ আর সুলভ হওয়া সত্ত্বেও?

৩. আরেক ভাই বললেন, আমি তখন রিয়াদে চাকুরি করি। মালিকের প্রয়োজনে এক হাইপার মার্কেটে গেলাম। প্রয়োজনীয় কাজ সারতে আসরের সময় হয়ে এল। জামাতের সময় কাছিয়ে এলে মার্কেটের শাটার নামিয়ে দেওয়া হলো। আমি জামাত ধরতে গেলাম। পেছন ফিরে দেখি, দরজা বন্ধ হলেও ভেতরে এখনো অনেক মানুষ রয়ে গেছে। নামাজ পড়ে এসে দেখি তারা আগের মতোই ঝুড়ি হাতে ঘুরছে। এটাসেটা উঠিয়ে নিচ্ছে। এতগুলো মানুষ নামাজ পড়ল না? তারা কোন ওজরে সালাত ত্যাগ করল?

৪. বিমান চলছে। যাত্রীরা প্রায় সবাই মুসলিম। নামাজের সময় হলো। যাত্রীদের কেউ বিমানের টিভিতে মগ্ন আর কেউ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাতেগোনা কয়েকজন উঠে গিয়ে নামাজ পড়ে এল। সূর্য উঠতে আর বেশি দেরি নেই। নামাজের সুন্দর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৯৯% ভাগ মানুষ কেন নামাজ পড়ল না? অথচ একটু পর নাস্তা পরিবেশন করার সময় ঠিকই টিভি ও ঘুম বাদ দিতে পেরেছিল।

৫. ইসলামি দেশ বলেই সারা বিশ্বে পরিচিত। ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। ফাইনাল। গ্যালারি কানায় কানায় ভর্তি। বেশিরভাগ দর্শক আসরের সময় থেকে হাজির আছে। জায়গা দখল করতে আগেই এসে পড়েছে। আসর গেল। মাগরিব গেল। ঈশার জামাতও চলে গেল। স্টেডিয়ামের পাশেই মসজিদ। সবার কানেই আজানের সমধুর ধ্বনি ভেসে এল। কিন্তু দুয়েকজন ছাড়া ১০০% জনই নামাজে গেল না। খেলার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকল। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম আমলি স্তম্ভের প্রতি এমন অবহেলা? ঈমানের কি হালত?

৬. সমস্যাটা ভয়াবহ। আমরা কুরআন কারিমের আলোকে বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখি। জিহাদের ময়দান। দুই পক্ষের তুমুল লড়াই চলছে। জীবন-মরণ মুহূর্ত। একটু বেখেয়াল হলেই প্রতিপক্ষের তির এসে বুক-গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। বিন্দুমাত্র পিছু হটার সুযোগ নেই। এমন অবস্থাতেও কুরআন কারিম মুসলিম বাহিনীকে জামাতে সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছে। এমন সঙ্গীন মুহূর্তেও শরিয়ত জামাত তরক করার অনুমতি দেয়নি। পালাক্রমে হলেও সালাত আদায় করতে হবে,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

এবং (হে নবী!) আপনি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও তাদের নামাজ পড়ান, তখন (শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে,) মুসলিমদের একটি দল আপনার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। অতঃপর তারা যখন সিজদা করে নেবে, তখন তারা আপনাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনও নামাজ পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা আপনার সাথে নামাজ পড়বে। তারাও নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সাথে রাখবে। কাফিরগণ কামনা করে, আপনারা যেন আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হন, যাতে তারা অতর্কিতে আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত থাকেন, তবে নিজেদের অস্ত্র রেখে দিলেও আপনাদের কোনও গুনাহ নেই; কিন্তু আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবেন (নিসা ১০২)।

৭. যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালেও সালাত তো বটেই, জামাত পর্যন্ত তরক করতে নিষেধ করেছেন। আরেক আয়াতে আরও কঠিন করে বলা হয়েছে। নামাজ ছেড়ে দিলে তার পরিণতি কী হবে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাজ কায়েমের হুকুম করা হয়েছে। না করলে কী হবে সেটা সরাসরি বলে বিপরীতটা বলা হয়েছে,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নামাজ কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (রূম ৩১)।

৮. ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, সালাত-বিষয়ক যত আয়াত আছে, তার মধ্যে এই আয়াতই সবচেয়ে বেশি অর্থবহ। ভীতিপ্রদও বটে। ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞাবশত কেউ সালাত কায়েম না করলে ঈমান চলে যাবে। আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে, সালাত তরক করা মুশরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লাহুয়ুবিল্লাহ। আমি একজন মুসলিম হয়ে মুশরিকের স্তরে নেমে যাওয়াকে কীভাবে মেনে নিতে পারি?

৯. কারো কারো ধারণা, দেরি করে হোক বা যেনতেন কোনও রকমে নামাজ পড়লেই বাঁচা যাবে। তারা কোনও রকমে নামাজ পড়ে নেওয়াকে দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে বলে মনে করে। তাদের জেনে রাখা উচিত, সালাতে গড়িমড়ি করা, বিলম্ব করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে (নিসা ১৪২)।

১০. কুরআন এখানেই থামেনি। মুনাফিকদের সালাত সম্পর্কে আরও বলেছে,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ

এবং তারা সালাতে এলে গড়িমসি করেই আসে (তাওবা ৫৪)।

১১. নবীজি সা.-ও মুনাফিকের সালাত সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন,

تلك صلاةُ المنافِقِ، يجلسُ يرقُبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَيِ الشيطانِ، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا

মুনাফিকের সালাতের ধরন হলো, সে বসে বসে সূর্য ডোবার অপেক্ষায় থাকে। যখন সূর্য প্রায় ডুবে যেতে বসে, সে উঠে পাখির ঠোকরের মতো দ্রুতলয়ে চার রাকাত পড়ে নেয়। সে খুব অল্পই আল্লাহর জিকির করে (আনাস বিন মালিক রা। মুসলিম ৬২২)।

১২. মুনাফিকও সালাত আদায় করে। কুরআন কারিম ও সুন্নাহয় সালাতের প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে,

ক. সে আলস্যভরে সালাত আদায় করে। না পারতে বাধ্য হয়ে সালাতে দাঁড়ায়।

খ. সে বিলম্ব করে সালাত আদায় করে। একেবারে শেষ সময়ে।

গ. সে দ্রুতলয়ে সালাত আদায় করে।

১৩. আমি যদি সালাত আদায়ে অলসতা করি, গড়িমসি করি, তাড়াহুড়ো করি, তাহলে আমার সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। আমার আচরণ মুনাফিকের আচরণের সাথে মিলে যাচ্ছে। আমি অজান্তেই মুনাফিকের কাতারে চলে যাচ্ছি না তো?

১৪. কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের কুফরির কারণে। বিশেষ করে তাদের সালাত তরকের কারণে,

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

এবং পায়ের গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে যাবে। সে দিন সকলের যাত্রা হবে আপনার প্রতিপালকের নিকট। তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করেনি ও নামাজ পড়েনি, বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (কিয়ামাহ ২৯-৩২)।

১৫. সালাত শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বা ওঠবসের নাম নয়। সালাত বাহ্যিক নড়াচড়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। সালাত আমাদের আখলাককে পরিশুদ্ধ করে। আমাদের চরিত্রকে সংশোধন করে,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

(হে নবী!) ওহির মাধ্যমে আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করুন ও নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে (আনকাবূত ৪৫)।

১৬. একজন ব্যক্তি নামাজ পড়ে আবার সুদ-ঘুষ খায়, তাহলে বুঝতে হবে, সে যথাযথভাবে নামাজ পড়ে না। সঠিকভাবে নামাজ পড়লে কারও চরিত্রে গুনাহের লেশমাত্র থাকতে পারে না। নবীগণের সালাত কেমন ছিল? তারা শুধু সালাত কায়েমই করতেন না, তারা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতেন। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করতেন। তারা আল্লাহর কাছে নিয়মিত দুআ করতেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে যথাযথভাবে সালাত আদায়ের শক্তি দান করেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (-এর মতো পুত্র) দিয়েছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যাধিক দুআ শ্রবণকারী। হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদদের মধ্য থেকেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামাজ কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দুআ কবুল করে নিন (ইবরাহিম ৩৯-৪০)।

১৭. আমি কতকিছুর জন্যে দুআ করি। আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে, স্বপ্নপূরণের জন্যে। টাকা-পয়সা ধনদৌলতের জন্যে। জানমালের হেফাজতের জন্যে। কিন্তু কখনো কি আল্লাহর ইবাদতে মতি হওয়ার জন্যে, ভালোভাবে ইবাদত করতে পারার তাওফিক লাভের জন্যে দুআ করেছি?

১৮. শরিয়তের বিধানগুলো ওহির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। সালাত তার ব্যতিক্রম। সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছিল নবীজি সা.-কে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে গিয়ে। হিজরতের তিন বছর আগে। সালাত ফরজ হওয়ার বিধান নবীজি সা. সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে শুনেছেন।

১৯. বুখারির বর্ণনায় বিস্তারিত আছে। প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছিল। মুসা আ.-এর অনুরোধে নবীজি কয়েকবার আল্লাহর কাছে গিয়ে পরিমাণ কমিয়ে পাঁচে নামিয়ে এনেছিলেন। পাঁচ হলেও সওয়াব মিলবে ৫০ ওয়াক্তের। সালাতের ফরজকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন 'আমার ফরজ',

إِنِّي قد أمضيتُ فريضتي وخفَّفتُ عن عبادي، وأجزي الحسنةَ عشرًا.

আমি আমার ফরজ বাস্তবায়ন করেছি। আমার বান্দাদের থেকে দায়িত্ব হালকা করেছি। আর পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ করে বাড়িয়ে দেব (বুখারি ৩২০৭)।

২০. ফিরিশতাগণ বান্দাদের আমলনামা নিয়ে আসমান-জমিনে ওঠানামা করে। তাদের ওঠানামার সময়টাও সালাতের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত,

يتعاقبون فيكم: ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار، ويجتمعون في صلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجرِ، ثم يعرجُ الذين باتوا فيكم، فيسألُهم، وهو أعلمُ بهم، كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُّون، وأتيناهم وهم يُصلُّون

ফিরিশতারা পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসে। রাতের ফিরিশতা ও দিনের ফিরিশতা। ফজর ও আসরের সময় তারা জমায়েত হয়। রাতে যারা আমাদের এখানে ছিল, তারা ঊর্ধ্বগমন করে। তাদের রব সবকিছু ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও ফিরিশতাদের কাছে জানতে চান,

তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছ?

আমরা তাদেরকে সালাত আদায়রত রেখে এসেছি। আবার তাদের কাছে গিয়েও তাদেরকে সালাত আদায়রত পেয়েছি (আবু হুরায়রা রা.। বুখারি ৫৫৫)।

২১. মানুষ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই ওসিয়ত করে। নবীজি সা. শেষশয্যায় একেবারে অন্তিম মুহূর্তে বলেছেন,

الصَّلاةَ الصَّلاةَ اتَّقوا اللهَ فيما ملكَتْ أيمانُكم

তোমরা সালাতের ব্যাপারে সতর্ক হও। তোমরা দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক হও (আলি রা। আবু দাউদ ৫১৫৮)

২২. একজন মানুষ সারা জীবন বিভিন্ন নেক কাজ করে, রোজা রাখে, কুরবানি করে, হজ করে, যাকাত দেয়, পাশাপাশি সালাতে অবহেলা করে। বেচারার অজান্তেই তার আমল বাতিল হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টা জানতেন। আবু মুলিহ রহ. বর্ণনা করেছেন, আমরা এক যুদ্ধে বুরাইদা রা.-এর সাথে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তিনি বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি আসর পড়ে নাও। কারণ নবীজি সা. বলেছেন,

من ترك صلاةَ العصرِ فقد حَبِطَ عملُه

আসর নামাজ না পড়লে আমল বাতিল হয়ে যায় (বুখারি ৫৫৩)।

২৩. হাদিসের এক অর্থ এটা হতে পারে, তার আমলনামার অন্য আমল বাতিল হয়ে যাবে। অন্য অর্থ হতে পারে, সে ব্যক্তি আসর আদায়ের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

২৪. শুধু কি ফরজ নামাজের গুরুত্ব? নবীজি সা. নফল নামাজের জন্যে পরিবার-পরিজনকে গুরুত্বের সাথে গভীর রাত ডেকে দিয়েছেন। আলি রা. বলেছেন,

আল্লাহর রাসুল সা. রাতের বেলা তার ও ফাতেমার ঘরে টোকা দিয়ে বলেছেন,

ألا تُصلُّونَ

কি, তোমরা সালাত আদায় করবে না? (বুখারি ৭৪৬৫)।

২৫. নফলের জন্যে যদি এমন হয়, তাহলে ফরজের গুরুত্ব কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামের জন্যে। তাহাজ্জুদ সালাতের যদি গুরুত্ব না থাকত, নবীজি কেন গভীর রাতে নিজ কন্যা আর চাচাতো ভাইয়ের কাঁচা ঘুম ভাঙাতে যাবেন? তিনি আল্লাহর হুকুম পালনার্থেই এমনটা করেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ করুন (তোয়াহা: ১৩২)।

২৬. ইবরাহিম আ-এর ঘটনাটা তো ভীষণ বিস্ময়কর। তিনি কী করলেন? বায়তুল্লাহর কাছে, স্ত্রী ও পুত্রকে ক্ষেত-খামারহীন উপত্যকায় রেখে চলে গেলেন। পর্যন্ত খাবার-দাবারের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাদের জন্যে নিরাপত্তার দুআ করলেন না। রিজিকের দুআ করলেন না। কেন এমনটা করলেন?

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

হে আমাদের প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্যে করেছি) যাতে তারা নামাজ কায়েম করে (ইবরাহিম ৩৭)।

তিনি জানতেন, সালাতই সবকিছু এনে দেবে। সালাতই খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দেবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেবে। সালাতের বদৌলতে আল্লাহই সবকিছুর আঞ্জাম দিয়ে দেবেন।

২৭. সালাত হবে মুমিনের দ্বিতীয় প্রাণ। পানি ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, মুমিনের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। সালাত ছাড়া তার কাছে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন মনে হবে।

প্রতিবেশী!

একটা গল্প পড়েছিলাম। মেয়েটা ডাক্তারি পড়ে। তার গন্ধসুচিবায়ু রোগ আছে। সামান্যতম দুর্গন্ধও সহ্য করতে পারে না। অনেক দূরের ক্ষীণতম গন্ধও নাক টেনে টের পেয়ে যায়। সু ও কু উভয় 'বাস'ই সে বুঝতে পারে। বাবা-মা পাড়া-প্রতিবেশী তার জ্বালায় অতিষ্ঠ। একটুও দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ঘরবাড়ি নিকিয়ে শুকিয়ে তকতকে করে রাখতে রাখতে মায়ের কোমর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। কাজের লোক এসে বেশিদিন টিকতে পারে না। মেয়ের ছোঁকছোঁকে স্বভাবের ছ্যাঁকায় বাপ-বাপ করে পালিয়ে বাঁচে।

তার রোগের ভালো দিকও আছে। বাবার আগে সিগারেটের নেশা ছিল। পোড়া তামাকের গন্ধ মেয়ে সহ্য করতে পারত না। বাবা অনেক সতর্ক থেকেও মেয়ের ঝাঁজালো নাকের খাঁজ থেকে রেহাই পেত না। সিগারেট টানার পর ভালো করে মৌরি চিবিয়ে, অফিস থেকেই জামা-কাপড় বদলে ফুল বাবুটি হয়ে ঘরে ফিরত। দামি সেন্টের শিশি উজাড় করে বিলাত শরীরে। কাজের কাজ হতো না কিছুই। ঘরের দরজায় পা দিতে না দিতেই মেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে দুহাতে নাক চেপে বাবার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যেত। কখনো বেসিনে গিয়ে ওয়াক ওয়াক বমিও করত।

কোন বাবাই-বা আদরের মেয়েকে আদর না করে থাকতে পারে? ছাড়লেন বহুদিনের নেশা। তামাকের নেশা আছে এমন বন্ধু-বান্ধবেরও বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে তাদের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। কী আর করা, মেয়ে বড় না বন্ধু-বান্ধব বড়?

একটিমাত্র মেয়ে। আর কোনও সন্তান হয়নি। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শহরতলিতে জমি কিনলেন। সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করে। নামমাত্র মূল্যে বিরাট জমি পেয়ে গেছেন। আশেপাশে ফ্ল্যাট উঠে গেছে। শুধু এই প্লটটা অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে ছিল। দালালের সাথে গিয়ে নিজে দেখে এসেছেন। প্রায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলেন বাবা। সবকিছু শুনে স্ত্রীও মহাখুশি। মেয়ের থাকার ঘর আর চেম্বার একসাথেই করা যাবে। ওদিকটা বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। চাইলে মানানসই একটি

ক্লিনিকও করে ফেলা যাবে। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না। ডাক্তারি পড়া শেষ করেই স্বাধীনভাবে পেশাচর্চা করতে পারবে।

বাড়ি তৈরি শুরু হলো। এতকিছু হয়ে যাচ্ছে, মেয়েকে কিছুই জানানো হলো না। সারপ্রাইজ দেবে বলে। গ্রীষ্মের ছুটির আগেই বাড়ির কাজ শেষ করা হবে। মেয়ের মেডিকেল কলেজ তখন ছুটি হবে। লম্বা সময় বাবা-মায়ের সাথে থাকবে। তখন শহরের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে ওঠা হবে।

সব ঠিকঠাক। মেয়েকে নিয়ে বাবা-মা নতুন বাড়িতে উঠলেন। মেয়ের নাকে যাতে কোনও প্রকার দুর্গন্ধের ছিঁটেফোটাও না লাগে, সেজন্য বাড়ির চারপাশে ফুলের বাগান করা হয়েছে। মৌসুমি ও বছরব্যাপী সব ধরনের ফুলের চাষ করা হলো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। মেয়ে বাস থেকে নেমেই নাকমুখ কুঁচকে ফেলল। তা দেখে বাবার কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। -কী হলো মা?

'বাবা তুমি গন্ধ পাচ্ছ না'?

বাবা বাতাস টেনে দেখলেন সত্যি সত্যি একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মেয়েকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘরে এনে তুললেন। ঘরে এসে মেয়ে আরও বেশি দুর্গন্ধ পেতে লাগল। ছাদে গিয়ে দেখল আকাশে শকুন উড়ছে। একটা পচা মাংসের টুকরা এসে মেয়ের গায়ের উপর পড়ল। দুর্গন্ধে মেয়ে ছাদের উপরে বমি করে ভাসিয়ে দিল। আর বমি থামে না। শেষতক অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো।

বাবা-মা মুষড়ে পড়লেন। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আগে খেয়াল করেননি। দাম কম দেখেই বায়না করে ফেলেছেন। চারপাশের সব ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেলেও এটা কেন রয়ে গেল, ব্যাপারটা একটুও মাথায় এল না কেন? বাড়ির দক্ষিণে উঁচু পাঁচিলঘেরা একটা জায়গা ছিল। সেটা ছিল 'ভাগাড়'। শহরের সমস্ত মরা পশু এখানে এনে ফেলা হতো। বাড়ি করার সময়ও দুর্গন্ধটা নাকে এসেছিল। কিন্তু গায়ে মাখেনি। এখন কী হবে? সারা জীবনের সঞ্চয়ের শেষ পাই-পয়সা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পেছনে। নতুন করে অন্য কোথাও বসতি গাড়া অসম্ভব। আবার মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়িতে বাস করাও সম্ভব নয়। একূল-ওকূল দুকূলই চলে গেলে। কী হবে?

গল্পটা পড়তে গিয়েই এক মহীয়সীর কথা মনে পড়ে গেল। যেখানেই যাই, যা কিছুই পড়ি, আল্লাহর রহমতে মনটা ঘুরেফিরে দিনশেষে কুরআন কারিমের নীড়েই ফেরে। এবারও ফিরল। এক নারীর কাছে। কুরআনি নারী। সর্বকালের সেরাদের একজন তিনি। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেছেন,

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন (তাহরীম ১১)।

১. আমরা ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়ার কথা বলছিল। যিনি কুফরের দুর্গে বাস করেও অতল ঈমানের অধিকারী ছিলেন।

২. শুধু তা-ই নয়, তিনি একজন মহান নবীর পালকমাতাও ছিলেন। মুসা আ.-কে পরম আদর-সোহাগে মানুষ করেছিলেন তিনি।

৩. কথায় আছে, ঘর বানানোর আগে প্রতিবেশী কেমন সেটা দেখে নিতে হয়। ঘরের ভিটে উত্তম-অনুত্তম দেখার আগে প্রতিবেশী উত্তম না অনুত্তম সেটা দেখা জরুরি।

৪. জান্নাতে ঘর তো সবাই পাবে। কিন্তু কজনের মনে আল্লাহকে প্রতিবেশী হিশেবে পাওয়ার তামান্না জাগ্রত থাকে? আসিয়া সেই দুর্লভ ঘরানার মানুষ। তিনি বাড়ি বায়না করার সাথে সাথে আবদার জুড়েছেন, 'আপনার কাছে (عِندَكَ)' বলে।

৫. আমি ফ্ল্যাট কেনার আগে, জমি কেনার আগে, ইনদাকা (عِندَكَ) ঠিক আছে কি না, সেটা ভালোমতো যাচাই করছি তো?

৬. অফিসের কলিগ-বন্ধুরা মিলে ফ্ল্যাট বুকিং দিচ্ছে। আমাকেও জোর করে জুড়েছে তাদের জুড়িতে। তারা আমাকে আল্লাহর প্রতিবেশী থাকতে দেবে তো? নাকি শয়তানের প্রতিবেশী বানিয়ে দেবে? সরস্বতি পূজা, দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সদস্য বানিয়ে দেবে?

৭. হোস্টেলে বা মেসে আমার প্রতিবেশী ঠিক আছে তো? দেখেশুনে উঠছি? তাদের তাসের আড্ডার সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি? আমার রুমমেট নামাজি?

৮. বাসে-রেলে সহযাত্রী বেগানা কেউ পড়ে গেলে, মন খুশিতে নেচে ওঠে নাকি আল্লাহর ভয়ে কুঁকড়ে যায়?

৯. আমি কি মেস ভাড়া করার সময় আল্লাহর ঘরকে প্রতিবেশী হিশেবে পাওয়ার চেষ্টা করি নাকি যা হোক একটা কিছু জুটে গেলেই উঠে যাই?

১০. আসিয়ার মতো সবকিছুর আগে আমার মাথায় 'আল্লাহ' আসেন? আল্লাহকে প্রতিবেশী হিশেবে পেতে ইচ্ছে করে? ইচ্ছেটা কতটা জোরালো?

নারীরোগ

আগের যুগে হেকিমগণ মানুষের নাড়ি ধরে রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। সেটা ছিল শারীরিক রোগ। বর্তমানে একটা রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নাম তার 'নারীরোগ'। কুরআন কারিমে খুব বেশি রোগের কথা উল্লেখ নেই। কুরআনে বর্ণিত অল্প কটি রোগের মধ্যে 'নারীরোগ' অন্যতম। সরাসরি নেই, পরোক্ষভাবে আছে।

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে যাদের ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো ন্যায়সংগত কথা (আহযাব ৩২)।

১. নারীর কোমল কথা শুনে, নারীর ছলনা-নখরা দেখে, নারীর রূপগুণ দেখে, অন্তর পাপাসক্ত হয়ে পড়াকে কুরআন 'ব্যাধি' বলে আখ্যায়িত করেছে।

২. পরকিয়াও একটি মানসিক ব্যাধি। যা তা ব্যাধি নয়, ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক ব্যাধি। ক্যান্সারে দুনিয়া শেষ হলেও, এর বিনিময়ে আখিরাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু 'নারীরোগ' হলে দুনিয়া-আখিরাত সবই বরবাদ।

৩. এই ব্যাধির ধরন ও মাত্রা একেকজনের মধ্যে একেক রকম। কারো মধ্যে রোগের প্রকোপ, বেগানা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কারো মধ্যে ফোনে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারো মধ্যে 'আননোন' নম্বর থেকে ফোন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. নবীজি সা.-ও এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

আমার পরে পুরুষের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ফিতনা হলো নারী (উসামা বিন যায়েদ রা.। বুখারি ৫০৯৬)।

৫. এই রোগের প্রধান প্রতিকার কুরআন কারিম দিয়েছে, নারীকে সংযত থাকার মাধ্যমে। নারীকে কথাবার্তা সংযত হয়ে বলার হুকুম দিয়েছে। নারীকে তাকওয়া অবলম্বন করার হুকুম দিয়েছে; নারী সংযত থাকলে দুষ্টমতি বিকারগ্রস্ত বিকৃত লালসার পুরুষগুলোর 'নোলা' চকচক করে ওঠার সুযোগ পাবে না। কিন্তু,

ক. এখন দেখা যায় নারীরা তাকওয়া তো দূরের কথা, কথাবার্তাকে আরও কত আকর্ষণীয় করে বলা যায়, তার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

খ. নারীরা এমন বেশভূষায় ঘরের বাহির হয়, সুস্থ পুরুষও কুরআনে বর্ণিত অসুখে 'অসুস্থ' হয়ে পড়ে।

গ. ধর্মীয় ঘরানার বাইরের মহিলা, যারা পর্দা মানে না, তাদের কথা না হয় তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ধর্মীয় ঘরানার কেউ বেহায়া-বেশরমের মতো পরপুরুষের সাথে রাস্তায় নেমে পড়লে সেটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে বৈকি।

ঘ. ধর্মীয় ঘরানার কোনও মহিলাকে যদি দেখা যায়, বেগানা পুরুষদের সাথে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গেও 'কমেন্ট' চালাচালি করছে, বোঝা যায় কিয়ামত আর বেশি দেরি নেই।

৬. আর পুরুষের দিক থেকে এ-রোগ থেকে বাঁচার উপায় হলো,

ক. যতবেশি সম্ভব বেগানা নারীর সংশ্রব এড়িয়ে যাওয়া। অনলাইনে অফলাইনে এমনকি কোনও বেহায়া নির্লজ্জ বেশরম মহিলা কমেন্টবক্সে এসে 'গালির' তুফান বইয়ে দিলেও তার জবাব দিতে না যাওয়া। বেগানা নারীর সাথে প্রেমের কথা বলা যেমন গুনাহ, বিনা প্রয়োজনে রাগের কথা বলাও গুনাহ। কমেন্টের জবাব দিতে যাওয়া মানে, তার বেহায়াপনাকে উস্কে দেওয়া। সমর্থন করা। এটা গুনাহ।

খ. চরিত্রহীন পুরুষ আর বেহায়া নারী, উভয়েই বিপজ্জনক। এরা উভয়েই 'পাগলা কুকুরের' মতো ভয়ংকর। ঈমান আমল ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

৭. কোনও পুরুষ যদি এই 'ব্যাধিতে' আক্রান্ত হয়েই পড়ে, তার আরোগ্যের উপায় কী? তার আরোগ্যের উপায় হলো,

ক. কোনও বুজুর্গ ব্যক্তির সুহবতে যাওয়া। নেককারের সুহবত অত্যন্ত শক্তিশালী।

খ. সুযোগ হলে বিয়ে করে ফেলা। বিবাহিত হলে বিবির সাথে সম্পর্ককে ভালো করে ঝালাই করে নেওয়া।

গ. কুরআন কারিমের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া।

উফ!

বাবা-মা মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। আল্লাহর অপূর্ব এক নিয়ামত। সময় ও সুযোগ থাকাবস্থাতেই এই নিয়ামতের যথাযথ কদর করা আবশ্যক। একবার হারিয়ে গেলে, আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো (ইসরা ২৩)।

বাবা-মায়ের সাথে ন্যূনতম দুর্ব্যবহার তো করা যাবেই না, সামান্য উফ পর্যন্ত বলা যাবে না। উফ (أُفٍّ) দুটি হরফ দিয়ে গঠিত,

১. আলিফ। হলকের শুরু হতে উচ্চারিত হয়।

২. ফা। দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়।

দুই হরফ মাখরাজের দুই প্রান্তসীমা থেকে উচ্চারিত হয়। ভাব অনেকটা এমন, এই দুই সীমার মাঝে অবস্থিত বিভিন্ন মাখরাজ থেকে যা কিছু উচ্চারিত হয়, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানগুলো সচেতনভাবে ব্যবহার করো। এমন কিছু যাতে বের না হয়, যা বাবা ও মায়ের মনে কষ্ট দেয়।

শুদ্ধতার সনদ

১. কুরআন কারিম হাতে নিলে, হাত প্রায়ই অজান্তে সূরা নূরে চলে যায়। সবচেয়ে প্রিয় তিনজন মানুষের কষ্টটা বোঝার চেষ্টা করি। ইফকের আয়াতগুলো পড়ে, চুপচাপ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। নবীজি সা., আবু বকর ও আয়েশা রা.-এর সীমাহীন মনোবেদনার কল্পনা করে, মনটা ছটফট করে ওঠে।

২. কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করি সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল রা.-কে। যার সাথে আম্মাজান আয়েশা রা.-কে জড়িয়ে মুনাফিকরা মদীনায় কুৎসা রটনা করেছিল। ওই দুর্যোগময় সময়ে, প্রায় মাসখানেক ওহি আসা বন্ধ ছিল। সেই অন্তবর্তী সময়ে, ফুলের মতো নিষ্পাপ চরিত্রের অধিকারী, হযরত সাফওয়ান লজ্জায় কতটা অধোবদন হয়ে মদীনায় বাস করেছিলেন? ইফকের আলোচনায়, আম্মাজানের কষ্টের কথা বেশি থাকলেও, এই অধমের কেন যেন পাশাপাশি সাফওয়ান রা.-এর কষ্টের কথাও মনে পড়ে।

৩. ইফকের আয়াতগুলো শেষ করে সামনে এগোলেই আসে গৃহে প্রবেশ-সংক্রান্ত আয়াত। এখানে এসে থমকে দাঁড়াই। একটা না পাওয়ার বেদনা বুকের গহিনে চিনচিন করে ওঠে।

৪. এমন কি হয় না, একটা আমল করার জন্যে সব সময় মনটা ছটফট করে, কিন্তু কিছুতেই আমলটা এসে ধরা দেয় না। তাওফিক হয় না। বারবার চেষ্টার করার পরও আমলটা নসিবে জোটে না?

৫. একটি আমল আছে, খুবই সহজ। আমলটা করতে পারলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট স্বীকৃতির নিশ্চয়তা। অনেকবার চেষ্টা করেও আমলটা করে উঠতে পারছি না। আমল না বলে 'আখলাক' বলাই শ্রেয়।

৬. আমলের আয়াতটা পড়ি,

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

তোমরা যদি তাতে (ঘরে) কাউকে না পাও, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাতে প্রবেশ করো না। তোমাদেরকে যদি বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে ফিরে যেয়ো। এটাই তোমাদের পক্ষে শুদ্ধতর (নূর ২৮)।

৪. কোনও কোনও মুহাজির সাহাবি, আজীবন আক্ষেপ করে গেছেন, এই আয়াতের শেষাংশের উপর আমল করতে না পেরে। আক্ষেপ করার মতোই একটি আমল।

৫. আমলটা কী? আমি কারও বাড়ি গেলাম। দরজায় টোকা দিলাম। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, এখন দেখা করতে পারব না, ফিরে যাও। আমি বিনাবাক্যব্যয়ে ফিরে গেলাম।

৬. ঘটনা এমনটা ঘটলে, রাব্বে কারিমের দৃষ্টিতে আমার ফিরে যাওয়াটা কেমন? আমার ফিরে যাওয়াটা হবে (أَزْكَىٰ) শুদ্ধতর একটি কাজ। আমার রবের কাছে আমি একজন 'শুদ্ধতর' বান্দা।

৭. আমলটা জীবনে একবারও করার সুযোগ হয় নি, এমন নয়। বেশ কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু তখন আমলটা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। এমনও হয়েছে, গভীর রাতে অসহায়ের মতো আশ্রয়ের জন্যে গিয়েছি। দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাহফিলের খোলা মাঠে পুরো রাত কাটাতে হয়েছে।

৮. মাঝেমধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে, অনেকে আছেন, পেশাগত কারণে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। তারা হয়তো নিয়মিত এই আমলের আওতায় পড়েন। ব্যবসার জন্যে বা ভিক্ষার জন্যে গেলে, তারা কি 'আযকা' বা শুদ্ধতর হবেন? মনে হয় না।

৯. কয়েকটা কৌতূহল জানিয়ে রাখি,

ক. কেউ কি আছেন, যিনি আমলটা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সনদ' লাভের চেষ্টা করেন?

খ. প্রিয় মানুষগুলোর কষ্ট অনুভব করার জন্যে সময়ে সময়ে সূরা নূর খুলে বসা হয়?

গ. সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল রা.-এর কষ্টের কথা আলাদা করে মনে পড়েছিল কখনো?

ব্যবসানীতি!

হুজুর প্রতিদিন পাহাড়সম পড়া দেন। সেগুলো শুধু বুঝলেই হয় না, নুরানিখানার তালিবে ইলমদের মতো ঠোঁটস্থ করতে হয়। রাতদিন এক করে, আমাদের সবাইকে 'তাফসিরে জাওয়াহেরুল কুরআন' নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে হয়। এই বুড়ো

বয়েসেও মাথা দুলিয়ে পড়া শিখতে মন্দ লাগে না। আর কুরআন কারিমের জন্যে যে-কোনও পরিশ্রমেই পরম আনন্দ বোধ হয়। মাঝেমধ্যে এমন হয়, পড়তে পড়তে চোখের সামনে কী যেন ওড়ে। আওয়াজ ছাড়া চুপচাপ পড়ে গেলে, তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু মুখস্থ করতে গেলে বারবার পড়তে হয়। পড়া যত মুখস্থ হতে থাকে, পেটের ক্ষুধাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে চড়চড় করে চড়তে থাকে। আসরের আগে ও পরে দুচোখ অগুনতি শর্ষেফুল ভাসতে শুরু করে। তবুও উপায় নেই, লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। আজকের পড়া শিখে না রাখলে, আগামী কালের পড়া শিখব কখন?

আমাদের মাসব্যাপী তাফসিরের দরস শুরু হয়েছে পঁচিশে শাবান থেকে। হুজুর প্রতি বছর এই তারিখেই দরস শুরু করেন। এভাবে চলে আসছে আজ প্রায় সাঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ। হুজুরের বয়েস হয়ে গেছে। একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। আগের মতো শরীরে বল পান না। তবুও রমযান এলে তাফসিরে পড়ানো বন্ধ রাখতে পারেন না। কিন্তু শুরু করেও শেষ করতে পারেন না। মাদরাসার কাজে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কয়েকদিন পড়ানোর পর, অপারগ হয়ে অন্যদেরকে পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দেন।

শাবানের শুরুতে একদিন ফোন করে বললেন,

'বাবারে, বুড়ো হয়ে গেছি, কখন কী হয়ে যায়, তাই এবার নিয়ত করেছি, পুরো রমযান মাস তাফসিরটা পড়াবো। সেই আগের দিনগুলোর মতো।'

সাথে সাথে বুঝে গেলাম, হুজুর সরাসরি না বললেও, ইঙ্গিতে কিছু একটা বলতে চাইছেন। দেরি না করে সাথে সাথে বলে দিলাম,

'জি হুজুর, তাফসিরের দরসে আগাগোড়া হাজির থাকার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। উত্তরটা শুনে, আকাশের চাঁদ পেলেন যেন হাতে। পাক্কা এক মিনিট পর্যন্ত দুআ করে গেলেন।'

তাফসিরের দরসে হুজুর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ঘটনা বলেন। আজ বললেন, সেদিন শহরে গেলাম। এক ছাত্র টেনে তার দোকানে নিয়ে গেল। মসজিদ মার্কেটে নূতন দোকান দিয়েছে। মোবাইলের। কী সুন্দর করে যে সাজিয়েছে। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কত রকমের মোবাইলই-না আছে তার দোকানে। একটুখানি বসে চলে আসার উপক্রম করতেই সে বলল,

'হুজুর, একটু নসিহত করুন'।

'আমি আর কী নসিহত করব। আল্লাহ তাআলার পাক কালামই সেরা নসিহত। কুরআন কারিম থাকতে, বাড়তি কোনও নসিহতের প্রয়োজনই হয় না। কুরআন কারিম পড়বে, আর আল্লাহর হাবিব সা.-এর তরিকা মতো জীবন পরিচালনা

করবে। ব্যস, আর কিছু লাগবে না। বাবারে, তোমার মতো ব্যবসায়ীদের জন্যেই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলে দিয়েছেন,

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

তাতে সকাল ও সন্ধ্যা তাসবিহ পাঠ করে এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে (নূর ৩৬-৩৭)।

এই আয়াতটা সব সময় মনে রাখবে। দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানেই কামিয়াবি এসে যাবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্বের সাথে আদায় করবে। হিশেব করে যাকাত দেবে। দেখবে ব্যবসা তরতর করে উন্নতির দিকে যচ্ছে।'

ইয়া লাইতা!

সময়মতো কাজ না করলে পরে পস্তাতে হয়। আফসোস করতে হয়। কিন্তু সে আফসোস কোনও কাজে আসে না। কুরআন কারিমে এমন কিছু আফসোসের কথা বলা হয়েছে,

১. হায়! যদি আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমিও মহাসাফল্য লাভ করতাম (নিসা ৭৩)।

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

আল্লাহ তাআলা জিহাদে বের হতে বলেছেন। একদল লোক সব সময়ই থাকে, যারা জিহাদে যেতে গড়িমসি করে। জিহাদকালে মুমিনদের উপর বিপদ এলে, এই লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, আমি তাদের সাথে ছিলাম না। থাকলে আমারও আজ এ হাল হতো। কিন্তু মুমিনগণ যখন সাফল্য লাভ করে, গনিমত লাভ করে, তখন এদের আফসোসের সীমা থাকে না। ইশ, আমরাও কেন তাদের সাথে গেলাম না! তাদের এই আফসোসে কোনও লাভ হয় না।

২. এবং যে দিন জালিম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ ধরতাম (ফুরকান ২৭)।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

আল্লাহ তাআলা দয়ালু হলেও সেদিন জালিমরা তাদের অপরাধের শাস্তি পাবেই। ছাড়া পাবে না।

৩. মানুষ কাজ করে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। বন্ধু ভালো হলে তাকে ভালোর দিকে নিয়ে যায়, মন্দ হলে মন্দের দিকে নিয়ে যায়।

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (ফুরকান ২৮)!

এই আক্ষেপ কিয়ামতের দিন করবে। কিন্তু তখন এসবের কোনও মূল্য থাকবে না। ধর-পাকড় থেকে বাঁচতে পারবে না।

৪. আল্লাহর জিকির থেকে বিরত থাকলে, আল্লাহ তাআলা তার পেছনে শয়তান লেলিয়ে দেন। শয়তান তাকে সৎপথ থেকে বিমুখ করে রাখে। পাশাপাশি তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে, সে সঠিক পথেই আছে। কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলবে,

يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

আহা! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কেননা তুমি বড় মন্দ সঙ্গী ছিলে (যুখরুফ ৩৮)।

এসব আক্ষেপ কাজে আসবে না। শয়তান ও ওই ব্যক্তি—দুজনকেই জাহান্নামে ফেলা হবে। আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখদের জন্যে বড় ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে।

৫. দুনিয়াতে মানুষ কত কিছু করে। দোর-দালান গড়ে। কল-কারখানা তৈরি করে। এসবের মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। একলোক নিজের বাগ-বাগিচার মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহ গজব নাজিল করলেন। তখন তার বোধোদয় হলো। হা-হুতাশ করে বলে উঠল,

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক না করতাম (কাহফ ৪২)!

বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হুঁশে ফিরলে কী লাভ! গজব এসে যাওয়ার পর তাওবা কাজে আসে না।

৬. কবর থেকে ওঠানোর পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামের সামনে আনা হবে। জাহান্নামিরা বলবে,

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

হায়! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্যে অগ্রিম পাঠাতাম (ফজর ২৪)!

জাহান্নামের আগুনে বসে আক্ষেপ করে কী লাভ?

৭. দ্বীনের কথা শোনে। এটা তারা সত্যানুসন্ধানের জন্যে শোনে না। ভুল ধরার জন্যে বা অন্য কোনও বক্র উদ্দেশ্য নিয়ে শোনে। এমন লোকদের কানে আল্লাহ তাআলা পর্দা ফেলে দেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে, তারা বলবে,

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হায়! আমাদেরকে যদি (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তবে আমরা এবার আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের মধ্যে গণ্য হতাম (আনআম ২৭)।

দুনিয়াতে থাকাবস্থাতে তাদের কাছে রাসুল এসেছিল, আলিম-ওলামা গিয়েছিল, তবুও তারা মানে নি, আবার ফেরত পাঠালে বুঝি মানবে?

৮. কাফিরদেরকে জাহান্নামে ফেলে তাদের চেহারা ওলট-পালট করা হবে। ঝলসানো হবে পুরো শরীর। তারা বলবে,

يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলের কথা মানতাম (আহযাব ৬৬)।

দুনিয়াতে থাকাবস্থাতেই অতীতের ভুলের জন্যে আক্ষেপ করে কাজ হয় না, আখিরাতে গেলে কী হবে? এখন থেকে সতর্ক হয়ে গেলেই হয়।

৯. কিছু ভালো লোকও আখিরাতে আক্ষেপ করবে। তারা যে সুখ-সুবিধা সেখানে ভোগ করবে, সেটা দুনিয়ার মানুষকে জানানোর একটা আক্ষেপ তাদের থাকবে। একলোককে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলল। লোকটা তাদেরকে হকের দাওয়াত দিত। মানুষটা শহীদ হওয়ার পর, তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে বলল,

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত (ইয়াসিন ২৬)।

এই ধরনের ভালো লোকের আক্ষেপও কাজে আসবে না। কারণ তার আক্ষেপের কথা দুনিয়ার নাফরমানরা জানতে পারবে না। জানতে পারলেও তাদের নাফরমানির কারণে, তাদের ভালো হওয়ার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করাটা কঠিন।

১০. নেককারকে কিয়ামতের দিন ডানহাতে আমলনামা দেওয়া হবে। বদকারকে দেওয়া হবে বামহাতে। বামহাতে আমলনামা পেয়েই সে হাউমাউ করে বলে উঠবে,

يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ

হায়! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হতো (হাক্কাহ ২৫)।

অথচ দুনিয়াতে তাকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। আল্লাহর কিতাব ছিল তার নাগালে। সে সব ব্যবস্থা পাওয়ার পরও ভালো হয় নি।

১১. মৃত্যু হলেই সব শেষ হয়ে যাবে না। এর পরেও জীবন আছে। মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আরেক জীবনের কথা ভুলে থাকে। পরকালে আজাবের সম্মুখীন হয়ে তার সংবিৎ ফিরবে। সে বলবে,

يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ

আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত (হাক্কাহ ২৭)।

এসব প্রলাপ বকে তার আজাব লাঘব করতে পারবে না। আল্লাহর করুণা লাভ করতে পারবে না।

১২. কিয়ামতের দিন মানুষের দুনিয়ার জীবনের সবকিছু তার সামনে প্রকাশ করা হবে। তা দেখে তার মুখ দিয়ে বেরোবে,

يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا

হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম (নাবা ৪০)।

মাটি হতে চাইলেই কি মাটি হওয়া যায়? আর মাটি হলেই বা কি হবে? আল্লাহ কি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? সে মাটিই তো হয়ে গিয়েছিল। আবার তুলে আনেন নি?

ক. আমার এই জীবন বড় গুরুত্বপূর্ণ। এখনই কাজে লাগানোর সময়।

খ. যে-কোনও মুহূর্তে আমি চলে যেতে পারি। ভালো হওয়ার পালাকে পিছিয়ে দেওয়া ভীষণ ঝুঁকির।

গ. আখিরাতে কাজে লাগবে না, এমন সব কাজকর্ম, আচার-আচরণ আমি এখন থেকেই আমার জীবন থেকে ছাঁটাই করে ফেলব। ইনশাআল্লাহ।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

১. অনলাইনের সাথে সম্পৃক্ত নেই, এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তরুণ প্রজন্ম নেট কানেকশন ছাড়া থাকতেই পারে না। না খেয়ে থাকতে পারে, নেট ছাড়া থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। নেট জীবন কীভাবে কাটাতে হবে? এ-ব্যাপারে কুরআনি নির্দেশনা কী?

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ

তারা যখন কোনও বেহুদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় (কাসাস ৫৫)।

২. মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় ধাপে এসেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে (মুমিনূন ৩)।

৩. রহমানের বান্দা কারা? তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا

এবং (রহমানের বান্দা তারা) যারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না এবং যখন কোনও বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায় (ফুরকান ৭২)।

৪. অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা আসলেই মুমিনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। শুধু দুনিয়াতেই নয়, জান্নাতেও এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে,

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا

তারা সেখানে শান্তিমূলক কথা ছাড়া কোনও বেহুদা কথা শুনবে না (মারইয়াম ৬২)।

৫. জান্নাতেও বন্ধুদের সাথে হাসিগল্প হবে। একসাথে পানাড্ডা হবে। কিন্তু অনর্থক কিছু থাকবে না,

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

সেখানে তারা (বন্ধুত্বপূর্ণভাবে) কাড়াকাড়ি করবে সুরা পাত্র নিয়ে, যা পান করার দ্বারা কোনও অনর্থ ঘটবে না এবং হবে না কোনও গুনাহ (তূর ২৩)।

৬. হাসিগল্প জান্নাতেও হবে। হবে না শুধু পাপ বা অনর্থক কাজ,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোনও অহেতুক কথা এবং না কোনও পাপের কথা (ওয়াকিয়া ২৫)।

৭. আমি কি প্রতিটি কাজ বিচার করে দেখি? আমার কাজটা লাগব (لغو) বা অনর্থক হয়ে যাচ্ছে কি না?

৮. অনর্থক কাজে ও কথায় জড়ালে আমি সাময়িকভাবে মুমিনের বৈশিষ্ট্যহারা হয়ে গেলাম। রহমানের বান্দার তালিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লাম।

৯. আমি যদি অহেতুক কাজ, কথা, আচরণ থেকে বাঁচতে পারি, তাহলে এই ভেবে আনন্দ লাভ করতে পারি, আমি একটি জান্নাতি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছি,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا

সেখানে তারা কোনও অহেতুক কথা শুনবে না এবং কোন মিথ্যা কথাও না (নাবা ৩৫)।

১০. আমি এখন থেকেই জান্নাতি মানুষ হওয়ার সাধনায় মশগুল হতে পারি। নিজের মধ্যে অনর্থক কিছু থাকলে ঝেড়ে ফেলতে পারি।

কুরআনি মোহর।

১. সালাফের জীবনী পড়লে দেখি, তাঁদের জীবন ছিল কুরআনময়। সুন্নাহময়। তাঁরা জীবনের পরতে পরতে কুরআন কারিমের বারাকাহ অনুভব করতেন। বর্তমানেও কি আমরা এমন বারাকাহর ছোঁয়া পেতে পারি? কুরআনি বরকতের ছোঁয়া আমাদের মতো গুনাহগার বান্দার পক্ষেও কি পাওয়া সম্ভব? এক জর্ডানি ভাই (আবু আবদিল মালিক) তার জীবনের গল্প শুনিয়েছেন।

২. আমার স্ত্রীর নাম 'বায়ান'। শায়খ আলি তানতাবী রহ.-এর মেয়ের নামও ছিল 'বায়ান'। হিজাব পরার কারণে জার্মানিতে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত তাকে শহীদ করে দিয়েছিল।

৩. আমি আমার জীবনের পদে পদে কুরআনের বরকত পেয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার প্রাণাধিকা স্ত্রীর ওসিলায়। আমার স্ত্রীর পবিত্র সঙ্গ না পেলে, আমার মতো গুনাহগার বান্দার পক্ষে কুরআনের ছায়াতলে যাওয়া সম্ভব হতো কি না আল্লাহ মালুম।

৪. দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে আমরা দুজন মুখোমুখি হলাম। আমার বেশি কিছু জানার ছিল না। যা জানার আগেই জেনে নিয়েছি। নিয়মিত নামাজ পড়ি। মুখে দাড়ি আছে। ওটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার ধার্মিকতা। যত দূর জেনেছি 'বায়ান'-এর ধার্মিকতার মাত্রা আরও অনেকদূর এগিয়ে ছিল। তাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, আমার ধার্মিকতার মাত্রা আঁচ করে, সে এই বিয়েতে গররাজি হয় কি না। দেখেছি প্রকৃত ধার্মিক মেয়েরা কিছুতেই অধার্মিক পাত্র পছন্দ করে না। অন্য দেশের কথা জানি না, আমাদের জর্ডানে ধার্মিক পরিবারের মেয়েরা এমনই। তারা গরিব হলেও ধার্মিক পাত্রকে জীবনসঙ্গী হিশেবে বেছে নিতে দ্বিধা করে না।

৫. আমার প্রশ্ন শেষ হলে, বায়ান শালীনতা বজায় রেখে জানতে চাইলেন,

'মোহরানা সম্পর্কে আপনার কোনও চিন্তা আছে'?

আমি থমকে গেলাম। মোহরানা সম্পর্কে আলাদা কোনও চিন্তাই ছিল না। দুই পক্ষের মুরুব্বিগণ যা নির্ধারণ করবেন, সেটাই মেনে নেব। এর বাইরে মোহর নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনা আর কী হতে পারে, অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারলাম না। আবার হুট করে কিছু বললে, পাছে আমার ধর্মবিষয়ে অজ্ঞতা ফাঁস হয়ে যায়, সে-নিয়েও সতর্ক ছিলাম। আমাকে চুপ করে ভাবতে দেখে, বায়ান বললেন,

'বিয়েতে মোহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্ব। মোহরানা আমাদের দুজনের বিষয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এখানে সম্পর্ক ঠিক হলে, মোহরানা নির্ধারণের পুরো ব্যাপারটা আমরাই দেখব'।

৬. আমি বায়ানের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে চিন্তায় পড়ে গেলাম। বায়ান কি প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী মোটা অঙ্কের মোহরানা আশা করছে? এবং নগদ আদায়ের কথা চিন্তা করছে? চিন্তায় ছেদ পড়ল বায়ানের পরের কথায়,

আপনার কাছ থেকে আমার বেশি কিছু জানার নেই। শুধু দুটি বিষয় জানার আছে,

ক. আমি চাই আমার জীবনসঙ্গী আমাকে সব সময় আল্লাহমুখী হতে সাহায্য করবেন। আর কুরআন কারিম ও সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আপনার পক্ষে কি এটা সম্ভব হবে?

বায়ানের কথা শুনে আমার এত আনন্দ হলো। এত আনন্দ হলো, ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠি। খুশিতে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে যাওয়ার জোগাড় হলো। বুঝে গেলাম, আমি একটি অমূল্য রতন পেতে যাচ্ছি। নিজেকে সামলে উত্তর দিলাম,

রাব্বে কারিম এখানে সম্বন্ধ চূড়ান্ত করলে আমি আমার জীবনের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব, আপনাকে সব সময় আল্লাহমুখী রাখতে। যত বাধাই আসুক, আমি আপনাকে তাকওয়ার পরিবেশে রাখতে কসুর করব না। ইনশাআল্লাহ।

৭. বায়ান বোধহয় আমার চাপা উচ্ছ্বাস টের পেয়ে গিয়েছিল। মুচকি হেসে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল,

'আপনি কুরআন কারিমের কতটুকু হিফজ করেছেন'?

প্রশ্নটা শুনে রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। সত্যি সত্যি ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। আমি মোটামুটি ধার্মিক। কিন্তু কুরআন কারিম হিফজ করার মতো ধার্মিক নই। যা হওয়ার হবে, সত্যটা বলে দিই,

'ছোটবেলায় দশ পারা হিফজ করেছি। এখন মনে নেই'।

আমার উত্তর শুনে বায়ান চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল। ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। এই বুঝি 'অমূল্য রতন' হারাচ্ছি। বায়ান বুঝি না-বোধক সিদ্ধান্ত নিতে

যাচ্ছে। যত দুআ-দুরুদ মনে ছিল, সব একসাথে আওড়ে আল্লাহর কাছে পেশ করে যাচ্ছিলাম। বায়ান চোখ খুললেন। অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললেন,

'তাহলে আমি চাই আমার মোহরানা হোক কুরআন কারিম। মোহরানা দুই ধাপে আদায় করতে হবে';

প্রথম ধাপ: নগদ আদায় (المهر المعجل) পছন্দমতো একটি কুরআন কারিম।

দ্বিতীয় ধাপ: বকেয়া আদায় (المهر المؤجل)। পুরো কুরআন কারিম হিফজ।

৮. হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বায়ানকে দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বললাম,

আপনি এই বিয়েতে সম্মতি দিলে, আমি বিয়ের পর, সব কাজ ছেড়ে কুরআন কারিম হিফজে মশগুল হয়ে যাবো। রুজি-রোজগারের চিন্তা নেই। ওটা আল্লাহ তাআলা আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। আপনার উসীলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে হিফজের তাওফিক দিলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনি কিছু মনে না করলে বলতে দ্বিধা নেই, আপনাকে পেলে আমার জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে। আপনাকে পাশে পেলে, আমিও সহজে আল্লাহর পথে চলতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

৯. বায়ান দয়া করে আমাকে তার জীবনসঙ্গী হিশেবে বেছে নিয়েছে। তার মতো 'জান্নাতি' হুরতুল্য মানুষ আমাকে পছন্দ করেছে, এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী দেখাদেখিতে, সাধারণত পাত্রের চেয়ে পাত্রী বেশি ভয়ে থাকে, তাকে পছন্দ করবে তো? আমার বেলায় হয়েছে উল্টো। আমি আশঙ্কায় ছিলাম, আমাকে যদি 'বায়ান' পছন্দ না করে? সেদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর থেকেই উঠেপড়ে লেগে গেলাম। আবার আমাদের দেখা হওয়ার আগেই আগেই যেন হিফজ কিছুদূর এগিয়ে রাখতে পারি। যাফাফ (বাসর) রাতেই তাকে সুসংবাদ শোনাতে পারি। বাড়ির সবাই বিয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আমিও বিয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। শুধু ধরন আলাদা। আমি মশগুল কুরআন হিফজ নিয়ে, তারা মশগুল কেনাকাটা নিয়ে। বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে বলে কথা।

১০. বিয়ের আগে থেকেই নানাভাবে কুরআন কারিমের বরকতের ছোঁয়া পেতে শুরু করলাম। বুঝতে অসুবিধা হলো না, 'বায়ান'-ই হলো আমার জন্যে মূল বারাকাহ। বিয়ের পর বায়ানের কাছেই হিফজ শোনাতে শুরু করলাম। হিফজের জন্যে অফিস থেকে ছুটি নিলাম। আমেরিকান বস অবাক হলেও ছুটি মঞ্জুর করলেন। ছুটি না পেলে চাকুরি ছেড়ে দিতাম।

১১. বায়ানের সাথে কিছুদিন থাকার পর, বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, আস্তে আস্তে আমার ভেতরের ধার্মিকতা অন্যমাত্রায় রূপ নিচ্ছে। বায়ান বা কুরআন বা উভয়ের প্রভাবে আমার ভেতরে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি একধরনের নির্মোহ ভাব

তৈরি হতে লাগল। তখন পাশের দেশে মার্কিন আগ্রাসনবিরোধী লড়াই শুরু হয়েছে। বায়ান নিয়মিত সেসব খবর রাখত। আমার সাথেও এসব নিয়ে আলাপ করত।

১২. হিফজ শেষ হতে হতে আমি এক অন্য মানুষে পরিণত হলাম। ততদিনে বায়ান আর আমি ঠিক করে ফেলেছি, প্রথম সুযোগেই মজলুম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে যাব। চাকুরিতে আর যোগ দেব না। অনেকেই যাচ্ছেন।

১৩. আমার সবক তখন সূরা ইউনুসে। বায়ানকে সেদিনের পড়া শোনাচ্ছি,

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির উপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব দিক থেকে তাদের দিকে তরঙ্গ ছুটে আসে এবং তারা মনে করে সব দিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ!) আপনি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে মুক্তি দান করেন, তখন অবিলম্বেই তারা জমিনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করছ তা অবহিত করব (ইউনুস ২২-২৩)।

১৪. কেন জানি না, আমি যখন প্রথম আয়াতখানা পড়ছিলাম, বায়ান হু হু করে কেঁদে দিল। দ্বিতীয় আয়াত পড়ার সময় তার কান্না আরও বেড়ে গেল। তার দেখাদেখি আমার চোখেও পানি চলে এল। সে হয়তো কুরআন শুনে কেঁদেছে। পড়া থামিয়ে দিলাম। বায়ান যেভাবে কুরআন কারিম বুঝত, উপলব্ধি করত, আমি সেভাবে পারতাম না। তবুও সাথে থাকার কারণে, আমার মধ্যেও কুরআন কারিম ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল।

১৫. এই দুই আয়াতই ছিল বায়ানকে শোনানো আমার শেষ হিফজ। তারপর বায়ান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর সুস্থ হলো না। আমাকে ছেড়ে আল্লাহর কাছে

চলে গেল। তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় কুরআন দিয়ে। শেষ পরিচয় সূরা ইউনুস দিয়ে।

১৬. আমি ভুল করলে, সুন্দর করে বুঝিয়ে সংশোধন করে দিত। আমার আমাকে গাফলতি দেখলে, আমার ব্যক্তিত্বে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে, গভীর বুদ্ধিমত্তার সাথে সচেতন করে দিত। বারান চলে গেছে। আমার জন্যে রেখে গেছে কুরআন। অবস্থা এমন হলো, বারানের কথা মনে এলে, সাথে সাথে কুরআনের কথা মনে পড়ে যায়। সালাতে, বাইরে যখনই কুরআন তিলাওয়াত করি, সাথে সাথে বারানের হাজারো স্মৃতি এসে হৃদয়পটে ভিড় করে। অজান্তেই বারানের জন্যে বুক ভেঙে কান্না আসে। মুনাজাতে হাত তুললেই বারানের জন্যে দিল থেকে দুআ আসে।

১৭. বারান নেই। আছে তার রেখে যাওয়া কুরআন। এই কুরআনখানা মোহরানাস্বরূপ তাকে দিয়েছিলাম। মার্কিন বাহিনীর প্রচণ্ড হামলার তুমুল উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্তে বারানের কুরআন ছিল আমার শ্রেষ্ঠতম সঙ্গী। যখন-তখন বিমান হামলার উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে বারানের কুরআন আমাকে পরম নিশ্চিন্তে ভূগর্ভের বাংকারে প্রতীক্ষার প্রহর কাটাতে সাহায্য করত। যে-কোনও সময় মার্কিন স্নাইপারদের টার্গেটে পরিণত হওয়ার অনিশ্চিত সময়েও বারানের কুরআন জোগাত পরম আশ্বাস।

নৈরাশ্য

১. আমি মুমিন। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখি। আমি আল্লাহর কালামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমি কেন নিরাশ হয়ে পড়ি? বিশেষ করে যারা দ্বীনের পথে আছি তাদেরকে কীভাবে নৈরাশ্য ছুঁতে পারে?

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব (মুজাদালা ২১)।

আমার আর ভয় কেন? নৈরাশ্য কেন? আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে থাকলে, বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই। আল্লাহর এই লিখিত বিধান কেউ খণ্ডাতে পারবে? কার এমন ক্ষমতা আছে?

২. আল্লাহ আমাদেরকে যে বিষয়ের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, সেটা জবরদখল করে রাখবে কে?

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا

আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, আমি তাদেরকে সেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম (আরাফ ১৩৭)।

আমি আজ দুর্বল। কাল দুর্বল থাকব না। পূর্ব-পশ্চিমের ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবেই।

৩. আল্লাহ তার মনোনিত বান্দাদের পক্ষেই বিজয় লিখে রেখেছেন। সেই আদি থেকেই বিষয়টা স্থির হয়ে আছে,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমার একথা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবেই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এবং নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত (আস-সাফফাত ১৭১-১৭৩)।

যখন মনে হবে, আমার সামনে সমস্ত দরজা বন্ধ, কোনওদিকে কোনও গতি নেই, তখনই আল্লাহর লুতফ, করুণা আমার দিকে ছুটে আসবে।

আকাইদ

তাওহিদ

১. আমার মনে কত কী যে ঘোরে। দ্বীন ভালো লাগে, দুনিয়াও ভালো লাগে। জান্নাতে যাওয়ার তামান্না রাখি আবার জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজও করতে থাকি। আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র রব্ব বলে বিশ্বাস করি, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে 'শাসনব্যবস্থা' ধার করি।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র (আম্বিয়া ২২)।

আসমান জমিন কত বড়? কল্পনাতীত রকমের বড়। এই সীমাহীন আয়তনে যদি দুই 'ইলাহ' একসাথে থাকা অসম্ভব হয়, আমার ছোট্ট কলবে কীভাবে দুই ইলাহ থাকবে?

২. আমার কলবে সত্যি সত্যি আল্লাহর দাসত্ব (উবুদিয়াত) থাকে, আল্লাহর ভয় থাকে, আল্লাহর সম্মান (তা'যীম) থাকে, কীভাবে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে 'বিধান' বা 'সমাধান' ধার করতে পারি? আমি কীভাবে একজন কাফিরকে ভাই বলতে পারি?

৩. এ জগতের ইলাহ একজনই। দুজন হলে বহু আগেই এই জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। তদ্রূপ আমার কলবকে ঠিক করতে হলে, আমার মনকে শুদ্ধ করতে চাইলে, আমার মননকে সংশোধন করতে চাইলে, আমার মধ্যে 'তাওহিদ'কে ভালো করে বসাতে হবে।

তাওহিদ বসানোর মানে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মনে স্থান দেব না।

আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান মেনে নেব না।

কুফর ও শিরকের ছোঁয়া আছে, এমন কিছুই গ্রহণ করব না।

সাময়িক কৌশল হিশেবেও না। ক্ষণিকের হেকমত হিশেবেও না।

সন্তান

১. আল্লাহ তাআলার কোনও সন্তান নেই। তার সম্পর্কে এমন কিছু ভাবাও শোভনীয় নয়। এমন কিছু চিন্তা করা মানবীয় দুর্বলতা,

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

অথচ এটা দয়াময়ের শান নয় যে, তাঁর সন্তান থাকবে (মারইয়াম ৯২)।

২. মানুষ তার নিজের মতো করেই সবকিছু বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলাকেও তার মতো করে ভাবতে চায়। এটা মারাত্মক এক ভুল। তিনি আমাদের মতো নন।

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

যিনি কোনও পুত্র গ্রহণ করেন নি (ফুরকান ২)।

৩. আমরা দেখি আমরা বাবা-মা থেকে জন্ম নিয়েছি। তাই অবচেতনে ধরে নিতে চাই, দুনিয়ার সবকিছুই এভাবেই জন্ম নিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মানবীয় চিন্তার ঊর্ধ্বে। তাঁর যথার্থ পরিচয় লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়,

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন (ইখলাস ৩)।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

৪. সবকিছুর সাদৃশ্য খোঁজা উচিত নয়। মানুষ তুলনা করতে পছন্দ করে। ভুল করে অনেক সময় আল্লাহ তাআলাকেও এর আওতায় নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি একক! তার কোনও তুলনা চলে না।

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

আল্লাহ তো একই মাবুদ। তাঁর কোনও পুত্র থাকবে, এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র (নিসা ১৭১)।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ, তিনি ছাড়া অন্য কোনও মাবুদ নেই (বাকারা ১৬৩)।

وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ

আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ একই (আনকাবূত ৪৬)।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই (মুহাম্মাদ ১৯)।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

বলে দিন, কথা হলো, আল্লাহ সব দিক থেকে এক।

তাওহিদের দলিল

১. নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলেও, বোঝা যাবে, জগতে একজনই ইলাহ আছেন। একাধিক ইলাহ থাকলে অনেক সমস্যা দেখা দিত!

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا

বলে দিন, আল্লাহর সঙ্গে যদি আরও ইলাহ থাকত, যেমন তোমরা বলছ, তবে তারা আরশ-অধিপতি (প্রকৃত ইলাহ)–এর উপর প্রভাব বিস্তারের কোনও পথ খুঁজত (ইসরা ৪২)।

২. তারাও যদি একটু চিন্তা করত, তাহলে তাওহিদ বুঝতে পারত!

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র (আম্বিয়া ২২)।

৩. ছোট্ট একটা সংসারেই দুজন মানুষ একসাথে থাকতে পারে না।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

আল্লাহ কোনও সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং সঙ্গে নেই অন্য কোনও মাবুদ। সে রকম হলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ মাখলুক নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, তারপর তারা একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র (মুমিনুন ৯১)।

৪. তাঁর কোনও শরিক নেই। তিনি একমাত্র অধিপতি।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ

تَكْبِيْرًا

বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনও সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর রাজত্বে কোনও অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্যে তাঁর কোনও অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। তাঁর মহিমা বর্ণনা করুন, ঠিক যেভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা উচিত (ইসরা ১১১)।

৫. কত কিছুকে যে মানুষ উপাস্য বানিয়েছে! কেউ আল্লাহর মতো নেই। হতে পারে না,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নয় (ইখলাস ৪)।

অমুখাপেক্ষী

তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন (ইখলাস ২)।

নশ্বর

তিনি ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে। বাকি থাকবে কেবল প্রতিপালকের গৌরবময় মহানুভব (চেহারা) সত্তা (আর-রহমান ২৬-২৭)।

লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা

১. আল্লাহ না চাইলে, কেউ কোনও কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। একটা বুলেটেরও ক্ষমতা নেই, কাউকে মারার।

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

বলুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আমি আমার নিজেরও কোনও উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রাখি না (আ'রাফ ১৮৮)।

২. আল্লাহর চাওয়াটাই চূড়ান্ত।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

আল্লাহ যদি আপনাকে কোনও কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি আপনার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন (ইউনুস ১০৭)।

৩. আল্লাহ ছাড়া বাঁচার কোনও উপায় নেই।

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

আল্লাহ যখন কোনও জাতির উপর কোনও বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোনও রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না (রা'দ ১১)।

সার্বভৌমত্ব

১. আর কারো কোনও শক্তি নেই।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

স্মরণ রেখো, সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ (আ'রাফ ৫৪)।

২. বাকি সব শক্তির দাবিদার মিথ্যাবাদী।

لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন (রা'দ ৩১)।

৩. যত বড় কিছুই হোক, আল্লাহই তার নিয়ন্তা।

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ

সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও (রূম ৪)।

তাওহিদ একটি ইবাদত। সাময়িক নয়, সার্বক্ষণিক। আমি আয়াতগুলোর মতো বিশ্বাস পোষণ করার মনে হলো, আমি একজন মুয়াহহিদ। তাওহিদের আকিদা ধারণ করা বড় ইবাদত। আমি আয়াতগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মূলত নিরন্তর ইবাদতেই মশগুল আছি।

গনী ও গাফুর!

আল্লাহ তাআলার দুটি গুণবাচক নাম,

১. (الْغَنِيُّ) গনী। অমুখাপেক্ষী। বেনিয়াজ। যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। করেন। তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কারো ক্ষমতাও নেই। এমন ভয় জাগানিয়া গুণের পরে কী বললেন?

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

আপনার প্রতিপালক বেনিয়াজ। দয়াশীলও বটে।

প্রথমে ভয় জাগলেও পরে আশা জাগে। সচেতন করে তোলার পর কী বললেন? তিনি কেমন অমুখাপেক্ষী?

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

তিনি ইচ্ছা করলে, তোমাদের সকলকে (পৃথিবী থেকে) অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে চান, আনয়ন করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন (আনআম ১৩৩)।

কেউ তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সূরা কাহফে আবার একটু ভিন্ন সুরের বক্তব্য আছে। আনআমে ভয়ের পাশাপাশি আশা জাগিয়েছেন। কাহফে আগে ও পরে আশাই জাগিয়েছেন। আমাদের মুক্তির আশা জিইয়ে রেখেছেন,

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

তোমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আগাগোড়াই ক্ষমা আর দয়া। তার দয়ার একটা নমুনা দেখা যেতে পারে,

لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

তিনি যদি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তাদেরকে অচিরেই শাস্তি দিতেন (৫৮)।

মানে? রাব্বে কারিম চাইলে শাস্তি দিতে পারতেন কিন্তু দেবেন না। ক্ষমা করে দেবেন। এসব দেখে বড় আশা জাগে। আমল দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। এই আয়াতগুলো থেকে আশা জাগে, আমল না হলেও, তার ক্ষমার গুণে ছাড়া পেয়ে যাবোই, ইনশাআল্লাহ।

আমার রব কেমন?

১. আল্লাহ মোদের রব। এই রবই আমার সব। প্রশ্ন হলো, আমার রব কেমন? প্রশ্নটা আমার নয়, ইবরাহিম আ.-এর। তিনি তার কওমকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা করেছিলেন,

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

তো যেই সত্তা সমস্ত জগতের প্রতিপালক, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? (আস-সাফফাত ৮৭)।

২. ইবরাহিম আ.-এর কাওম তাকে কী উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা আর কুরআনে বলা হয় নি। এখন আমার রব সম্পর্কে আমার ধারণা কেমন? তাঁর রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার দয়া, সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত (আ'রাফ ১৫৬)।

৩. তিনি রহিম। দয়া করা তিনি নিজের আবশ্যক করে নিয়েছেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতকে অবধারিত করে নিয়েছেন (আনআম ৫৪)।

৪. আমি আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় রবের ক্ষমাপরায়ণতার পরিধি ধারণা করতে পারব না।

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমাশীল (নাজম ৩২)।

৫. দয়া করার ব্যাপারটা শুধু মৌখিক বিষয় নয়, রীতিমতো লেখাপড়া করা। বিশুদ্ধতম হাদীস দ্বারাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত

إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي

নিশ্চয় আমার রাগের চেয়ে আমার রহমত অগ্রগামী (বুখারি)।

সবকিছু সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তাআলা একটা কিতাব লিখে রেখেছিলেন। সে কিতাবেই উপরের বাক্যটা আছে। কিতাবটা রক্ষিত আছে আরশের উপর।

৬. সীমালঙ্ঘন করলেও মাফ পাওয়ার আশা করা জরুরি। নিরাশ হয়ে পড়া কুফরি।

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (যুমার ৫৩)।

৭. একশোজনকে হত্যা করার পর মনে অনুশোচনা জেগেছে, এক আল্লাহওয়ালার পরামর্শে খাস দিলে তাওবা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন (মুসলিম)।

৮. ব্যভিচারিণী মহিলা। পিপাসার্ত কুকুরকে দেখে মনে বড় দয়া হলো। পায়ের মোজা খুলে, ওড়না দিয়ে বেঁধে কূপে ফেলে দিল। ভেজা মোজা কুকুরের মুখে ধরল। তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া পর্যন্ত এভাবে করে গেল। তার কাজটা আল্লাহর বেশ পছন্দ হলো। তাকে মাফ করে দিলেন (বুখারি)।

৯. একলোক জীবনে কখনো ভালো কাজ করে নি। মানুষ চলাচলের পথে কাঁটা পড়ে থাকতে দেখল। পথিকের কষ্টের কথা ভেবে, কাঁটাটা সরিয়ে দিল। কাজটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ হলো। তাকে জান্নাত দিয়ে দিলেন (বুখারি-মুসলিম)।

১০. মিসকিন মহিলা, দুটি মেয়েশিশু নিয়ে এল। আয়েশা রা. তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। দুই মেয়েকে দুটি খেতে দিলেন। নিজে তৃতীয়টি মুখে দিতে যাবেন, মেয়েরা সেটা চেয়ে বসল। মা খেজুরটাকে দুই ভাগ করে, দুই মেয়েকে খাইয়ে দিলেন। ঘটনাটা আম্মাজানের মনে দাগ কাটল। নবীজি সা.-কে বললেন মা-মেয়ের কথা। নবীজি বললেন, আল্লাহ তাআলার মায়ের মমতামাখা আত্মত্যাগ বড়

পছন্দ করেছেন। তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে, তার জন্যে জান্নাতকে আবশ্যক করে দিয়েছেন (মুসলিম)।

১১. একটা ভালো কাজ করলেই তার দশগুণ সওয়াব দান করবেন রাব্বে কারিম। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে সাতশগুণ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন (কুরআন)।

১২. বান্দার তাওবায় রাব্বে কারিম ভীষণ আনন্দিত হন। বান্দার আনুগত্য দেখলে তিনি হেসে ওঠেন। তার দুআ কবুল করেন। তার বিপদ দূর করে দেন (হাদীস)।

১৩. রাতের শেষ ভাগে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আমাকে ক্ষমা করার জন্যে, আমার তাওবা কবুল করার জন্যে, আমার আশা পূরণ করার জন্যে (হাদিস)।

১৪. আমার রব সম্পর্কে তাহলে আমার ধারণা কেমন?

ক. তিনি (جَمِيل) সুন্দর।

খ. তিনি (طَيِّب) উত্তম।

গ. তিনি (حَلِيم) অতি সহনশীল।

ঘ. তিনি (رَفِيق) আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

ঙ. তিনি (عَفُوٌّ) মার্জনাকারী।

চ. তিনি (كَرِيم) মহান।

ছ. তিনি (غَفُور) অতি ক্ষমাশীল।

ঞ. তিনি (رَحِيم) পরম দয়ালু।

আমার আর ভয় কীসের?

যাবাদ (বুদবুদ)!

১. কিছুদিন পরপরই ঘরে বাইরে জঞ্জাল জমে। অপ্রয়োজনীয় সরু-সামান ডাঁই হয়ে যায়। এসব সাফ-সুতরো না করে রেখে দিলে জীবাণু ছড়ায়। রোগ-বালাইয়ের উপদ্রব দেখা দেয়। ইঁদুর-তেলাপোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তখন একদিন সবাই মিলে সাফাই অভিযানে নামে।

২. আল্লাহ তাআলাও তাঁর বান্দাদের ঈমান আকিদা সংশোধনের মানসে, কিছুদিন পর পর শুদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূ-প্রকৃতিকে ঠিক করার জন্যে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস পাঠান। আকিদা-আমল ঠিক করার জন্যে নবী-রাসুল পাঠান। যাবতীয় ক্ষতিকর বিশ্বাস-কর্ম দূর করে, সুস্থ সঠিক আকিদার প্রসার ঘটান। আকাশ-বাতাসকে করে তোলেন নির্মল।

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

আল্লাহ এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায় (রা'দ ১৭)।

আমার চারপাশে তাকালেও দেখতে পাই, প্রতিবছরই কিছু জঞ্জাল জন্মে।

৩. আকিদা-বিশ্বাসে ভুল চিন্তার জঞ্জাল জন্মে। মিডিয়া, দুষ্টবন্ধু থেকে নানা জঞ্জাল আসতে থাকে। জমতে থাকে।

৪. অতি শখ করে কেনা বইপত্র থেকে জঞ্জাল জমে। ফেসবুক থেকে জঞ্জাল জমে। টুইটার থেকে জঞ্জাল জমে। পত্র-পত্রিকা থেকে জঞ্জাল জমে।

৫. আসবাবপত্রের জঞ্জাল চেনা যায়। সহজে সাফ করা যায়। কিন্তু চিন্তার জঞ্জাল চেনা বড় দায়! দূর করা তো পরের কথা! এখন উপায়?

- ক. নিয়মিত কুরআন কারিম পড়ে পড়ে নিজের চিন্তার সাথে কুরআনকে মিলিয়ে দেখা।
- খ. সিরাত পড়ে পড়ে নিজের আমলকে নবীজি সা.-এর আমলের সাথে মিলিয়ে দেখা।
- গ. কোনও হক্কানি আলিমের সান্নিধ্যে গিয়ে নিজের আকিদা-বিশ্বাসের 'থরো চেকআপ' করিয়ে নেওয়া। এটাই বেশি কার্যকর। একজন হক্কানি আলিমের কাছে, একসাথে কুরআন-সুন্নাহ-সিরাত সবই পাওয়া যায়। তিনি সবকিছু মিলিয়েই আমার চেকআপ করে দেবেন।

৬. আমার মধ্যে কি যাবাদ (ফেনা) আছে?

আর কিছু না পারি, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত-তাদাব্বুর অব্যাহত রাখলে, 'যাবাদ' আস্তে আস্তে দূর হতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

দুরারোগ্য ব্যাধি।

মানুষটার শরীর থেকে সব সময় বদগন্ধ বের হয়। এ এক অদ্ভুত রোগ। কিছুদিন আগে দেখা দিয়েছে। সব রকমের চিকিৎসা নিয়েও কাজ হয় নি। রোগটা সারছে না। চিকিৎসার যত রকমের উপায় আছে, কোনওটাই বাদ রাখা হয় নি। রোগটাও এমন, সমাজে বাস করা দিনদিন দুরূহ হয়ে উঠছে। একটু পরপর গোসল, একটু পরপর পরিধেয় বদল, উন্নতমানের সুগন্ধি, দামি ধূপধুনা ব্যবহার করেও কাজ হয় নি। যেই দেখে নাকসিঁটকে, মুখ কুঁচকে প্রশ্ন করে,

গোসল করো না?

বিবি, বালবাচ্চা সবাই এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। আর কোনও ডাক্তারি পরীক্ষা বাকি নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে অগুনতি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় সুগন্ধি

পানিতে শরীর ডুবিয়ে রেখেছে, উঠে আসার একটু পরই আবার কটু গন্ধ বের হতে শুরু করে। মনে হয়, কবর থেকে উঠে আসা পচা-গলা লাশ। অবস্থা এমন, শত্রুর আগে বন্ধুরা পালায়। ডাক্তারের কাছে গেলে তারা বলে,

'আপনার শরীরে রোগ-বালাইয়ের লেশমাত্র নেই। আমাদের পরীক্ষায় অন্তত কোনও রোগ ধরা পড়ে নি'।

মানুষটা সমস্যা সমাধানের জন্যে হন্যে হয়ে ফিরতে লাগল। নানা দরবার আর কারবার ঘুরে অবশেষে এক বুজুর্গের সাথে দেখা হলো। তাকে সব কথা ব্যথা খুলে বলল। নেককার বললেন,

'বুঝতে পেরেছি, ডাক্তাররা রোগের উৎস ধরতে পারেনি। সবাই রোগের উৎস শরীর মনে করে চিকিৎসা করার চেষ্টা করেছে। রোগটা তোমার শরীরে নয়, আমলে। কলবে।

'আমলে? আমলের বুঝি এমন দুর্গন্ধ হয়'?

'আমি নিশ্চিত নই, তবে তোমার সব কথা শুনে আমার এটাই মনে হলো। আল্লাহ তাআলা হয়তো তোমার কল্যাণ চান, মৃত্যুর আগেই তোমাকে দিয়ে তাওবা করিয়ে নিতে চান, তাই তোমার বদআমলের স্বরূপকে দুর্গন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যাতে তুমি সময় থাকতেই সচেতন হও, সতর্ক হও। তোমার বোধ হয় গোপন পাপ আছে'।

'আমি এখন মরিয়া। স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার বাড়ি এখানে হলেও থাকি দূরের এক শহরে। বাড়ির লোক আমাকে ভালো মানুষ বলেই জানে। সাধু মনে করে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমি নানা অপরাধ করে জীবিকা উপার্জন করি। আমি খারাপ পাড়ায় চাকুরি করি। আমার আয়ের উৎস চুরি-সুদ-ব্যভিচার-নেশাদ্রব্য'।

'আমার মনে হয়, এসব কাজই তোমার শরীরের বদগন্ধের কারণ। তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা করা থাকত, প্রতিটি গুনাহের নিজস্ব দুর্গন্ধ থাকবে। গুনাহটা করলেই গুনাহকারীর শরীর থেকে দুর্গন্ধটা বের হতে শুরু করবে, তাহলে কেমন হতো? তোমার বেলায় মনে হয় এমনটাই ঘটেছে'।

'হযরত, এখন সমাধান কী'?

'সমাধানও বুঝি আমাকে বলে দিতে হবে? গুনাহ ছেড়ে দেবে। আল্লাহর কাছে খাস দিলে তাওবা করবে'।

'তাহলে বদগন্ধ দূর হয়ে যাবে বলছেন'?

'পরীক্ষা করেই দেখো না। তবে শর্ত হলো তাওবাটা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যটা নিঃশর্ত হতে হবে'।

মানুষটা কর্মক্ষেত্র থেকে চলে এল। গুনাহ ছেড়ে শুদ্ধ জীবনযাপন করতে শুরু করল। কিন্তু দুর্গন্ধ একটু কমলেও একেবারে দূর হয়ে যায় নি। বুজুর্গের দরবারে গিয়ে কেঁদে পড়ল,

'হুজুর, আমার কী উপায় হবে'?

'আমার মনে হয়, তোমার বর্তমান আমল দুরস্ত হলেও, অতীতের কৃতকর্মের কলুষতা রয়ে গেছে। তার প্রভাবেই দুর্গন্ধ যায় নি। ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে'।

'কীভাবে ক্ষমা পাবো'?

'ক্ষমা পাওয়ার কুরআনি ফর্মুলা আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

নিশ্চয় পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয় (হুদ ১১৪)।

'সাদাকা করো। পারলে হজ করে এসো। হজে মাবরুর মানুষকে নবজাতকের মতো নিষ্পাপ করে দেয়। সিজদায় গিয়ে বেশি বেশি আল্লাহর কাছে কাঁদো'।

বুজুর্গের কথামতো সাদাকা করতে শুরু করল। হজও করে এল। দুআ কবুল হওয়ার প্রতিটি সময় ও স্থানে হাউমাউ করে কেঁদে দুআ করল। যে কয়দিন হজে ছিল, দুর্গন্ধ ছিল না। ফিরে আসার পর আবার দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। এদিকে বুজুর্গের দেখা নেই। তিনি কোথাও গিয়েছেন। শুধু মানুষ নয়, কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে কবরস্তানের কাছে নির্জন এক স্থানে বাস করতে শুরু করল। এক রাতে স্বপ্নে দেখল, তার গায়ের গন্ধে কবরের লাশগুলোও পালাচ্ছে। সারি সারি কঙ্কাল খটখট আওয়াজ তুলে দৌড়াচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠে ধড়মড় করে জেগে উঠল। কবরে এসেও নিস্তার পায় নি। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সকালে কুটিরের সামনে বসে বসে নিয়তির কথা ভাবছে। দূর থেকে দেখা গেল, বুজুর্গ এদিকে আসছেন। দৌড়ে তার কাছে গেল।

'হুজুর, কিছুই তো হলো না। কী এক গজব এল, দুনিয়াতে বেঁচে থেকেও আজ আমি ঘরবাড়ি ছাড়া। আপনি যা যা বলেছেন, সব করেছি। যেভাবে বলেছেন, একবিন্দু নড়চড় করি নি'।

'এভাবে কেঁদে লাভ নেই। তোমার কলব এখনো পরিশুদ্ধ হয় নি। তোমাকে বলেছিলাম নিঃশর্ত আনুগত্য করতে। তুমি বোধ হয় তা কর নি। তোমার কলবে 'আপত্তি' বিদ্যমান। তোমার এই কান্না নিজেকে দোষী মনে করার কান্না নয়। এটা মূলত (العدالة الإلهية) আল্লাহর ইনসাফের প্রতি অভিযোগের কান্না।

'বুঝতে পারি নি হুজুর। কষ্ট করে আরেকটু সহজ করে বলুন'।

'বোঝার কথাও নয়। তুমি অতীতের পাপস্খালনের জন্যে বহু কিছু করেছ। আমি ভুল কিছু বললে, সাথে সাথে বলে দেবে। তোমার ধারণা অনুযায়ী, তুমি অতীতপাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছ। এতকিছু করার পর, তোমার ক্ষমা পাওয়া উচিত। ক্ষমা পাওয়াটা তোমার অধিকারে পরিণত হয়েছে। এখনো যেহেতু দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, তুমি নিজেকে অধিকারবঞ্চিত ভাবতে শুরু করেছ। তার মানে, আল্লাহ তাআলা তোমার ন্যায্য অধিকার তোমাকে দিচ্ছেন না (নাউযুবিল্লাহ)। তোমার চিন্তামতে আল্লাহ অন্যায়কারী (নাউযুবিল্লাহ) আর তুমি নির্দোষ। এমন চিন্তা তোমার মনে হয়তো সুস্পষ্ট নেই, তবে অবচেতনে আছে। ঠিক বলেছি'?

'জি।'

-'তুমি ভালো কাজ করছ ঠিকই, পাশাপাশি আল্লাহ তাআলাকেও দোষী ভাবছ। একদিকে নেক আমল করছ, আরেকদিকে রাব্বে কারিম সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে মারাত্মক পাপ করে চলেছ। নেকআমলের চেয়ে তোমার বদআমলের পাল্লা শতগুণ বেশি ভারী হয়ে চলেছে। আসলে তোমার ঈমানই ঠিক নেই। তোমার মতো মানুষ একজন দুজন নয়, হাজারো, অসংখ্য। কুরআনেও তোমাদের কথা আছে,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করেছে (কাহফ ১০৩-৪)।

'জি, হুজুর, আমি নিজেকে মজলুম ভাবতে শুরু করেছিলাম'।

'কতবড় জঘন্য কথা, রহিম-রহমানকে তুমি জালিম ভাবছিলে। অথচ তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন,

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

আমার সামনে কথার কোনও রদবদল হতে পারে না। এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না (কাফ ২৯)।

এমন ঘোষণা পুরো কুরআনে ছয়বার দিয়েছেন। আহযাবের যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহ সম্পর্কে ভিন্ন রকমের চিন্তা করেছিলেন,

আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে (আহযাব : ১০)।

'তাহলে আমার ধারণায় দোষ হবে কেন'?

'সাহাবায়ে কেরামের ধারণা আর তোমার ধারণায় আকাশ-পাতাল তফাত। তারা চারদিক থেকে কাফিরদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কিছুটা অশান্ত হয়েছিলেন। তাও কেউ কেউ, সবাই নয়। বিপদগ্রস্ত মানুষের মনে হঠাৎ হঠাৎ নানা রকমের চিন্তার উদয় হয়। পরক্ষণেই আবার চলে যায়। এমন চিন্তা হুট করে এসে, আবার চলে যাওয়াতে পাপ নেই। তোমার চিন্তাটা হুট করে আসা নয়, মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে গেঁড়ে বসা বদ্ধমূল বিশ্বাস'।

'আমি আর কী করব, এত চেষ্টার পরও ক্ষমা না পেলে'?

'তুমি যে নিকৃষ্ট পাপগুলো করেছ, তার শাস্তি কত কঠিন, তোমার যদি গায়েবের জ্ঞান থাকতো, তাহলে টের পেতে। আল্লাহ ছাড়া আর কারও গায়বের জ্ঞান নেই। তাই আমরা জানতে পারি না, আমাদের পাপরাশির শাস্তি কতটা কঠিন আর ভয়ানক। তোমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়াটা যদি আখিরাতের আযাব মাফের বিনিময়ে হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে, রাব্বে কারিম তোমার প্রতি সীমাহীন দয়া করেছেন। কিন্তু তুমি অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তাআলাকে দোষী ভাবতে শুরু করেছ। জালিম ভাবছ (নাউযুবিল্লাহ)। এখনো সময় পেরিয়ে যায় নি। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাও। নিঃশর্ত আনুগত্য করো। তুমি নিয়মিত সালাত-সিয়াম-হজ-সাদাকা আদায় করেও এখনো পর্যন্ত সত্যিকারের 'মুসলিম' হতে পারো নি'।

'আমি কি মুসলিম নই'?

'জি, তুমি নামে মুসলিম, কামে নও। সত্যিকার ইসলাম হলো, সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা'।

'সোপর্দ কীভাবে করব'?

সর্বাবস্থায় এই বিশ্বাসগুলো ধরে রাখা,

১. আল্লাহকে দোষারোপ না করা। আল্লাহর কোনও কাজে মনে ঘুণাক্ষরেও আপত্তি না রাখা।

২. তাকদিরের ফয়সালাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়া। কোনওপ্রকারের ওজরআপত্তি না তোলা।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া ও না-পাওয়া উভয়টাকে সমানভাবে গ্রহণ করা। আল্লাহ আমার প্রতি যেমন আচরণই করেন, সেটাকে তাঁর রহমত ও

হেকমতের অংশ মনে করে খুশি থাকা। নিয়ামত পেয়ে গর্বিত হয়ে না পড়া। নিয়ামত লাভে বঞ্চিত হয়ে আপত্তি না তোলা। রহমত ও গজব উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর প্রতি সমান অনুগত থাকা।

৪. আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় আদেল। ইনসাফকারী। ন্যায়বিচারক। সুবিবেচক। আল্লাহর ইনসাফের কোনও রদবদল ঘটে না। কখনো কম কখনো বেশি এমন হয় না। সর্বাবস্থায় তিনি পরিপূর্ণ 'আদেল'।

সব তো শুনলে। এবার নতুন করে (لا إله إلا الله) বলো। তারপর (استقم)-এর উপর অবিচল থাকো।

'আমি সব সময়ই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ি ও বলি'।

'তা বলো। কিন্তু তোমার এতদিনের বলাটা ছিলো মুখে মুখে। কলব দিয়ে বল নি। তোমার আচরণ দিয়ে বল নি। তোমার অবস্থান দিয়ে বল নি। আমল দিয়ে বল নি'।

'সেটা কেমন'?

'তুমি 'পাওনা' নিয়ে ভেতরে ভেতরে আল্লাহর সাথে নিয়মিত ঝগড়া করতে। যেন তুমিও তার মতো আরেকজন ইলাহ (উপাস্য)। নাউযুবিল্লাহ। তোমার ঝগড়ার ধরনটা ছিলো এমন,

হে আল্লাহ, আমি (استغفرت) ক্ষমা চাই বলেছি, কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করেন নি।

আমি আপনার দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছি, কিন্তু আপনি আমার প্রতি দয়া করেন নি।

আমি আপনার কাছে কেঁদেছি, কিন্তু আপনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি (নাউযুবিল্লাহ)।

সালাত আদায় করেছি। সিয়াম পালন করেছি, হজ করেছি, কিন্তু আপনি আমার প্রতি সদয় আচরণ করেন নি (নাউযুবিল্লাহ)।

কোথায় গেল আপনার আদল-ইনসাফ? (নাউযুবিল্লাহ)।

বৎস! এটার নাম তাওহিদ নয়।

তাহলে তাওহিদ কী?

তাওহিদ হলো,

১. আল্লাহর চাওয়াই তোমার একমাত্র চাওয়াতে পরিণত হওয়া।
২. আল্লাহর বাঞ্ছিত আমলই তোমার প্রিয় আমলে পরিণত হওয়া।

৩. তোমার হাত-পা-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হওয়া।
৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে (কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে) যে আদেশই আসুক, সাথে সাথে 'হ্যাঁ' বলা। যেমনটা হ্যাঁ বলেছেন আল্লাহর রাসুলগণ। ফিরিশতাগণ। ভুলেও তোমার মুখ দিয়ে 'কেন' উচ্চারিত না হওয়া।
৫. তিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই, কোনও ইনসাফকারী নেই, কোনও রহমান নেই, রহিম নেই। তিনি ছাড়া আর কোনও হক নেই।
৬. তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আমি ছিলাম না, আছি, থাকবো না। তাঁর অস্তিত্বই সর্বকালের একমাত্র ধ্রুবসত্য। এমনকি কাল সৃষ্টিরও আগে, কাল কখনো শেষ হলে, তারও পরে তিনি ধ্রুবসত্য। আমার অস্তিত্ব ধ্রুবসত্য নয়।
৭. যে আমি একসময় নাই হয়ে যাবো, সে আমি কীভাবে 'চির অস্তিত্ববান' সত্তার সাথে তর্ক জুড়ি? আমি তার কাছ থেকে শুধু 'মদদ' গ্রহণ করবো। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, নিরঙ্কুশ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, কৃতজ্ঞ গদগদ চিত্তে।
৮. তিনিই হক। বাকি সব বাতিল। মিথ্যা। অসার। তিনিই একমাত্র সুনিশ্চিত। তাঁর কথা সুনিশ্চিত। তাঁর বিধান সুনিশ্চিত। বাকি সব অনিশ্চিত। ধোঁয়াশা।'

বুজুর্গের কথা শেষ হলে লোকটা কেঁদে দিল। বুজুর্গ তাকে অভয় দিলেন।

'বাছা, তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ'?

'জি, হুজুর। আমি এখন বুঝতে পারছি, আমার এতদিনের বেঁচে থাকাটা ছিল অর্থহীন। আমার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগিও ছিল মূল্যহীন। আমার তাওহিদই বিশুদ্ধ ছিল না। সে অর্থে বলতে গেলে, আমি আসলে এতদিন কোনও ইবাদতই করিনি'।

'এখন তো বুঝলে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে, নতুন করে বুঝেশুনে কালিমায়ে তাওহিদ বলো। তারপর এই বলার উপর অটল অবিচল থাকো'।

এমনভাবে (لا) বলো, যেন এই 'লা' বলার সাথে সাথে দুনিয়ার বাকি সবকিছু (لا) হয়ে যায়।

ইলাহা (إله) বলার সময়, দুনিয়ার সমস্ত উপাস্যকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

ইল্লাল্লাহ (إلا الله) বলার সময়, অন্তরে একমাত্র আল্লাহই বসবে। আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না।

যেভাবে বললাম, হুবহু সেভাবে চিন্তা করে একবার উচ্চারণ করো,

লা (لا) নেই,

ইলাহা (إله) কোনও উপাস্য,

ইল্লাল্লাহ (إلا الله) আল্লাহ ছাড়া।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

চারপাশ অপূর্ব সুরভিতে ছেয়ে গেল। বাতাসে বয়ে নিয়ে গেল মনমাতানো সৌরভ। মোহনীয় সুবাসে মোহিত হয়ে আকাশ বাতাস।

কিয়ামত ও আল্লাহর সাক্ষাৎ!

১. আধুনিক জীবনযাত্রার ঢঙই এমন, আমি যত আধুনিক জীবনের সাথে জুড়ব, ততই আখিরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরতে থাকব। বস্তুবাদী জগৎ আমাকে 'আসল হাকিকত' ভুলিয়ে দেয়। আখিরাতই হলো আসল হাকিকত। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু আমরা তা থেকে গাফেল,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের জন্যে তাদের হিশেবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় বিমুখ হয়ে আছে (আম্বিয়া ১)।

২. কুরআন কারিম বিভিন্নভাবে আখিরাতের কথা বলেছে। কিয়ামতের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছে। কুরআনে আখিরাতের কথা এত বেশিবার আলোচিত হয়েছে, এতবেশি ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে, মানুষের পক্ষে কিয়ামতের আলোচনা সংবলিত আয়াতগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান বের করা অসম্ভব। একটু পরপরই কিয়ামতের আলোচনা। পরকালের আলোচনা। আখিরাতের আলোচনা। এসব কি এমনি এমনি? কোনও কারণ ছাড়াই?

৩. কুরআন কারিমে আখিরাত-বিষয়ক আয়াতগুলোতে বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কখনও কবর, কখনো কবর থেকে ওঠার অবস্থা, কখনও কিয়ামত মাঠের অবস্থা, কখনও আল্লাহর সামনে নতমস্তকে দাঁড়ানো অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কিয়ামতচিত্র : ১

শিঙ্গাধ্বনির পর সবাই যে যার কবরগাহ থেকে উঠে আসবে। ভীত-বিহ্বল হয়ে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

আপনি কিছুতেই মনে করবেন না জালিমগণ যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তো তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফারিত। তারা মাথা উপর দিকে তুলে দৌড়তে থাকবে। তাদের দৃষ্টি

পলক ফেলার জন্যে ফিরে আসবে না। আর (ভীতি বিহ্বলতার কারণে) তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম করবে (ইবরাহিম ৪২-৪৩)।

৪. আমাদের দৃষ্টি হবে বিস্ফারিত। মাথা উপর দিকে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকব। বেদম ভয়ের চোটে চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যাবো। প্রচণ্ড শঙ্কার কারণে, মনে হবে প্রাণপাখি আবার উড়ে যাবে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা।

কিয়ামতচিত্র : ২

কিয়ামতের দিন যে কী এক ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে, ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। কুরআন কারিমের আয়াতের আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! আপনি যদি সেই দৃশ্য দেখতেন, যখন অপরাধীরা নিজ প্রতিপালকের সামনে মাথা নুইয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলবে!) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (এবার প্রকৃত বিষয়) দেখলাম ও শুনলাম। সুতরাং আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন। তাহলে আমরা সৎকাজ করব। আমরা যথার্থ বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি (সাজদা : ১২)।

৫. একটু কল্পনা করে দেখতে পারি, আমি মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বিচার হচ্ছে। নানা অপরাধ বেরিয়ে আসছে। যেসব কেউ জানত না। থরথর করে কাঁপছি। দুই হাঁটু ভয়ে ঠকঠক করছে। বাঁচার আর কোনও আশা নেই। অনুনয় বিনয় করছি, আমাকে যেন আরেকবার পৃথিবীতে ফেরার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তা কি সম্ভব?

কিয়ামতচিত্র : ৩

সেদিন চরম বিপর্যস্ত অবস্থা হবে। আল্লাহর ভয়ে জর্জরিত হয়ে একে অপরের দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে,

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ

আপনি তাদেরকে দেখবেন, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে এভাবে পেশ করা হবে যে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অস্ফুট চোখে তাকাচ্ছে (শুরা ৪৫)।

৬. আমি দুনিয়াতে কত সম্মানিত ছিলাম। লোকে আমাকে বড় সাহেব বলে ডাকত। বড় হুজুর বলে ডাকত। সেদিন সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে।

কিয়ামতচিত্র : ৪

একেকজন অপরাধীর চেহারা সেদিন কালো হয়ে যাবে। অমাবস্যার ঘোর অমানিশা তাদের চেহারায় ছেয়ে যাবে,

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দ কাজের বদলা অনুরূপ মন্দই হবে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ (-এর আজাব) হতে তাদের কোনও রক্ষাকর্তা থাকবে না। মনে হবে যেন তাদের মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতের টুকরা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে। তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে (ইউনুস : ২৭)।

৭. কিয়ামতচিত্র : ৫

আরেকটা দৃশ্য কল্পনা করলে, অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। সেদিন অপরাধীরা হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসবে,

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আর আপনি প্রত্যেক দলকে দেখবেন হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে এবং প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। এটা আমার (লিপিবদ্ধ করানো) দফতর, যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলছে। তোমরা যা-কিছু করতে আমি তা সবই লিপিবদ্ধ করাতাম (জাসিয়া : ২৮-২৯)।

৮. কিয়ামতচিত্র : ৬

অবস্থা এমন শোচনীয় হবে, তাদের প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে যাবে। প্রায় যায় যায় অবস্থা,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

(হে রাসুল!) তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যাবে। জালিমদের থাকবে না কোনও বন্ধু এবং কোনও সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হয় (মু'মিন : ১৮)।

৯. আরও অসংখ্য আয়াতে কিয়ামতের বিভীষিকার বর্ণনা আছে। সেদিন মানুষ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তার বর্ণনা আছে। আমার সময়ও শুরু হয়ে যেতে পারে। মালাকুল মাউত যে কোনও মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে। তারপরই শুরু হবে আমার সেই সুনিশ্চিত যাত্রা। সেদিন কখন আসবে? আল্লাহ ছাড়া কেউ তা

বলতে পারে না। কুরআন কারিমে ছয়বার বলা হয়েছে, সেদিন আসবে আচানক (بَغْتَةً)।

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً

অবশেষে কিয়ামত যখন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে পড়বে (আনআম ৩১)।

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

তোমাদের নিকট তা (কিয়ামত) আসবে হঠাৎ করেই (আরাফ : ১৮৭)।

أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অথবা সহসা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত আপতিত হবে? (ইউসুফ : ১০৭)।

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

বরং তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) তাদের কাছে আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে, ফলে না তারা তা হটাতে পারবে এবং না তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হবে (আম্বিয়া ৪০)।

আমার কি জানা আছে, কোন অবস্থায় এসে আজরাঈল আমাকে পাকড়াও করবে? আমি কেন সতর্ক থাকছি না?

১০. পুরো কুরআন কারিম জুড়ে কিয়ামত আর কিয়ামতের আলোচনা। অন্য কোনও আসমানি কিতাবে এত বেশি পরকালের বর্ণনা নেই। কুরআন কারিমে বিস্তারিতভাবে আখিরাতের বর্ণনা আছে, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা আছে। আজাব-গজবের কথা আছে। তাওরাত-ইনজিলে এভাবে নেই।

১১. আল্লাহ তাআলা নিজের প্রশংসা করেছেন। কেন?

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَـٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ

তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে রূহ (অর্থাৎ ওহি) নাজিল করেন। এই জন্যে যে, সে সাক্ষাৎ দিবস সম্পর্কে সতর্ক করবে (মু'মিন : ১৫)।

১২. নিজের প্রশংসা করেছেন, কারণ তিনি তার পছন্দের বান্দার উপর ওহি নাজিল করেন। যাতে সেই পছন্দের বান্দা (নবী বা রাসুল) শেষদিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে পারে। তার মানে ওহির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করা। আরও খোলাসা করে বলতে পারি, কুরআন নাজিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে সতর্ক করা, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিবস সম্পর্কে। আর আমরা এই বিষয়ে কত গাফিল।

১৩. আমরা যখন কুরআন কারিম তিলাওয়াত করি, তখন কি আমার মনে একথা জাগরূক থাকে, এই কুরআন কেন নাজিল করা হয়েছে? আমার কাছে স্পষ্টভাবে কথাটা জানা থাকে, এই কুরআন নাজিল হয়েছে, আমাকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে। আখিরাতের স্মরণ সংবলিত আয়াতগুলো কি আমাকে যথাযথভাবে আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়? নাকি কোনও রকম পড়েই সামনে চলে যাই?

১৪. আমরা যখন শেষদিনকে ভুলে দুনিয়া নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ি, তখন কিন্তু আমরা সাধারণ একটা দিনকে ভুলি না, আমি ভুলে থাকি এক ভয়ংকর দিনকে,

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

তারা তো (দুনিয়ার) নগদ জিনিসকে ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করছে (দাহর : ২৭)।

১৫. এই যে বিভিন্ন আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ সেই কঠিন দিনে, নির্বাক হয়ে যাবে, তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে যাবে, তাদের মাথা অবনত হয়ে যাবে, ভয়ে পাগলপারা হয়ে যাবে, হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসে থাকবে। এর কারণ কী? কেন স্নায়ুগুলো জমাট বেঁধে যাবে? দৃষ্টি জমে যাবে?

এর কারণ নিঃসন্দেহে, আজাবের ভয় আর দুনিয়ার বুকে করে যাওয়া বদআমলের ফিরিস্তি। এই দুটি বিষয় ছাড়া আরও একটি বিষয়ও আছে। তা হলো, আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি। সেদিন তিনি আবির্ভূত হবেন। সবাই তার উপস্থিতিতে ভয়ে সমীহে জড়সড় হয়ে পড়বে। কথা বন্ধ হয়ে যাবে, আল্লাহর বড়ত্ব বুঝতে পেরে, মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরে। তিনি রহমান। সে ভয়ংকর দিনে সবার আওয়াজ ফিসফিসে হয়ে যাবে,

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

সে দিন সকলে আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে এমনভাবে যে, তার কাছে কোনও বক্রতা পরিদৃষ্ট হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর সামনে সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে আপনি পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবেন না (তোয়াহা : ১০৮)।

১৬. একটু পরেই আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

আল-হাইয়ুল কাইয়ুম (অর্থাৎ চিরঞ্জীব, নিয়ন্ত্রক, সেই সত্তার) সামনে সকল চেহারা নত হয়ে থাকবে। আর যে-কেউ জুলুমের ভার বহন করবে, সে-ই ব্যর্থকাম হবে (তোয়াহা : ১১১)।

১৭. দুনিয়ার অন্ধ মোহে বুঁদ হয়ে গেলে, চোখের সামনে পর্দা পড়ে যায়। কোনও এক উপলক্ষ্যে মানুষ যখন এই অন্ধকার পর্দা সরিয়ে, নিজের মাঝে ডুব দেয়, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ বিষয়ে চিন্তা করে, তখন মানুষ নিজের মধ্যে আশ্চর্য রকমের প্রাণশক্তি অনুভব করে। ঈমানের নবধারা জলে অবগাহনের অনুভূতি জাগ্রত হয় তার মধ্যে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা মানে নতুন এক ঈমানি গোসল। এই গোসলে কলব থেকে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যায়। এই গোসলে কলবের অনেক বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। এতদিনকার অনেক জং ধরা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে।

১৮. শেষদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা কলবে 'হাজির-নাজির' রাখার অন্যতম বড় ফায়েদা হলো, কলব অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না। সব সময় আখিরাতে কাজে আসবে, এমন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়। অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি, অপ্রয়োজনীয় শ্রবণ, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা, অপ্রয়োজনীয় ঘুম, অপ্রয়োজনীয় নেটবিচরণ কমে আসে। আল্লাহর সাক্ষাৎচিন্তা মানুষকে শুধু মূল লক্ষ্যপানে ধাবিত করে।

১৯. আল্লাহর সাক্ষাতের চিন্তা মানুষকে বড় বেশি কুরআন কারিমমুখী করে দেয়। আল্লাহমুখী মুমিন তার চিন্তাকে, তার ব্যক্তিত্বকে কুরআনের ছাঁচেই গড়ে তোলে। কারণ আল্লাহ তাআলা সেই কঠিন দিনে, আমাদের যাবতীয় হিশেব গ্রহণ করবেন কুরআনেরই আলোকে,

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

(হে নবী!) আমি এভাবে অতীতে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ আপনাকে অবহিত করি আর আমি আপনাকে আমার নিকট থেকে দান করেছি এক উপদেশবাণী। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে মস্ত বোঝা (তোয়াহা : ৯৯-১০০)।

২০. আমরা আজ নবীজি সা.-এর শিক্ষাকে ভুলে গেছি। তার দাওয়াতকে অবহেলা করছি। এটা একদিন আমাদেরকে ভীষণ বিপদে ফেলে দেবে,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ

এবং সেই দিন (-কে কিছুতেই ভুলো না) যখন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমর নবীগণকে কী উত্তর দিয়েছিলে? সে দিন যাবতীয় সংবাদ (যা তারা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরি করত) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না (কাসাস ৬৫-৬৬)।

২১. আধুনিক সমাজের অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি দিক হলো, অনেক মুসলিমের চিন্তাজগৎ গড়ে ওঠে পাশ্চাত্যের বিকৃত চিন্তাভাবনা দ্বারা। ব্যাপারটা স্বচ্ছ-সুপেয় ঝরনার পানি ত্যাগ করে, নালা-নর্দমার নোংরা জল পান করার মতো হয়ে যায় না? কুরআন ও সুন্নাহর চিন্তা বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণ করাটাও এমনই।

২২. শেষদিবসে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা মুমিনকে অনেক সুন্দর চিন্তা ও কর্ম উপহার দেয়। তাকে ভাবতে শেখায়, কীসে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকার হবে। তার সামনে থাকে আখিরাত। তাই অপর ভাইয়ের কল্যাণভাবনাও আখিরাতে লাভের চিন্তা থেকে আসে,

من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامةِ . ومن يسَّرَ على معسرٍ، يسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ . ومن سترَ مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ . واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একজন মুমিনের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ আখিরাতে তার কষ্ট দূর করবেন। একজন নিঃসম্বল ব্যক্তিকে সম্বল জোগালে আল্লাহও দুনিয়া-আখিরাতে তাকে সম্বল জোগাবেন। একজন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন (আবু হুরায়রা রা. । মুসলিম ৭০২৮)।

২৩. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা মনে রাখলে, আমি মুমিন ভাইদের প্রতি দয়ালু হব। তার দ্বীনের উন্নতির ফিকির করব। তার কুরআন শিক্ষা নিয়ে ভাবব। তার আমলি উন্নতি নিয়ে ভাবব। এমনকি জাগতিক শিক্ষা অর্জন করেও অপর মুমিন ভাইয়ের কাজে আসার প্রতি সচেষ্ট হব।

২৪. শেষদিবসে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎচিন্তা আমাকে মজলুম ভাইদেরকে ভুলে থাকতে বাধা দেবে। আমাকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জোগাবে। আমি যত বেশি আল্লাহর সাক্ষাৎচিন্তা নিজের মধ্যে জাগ্রত করব, ততবেশি আমার ভেতর থেকে দুনিয়া বের হয়ে যেতে থাকবে। মানুষের দৃষ্টিতে বিশাল কোনও দুনিয়াবি পদও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। আমাকে বেশি বেশি আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। মানুষের প্রশংসা-নিন্দা আমাকে খুব একটা প্ররোচিত বা বিচলিত করতে পারবে না।

২৫. আমার চর্মচক্ষু আর মনশ্চক্ষু উভয়ের সামনে যখন শুধু আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা থাকবে, তখন দুনিয়ার সবকিছুকেই তুচ্ছ বলে মনে হবে। সেদিন আমার অবস্থা কেমন হবে?

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

(কিয়ামত একদলকে) নিচু করবে, (আরেকদলকে) উঁচ করবে (ওয়াকিয়া ৩)।

২৬. যার সামনে আয়াতটা থাকবে, তার কাছে খ্যাতির মোহ, নেতৃত্বের মোহ ফিকে হয়ে যাবে। দুনিয়ার বাজার তার কাছে নগণ্য হয়ে যাবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, চারপাশের চাকচিক্য, সবই ঠুনকো। পলকা। ভঙ্গুর। এসবের পেছনে আমার মহামূল্যবান সময় ব্যয় করা বৃথা। আমার বহুমূল্য হায়াত এসবের জন্যে ব্যয় করতে দেওয়া হয় নি। মাস-বছর দূরের কথা, একটা মুহূর্তও এসবের পেছনে ব্যয় করা যৌক্তিক নয়।

২৭. মানুষ কীভাবে যে আসমান-জমিনের প্রতাপান্বিত শাসককে ভুলে দুর্বল মাখলুকের পূজায় লিপ্ত হয়! এ এক রহস্য। আমার মধ্যে যখনই দুনিয়া হানা দেবে, আমাকে যখনই পাপ হাতছানি দিয়ে ডাকবে, আমি আয়াতাংশটুকু স্মরণে আনব,

آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ নাকি যাদেরকে তারা (আল্লাহর প্রভুত্বে) অংশীদার বানিয়েছে তারা? (নামল ৫৯)।

তাই তো, কে শ্রেষ্ঠ? আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নাকি অন্য কেউ? কার পথ অনুসরণের জন্যে সেরা? আমার রবের নাকি অন্য কারও?

মৃত্যু

কুরআন কারিমে নানা বিষয়ে অসংখ্য মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমান তো বটেই, অমুসলিমেরও মূলনীতিগুলো জেনে রাখা কর্তব্য। জগতের সবচেয়ে তিক্ততম ও অকাট্যতম মূলনীতি হলো,

মৃত্যু সুনিশ্চিত

১. প্রতিটি প্রাণীর কাছে মৃত্যু আসবেই। এটা এক অবধারিত সত্য। অমোঘ নিয়তি। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীর কাছেই মৃত্যু এক অনিবারণীয় সত্য,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (আলে ইমরান ১৮৫)।

একমাত্র আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। চিরস্থায়ী। বাকি সব মরণশীল। মানুষ ফিরিশতা সবাই নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ইহজীবন ত্যাগ করবে।

২. আমি চাইলেও মৃত্যুকে পাশ কাটাতে পারব না। মৃত্যু থেকে ফস্কানোর কোনও উপায় নেই। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে লুকানোর মতোও কোনও স্থান নেই।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনও দুর্গেই থাক না কেন (নিসা ৭৮)।

ওহুদের পর মুনাফিকরা বাগাড়ম্বর করে বলেছিল, ওরা (শহীদগণ) যদি যুদ্ধে না যেত, তাহলে মরতো না। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা রদ করে এই আয়াত নাজিল করেছিলেন। তোমরা ঘরে থেকেও মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাবে না। যতই সুরক্ষিত দুর্গে থাকো না কেন, বাঁচার উপায় নেই।

৩. মাঝেমধ্যে বোকাদের ভ্রম হয়, তারা মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে। তারা নিস্তার পেয়ে যাবে,

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

(হে নবী! তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে সে পলায়ন তোমাদের কোনও কাজে আসবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে (জীবনের) আনন্দ ভোগ করতে দেওয়া হবে অতি সামান্যই (আহযাব ১৬)।

একদল মুনাফিক নবীজি সা.-এর কাছে এসে বলল, (إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ) আমাদের ঘর অরক্ষিত। অথচ আল্লাহ বলছেন, (وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) তা অরক্ষিত ছিল না। তারা শুধু (إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) পালাতেই চাইছিল। ঘটনাটা আহযাব যুদ্ধের। পালিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে, এমন ভ্রান্ত চিন্তাকেই আয়াতে রদ করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট মেয়াদ

৪. আমি মৃত্যুভয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে চাই না। দ্বীনের পতাকা বুলন্দির জন্যে নিজেকে মেহনতে জুড়তে চাই না! যদি মরে যাই?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا

কোনও ব্যক্তির এখতিয়ারে নয় যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তার মৃত্যু আসবে, নির্দিষ্ট এক সময়ে তার আগমন লিখিত রয়েছে (আলে ইমরান ১৪৫)।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার প্রতি নিরুৎসাহিত করছেন।

৫. সময়ের আগে কেউ মারা যাবে না। সময় হয়ে গেলে, এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং ত্বরাও করতে পারে না (আ'রাফ ৩৪)।

কখন সময় এসে যাবে টেরটিও পাবো না। তাই আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখাই ভালো। লেনদেন সাফ করে রাখা। হিশেব চুকিয়ে রাখা।

৬. অনেকেই আশায় আশায় থাকে, অনেক কিছু করবে। অনেক পয়সা-কড়ি জমাবে। বাড়ি-গাড়ি করবে। কিন্তু আচানক মৃত্যু এসে হানা দেয়।

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

যখন কারো নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত (মুনাফিকুন ১১)।

এতদিনের সাজানো সংসার ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হয়। সাথে শুধু নেকআমলই নিতে পারে। আর কিছু নয়।

৭. মৃত্যু কারো কাছে পরম প্রত্যাশিত, কারো কাছে চরম অপ্রত্যাশিত। মুমিন মৃত্যুর ভয়ে ভীত থাকে, পাশাপাশি আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যেও পিপাসার্ত থাকে।

مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖ

যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত, আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে (আনকাবূত ৫)।

মুমিন হোক কাফির হোক, মৃত্যু আসবেই। পার্থক্য হলো, মৃত্যু পরবর্তী জীবনটা নিয়ে।

৮. আল্লাহ তাআলার সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত। তার স্থিরীকৃত বিষয়ের কোনও পরিবর্তন হয় না।

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয় আল্লাহর স্থিরীকৃত কাল যখন এসে যায়, তখন আর তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা জানতে (নূহ ৪)।

একটুও এদিক-সেদিক হবে না। যেমন পরিস্থিতিই হোক, মৃত্যু কার্যকর হয়েই যাবে।

মৃত্যুর স্থান

৯. কখন মৃত্যু হবে, কোথায় হবে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

এবং কোনও প্রাণী এটাও জানে না যে, কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে (লুকমান ৩৪)।

বেড়াতে যাই, দূরদেশে যাই, মনে মনে আশা থাকে, আবার ফিরে আসব। কিন্তু অনেক সময় আর ফেরা হয়ে ওঠে না। এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়ে যায়। কিছুই করার নেই। এটাই আল্লাহর ফয়সালা।

মৃত্যুযন্ত্রণা

১০. দুনিয়ার কোনও যন্ত্রণার সাথেই এর তুলনা চলে না। সন্তানসম্ভবা মায়ের প্রসব যন্ত্রণার সাথেও এর তুলনা চলে না। মানে ও পরিমাণে কোনওভাবেই না। এর ধরন একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। কারণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগকারী কারো অভিজ্ঞতা জানার উপায় নেই।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে (কাফ ১৯)।

মা প্রসব যন্ত্রণা থেকে পালাতে চায় না। বরং সানন্দে যন্ত্রণা শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাণ সংহারক

১১. যা কিছুই করি, মনে রাখা উচিত, আমাকে একদিন রবের দরবারে হাজির হতে হবে।

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

বলে দিন, মৃত্যুর যে ফিরিশতাকে তোমাদের জন্যে নিয়োজিত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি উসুল করে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে (সাজদা ১১)।

দুনিয়ার দায়িত্বশীলদেরকে ফাঁকি দেওয়া যায়, আল্লাহর নিয়োগ করা দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে এসব চলবে না।

শহীদি মৃত্যু

১২. এই একটা মৃত্যুই স্বস্তির। যদি খালেস নিয়তে, রিয়ামুক্ত হয়ে শাহাদাত লাভ করা যায়, আর চিন্তা নেই।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে রিজিক দেওয়া হয় (আলে ইমরান ১৬৯)।

একজন শহীদের আমলনামা যত শূন্যই থাকুক, কিয়ামতের দিন তিনিই সবচেয়ে ধনীদের একজন হবেন।

১৩. এক শায়খ লিখেছেন,

আমার এক পরম সুহৃদ বেড়াতে এল। নাম তার আবদুল করিম। মধ্য চল্লিশে পা দিয়েছে। শক্তপোক্ত সুস্থ-সবল লোক। গায়ে-গতরে বেশ তাগড়া। আমরা ছেলেবেলা থেকে পরিচিত। ছোটবেলায় একসাথে বেড়ে উঠেছি। একসাথে পড়াশোনা করেছি। একই মহল্লায় পাশাপাশি বাড়িতে থেকেছি। বড়বেলায় দুজনে দুদিকে গিয়েছি। দুজন দেশের দুই প্রান্তে বাস করলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দিই নি। ঈদে-চাঁদে দেখা তো হতোই, মাঝেমধ্যে আমি তার কাছে বেড়াতে যেতাম, সেও আমার কাছে আসত। আমরা একে অপরকে না দেখে বেশিদিন থাকতে পারতাম না। দুজনের চিন্তা ও ভাবনার অনেক কিছুতে মিল ছিল। একে অপরের কাছে মনের ভাবগুলো বিনিময় করতে না পারলে, স্বস্তি পেতাম না। সবার জীবনেই কিছু ভাবনা থাকে, যেগুলো সবাইকে বলা যায় না। অল্প হাতেগোনা কিছু মানুষের কাছেই শুধু সেগুলো গচ্ছিত রাখা যায়। অন্য কাউকে বললে, হয়তো বুঝবে না, নইলে গুরুত্ব দিয়ে শুনবে না।

১৪. আবদুল কারিম ছোটবেলা থেকেই ভদ্র সজ্জন। পরোপকারী। অমায়িক। মিশুক প্রকৃতির। এই জীবনে আমার অসংখ্য উপকার করেছে। বেশিরভাগেরই কোনও প্রতিদান দেওয়া হয়ে ওঠে নি। 'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ'। কিন্তু তার প্রতি দেনার পরিমাণ এত বেশি, শোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

১৫. কদিন আগে আবদুল করিম বেড়াতে এল। পূর্ব কোনও যোগাযোগ ছাড়াই। দেশের ও-প্রান্ত থেকে এসেছে। ক্লান্তি দূর করার জন্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। ঘুম থেকে জাগার পর শুরু হলো দু-বন্ধুর গল্প। গল্প না বলে বলা উচিত ভাব-বিনিময়। জমে থাকা ভাব-বুদ্বুদের লেনদেন। মধ্যখানে শুধু সালাতের বিরতি। তারপর আবার শুরু। সময় ফুরোয় কিন্তু কথা ফুরোয় না। প্রতিবারের মতো এবারও একটা মাসয়ালা নিয়ে দুজনের মতবিরোধ দেখা দিল। রাতে ঘুমের সময় হলে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। মাসয়ালাটি সম্পর্কে আরও ভালো করে পড়াশোনার জন্যে আমার ব্যক্তিগত কুতুবখানা থেকে একটা কিতাবও বগলদাবা করে নিল। মা শা আল্লাহ, আবদুল করিম পড়তেও পারে বেশ। কোনও বিষয় ধরলে, শেষ না করে ছাড়ে না। আমি মাঝেমধ্যে ভাবি, সে যদি আমাদের মতো পড়ালেখার লাইনে থাকত, তাহলে বড় কিছু হয়ে যেতে পারত।

১৬. আবদুল করিম পরদিন চলে গেল। আবার শিগগিরই আসবে, কথা দিয়ে গেল। এর দুদিন পর, বাড়ি থেকে আম্মা ফোন করলেন,

বাবা, আবদুল করিম!'

'কী হয়েছে আবদুল করিমের'?

'একটা ঘটনা ঘটেছে'।

'কী ঘটনা? আবদুল করিমের কোনও সমস্যা'?

'জি। তুমি দ্রুত চলে এসো। আমরা তার বাড়িতে যাচ্ছি'।

'সে কি অসুস্থ? কোন হাসপাতালে আছে সে'?

'হাসপাতালে নয়, সে মারা গেছে'।

১৭. আমি দীর্ঘক্ষণ কিছু বলতে পারলাম না। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। আম্মা বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। আমাদের দুজনের গভীর বন্ধুত্বের কথা তিনি ছাড়া আর কে বেশি জানবেন? সংবিৎ ফিরে পেয়ে গ্রামের দিকে ছুটলাম। আমার তখনো বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না, আবদুল করিম আর নেই। মনে হচ্ছিল বাড়ি গেলেই তার দেখা পাব। আমার খবর পেয়েই বাসস্ট্যান্ডে সে বাইক নিয়ে ছুটে আসবে। আগের মতোই বাড়ি না গিয়ে এদিক-সেদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবে। পথ চলতে চলতে কথা বলবে।

১৮. তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হতেই হলো। আবদুল করিমের মৃত্যু আমার চিন্তাজগতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিল। কিছুই ভালো লাগছিল না। মনে অর্গল খুলে কথা বলার মতো আর কোনও বন্ধু রইল না। জীবনে আন্তরিক সম্পর্ক অনেকের সাথেই তৈরি হয়। বন্ধুও অনেকেই হয়। কিন্তু মনখুলে কথা বলার মতো বন্ধু খুব অল্পই হয়।

১৯. আবদুল করিমের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তার বাবা এসে জড়িয়ে ধরলেন। হু হু করে কান্না এল। আমাকে দেখে ইয়াতিম বাচ্চাদের শোক যেন উথলে উঠল। গোসল-কাফন-দাফনের পুরো সময় সশরীরে উপস্থিত থাকলাম। লোকজন আসছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি বারান্দার এককোণে চেয়ারে চুপচাপ বসে মানুষের আসা-যাওয়া লক্ষ করছিলাম। জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু এতটা আপনজনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আগে আর হয় নি। সবাই গৎবাঁধা শব্দে ও ছককাটা স্বরে শোক প্রকাশ করে যাচ্ছে। কাউকে কাউকে দেখে মনে হলো, দায় সারতে এসেছে। কাউকে মনে হলো তারা সত্যি সত্যি মর্মাহত। তবে বেশিরভাগের কথা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, তারা মৃত্যুর ঘটনাটিকে অন্যের বিপদ হিশেবে ধরে নিয়েছে। সান্ত্বনাও সে হিশেবে দিচ্ছে। তাদের কি এটা মনে

আছে, তাদেরও একদিন এই মুসিবতে পতিত হতে হবে? আমার মেয়াদও নির্ধারিত আছে? আমাকেও একদিন সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হবে? আমিও একদিন শাদা কাফনে আবৃত হব। একদিন ঘুটঘুটে অন্ধকার কবরে শায়িত হব। আমাকেও একদিন একাকী রেখে সবাই চলে আসবে।

২০. আজ শোক প্রকাশ করতে আসা কোনও মানুষ এই মাসে মারা যাবে, কেউ আগামী মাসে, কেউ এই বছর, কেউ আরও পরে। কিন্তু মরতে একদিন হবেই। অচিরেই আমাদের সবাইকে এই জীবন ত্যাগ করতে হবে। সবার জন্যেই একটি অন্তিম মুহূর্ত নির্ধারণ করা আছে। আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। তারপর মায়ের গর্ভে চার মাসের সময় ফিরিশতাগণ তাকদিরের খাতায় নির্ধারিত বয়েস লিখেছেন। আমি জন্মের পর থেকে দিন দিন সেই বয়েস পূর্ণ করার দিকে এগুচ্ছি। যত দিন যায়, আমার বেঁচে থাকার দিন ও ক্ষণ কমে আসতে থাকে।

২১. গত বছর এই দিনে আমার নির্ধারিত বয়েসের তিন বছর বাকি থাকলে, আজ বাকি আছে দুই বছর। প্রতি সেকেন্ডে আমি অন্তিম সময়ের দিকে যাচ্ছি। বিষয়টা আমি এতদিন কীভাবে ভুলে ছিলাম? আবদুল করিমের মৃত্যু না দেখলে, আমার মধ্যে সহসা মৃত্যু চিন্তা আসত কি না সন্দেহ। মানুষ কেন মৃত্যুকে ভুলে থাকে? কীভাবে এমন অমোঘ নিয়তিকে ভুলে থাকে? প্রতিটি মানুষই জানে, একদিন মরতে তাকে হবেই। মৃত্যু এক অকাট্য দর্শন। পৃথিবীর আদি থেকেই মানুষ এই দর্শন জানে। তবুও কেন মৃত্যুচিন্তা তার চিন্তাচেতনা জুড়ে থাকে না? তার মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে না?

২২. অদ্ভুত হলেও সত্যি, কিছু মানুষ মৃত্যুর আলোচনা করতেই ভয় পায়। মৃত্যুকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে। কেউ কেউ মৃত্যুকে ঘৃণাভরেই এড়িয়ে যেতে চায়। মৃত্যুকে ঠেকানো বা পেছানোর উদ্দেশ্যে চিকিৎসার খোঁজ করে। তাদের অবস্থা যেন এমন, আলোচনা এড়িয়ে গেলে, মৃত্যুকেও এড়ানো যাবে। আর মৃত্যুর কথা ওঠালে মৃত্যু তাড়াতাড়ি হাজির হবে। এই পলায়নপর মনোবৃত্তি সম্পর্কে কুরআন কারিম বলছে,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পালাচ্ছ, তা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেই। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা-কিছু তোমরা করতে (জুমু'আ ৮)।

২৩. আমি মৃত্যু থেকে পালাতে চাইলেই কি পালাতে পারব? ভুলে থাকতে চাইলেই বুঝি মৃত্যুর পাকড়াও থেকে ছুটকারা পেয়ে যাবো?

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

(হে নবী! তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে তবে সে পলায়ন তোমাদের কোনও কাজে আসবে না। এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে (জীবনের) আনন্দ ভোগ করতে দেওয়া হবে অতি সামান্যই (আহযাব ১৬)।

আমি সুখে থাকি, সাচ্ছন্দ্যে থাকি, মৃত্যু তার সময়মত হানা দেবেই। রোগ-বালাই নেই। অসুখবিসুখ নেই। বিপদাপদ নেই। নিজেকে নিরাপদ ভাবারও কোনও কারণ নেই। মৃত্যু আসবেই।

২৪. আমি যতই মৃত্যুকে এড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, বিপদসংকুল পথ এড়িয়ে চলি, মৃত্যু না আসার নানা বন্দোবস্ত করি, উপায় নেই। মৃত্যুর তিরে আমাকে একদিন ঘায়েল হতেই হবে,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে (কাফ ১৯)।

মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই। মৃত্যু থেকে সরে থাকার সুযোগ নেই। মৃত্যুকে পাশ কাটানো সম্ভব নয়। একদিন আমাকে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে অবিনশ্বর আখিরাতে স্থানান্তর হতেই হবে।

২৫. আমি কোথায় কখন মৃত্যুবরণ করব সেটা নির্ধারিত আছে। আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুস্থলের দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে অগ্রসর হচ্ছি। আমি জানি না কোথায় মৃত্যু ঘাপটি মেরে আছে। কখন মৃত্যু আচম্বিতে ছোবল হানবে, তাও আগাম জানি না। আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি, সময়মতো আমি ঠিক জায়গাতে পৌঁছে যাবোই,

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

বলে দিন, তোমরা যদি নিজগৃহেও থাকতে, তবুও কতল হওয়া যাদের নিয়তিতে লেখা আছে, তারা নিজেরাই বের হয়ে নিজ-নিজ বধ্যভূমিতে পৌঁছে যেত (আলে ইমরান ১৫৪)।

২৬. অনেকেই পথচলতে দুর্ঘটনা দেখি, দীর্ঘদিন হাসপাতালে চাকুরি করি, কিন্তু মনটা এমন হয়ে যায়, ঘুণাক্ষরেও কল্পনায় আসে না, আমিও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে পারি, আমিও মারা যেতে পারি। আমার সময় এখনো আসে নি বলেই বেঁচে আছি। সময় হলে এক লহমাও শ্বাস নিতে পারব না,

وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকালও পেছনে যেতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না (নাহল ৬১)।

২৭. টাকা-পয়সা হলেই ধনী লোকেরা কী বড় বড় প্রাসাদ বানায়। মনে হয় যেন তারা চিরকাল দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। এটাই তাদের স্থায়ী আবাস। অনেকে প্রাসাদসুখে মৃত্যুর কথাও সাময়িকভাবে ভুলে যায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় কি? হানাদার মৃত্যু কাউকে ছাড়ে না,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনও দুর্গেই থাক না কেন (নিসা ৭৮)।

২৮. মৃত্যুভয়ের কারণেই একদল লোক জিহাদে যেতে ভয় পায়। তারা মনে করে জিহাদে গেলেই মরতে হবে। তারা ভুলে যায়, মৃত্যু এক নির্ধারিত তাকদির। তার নির্দিষ্ট সময় আছে। তারপরও তারা বলে,

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরজ করলেন? অল্প কালের জন্যে আমাদেরকে অবকাশ দিলেন না কেন? (নিসা ৭৭)।

২৯. যুদ্ধে গেলেই যদি সবাই মারা যেত, তাহলে পৃথিবীতে কোনও সৈনিক বেঁচে থাকত না। প্রচণ্ড বিমান হামলার মুখেও কেউ হতাহত হয় নি, এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। সারা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েও শেষ জীবন ঘরের বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এমন ঘটনাও কম নয়। এর বিপরীতে দিব্যি পুরোপুরি সুস্থ মানুষ, কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই আচানক মরে গেছে, এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। এত এত ঘটনা সামনে থাকার পরও যখন কিছু (মুনাফিক) শোনে, অমুকে জিহাদে গিয়ে মারা গেছে, তখন তাদের ভাবনায় আসে, তারা জিহাদে না যাওয়ার কারণেই বেঁচে থাকার নিয়ামত লাভ করতে পেরেছে,

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে। তারপর (জিহাদকালে) তোমাদের কোনও মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না (নিসা ৭২)।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা বলা হয়েছে আয়াতে। সে ও তার মতো অন্যরা মনে করত, জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকাটা আল্লাহর নিয়ামত ছিল।

৩০. আবদুল করিমের জানাযার পর, আমি কিছুক্ষণ বসে বসে জীবনের খতিয়ান নিয়েছিলাম। পেছন ফিরে দেখছিলাম ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে কারা আছে, কারা নেই। পরিচিতজনদের মধ্যে কারা চলে গেছেন। ভাবনার জানলা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার সাথে প্রাথমিকে পড়েছে এমন কিছু বন্ধু আজ আর বেঁচে নেই। আমার সাথে মাধ্যমিকে ছিল, এমন কিছু বন্ধুও আর নেই। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়া কিছু বন্ধুর কথাও দীর্ঘদিন ধরে আর শুনি না। অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ের কিছু বন্ধুও নেই। ছেলেবেলার অনেক পড়শিও চলে গেছেন। শিক্ষকদেরও অনেকে চলে গেছেন। অনেক বড় বড় শায়খের কাছে পড়াশোনা করেছি, তাদের কেউ কেউ আর নেই। যাদের মেহনতে দ্বীন পেয়েছি, সেই সালাফেরও কেউ নেই। সাহাবায়ে কেরাম নেই। এমনকিও নবীজি সা.-ও নেই। সবাই মাটির নিচে চলে গেছেন। পৃথিবীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত একজনও বেঁচে থাকতে পারে নি।

৩১. মানুষ কোনও কারণে যখন সত্যি সত্যি মৃত্যুচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সে অবাক হয়ে দেখতে পায়, তার চিন্তা ও কর্মে ব্যাপক তফাত। প্রতিটি মানুষই মনের গভীরে বিশ্বাস করে, সে একদিন মারা যাবে। মৃত্যু যে-কোনও দিন, যে-কোনও স্থানেই হতে পারে। এটা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই জানে। তারপরও গাফেল থাকে,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের জন্যে তাদের হিশেবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় বিমুখ হয়ে আছে (আম্বিয়া ১)।

৩২. মানুষ মৃত্যুকে ভুলে থাকে। হঠাৎ করে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলে, অধিকাংশ মানুষের প্রবৃত্তিই এমন, ইশ! আর কটা দিন যদি বাঁচতে পারতাম। কুরআন কারিমে তিন প্রকারের অন্তিম চিত্র তুলে ধরেছে,

<u>প্রথম চিত্র</u>: মৃত্যু উপস্থিত হলে একদল লোক আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে ফিরে আসার বায়না ধরে। একবার সুযোগ দিলে, তারা নেকআমল করবে। হায়, অসম্ভব তাদের আশা! সময় যে পেরিয়ে গেছে,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ওয়াফস পাঠিয়ে দিন। যাতে আমি যা (অর্থাৎ যে

দুনিয়া) ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে সৎকাজ করতে পারি। কখনও না। এটা একটা কথার কথা, যা সে মুখে বলেছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে রয়েছে 'বরযখ', যা তাদেরকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে (মুমিনুন ৯৯-১০০)।

আমার সামনে এখনই সুযোগ। আমল যা করার এখনই করে নিতে হবে। পরে আর সুযোগ নাও মিলতে পারে। এই নামাজই আমার শেষ নামাজ হতে পারে। মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেলে, যতই কাকুতি-মিনতি করি, কোনও কাজে আসবে না।

৩৩. দ্বিতীয় চিত্রঃ আরেকদল মৃত্যু উপস্থিত হলে, সামান্য একটু সময় চাইবে। দান-সাদাকা করার জন্যে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব! সময় পেরিয়ে গেছে যে!

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) ব্যয় কর, এর আগে যে, তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে কিছু কালের জন্যে সুযোগ দিলেন না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত (মুনাফিকুন ১০-১১)।

আমি এখন যত ইচ্ছা, দান-সাদাকা করতে পারি। মন উজাড় করে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। অন্তিমকাল চলে এলে, আর সুযোগ মিলবে না।

৩৪. তৃতীয় চিত্রঃ সারা জীবন পাপ করে বেড়িয়েছে। নাফরমানি করেছে। জুলুম করেছে। হঠাৎ করে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে, সে তাওবার ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু তাওবা-ইস্তেগফারের সময় যে পেরিয়ে গেছে!

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তাওবা কবুল তাদের প্রাপ্য নয়, যারা অপকর্ম করতে থাকে, পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। এবং তাদের জন্যেও নয়, যারা কাফির অবস্থায়ই মারা যায়। এরূপ লোকদের জন্যে তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি (নিসা ১৮)।

আমি কি নিশ্চিতভাবে জানি, কখন আমার অন্তিম মুহূর্ত? আমি এখনই তাওবা-ইস্তেগফার করে ফেলছি না কেন?

৩৫. মৃত্যুপথযাত্রীর মনের কথা আমরা পড়তে পারি না। তাদের চিন্তা আমরা ধরতে পারি না। আল্লাহ তাআলা তাদের মনের কথা ও চিন্তা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। তারপরও আয়াতগুলো পড়ার সময়, কারো কারো ভাবনায় আসে, আমি বোধহয় আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি নই। আমার বেলায় এমনটা হবে না। আমি আগেই তাওবা করে ফেলব। আমি আগেই দান-সাদাকা করে ফেলব। আমি আগেই নেক আমল করে রাখব। শয়তান ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদেরকে সত্যবিমুখ করে রাখে।

৩৬. তিনটি চিত্রেই আমি নিজেকে একটু কল্পনা করে দেখি না। আমার অবস্থাও যে তিন চিত্রের সবটা বা কোনও একটা হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? মনে রাখবো, তখন আমার সমস্ত আশা-তামান্নাই প্রত্যাখ্যাত হবে।

৩৭. শয়তান আমাদের দৃষ্টির সামনে গাফলতের চাদর ঝুলিয়ে রাখে। সে চাদরে দুনিয়ার চাকচিক্য ঝিকিমিকি করতে থাকে। আড়ালে পড়ে যায় আখিরাতের ভয়ংকর দৃশ্য। প্রকৃত হাকিকত।

৩৮. আমরা দুনিয়াতে অনবরত ঘোড়দৌড়ের মাঠে আছি। রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়ে চলেছি। কেউ পড়ালেখা শেষ করার দৌড়ে। কেউ চাকুরির দৌড়ে। কেউ বাড়ি-গাড়ির দৌড়ে। কেউ যশ-খ্যাতির দৌড়ে। কেউ পদ-মদের দৌড়ে। সবাই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। আরও চাই, আরও চাইয়ে ব্যস্ত,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

(পার্থিব ভোগসামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে (তাকাসুর ১)।

আয়াত বলছে, দুনিয়ার দৌড় কবর পর্যন্ত জারি থাকবে। এক পা কবরে গেলে, সংবিৎ ফিরে পেয়ে লাভ হবে না। লাগাম আগেই টেনে ধরতে হবে। রাশ শক্ত হাতে ধরে রাখতে হবে। বলগা যেন কিছুতেই আলগা না হয়।

৩৯. শয়তান সারাক্ষণই ওত পেতে আছে। কীভাবে আমাদেরকে দুনিয়ার বাজারে আধিক্যের প্রতিযোগিতায় নামাবে, তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের উপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম (হাদীদ ২০)।

৪০. দুনিয়া হলো বর্তমান। আখিরাত হলো ভবিষ্যৎ। আমি তুচ্ছ বর্তমানের মোহে পড়ে অনন্ত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নষ্ট করছি। বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্যে

ফলদার করে তুলছি না। আমি যদি কুরআনের নির্দেশ মেনে, বর্তমানের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, সত্যিকারের জীবন 'আখিরাতের' প্রস্তুতির জন্যে নিজের মনকে তৈরি করতে পারি, তাহলে বর্তমান জীবনের অনেক রঙ বদলে যাবে। অনেক কিছু তুচ্ছ হয়ে যাবে। এজন্য আমাকে প্রথমে বাঁচতে হবে 'আধিক্যের প্রতিযোগিতার' চক্কর থেকে।

৪১. আমার সামনে সব সময় পরিষ্কার থাকতে হবে,

ক. দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ। এখানকার সব কাজ হবে, আখিরাতের জন্যে। আখিরাতে সুখে থাকার জন্যে।

খ. আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায়, দুনিয়ার অবস্থানের মেয়াদকাল খুবই তুচ্ছ। কিন্তু এই তুচ্ছ সময়কে কাজে লাগিয়ে আমি অনন্ত জীবনে সুখে থাকাটা নিশ্চিত করতে পারি।

৪২. একলোককে বলা হলো, তুমি এই দেশে পাঁচ বছর থাকতে পারবে। তারপর তোমাকে অমুক দেশে আমৃত্যু থাকতে হবে। আর সেখানে থাকার জন্যে যা যা করা দরকার, এই পাঁচ বছরেই করে রাখতে হবে। লোকটা কী করবে? প্রথম দেশে দিনরাত খেটে, উদায়াস্ত পরিশ্রম করে, আধপেটা খেয়ে, পরের দেশের জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকবে। সমস্ত অর্জিত সম্পদ দ্বিতীয় দেশের জন্যে সঞ্চিত করে রাখবে।

৪৩. দুনিয়ার যদি এই অবস্থা হয়, আখিরাতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করি কেন? আমরা কেন উল্টো কাজ করি? অনন্তজীবনকে ভুলে পাঁচ বছরের জীবনকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকি? কোন নেশা আমাদের বিভোর করে রাখে? কীসের আশায় আমি মদচুরচুর হয়ে আছি?

৪৪. আখিরাতে আমি জান্নাত লাভ করলে, কত কত সুখশান্তি, নায-নেয়ামতে ডুবে থাকতে পারব? দুনিয়াতে বসে আমি তা কল্পনাও করতে পারবো না। তারপরও দুনিয়ার তুচ্ছ সুখের মোহজালে জড়িয়ে পড়ি।

৪৫. আধুনিক চিন্তার কিতাবগুলো হাতে নিলে ভীষণ অবাক হতে হয়। আধুনিক চিন্তা ও চিন্তাবিদরা মানুষকে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে না। আখিরাত-পরকাল বিষয়ে সতর্ক করে না। আধুনিক চিন্তা ও চিন্তাবিদেরা বর্তমানকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। ইহাকালকেই সবার চোখের সামনে ধরে রাখে। এর আগে বা পরের সময় নিয়ে তারা ভাবতে চায় না বলেই চলে। এরই প্রভাবে পুরো বিশ্ব আজ বেঘোর হয়ে আছে।

৪৬. এক যুবক আমাকে অভিযোগের সুরে বলেছিল,

'আধুনিক চিন্তাগুলো সভ্যতার বিনির্মাণের জন্যে ভীষণভাবে সহায়ক। আপনাদের কথমতো যদি কুরআনি চিন্তা গ্রহণ করি। সে চিন্তার ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলি, তাহলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। বর্তমান সভ্যতার যত উন্নতি অগ্রগতি সব থেমে যাবে। শিল্প-কারখানায় তালা লেগে যাবে'।

'তুমি কুরআনি চিন্তাকে ধরতে পারো নি। আল্লাহর কালামকে ভালো করে পড়লে, তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখলে, তোমার মধ্যে এই ভুল চিন্তা গজিয়ে উঠতে পারত না। মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাতের স্মরণ একজন মুমিনকে আরও বেশি কর্মতৎপর করে তোলে। তাকে উপকারী আর ফলপ্রসূ কর্মে জড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের প্রধান ইবাদত কী? সালাত। সালাত আদায় করা সহজ? কারো কাছে সহজ, কারো কাছে কঠিন। সালাত সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে, মৃত্যুর দৃঢ়বিশ্বাস আর আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে সবল আকিদা না রাখলে, সালাত আদায় করা সহজ হয় না'।

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশু' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে। যারা এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে (বাকারা ৪৫-৪৬)।

আয়াত আমাদের কী বলছে? আল্লাহর প্রতি ইয়াকিন থাকলে সালাত সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা সজাগ থাকলে, সালাত আসান হয়ে যায়।

৪৭. সঠিক মৃত্যুচিন্তা, আখিরাত সম্পর্কে আন্তরিক ভাবনা, আল্লাহর সাক্ষাতের পিপাসা মানুষের পার্থিব কর্মশক্তি বাড়িয়ে দেয়। কুরআনই তা বলছে,

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অতঃপর তালূত যখন সৈন্যদের সাথে রওনা হলো, তখন সে (সৈন্যদেরকে) বলল, আল্লাহ একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার লোক নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না, সে আমার লোক। অবশ্য কেউ নিজ হাত দ্বারা এক আঁজলা ভরে নিলে কোনও দোষ নেই।

তারপর (এই ঘটল যে,) তাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে নদী থেকে (প্রচুর) পানি পান করল। সুতরাং যখন সে (তালূত) এবং তার সঙ্গের মুমিনগণ নদীর ওপারে পৌঁছল, তখন তারা (যারা তালূতের আদেশ মানে নি) বলতে লাগল, আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোনও শক্তি আমাদের নেই। (কিন্তু) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে, তারা বলল, এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয় (বাকারা ২৪৯)।

যুদ্ধের ময়দানের জীবনমরণ লড়াইয়ে কারা অবিচলভাবে টিকে ছিল? যাদের কলবে মৃত্যুর স্মরণ ও স্বরূপ ভালোভাবে জাগরূক ছিল। আখিরাতের হাকিকত হাজির-নাজির ছিল।

৪৮. পাশ্চাত্য চিন্তার ধ্বজাধারীরা মৃত্যুচিন্তাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে। তারা মনে করে মৃত্যুচিন্তা জীবন থেকে পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যতক্ষণ বেঁচে আছ, জীবনকে উপভোগ করে নাও। মৃত্যুচিন্তা, সে তো বুড়োবুড়িদের কাজ। বেঁচে থাকতেই মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। জীবনসাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে কবরে পা দিয়ে বসে থাকব কেন? কুরআন বলছে ভিন্ন কথা,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায় নি (আহযাব ২৩)।

প্রকৃত মুমিনগণই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এবং তাতে অবিচল থাকে। নড়চড় করে না।

৪৯. মৃত্যুচিন্তায় ঈমান বৃদ্ধি পায়। চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। কুরআন আমাদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে,

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

তারা কি লক্ষ করে নি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বে এবং আল্লাহ যে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় কাছেই এসে পড়েছে? (আ'রাফ ১৮৫)।

এই আয়াতে ঈমান বৃদ্ধির জন্যে, নবীজি সা.-এর প্রতি আস্থা তৈরির জন্যে, মৃত্যু যে নিকটবর্তী, সেটা নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে। গাফলত দূর করতে বলা হয়েছে। গাফলত দূর করার জন্যে মৃত্যুচিন্তাকে সামনে আনা হয়েছে,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের জন্যে তাদের হিশেবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় বিমুখ হয়ে আছে (আম্বিয়া ১)।

৫০. মৃত্যুচিন্তায় ভীত থাকা, সালাফের স্বীকৃত আমল। নবীজি সা. বারবার এ-বিষয়ে তাকিদ দিয়ে গেছেন। মক্কা ও মদীনার আবহাওয়ায় কিঞ্চিত তফাত ছিল সেকালে। মুহাজিরগণ হিজরত করে মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। তখনকার একটি ঘটনা বুখারিতে এসেছে,

لمّا قدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ المدينةَ وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ، فكانَ أبو بكرٍ إذا أخَذَتْهُ الحمّى يقولُ: كلُّ امرئٍ مُصَبَّحٌ في أهْلِهِ والموت أدنى من شراك نعله .

আল্লাহর রাসুল যখন মদীনায় এলেন, আবু বকর ও বিলাল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আবু বকর রা.-এর জ্বর হওয়ার পর তিনি আবৃত্তি করলেন, প্রতিটি মানুষই পরিবার-পরিজনের সাথে বাস করছে। অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও সন্নিকটে (আয়েশা রা., বুখারি)।

৫১. আল্লাহর কালাম বলছে,

ক. মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা, কর্মপ্রেরণা বাড়িয়ে দেয়।

খ. মুমিনের কুউয়াত ও সবরশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

গ. কুরআনের সাথে পাশ্চাত্যচিন্তা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মৃত্যুর স্মরণ জীবনের অনেক অস্পষ্টতা দূর করে দেয়।

ঘ. জীবন চলার পথ বহু কুহেলিকা আর ধোঁয়াশা দূর করে।

ঙ. বক্রপথ থেকে সরে এসে, সিরাতে মুস্তাকিমে উঠে আসার প্রেরণা জোগায়।

চ. মৃত্যুর স্মরণ মুমিনকে যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।

৫২. মৃত্যুর স্মরণ প্রতিটি কাজের আগে মুমিনের সামনে প্রশ্ন রাখে, এই কাজ আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাবে নাকি দূরে? এই কাজ আখিরাতে কাজে লাগবে নাকি ক্ষতি করবে? একজন মুমিন সব সময় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই থাকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নের ধারা বহমান থাকে,

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

বলবে, আমরা পূর্বে আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) বড় ভয়ের ভেতর ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের রক্ষা করেছেন উত্তপ্ত বায়ুর শাস্তি থেকে (তূর ২৭)।

৫৩. মৃত্যুর স্মরণ

১. মুমিনের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। অর্থবহ করে তোলে।

২. অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করা থেকে হেফাজত করে।

৩. শুধু শুধু গল্প-গুজব, নিছক হাসি-ঠাট্টা থেকে দূরে রাখে।

৪. সৎসঙ্গে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। দুষ্টসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলে।

৫. অনলাইনে, ঘোরাঘুরিতে, মোবাইলে, ল্যাপটপে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় নষ্ট করতে বাধা দেয়।

৬. মৃত্যুর স্মরণ মুমিনকে সব সময় আল্লাহর জিকিরে-ফিকিরে ডুবিয়ে রাখে। তাসবিহ-তাহলীলে নিমগ্ন রাখে। হামদ-সানায় বিভোর করে রাখে। এমন মুমিন আয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে যান,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(জ্ঞানী কারা?) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (আলে ইমরান ১৯১)।

৭. মৃত্যুর স্মরণে সন্ত্রস্ত মুমিন কুরআন পড়তে গিয়ে দেখে, সালাত পুরোটাই জিকির, তারপরও সালাতের পর সারাক্ষণ জিকির জারি রাখতে বলেছেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

যখন তোমরা সালাত আদায় করে ফেলবে, তখন আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করতে থাকবে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শোয়া অবস্থায়ও (নিসা ১০৩)।

৫৪. আমার সব সময় মনে রাখা উচিত,

ক. যে সময়টুকু আমার হাত ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছে, যে দিনগুলো আমার জীবন গলে চুইয়ে যাচ্ছে, যে মাসগুলো আমার হায়াত থেকে গলে যাচ্ছে, সেগুলো আর আসবে না।

খ. আজকে যে ফজর পড়লাম, সেটা আমার জীবনের শেষ ফজরও হতে পারে। এখন যে খাবারটুকু গ্রহণ করে উদরপূর্তি করলাম, সেটা আমার শেষ ভোজনও হতে পারে।

৫৫. যা চলে গেছে, সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করে কোনও লাভ হবে না। সামনের দিনগুলোতে আয়াতটা সামনে রাখতে পারি,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর উত্তম যা-কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না। যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়, আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্যে আফসোস! প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান নিয়ে) ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম (যুমার ৫৫-৫৬)।

৫৬. আমি চাইলে, মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে,

১. সময়গুলো আখিরাতের রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারি।

২. দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করে তুলতে। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কি আছে?

৩. জীবনটাকে ইলম ও আমলে পূর্ণ করে তুলতে পারি।

৪. সময়গুলোকে পরোপকার আর মুসলিম উম্মাহর হিতে ব্যয় করতে পারি।

নিফাকের আজাব

১. কোন সমাজ বেশি উত্তম, আমাদের সমাজ নাকি নবীযুগের সমাজ? বেখাপ্পা শোনালেও প্রশ্নটা করার যৌক্তিক কারণ আছে। লেখার শেষ পর্যায়ে গেলে, প্রশ্নটার যৌক্তিকতা বোঝা যাবে।

২. এক ইসলামি চিন্তাবিদ, পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখেন। লেখায় নতুন ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কোনও প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে, একটু পরপরই বলেন,

'অবশ্যই পরিপূর্ণ শরিয়াহর অনুশাসন মেনে'

তিনি বিরক্তিহীন ও বিরতিহীনভাবে বাক্যটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তার ভক্ত পাঠক-শ্রোতা তার এমন শরীয়তপ্রেমে রীতিমতো বিমুগ্ধ। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে ভিন্ন সুর বের হয়ে আসে। একান্ত ঘরোয়া আড্ডায়, তিনি সম্পূর্ণ উল্টোগীত গান। কেউ শরিয়াহশাসন বা খিলাফাহর কথা উঠলেই তিনি খেঁকিয়ে উঠে বলেন,

'থামো থামো, বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া জীবন এক পা আগে বাড়াও অসম্ভব। দ্বীন বা শরিয়ত, সেটা ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্মপালন, ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা, যার যার ব্যক্তিগত অভিরুচি। পাশ্চাত্যঘেঁষা আধুনিক সমাজ এত অগ্রসর কেন? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর মূল কারণ। দ্বীনধর্ম পালন করাটা চমৎকার 'আচরণ'। কিন্তু সেটা হতে হবে ব্যক্তির গণ্ডিতে। রাষ্ট্রের ব্যাপ্তিতে নয়'।

৩. তার প্রকাশ্য লেখালিখি ও বক্তব্যের সাথে ঘরোয়া আড্ডার এহেন বৈপরীত্য দেখে কেউ কেউ উসখুশ করে বলে ওঠে,

'আপনার লেখা ও চিন্তার মিল নেই যে'?

'মিল নেই, এটা কেমন কথা, অবশ্যই মিল আছে। আমি প্রকাশ্যে ধর্ম ও শরিয়তের কথা লিখছি। এটাও আমার চিন্তার স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। এই মুক্তপ্রকাশ ধর্মনিরপেক্ষতার দান। কট্টর শরিয়াহশাসনে আমি এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে পারতাম? আমি খিলাফাহশাসনাধীন সমাজে, মুক্তকণ্ঠে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের জয়গান গাইতে পারতাম? আমার টুঁটি চেপে ধরা হতো না? আমার কণ্ঠরোধ করা হতো না? এ থেকে কী প্রমাণ হয়? চিন্তার বিকাশে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কোনও বিকল্প নেই। আর ব্যক্তির নৈতিকতা বিকাশে ধর্মকর্ম পালনের কোনও বিকল্প নেই।

৪. এই চিন্তাবিদের কথা শুনে চমৎকৃত হওয়ার মতো মানুষের অভাব হবে না। এই যে প্রকাশ্যে ধার্মিক, চিন্তায় অধার্মিক বা ধর্মনিরপেক্ষ, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কজনই-বা সচেতন? এমন মানুষ আজকালের সমাজে হাতেগোনা না ভুরিভুরি? এটা কি ফিকরি নিফাক নয়? মানুষটা চিন্তায় মুনাফিক নয়? তার চিন্তা কি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

৫. যদি তার চিন্তা ও বক্তব্যের বৈপরীত্যকে 'নিফাক' বলে আখ্যায়িত করি, তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুনাফিক বলি, আরেকদল চোখ কপালে তুলে অভিযোগ হানবে,

'তিনি 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। রমযানে নিষ্ঠার সাথে রোজা রাখেন। পরম যত্নে হিশেব কষে যাকাত আদায় করেন। এমন মানুষকে মুনাফিক বলা চরম ধৃষ্টতা নয়'?

৬. প্রশ্নটা যে কাউকেই ভাবিয়ে তুলবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আসলেই, সালাত-সিয়াম পালন করার পরও একজন মানুষ মুনাফিক হতে যাবে কোন দুঃখে?

৭. আমরা কুরআন কারিমের কাছে গেলেই এর সমাধান পাবো। কুরআন কীভাবে মুনাফিকদের চিত্র এঁকেছে, তাদের চরিত্রকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, কীভাবে মুনাফিকদের অন্তর্জগতের স্বরূপ তুলে ধরেছে, মুনাফিকরা কীভাবে সেকালের মুসলিম সমাজে বসবাস করত, মুনাফিক সম্পর্কিত আয়াতগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেই উত্তর বেরিয়ে আসবে।

৮. কুরআন কারিমই বলছে, মুনাফিক সালাত আদায় করে। সাদাকা দেয়। আল্লাহর জিকিরও করে,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে (নিসা ১৪২)।

সালাত আদায়কারিম জিকিরকারী, তবুও তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৯. মুনাফিকরাও সালাত আদায় করে। তবে অলসতার সাথে,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

এবং তারা সালাতে আসলে গড়িমসি করেই আসে এবং (কোনও সৎকাজে অর্থ) ব্যয় করলে তা করে অসন্তোষের সাথে (তাওবা ৫৪)।

১০. মুনাফিকরা সাদাকা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়,

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ

বলে দিন, তোমরা (নিজেদের সম্পদ থেকে) খুশি মনে চাঁদা দাও অথবা অসন্তোষের সাথে, তোমাদের পক্ষে তা কিছুতেই কবুল করা হবে না। নিশ্চয় তোমরা ক্রমাগত অবাধ্যতাকারী সম্প্রদায় (তাওবা ৫৩)।

১১. মুনাফিকের সালাত সম্পর্কে নবীজি সা. বলেছেন,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

মুনাফিকের সালাত হলো, সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। (সালাতকে পেছাতে পেছাতে) যখন সূর্য ডুবি ডুবি করে, তখন (তড়াক করে ওঠে) পাখির মতো চারবার (দুমদাম রুকু সিজদা করে) ঠোকর মারে, বেশি কিছু না পড়েই। (আনাস বিন মালিক রা. । মুসলিম ৬২২)।

১২. গা শিউরানো হাদিস। সময়মতো আদায় না করে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা সালাতকে নবীজি সরাসরি মুনাফিকের সালাত (صَلَاةُ الْمُنَافِقِ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরা তো তাও বা শেষ সময়ে হলেও সালাত আদায় করে। যারা শেষ সময়েও সালাত আদায় করে না, পুরোপুরি ছেড়ে দেয়, তাদের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?

১৩. সময়মতো সালাত আদায় না করা মুনাফিকের আলামত। সালাতে অবহেলা ঔদাসীন্য দেখানোও মুনাফিকের আলামত। বাহ্যিক অবস্থার বিচারে এদেরকে

কেউ মুনাফিক বলবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সরাসরি মুনাফিক বলে দিয়েছেন। কেন? আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতেন, তাই। সাধারণ অবস্থায়, শরিয়তের সিদ্ধান্তে, সালাতে অবহেলাকারীকে মুনাফিক বলা হবে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুনাফিক বলেছেন। তার মানে, ওই লোকদের মধ্যে সঙ্গোপনে আরও কিছু বিষয় ছিল, যা সত্যিকারের 'নিফাক'। যার কারণে তারা মুনাফিক আখ্যা পেয়েছে।

১৪. আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মারাত্মক অপরাধ। যারা এমন করবে, তাদের সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফুর্তি করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে ফুর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান জাহির করার পর কুফরিতে লিপ্ত হয়েছ (তাওবা ৬৫-৬৬)।

লোকগুলো ভেবেছিল, এ আর এমন কি, সামান হাস্য-ফুর্তিই তো। তাদের কল্পনাতেও হয়তো ছিল না, তাদের আচরণটা কুরআনের মানদণ্ডে কুফরির স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

১৫. সমস্যার শুরুই হয় এখান থেকে। আমাদের বিবেচনায় কিছু বিষয় 'হালকা' সাধারণ, কিন্তু কুরআনের বিবেচনায় সেটা হয়ে যায় গুরুতর। আমাদের অনেক কাজ অজান্তেই কুফর ও নিফাকাক্রান্ত হয়ে যায়।

১৬. আমি আগে মনে করতাম, যারা সত্যিকারের মুনাফিক, তারা নিজে মুনাফিক হওয়ার ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিবহাল। পরে ভুলটা ভেঙেছে। অনেক মুনাফিক আছে, নিজের নিফাকির সম্পর্কে বেখবর।

১৭. আগে মনে করতাম, মুনাফিক হওয়া নিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা করে, পরিকল্পনা করেই মুনাফিক হতে হয়। বাইরে ইসলাম, ভেতরে নিফাক। পরে ভুল ভেঙেছে। নিফাক সব সময় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়, অজান্তেই অনেকে মুনাফিক হয়ে যায়।

১৮. আগে মনে করতাম, নিফাক তৈরি হয়, গভীর গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে। একদল লোক সচেতনভাবে পরিকল্পনা করে, অন্যাকে মুনাফিক বানানোর প্রকল্প নিয়ে মাঠে নামে। পরে ভুল ভেঙেছে। আমরা অত্যন্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখি, এমন অনেক কথা বা কাজও আমাদের কলবে নিফাক সৃষ্টি করে রাখে।

১৯. আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তিনি অনুগ্রহ করে সম্পদশালী করলে, মুক্তহস্তে দান করব। আল্লাহ তাআলা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমাকে সম্পদশালী করেছেন। সম্পদ হাতে পেয়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে। হাতের ফাঁক গলে একটা পয়সাও বের হচ্ছে না। আমি টেরও পাই নি, এই কৃপণ স্বভাবই আমার অন্তরে নিফাকির বীজ বুনেছে। কখনো কল্পনা করেছি বিষয়টা? কুরআন কারিম এমনটাই বলে,

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই সাদাকা করব এবং নিঃসন্দেহে আমরা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সুতরাং আল্লাহ শাস্তি হিশেবে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল, তা রক্ষা করল না এবং তারা মিথ্যা বলত (তাওবা ৭৫-৭৭)।

২০. অবাক লাগে না, তারা মুমিন ছিল। আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখত। সাধারণ বিশ্বাস নয়, গভীর বিশ্বাস। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলও ছিল। আস্থাটা কোন পর্যায়ের হলে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করতে পারে যে, তারা অর্থশালী হলে সাদাকা করবে? তাদের অপরাধ কী ছিল? আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদামাফিক দান করে নি। কৃপণতা করেছে। আমাদের চিন্তা কি বলে, আমরা এমন মানুষকে চট করে মুনাফিক বলব? কুরআন কারিম কিন্তু এদেরকে মুনাফিকের কাতারে শামিল করেছে।

২১. আমরা মনে করি পাপ করার পর সাথে সাথে আযাব আসে না। এটা ভুল ধারণা। এই যে লোকগুলো দান করতে অস্বীকার করার সাথে সাথেই আজাব এসে গেছে। কী আজাব?

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

আল্লাহ শাস্তি হিশেবে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন।

শাস্তিটা এক-দুদিনের জন্যে নয়, কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ভয়াবহ এক শাস্তি।

২২. আমিও তো অহরহ জেনেশুনে কতশত পাপ করেই চলেছি। আমার জানা আছে, গুনাহটা বেশ গুরুতর। কাজটাকে কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম বলা হয়েছে। তারপরও করছি। এ-কারণে আমার মধ্যেও যে নিফাক সৃষ্টি হয়ে

যাচ্ছে না, তার নিশ্চয়তা আছে? আমি কীসের ভরসায় জেনেশুনে গুনাহ করে চলেছি?

পাপের কারণে (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম না তো?

২৩. কুরআন কারিমে কুফর ও কাফিরের স্বরূপ সম্পর্কে শত শত আয়াত পড়ছি, পাশাপাশি কাফিরের সাথে অহেতুক দহরম মহরম চালিয়ে যাচ্ছি? কাফিরের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তোষামোদ খোশামোদ করছি? ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, এটা জেনেও সর্বধর্মের সাম্যের পক্ষে কথা বলছি?

আমি (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম না তো?

২৪. নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে আয়াত পড়ছি, দৃষ্টি অবনত রাখার আয়াত পড়ছি, বেগানার সাথে অবৈধ সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকার আয়াত পড়ছি, হারাম-অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ সংবলিত আয়াত পড়ছি, পাশাপাশি হারাম অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি, অবাধে দৃষ্টি মেলে হারামের দিকে তাকাচ্ছি। মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারাম বাতচিত করছি? আমি কীভাবে নিজেকে এতটা নিরাপদ ভাবছি?

আমি (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম না তো?

২৫. সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন কারিমের আয়াতসমূহ পড়ছি। তারা পরিপূর্ণ হিদায়াতের উপর ছিলেন, এটা আয়াতের মাধ্যমে জানছি। তারপরও ঔদ্ধত্যের সাথে বলছি (تَجْرِبَةُ السَّلَفِ لا تَلْزَمُنَا) সালাফের তাজরেবা (অভিজ্ঞতাপ্রসূত দ্বীনি সিদ্ধান্ত) মান্য করা আমাদের জন্যে আবশ্যক নয়। কুরআনের আয়াতের এভাবে সরাসরি বিরোধিতা করতে, আমাদের একটুও বুক কাঁপে না?

আমি (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম না তো?

২৬. আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ লাগলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ফিরে আসতে। সমাধানের জন্যে আল্লাহর কালামের কাছে ধর্না দিতে। আমি করছি এর বিপরীতটা। কুরআনকে উপেক্ষা করছি। আমাকে যখন বলা হয়, আল্লাহ এমনটা বলেছেন, আল্লাহর রাসুল এমনটা বলেছেন, তখন আমি প্রত্যুত্তরে বলেছি,

'এর অর্থ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে'।

আমি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্যে, কুরআন ও সুন্নাহকে পেছনে ঠেলে দিলাম। আমি (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম না তো?

২৭. কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, নেককারদের সাথে মুআলাত (বন্ধুত্ব) করতে, গোমরাহ বিভ্রান্তদের এড়িয়ে চলতে। কিন্তু আমি সকাল-সন্ধ্যা গোমরাহ বিভ্রান্তদের সাথেই ওঠাবসা করছি। সবার সাথে বুলি আওড়াচ্ছি—এক দেশ, এক জাতি। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। মূর্তিপূজার মণ্ডপে যাচ্ছি, বুদ্ধপূর্ণিমাও বাদ পড়ছে না। বড়দিনের শুভেচ্ছা কখনোই বাদ যেতে পারে না। আমার বন্ধু-বান্ধবের কেউই নামাজি নয়। এসব নিয়ে আমার মধ্যে কোনও বিকার নেই।

আমি (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছি না তো?

২৮. বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে আবি মুলাইকা রহ.। বুখারিতে তাঁর একটা উক্তি নকল করা হয়েছে,

أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه

আমি ত্রিশজন সাহাবির দেখা পেয়েছি। তারা সবাই নিজের মধ্যে নিফাক থাকার ব্যাপারে আশঙ্কা করতেন।

২৯. প্রতিবারই বুখারির বর্ণনাটা পড়ার সময় আমি মনে করতাম, সাহাবায়ে কেরাম তাকওয়াবশত 'নিফাকের' ভয় করতেন। এটা ছিল তাদের মুসতাহাব সতর্কতা। কিন্তু আয়াতটা সামনে আসার পর, ভুল ভেঙেছে। লোকটা আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়েছে, ঈমান-সালাত-সিয়াম-যাকাত সত্ত্বেও তাকে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তার কলবে নিফাকি বসিয়ে দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম আয়াতটি নাজিল হওয়ার ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে অবলোকন করেছেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মের প্রতিক্রিয়ার মানুষের কলবে নিফাক সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ সময় নিফাকপূর্ণ কলবের অধিকারী নিজেও জানে না, তার কলবে নিফাক আছে। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন, নিফাক কোনও সিদ্ধান্তগত বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক যে-কোনও কথা-কাজ ও চিন্তার ফলে কলবে নিফাকের বীজ সৃষ্টি হতে পারে। তারা জানতেন, নিফাক শুধু সচেতন ইচ্ছা থেকেই তৈরি হয় না। অগোচরেও কলবে নিফাক সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

৩০. কুরআন কারিম বলছে, সালাত-সিয়াম, অল্পস্বল্প জিকিরও নিফাক থেকে বাঁচাতে পারে না। আচ্ছা, আমরা কি চাইলে মুনাফিক চিনতে পারব? মুনাফিকরা কি মুখোশধারী নয়? নিফাক কি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা অন্তরের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়? উত্তরটা কুরআন থেকে বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩১. আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মুনাফিকের বিভিন্ন রঙ আছে,

ক. কিছু মুনাফিক মুখোশধারী। চেনা যায় না।

খ. কিছু মুনাফিকের আসল পরিচয়, হাতেগোনা কিছু মানুষ জানেন। তবে তারা মুনাফিকের পরিচয় জেনেও, জনসমক্ষে ফাঁস করেন না।

গ. কিছু মুনাফিকের পরিচয় তাদের কথা, চিন্তা ও বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ

আমি চাইলে আপনাকে তাদের (চেহারা) দেখিয়ে দিতাম, ফলে আপনি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে ফেলতেন এবং (এখনও) আপনি কথা বলার ধরন দেখে তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবেন (মুহাম্মাদ ৩০)।

৩২. এটা ছিল নবীজি সা.-এর যুগের কথা। তখন যদি এই অবস্থা হয়, বর্তমানের আধুনিক মুসলিম সমাজের কী অবস্থা? খুঁজে দেখলে কতজনের কথা, কাজ, চিন্তা ও বক্তব্য থেকে নিফাক বের হবে?

৩৩. সেকালে কথা, কাজ, চিন্তা ও বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম চিনে ফেলতে পারতেন, কে মুনাফিক আর কে প্রকৃত মুমিন। কা'ব বিন মালিক রা.-এর বিখ্যাত হাদিসেই এর একটি চিত্র আছে। দীর্ঘ হাদিসটির একপর্যায়ে তিনি বলেছেন,

فَكُنْتُ إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلًا مغموصا عليه النفاق، أو رجلًا ممن عذر الله من الضعفاء،

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাবুকের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হওয়ার পর, প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে দেখতাম, মদীনায় কোনও পুরুষ অবশিষ্ট নেই। সবাই জিহাদে চলে গেছে। শুধু কিছু মুনাফিক আর শারীরিক প্রতিবন্ধী আছে (বুখারি ৪৪১৮)।

৩৪. কা'ব বিন মালিক মানে সাহাবায়ে কেরামও চিনতেন, কারা মুনাফিক। তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন, (مغموصا) মানে নিফাকির দোষে সন্দেহভাজন। অভিযুক্ত। ঘৃণিত। অবজ্ঞেয়।

৩৫. একটা কথা প্রচলিত আছে, 'নিফাক' কলবের বিষয়। কলবের অভ্যন্তরে গোপন থাকে। এজন্য কাউকে সুনির্দিষ্ট করে মুনাফিক বলা অসম্ভব'। কথাটা বোধ হয় সঠিক নয়। মুসলিমের একটি বর্ণনা বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। সালাতের জামাতে হাজির হওয়া প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

ولقد رأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ، معلومُ النفاقِ .

আমরা দেখতাম, সালাতের জামাত থেকে কেউই পিছিয়ে থাকত না। শুধু মুনাফিকরা সালাতের জামাত থেকে পিছিয়ে থাকত, যাদের নিফাকি সবার কাছে পরিচিত ছিল (মুসলিম ৬৫৪)।

৩৬. সাহাবায়ে কেরাম সুনির্দিষ্টভাবে জানতেন, চিনতেন কারা মুনাফিক। কিছু গোপন মুনাফিকও ছিল, যাদেরকে নবীজি সা. ছাড়া অন্য কেউ চিনত না। পুরো কুরআন কারিমের দুটি স্থানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন (তাওবা ৭৩। তাহরীম ৯)।

৩৭. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে না চিনলে কীভাবে জিহাদ করা হবে? তার মানে মুনাফিকদের চেনা সম্ভব। জি না, আয়াতটা শুধু নবীজির সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। মুনাফিকদের যদি চেনাই না যেত, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন কারিমের দুটি আয়াত 'অনর্থক' হয়ে যেত।

৩৮. আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, মুনাফিকদের ব্যাপারে বিভক্ত হতে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, মুমিনগণকে এক থাকার হুকুম দিয়েছেন,

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুদল হয়ে গেলে? অথচ তারা যে কাজ করেছে তার দরুন আল্লাহ তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে (তার ইচ্ছা অনুযায়ী) গোমরাহিতে লিপ্ত করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদায়াতের উপর আনতে চাও? (নিসা ৮৮)।

৩৯. বিভক্তিটা কেন আসে? কিছু মানুষ আছেন, তারা চান বুঝিয়ে শুনিয়ে মুনাফিকদের হিদায়াত দান করবেন। ফলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের শিথিলতা তৈরি হয়। এ কারণে মুনাফিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে মুমিনগণ বিভক্ত হয়ে পড়েন।

৪০. মুনাফিকদের চেনা না গেলে, এই আয়াতের কাজ কী? তার মানে কি এই নয়, মুনাফিকদের চেনা সম্ভব? সেই চেনার ভিত্তিতে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে মুমিনকে বিভক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪২. মুনাফিকদের নসিহত শুনতে নিষেধ করা হয়েছে। মুনাফিকদের চাপের সামনে মুমিনকে নতি স্বীকার করতে নিষেধ করা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না (আহযাব ১)।

৪৩. মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন আল্লাহ,

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

আর তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা তাদের (মতলবের) কথা বেশ শুনে থাকে (তাওবা ৪৭)।

মুমিনগণের দলে মুনাফিকদের গুপ্তচর থাকে। তাই মুমিনগণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

৪৪. একদল লোক গা বাছানোর জন্যে বলে বেড়ান, মুনাফিকদের চেনা মুশকিল। নিফাক কলবের বিষয়। প্রকাশ্য কিছু নয়। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হবে, তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে কী ফয়সালা? তারা আরও বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নিফাকের ভয় করতেন, সেটা তারা তাকওয়ার কারণে করতেন।

৪৫. আমরা শুরুতে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। কোন সমাজ বেশি উত্তম, আমাদের সমাজ নাকি নবীযুগের সমাজ? উত্তরটা আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ রহ.-এর যবানীতে শুনি,

كُنَّا فِي حَلْقَةِ عبدِ اللهِ، فَجاء حُذَيفَةُ حتَّى قام عَلينا، فَسلَّم، ثُمَّ قال: لَقَدْ أُنزِلَ النِّفاقُ عَلى قومٍ خيرٍ منكُم،

আমরা বসেছিলাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হালকায়। এমতাবস্থায় হুজাইফাতুল ইয়ামান সেখানে তাশরিফ আনলেন। সালাম দিয়ে বললেন, 'তোমাদের চেয়েও উত্তম সম্প্রদায়ের উপর 'নিফাক' নাজিল করা হয়েছিল (বুখারি ৪৬০২)।

৪৬. হুজায়ফা রা. সবাইকে সতর্ক করেছেন। নিজেদের ঈমান-আমল নিয়ে তুষ্ট থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নবী সা. থাকাবস্থাতেই যদি নিফাক থাকতে পারে, মুনাফিক থাকতে পারে, নবীর অবর্তমানে অবস্থাটা কেমন হবে?

৪৭. অনেকে বলে, বর্তমানে মুনাফিক নেই। থাকার সুযোগ নেই। তাদের উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটা করা। আমাদের সমাজ কি নবীজির সমাজের চেয়েও ভালো হয়ে গেছে? নবীজির উপস্থিতিতে, ওহি নাজিল হতে দেখে, অসংখ্য মুজিযা দেখা সত্ত্বেও অনেক লোক মুনাফিক হয়ে গেছে। বর্তমানে নবী নেই, ওহি নেই, তাহলে তো আরও বেশিগুণে মুনাফিক থাকার কথা?

হৃদয়কর্ম

১. যখনই আমার আদর্শ, আমার 'উসওয়া' আবু বকর রা.-কে নিয়ে পড়ি, তাকে নিয়ে কল্পনায় বসি, মনের মধ্যে কেমন যেন 'আব্বু আব্বু' ভাব জাগে। আব্বুর মতোই নরম-সরম এক পুরুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সেটা হয়তো আমার দুর্বল মনের কল্পনা। সিদ্দীকে আকবরের ছবি নয়, আদর্শই আমার নাজাতের উসিলা হবে।

২. আবু বকর সেরা কেন? কীভাবে সবার চেয়ে এগিয়ে গেলেন? এ প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই পারে। একটু খতিয়ে দেখা যাক বিষয়টা:

৩. তিনি আবু জর বা আবু হুরাইরার মতো গরিব ছিলেন না। কিন্তু তাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন।

৪. অনেক সাহাবি কাফিরদের হাতে চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন। যেমন হযরত খাব্বাব, বিলাল, সুমাইয়া, ইয়াসের রা.। প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। আগুনে পুড়েছেন। আবু বকর রা.-এর এমন কিছু হয় নি। কিন্তু তিনি তাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন।

৫. সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মারাত্মক আহত হয়েছেন। তালহা, আবু উবাইদা, খালিদ বিন ওলীদ রা. বিভিন্ন জিহাদে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। আবু বকর রা.-এর এমন কিছু হয় নি।

কিন্তু তিনি তাদের সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন।

৬. সাহাবায়ে কেরাম বদর-ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। তারপরও নানা জিহাদে শরিক হয়েছেন। শুধু ওহুদেই সত্তরজন সাহাবি শহীদ হয়েছেন। উমর রা. জীবনের শেষপাতে এসে শহীদ হয়েছেন। আবু বকর স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু তিনি সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন।

৭. তিনি অন্য সাহাবিদের তুলনায় বেশি ইবাদতগুজার ছিলেন, এমন প্রমাণও নেই। অনেক অনেক টাকা দান করেছেন এমনটাও নয়। আবু হুরাইরার মতো সারাক্ষণ নবীজির সাথে লেগে ছিলেন এমনও নয়। তাহলে কী এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল, যার কারণে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন?

বিশিষ্ট তাবেয়ী বকর বিন আবদুল্লাহ মুযানি (রহ.) বলেছেন,

'আবু বকর সালাত-সিয়ামের পরিমাণ দিয়ে সবাইকে ছাড়ান নি। তিনি ছাড়িয়ে গেছেন 'আ'মালুল কুলুব-হৃদয়কর্ম দিয়ে'।

আমরা জানি ঈমান হলো,

ক. মুখে উচ্চারণ করা।

খ. হৃদয়ে স্বীকার করা।

গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বাস্তবায়ন করা।

৮. আমরা সাধারণত চেষ্টা করি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ইবাদত করতে। আমলের বাহ্যিক দিকটা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। মুখে ভাসাভাসা জিকির করেই তৃপ্ত হই। দশ-বিশ-একশো-হাজার সংখ্যার তাসবিহ টিপেই অনেক কিছু করে ফেললাম

ভেবে আপ্লুত হই। কিন্তু ইবাদতের মূল দিকটাকেই আমরা নিতান্ত অবহেলা করি—

আমালুল কালব। হৃদয়কর্ম।

৯. প্রতিটি ইবাদতের দুইটা রূপ আছে:

১. অন্তর্গত রূপ বা হাকিকত।

২. বাহ্যিক রূপ।

ক. নামাজের বাহ্যিক রূপ হলো, রুকু-সিজদা ও অন্যান্য রুকন। কিন্তু অন্তর্গত রূপ বা মূল প্রাণই হলো, খুশু-খুজু বা একনিষ্ঠ মনোযোগ।

খ. রোজার বাহ্যিক রূপ হলো, উদয়াস্ত পানাহার ইত্যাদি পরিহার করে চলা। অন্তর্গত রূপ হলো, তাকওয়া। মনে মনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

গ. হজের বাহ্যিক রূপ হলো, সাঈ করা, তাওয়াফ করা, আরাফা-মুজদালিফায় অবস্থান করা, পাথর ছোড়া। অন্তর্গত রূপ বা হাকিকত হলো, আল্লাহ শি'আর বা নিদর্শনাবলিকে সম্মানপ্রদর্শন ও আল্লাহর হুকুম মানা।

ঘ. দুআর বাহ্যিক রূপ হলো, হাত ওঠানো, কিবলামুখী হওয়া, ঠোঁট দিয়ে কিছু বাক্য উচ্চারণ করা। মূলরূপ বা প্রাণ হলো, আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আত্মনিবেদন। সর্বস্ব বিলোনো।

ঙ. জিকিরের বাহ্যিক রূপ হলো, তাসবিহ পড়া। তাহলীল পড়া। তাকবির বলা। আলহামদু পড়া। অন্তর্গত রূপ হলো, আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব, আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কম্পন। আল্লাহর রহমতের গভীর প্রত্যাশা।

১০. কুরআন কারিমের কয়েকটা আয়াতের দিকে তাকালেও বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিয়ামতের দিন,

এক. সেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হবে (তারিক: ৯)।

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

দুই. অন্তরে যা আছে, বের করা হবে (আদিয়াত: ১০)।

وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ

তিন. কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে (শু'আরা: ৮৯)।

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

চার. যে না দেখে রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো (ক্বাফ: ৩৩)।

مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

১১. একটা বিষয়ই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে,

আমলের বাহ্যিক রূপ তো অবশ্যই লাগবে। কিন্তু মূল্য নির্ধারণ করা হবে আমলের অন্তর্গত রূপ দেখে। পরিমাপ করে। বিবেচনা করে। যাচাই করে।

আবু বকর রা. ঠিক এই জায়গাটাতে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমদেরকেও আমলের ওজন বাড়াতে হলে, আমালুল কালব বা হৃদয়কর্মের বিকল্প নেই।

সুপ্রিম কোর্ট

আমি দুনিয়ার আদালতের নিয়ম-কানুন জানি। রীতিনীতি জানি। আখিরাতের আদালতের কথা আমার কতটুকু জানা আছে? কেমন হবে তার বিচার-ব্যবস্থা? কেমন হবেন তার বিচারক? মামলা-মোকদ্দমার ধরনই-বা কেমন হবে? আমার হয়ে কোনও উকিল মামলা লড়বে? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ থাকবে? দেখা যাক একটু নজর বুলিয়ে। আগে থেকে সেই আদালত সম্পর্কে জেনে না রাখলে, পরে বিপদে পড়ব তো।

(এক) **উন্মুক্ত ফাইল**।

সেদিন সব মামলার ফাইল হবে উন্মুক্ত। গোপন আদালত, গোপন ট্রাইবুনাল বলে কিছু থাকবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিরোধীপক্ষের দুর্নীতির শ্বেতপত্র তৈরি করে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পানামা পেপারস নামেও ফাইল আছে। কিন্তু শেষ বিচারের আদালত এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾

এবং কিয়ামতের দিন আমি (তার আমলনামা) লিপিবদ্ধরূপে তার সামনে বের করে দেব, যা সে উন্মুক্ত পাবে (ইসরা: ১৩)।

আল্লাহ গো, কেমন হবে আমার ফাইল! বেইজ্জত করো না ইয়া রাব।

(দুই) **কঠিন প্রহরায় হাজিরা**।

বিপজ্জনক আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে। কঠোর প্রহরা নিয়ে। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। মাথায় হেলমেট পরিয়ে। চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে।

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী (ক্বাফ: ২১)।

পালানোর কোনও সুযোগ থাকবে না। ফাঁকি দেওয়ারও উপায় থাকবে না।

(তিন) জুলুম ও পক্ষপাতহীন বিচার।

দুনিয়ার আদালতে কত কী ঘটে। কত খেলা চলে। টাকার খেলা। মামার খেলা। পদের খেলা। সেদিন কোনও খেলা চলবে না। বিচারক কোনও কিছু দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। বিন্দুমাত্র জুলুমের অবকাশ থাকবে না।

﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না (ক্বাফ: ২৯)।

এই আদালতে আপিল নেই। সব মামলাই এক বসায় শেষ করে দেওয়া হবে। জুলুম হবে না কোনও।

(চার) উকিল থাকবে না

জমি বিক্রি করে হলেও সেরা উকিল ধরি। বিদেশ থেকেও ভাড়া করে আনি। তারা নয়কে ছয়, ছয়কে নয় বানিয়ে মামলা লড়ে। তিলকে তাল বানায়। তালকে তিল বানায়। সেদিন এসবের বালাই থাকবে না। শেষ বিচারে উকিলের প্রয়োজন হবে না।

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

(বলা হবে) তুমি নিজ আমলনামা পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিশেব নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট (ইসরা: ১৪)।

(পাঁচ) ঘুষ ও ঘুষি কোনওটাই থাকবে না

কাউকে দিয়ে ফোন করানোর সুযোগ থাকবে না। প্রভাব খাটানোর উপায় থাকবে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হবে সেদিনের কাঠগড়া।

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾

যে দিন কোনও অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না (শু'আরা: ৮৮)।

(ছয়) নাম কাটানো যাবে না।

কোর্টে মামলা উঠার আগেই অনেক কিছু হয়ে যায়। অনেক লেনদেন ঘটে যায়। হাজতে থাকতে থাকতেই। এ-বিচারালয়ে এসবের কোনও সুযোগ থাকবে না। কোনও ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

আপনার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার নন (মারইয়াম: ৬৪)।

(সাত) হাতে হাতে মামলার রায়

কোনও লুকোচুরি নেই। সবকিছু খোলামেলাভাবে সম্পন্ন হবে। রায়ের কপি সরাসরি সাথে সাথে আসামির হাতে দিয়ে দেওয়া হবে।

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾

অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে, হে লোকজন! এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখ (হাক্কাহ: ১৯)।

(আট) গায়েবি বিচার হবে না

সব আসামি হাজির থাকবে। আসামি পলাতক আর তার অনুপস্থিতিতেই মামলার রায় বের হয়েছে, এমন হবে না। পালাবে কোথায়? জেল ভেঙে? গাড়ি থেকে লাফিয়ে? পুলিশ রেইড দেওয়ার আগে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আত্মগোপন করে? উঁহু, এসবের কোনও সুযোগ নেই।

﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

এবং যত লোক আছে তাদের সকলকে অবশ্যই একত্র করে সামনে হাজির করা হবে (ইয়াসিন: ৩২)।

(নয়) আপিল থাকবে না। আদালত বিব্রত বোধ করবে না।

টাকা দিয়ে জামিন নেওয়া? দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বিচারক বদলানো? রায় হয়ে যাওয়ার পরও উচ্চ আদালতে আপিল? না, কোনও সুযোগ নেই। নো ওয়ে।

﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾

আমার সামনে কথার কোনও রদবদল হতে পারে না (ক্বাফ: ২৯)।

(দশ) মিথ্যা সাক্ষী থাকবে না

টাকা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায় আর একজন সাক্ষী মিলবে না? টাকা ছড়ালে মুর্দা এসেও সাক্ষী দিয়ে যাবে। কিন্তু এসব জালিয়াতি তো দুনিয়ার আদালতে, আল্লাহর আদালতে মিথ্যার লেশমাত্রও থাকবে না।

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে (নূর: ২৪)।

(এগারো) <u>মামলার নথি হারাবে না। ফাইল মিসিং হবে না।</u>

মামলার কাগজপত্র গায়েব হয়ে যায়। রাতের বেলা কে বা করা এসে নথিকক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। মামলা ডিসমিস করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু আল্লাহর আদালতে কোনও মিসিং নেই।

﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾

আল্লাহ তা গুনে গুনে সংরক্ষণ করেছেন (মুজাদালাহ: ৬)।

(বারো) <u>সূক্ষ্ম বিচারিক মাণদণ্ড</u>

দুনিয়ার পাল্লায় প্রায়ই খাদ ধরা পড়ে। ভেজাল ধরা পড়ে। আল্লাহর মাণদণ্ডে কোনও খাদ থাকবে না। বিন্দু পরিমাণ বস্তুও সে নিক্তিতে ধরা পড়ে যাবে।

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ানুগ তুলাদণ্ড স্থাপন করব। ফলে কারও প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না। যদি কোনও কর্ম তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিশেব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট (আম্বিয়া: ৪৭)।

(তেরো) আমাকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমার গতিবিধির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। লেখা হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি নড়াচড়া। তবুও আমি কেন ভুলে থাকি? দুনিয়ার সিসি ক্যামেরা কত ভয় পাই, আল্লাহর কেরামান-কাতিবিনকে কেন ভয় পাই না?

একটুখানি তাদাব্বুর!

১. হকের মানদণ্ড

১. ঈমান ও কুফরের এই মহাসমরে কোনও মুসলিম দল বা ব্যক্তি হকের মানদণ্ডে আছেন কি না, এটা মাপার উপায় কী? উপায় রাব্বে কারিমই বলে দিয়েছেন,

ক. মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি দয়ালু হবেন (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)।

খ. কাফিরের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হবেন (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ)।

২. আমার দল বা ঘরানার মধ্যে এই দুই বৈশিষ্ট্য আছে তো? যার মধ্যে যতবেশি এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, তিনি ততবেশি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

২. নফসে আম্মা-রাহ

১. কুরআন কারিমে তিন প্রকারের নাফসের কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ আর বিপজ্জনক হলো (أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) প্রচণ্ড শক্তিতে মন্দকাজে প্ররোচনা প্রদানকারী 'নাফস' বা আত্মা।

২. বয়েস বাড়তে বাড়তে শরীর দুর্বল হতে থাকে। ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হতে থাকে। নানাদিক থেকে শরীরে বার্ধক্য এসে বাসা বাঁধতে থাকে। কিন্তু নাফসে আম্মা-রাহ দুর্বল হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে এই নাফস বয়েস বাড়ার সাথে সাথে আরও প্রবল প্রতাপান্বিত হতে থাকে।

৩. শুরু থেকেই তেজের সাথে এই দুষ্ট নাফসকে নেতিয়ে দিতে না পারলে, কালে কালে গোখরোর মতোই ফনাদার হতে থাকে।

৩. বিয়ের মানে

বিয়ে মানে লাখ লাখ টাকা মোহরানার ফুটানি নয়।
বিয়ে মানে জাঁক-জৌলুসের বাহারি চমক নয়।
বিয়ে মানে চাকচিক্যের অপরিমিত দেখানোপনা নয়।
বিয়ে মানে একটি 'সুখীগৃহ'-এর নাম।
যার ভিত 'আল্লাহর আনুগত্য'-এর উপর স্থাপিত।
যার খুঁটি পরস্পরকে বোঝাপড়াময় সহনশীল দুটি হৃদয়।
যার ছাদ হবে (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) আমরা আল্লাহরই ইবাদত করি। আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।

৪. <u>দ্রুতগতি</u>

১. কাজেকর্মে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নবীজি সা. তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। রাস্তাঘাটে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো জরিমানাযোগ্য অপরাধ। কখনো কখনো এই দ্রুতগতির পরিণতি নির্মম 'মৃত্যু'। গাড়িঘোড়ার দ্রুতগতি ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সিসি ক্যামেরা, পুলিশ প্রহরাসহ আরও নানা আয়োজন।

২. এ তো গেল দুনিয়ার ব্যাপার। আখিরাতের ব্যাপারে হিশেব ভিন্ন। তাওবা করার ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করা প্রশংসনীয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া প্রশংসনীয়। কারণ এই দ্রুতগতির পরিণতি হচ্ছে অনন্ত সুখের 'জান্নাত'।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতে দিকে দ্রুত অগ্রসর হও (আলে ইমরান: ১৩৩)।

৩. দুনিয়ার প্রাপ্তির জন্যে, গুনাহের জন্যে 'দ্রুতগতিসম্পন্ন' মানুষের অভাব নেই। মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়ার মতো মানুষের বড়ই অভাব। রাব্বে কারিম আমাদেরকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

৫. <u>বুদ্ধিশুদ্ধি</u>

১. হুজুরের কাছে এক ছাত্র এসে বলল, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। আমার জন্যে দুআ করুন। হুজুর বললেন, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করো। অল্প অল্প করে বোঝার চেষ্টাও চালিয়ে যাও। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি এই কিতাবকে আরবি কুরআন হিসেবে নাজিল করেছি। যাতে তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারো (ইউসুফ: ২)।

২. যখনই নিজেকে কমবুদ্ধির মনে হবে, নিজের 'আকল' বা জ্ঞানবুদ্ধির প্রতি হীনমন্যতা জন্মাবে, কুরআন নিয়ে বসে যেতে হবে। কুরআন উপলব্ধির কিতাব। অনুধাবনযোগ্য কিতাব। আল্লাহ তাআলাই সাহায্য করেন বুঝতে। উপলব্ধি করতে। অনুধাবন করতে।

৩. যে-কোনও প্রাপ্তিই ধারাবাহিক কর্মপ্রক্রিয়ার অংশ। এক সাফল্য আরও সাফল্য ডেকে আনে। একবারের জয় আরও জয়ের ভিত হয়। একবারের পারা, আরও পারার সোপান হয়।

৪. আল্লাহর সাহায্যে সহজেই কুরআন পড়তে ও বুঝতে শুরু করলে, বোঝার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এই প্রভাব অন্য পড়াশোনাতেও পড়বে। লেখকের লেখা না এলে, পাঠকের পাঠে সদিচ্ছা না জাগলে, কুরআন নিয়ে বসে যেতে হবে। কিছুক্ষণ কুরআন পড়ে গতি সৃষ্টি করে, সে গতিকে কাজে লাগিয়ে অন্য পড়াশোনা শুরু করা যেতে পারে। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

৫. এটা দোলনায় দোল দেওয়ার মতো। একদোলের গতিশীল প্রভাবে আরও কয়েকটা দোল সৃষ্টি হয়। যে-কোনও সমস্যায়, বিশেষ করে মানসিক সমস্যায়, প্রথমেই কুরআনে দ্বারস্থ হবো। আল্লাহর কালামের প্রভাবে কেটে যাবে সব জড়তা। ইনশাআল্লাহ।

৬. <u>সন্তোষভাজন</u>

১. সাঈদ বিন জুবায়ের রা. বলেন, আমি একটি আয়াত আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে তিলাওয়াত করলাম,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

হে প্রশান্তচিত্ত! তোমার রবের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে (ফজর: ২৮)।

২. আবু বকর রা. আয়াতখানা শুনে নবীজিকে বললেন, 'কী চমৎকার কথা'।

নবীজি সা. বললেন,

أما إنَّ الملَكَ سيقولُ لك هذا عند الموتِ

মৃত্যুর সময় ফিরিশতা আপনার উদ্দেশ্যে এই আয়াত তিলাওয়াত করবেন (তাফসিরে ইবনে কাসীর)।

৩. নবীজির কথা শুনে, আবু বকরের কেমন লেগেছিল? দুনিয়ার বুকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশান্তিময় সুসংবাদ আর কী হতে পারে?

৪. রাব্বাহ! আমরা আবু বকরকে ভালোবাসি। আমাদেরকেও তাঁর দলে শামিল করে নিন। আমাদেরকে তাঁর মতো সম্মান ও অনুগ্রহ দান করুন। আমাদের জন্যেও আয়াতখানা পড়ার জন্যে ফিরিশতাকে বলে দিন। আমিন।

৭. <u>চিন্তাশীলের কিতাব</u>

কুরআন কারিম চিন্তার কিতাব। কুরআন কারিম চিন্তাশীলগণের কিতাব। কুরআন কারিম বুদ্ধিবৃত্তির কিতাব। কুরআন কারিম বুদ্ধিজীবীদের কিতাব। কুরআন কারিমের মতো আর কোনও ধর্মগ্রন্থ পাঠককে এভাবে চিন্তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নি। কুরআন বারবার বলেছে,

১. যেন তোমরা বুঝতে পারো (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)।

২. যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)।

৩. বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ)।

আন্তরিক চিন্তা নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করলে, আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত আসবেই, ইনশাআল্লাহ।

৮. আলিম

১. আলিম (عالِم) অর্থ যিনি ইলম অর্জন করেছেন। জ্ঞানী। এর বহুবচন (العالِمِين)। আলিমগণ বা ইলম অর্জনকারীগণ। শব্দটা পুরো কুরআনে ৭৩ বার বর্ণিত হয়েছে।

২. ইলম অর্জনের পরের ধাপ আমল করা। রব্বানি আলিমগণ ইলম শিখেই ক্ষান্ত হন না। তারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। জানাকে মানায় পরিণত করেন। তারা আমল করেছে/করল (عَمِلُوا) ক্রিয়াপদটা পুরো কুরআনে ৭৩ বার বর্ণিত হয়েছে।

৩. আলিম ও আমলের শব্দ উভয়টার বহুবচন সমান সংখ্যকবার বর্ণিত হয়েছে। যেন বলা হয়েছে,

'হে আলিম সম্প্রদায়, যা জেনেছ, তা মানায় পরিণত করো। জেনে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, আমলেও ব্রতী হও'।

৯. সালাত কায়েম

১. আমরা সালাত আদায় করি। প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত। এ ছাড়াও বুজুর্গগণ তাহাজ্জুদ-ইশরাকসহ আরও নফল আদায় করেন। আল্লাহ তাআলা সালাতের ফরজিয়ত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেন (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ)। তোমরা সালাত কায়েম করো।

২. আদায় করার কথা না বলে, কায়েম করার কথা কেন বললেন? বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বলেন, তোমরা কায়েম করো (أَقِيمُوا) ক্রিয়াটির উৎস হলো (أقام العود) ব্যবহারটি। আরবরা লাঠি বা দণ্ডকে সোজা-ঋজু করে দাঁড় করানো বোঝাতে 'أقام' শব্দটি ব্যবহার করত।

৩. মুফাসসিরীনের ব্যাখ্যামতে 'ইকামতে সালাত' মানে?

ক. সালাতে তা'দীলে আরকান (تعديل أركان) করা। প্রতিটি রোকন যথাযথভাবে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। যেমন : রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। দুই সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা। সালাতের সুন্নত, আদাব যত্নের সাথে আদায় করা। সালাতকে সব ধরনের অসম্পূর্ণতা থেকে রক্ষা করা।

খ. সালাতকে এভাবে আদায় করলেই 'কায়েম' করা বলা যেতে পারে। একটা লাঠি বা দণ্ডকে পুরো সোজা করে রাখাকে যেমন 'ইকামাতুল উদ' বলে, তদ্রূপ সালাতকে বিধিসম্মতভাবে আদায় করাকেই 'ইকামতে সালাত' বলা হবে।

গ. এ ছাড়াও অন্যকে সালাত আদায়ে উৎসাহিত করা, সমাজে সালাত কায়েমের পরিবেশ সৃষ্টিতে অংশ নেওয়াও ইকামতে সালাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে 'ইকামতে সালাতের' মূল দাবি হলো, ধীরস্থিরভাবে খুশু-খুজুর সাথে আদায় করা।

ঙ. আমার নিত্যদিন যেভাবে সালাত আদায় করছি, সেটা 'ইকামতে সালাতের' মানদণ্ডে উন্নীত হচ্ছে তো?

১০. অহংকার

১. পৃথিবীতে যত পাপ আছে, সব পাপের মূলে আছে মানুষের একটি ঘৃণিত 'মনোবৃত্তি'-অহংকার। কুরআন কারিমের ভাষায় 'ইস্তেকবার'। ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে কেন? আল্লাহ তাআলা এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ) ফিরআউন ও তার বাহিনী দম্ভ-অহংকারে লিপ্ত হয়েছে (কাসাস : ৩৯)।

২. ইস্তেকবার (اِسْتِكْبَار) শব্দটি পুরো কুরআনে, ১৯ ধরনের শব্দে মোট ৬০ বার বর্ণিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত হয়েছে (اسْتَكْبَرُوا) সীগাহ বা শব্দটি। অর্থ: তারা দম্ভ-অহংকারে লিপ্ত হয়েছে।

৩. ইস্তেকবারের বিভিন্ন ধরন আছে। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ছোটখাটো গুনাহে 'ইস্তেকবার'-এর অস্তিত্ব কোথায়? ধরা যাক, আমি কাউকে গালি দিলাম, এর মানে কি এটা নয়, আমি নিজেকে তার চেয়ে ভালো মনে করছি? যে-কোনও পাপের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'অহংকার' লুকিয়ে থাকে।

৪. সহজ করে বলতে গেলে—আল্লাহর বিধান, নবীজি সা.-এর সুন্নাহকে অবহেলা করার মাধ্যমেই তো গুনাহগুলো সংঘটিত হয়। এই অবহেলার উৎসই হলো ভেতরে লুকিয়ে থাকা 'ইস্তেকবার' বা অহংকার। আল্লাহকে পরোয়া না করার অহংকার। রাব্বে কারিম আমাদেরকে ইস্তেকবারের মহা পাপ থেকে হেফাজত করুন।

১১. সাক্ষ্য

১. দেখা ও শোনা—কোন মাধ্যমটা বেশি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য? অবশ্যই দেখা। এক মামলায় দুই ধরনের সাক্ষী আছে; একজন সরাসরি দেখেছে, আরেকজন ঘটনা সম্পর্কে শুধু শুনেছে। কে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে? অবশ্যই চাক্ষুষ দেখা ব্যক্তি।

২. অকুস্থলে উপস্থিত ছিল না, ঘটনা ঘটতে দেখে নি, ঘটনা ঘটার সময় তার জন্মও হয় নি, এমন কেউ কি কোনও ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে? একদম নয়। এমন কাউকে সাক্ষী হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া বিস্ময়কর নয় কি? শুধু বিস্ময়করই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে।

৩. আমরা পূর্ববর্তী উম্মাহর ব্যাপারে সাক্ষী হব। যতই বিস্ময়কর আর অবিশ্বাস্যই হোক, কিয়ামতের দিন এমনটাই ঘটবে। এই উম্মাহ সাক্ষ্য দেবে, পূর্ববর্তী উম্মাহ সম্পর্কে। না দেখে, না শুনে। হাজার বছর পরে জন্ম নিয়েও। এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কীভাবে পুরো উম্মাহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে? উত্তরটা সহজ—কুরআন বলেছে, তাই। কুরআন কারিম বলেছে আমরা (شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ) পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে সাক্ষী হব।

৪. কুরআন কারিম আমাদের কাছে কতটা নির্ভরযোগ্য আর বিশ্বাসযোগ্য? চোখের দেখা, নিজ কানে শোনা, স্বহস্তে স্পর্শ করার চেয়েও কুরআন কারিম আমাদের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য। কুরআন বলছে, আমরা সাক্ষী হব, আর কোনও সন্দেহ-অবিশ্বাসের অবকাশ নেই।

৫. কোনও যুক্তিতর্ক, প্রমাণ-উপাত্ত কুরআনের সামনে ধোপে টিকবে না।

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি-তক্ক-গপ্পও যদি কুরআনের বিপরীত হয়, সেটা পরিত্যাজ্য।

৬. দুনিয়ার সবচেয়ে অকাট্য বৈজ্ঞানিক সূত্রও যদি কুরআনের বিপরীত হয়, সেটা বর্জনীয়। একমাত্র কুরআনই সত্য। বাকি সব মিথ্যা।

একমাত্র কুরআন অনুমোদিত পথই সত্য, বাকি সব মিথ্যা।

একমাত্র কুরআন অনুমোদিত ইসলামই সত্য, বাকি সব মিথ্যা।

একমাত্র কুরআন অনুমোদিত 'নবী-রাসুল'ই সত্য, বাকি সব মিথ্যা।

১২. আকসা

১. কুদস শরিফে মুসলমানদের প্রবেশ ও বিজয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. মেরাজের রাতে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রবেশ ছিল আত্মিক বিজয়।

খ. উমার রা.-এর প্রবেশ ছিল 'সামরিক বিজয়'।

গ. ভবিষ্যতে কুদসে মুসলমানদের প্রবেশ হবে 'সার্বিক বিজয়'। এরপর মুসলমানদের আর পরাজয় থাকবে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা। তাঁর ওয়াদা কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

২. আল-আকসার মর্যাদা নানাভাবে উপলব্ধি করা যায় :

ক. আল্লাহ তাআলা এটাকে উর্ধ্বজগতের দরজা বানিয়েছেন। মেরাজের রাতে নবীজি এখান থেকেই উর্ধ্বারোহণ করেছিলেন।

খ. নবীজি উর্ধ্বজগৎ থেকে ফেরার সময়ও আকসায় নেমেছিলেন।

গ. আল্লাহ তাআলা আকসার চারপাশকে বরকতময় বলে ঘোষণা করেছেন।

৩. কুরআন কারিমের লেখনশৈলী (الْخَطُّ، رَسْمٌ)-ও আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত (تَوْقِيفِيٌّ)। আমরা সাধারণত আকসা লেখার সময় লিখি (الأقصى)। কিন্তু কুরআন কারিমে লেখা হয় (الأقصا)। শেষে একটা লম্বা ঋজু আলিফ (ا) মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটাকে বিস্তৃত আলিফ (ا) বলা হয়। মনে হয় এটাই বোঝানো হয়েছে, আলিফ যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আল-আকসাও এভাবে যুগের পর যুগ সমুন্নত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নির্ভিক। স্বাধীন।

৪. আল-আকসাকে আপন মর্যাদায় অভিষিক্ত করার দায়িত্ব আমাদের উপর! সেজন্য আমাদেরকে হতে হবে 'আলিফের' মতোই ঋজু! দৃঢ়চেতা! টানটান সীনা।

১৩. নির্দয় হৃদয়

১. কুরআন কারিমে হৃদয় (قَلْبٌ) কঠোর বা নির্দয় (قَسْوَةٌ) হয়ে যাওয়ার কথা আছে। এটি একটি মানসিক ব্যাধি। এর প্রতিক্রিয়া কী? কঠোর হৃদয় বললে, আমরা সাধারণত বুঝি, মনে দয়ামায়া নেই। রূঢ় স্বভাবের। পাষাণহৃদয়। কঠোর রুক্ষ স্বভাব। ব্যাপারটা মূলত এমন নয়।

২. কুরআনি কাসাওতে কলব (قَساوة قلب) বা রুক্ষ স্বভাব চেনার প্রধানতম আলামত হলো, ইবাদতের প্রতি অনীহা থাকা। ঈমানি কাজের প্রতি বিমুখ থাকা। আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মন সায় না দেওয়া। অবশ্য শাব্দিক অর্থ ধরলে, রুক্ষ স্বভাবের অধিকারীই বোঝায়। কিন্তু সেটা বোঝানো বোধ হয় কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। আমি এতদিন ভুল ধারণার মধ্যে ছিলাম।

১৪. সন্তান

১. সন্তানকে কুরআনে বলা হয়েছে 'ওয়ালাদ' (وَلَد)। অর্থাৎ যে জন্মলাভ করেছে। পিতার আরবি 'ওয়ালিদ' জন্মদাতা। মায়ের আরবি 'ওয়ালিদাহ' জন্মদাত্রী।

২. তারা আল্লাহর কুদরতে, সন্তানের শরীরকে যেভাবে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন, ঠিক সেভাবে সন্তানের 'মানসকেও' জন্ম দিতে সক্ষম।

৩. আমরা কি আমাদের সন্তানকে শারীরিকভাবে জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি, মানসিকভাবেও সঠিকভাবে জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছি?

৪. একদম বিয়ের আগে থেকেই নেক সন্তানের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করা উচিত। বাবা-মা ঠিকমতো চাইলে ও সঠিক পন্থায় চেষ্টা করলে, সন্তান অবশ্যই নেক হবেন। ব্যতিক্রম হলে, সেটা রাব্বে কারিমের খাস কুদরত।

১৫. ইবলিসেরও অধম

১. আজকালের মুলহিদরা (নাস্তিক) ইবলিস শয়তানেরও অধম। তাদের কথাবার্তা, তাদের চিন্তাভাবনা শয়তানকেও লজ্জায় ফেলে দেয়। ইবলিস একটি হুকুমে আল্লাহর অবাধ্যতা করলেও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এমনকি আল্লাহর বড়ত্ব আর মহত্ত্বের আকিদাও পোষণ করত। কাজেকর্মে আল্লাহর ইজ্জতের (فَبِعِزَّتِكَ) শপথ করত (সোয়াদ : ৮২)।

২. বর্তমানের মুলহিদরা আল্লাহকে গালি দেয়। আল্লাহর দ্বীনকে গালি দেয়। অথচ এমন কাজ ইবলিসও করে নি। এদের মধ্যে সেই প্রাচীন রোগ দেখা দিয়েছে। নুহ আ. অবাক হয়ে তার কওমকে প্রশ্ন করেছিলেন,

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর বড়ত্বকে ভয় করছ না (নুহ: ১৩)।

৩. এখন ইসলামবিরোধী যেসব চিন্তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে, তার সবগুলোর ধরণই আগের যুগের জাতিসমূহের মধ্যে ছিল। কুরআন কারিমে ফিরে আসা ছাড়া গতি নেই। কুরআনের ছোঁয়া ছাড়া এই মহাদুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায় নেই।

১৬. জ্ঞানী শিশু

১. এক মা তার ঘরের বিভিন্ন দরজার উপরে নেমপ্লেটের মতো করে জিকির লিখে টাঙিয়ে দিয়েছেন। কোনও কামরার দরজায় লেখা 'সুবহানাল্লাহ কক্ষ'। কোনও কামরার দরজায় লেখা 'আলহামদুলিল্লাহ কক্ষ'। আরেক কামরার দরজায় লেখা 'আল্লাহু আকবার কক্ষ'। রান্নাঘরের দরজায় লেখা 'ইস্তেগফার কক্ষ'। বৈঠকখানার দরজায় লেখা 'তাহলীল কক্ষ'।

২. মেহমান এলে অবাক হয়। এটা কেন? মায়ের সহাস্য উত্তর,

'আমি আমার সন্তানদেরকে 'জ্ঞানী' বানাতে চাই'।

'জ্ঞানী বানানোর সাথে, দরজার উপরে এসব লেখার কী সম্পর্ক'?

৩. কুরআন কারিমে প্রকৃত জ্ঞানীকে উলুল আলবাব (لِأُولِي الْأَلْبَابِ) বা জ্ঞানের অধিকারী বলা হয়েছে। এই জ্ঞানীরা কারা? আল্লাহ তাআলাই বলে দিচ্ছেন,

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে (আলে ইমরান: ১৯১)।

৪. আমি চাই আমার সন্তানরাও সর্বাবস্থায় জিকিরে অভ্যস্ত হোক। তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হোক।

৫. এই মা যখন যে কামরায় প্রবেশ করতেন, সন্তানদের শুনিয়ে শুনিয়ে সেই জিকির করতে থাকতেন। সন্তান আর সন্তানদের পিতাও তার দেখাদেখি এই আমলে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাহলীলের কামরায় প্রবেশ করেই শিশুরা সমস্বরে বলে উঠছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ইস্তেগফারের কামরায় প্রবেশ করেই আস্তাগফিরুল্লাহ বলে উঠছে। আস্তে আস্তে এমন হয়েছে, বাড়িতে মেহমান এলে, মেহমান শিশুরাও এ-কামরা ও-কামরায় হুটোপুটি করতে করতে জিকির জিকির খেলা শুরু করে।

৬. সন্তানদেরকে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে এই মায়ের প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। মা-ই হলেন সন্তানের প্রথম মাদরাসা।

১৭. সুখী দাম্পত্য

১. একজন প্রশ্ন করল,

'আমাকে স্রেফ দুই শব্দে সুখী দাম্পত্য জীবন লাভের উপায় বাতলে দিন তো! লম্বাচওড়া বয়ান মনে থাকে না'।

'দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাইলে দুই শব্দই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলাই দুই শব্দে সুখী দাম্পত্যের রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন।

ক. মাওয়াদ্দাহ (مَوَدَّةً)। প্রগাঢ় ভালোবাসা।

খ. রহমাহ (رَحْمَةً)। অনুকম্পা। দয়া।

২. পরস্পরের আচার-আচরণে এ-দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে কী হবে?

'সেটাও আল্লাহ তাআলা এক শব্দে প্রকাশ করেছেন। সাকান (سَكَن) আরাম, প্রশান্তি'।

৩. আমি রাগ-বিরাগ-অনুরাগ সব সময় মনে রাখব, স্বামী হলে স্ত্রী বা স্ত্রীদের প্রতি মাওয়াদ্দাহ ও রহমাহপূর্ণ আচরণ করছি তো?

৪. স্ত্রী হলে মনে রাখব, আমার আচরণেও রহমাহ বা মাওয়াদ্দাহ থাকছে তো?

১৮. কুঠার চোর

১. মন্দ ধারণা করা মুনাফিক ও কাফিরের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। মুমিনের মধ্যে অন্য মুমিন সম্পর্কে মন্দ ধারণা জাগতে পারে না। কুরআনে মুমিনগণকে মন্দ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)। তোমরা অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক (ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ)। কোনও কোনও অনুমান গুনাহ (إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ)। হুজুরাত : ১২।

২. মুনাফিক মুশরিকের স্বভাবই হলো মন্দ ধারণা করা। তারা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে (ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ)। ফাতহ : ৬।

৩. শুধু আল্লাহ সম্পর্কেই নয়, মুনাফিক-মুশরিকরা নবীজি সা. ও মুমিনগণ সম্পর্কেও মন্দ ধারণা করে। তোমরা (মুনাফিকরা) নানা রকম কুধারণা করেছিলে (وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ)। ফাতহ : ১২।

৪. অন্যের প্রতি কুধারণার প্রবণতা থাকা ঘৃণিত বিষয়। এর ফলে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে নানা ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেয়। বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। একজনের অভিজ্ঞতা,

'আমার কুঠার হারানো গেল। সাথে সাথে সন্দেহের তির প্রতিবেশীর দুষ্ট ছেলেটার দিকে ধেয়ে গেল। তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করলাম। একটু পরই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, ওই ছেলেই আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কুঠারটা সরিয়েছে। তার চলাফেরা একজন কুঠার চোরের মতোই লাগছে। চোরা-চাহনিটাও ঠিক ঠিক কুঠার চোরের মতো। লুকিয়ে লুকিয়ে কাছে গিয়ে ওঁত পেতে তার কথা শুনে দেখলাম, আর কোনও সন্দেহ রইল না, সে পাকা কুঠার চোরের মতোই কথা বলছে।

৫. কুঠারের চিন্তায় রাতে ঘুম হলো না। আগামীকাল বনে গিয়ে কাঠ কাটব কী দিয়ে? কাঠ কাটতে না পারলে বাজার-সদাই হবে না। বাচ্চারা অভুক্ত থাকবে। সকালে চিন্তিত মনে কাঠঘরে গেলাম। বিক্রির করার মতো অবশিষ্ট কাঠ আছে কি না দেখব। একগাদা কাঠের টুকরা ডাঁই করে রাখা আছে। লাঠি দিয়ে সেগুলো একপাশে সরাতে গিয়ে দেখি, ওই তো কুঠারটা পড়ে আছে।

৬. সাথে সাথে কুঠার হাতে কাঠঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ও-বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রতিবেশী ছেলেটা কিছু নিয়ে খেলছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, নাহ তাকে কুঠার চোরের মতো লাগছে না। কেমন নিষ্পাপ শান্তশিষ্ট বালক। একমনে খেলে যাচ্ছে। এই ছেলে কিছুতেই চোর হতে পারে না।

৭. ভেবে দেখলাম, আমিই বড় চোর। একটি নিরপরাধ ছেলের আমানতদারিতা ও নির্দোষিতা চুরি করেছি আমি। গোটা একটি বিকেল ও পুরো একটি রাত মাসুম শিশুকে চোর ঠাউরে, নিজেই চোর সেজে বসেছি। কুঠারের চিন্তা ও অপরকে অপবাদ দেওয়ার কারণে, দুশ্চিন্তা আর মনোকষ্টে সারারাত বিনষ্ট সময় কাটিয়েছি। নিজেই নিজের মূল্যবান একটি রাত চুরি করেছি।

৮. আমাদের অনেক সমস্যাই আমাদের ভুল ধারণার কারণে সৃষ্টি হয়। কুরআন কারিম আমাদেরকে মন্দ ধারণা ও ভুল ধারণা এড়িয়ে চলতে হুকুম করেছে। ভুল ধারণার কারণে নিজেরও কষ্ট আশেপাশের লোকদেরও কষ্ট।

১৯. আজাব মাফ

বাবার দাফনের কাজ সম্পন্ন। সবাই চলে গেছে। ছেলেটা একাকী বাবার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল,

'আব্বু, আপনি কি প্রতি রাতে সূরা মুলক তিলাওয়াতের ব্যাপারে রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছেন'?

বাবাভক্ত ছেলে এবার আকাশের তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে বলল,

ইয়া রাব্বাহ! আমাদের নবীজি সা. বলে গেছেন, প্রতি রাতে সূরা মুলক তিলাওয়াত করলে, আপনি কবরের আজাব মাফ করে দেবেন। ইয়া রাব্বাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমার আব্বুকে কখনো সূরা মুলক তিলাওয়াত করা ছাড়া ঘুমুতে যেতে দেখি নি।

কবর দিতে আসা আত্মীয়স্বজন অবাক হয়ে দেখল, ছেলেটা চোখের পানি মুছতে মুছতে হাসিমুখে কবরস্থান ত্যাগ করছে আর বলছে,

'আমার এত চিন্তার কী আছে? নবীজির হাদিস মিথ্যা হতেই পারে না। সূরা মুলকই আব্বুকে এখন রক্ষা করবে। সূরা মুলক যার সঙ্গী, কবরজীবন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা ঈমানবিরোধী কাজ। আল্লাহ চাইলে সূরা মুলক পড়া ব্যক্তিকেও আজাব দিতে পারেন। তবে আল্লাহ তাআলা রহিম, রহমান—এটাই বড় আশা জাগায়'।

২০. প্রতীক্ষা

রমাদানে রোজা রেখে কেউ অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে, পরের খেলার, সিরিয়ালের পরের পর্বের। আর কেউ ব্যাকুল উন্মুখ হয়ে প্রহর গোনে, পরের 'পারার'। পরের সূরার। পরের তারাবীহের। পরের রোজার। আল্লাহ তাআলার প্রশ্ন,

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

দুজনের দৃষ্টান্ত কি সমান?

প্রশ্নটা একবার নয়, দুই প্রসঙ্গে দুইবার করেছেন আল্লাহ তাআলা। আগ্রহ থাকলে 'মুসহাফ' খুলে দেখে নিতে পারি। ক. হুদ : ২৪। খ. যুমার : ২৯।

২১. তাসবিহ

নামাজের পর তিন তাসবিহ পড়তে গিয়ে মনে হলো, আমি আর পুরো বিশ্ব একই কাজে মশগুল। রাব্বে কারিম বলেছেন,

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সাত আসমান ও জমিন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাসবিহ পাঠ করে।

এখানেই শেষ নয়, আরো তাকিদ দিয়ে বলেছেন,

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

এমন কোনও জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করে না (ইসরা : ৪৪)।

আমি সুবহানাল্লাহ বলছি। আমার আশেপাশের প্রতিটি বস্তুও সুবহানাল্লাহ বলছে। গাছ সুবহানাল্লাহ বলছে। পাখি সুবহানাল্লাহ বলছে। জানলার ওপাশে কালো দাঁড়কাকটি সুবহানাল্লাহ বলছে। জানলা দিয়ে দেখা যাওয়া ছোট্ট চড়ুইটি সুবহানাল্লাহ বলছে। আমার সমস্যা হলো,

وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝতে পার না।

রাব্বে কারিম আয়াতটা শেষ করেছেন,

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

বস্তুত তিনি পরম সহিষ্ণু ও অতি ক্ষমাশীল।

শেষে এসে ক্ষমা ও সহনশীলতার কেন বললেন?

এ ছাড়া আর কী বলবেন? আমার কি উচিত ছিল না, সুযোগ পেলেই একবার তাসবিহ পাঠ করে নেওয়া? একবার সুবহানাল্লাহ বলে নেওয়া? আমার আশেপাশের প্রতিটি বস্তু অনবরত সুবহানাল্লাহ বলে যাচ্ছে, আর আমি অহেতুক অর্থহীন প্রশ্নফাঁস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করছি? আমার এতসব অপরাধের তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াই কি প্রমাণ করে না তিনি 'হালিম' ও গাফুর?

আচ্ছা, সুবহানাল্লাহ মানে কী?

আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি মানে?

আপনি সমস্ত অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত।

শুধু এই, আর কিছু নেই?

জি, আরও আছে। এ তো গেল ইতিবাচক দিক।

নেতিবাচক দিকও আছে।

আমি আপনাকে পরিপূর্ণ পবিত্র মনে করছি।

তার মানে আপনি ছাড়া আর কেউ পরিপূর্ণ পবিত্র নেই।

আপনি ছাড়া আর কেউ নিখুঁত নেই।

আপনার আইন ছাড়া আর কারও আইন দোষমুক্ত নেই।

আপনার কালাম ছাড়া আর কারও কালাম নিদাগ নেই।

আপনার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া অন্য কোনও কালাম-আইন-বিধানকে আমি পবিত্র মনে করি না। মানবরচিত আইন-বিধানকে আমি মানার উপযুক্ত মনে করি না।

আমার তাসবিহ বা সুবহানাল্লাহ কি এসব ধারণ করে?

নাকি শুধু বিড়বিড় করে আওড়ানো আর তাসবিহের দানা ঘোরাই সার হয়?

২২. মৌমাছি ও মৌয়াল

মধুর চাক ভাঙতে দেখার অভিজ্ঞতা আছে? মৌমাছিগুলো কেমন করে জটলা পাকিয়ে মধুর চাকের সাথে এঁটে থাকে। মৌয়াল চাক ভাঙতে গেলে, বারবার মৌমাছিকে সরিয়ে দেয়। মৌমাছিগুলো আবার এসে চাকের উপর হামলে পড়ে। কিছুতেই চাকের কাছছাড়া হতে চায় না। ধোঁয়া দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, আগুনের তাপ দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়, তবুও মৌমাছিরা ফিরে ফিরে আসে।

দৃশ্যটা দেখে, চট করে কুরআন কারিমের কথা মনে পড়ল। আমি কি মৌমাছি হতে পেরেছি? রাব্বে কারিম কুরআনে মৌমাছি (نَحْل)-র কথা বলেছেন। আমি কুরআনের প্রতি এভাবে মৌমাছির মতো অবিচলভাবে লেগে থাকি? কুরআন কারিম কি আমার জন্যে মৌচাক নয়? কুরআনের মতো এমন (عَسَل مُصَفًّى) পরিশোধিত মধু আর কিছু হতে পারে? মৌমাছি সম্পর্কে রাব্বে কারিম বলেছেন,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয় (নাহল : ৬৯)।

আমি কুরআনকে মৌমাছি মনে করতে পারি। কুরআন থেকে কত রকমের উপদেশ বের হয়। কত ধরনের শিক্ষা বের হয়। আমি নিজেও মৌমাছি হতে পারি। কুরআনি মধু আহরণ করে, আমি কতকিছুর মালিক বনে যেতে পারি। কুরআনের ছোঁয়ায় আমার মধ্যে হীরে-জহরত জমা হতে পারে। মধু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

মধুতে আছে মানুষের জন্যে শেফা (আরোগ্য)-নাহল ৬৯

আর কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, (شِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ) অন্তরের রোগব্যাধির উপশম (ইউনুস : ৫৭)।

আমি মৌমাছি হব। আমি কুরআনের মৌয়াল হব। আমি মৌমাছির মতো কুরআনকে ঘিরে থাকব। আমি সব সময় কুরআনি মধু আহরণে মশগুল থাকব। পৃথিবীর কোনও শক্তিই আমাকে কুরআন থেকে আলগা করতে পারবে না। দুষ্টচক্র যতই আমাকে মৌচাক থেকে দূরে সরাতে চাক, আমি আরও দৃঢ়ভাবে এঁটে থাকব। রাব্বে কারিমই একমাত্র তাওফিকদাতা।

২৩. হুসনে যন্ন

আল্লাহ তাআলার প্রতি হুসনে যন্ন বা সুধারণা রাখা, ঈমানের অপরিহার্য শাখা। আমি দুআ করলে, আল্লাহ তা কবুল করবেন। তিনি বলেছেন, (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

দুআ কবুল হতে দেরি হলেও, অবশ্যই কবুল হবে, এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে, ক্ষান্ত না হয়ে, নিয়মিত দুআ করে যাওয়াও, আল্লাহর প্রতি হুসনে যন্নের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ কবুল করবেন না, এই বদযন্ন (কুধারণা) করে, দুআ বন্ধ করে দেওয়া ঈমানবিরোধী কাজ। কুরআনবিরোধী চিন্তা।

২৪. বক্রতা

কুরআন কারিমে অন্তরের বক্রতা (زَيْغٌ)-এর নিন্দা করা হয়েছে। যাইগ বা বক্রতার নানা রূপ আছে। অনেক সময় দেখা যায়, অভিজ্ঞ মানুষ, হয়তো আলিমও, কিন্তু এমন চিন্তা গ্রহণ করেছেন, যা বাহ্যিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ খুঁজলে দেখা যায়, তিনি ভ্রান্ত চিন্তাটাকে (সাময়িক) কৌশল হিশেবে গ্রহণ করেছেন। চিন্তাটাকে ভালোবেসে বা চিন্তাটার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে নয়, চিন্তাটা গ্রহণ করেছেন তার বিরোধীদের দমন করার জন্যে। এ ধরনের লোকেরা চলার গতিতে সময়মতো লাগাম পরাতে না পারলে, ঈমান-আমলের অবস্থার দিনদিন অবনতি ঘটতে থাকে।

২৫. নকল ও আকল

আজকালের ফিতনা অনেকটা প্রথম যুগের কুরাইশের ফিতনার মতোই। বর্তমানে নানা চটকদার নানা বিষাক্ত চিন্তা (أفكار) দ্বারা সহজেই সরলমনা মুসলিমরা ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমনটা কুরাইশরা সুন্দর সুন্দর পাথর (أحجار) দেখলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত।

কুরাইশরা আল্লাহর কালাম (نقل) অনুসরণ না করে আকল (عقل)-এর খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য দিত। এক সাহাবির বক্তব্য ছিল এমন,

'আমরা পাথরপূজা করতাম। রাস্তাঘাটে পথচলতে গিয়ে আগেরটার চেয়ে সুন্দর পাথর পেলে, ঘরেরটা ছুড়ে ফেলে দিতাম। নতুনটা ঘরে তুলতাম'। এখনো, কিছু মুসলিম কুরআন-সুন্নাহ (نقل) বাদ দিয়ে নিজের (عقل) আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। তাদের পরিণতিও ঠিক মক্কার মুশরিক কুরাইশদের মতোই হয়।

২৬. নামিমা

ভুলে, মুখ ফস্কে কখনো নেককারের মুখ দিয়েও গীবত বের হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নেককারের মুখ দিয়ে ভুলে বা মুখ ফস্কেও 'নামিমা'(نَمِيمة) বের হতে পারে না। অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানোকে নামিমা বলে। অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো নেককারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তবে জালিম শাসকের জুলুমের কথা তুলে ধরা, গীবত বা নামিমা কোনওটাই নয়। ধর্মহীন শাসকের অসার নীতির কথা প্রকাশ করাও গীবত বা নামিমা হতে পারে না।

২৭. পাকড়াও

হকের বিরুদ্ধে লড়াইরত কাফিররা নিজেদের সুরক্ষায় নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কয়েক স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, সুরক্ষিত দুর্গে (بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ) অবস্থান করলেও মৃত্যু এসে ধরবে। আর হকের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের পরিণতি দিনদিন আরও বেশি কঠিন, অনেক বেশি তিক্ত (أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ) হতে থাকবে।

২৮. তাওবা কবুল

মানুষটার চেহারায় মলিনতার ছাপ। শায়খের দরবারে এসেছে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

'হযরত! আমি অনেক গুনাহ করেছি, আল্লাহ তাআলা কি আমার তাওবা কবুল করবেন'?

আল্লাহ তাআলা যেখানে মুদবিরীন (مدبرين) 'পৃষ্ঠপ্রদর্শনাকারীকে' তার দিকে অনবরত ডাকতে থাকেন, সেখানে তোমার মতো অনুতপ্ত মুকবিলীন (مقبلين) 'আগ্রহের সাথে আগমনকারীকে' বুঝি ফিরিয়ে দেবেন? তার আন্তরিক তাওবা কবুল না করে ফেরত দেবেন?

২৯. মুত্তাকি

মুত্তাকি মানে? যিনি আল্লাহকে ভয় করে, গুনাহ এড়িয়ে চলেন। মুত্তাকির অন্যতম আলামত হলো, তিনি ভোরে (الْأَسْحَارِ) উঠে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা (يَسْتَغْفِرُونَ) করেন। রাতের শেষ অংশটা এত গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মানিত কেন? কারণ এই অংশে রাব্বে কারিম প্রথম আসমানে নুযুল করেন। বান্দার উচিত এই সময় বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। আল্লাহর কাছে মাগফিরাত (ক্ষমা) চাওয়া। গুনাহের জন্যে মাফি চাওয়া। কয়েকদিন গোসল করতে না পারলে, শরীরে ময়লা জমলে, ভালো করে গোসল করার পর, কেমন অনুভূতি হয়? শরীরটা ফুরফুরে আর ঝরঝরে লাগে না? বেশি বেশি ইস্তেগফার করে গুনাহ মাফ করিয়ে নিলেও, কলবে এমন প্রশান্তি আসে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে বরকত আসে।

৩০. হারাম ভক্ষণ

হারাম খেতে নিষেধ করা হয়েছে কুরআনে। কিন্তু হারাম সম্পর্কেই যদি না জানি, তাহলে বেঁচে থাকব কি করে? রোজা রেখেছেন। কুলি করার সময় কী সতর্কতা! যাতে এক ফোঁটা পানিও গলা দিয়ে নেমে না যায়। রোজা ভেঙে যাবে যে? ফরজ রোজা ভাঙা হারাম। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি, বোনের মিরাস দেন নি। অন্যায়ভাবে রেখে দেওয়া, বোনের মিরাসযুক্ত হারাম সম্পদ দিয়েই সাহরি খেয়ে এসেছেন। প্রতিবেশীর এক গজ জমি নিজের জমির সাথে মিলিয়ে নেওয়া খেতের হারাম ধানের চালের সাহরি খেয়ে ওজু করতে বসেছেন।

৩১. পরীক্ষা

আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর ইবতিলা (ابتلاء) বা পরীক্ষা আসে। এই ইবতিলা কি বান্দার শারীরিক শক্তি যাচাইয়ের জন্যে আসে? জি না। আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসে বান্দার ইস্তেআনত (استعانة) বা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার শক্তি যাচাইয়ের জন্যে। বান্দা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে, কতটুকু আল্লাহর প্রতি রুজু হতে পারে, সে শক্তি যাচাইয়ের জন্যে। বিপদের মুহূর্তে, বান্দা কতটুকু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারে, সেটা যাচাইয়ের জন্যে। আমি বিপদে পড়ে, হা-হুতাশ বেশি করি নাকি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ বেশি করি?

৩২. ফিরিশতা মানব

আমরা ফিরিশতা (مَلَكٌ) নই, তবে শ্রেষ্ঠতম জাতি (خَيْرَ أُمَّةٍ)। আমাদের কাজ-কারবারও শ্রেষ্ঠতম জাতির মতো হওয়া চাই। আমরা ফিরিশতার মতো নিষ্পাপ নই, তবে কাজেকর্মে অবশ্যই ফিরিশতার চেয়ে সেরা হওয়ার যোগ্যতা রাখি।

৩৩. নিয়ামত

আম্মু আব্বু অনেক বড় নিয়ামত। তারপর মুত্তাকি ও ইলমদার উস্তাদও অনেক বড় নিয়ামত। উস্তাদের সাহচর্য মানুষকে কী থেকে কী বানিয়ে দিতে পারে, সাহাবায়ে কেরাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করো। এই ভাবটা পুরো কুরআন কারিমে পাঁচবার আছে। মা-বাবা আমার জন্যে জীবন্ত জান্নাত। অনেক পরিবারে মা-বাবা পালাবদল করে, একবার এক সন্তানের বাড়িতে থাকেন। যার পালা আসে, সে মূলত মা-বাবাকে পায় না, পায় জান্নাতকে। তার পালা আসা মানে, নিছক দায়িত্ব পালনই নয়, বরং অন্য ভাই-বোনদের সাথে জান্নাতের প্রতিযোগিতায় নামা।

৩৪. নাসূহা তাওবা

খাসদিলে তাওবা করলে, আল্লাহ তাওবা কবুল করে নেন। তবে তাওবাটা 'নাসূহা' (বিশুদ্ধ) হয়েছে কি না, সেটা যাচাই করার জন্যে আল্লাহ বান্দার সামনে গুনাহকে সহজ করে দেন। বান্দা গুনাহের ফাঁদে পা দেয় কি না, পরীক্ষার করেন। তাই তাওবা করার পর, সতর্ক থাকা কাম্য।

৩৫. চাঁদ

চাঁদ আল্লাহ তাআলার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

কুরআন কারিমে চাঁদ বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ক. কামার (قَمَرٌ)। শব্দটা ২৭ বার আছে পুরো কুরআন কারিমে।
খ. হিলাল (هِلَال)। নতুন চাঁদ। কুরআনে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে (الْأَهِلَّةِ)।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চাঁদ দেখতে পারার সৌভাগ্য কজনের কপালে জোটে? চাঁদ দেখা কি শুধু কবিদের কাজ? একজন মুমিনও চাঁদ দেখতে পারে। ইবাদতের নিয়তে। চাঁদকে আল্লাহ তাআলা আয়াত বা নিদর্শন বলেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিদর্শনাবলি নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা 'জিকির'। জিকিরই ইবাদত।

জানলা দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ বলে বোঝাবার মতো নয়। আল্লাহর অপূর্ব এক 'ঝলসানো রুটি' নিয়ে ভাবা শিক্ষণীয় ইবাদত। এই ইবাদতই প্রতিনিয়ত করার সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা কাউকে কাউকে দিয়েছেন।

৩৬. শেষরাত

রাতের শেষভাগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মুমিনের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকা উচিত রাতের শেষভাগে জেগে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর। একান্তই যদি জেগে উঠে সালাতে দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, শুয়ে শুয়ে অন্তত একবার 'ইস্তেগফার' করাও কি সম্ভব নয়? মুত্তাকির একটা বৈশিষ্ট্য এটাও যে, শেষরাতে ইস্তেগফার করবে। আধো ঘুম আধো জাগরণেও কি একবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতে পারব না? কোনও রকমে? চোখ বন্ধ করেই? আস্তাগফিরুল্লাহ? শুয়ে শুয়েই অন্তত একটি দুআ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাব্বে কারিমের দরবারে একটি 'আবেদন' করাও কি কঠিন? আরামের ঘুমও হলো, মুত্তাকির তালিকায় নামও উঠল? সহজ নয় কি?

৩৭. সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে (أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) সৃষ্টি করেছেন। আবার একসময় মানুষকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থায় (أَسْفَلَ سَافِلِينَ) পৌঁছে দেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, ইবাদতের (لِيَعْبُدُونِ) জন্যে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজকর্মে চতুষ্পদ জন্তুর (أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ) মতো হয়ে যায়। কেউ কেউ আগে বেড়ে আরও বেশি (أَضَلُّ) বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

৩৮. মোহরানা

মোহরানা দিতে হবে 'খুশি মনে'। মোহরানা কীভাবে পরিশোধ করবে? কুরআন কারিমে (نِحْلَةً) বলা হয়েছে। মোহরানা পরিশোধের সময় মনের মধ্যে কোনও রকমের কষ্টই রাখা যাবে না। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতায় মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এখন যে পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণ করা হয়, পরিশোধ করা তো দূরের কথা, মোহরানা নির্ধারণ করার সময়ই মন কষাকষি হয়। যে বিয়ে শুরু হয় কুরআনবিরোধী মানসিকতা নিয়ে তাতে বরকত থাকতে পারে না। মোহরানা কেন বেশি নির্ধারণ করা হয়? অন্যতম প্রধান কারণ থাকে, টাকার ভয়ে হলেও যাতে ছেলেপক্ষ বিয়ে না ভাঙে, স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে। যে বিয়ে শুরুতেই ভাঙার আশঙ্কা দিয়ে শুরু হয়, তাতে বরকত আসবে কি করে?

৩৯. উপশম

কুরআন কারিম আমাদের রোগ এবং উপশম দুটোই নির্ণয় করে দিয়েছে।

রোগ হলো: গুনাহ।

উপশম: ইস্তেগফার।

৪০. খিনজির

কুরআন কারিমে সুনির্দিষ্ট জাতিবাচক নাম ধরে কোনও প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়নি। শূকর (خِنْزِيْر) অদ্ভুত ব্যতিক্রম। একমাত্র শূকরের নাম ধরেই তার গোশত হারাম করা হয়েছে। অথচ আরবে তখন শূকর খুব একটা পরিচিতও ছিল না। যেটা হাতের কাছে নেই, তেমন পরিচিতও নয়, এমন একটা প্রাণীর মাংস হারাম ঘোষণা করা, বিস্ময়কর ছিল না?

কুরআন কোনও স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সীমাবদ্ধ কিতাব নয়। কুরআন সব সময়ের। কুরআন সব স্থানের। কুরআন সব জাতির। চৌদ্দশত বছর পর এসে বুঝতে পারছি, কুরআন কারিম সেদিন কেন শূকরের গোশত হারাম করেছে। আজ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত গোশতগুলোর মধ্যে শূকরের গোশত শীর্ষে। কুরআন কারিম বিশ্বজনীন কিতাব। কুরআন কারিম সর্বজনীন কিতাব।

৪১. জান্নাতি হুর

অনেকেই মনে করি, জান্নাতে 'হুরগণ' রূপেগুণে অতুলনীয়া হবেন। এই জানায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু একটা জায়গায় কারো কারো ভুল হয়ে যায়, মনে করি, জান্নাতি হুরগণই জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নারী হবেন। এটা ঠিক নয়।

দুনিয়ার নারীরা জান্নাতে যাওয়ার পর তাদের অবস্থাই বদলে যাবে। জান্নাতে দুনিয়ার নারীগণ জান্নাতি হুরের চেয়ে রূপেগুণে মর্যাদায় সব দিক দিয়ে বহু বহু গুণ এগিয়ে থাকবেন। ইমাম কুরতুবি সুন্দর করে বিষয়টা তুলে ধরেছেন।

পাশাপাশি এ-বিষয়টাও মাথায় রাখা জরুরি, আমি যার সাথে ঘর করছি, তিনি যদি দ্বীনদার হন, তাহলে আমি দুনিয়াতেই জান্নাতি বিবির সাথে ঘর করছি। দুনিয়ার বিবি জান্নাতেও আমার বিবি হবেন। জান্নাতে তিনি হুরের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদাবান হবেন। দুনিয়াতে থাকতেই আমি আমার জীবনসঙ্গীকে জান্নাতি মর্যাদায় গুরুত্ব দেয়া শুরু করতে পারি।

৪২. শ্রেষ্ঠ উম্মত

কুরআন কারিম বলছে, আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত (خير أمة)। তাহলে আমাদের সবকিছুই শ্রেষ্ঠ হবে। আমাদের ইতিহাস, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র (খিলাফা), সবই শ্রেষ্ঠ। যদি আমরা কুরআনি 'উম্মাহ' হতে পারি, তবেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারব।

৪৩. এক কুরআন

মক্তব থেকে শুরু করে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার শেষ পর্যন্ত সবাই কত সুন্দর করে দলবদ্ধভাবে কুরআন কারিম তেলাওয়াত করে। তাফসির পড়ে। যেন তারা (كَأَنَّهُم

(بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ) সীসাঢালা প্রাচীর। এ-বাঁধন কখনো যাবে না টুটে। আজীবন সবাই এক ও নেক হয়ে থাকবে। এক দেহে, এক মনে এক ধ্যানে, এক পানে, এক মানে।

কিন্তু পাঠশেষে হয় তার উল্টো। পড়ালেখা শেষ করার পর থেকেই একেকজনের চিন্তা একেক দিকে মোড় নেয়। কেউ মনে করে রাজনীতিই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কেউ মনে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনই ইসলামের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার মোক্ষম উপায়। কেউ মনে করে আত্মিক শুদ্ধি অর্জনই ইসলামের পুনর্জাগরণের পূর্বশর্ত। অথচ কুরআন কারিম সেই একটাই। সবাই এক কুরআন কারিম থেকে চিন্তা আহরণ করে। তারপরও মত ও পথ ভিন্ন হয়ে যায়। ভিন্নতা থাকবে, বিভিন্ন মত ও পথের কোনওটাই একটা আরেকটার বিরোধী নয়। সবগুলোই একে অপরের পরিপূরক। তারপরও কেন যেন যে যারটা নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। আলাদা হয়ে পড়ে।

৪৪. পানাহার

কুরআন কারিমে (أكل) খাওয়া, শব্দমূলটি সর্বমোট ১০৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পান করা (شرب) শব্দমূলটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩৯ বার। দুটি শব্দমূল পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে ৯ বার। অবাক করা ব্যাপার হলো, প্রত্যেকবারই 'খাওয়া' শব্দটি 'পান করা' শব্দের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেও আগে খাওয়া তার পর পান করাই স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি।

৪৫. সময়ের কসম

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বিভিন্ন সময়ের কসম খেয়েছেন।

১: (الفجر) ফজর বা প্রভাতের কসম খেয়েছেন।

২: (الضحى) দুহা বা পূর্বাহ্নের কসম খেয়েছেন।

৩: (النهار) নাহার বা দিনের কসম খেয়েছেন।

৪: (العصر) আসর মানে বিকেল বা সময়ের কসম খেয়েছেন।

৫: (الليل) লাইল বা রাতের কসম খেয়েছেন।

আমি কি এই সময়গুলোর যথাযথ সদ্ব্যবহার করছি? আল্লাহ তাআলা যে গুরুত্ব দিয়ে সময়গুলোর নাম ধরে কসম খেয়েছেন, আমি সে সময়গুলো হেলায় অবাধ্যতায় কাটিয়ে ফেলছি না তো?

৪৬. দ্বিচারিতা

এক তিউনিসিয়ানের সাথে দেখা। কা'বা চত্বরে। কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলা হলো, আপনি আপনাদের সংবিধানে বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি।

দেশের সব আইনকে বৈধ বলে বলে মানেন?

জি।

আপনি তো ঈমানহারা হয়ে গেছেন?

কীভাবে?

আপনাদের আইনে একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ কুরআনবিরোধী একটা আইন। আপনাদের সংবিধানে মদ বিক্রি করা, মদ পান করাও বৈধ। আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, সেটাকে হালাল করা সুস্পষ্ট কুফরি। আপনাদের দেশে নারীও পুরুষের মতো সমান উত্তরাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আইন পাশ করার প্রস্তুতি চলছে। এখন বলুন, আপনি আপনার সংবিধানের প্রতি আস্থা রাখলে কীভাবে মুমিন থাকেন?

তিউনিসিয়ার রাস্তায় রাস্তায় নারীদের মতো পুরুষরাও মিছিল করেছে। তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى

পুরুষের প্রাপ্য অংশ এক নারীর প্রাপ্য অংশের সমান!

তাদের এই বাক্য কুরআন কারিমের একটা আয়াতাংশের পরিবর্তিত রূপ,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান (নিসা ১১)।

এই মিছিলকারীরাই আবার জুমার নামাজ পড়তে যাবে। এরা মরলে জানাযা পড়া হবে।

৪৭. কুরআন

কুরআন কারিম আমাদের জন্যে অনেক বড় নিয়ামত। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানে।

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

নিশ্চয় এটা ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত (নামল ৭৭)।

১. কুরআন কারিম আমার জন্যে হিদায়াত (هُدًى)। কারণ, কুরআন আমাকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচায়। বিচ্যুতি থেকে বাঁচায়। পরিপূর্ণ আস্থাশীল জ্ঞান দিয়ে যাবতীয় সন্দেহ ও দ্বিধা থেকে রক্ষা করে।

২. কুরআন কারিম আমার জন্যে রহমত (وَرَحْمَةٌ)। কুরআনের সংস্পর্শে আমার কলবে প্রশান্তি লাভ হয়। আমার দ্বীনি ও দুনিয়াবি কার্যক্রম দুরস্ত হয়। জীবনের প্রতি পদে পদে আমাকে পথ দেখায়।

৩. কুরআন মুমিনদের জন্যে বিশেষ উপহার (لِّلْمُؤْمِنِينَ)। মুমিন মানে? যারা কুরআনকে খাস দিলে বিশ্বাস করে। কুরআনের যাবতীয় বিধান সানন্দে গ্রহণ করে। কুরআনের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করে ও সে অনুযায়ী আমল করে।

৪৮. প্রভুর সাড়া

আল্লাহ তাআলা মাঝেমধ্যে আমাকে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বিপদাপদের সম্মুখীন করেন। আমি যাতে বিপদে পড়ে হলেও আল্লাহর দ্বারস্থ হই। আল্লাহ অভিমুখী হই। আল্লাহর প্রতি প্রণত হই। আল্লাহ চান আমার অক্ষমতা, দুর্বলতা নিয়ে তাঁর দরবারে আর্জি পেশ করি। আমি যেন ভালো করে বুঝি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এই বিপদে আল্লাহ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তিনি ছাড়া যাওয়ার আর কোনও ঠিকানা নেই। আমি বিপদে পড়ে হলেও আল্লাহর কাছে ফিরে এলে তিনি আমার ডাকে সাড়া দেন। এমন পন্থায় বিপদ দূর করেন, যা আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি। আমার সামনে যে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে দরজা দিয়েই সমাধান বের হয়ে আসে। বান্দা অবাক হয়ে যায়, বন্ধ দরজা আবার খুলে যেতে দেখে। আল্লাহর প্রতি ইয়াকিন ও মহব্বতে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

৪৯. ইবাদত

আমরা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। আল্লাহ তাআলা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর তিনি দিয়েছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে (যারিয়াত ৫৬)।

আমার শরীরে যা যা উপাদান আছে—হৃদয়, মস্তিষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সবই আল্লাহর ইবাদতের জন্যে। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে। আমার শরীরে যা কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে।

আমার কান সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতে সহায়তা করার জন্যে। সারাদিন আমি যত কাজে কান ব্যবহার করেছি, তার কতটা আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে? কয়টা কাজের জন্যে আমি সওয়াবের আশা করতে পারি? স্বেচ্ছায় পূর্ব পরিকল্পনা

করে যেসব কাজে কান ব্যবহার করেছি, তার কয়টা আমি ইবাদতের নিয়তে করেছি?

আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে চোখ সৃষ্টি করেছেন। সারাদিন যা কিছু চোখ দিয়ে দেখি, তার কতটা ইবাদতের তালিকায় শামিল হওয়ার যোগ্য? সওয়াব পাওয়ার যোগ্য? কয়টা কাজ আমি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সওয়াব পাওয়ার জন্যে করেছি?

আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে জিহ্বা সৃষ্টি করেছেন। সারাদিনের কতবার আমি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কথা বলেছি? কয়টা কথা আমি সওয়াবের জন্যে বলেছি?

আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে পা সৃষ্টি করেছেন। সারাদিনে আমি কতবার আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পা ব্যবহার করি?

আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে দুটি হাত সৃষ্টি করেছেন। আমার হাতের কাজগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হচ্ছে তো?

আল্লাহ তাআলা আমাকে জীবন দিয়েছেন। বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েছেন। আমার সময়, আমার বিদ্যাবুদ্ধি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তো?

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ব্যবহার আল্লাহর জন্যেই হওয়া উচিত। প্রথম প্রথম না হলেও ধীরে ধীরে প্রতিটি অঙ্গের ব্যবহার আল্লাহমুখী করে নেওয়া আবশ্যক।

৫০. প্রত্যাবর্তন

আপনার রবের দিকেই আপনার প্রত্যাবর্তন (إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ) জীবনের সারাৎসার। জীবনের মূলকথা (সূরা আলাক ৮)।

৫১. আনুগত্য

যার অন্তকরণ সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করে, তার ভয়ের কিছু নেই। বাহ্যিক আমলকে যে বেশি গুরুত্ব দেয় একাকী-নির্জনে আল্লাহর ভয় ক্রিয়াশীল থাকে না, তার সামনে ভীষণ বিপদ অপেক্ষা করছে। যে-কোনও মুহূর্তে তার বাইরের আমলও নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা। কুরআন বলে, প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর আনুগত্যে বিলীন হতে।

৫২. তাহাজ্জুদ

প্রতি রাতে ঘুমের আগে ভোররাতে তাহাজ্জুদ পড়ার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে ঘুমুতে যাওয়া উচিত। ফজরে উঠতে না পারলে ঘুমুতে যাওয়ার আগে, তাহাজ্জুদ ও ফজরের ফজিলতগুলো মাথায় আনা। দুআ করা—আল্লাহ, ফজর কাজা হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আগামীকালের ফজরকে আপনার কাছে আমানত রাখছি। আপনি সময়মতো আমার আমানত আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

৫৩. মুনাফিকের আলামত

ফজর ছুটে গেলে মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা ঈমানের দাবি। স্বেচ্ছায় কোনও মুমিনের ফজর কাজা করতে পারে না। ইচ্ছাকৃত ফজর ছেড়ে দেওয়া মুনাফিকের আলামত। ঘুমুতে যাওয়ার সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে ঘুমুলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়।

৫৪. কষ্ট ও স্বস্তি

বিপদ এলেই মনে করি চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সুখস্বপ্ন তছনছ হয়ে গেছে। ওলটপালট হয়ে গেছে। এ তো জীবনের একপিঠ। ধৈর্য-সবরের সাথে সুস্থির হয়ে জীবনের আরেকপিঠ দেখলে, সহজেই বুঝতে পারব, বিপদটা আসলে একটা ফোকর। এই ফোকর গলিয়ে সূর্য হাসবে। অচিরেই। শীঘ্রই। সুখ আসতে বেশি দেরি নেই। কুরআনে বলে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।

৫৫. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

যত অন্যদের সুখ-শান্তির দিকে তাকাব, ততই আমার সুখ-শান্তি বিনষ্ট হবে। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব। আমি কি হিশেব করে দেখেছি কখনো, আমার প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের সংখ্যা কত? আমার ধারণা আছে, আমি কখনো আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত গুনে শেষ করতে পারব না? তবুও কেন অপরের সুখে ঈর্ষান্বিত হই। অন্যের ভালো দেখে চোখ টাটায়?

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

আপনি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না (তোয়াহা ১৩১)।

সমাধান সহজ। অন্যের দিকে তাকানো যাবে না। তাহলে লোভও জাগবে না।

৫৬. শুদ্ধপাঠ

কুরআন কারিমের স্বাদ-মজা কখনোই ফুরোবে না। কুরআন কারিমের সূরা-আয়াত তো বটেই, প্রতিটি হরকত ও মদ্দে পর্যন্ত আলাদা স্বাদ আছে। আলাদা রঙ আছে। আলাদা ঢঙ আছে। মদ্দযুক্ত হরফগুলো টেনে পড়ার সময় কখনো কি কল্পনা করেছি, আমি কেন টেনে পড়ছি? টেনে না পড়লে কোনও সমস্যা হবে? টেনে পড়ে আমার কোনও লাভ হচ্ছে? আমি কি এভাবে 'আঁ আঁ' করে কোনও মজা পাচ্ছি? শুধু কি সুরের মজা? নাকি আরও গভীর কিছু?

কুরআনের প্রতিটি কালিমা-শব্দই একেকটি স্বতন্ত্র ভবনের মতো। এই শব্দভবনের একটি সুদৃঢ় সুদৃশ একটি ছাদ আছে। মেঝে আছে। দরজা-জানালা আছে। উঠোন আছে। আমি কোনও একটি হরফ উচ্চারণে ভুল করার মানে আমি ঘরের কোনও একটি অংশ খুলে রেখে দিলাম। কল্পনা করে দেখি, দরজা বা জানালা বা ছাদহীন একটি ঘর কেমন লাগে? চিত্রটাই বদলে যায়।

কুরআনে দেখি (آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) আল্লাহই শ্রেষ্ঠ নাকি যাদেরকে তারা (আল্লাহর প্রভুত্বে) অংশীদার বানিয়েছে তারা? (নামল ৫৯)।

শুরুতে আছে 'আ---ল্ল-হু'। আমি যদি 'আ' বা শুরুর আলিফকে টেনে না পড়ে স্বাভাবিক 'আল্লাহ' পড়ে চলে যাই, তাহলে অর্থের কথা বাদই দিলাম, এখানে টেনে পড়ার মাঝে যে মজা-স্বাদ আর স্মার্টনেস আছে, না-টেনে পড়লে সেটা অনুভব করবো? এখানে টেনে না পড়লে, এখানে যে তাওহিদের প্রশ্ন করা হচ্ছে, সেটা বজায় থাকবে? না টেনে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহ শ্রেষ্ঠ অথবা তারা যা শিরক করে। নাউযুবিল্লাহ, পুরোই উল্টে গেল। চেষ্টা করব সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে। বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতে আছে অপূর্ব অনির্বচনীয় এক স্বাদ।

৫৭. খাস রহমত

একান্ত নির্জনে চোখ থেকে বের হওয়া অশ্রু, তিলাওয়াতে জাহান্নামের বর্ণনা পড়ে কেঁপে ওঠা, মুখের ভাষা সংযত রাখার চেষ্টা করা, এসব ছোটখাটো কোনও আমল নয়। আমার মধ্যে যদি এসব গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে আমার প্রতি আল্লাহর খাস রহমত আছে।

৫৮. চোরাদৃষ্টি

গোপনে সবার অগোচরে চোরাদৃষ্টি দিয়ে হারামের দিকে তাকানো আল্লাহর অগোচর নেই। তার কাছ থেকে কিছুই লুকানো যায় না।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

আল্লাহ জানেন চোখের অসাধুতা এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে (গাফের : ১৯)।

৫৯. দাতার বিনিময়

আমি যা-কিছুই আল্লাহর জন্যে খরচ করব, আল্লাহ তাআলা অচিরেই আমাকে তার বিনিময় দিয়ে দেবেন। আজ হোক বা কাল। আমি চাই বা না চাই। অবশ্যই এর প্রতিদান দিয়েই দেবেন। কিছুতেই আমার দান বিনষ্ট হতে দেবেন না। তিনি কিছুতেই আমাকে ভুলে যাবেন না। তিনি শ্রেষ্ঠতম রিজিকদাতা।

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা (সাবা ৩৯)।

৬০. ইনশিরাহ

ইনশিরাহ। হৃদয়ের উন্মোচন। মনোজাগতিক উদ্ভাস। আত্মিক জাগরণ। ইনশিরাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখনই তিলাওয়াত করি, থমকে যাই। এ-ধরনের দুটি আয়াত দেখি (رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى) হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন ও (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) (হে রাসুল!) আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ খুলে দিইনি?।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মাঝে কোনও সম্পর্ক চোখে পড়ে? প্রথম আয়াতে দুআ। দ্বিতীয় আয়াতে দুআ কবুলের আশ্বাস। মুমিনের প্রকৃত বন্ধু কে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ। কার সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়ে বেশি সুখপ্রাপ্তি হয়? আল্লাহর সাথে।

সত্যিকার 'উনস' বা সঙ্গসুখ একমাত্র আল্লাহর কাছেই। দুই আয়াতে অপূর্ব এক 'ইনশিরাহের' কথা বলা হয়েছে। মনোজাগতিক উত্তরণ। এর প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআনের সাথে লেগে থাকলে, আল্লাহর জিকিরে-ফিকিরে থাকলে, এই অপার্থিব ইনশিরাহ বা মনোজাগতিক উত্তরণ লাভ করা সম্ভব।

৬১. ঘৃণিত অভিযাত্রা

একটি আয়াত নিয়ে প্রায়ই ভাবি। মানুষ কেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূর সরে থাকে? মানুষ কেন কুরআনের মতো অপূর্ব এক কিতাব নাগালে পেয়েও বঞ্চিত থাকে?

وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন (তাওবা ৪৬)।

আয়াতখানা সব কথা বলে দেয়। এটাই আমাদের বঞ্চনার মূল কারণ। আল্লাহই আমাদেরকে বঞ্চিত রাখেন। আমাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ আমাদের মধ্যে আলস্য আর অক্ষমতা জাগিয়ে রাখেন। এখন আমার করণীয় কী হওয়া উচিত? আমি এখনো কুরআন থেকে দূরে সরে থাকব? অলসতার গোলামি করে নিয়মিত কুরআন নিয়ে বসা থেকে দূরে সরে থাকব?

৬২. গনিমত

সাধারণ জিহাদ থেকে অর্থসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ হয়। মুমিন সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে সেই শুরু থেকেই যুদ্ধ

ঘোষণা দিয়ে বসে আছে। সে বসে নেই, প্রতিনিয়ত কৌশল শানাচ্ছে। অন্যসব জিহাদের মতো, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলেও গনিমত লাভ হয়। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্র আছে। সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো কুরআন কারিম। এই কুরআনি যুদ্ধজয়ের গনিমত কী? অসংখ্য সওয়াব, মানসিক শক্তি, অপার্থিব প্রশান্তি ইত্যাদি।

৬৩. শোকর

শুকরিয়া ইবাদতের বিশেষ একটি মাকাম। সম্মানজনক একটি অবস্থান বা স্তর। প্রতিটি ইবাদতই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। প্রতিটি ইবাদতই একেকটি মাকাম। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই শুধু ইবাদতের মাকাম দান করেন। খালেস নিয়ত একটি মাকাম। বান্দা নিয়ত সহিহ করলে আল্লাহ তাকে আমলে সালিহের তাওফিক দান করেন। বান্দা আল্লাহর তাউফিকে শোকর, হামদ, সালাত, সাদাকাত, হিফজুল কুরআন, তিলাওয়াত, দুআ ইত্যাদি করতে পারে।

৬৪. তাওবা-ইস্তেগফার

বান্দা যখন এসব আমল তাওবা-ইস্তেগফার ছাড়াই যান্ত্রিকভাবে করতে থাকে, ইবাদতগুলো দৃশ্যত কোনও ফল বয়ে আনে না।

এসব ইবাদতের নিজস্ব কোনও শক্তি নেই। এগুলো তো (تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا) *তা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ফল দেয় (মারইয়াম ২৫)।*

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) *(এবং ফিরিশতাগণ আপনাকে বলে,) আমরা আপনার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না (মারইয়াম ৬৫)।*

ইখলাস এবং পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তেগফার ছাড়া (أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ) *তাদের কার্যাবলি যেন মরীচিকা (নূর ৩৯)।*

তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মতো, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায় (أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ) (ইবরাহিম ১৮)।

আল্লাহকে রাজিখুশি করতে হলে আমার প্রতিটি কাজের জন্যে 'ইখলাস' লাগবে। তাওবা-ইস্তেগফার লাগবে।

৬৫. অহেতুক ভয়

মানুষের জীবনে আত্মমুখিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, চ্যালেঞ্জ নিতে না চাওয়া, কারো সাথে না মেশার স্বভাব এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না। কুরআনে এ-ব্যাপারে ইশারা আছে। ফেরআউনের কাছে যেতে বললেন। মুসা উত্তরে বললেন, (رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن

(يُكَذِّبُونِ) হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে (শু'আরা ১২)।

ভয় মানুষকে অনেক কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষের সাথে মেশা, কাজে অগ্রসর হওয়া, নিজেকে পরিবর্তন করা, আরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে, ভয় মানুষকে পেছনে টেনে রাখে।

৬৬. আমলনামা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশাল এক জগৎ। এই জগতের আছে স্বতন্ত্র কিছু নিয়মকানুন। শুরুতেই নিজের লাগাম ধরে রাখতে না পারলে, বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা। সাময়িক আবেগে ভেসে গিয়ে এমন কিছু করা উচিত নয়, যা আমার দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস করে দেবে। বাকি জীবন আফসোস আর পরিতাপ করে কাটাতে হবে।

এই জগতে আমার এমন কিছু করা উচিত নয়, যা আমার আমলনামাকে কলুষিত করবে। শেষবিচারে আল্লাহর সামনে অধোবদন করে তুলবে। আমি চাইলে এই জগতকে আমার আমলনামা সমৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারি। সাধ্যমতো কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার করতে পারি। আমার লেখার পাঠক আপাতত না থাকলেও, একটি আয়াত প্রচার করেছি, একটি হাদিস প্রচার করেছি, এটা আমার আমলনামায় উঠে যাবে। ইন শা আল্লাহ।

৬৭. ইয়া রাব্বি

ইবলিস শয়তানও ভালো করে জানে, কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়। এবং তার দুআ আল্লাহ কবুলও করেছেন। আমি মুমিন বান্দা হয়ে কেন আল্লাহর কাছ থেকে দুআ কবুল করিয়ে নিতে পারছি না? কী ছিল ইবলিসের সেই দুআ?

رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত (জীবিত থাকার) সুযোগ দিন, যখন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে (হিজর ৩৬)।

ইবলিস দুআর শুরুতে আল্লাহকে 'রব্ব' বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহর কাছে তাঁর পবিত্র 'রব্ব' গুণবাচক নামটি অত্যন্ত প্রিয়। একথা ইবলিসের জানা ছিল। তাই সে দুআয় আল্লাহর 'রুবুবিয়্যাত'-কে উসিলা বানিয়েছে। একজন স্বীকৃত অভিশপ্ত রহমতবিতাড়িত ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রিয় বিষয়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে পারে, আমি কী করছি? আর যে-কোনও দুআয় একটু পরপর 'ইয়া রাব্বি' বা শুধু 'রাব্বি' বা রাব্বানা বলা সালাফের সুন্নাহ। কুরআনি সুন্নাহও বটে। কুরআন কারিমের প্রায় সব দুআই 'রাব্বি' বা রাব্বানা

দিয়ে শুরু হয়েছে। নবীজির দুআগুলোও এমন। সাহাবায়ে কেরামের দুআও। ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি!

৬৮. অনাকাঙ্ক্ষিত ফল

বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ভীষণ অস্থির। ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা। কী হয়েছে আপনাকে এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন? আল্লাহর কালামের একটি আয়াতের কথা ভেবে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। কোন আয়াত?

وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি (যুমার ৪৭)।

আমার ভয় হচ্ছে, আমার সামনেও যদি অপ্রত্যাশিত কোনও কিছু প্রকাশ পায়?

৬৯. তাসবিহ

কন্যা মারা যাওয়ার পর পিতা স্বপ্নে দেখলেন। মা, আখিরাত সম্পর্কে কী জানতে পারলে? এ-এক বিশাল জগৎ। অনেক তিক্ত সত্যের মুখোমুখি হয়েছি। পৃথিবীতে আমরা জানাকে মানায় পরিণত করতাম না। এখানে এসে বুঝতে পেরেছি, একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলাও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে মূল্যবান।

৭০. আল্লাহর অনুগ্রহ

কীভাবে বুঝব আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন কি না? সাধারণ কিছু লক্ষণ আছে। লক্ষণগুলো জানা থাকলে, আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন কি না, অনায়াসেই আমি বুঝে নিতে পারব। আমি কোথাও যাচ্ছি, আমার কানে একটি আয়াতের তিলাওয়াত ভেসে এল। আয়াতখানা আমার ভাবিয়ে তুলল। দূরপাল্লার দ্রুতগামী বাসে করে গন্তব্যপানে ছুটে চলেছি, রাস্তার পাশে ওয়াজ হচ্ছে। শাঁ শাঁ করে মাহফিলের প্যান্ডেল অতিক্রম করতে করতেই কানে এল, হুজুর কুরআনের কোনও আয়াত ব্যাখ্যা করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লগইন করেছি, স্ক্রল করতে করতে চোখে পড়ল কুরআনের একটি আয়াত। যা সরাসরি আমার মধ্যে থাকা কোনও গুনাহের কথা বলছে। লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে আগে পড়া হয়নি এমন কোনও বইয়ে, অনির্দিষ্ট কোনও লাইনে চোখে পড়ল, কুরআনের কোনও আয়াত। যার বক্তব্য আমার মর্মমূলে গিয়ে বিঁধেছে। সবাই ঘুমুচ্ছে, আচানক আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেন যেন মনে হলো, তাহাজ্জুদ পড়লে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। ওজু করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অত্যন্ত দরদ দিয়ে লম্বা কেরাত, দীর্ঘ সিজদা, খুশুখুজু ইস্তেগফারময় শেষ বৈঠক আর কায়মনোবাক্যের দুআ দিয়ে সালাতপর্ব সুসম্পন্ন হলো। এসবকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হবে না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এসব হলো,

আমাকে যে আল্লাহ ভালোবাসেন, তার আলামত। তিনি আমাকে পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার সামনে পরিবর্তনের পদরেখা এঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে কল্যাণ দেখেছেন বলেই তার আয়াত শোনার অপূর্ব সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি চাইলে তো (وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ) *আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোনও কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফিক দিতেন (আনফাল ২৩)।*

৭১. দুনিয়ার চাকচিক্য

বর্তমানে বেশিরভাগ মানসিক, চারিত্রিক ও সামাজিক সমস্যার মূলে আছে একটি কুরআনি নির্দেশ অমান্য। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) *পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না (তোয়াহা ১৩১)।* মদ্দে নজর বা দৃষ্টির প্রসারণ। এটাই মূল সমস্যা। অন্যের দিকে তাকানো। বেগানা নারী বা পুরুষের দিকে তাকালে হারাম কাজের প্রবৃত্তি জাগে। অন্যের সম্পদ শক্তির দিকে তাকালে, হারাম উপার্জনের উৎসাহ জাগে। নিজের কিছুই ভালো লাগে না। নিজের বিবি/স্বামী ভালো লাগে না। নিজের ঘরদোর ভালো লাগে না। নিজের সহায়-সম্পত্তি ভালো লাগে না। আরও ভালোর চকচকে লোভ উদগ্র হয়ে ওঠে। কুরআন পৃথিবী ভ্রমণ করতে বলে। ঘুরে দেখতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার ও তার চাকচিক্যের দিকে মোহের দৃষ্টিতে তাকাতে নিষেধ করে।

৭২. ভয়াবহ কিয়ামত

ত্রিশতম পারাটা মুমিনকে ভীত সচেতন করে তোলে। এই পারায় গাইব-অদৃশ্য জগতের অসংখ্য চিত্র আঁকা হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী বহু ঘটনার কথা বলা হয়েছে। যা ঘটবেই। কিয়ামতের ভয়াবহ রূপ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই জীবন ও জগৎ সবই একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিশাল আসমান জমিন একসময় বদলে যাবে। পাহাড়-পর্বত পশমের মতো উড়তে থাকবে। চাঁদ-সুরুজ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। অসংখ্য কোটি তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়বে। আমি কি সেদিনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি?

৭৩. সিজদা

পিঠে কোনও সমস্যা নেই। পরিপূর্ণ সুস্থ-সবল। তবুও এখন আল্লাহর জন্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে না। কখন আল্লাহর জন্যে পিঠ বাঁকিয়েছে, সে নিজেও জানে না। একদিন এমন আসবে,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

যে দিন 'সাক' খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্যে ডাকা হবে, তখন তারা (সিজদা করতে) সক্ষম হবে না (কলম ৪২)।

সেদিন বান্দা চাইলেও আল্লাহ সিজদা দিতে দেবেন না। আজ আল্লাহ সিজদা করার অবাধ সুযোগ দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু বান্দা নাফরমানি করে সিজদা দিচ্ছে না। আমি এই দলে নই তো? সিজদায় মাথা ঝোঁকাচ্ছি অথচ মন ঝোঁকাচ্ছি না?

দ্রষ্টব্য : সাক মানে পায়ের গোছা। আরবি বাগধারা। কঠিন সংকট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৭৪. গুনাহের জং

'রান' মানে গুনাহের পর গুনাহ। গুনাহ দ্বারা কলব মরিচাযুক্ত হয়ে যায়। নরচে পড়তে পড়তে কলবের উপর 'রান' পড়ে যায়।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

কখনও নয়! বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে (মুতাফফিফীন ১৪)।

'রান' (জং) জমতে জমতে কলবে তালা লেগে যায়। গিলাপ পড়ে যায়। মোহর পড়ে যায়। সিল লেগে যায়। কলব একটা শক্ত আবরণীতে ঢেকে যায়। হিদায়াত ও বসিরতসম্পন্ন কলব উল্টে যায়। উপরটা নিচ হয়ে যায়। তখন অবাধ্যতা একগুঁয়েমি হঠকারিতা তাকে পেয়ে বসে। সে শয়তানের দোসর হয়ে যায়। শয়তানের কথামতো চলতে থাকে। শয়তান যেদিকে টানে সেদিকে যায়।

৭৫. আল্লাহর নিয়ামত

বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রতিটি আচরণই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা আমাকে বঞ্চিত করেও অনেক কিছু শেখান। অনেক সময় দেখা যায়, নিয়ামতে ডুবে থাকার চেয়ে ছোট্ট একটি নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রভাব অনেক বেশি। অনেক বেশি শিক্ষণীয়। প্রার্থিত কাঙ্ক্ষিত কোনও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে, মন খারাপ করব না। হতাশ হব না। নির্দিষ্ট পথে যেতে না পারলে উদ্বিগ্ন হব না। যা হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা নিয়ে হা-হুতাশ করব না। আমি কল্যাণকর মনে করলেও, তাতে হয়তো আমার জন্যে অকল্যাণই ছিল। আমি যেটাকে বিপদ মনে করছি, কালের পরিক্রমায় সেটাই হয়তো আমার জন্যে কল্যাণকর বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমার কাছ থেকে কোনও কিছু ছিনিয়ে নেন, আমাকে আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্যে। আর এটা আমার ভাষায় ছিনিয়ে নেওয়া হলেও আল্লাহর দিক থেকে এটা ছিনিয়ে নেওয়া নয়। এই ছিনিয়ে নেওয়াও এক প্রকার দান করা।

৭৬. আলহামদুলিল্লাহ

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি ইলম কীভাবে শিখেছেন? আমি যখনই নতুন কোনও মাসয়ালা শিখেছি, আল্লাহর দরবারে

শুকরিয়া আদায় করেছি। (لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) তোমরা শুকরিয়া আদায় করলে, আমি নিয়ামত বাড়িয়ে দেব। ইলম অনেক বড় নিয়ামত। যখনই কিছু শিখব, সাথে সাথে পরম কৃতজ্ঞতায় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলব।

৭৭. আল-কাফি

আল্লাহ তাআলার একটি নাম 'আল-কাফি'। তিনি সবার জন্যে যথেষ্ট। বান্দার প্রয়োজন পুরো করার জন্যে আর কারও প্রয়োজন নেই। এই নামের প্রতি শতভাগ আস্থাযুক্ত ঈমান আমার মধ্যে সৃষ্টি করবে অপরিমেয় আস্থা ও প্রশান্তি। এই নামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানের ছোঁয়ায় আমার জীবনে নেমে আসবে স্বস্তি আর সুখ। আমার মধ্যে সৃষ্টি হবে আল্লাহর সব সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ।

নিজেকে কখনো সংকীর্ণ ঘেরাটোপে আবদ্ধ, আটকা পড়তে দেখলে, নিজের আশেপাশের বন্ধুবেশী শত্রুর ছোবল থেকে বাঁচতে নিয়মিত পড়তে থাকা (اللهم اكفنيهم بما شئت) হে আল্লাহ, তাদের আপনার নিজের ইচ্ছানুযায়ী, তাদের বিরুদ্ধে আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

এই দুআখানা কায়মনোবাক্যে পড়ার পাশাপাশি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস রাখা, আমার আর কোনও ভয় নেই। আমার সব দায়দায়িত্ব আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি। আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ আমাকে ঘিরে রেখেছে। আল্লাহর অশেষ করুণা আমার দেখভাল করছে। আমি নিরাপদ। আমি আল্লাহর সীমাহীন রহমতের পক্ষপুটে আছি।

আমার অন্তরের অন্তস্তলে যখন একথা গেঁথে দেওয়া থাকবে, আল্লাহ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট, জাগতিক সমস্ত ভয়ভীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বালা-মুসিবতের পাহাড়কেও মনে হবে কিছুই না। দুনিয়ার কেউই আমাকে একবিন্দু এগিয়ে দিতে পারবে না। এক সুতো পিছিয়ে দিতে পারবে না। সারাবিশ্ব মিলেও আমাকে এক পয়সা দিতে পারবে না, গোটা বিশ্বজগৎ একজোট হয়েও আমার কাছ থেকে এক পয়সা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ

(হে রাসুল!) আল্লাহ কি তার বান্দার জন্যে যথেষ্ট নয়? তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায় (যুমার ৩৬)।

আমার আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমার সামনে সব দরজা বন্ধ। চারদিক থেকে শুধু হুমকি আর ধমকি আসছে। আমার সমস্ত আশা-ভরসায় পানি ঢেলে দিচ্ছে। চারপাশের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কোনও সমস্যা নেই। আমার আল্লাহই আমার

জন্যে যথেষ্ট। আমার সাথে যখন আল্লাহ আছেন, আমার আর পরোয়া কীসের? আমার চিন্তা কীসের?

তারা আমাকে ভয় দেখায় (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ)। তারা আমাকে যাদের ভয় দেখায়, তারা নিজেরাই তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা যদি প্রবল দাপটের অধিকারী হয়, বিপুল পরাশক্তির অধিকারী হয়, তারা যদি দশদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেও, তবুও আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে যে কল্যাণ লিখে রেখেছেন, তা আমার কাছে পৌঁছবেই। তারা যতই ক্ষতি করার চেষ্টা করুক, আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে তারা আমার কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না।

৭৮. প্রশ্ন ও উত্তর

সূরা আনকাবূতের প্রথম আর শেষে অদ্ভুত সাযুজ্য দেখা যায়। এ-অনেকটা প্রশ্নোত্তরের মতো। শুরুতে প্রশ্ন দিয়েছেন। শেষে গিয়ে উত্তরও বাতলে দিয়েছেন।

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ

মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।

আর শেষে আছে,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।

এমনি এমনি পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাস্তায় মেহনত-মুজাহাদা করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে পরীক্ষা করবেন সত্য, কিন্তু চেষ্টা মুজাহাদা করলে তিনি হিদায়াতের গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন। পরীক্ষার কথা শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই।

৭৯. কৃতজ্ঞতা

রাব্বে কারিম বলেছেন, শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ বান্দার নিয়ামত বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা স্বতন্ত্র ইবাদত। শুকরিয়া অনেক বড় ইবাদত। পরম কৃতজ্ঞতার সাথে একবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা যেমন শোকর। তেমনিভাবে অন্তরে অন্তরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ গদগদ থাকাও শোকর। শোকর দুইভাবে আদায় করা যায়,

ক. অন্তরের আচরণের মাধ্যমে।

খ. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উচ্চারণের মাধ্যমে।

আলহামদুলিল্লাহ।

৮০. শোকরের নিয়ামত

১. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ইবাদত। আমাকে আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামতের জন্যে শুকরিয়া আদায় করতে পারাও একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত। তা ছাড়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে বাড়তি দুটি নিয়ামত লাভ হলো,

ক. বর্তমানে যে নিয়ামত আছে, তাতে স্থায়িত্ব আসে।

খ. বর্তমানে মালিকানায় থাকা অল্প বা বেশি নিয়ামতে বরকত আসে।

২. আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরি করলে পরিণতিতে দুটি শাস্তি আসে,

ক. আল্লাহ নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন।

খ. অথবা নিয়ামত রেখে দিয়ে, নিয়ামতের বরকত ছিনিয়ে নেন।

নাউযুবিল্লাহ। আমরা আল্লাহর পানাহ চাই।

৮১. রহিমের রহমত

রাব্বে কারীমের রহমত কোথায় নেই? আকাশে-বাতাসে-পাতালে? সাগরের তলদেশে? এমন কোনও স্থান আছে, তাঁর রহমতের বেষ্টনীর বাইরে?

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তুমি সকল ক্রটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয় আমি অপরাধী (আম্বিয়া ৮৭)।

অতল সাগরের গভীরে, মাছের পেটের অন্ধকারে, নাড়িভুঁড়ির জটিল মারপ্যাঁচে আটকা পড়লেও রহমতের আশা আছে! এমন অসম্ভব স্থানেও রাব্বে কারিমের রহমত পৌঁছে!

ইউনুস আ. এমন দুর্ভেদ্য স্থানেও রহমত লাভ করেছিলেন। দয়া-করুণার প্রত্যাশা করেছিলেন। সে তুলনায় আমি তো রীতিমতো জান্নাতে আছি!

৮২. রহমতের আশা

দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করে থাকা কোনও সুযোগ বা সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেছে? যার আশায় সে কবে থেকে আশার প্রহর গুনছিলাম, তা হাতছাড়া হয়ে গেছে?

عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا

অসম্ভব কিছু নয়, আমাদের প্রতিপালক এ বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে আরও উৎকৃষ্ট বাগান দান করবেন (কালাম ৩২)।

বাগানটা ছিল তিন ভাইয়ের। দুই ভাই কৃপণ। লোভী। দান করতো না। বাগানের ফসল তারা চুপি চুপি কাটতে চেয়েছিল। মিসকিনদের কিছু না দিয়েই। আল্লাহ তাআলা আসমানি গজব নাজিল করে, বাগান পুড়িয়ে দিলেন। পরে তারা তাওবা করে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল।

আমি কেন আশাহত হব। নিরাশার দোলাচলে দোদুল্যমান থাকব! আমি যা হারিয়েছি, তার চেয়েও ভালো কিছু আল্লাহর কাছে পাব! ইনশাআল্লাহ!

৮৩. মুহসিন

একজন মানুষ দেখলে প্রথমেই তার চেহারাটা আমাদের নজরে আসে। ইউসুফ আ. জেলে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ। পুরো মিসরের নারীকূল তার জন্যে 'ফিদা'। কিন্তু তিনি আল্লাহর জন্যে ফিদা।

কারাগারের সঙ্গীরা তার সাথে থেকেছে, তার কথা শুনেছে! তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ চাপিয়ে কারাসঙ্গীদের কাছে তার চারিত্রিক সৌন্দর্যটাই মুখ্য হয়ে গিয়েছিল। রূপের মোহ কয়দিন! গুণের রেশটাই স্থায়ী হয়। সঙ্গীরা তার চেহারার প্রশংসা করেনি। সুরতের সৌন্দর্যের চেয়ে তার সিরাতের সৌন্দর্যই তাদের বেশি মুগ্ধ করেছিল:

إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

আমরা আপনাকে মুহসিন (সৎকর্মশীল-অনুগ্রহকারী-সদয় আচরণকারী) দেখছি!

আমার কোনটা আছে? সুরত বা সীরত (স্বভাব)? নাকি কোনওটাই নেই? সুরত সুন্দর করার তাওফিক আমার নেই, কিন্তু সীরত সুন্দর করার সুযোগ সব সময় আছে। এদিক দিয়ে আমি নবীর মতো গুণের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে পারি!

৮৪. ভয়ংকর দিন

কী এক আজিব ও গরিব দিন! আমার মৃত্যুর পর সবাই আকুল কেঁদে বুক ভাসিয়ে বিদায় দিয়েছে! সে-মানুষেরাই আমাকে দেখে দৌড়ে পালাবে, বিশ্বাস করা যায়?

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ

সে দিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও (আবাসা ৩৪-৩৬)।

কী এক ভয়ংকর দিন। সবাই সবকিছু ভুলে যাবে। শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কী যে হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৮৫. ভয়ংকর গুনাহ

শিরক অতি ভয়ংকর এক গুনাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয়। কুরআন কারিমেও গা-ছমছমে ভাষায় শিরকের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

অসম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় ভেঙে-চুরে পড়বে (মারইয়াম ৯০)।

এই ভয়ংকর কাণ্ড কেন ঘটবে?

أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا

যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে (মারইয়াম ৯১)।

৮৬. দুআ কবুল

আমরা জানি একটা দুআ কবুল হতে কখনো কখনো দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ইবরাহিম আ. দুআ করে গেছেন, তার বংশ থেকে যেন নবী পাঠানো হয়। সেটা কবুল হয়েছে প্রায় ২৫ শ বছর পর।

আমরা একটা কিছু তৈরি করলে, সেটার মেয়াদ কতদিন থাকে? বড়জোর দশ বা বিশ বা ত্রিশ বছর? একশো বছর? কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতের স্থায়িত্ব? তার কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে?

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

এটা সেই সময়ের কথা, যখন যুবক দলটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং (আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে) বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আপনার নিকট থেকে বিশেষ রহমত নাজিল করুন এবং আমাদের জন্যে কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন (কাহফ ১০)।

আসহাবে কাহফের যুবকেরা অসহায়। আশ্রয় নিল পর্বতকন্দরে। দুআ করলো। রাব্বে কারিম রহমত নাজিল করলেন। কত বছর ব্যাপী রহমতটা আশ্রয় দিয়েছিল? তিন শ বছরেরও বেশি।

শুধু একটা দুআ দিয়েই তিন শ বছরের জন্যে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়ে গেছে। আমিও কি চাইলে পারি না, আমার বাকি দিনগুলোকে দুআর মাধ্যমে নিরাপদ করে নিতে? রব সেই একজনই আছেন!

৮৭. আল্লাহর সাহায্য

চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, খোদ আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন:

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ

আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে (হাজ্জ ৪০)।

আমি যদি হকের ও হক দলের সাহায্যে এগিয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ তাআলাও আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। সারা বিশ্ব আমাকে ত্যাগ করলেও, সবাই আমার বিরুদ্ধে একজোট হলেও আল্লাহ আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। শর্ত হলো আমাকে আল্লাহর পথে নেমে যেতে হবে।

৮৮. আল্লাহর মর্যাদা

আমার কল্পনার পরিধি কতটুকু? আমার কল্পনায় কি আল্লাহকে ধারণ করা সম্ভব? নাউযুবিল্লাহ! অসম্ভব! শুধু আমি কেন, পৃথিবীর শুরু থেকে এ-পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়েও প্রিয় রবকে পুরোপুরি চেনা সম্ভব নয়! তার সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়:

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ

তারা (কাফিরগণ) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (আনআম ৯১)।

তাহলে আমার কাজ কী?

আমি আমার কল্পনার শেষ সীমার চেয়েও তাকে বেশি রহিম মনে করে তার রহমতের প্রত্যাশী হব!

আমি আমার কল্পনার শেষ সীমার চেয়েও তাকে বেশি অনুগ্রহকারী মনে করে তার অনুগ্রহের প্রত্যাশী হব!

আমি আমার কল্পনার শেষ সীমার চেয়েও তাকে বেশি দাতা মনে করে তার দানের প্রত্যাশী হব!

৮৯. অন্তর্যামী

মনের রাজ্যে কত কী যে ভাবি। কত কী কল্পনা করি। কেউ তো দেখছে না। মনের পর্দায় কী ভেসে উঠছে, কেউ উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছে না। ধরা পড়ার ভয় নেই। লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু বাস্তবেই কি কেউ দেখছে না।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কী আছে তা ভালো জানেন (বনী ইসরাঈল ২৫)।

পাপচিন্তা এলে কেউ না জানলেও তিনি জানবেন। তাহলে কেন তাঁর দরবারে নিজেকে মন্দলোকের তালিকাভুক্ত করবো!

বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হলে মনে আজেবাজে অমূলক চিন্তা ভিড় জমালেও তিনি জানবেন! তাহলে কেন, হতাশাকে কাছে ঘেঁষতে দেব? তিনি জানেন আমার অবস্থা! তাহলে আমি কেন মনকে মিছেমিছি ভারাক্রান্ত করছি? মনকে ভারমুক্ত রাখছি না? আমি কেন জোর করে হলেও ভালো ভালো কথা মনে ঠাঁই দিচ্ছি না?

৯০. ইতিবাচকতা

কুরআন কারিম মানুষকে আশাবাদী করে তোলে। কুরআন কারিমের সবকিছুই 'পজেটিভ'। কোনও রকমের নেতিবাচকতার স্থান এখানে নেই। দুঃখ শোক হতাশার জায়গা নেই। রাব্বে কারিম বারে বারে আশার বাণী শুনিয়েছেন:

১: (لَا يَحْزُنكَ) যেন আপনাকে দুঃখে না ফেলে (আলে ইমরান ১৭৬)।
২. (لَا هُمْ يَحْزَنُونَ) তারা দুঃখিত হবে না (বাকারা ১১২)।
৩. (لَا تَحْزَنْ) তুমি চিন্তা করো না (তাওবা ৪০)।
৪. (لَا تَحْزَنُوا) তোমরা চিন্তিত হয়ো না (আলে ইমরান ১৩৯)।

দুঃখ করে কী লাভ? দুঃখ বা শোক (الحزن) শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। মনোবলকে ভঙ্গুর করে দেয়। এজন্য রাব্বে কারিম বারবার নানা প্রসঙ্গে হুজন (শোক) করতে নিষেধ করেছেন। আমি আশাবাদী হব। আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হব। ইনশাআল্লাহ।

৯১. মৃত্যুর প্রস্তুতি

মৃত্যুর কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। নির্দিষ্ট স্থান নেই। নির্দিষ্ট পাত্র নেই। মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য। তাকদিরের ফায়সালা।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনও দুর্গেই থাক না কেন (নিসা ৭৮)।

মৃত্যুকে যখন কোনওভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়, তাহলে বুদ্ধির কাজ হলো, মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে থাকা। আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতা সব সময় জাগ্রত রাখা!

৯২. শাস্তি

কুরআন কারিম তিলাওয়াত করার সময় হয়ে ওঠে না। কুরআন কারিম নিয়ে সময় কাটাতে ইচ্ছা করে না। এটা আসলে একধরনের শাস্তি:

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

এর (অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস) থেকে এমন ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে রাখে, যে সম্পূর্ণরূপে সত্যবিমুখ (যারিয়াত ৯)।

আমার পাপের কারণে, আমার হক থেকে দূরে সরে থাকার কারণেই, নিয়মিত কুরআনের জন্যে সময় ব্যয় না করার কারণেই, আমাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়! তাওবা করে আবার জোর করে কুরআনে ফিরে না এলে শাস্তির ধারা চলতেই থাকে!

৯৩. ভয়

আমি কাকে বেশি ভয় করি? মানুষকে না আল্লাহকে? মুনাফিকদের একটা আলামত হলো,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ

তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না (নিসা ১০৮)।

নিজের সম্পর্কে ভাবতে গেলে, দেখা যায়, আমার মধ্যেও মুনাফিকের বেশ কিছু আলামত ঘাপটি মেরে আছে। আমি নিজেই আল্লাহর চেয়ে বান্দাকে বেশি ভয় পাই। ভয়াবহ অবস্থা।

৯৪. ইবাদতের সৌন্দর্য

ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। রোজার মধ্যেও দুটি সৌন্দর্য : ক. অন্তর্গত সৌন্দর্য (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ), যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয় (বাকারা ১৮৩)।

খ. বাহ্যিক সৌন্দর্য। বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা। মিথ্যা পরিহার করা। গীবত পরিহার করা।

যে রোজায় নজরের হেফাজত নেই, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা নেই, এমন রোজার বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে মিলবে কি না সন্দেহ!

৯৫. আমার চাওয়া

আমার কী প্রয়োজন? সেটা আমার জানা আছে। কোনটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে, সেটা আমার জানা নেই। তবুও আমরা নিজের চাহিদামাফিক আল্লাহ তাআলার কাছে চাই। তিনি কী করেন?

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

তোমরা যা-কিছু চেয়েছ, তিনি তার মধ্যে হতে (যা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক তা) তোমাদেরকে দান করেছেন (ইবরাহিম ৩৪)।

আমার জন্যে যা কিছু কল্যাণকর, তা আমি চাইলেই দিয়ে দেবেন।

তিনি বলেননি কিছু (بَعْض) দেবেন।

সব (كُلّ) দেবেন বলেছেন।

আমার আর আল্লাহর অনুগ্রহের মাঝে খুব বেশি ব্যবধান নেই।

ক. আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে,
খ. কবুল হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বাস পোষণ করে,
গ. মন থেকে উঠে আসা সত্যিকারের একটি 'দুআ'!

বেশি কিছু লাগবে না!

৯৬. মেমোরি

যত গোপনেই করি, সবকিছু লেখা হয়ে যাচ্ছে। ছোট বড় মাঝারি কাজ, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। গুনাহ করলেও লেখা হচ্ছে, ভালো কিছু করলেও লেখা হচ্ছে:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব কারও প্রতি কোনও জুলুম করেন না (কাহফ ৪৯)।

কী ভয়াবহ এক ব্যাপার, চট করে বোঝা মুশকিল। আলাদা করে একটু চিন্তা করে দেখলে, গা শিউরে ওঠে!

আমি যা বলছি লেখা হয়ে যাচ্ছে।

আমি যা করছি, লেখা হয়ে যাচ্ছে।

আমি লিখছি (পোস্টে, কমেন্টে, গোপনে ইনবক্সে) সবই লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন তিনি সবার সামনে আমার গোপন ইনবক্সকে উদোম করে দেবেন! স্ক্রিনশট লাগবে না। আস্ত ইনবক্সই তার কাছে থাকবে।

বড় শক্তিশালী সার্ভার। বেশি বেশি ইস্তেগফার করে আগের মেমেরিগুলো ডিলিট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯৭. পড়ো

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন:

আমাকে নবীজি (সা.) বললেন, 'পড়ো। আমাকে কুরআন কারিম পড়ে শোনাও।
ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনাকে পড়ে শোনাব? আপনার উপরে না কুরআন নাজিল হয়!
তা হয়। অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনতে আমার বেশ লাগে।

তবে আর কথা কি, আমি তিলাওয়াত শুরু করলাম। পড়ছিলাম সূরা নিসা! পড়তে পড়তে ৪১তম আয়াতে এলাম:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী) আমি আপনাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? (নিসা ৪১)।

নবীজি বললেন,

আপাতত যথেষ্ট তেলাওয়াত করেছ।

নবিজীর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

(বুখারি ৪৫৮২ - মুসলিম ৮০০)।

ঘটনাটি পড়লে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, কুরআন কারিমের সাথে নবীজির সম্পর্ক কত গভীর ছিল। তিনি কুরআনের বক্তব্যকে কতটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। কুরআন কারিম তাঁর মধ্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করতো। তিলাওয়াত শুনে তাঁর হৃদয়টা কেমন বিগলিত হতো। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনম্র হতো। কুরআনকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেন! শুধু মুখ দিয়েই তিলাওয়াত করতেন না। তাঁর মতো সর্বান্তঃকরণে কুরআন তিলাওয়াত করলে, তিলাওয়াত শুনলে, মন অন্য দিকে যেতে পারে? না, পারে না।

৯৮. বিপদ

বিপদের কি ধরন আছে? জি, আছে। ছোট বিপদ। মাঝারি বিপদ। বড় বিপদ। বিপদ থেকে উত্তরণের উপায়? আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা। যত বড় বিপদই হোক, সমস্যা নেই,

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল (হুদ ৪২)।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু বলেছেন, ঢেউগুলো ছিল পাহাড়ের মতো, তাহলে কোনও সন্দেহ নেই, বাস্তবেই উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছিল। কিন্তু এত প্রবল প্রতাপান্বিত ঢেউ নূহ আ.-এর নৌকার কোনও ক্ষতি করতে পেরেছিল? মোটেও পারেনি।

আমার উপর যত বিপদই সওয়ার হোক, রাব্বে কারিম যদি সহায় থাকেন, আর চিন্তা কি। কোনও পরোয়া নেই। তিনি বিপদ দিয়েছেন, তিনিই পার করে দেবেন।

৯৯. শ্রেষ্ঠ রক্ষক

বিপদাপদে আমরা প্রিয়জনকে কার হাওয়ালা করি? কে তাকে রক্ষা করবে? ইউসুফের ভাইয়েরা বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে:

وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

নিশ্চিত থাকুন, আমরা তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করব (ইউসুফ ৬৩)।

রাখতে পেরেছে? পারেনি। তারা রাখতে চায়ওনি। পক্ষান্তরে বাবা কী বললেন?

فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا

আল্লাহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু (ইউসুফ ৬৪)।

আল্লাহ তাআলা ঠিকই ইউসুফকে রক্ষা করেছেন। সবকিছুতে আল্লাহর কাছেই ফিরে আসা নিরাপদ। তিনি ছাড়া বাকি সব অনিরাপদ। প্রিয়জনকে তাই আল্লাহর হেফাজতেই সোপর্দ করতে অভ্যস্ত হব! বান্দা বা অন্য কিছুর নয়।

১০০. দুর্বল মানব

আমার জীবন শুরু হয়েছে দুর্বল অবস্থায়। শারীরিক তো বটেই, মানসিকও। জন্মের মুহূর্তের কোনও স্মৃতি আমার মাথায় ধারণ করা নেই। শতচেষ্টা করলেও আমি মনে করতে পারব না। এক সময় আমার এই জীবন শেষ হয়ে যাবে! কী দুর্বল আর অসহায় অবস্থা আমার!

وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

আর মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে (নিসা ২৮)।

আমি দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে।

ক. যে অতীতকে আমি আর বদলাতে পারবো না!

খ. যে ভবিষ্যৎকে আমি শত চেষ্টাতেও আঁচ করতে পারব না। কী হতে যাচ্ছে।

মাদরাসাতুল কুরআন

মেলা ও পড়া

ড. আবদুল্লাহ। একজন বইপাগল মানুষ। অভ্যেসটা পারিবারিকসূত্রেই পাওয়া। মা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি এ-বয়েসেও পড়াপড়ি নিয়ে থাকেন। বাবাও পড়তেন। বোনেরা শ্বশুরবাড়িতে গেলেও পড়াটা একেবারে ছেড়ে দেয়নি। ড. আবদুল্লাহ তার কুরআনে ফেরার কাহিনি শুনিয়েছেন,

আমাদের আরব সমাজের বিত্তশালী মহলে পড়াশোনার ব্যাপারটা খুবই দুর্বল। সে হিশেবে আমাদের পরিবার উজ্জ্বল ব্যতিক্রমই বলতে হবে। রিয়াদে প্রতিবারই বইমেলা হয়। সারা বছর আমার মন মেলার দিকেই পড়ে থাকে। কখন মেলাটা আসবে, কখন নতুন নতুন কিতাবের ঘ্রাণ শুঁকবো, হরেক রকমের কিতাব কিনব। এবারও তা-ই হলো। প্রতিদিন ভার্সিটি থেকে ফিরেই একবার মেলায় ঢু মেরে আসা চাই-ই।

আজ আমার গাড়িটা নষ্ট ছিল। প্রাইভেট ট্যাক্সিতে করেই মেলায় গেলাম। একগাদা বই কিনে প্যাভিলিয়নের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। আমি পেছনে বসতে উদ্যত হলে, চালক বিনীতভাবে আমাকে তার পাশে বসার অনুরোধ করলো। মানুষটা কালো। পোশাকাশাক ভদ্রোচিত। শাদা জুব্বা। মাথায় লাল রুমাল। আর দশজন চালকের মতোই। তার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। উঠে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কখন বাসায় ফিরব, কখন বইগুলো খুলে খুলে দুয়েক পৃষ্ঠা পড়বো, তার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। তর না সওয়াতে গাড়িতে বসেই একটা 'উপন্যাস' খুলে পড়া শুরু করে দিলাম। ড্যান ব্রাউনের। সদ্য অনুবাদ হয়েছে আরবিতে। লোকটা বেশ ভালোই রহস্য জমিয়ে তুলতে পারে। আজ রাতটা বোধ হয় ঘুম মারা যাবে। কাল ভার্সিটি নেই। ভয় কীসের। মনের সুখে পড়া যাবে।

গাড়ি চলছে। আমি বইয়ে ডুবে আছি। চালক বলে উঠলো,

খুব বই পড়েন বুঝি?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক। এ কেমন প্রশ্ন। বই না পড়লে মেলায় এলাম কেন। এতগুলো বই-ই বা কিনব কেন। তবুও বিরক্তি চেপে উত্তর দিলাম।

জি, পড়ি।

অনেক পড়েন?

ভেবেছিলাম আর প্রশ্ন করবে না। পড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে বিরক্ত লাগছিল। একজন চালকের সাথে খেজুরে আলাপ করে সময় নষ্ট করার ফুরসত কোথায়। তবুও উত্তর দিলাম।

জি, মোটামুটি পড়া হয়।

আমি বইয়ের পাতায় ডুবে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর চালক আবার বলল,

আমি 'বই' পড়ি না বললেই চলে।

কোনও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল,

কেন পড়েন না?

পড়তে ভালো লাগে না। কী পড়বো? পড়ার কিছু পেলে তো পড়ব। জীবনে কোনও বই শেষ করেছি এমন নজির নেই। একটা বই-ই জীবনে আগাগোড়া শেষ করতে পেরেছিলাম।

কোন বই?

লা তাহযান।

সেটাতে বিশেষ কী পেলেন?

বিশেষ কিছু পেয়েছি কি না জানি না। পড়তে ভালো লেগেছিল তাই পড়েছি। হাতের কাছে আর কিছু ছিলও না। বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছে। আমার এক উস্তাদ আমাকে বইটা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। বিমানে বসে বসে, গাড়িতে বসে বসে বইটা শেষ করেছি। আমার বাড়ি মৌরিতানিয়ায়। বিমান থেকে নামার পর আরও বহুদূর বাসে করে যেতে হয়। নৌকাতেও চড়তে হয়।

মানুষটাকে এতক্ষণ সাধারণ আর দশজন চালকের মতো মনে করেছিলাম। এখন মনে হলো, আমার ধারণা ভুল। কথাবার্তা, অভিব্যক্তি, চাহনি ইত্যাদিতে ফুটে উঠছে, মানুষটা সাধারণ নন। আমি জানতে চাইলাম,

না পড়লে আপনি সময় কীভাবে কাটান?

শুনে। আমি শোনার মানুষ। আমি শুনতে পছন্দ করি।

আমি ভেবেছিলাম তাকে প্রশ্ন করবো, আপনি কী শোনেন? তার আগেই আমাকে মানুষটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক প্রশ্ন করে বসলো,

আপনি তো প্রচুর বইপত্র পড়েন দেখা যাচ্ছে। পড়াশোনা নিয়ে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা। আচ্ছা বলুন তো, এসব সাধারণ বইপড়া আর কুরআন পড়ার মাঝে পার্থক্য কী? কোনও পার্থক্য অনুভব করেন কি?

প্রশ্নটা শোনার সাথে সাথেই একরাশ লজ্জা আমাকে পেয়ে বসল। গলা দিয়ে স্বর বের হতে চাইছিল না। একটা ধাক্কা এসে যেন আমাকে থামিয়ে দিতে চাইল। তবুও তোতলানো আওয়াজে বললাম,

আমি কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। তবে একদম তিলাওয়াত করি না তা নয়। কিন্তু সেটা নিয়মিত নয়। অনিয়মিত। আমি কুরআন কারিমের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারি না। তবে উভয় পাঠের মধ্যে পার্থক্য আছে। কুরআন কারিম পাঠের আজিব এক প্রভাব আছে। বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

চালক আমার কথা শুনে স্মিত হেসে মাথা নাড়লেন। এরপর আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালালেন। আমি কান খাড়া করে রাখলাম। মানুষটা আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে। হঠাৎ করে বলল,

আমি যদি একটা পার্থক্যের কথা বলি, বিরক্ত হবেন?

'কেন বিরক্ত হব। আমরা দুজন কথাই তো বলছি। মতবিনিময় করছি'।

'না তা নয়। আমার মনে একটা দ্বিধা জাগছে। কথাটা আপনার কানে ভুল অর্থ বহন করে নিয়ে যায় কি না'।

আপনি বলুন তো। আমি কিছুই ভুল বুঝবো না।

আচ্ছা, ঠিক আছে বলছি। এই যে আপনারা এতসব বইপত্র পড়েন। অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তথ্য সংগ্রহ করেন। এটা ভালো। উপকারী। তবে কথা হলো, কুরআন কারিম আর এসব বই পড়ার মাঝে যদি আমাকে পার্থক্য করতে বলা হয়, আমি বলবো,

এসব বইয়ে অনেক তথ্য-তত্ত্ব থাকে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব হলো 'জুযয়ী (الجزئي)'। আনুষঙ্গিক বিষয়। শাখা-প্রশাখাগত তথ্য। এর সবকটি জীবনে কাজে লাগে না। প্রয়োজনেও আসে না। উপকারে লাগে না। এসব বইয়ে অনেক কথা এমন থাকে, যা না জানলে জীবনের কোনও ক্ষতি হবে না। আর কুরআন?

এখানে সব কথা কুল্লি (الكلي)। মূলনীতি। সারাৎসার। জীবনের জন্যে, দুনিয়ার জন্যে, আখিরাতের জন্যে, যা কিছু প্রয়োজন, তার মৌলিক দিক-নির্দেশনাই কুরআনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার বইয়ে বলা সমস্ত 'শাখাগত তথ্য' যেসব মূলনীতি থেকে বের হয়, সেগুলো এই কুরআনে আছে। আর বইপত্রে যেসব বেদরকারী তথ্য থাকে, সেসবের মূলনীতি কুরআনে নেই। থাকার কোনও প্রয়োজনও নেই। যা জীবনে কাজে লাগে না, আখিরাতে লাগে না, কুরআন তার প্রয়োজনও বোধ করে না। কুরআনকে এজন্য নাজিলও করা হয় নি।

মানুষটা একনাগাড়ে কথা বলে চট করে চুপ হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হচ্ছিল এই বুঝি তিনি মুখ খুলবেন। শেষে আর না পেরে আমি বললাম,

আপনি বুঝি খুব কুরআন তিলাওয়াত করেন?

খুব বেশি করি তা নয়। তবে প্রতিদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার আগে দীর্ঘক্ষণ কুরআন নিয়ে থাকি। সূরা বাকারা প্রতিদিন পড়ার চেষ্টা করি। না পড়লে সারাদিন শরীরে অসুস্থ একটা ভাব লেগে থাকে। সূরা বাকারা পড়লে সারাদিন শরীরে প্রচণ্ড কর্মশক্তি পাই। ছোটবেলায় আমি যার কাছে কুরআন হিফজ করেছি, তিনি ছিলেন একজন সুদানি শায়খ। তিনিই আমাদেরকে এই অভ্যেস করিয়েছিলেন।

আমি নড়েচড়ে বসলাম। লোকটাকে রীতিমতো শ্রদ্ধাই করতে শুরু করলাম। কারো কথা শুনতে এত ভালো লাগতে পারে, ধারণা ছিল না। কারো কথায় এত প্রভাব থাকতে পারে, জানা ছিল না। নিকট অতীত হাতড়েও বের করতে পারলাম না, আমি কারো কথা এতটা মনোযোগী শ্রোতা হয়ে শুনেছি। একটা হাদিসের কথা মনে পড়লো, বক্তব্যটা বোধহয় এমন,

'সূরা বাকারা ছেড়ে দিলে অন্তরে (حسرة) পরিতাপ-অনুশোচনার ভাব সৃষ্টি করে'।

আসলেই তা-ই। সূরা বাকারার প্রভাব এমনই। আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে।

এরপর মানুষটা একনাগাড়ে বলে যেতে লাগলেন কুরআন নিয়ে তার ভালোবাসার কথা। মেহনতের কথা। তার চোখে মুখে অন্য রকম দ্যুতি চমকাচ্ছিল। তার কিছুটা ছটা আমাকেও ছুঁয়ে যাচ্ছিল। গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। তার নম্বর রেখে দিলাম। এমন মানুষকে হারানো যায় না।

ঘরে প্রবেশ করতে করতে একটা কথা ভাবছিলাম। গাড়িতে বসেই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম কথাটা মানুষটাকে বলি। কেন যেন শেষ পর্যন্ত বলা হয় নি। তিনি যখন সূরা বাকারার কথা বলছিলেন, তখন মনে পড়েছিল গতরাতের কথা। প্রতি রাতেই আমি আম্মুর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি। গল্প করি। একটা বিষয়ে আম্মুকে আমার অস্থিরতার কথা জানালাম। আম্মু ছোট্ট একটা বাক্য বলে তার কথা শুরু করেছেন। বাক্যটা ছিল,

(تركُ البقرة حسرة) বাকারা পাঠ ছেড়ে দেওয়া পরিতাপের।

আম্মু সারাদিন কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন। ফাঁকে ফাঁকে অন্য কিছু পড়েন। তবে বেশি সময় কুরআন নিয়েই কাটে। আম্মু আমাকে নিয়মিতই তাগিদ দিতেন কুরআন পাঠের জন্যে। গতকাল একটু বেশি করেই বলেছিলেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! আজ আল্লাহ তার আরেক বান্দাকে পাঠিয়ে দিলেন। হুবহু একই দীক্ষা

দিয়ে। আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো একটা শিহরণ বয়ে গেল। আমাকে কি আল্লাহ অদৃশ্য থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? আমার জীবনের গতিপথ বদলাতে চাচ্ছেন? তাই তো মনে হচ্ছে। গোপন ইশারা দিচ্ছেন। আসলেই তো। তিনিই তো বলেছেন, (هو أعلم بكم) তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

একরাতে খতম

বাংলাদেশের প্রায় সব মাদরাসাতেই বেশ আর কম কুরআন চর্চা হয়। মোমেনশাহীর একটি মাদরাসা কুরআন চর্চায় বাংলাদেশে অন্যতম। শিক্ষা-দীক্ষায়, তালিম-তারবিয়তে, আমল-আখলাকে। নিয়মে-নেজামে মাদরাসাটি অনন্য। অনেক দিনের ইচ্ছে, কিছু শেখার আশায় সেখানে যাবো। কিন্তু সময় হয়ে উঠছে না। সেখানে পড়েছে, এমন কাউকে পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিই। সেদিন একজনকে পেলাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ওখানে তালিবে ইলমরা একরাতে পুরো কুরআন কারিম খতম করতে অভ্যস্ত। আমি চমকে উঠলাম। এটা তো আমার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন।

অনেক দিনের ইচ্ছা, একরাতে কুরআন খতম করবো। কিন্তু কেন যেন পেরে উঠছি না। অথচ একসময় খতম করেছি। সেটাতে অবশ্য ভেজাল আছে। আমাদেরকে শবীনা খতম পড়তে পাঠানো হতো। একরাতে মাইকে কুরআন খতম দেওয়া। বেশ উৎসব উৎসব ব্যাপার ছিল। শবীনা খতমকে হক্কানি ওলামায়ে কেরাম অনুমোদন করেন না, কিন্তু সেকালে এটার বেশ প্রচলন ছিল। এখনো হয়তো প্রচলিত আছে।

শবীনা খতম একজন নয়, কয়েকজন মিলে করা হতো। একজন কিছুক্ষণ পড়ার পর আরেকজন এসে মাইক ধরতো। এভাবে চলতে থাকতো সারা রাত। অনেক সময় রাতে শেষ করা যেত না। সকালে দিনের আলোতেও পড়তে হতো। শুরু করতে হতো দিনে আলো থাকতে থাকতে। শবীনা খতম সব এলাকায় হয় না। যেসব এলাকায় মিলাদ-কেয়ামের প্রচলন থাকে, সাধারণত সেখানে কোথাও কোথাও হয়ে থাকে। শবীনার দাওয়াতে সবাই যেতে পারত না। যাদের হিফজের খতম শেষ হতো বা খতম শেষ হওয়ার কাছাকাছি যেত, তাদেরকেই শবীনা খতমের জন্যে নির্বাচন করা হতো। আমরাও বেশ মুখিয়ে থাকতাম। তাড়াতাড়ি হিফজের খতম শেষ করার প্রাণান্ত চেষ্টায় লেগে থাকতাম।

হিফজের সবক বিশ পারা শেষ হওয়ার পরই প্রতীক্ষার প্রহর শুরু হতো। কখন শেষ সবকটা শোনাবো। কখন শবীনায় নাম আসবে। কারণ শবীনায় গেলে ভালো খাওয়া-দাওয়া হতো। উত্তম আদর-যত্ন হতো। মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক ধরাবাঁধা জীবন থেকে কিছু সময়ের জন্যে বের হওয়া যেত। তখন জায়েজ-নাজায়েজের

বোধ অতটা পোক্ত হয়নি। মাদরাসা ছিল মিলাদ-কেয়ামবহুল এলাকায়। হুজুরগণও মিলাদি মতাদর্শের ছিলেন।

আরও একটা কারণে ছাত্ররা শবীনা পড়তে যেতে আগ্রহী হতো। ওখানে গেলে ভিন্নধর্মী কিছু দুষ্টুমি হতো। একবার আমরা শবীনা পড়তে গেলাম। মাদরাসা থেকে বের হয়েছি একটু আগে আগেই। সাথের একজনের বাড়ির কাছেই। এলাকার ছেলে। সবাই তার চেনাজানা। পড়া শুরু হলো। মাইকটা ভালো ছিল। উঠানে পাটি বিছানো আছে। আগর বাতি জ্বলছে। কিছু মানুষ বসে বসে আমাদের তেলাওয়াত শুনছেন।

ভেতরে যেনানাদের বসার জায়গা করা আছে। বেড়ার ফাঁক গলে তাদের চুড়ির টুং টাং আর কলগুঞ্জন ভেসে আসছিল। দুষ্ট মেয়েগুলোর ফিসফিসানো টিপ্পনী বাঁশের বেড়া পেরিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। গ্রামে যা হয় আরকি, ভেতরের মানুষগুলোর মধ্যে বাইরের মানুষকে উঁকি মেরে দেখার প্রতিযোগিতা-ঠেলাঠেলি। এ ছাড়া অনবরত হিহি, যাহ্, উঁ, আহ, বা রে, কচু, যা ভাগ ইত্যাদি শব্দের ফুলঝুরি তো আছেই।

আমরা বেড়ার বাইরে, 'তেনারা' ভেতরে। মাঝেমধ্যে গৃহকর্তাকে বাধ্য হয়ে উঠে গিয়ে তাদের কলগুঞ্জন থামাতে হচ্ছে। কখনো তো এমন হয়েছে, আমরা নিজেদের মধ্যে দুষ্টুমি করে কিছু বলছি, ভেতর থেকে অদেখা কেউ একজন তার উত্তর দিয়ে বসেছে। আমরা ছোট হওয়াতে তাদের সুবিধাই হতো। কত হবে, বড়জোর বারো কি তেরো বছর বয়েস? সে এক মধুর উৎপাত। দলে অবশ্য বেশ বড় ছাত্রও থাকত।

আমাদেরকে পান দেওয়া হতো। সুন্দর করে খিলি বানিয়ে। পান যদি দশটা হয়, খিলির ডিজাইন ও দশটা। এ-ভিন্ন এক শিল্প। সুপুরি কাটারও ভিন্ন ভঙ্গি ছিল। পান সাজার পিরিজের তিন কোণায় কয়েক ঢঙে কাটা সুপুরি। একধরনের খিলি পুরো পানকে বোঁটাসহ তেলের পিঠার মতো করে বানানো হতো। আমাদের আগ্রহ ছিল সে-খিলির প্রতি। কারণ, এটাতে অনেক সময় যে বানিয়েছে সে দুষ্টুমি করে, সাদা চুন দিয়ে নিজের নাম লিখে দিত। ভাগ্য ভালো (!) হলে, খিলির মধ্যে ছোট্ট কাগজের টুকরোও পাওয়া যেত। তাতে লেখা থাকতো 'ভাষা'। ছন্দ মেলানো কিছু অর্থপূর্ণ কথা। এখনো গ্রামের মেয়েদের মধ্যে এসব 'ভাষা'র প্রচলন আছে। বালিশের কভারে এখনো লালসুতোয় এলোমেলো অক্ষরে অনেক 'ভাষা' লেখা থাকে।

আমাদের তখন চলছে উনিশতম পারা। আমি তখন মাইকে। আমাদের স্থানীয় সাথী আজ একটু বেশিই ব্যস্ত। বারবার উঠে যাচ্ছে। এর ওর সাথে কথা বলছে।

গলা এলে মাইকে বসছে। তার সাথে আগেও এক জায়গায় খতমে গিয়েছি। সেদিনের তুলনায় আজ তার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক ঠেকলো। পানের খিলি আসার পর দেখি, সে সবার আগে ডানের খিলিটা উঠিয়ে নিয়েই আড়ালে চলে যাচ্ছে। সাথে সাথে ভেতর থেকে টিপ্পনীও ভেসে আসতে শুরু করে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। পরে তাকে চেপে ধরাতে স্বীকার করতে বাধ্য হলো। পানের খিলিতে তার জন্যে বিশেষ বার্তা আসে। ওটা পড়ার জন্যেই আড়ালে যাওয়া। সে আরও জানাল,

'পান কিন্তু একবারেই বেশি করে পাঠানো যায়, কিন্তু তা না করে বারবার পাঠানো হচ্ছে। তাতে 'খবর' দিতে সুবিধা।

'তোকে কয়টা চিরকুট পাঠিয়েছে এই পর্যন্ত?

'অতবেশি কোথায়, এই তো কয়েকটা মাত্র'।

'সব দেখা, নইলে মাদরাসায় গিয়ে সব ফাঁস করে দেব'।

'না ভাই, আল্লাহর দোহাই লাগে, সেটা করিস না। এই নে।'

প্রায় দশ-বারোটা চিরকুট। ইয়া আল্লাহ, এতগুলো কখন এল রে? টেরই পেলাম না? এ যে দেখি ঘনীভূত রসের আধার! একটা খুলে পড়া গেল,

'আপনি গতবার বাড়ি এসে আমাদের ঘরে এলেন না যে? আম্মা আপনার জন্যে তালের শাঁস রেখেছিলেন।

আরেকটাতে আছে,

'এবার ঈদে কিন্তু আপনি কথা রাখেন নি, আমি কথা রেখেছি, কুরআন শরিফ পড়া শুরু করেছি।'

আমরা সাথীকে ধরলাম,

'কি রে, কী কথা রাখিস নি? বল।

সে মিটিমিটি হাসে। কিছু বলে না। আমাদের জোর চাপাচাপিতেও সে টললো না। এমন ঘটনা একটা দুটো নয়। অসংখ্য। বলে শেষ করা যাবে না। আর সেই সাথীর ঘটনাও শেষ পর্যন্ত অনেকদূর গড়িয়েছিল। মোটামুটি হ্যাপী এন্ডিংও বলা যেতে পারে। তাকে তুই করে বললেও, সে ছিল আমাদের চেয়ে বয়েসে, গায়ে-গতরে অনেক এগিয়ে।

হিফজখানার হুজুর আমাদেরকে বলতেন, বড় বুজুর্গগণ একরাতে কুরআন খতম করতেন। নামাজে বা তিলাওয়াতে। আমাদের বার বার এসব ঘটনা শোনাতেন। আমরা কয়েকজন বেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম। হুজুর নিজেও রাতে নামাজে কুরআন

খতম করতেন। আমাদেরকেও উৎসাহ দিতেন। একবার প্রতিজ্ঞা করলাম। সারাদিন বেশ কষ্ট করে, ইয়াদ করলাম। তিনজন। একজন দশ পারা করে। পালাক্রমে নামাজে পড়বো। মাগরিব পড়েই শুরু করে দিলাম। মধ্যখানে ঈশার বিরতি। আবার শুরু হলো। পড়তে পড়তে পড়তে রাত তখন নিশি। ইমাম-মুক্তাদি উভয়ের চোখ ঢুলুঢুল। প্রথম প্রয়াস হিশেবে পড়াটা মন্দ এগোয়নি। ভালোই পড়েছি তিনজনে। আস্তে আস্তে গতি কমে আসছিল। আমি ছিলাম ইমাম। সিজদায় গিয়ে বেশ মনোযোগের সাথে তাসবিহ পড়ছি। পড়তে পড়তে মনোযোগ একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল।

ফজরের আজান শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি, দুই মুক্তাদি তখনো নাকডাকায় ব্যস্ত। নিদ্রাসুখের সুনিবিড় নিরাপত্তাবলয়ে। বাহুডোরে। কণ্ঠলগ্ন। অবাক হয়ে গেলাম সিজদাতেই এত লম্বা একটা সময় পার করে দিলাম? ইশ, আল্লাহর মহব্বতে এমন একটা সিজদা কবে দিতে পারবো?

আফসোসের আর সীমা রইলো না। সাফল্যের এত কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হলো। সামান্য ঘুমের কাছে হেরে গেলাম। পরদিন আবার চেষ্টা করবো, বলে সেদিনের মতো ক্ষান্ত হলাম। কিন্তু যতবারই চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি। এ-পর্যন্ত এককভাবে একরাতে কুরআন খতমের সৌভাগ্য হলো না। অথচ আমি জানি, এমন লোক আমাদের দেশে বিরল নন।

গত রামাদানেও এমন একজন 'আল্লাহওয়ালার' সন্ধান পেয়েছি। তার কাছে একবার যাব বলে ঠিক করেছি। তিনি রামাদান এলে সব কাজ ছেড়ে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়ে। দিনে-রাতে প্রায় সারাক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাকেন। প্রতিদিন এক খতম। কখনো দুই খতমও হয়ে যায়। পুরো রামাদান মাসে প্রায় পঞ্চাশ খতম।

ভাবতাম এটা আগের যুগে সম্ভব ছিল। আমাদের যুগেও যে সম্ভব, এটা কল্পনাতেও ছিল না। আসলে নিজের অলসতার দিকে তাকিয়েই এমন ধারণা করেছি। খোঁজখবর করি নি। আরও ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, আমার একান্ত আশেপাশেই আরও কত 'আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ' আছেন। তাদের অতিমানবীয় আমলও আছে।

এমন আমল কি শুধু হুজুররাই করেন? আমার এমনটাই ধারণা ছিল। ভুল ভাঙল আমার শায়খের দরবারে এক অদ্ভুত মানুষকে দেখে। তিনি প্রতি রমজানে পঞ্চাশ খতমের মতো কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিনি জেনারেল শিক্ষিত। এক আজিব মানুষ।

ইনশাআল্লাহ, একদিন হয়তো পেরে যাবো, একরাতে পুরো কুরআন কারিম খতম করতে। আশা করি সে দিন আর বেশি দূরে নয়। অন্যরা পারলে আমি পারবো না কেন? পার্থক্য শুধু এটুকু হবে যে, তারা মুখস্থ পড়েন। আমি হয়তো পুরোটা এক বসায় মুখস্থ পারবো না। কিন্তু দেখে তো পারবো। রাব্বে কারিম তাওফিক দিলে, মুখস্থও পারব। ইনশাআল্লাহ। একরাতে খতম করতে চাইলে, লেগে থাকতে হয়। প্রথম কিছুদিন খতম উঠে না। বাকি থেকে যায়। চেষ্টা চালিয়ে গেলে, একসময় সহজ হয়ে ওঠে।

তিন দিনের কমে খতম করতে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। বেশি বেশি তিলাওয়াত করতে করতে একদিনেই খতম হয়ে গেলে, দোষের কিছু নেই।

খতমের দুআ

ইউসুফ বিন আসবাত রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, কুরআন খতমের পর কী দুআ করেন? আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। কারণ, খতম করার পর ভাবতে বসি, পুরো কুরআনের কোন কোন হুকুম আমি মান্য করেছি, কোন কোন হুকুম মান্য করতে পারি নি। হিশেব করলে দেখা যায়, অনেক হুকুম আমি মান্য করছি না। এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া চাড়া আর কোনও উপায় দেখি না। কারণ না মানার পরিমাণই যে বেশি।

খতমের স্বাদ

ক. এক খতম শেষ হয়েছে, সাথে সাথে আরেক খতম শুরু করে দিয়েছেন। একটা মিষ্টি খেয়ে অতুলনীয় স্বাদে বিমোহিত হয়ে আরেকটা মুখে পুরে দেওয়ার মতো। কোনও কাজে একবার মজা পেয়ে দ্বিতীয়বার আসার মতো।

খ. খতমের পর খতম মানে? সাফল্যের পর সাফল্য। আনন্দের পর আনন্দ। উন্নতির পর উন্নতি। সমৃদ্ধির পর সমৃদ্ধি। আরোগ্যের পর আরও আরোগ্য। স্বস্তির পর আরও স্বস্তি। শান্তির পর আরও শান্তি।

গ. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার কলব, হিদায়াত ও হকের উপর অবিচল থাকবে। আমার অজান্তেই মনের অনেক সন্দেহ-প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে। অনেক না বলা ব্যথার উপশম হবে। অনেক অব্যক্ত খটকা আপনা-আপনিই উবে যাবে।

সন্তান পালন

সন্তানকে ভালো করে কীভাবে গড়ে তোলা যায়? অভিজ্ঞজনেরা সন্তানকে নেক হিশেবে গড়ে তোলার তিনটা ধাপ বলে থাকেন,

প্রথম ধাপ: অভিভাবকের সততা।

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক (কাহফ ৮২)।

পিতাকে সৎ হতে হবে। মাতাকে সৎ হতে হবে। এটা সূচনা। বিসমিল্লাতে গলদ থেকে গেলে আমীনেও গলদ থাকার সম্ভাবনা। মুসা আ. ও খিজিরের ঘটনার সেই দুই বালকের পিতা সৎ ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিশেষ রহমতের আওতায় রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় ধাপঃ সন্তানের জন্যে দুআ।

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

আমার জন্যে আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন (আহকাফ ১৫

সন্তানের জন্যে দুআটা অপরিহার্য। বলতে গেলে দুআই সন্তান প্রতিপালনের প্রধান কাজ।

তৃতীয় ধাপঃ নিজে নামাজ কায়েম করা। সন্তানকেও নামাজ কায়েমের আদেশ করা। এবং এজন্য দু'আ করা।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামাজ কায়েম করবে) ইবরাহিম ৪০।

সালাত যাবতীয় কর্মের মূলভিত। সালাত হলো স্তম্ভ। এটা ঠিক হলে, বাদবাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।

<u>আয়াতের গল্প</u>

কুরআন কারিমের আয়াতগুলোর শিক্ষা সব সময় মনে থাকে না। এ-শিক্ষাগুলো মনে রাখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় হলো,

আয়াতের সাথে 'গল্প' জুড়ে দেওয়া।

সেটা কীভাবে?

দুদিন আগে শায়খের দরবারে গেলাম। সেই 'আমি হব সকাল বেলার পাখি' হয়ে। ভোর তিনটার দিকে। ফজরের পর মোলাকাত হলো। প্রতি বছর হজরতের দুআ নিয়েই মাদরাসার কার্যক্রম শুরু করার অভ্যেস। সে সুবাদেই যাওয়া। খানকায় অনেকেই এসেছেন। বেশ কিছু তালিবে ইলমও এই সাত সকালে হাজির। একজন তালিবে ইলম বলল,

হুজুর, অমুক মাদরাসায় পরীক্ষা দিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, সাথের অনেকের চেয়ে পরীক্ষা আমি ভালোই দিয়েছি। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় নাম আসে নি। অথচ আমার চেয়ে খারাপ পরীক্ষা দেওয়া কয়েকজনের নাম এসেছে। ছেলেটার কান্নামাখা কথা শুনতে খারাপ লাগছিল। আমার হজরত তার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলে উঠলেন,

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْن

আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

তারপর হুজুর জানতে চাইলেন এর আগে কী? পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক তালিবে ইলম বলল,

وَعَسَىٰٓ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰٓ أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও খুব সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ (বাকারা ২১৬)।

ব্যস, আমি একটা পেয়ে গেলাম 'গল্পমাখা আয়াত'। বাকি জীবনে যখনই আয়াতটা সামনে পড়বে, সাথে সাথে গল্পটা মনে পড়বে। অথবা বাকি জীবনে যখনই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হব, চট করে আয়াতটা মনে পড়ে যাবে।

এই আজই, আমাদের মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে যাওয়া দুজন তালিবে ইলম মনে ভীষণ কষ্ট নিয়ে দেখা করতে এল। সান্ত্বনা পেতে। হুবহু একই ঘটনা। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করেও টেকে নি। তাদের চেয়ে খারাপ করেও সুপারিশের জোরে ভর্তি হয়ে গেছে। সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকের মতো আয়াতটা মনে পড়ল। দেরি না করে আমার শায়খের ভঙ্গিতেই আয়াতটা শুনিয়ে দিলাম। ওরা সান্ত্বনা পেল। আমি পেলাম শিক্ষা।

আমার একটা হবি হলো 'খোঁজা'। মানে আর কিছু নয়, হরদম 'খুঁজিয়া বেড়াই'

ক. আয়াতমাখা গল্প।
খ. গল্পমাখা আয়াত।

কুরআনের আদব

কুরআন কারিম সামনে রেখে অন্য কিছু করা আদব পরিপন্থি কাজ। এমনকি কুরআন সামনে রেখে কুরআন নিয়ে গল্পে মশগুল হওয়াও ঠিক নয়। কেউ একজন কুরআন কারিম তিলাওয়াত করছে, তার তিলাওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে আমি তিলাওয়াত করতে লেগে গেলাম, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা নবীজি সা.-কে একবার বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন করতে নিষেধ করেছিলেন। যখন ওহি নাজিল

হতো, ওহি শেষ হওয়ার আগেই নবীজি সা. তাড়াহুড়া করে মুখে মুখে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করতেন। পাছে আবার ভুলে যান তাই। এটা দেখে আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছেন,

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

ওহির মাধ্যমে যখন কুরআন কারিম নাজিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না (তোয়াহা ১১৪)।

কুরআন কারিম আমার পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। আমার অর্ধেক মন কুরআনে বাকিটা কারবারে, এটা কুরআনের জন্যে মানহানিকর।

ম্যাসেজ

একটি বার্তা বা মেসেজে চারটি পক্ষ থাকে।

ক. বার্তা।
খ. বার্তাপ্রেরক।
গ. বার্তাবাহক।
ঘ. বার্তাগ্রাহক।

একটি বার্তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বার্তার চারপক্ষের কোনও এক পক্ষের কারণে হতে পারে। বার্তার চারটি পক্ষই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে অথবা এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। কুরআন কারিম আল্লাহ তাআলার বার্তা (الرسالة)। চারটি দিক থেকেই কুরআন কারিম অনন্য।

১. নিশ্চয় (وَإِنَّهُ) এ কুরআন,
২. রাব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ (لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)।
৩. জিবরাঈল (الرُّوحُ الْأَمِينُ) তা নিয়ে অবতরণ করেছে।
৪. আপনার অন্তরে (হে নবী)। শু'আরা ১৯১-৯৪।

এজন্য নবীজি সা. বলেছেন: কুরআন কারিম শিক্ষাদাকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারী উভয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আমি যদি কুরআন কারিম পড়ি, কুরআন কারিমের সাথে সময় কাটাই, কুরআন কারিমের আইন বাস্তবায়নের মেহনতে শামিল হই, তাহলে আমিও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হব।

আধুনিকতা

সংশয় আর সন্দেহকে আধুনিক চিন্তায় বেশ সম্মান-সমীহের চোখে দেখা হয়। আধুনিক চিন্তার বইপত্রে প্রশ্ন আর কৌতূহলকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সব বিষয়ে প্রশ্ন তোলাকে জ্ঞান অর্জনের মূল ভিত্তি মনে করা হয়। নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন),

প্রশ্নহীনতাকে মনে করা হয় স্থবিরতা। জড়তা আর পশ্চাৎপদতা। তাদের অনেকেই মনে করে, নিশ্চিত বিশ্বাস বলে কিছু নেই। আজ যা সত্য, কাল নতুন থিউরির আবিষ্কারে তা অসত্য হয়ে যেতে পারে।

তারা বিজ্ঞানের নিত্য অনিশ্চয়তাকে ওহির নিশ্চয়তার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। তারা মনে করে, কোনও কিছুই প্রশ্নাতীত নয়। তারা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে। উত্তরটা পেলে ভালো, না পেলেও থেমে থমকে যাওয়া চলবে না। আরো নিত্য-নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে যেতে হবে। এভাবেই একসময় হয়তো চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যাবে। কিন্তু চূড়ান্ত সত্য যে পৃথিবীর শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা নবীগণের মাধ্যমে উন্মোচন করে দিয়েছেন, সেটা তারা দেখেও না দেখার ভান করে অথবা দেখেও বুঝতে পারে না। এটাকেই বলে 'মোহর মারা'।

তারা আসলে প্রশ্নের উত্তর পেতে ভয় পায়। উত্তর পেলে যে নিজেকে কিছু বাধ্যবাধকতায় আটকে ফেলতে হবে। এই আটকে যাওয়াতেই তাদের যত ভয়। উন্মুক্ত প্রশ্নের প্রধান উপকারিতা হলো, কোনও কিছু মানার ঝামেলা নেই। ইচ্ছামতো চলার স্বাধীনতা থাকে।

সংশয়বাদীরা নয়, আল্লাহর কিতাবই হলো আমাদের আদর্শ। এ-কিতাব আমাদেরকে সংশয়হীন দৃঢ় বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ প্রদত্ত সুনিশ্চিত জ্ঞানের প্রতি আস্থা রাখতে উৎসাহ জোগায়। অহেতুক প্রশ্ন করে অযথা কালক্ষেপণ করতে নিষেধ করে। তারা অসার দাবি করে, প্রশ্নের উর্ধ্বে নয় কিছুই, আল্লাহ বলেন (তরজমা নয়, ভাব),

ক. আমার কিতাবে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহ নেই (বাকারা ২)।

খ. আমার কুরআন লওহে মাহফুজে রক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ। এতে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই (ইউনুস ৩৭)।

গ. আমি কুরআন নাজিল করেছি। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। এই কুরআনে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহ নেই (সাজদাহ ২)।

কুরআনের সত্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

কুরআন হলো সুনিশ্চিত জ্ঞানের আধার।

প্রশ্নাতীত বিষয়াবলির আকর।

সন্দেহ-সংশয়ের মূলে কুঠারাঘাতকারী।

পাগলামি যেমন একটা মানসিক রোগ, সন্দেহ (رَيْبَ)-ও একটা রোগ। দুরারোগ্য ব্যাধি।

কুরআন কারিম দ্ব্যর্থহীন সত্যের কথা বলে।

তারা কুহেলিকাময় ধ্বংসাত্মক দ্বিধা-সন্দেহের কথা বলে।

কুরআন কারিম সুনিশ্চিত বিশ্বাস আর আস্থার কথা বলে। কুরআন কারিমে সন্দেহ নামক মানসিক রোগের কোনও স্থান নেই। যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদিস নীরব, সেসব বিষয়ে সন্দেহ চলতে পারে। প্রশ্ন চলতে পারে।

দুনিয়ার যে কিতাবই পড়ি, তার ভূমিকায় লেখা থাকে,

আমরা বইটিকে নির্ভুল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বইয়ে কোনও ভুল ধরা পড়লে, দয়া করে জানালে বাধিত হবো। শুধু একটা কিতাবই আছে, শুরুতেই লেখা আছে

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

এটা এমন কিতাব, যাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অটোবায়োগ্রাফি অব কুরআন

(কুরআনের আত্মজীবনী)

হে লোকেরা! তোমাদের কাছে এসেছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে,

ক. এক উপদেশ।
খ. আত্মার ব্যাধিসমূহের নিদান (শিফা-উপশম)।
গ. হিদায়াত।
ঘ. মুমিনদের জন্যে রহমত।

হে নবি, আপনি বলে দিন;

(এক) এ-কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াতেই (নাজিল হয়েছে)।

(দুই) এ-কুরআন নিয়ে তো তাদের আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠা উচিত।

(তিন) এ-কুরআন তারা যা কিছু জমা-সঞ্চয় করে, তার চেয়ে উত্তম-উৎকৃষ্ট। (সূরা ইউনূস ৫৭-৫৮)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

তাহাজ্জুদগুজার সন্তান

বাবা গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ছেন। একটু পর ছোট্ট ছেলেটাও পাশে এসে দাঁড়াল,

'বাবা, তুমি কেন উঠে এসেছো? ছোট্ট মানুষ যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

'তাহলে আপনি কেন তাহাজ্জুদ পড়ছেন'?

'আল্লাহ তাআলা রাত জাগতে বলেছেন যে'।

জি, আব্বু আয়াতটা আমিও পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ؕ

নিশ্চয় আপনার রব জানেন! আপনি রাতের দুই তৃতীয়াংশ-আধরাত-এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকেন (নামাজ পড়েন)। আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দাঁড়ায় (মুজাম্মিল:২০)।

আয়াতে নবীজির সাথে কারা দাঁড়াতো?

তার সাহাবিগণ।

তাহলে আপনিও রাতজাগার ক্ষেত্রে আমাকে আপনার সাহাবি হতে বাধা দেবেন না।

বাবা, তুমি এখনো ছোট।

আব্বু, আম্মুকে সব সময় দেখি চুলায় আগুন দেওয়ার সময় লাকড়ির ছোট টুকরো দিয়ে বড় লাকড়িগুলোতে আগুন ধরান। আমি আশঙ্কা করছি, আপনার আনুগত্যে অবহেলার কারণে কিয়ামতের দিন না জানি আল্লাহ আমাকে দিয়েই শাস্তি শুরু করেন।

ঠিক আছে বাবা, তুমি তাহাজ্জুদ পড়ো। তোমার বাবার চেয়েও তুমি বেশি তাহাজ্জুদ পড়ার যোগ্য।

নাস্তিক

তোমরা দাবি করো, কুরআনে সবকিছু আছে। সব সমস্যার সমাধান আছে।

হ্যাঁ, আছেই তো।

তাহলে আগামীকালের আবহাওয়া কেমন হবে কুরআন থেকে বের করে দেখাও।

আস্তিক সাথে সাথে আবহাওয়া অফিসে ফোন করে সংবাদ জেনে নিয়ে বলল।

আগামী কাল দিনের বেলা আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলেও রাতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

বোকা পেয়েছ আমাকে?

কেন কী হয়েছে?

তোমাকে না বলেছি কুরআন থেকে সমাধান বের করতে?

কুরআন থেকেই তো সমাধান বের করেছি। কুরআনে বলা আছে,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যদি তোমাদের জানা না থাকে, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও (নাহল: ৪৩)। আমি তাই করেছি! পথটা কুরআনই বাতলে দিয়েছে।

পীরের ওহি

আপনি আমার সাথে শুধু তর্ক করেন। আমাদের বাবাকে বিশ্বাস করতে চান না। জানেন তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়?

আচ্ছা তাই নাকি। আপনাদের বাবা বলেছেন একথা?

হ্যাঁ, আমি নিজ কানে শুনেছি।

এতদিন খটকা ছিল। আজ সত্যি সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে।

আহ! কী যে ভালো লাগছে ভাই আপনাকে বোঝাতে পেরে। আপনি কোন কথা শুনে বাবার কথা বিশ্বাস করলেন।

ওহির কথা। সেটা কুরআনেই আছে।

হক মাওলা, কুরআনেও বাবার কথা আছে। একটু বলুন না কী আছে?

সূরা আন'আমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ

নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদের কাছে ওহি নাজিল করে। যেন তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে (১২১)।

বোবাকান্না

মানুষটা ধর্মকর্মের তেমন ধারধারে না। মদ-জুয়ার নেশাও আছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল একজন অত্যন্ত নেককার বিবি। বিয়ের পর সন্তান হলো। বাচ্চাকাচ্চা হলো। একটা সন্তান আল্লাহর ইচ্ছায় বোবা হলো।

মা সন্তানদেরকে অত্যন্ত যত্নের সাথে দ্বীনি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। স্বামীর জন্যেও দুআ করতে থাকলেন। বোবা ছেলেটাকেও মা বিশেষ যত্নের সাথে কুরআন শিক্ষা দিলেন। মেধা ভালো থাকাতে তার পড়াশোনাও তরতর করে এগোতে থাকলো। সন্তানরা নেক হিশেবে বেড়ে উঠলেও বাবা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।

একদিন বোবা ছেলেটা মসজিদ থেকে দৌড়ে বাড়ি এল। কাঁদতে কাঁদতে। হাতে একটা কুরআন শরিফ। সরাসরি বাবার কাছে গিয়ে কুরআন কারিমের একটা আয়াতের ওপর আঙুল রেখে বাবার সামনে খুলে ধরলো। বাবা দেখলেন, লেখা আছে,

يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا

আব্বু! আমি আশঙ্কা করছি, দয়াময়ের একটা আজাব আপনাকে স্পর্শ করবে, আর আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু! (মারইয়াম: ৪৫)।

বাবা ছেলের কান্না দেখে আর আয়াতটা পড়ে শিউরে উঠলেন।

কুরআনি বুজুর্গ

এক বুজুর্গের অভ্যেস ছিল প্রতিদিন দশ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একদিন তিলাওয়াত করতে করতে সূরা ইয়াসিনে এসে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলো, তিনি মৃত্যুর সময় কোন আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন। খবর বের হলো তিনি মৃত্যুর সময় পড়ছিলেন,

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

নিশ্চয় আমি তাহলে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছি!(ইয়াসীন:২৪)।

সবাই ভীষণ অবাক। এমন ভালোমানুষ হয়েও এহেন পরিণতি। এক আত্মীয় বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখলো,

আপনাকে নিয়ে আমরা সবাই আশঙ্কায় আছি।

কেন?

আপনি এমন আয়াতে এসে মৃত্যুবরণ করলেন। না জানি আয়াতের অর্থটা আপনার পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করছে কি না। তা আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করলেন?

তোমরা আমাকে দাফন করে চলে গেলে। এরপর দুইজন ফিরিশতা এলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন,

তোমার রব কে?

আমি তখন রূহ কবজের আগে যতদূর পড়েছিলাম, তার পর থেকে পড়া শুরু করলাম,

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ

আমি তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনলাম! আমার কথা শুনে রাখো তোমরা (ইয়াসিন:২৫)।

তখন বলা হলো,

ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَ

তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো (ইয়াসিনঃ ২৬)

আমি তখন বলে উঠলাম,

يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ

ইশ! আমার কওম যদি জানতো! আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (ইয়াসিনঃ ২৬-২৭)।

পুত্রসন্তান

আজকে তাফসির দরসে সুন্দর একটা কথা শিখলাম। পড়া চলছিল সূরা ইউসুফের। একটা আয়াতে আছে,

يَٰبُشۡرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ

কী সৌভাগ্য, এ যে দেখি এক বালক।

হুজুর বললেন,

কারো যদি শুধু মেয়ে হয়, অনেক দুআর পরও ছেলে হচ্ছে না, তাহলে গর্ভাবস্থাতেই একটা সন্তানের নাম 'বুশরা' রেখে দিলে, পরের সন্তান বা তার পরের সন্তান ছেলে হবে।

এটা অভিজ্ঞতার কথা। সহিহ্ হাদিস বা আকিদার কিছু নয়। এটা বিশ্বাস করতেই হবে, এমন নয়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াটা কাজে লেগেছে। আবার মেয়ে সন্তানের প্রতি অবজ্ঞারও কিছু নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি দুটি মেয়ে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে লালন-পালন করে, কিয়ামতের দিন সে আর আমি (নবীজি) একদম কাছাকাছি অবস্থান করব। (মুসলিম)

আর কারো যদি পুত্র সন্তান লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহলে গর্ভে থাকাবস্থাতেই 'ভ্রূণের' নাম 'মুহাম্মাদ' রেখে দিলে সন্তান সাধারণত ছেলে হয়। এটাও অভিজ্ঞতার কথা। আকিদার কথা নয়। আল্লাহই সবকিছু জানেন। করেন। বান্দা শুধু চেষ্টা করতে পারে। দুআ করতে পারে।

মৃত্যুচিন্তা ও আবে হায়াত

ভারি মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি। সকাল বিকেল মৃত্যুচিন্তা পালা করে হানা দিয়ে যাচ্ছে। তাফসিরের দরসে সূরা তাওবা শেষ হবে। হুজুর জোরদার জিহাদের বয়ান

দিলেন। আমরা জোশে জোশিয়ান। পারলে এখনই 'ইয়ে' হাতে নেমে পড়ি পড়ি অবস্থা। শেষ আয়াত দুটিতে হুজুর দুটি আমলের কথা বললেন। একশত আঠাশতম আয়াতে পিলে চমকানো এক তথ্য দিলেন।

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের পর এ আয়াত একবার পড়বে, সে মাগরিবের আগ পর্যন্ত মারা যাবে না। আর মাগরিবের পর পড়লে সারারাত্রির জন্যে নিশ্চিন্ত'।

দরসে উপস্থিত সবাই তো খুশিতে আত্মহারা। যাক, অমরত্বের সন্ধান বুঝি পেয়ে গেলাম। আবে হায়াত? হ্যাঁ, আবে আয়াত। সিকান্দার, যুলকারনাইন, চেঙ্গিস, তৈমুর, হালাকু যে অমূল্য রতন পায়নি আমরা তা পেয়ে গেলাম? তাড়াতাড়ি তক্ষুনি একবার পড়ে নিলাম,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(হে মানুষ) তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসুল এসেছে। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্যে অতি পীড়াদায়ক। যে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।

যাক, মাগরিব পর্যন্ত আজরাইল আর কাছেপিঠে ঘেঁষতে পারবে না। সেদিন হয়েছে এক কাণ্ড। ভুলে আয়াতটা না পড়েই মাগরিবের সুন্নতে দাঁড়িয়ে গেছি। সূরা ফাতেহা পড়ে সূরা ফিলও প্রায় শেষ করে এনেছি। রুকুতে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে চট করে মনে পড়ল। এই রে, মৃত্যুনিরোধক 'আবে আয়াত' তো পড়া হয় নি। এখন? এই মুহূর্তে যদি আজরাইল এসে পড়ে? টিকা তো নিই নি? অজান্তে ভুলে আড়চোখে ডানে তাকিয়েও ফেললাম, আজরাইলকে দেখা যায় কিনা? নামাজ ছেড়েই আয়াতটা পড়ব কিনা ভাবছি, পরে কিরাত হিশেবেই আয়াতটা পড়ে নিলাম। মৃত্যুচিন্তায় এতটাই ভীত ছিলাম, কেরাতের তারতিব যে উল্টো হয়ে গেল, সেদিকে খেয়াল রইল না। অবশ্য নফলে তরতীব রক্ষা করা আবশ্যক নয়। দুরুদুরু বক্ষে সালাম ফিরিয়েই আয়াতখানা আবার পড়ে নিলাম। আহ, শান্তি। ফজর পর্যন্ত আর মরছি না। নাউযুবিল্লাহ, কী সব উল্টাপাল্টা চিন্তা।

তো হুজুরের কথা শুনে খুশিতে হাসছি। দরসের শেষে এসে হুজুর বোমা ফাটালেন। বললেন,

তবে কথা আছে।

কী কথা?

যেদিন তুমি মারা যাবে, সেদিন শত চেষ্টা করেও এ আয়াত তুমি পড়তে পারবে না। ভুলে যাবেই যাবে।

এই যাহ, সব মাটি করে দিল। আমি বিশ্বাস করি, কোনো আয়াতের শক্তি নেই মৃত্যুকে ঠেকানোর। এসবে বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

কুরআনে আছে, এই কুরআন অনেক মানুষের জন্যে যেমন হিদায়াতের উৎস হবে, পাশাপাশি অনেক মানুষের জন্যে গোমরাহিরও কারণ হবে। আমার মনে হয়, বর্তমানে 'হাদিস শরিফ'-এর অবস্থাও ঠিক তেমনি। কিছু মানুষকে হিদায়াত করছে ঠিকই, পাশাপাশি কিছু মানুষকে ভ্রান্তির দিকেও নিয়ে যাচ্ছে। তারা কারা? যারা শরিয়তের কোনও বিধান যাচাই করতে গিয়ে প্রথমেই কুরআনের দিকে রুজু না করে, হাদিসের দিকে ধাবিত হয়। এই রোগ এখন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে।

বুজুর্গদের জীবনী পড়তে আগ্রহী। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পড়তেও আগ্রহী। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত আম্বিয়া কেরামের ঘটনা পড়ার প্রতি অতটা আগ্রহী নয়। আগ্রহী হলেও শুধু গল্পটা পড়েই খালাস। আল্লাহ তাআলা কেন ঘটনাটা বললেন, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনি ঘটনা বলুন, হয়তো তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু আমরা শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহী নই। শিক্ষা না মানতে পারি, শিক্ষা বের করার চেষ্টা তো করতে পারি। যতটা আগ্রহ নিয়ে বাঙলা 'হাদিস' কিনতে যায়, অতটা আগ্রহ নিয়ে আরবি কুরআন কিনতে যায় কি না সন্দেহ।

আমাদের কেউ কেউ, যতটা হাদিসের পেছনে সময় ব্যয় করি, ততটা সময় কুরআনের পেছনে ব্যয় করি কি না, সন্দেহ আছে।

যদি দ্বীনি আলোচনায় বা তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে, দলিল খুঁজতে গিয়ে কারো চিন্তায় প্রথমেই কুরআন কারিম না এসে, 'বুখারি' এসে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে, তার চিন্তায় অসংগতি আছে। তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ হলেও, পাশ্চাত্য আগ্রাসনের প্রভাব কাজ করছে। ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার বিষ ঢুকেছে।

সব দলিল তো আর কুরআন কারিমে থাকবে না। কিন্তু এই ধারণাটাও নিজের মধ্যে পরিষ্কার থাকতে হবে, এ বিষয়ে কুরআনে দলিল নেই। তারপর না হয় অন্যদিকে যাওয়া হবে। পাশাপাশি কুরআনি দলিলকে বুঝতে হবে হাদিসের সাহায্য নিয়েই। মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নয়।

একজন মুমিনের স্বভাব তো এমন হবে, কিছু হলে প্রথমেই কুরআনের দিকে মনটা রুজু হবে। সেখানে সুস্পষ্ট কিছু না পেলে, হাদিসের দিকে যাবে। কিন্তু আমাদের কারো কারো স্বভাবই যে বদলে গেছে।

এটা ঠিক, হাদিস শরিফ হলো কুরআন কারিমের ব্যাখ্যা। কিন্তু 'টেক্সট' না বুঝলে তবেই না নোটের দিকে যাওয়া হয়। টেক্সট স্পষ্ট না হলে, তবেই না নোটবইয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। আমরা কেউ কেউ নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার মতো, জীবনে একবারও টেক্সটে হাত না দিয়ে প্রথমেই নোটে হাত লাগাই। সারা জীবন সেই

নোট নিয়ে পড়ে থাকি। অথচ কুরআন কারিমের শব্দ নিজেই একটা জীবন্ত মুজিযা। নবীজি সা.-এর হাদিসও ওহি, তবে অর্থটা ওহি। শব্দ নয়। হাদিসে কুদসির ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। আমরা মনকে প্রথমে কুরআনমুখী হতে অভ্যস্ত করবো। হাদিস থাকবে দ্বিতীয় স্তরে।

হৃদয়ের 'রবী'

নবিজী সা.-এর একটা দুআ আছে,

أسألك اللهمّ أن تجعل القرآن العظيم ربيعَ قلبي

ইয়া আল্লাহ! কুরআনকে আমার হৃদয়ের রবী বানিয়ে দিন।

এতদিন আমি একটা ভুলের মধ্যে ছিলাম। রবী অর্থ বসন্ত। আমি মনে করতাম, দুআটার অর্থ হলো, ইয়া আল্লাহ, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, মহান কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন।

অর্থ ঠিক আছে। কিন্তু এটাই একমাত্র অর্থ নয়। রবী অর্থ বসন্ত ছাড়াও আরও অর্থ আছে,

ক. পানির নালা। যা দিয়ে ক্ষেতখামারে সেচ করা হয়। তার মানে হলো, কুরআনকে হৃদয়ের উর্বরতার জন্যে 'নহর' বানিয়ে দেওয়ার দুআ করা হচ্ছে। নহর যেমন জমিকে, ফসলকে সিঞ্চিত করে, কুরআনও যেন আমার হৃদয়কে হিদায়াতের আলো দ্বারা উর্বর করে।

খ. সুস্থিরতা-প্রশান্তি। কুরআনকে হৃদয়ের জন্যে সুস্থিরতার উৎস বানিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দেওয়ার দুআ করা হচ্ছে।

এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতো। বন্ধুদের উৎসাহে হিফজও শুরু করেছিল। কিন্তু একটা চাকুরি পাওয়ার পর ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সব সময় ছোটোছুটির ওপর থাকতে হতো, সে আক্ষেপ করে বলল,

'কুরআন তিলাওয়াত তো হতোই না, উল্টো নামাজও ছুটে যাওয়ার উপক্রম হতো। মনে মনে বেশ অপরাধবোধ জাগতো। কুরআন থেকে দূরে সরে আছি। মনে হতো আল্লাহর রহমত থেকেই আমি যোজন যোজন দূরে হটে গেছি।

সারাক্ষণ আপরাধবোধ বিবেকে দংশন করতো। কুরে কুরে খেতো দুশ্চিন্তা। চাকুরিটা ছাড়া যাচ্ছিল না। পরিবারের রুজি-রুটি ওটার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। শুধু কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে তো চাকরি ছাড়া যায় না। যে করেই হোক, নামাজ তো পড়তে পারছি।

আল্লাহর কাছে একটা দুআ নিয়মিতই করে যাচ্ছিলাম। আগেও করতাম। আল্লাহুম্মাজ আলিল কুরআনা রাবী'আ কলবি। বারবার পড়তাম। সুযোগ পেলেই।

পাশাপাশি একটা সমাধানের জন্যেও আল্লাহর কাছে দুআ করতাম।

ফজরের নামাজ পড়ে বসে আছি। পাশে তালিম হচ্ছিল। হুজুর একটা আয়াত পড়লেন। ভাবটা বলে দিলেন,

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ

কাজেই কুরআন যতটুকু (পাঠ করা) সহজ হয়, তোমরা ততটুকু পাঠ করো। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ থাকবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করতে জমিনে ঘুরে বেড়াবে, কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করবে; কাজেই তা যতটুকু (পাঠ করা) সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর (মুয্যাম্মিল:২০)।

এই আয়াতটা যেন আল্লাহ আমার দুআ কবুল করার নিদর্শন হিশেবেই হুজুরের মুখ দিয়ে বের করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম: ব্যস্ততার কারণে খুব বেশি তিলাওয়াত করতে হবে না। যতটুকু সহজ হয়, যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু তিলাওয়াত করলেই হবে। তিনি খুশি হবেন। আমাকে দয়া করবেন।

কিশোরীর চাল-ধোয়া হাত

জটিল কিছু বোঝানোর ক্ষেত্রে উপমা বড়ই উপকারী মাধ্যম। উপমার মাধ্যমে আপাত দুর্বোধ্য কথাও সহজেই 'বোধগম্য' হয়ে যায়। উপমার অসাধারণ শক্তি। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ জানলার ধারে বসে পড়ছেন। দুই ঢাকাইয়া কুট্টি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একজন বলল,

ওই দেখ ডকডর সাব বইসা আছে।

ডাক্তার হইলে রুগি তো দেহি না?

আরে ওই ডকডর না রে, উনি হলেন 'বাযার' মানে লফযের ডকডর।

আরে ছেঃ, এইডা আবার ডকডর অইলো কেমনে?

তুই চিনসনা না ওনারে, উনি কত বড় ডকডর।

কতো বড়ো?

আমাগো সকিনার যে মাসটর?

হ

হের যে মাসটর?

হ

এমন কইরা একশ তলার উপ্রে উইটঠা যারে পাবি, হে অইলো আমাগো এই ডকডর।

ওরে বাপ্রে!, কস্কি বদি।

'উপমা' বোঝাতে গিয়ে স্যার ঘটনাটা বলেন। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা চমৎকারভাবে উপমা ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন আরবদের প্রচলিত ধারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তাদের ধারণা ছিল উপমা হবে বড়-বৃহৎ-মহৎ বস্তু দিয়ে। তুচ্ছ কোনও কিছু দিয়ে উপমা হতেই পারে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমের শুরুতেই 'মাছি-মশা'র উপমা দিয়ে তাদের ভাষাজ্ঞান তো বটেই, তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের বেদীমূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, কবিতা হবে উচ্চ-উন্নত কিছুকে ধারণ করার জন্যে। এটা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাথে প্রচণ্ড বিতর্ক। সামান্য কিছু নিয়ে সুন্দর-সফল কবিতা হতেই পারে না। সুধীন দত্ত বাজি ধরলেন। পরদিন 'কুক্কুট' শিরোনামে মোরগ নিয়ে চমৎকার এক কবিতা লিখে আনলেন। কবিগুরুর চক্ষু চড়কগাছ। তার এতদিনকার অচল বিশ্বাস সচল হলো।

কুরআন কারিমের উপমাগুলো মোটা দাগে দুই প্রকার,

প্রথম, সুস্পষ্ট উপমা। পড়লেই বোঝা যায়, কীসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কী বোঝাবার জন্যে উপমা দেওয়া হচ্ছে,

একজন লোক নিকষ–ঘুটঘুটে আঁধারে বাতি জ্বাললো। চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠলো। সবকিছু দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করে বাতিটা নিভে গেল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাফিরদের দৃষ্টান্তও এমন। হিদায়াত আসার পর চারদিক আলোকিত হলো। কিন্তু তাদের অন্তরের বক্রতা এমন আলোতেও কিছু দেখতে পায় না (বাকারা ২০)।

দ্বিতীয়, কিছুটা অস্পষ্ট উপমা।

এক ব্যক্তি তাকওয়া-পরহেজগারি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করে ঘর বানিয়েছে। আরেক জন ভঙ্গুর-পতনোন্মুখ গর্তের কিনারায় ঘর বানিয়েছে। কোনটা উত্তম? এখানে উভয় ঘর কিন্তু দৃশ্যমান ঘর নয়। ঈমান ও নেক আমলে কথা বলা হয়েছে (তাওবা ১০৯)।

বাংলা ভাষায় উপমাবহুল কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্বারা। দুজনের কবিতাতেই প্রকৃতি বিপুলভাবে উপস্থিত। নিসর্গই তাদের কবিতার প্রধান উপজীব্য। বাংলা কবিতায় অনেক ধরনের উপমাই উঠে এসেছে। আধুনিক সেরা পাঁচ কবির মধ্যে সুধীন দত্ত আর অমিয় চক্রবর্তীকে আমার অগ্রগামী মনে হয়। সুধীনবাবু বাঙলা কবিতায় বিশ্বজনীন

একটা আবহ এনেছেন। তার কবিতার উপমাও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের 'দিকচক্রবাল' ছুঁয়েছে। তবে খুলনার জীবনানন্দ সত্যিই অনন্য। তিনি কবিতায় অভিনব সব উপমা তুলে এনেছেন। রূপসি বাঙলার বিচিত্র সব উপমা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাতও তিনি আলতো করে ধরেছেন।

অধ্যাপক জীবনানন্দ আর জমিদারের গোমস্তা বিভূতিভূষণ বাঙলাকে যেভাবে চিনেছেন, কবিগুরুও চিনেছেন কি না সন্দেহ। ছিন্নপত্রে ছিন্ন ছিন্ন কিছু অসাধারণ 'ঝিলিক' আছে, এই যা। একবার চলচ্চিত্র বোধ ও প্রেষণার ক্লাসে বক্তব্য দিতে এসেছিলেন বিখ্যাত এক নাট্যকার অধ্যাপক। তিনি নিজের বানানো পুতুলের ভঙ্গিতেই কথার উপসংহার টানতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন,

'একজন চলচ্চিত্রকার চান, সমাজে ঘটে চলা চিত্রগুলোর রূপালি পর্দায় তুলে ধরতে। এটা একধরনের উপমাও বটে। যিনি যত সুন্দর উপমা দিতে জানেন, তার চলচ্চিত্রও তত সফল হয়। আমাদের কবিতার দিকে দেখুন! সবাই তো উপমা দেয়, কিন্তু এক ভদ্রলোক এসে সব ওলটপালট করে দিলেন। বাঙলার উপমা দিতে গিয়ে অসংখ্য চিত্রকল্প তো আনলেনই, শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলেন? এটুকু বলে মনোয়ার স্যার থমকে গেলেন। শ্রোতাদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,

কী উপমা নিয়ে এলেন?

প্রশিক্ষণার্থীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। পেছনের সারির একজন হাত তুললো। অবাক হয়ে স্যার বললেন,

আপনি বলবেন?

জি। 'কিশোরীর চাল ধোয়া হাত'।

দারুণ তো, আপনি জীবনানন্দ পড়েন?

এই একটু-আধটু।

মাদরাসায় এগুলো পড়ায়?

কুরআন কারিমে বর্ণিত উপমাগুলো প্রকরণের দিক থেকে তিন প্রকার,

প্রথম প্রকার: রূপক উপমা। পাখি, কীট-পতঙ্গ দিয়ে উপমা দেওয়া। সুলাইমান আ.- ও পিঁপড়ার ঘটনাও এমন।

দ্বিতীয় প্রকার: গাল্পিক উপমা। অতীতের গল্প বলে, বর্তমানের কোনও চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা। নুহ আ.-এর স্ত্রীর কথা বলে বর্তমানের জাহান্নামিদের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার: প্রাকৃতিক উপমা। প্রকৃতির রীতির সাথে তুলনা দিয়ে কোনও বক্তব্য তুলে ধরা। পার্থিব জীবন হলো, আকাশঝরা পানির মতো। সে পানির ছোঁয়া পেয়ে

শস্য লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। পরিপক্ব হয়। সোনালি রঙ ধারণ করে। মানুষ ভাবে, এ-ফসল তার থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তখন আসমানি আজাব এসে, সবকিছু ওলট-পালট করে দেয়। পার্থিব জীবনও এমনই। একদিন ঠিকই সব তছনছ হয়ে যাবে। যেতে হবে কবরে।

কুরআন কারিমে অসাধারণ ব্যতিক্রমী কিছু উপমা আছে। কেউ কেউ সেগুলোকে উপমা না বলে, শব্দপ্রয়োগের অপূর্ব দক্ষতা বলতে চান। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, এগুলোও একধরনের উপমা। কিছু আরবি শব্দ বিশেষ পরিস্থিতি ও ভাব বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। কুরআন কারিম এমন কিছু শব্দকে সম্পূর্ণ নতুন এক অর্থে ব্যবহার করেছে। এ-ধরনের ব্যতিক্রমী ব্যবহারেও সূক্ষ্ম উপমা থাকে। মূল ব্যবহারটা জানলে, কুরআনের অর্থটা বুঝতে সহজ হয়। উমার রা. বলেছেন,

'তোমরা আরবি কবিতা ভালোভাবে শিখে রাখো। তাহলে তোমরা পথ হারাবে না। তাতে রয়েছে তোমাদের কিতাবের তাফসির। তোমাদের কথার অর্থ'।

ইবনে আব্বাস রা.-এরও এমন একটি উক্তি আছে। আমাদের মাদরাসার পাঠক্রমেও প্রাচীন আরবি সাহিত্য বেশ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হতো। এখন কিছুটা কমে গেছে। বিশেষ করে সাবআ মুয়াল্লাকা। আর সাবআ মানেই তো ইমরাউল কায়েস। একটা সময় এমনও গেছে, সারাদিন সাবআ মুয়াল্লাকা নিয়েই মজে ছিলাম। মুখস্থ করেছি। খাতায় নোট করেছি। অর্থ শিখেছি। সুর তুলেছি। কিছু সময় এমন গিয়েছে, সাবআ মুয়াল্লাকা থেকে একটি লাইন পড়তাম। পাশাপাশি দেখতাম কুরআন কারিমের কোনও আয়াতের সাথে পঙ্‌ক্তিটার মিল আছে কি না। শেরটাতে উল্লেখিত শব্দগুলোর কোনোটি কুরআন কারিমে ব্যবহৃত হয়েছে কি না। কখনো কখনো উল্টোও হতো। কুরআন কারিমের একটি শব্দ নিয়ে দেখতাম সেটা সাবআ বা দীওয়ানে হামাসায় পাওয়া যায় কি না। সেখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? কুরআনের ব্যবহার আর শেরের ব্যবহারে ভাষাগত কোনও পার্থক্য আছে কি না। একটি উদারহণ দিলেই ব্যাপারটা খোলাসা হবে।

সূরা নুরের ৩৭ নাম্বার আয়াতে একটা শব্দ আছে। 'লা তুলহীহিম' (لا تلهيهم)। কিছু লোক আছে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য মোটেও বিমুখ করতে পারে না আল্লাহর জিকির থেকে।

কবিগুরু ইমরাউল কায়েসের সাতাশি লাইনের কবিতা এক বসায় শুনিয়েছি। এখন অবশ্য ভুলে গিয়েছি। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সবটা না বলতে পারলেও, শুরুর দিকের লাইন তো সূরা ফাতিহার মতোই আছে। থাকবে। শুরুর দিকেই একটা শব্দ আছে (فألهيتها) আমি তাকে বিমুখ করে দিয়ে দিয়েছি। শব্দটি কবিতার এক ভয়াবহ জায়গায় আছে। বোধহয় আরবি কবিতারও সবচেয়ে ভয়াবহ লাইন ওটা।

লাইনটার অর্থ বলা তো শালীন-শোভন-উচিত কোনওটাই হবে না। শুধু আকারে-ইঙ্গিতে বলছি, ইমরাউল কায়সকে পেয়ে মেয়েরা এত বেশি খুশি হতো, কুমারি তো বটেই, ছাওয়ালধারী মায়েরাও তাদের সন্তানদের ভুলে, কবিগুরুর পদপাতে মাথাকুটে মরতো। ঈমানহীন কবিদের এমন ধ্যাষ্টামো যুগে যুগে চলে আসছে। সে যুগে ইমরাউল কায়েসের ছিল 'উনাইযা'। আমাদের যুগে আছে মৈত্রেয়ীসহ আরও অনেকে।

(إلهاء) মানে বিমুখ করা। উদাসীন করা। কিন্তু এতে কি কিছু বোঝা যায়? কতটা বিমুখ, কতটা উদাসীন? কিন্তু কবিগুরুর আত্মজৈবনিক লাইনটা পড়লে, একেবারে খোলাসা। ব্যবসা-বাণিজ্য একশ্রেণির মানুষকে মোটেও উদাসীন করে না, যেমনটা আরেক শ্রেণির মানুষকে করে। কেমন উদাসীন করে?

'ঠিক যেমনটা ইমরাউল কায়েস তার প্রেমিকা উনাইযা ও তার আরও অনেক প্রেয়সীকে সবকিছু ভুলিয়ে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখতে পারতো।'

কুরআন কারিমের এ-শাব্দিক উপমাটা দারুণ উপভোগ্য। আচ্ছা বর্তমানে কুরআন নাজিল হলে বক্তব্যটা কেমন হতো? হয়তো এমন কিছু বা কাছাকাছি কিছু থাকত,

'কিছু লোক এমন আছে, যাদেরকে 'অনলাইন' আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালহামদুলিল্লাহ। ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

তিবয়ান

একজনের মারাত্মক রোগ হলো। কোনও ওষুধেই কাজ হচ্ছে না। দিন দিন লোকজটার অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। তার প্রভাবে বাড়ির অন্যরাও আস্তে আস্তে অসুস্থ হতে শুরু করল। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, ক্রমে পুরো গ্রাম।

দেশের লোকেরা পেরেশান। কীভাবে রোগ সামলানো যায়। নইলে প্রকোপ তাদের উপরও পড়বে। রোগ বাড়ছে। এক রোগ থেকে আরেক রোগ। আগে সবার অসুস্থতার ধরন এক ছিল, এখন নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করল। দূর দেশ থেকে এক লোক এল সে গ্রামে। পাশের গ্রামের লোকজন তাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল। আপনি যাবেন না, ওখানে গেলে আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

'দেখা যাক, গিয়েই দেখি না। আমার কাছে 'তিবয়ান' আছে'।

'তিবয়ান? সে আবার কী'?

সর্বরোগের মহৌষধ।

এটা খেলে সব রোগ সেরে যাবে বলছেন?

জি। খেতে দেরি, রোগ পালাতে পথ পাবে না।

কুরআন কারিমও এমন এক মহৌষধ। তিবয়ান। মানব জীবনের সব সমস্যার 'সুস্পষ্ট সমাধান'।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলমানদের জন্যে হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ (নাহল ৮৯)।

কুরআন কারিম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সমাধান।

জ্ঞানীদের জন্যে বিশেষ পয়গাম।

মানুষের সকল মুশকিলের আসান।

মানুষের জন্যে সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের মানদণ্ড।

বিপদ থেকে মুক্তির মহাসোপন।

দুনিয়াতে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি।

আখিরাতে চিরমুক্তির অব্যর্থ উপায়।

কুরআন কারিম শুধু মুসলমানের সমস্যাই সমাধান করে না। কুরআন কারিম সকল মানুষের কিতাব। এটা মেনে চললে, সকল ধর্মের মানুষই উপকৃত হবে। সুখী হবে। আরোগ্য লাভ করবে।

কুরআনি রহমত

১, নবীজি সা. আমাদের জন্যে রহমত। কুরআন কারিমও আমাদের জন্যে রহমত। কুরআন কারিম ছাড়া মুমিনের জীবন অচল,

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি, তা সবই প্রত্যাহার করতে পারতাম, তারপর আপনি তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীও পেতেন না (বনী ইসরাঈল ৮৬)।

২. আল্লাহর অসীম করুণায় আমাদের কাছ থেকে কুরআন কারিম উঠিয়ে নেওয়া হয় নি,

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

কিন্তু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ এটা এক রহমত (যে, ওহির ধারা চালু আছে)। বস্তুত আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সুবিপুল।

৩. কুরআন নাজিল অব্যাহত ছিল। ওহির ধারা মাঝপথে বন্ধ হয় নি। আমাদের মহাসৌভাগ্য, আমরা পুরো কুরআন পেয়েছি।

৪. দেখার বিষয় হলো, আমরা কুরআন পেয়ে কতটুকু কাজে লাগাচ্ছি? গুনাহের কারণে বান্দা কুরআনের নূর থেকে বঞ্চিত হয়।

৫. কুরআনের নূর পেতে হলে, আমাকে গুনাহ ছাড়তে হবে। তাওবা করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

নাস্তিকের ভয়

এক আরব নাস্তিক ঈমান আনার পর তার দিনলিপিতে লিখেছে, একরাতে লিখতে লিখতে রাত দুটো বেজে গেল। লেখাটাতে আমি নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, আল্লাহর কোনও অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ বলে কেউ নেই। থাকার কথা নয়। থাকতে পারে না। খাতাপত্র গুছিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। বাতি বন্ধ করতে গিয়ে একটা আয়াত মনে পড়ল,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ

তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফিরদের জন্যে যতই অপ্রীতিকর হোক (সাফ্ফ ৮)।

হাত কেঁপে উঠল। সুইচ বন্ধ করতে পারলাম না। চিন্তা হলো, লেখাতে তো প্রমাণ করে দিয়েছি, আল্লাহ বলে কেউ নেই। কিন্তু বাস্তবে যদি আল্লাহ বলে কেউ থাকেনই, তাহলে কুরআনে যে যে আজাবের কথা বলা হয়েছে, সবই আমার উপর ভেঙে পড়ার কথা। এই অবস্থায় মারা গেলে আমার কী পরিণতি হবে, সে দৃশ্য কল্পনা করে ভয়ে বাতিটা বন্ধ না করেই শুয়ে পড়লাম। নির্ঘুম রাত কাটল। সকালে উঠে লেখাটা ছিঁড়ে ফেললাম। আগপিছ না ভেবে কুরআন খুলে বসলাম। কুরআনই আমাকে ঈমানের রাজপথে পৌছে দিয়েছে।

আমলনামা

সময় চলে গেলে হা-হুতাশ করে কোনও লাভ হয় না। বিপদ নামার আগেই সতর্ক হতে হয়। বিপদ যাতে না আসে, তার জন্যে আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হয়।

يَوْمَ نَدْعُوا۟ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَٰمِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকব। তারপর যাদেরকে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, ডান হাতে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না (ইসরা ৭১)।

ধরা যাক, আমি জীবনে যা করেছি, তার সমস্ত বিবরণ একটা খাতায় লেখা হলো, গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই খাতায় টোকা আছে। আমি কি বইটা সবাইকে

সমানভাবে পড়তে দিতে পারব? আমার ছেলেকে? আমার বাবা-মাকে? কোনও রকমের রাখঢাক ছাড়া, আমার পুরো জীবন নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানালে, আমি কি সেটা বাবা-মা ও ছেলে-মেয়ের সাথে বসে দেখতে পারব?

আমার সে কিতাবে কী লেখা থাকবে, সেটা তো আমার জানা আছে। কিয়ামতের দিন সবার সামনে প্রকাশিত হওয়ার আগে আমিই আমার কিতাবটা পড়ে নিতে পারি। আপত্তিকর অংশগুলো সম্পাদনার মাধ্যমে বাদ দিতে পারি। তাওবার মাধ্যমে। ইস্তেগফারের মাধ্যমে।

আমার কিতাবকে ভালো হিশেবে পাওয়ার জন্যে আমাকে আগে আল্লাহর কিতাবকে,

ইবাদতের নিয়তে পড়তে হবে।

আমলের নিয়তে পড়তে হবে।

দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পড়তে হবে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে হবে।

সীমাহীন আনন্দ নিয়ে পড়তে হবে।

কুরআন নিয়ে গর্বিত এমনভাবে পড়তে হবে।

সফলতা লাভের জন্যে পড়তে হবে।

মুক্তির জন্যে পড়তে হবে।

কুরআনি আনন্দ ও সম্মান

১. কুরআন কারিমকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিশেবে পাওয়া, এই উম্মতের অন্যতম সেরা সৌভাগ্য। না চাইতেই এতবড় একটি নিয়ামত পাওয়ার শুকরিয়া কোনওভাবেই আদায় করা সম্ভব নয়। তারপরও নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী কুরআন কারিম প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করা ঈমানি দায়িত্ব,

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

(হে নবী!) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাজিল করা হয়েছে, তা শুনে আনন্দিত হয়। আবার তাদেরই কোনও কোনও দল এমন, যারা এর কিছু কথা মানতে অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে তো এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং প্রভুত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। এ কথারই আমি দাওয়াত দিয়ে থাকি আর তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে (রা'দ ৩৬)।

ক. কুরআন কারিম পেয়ে আনন্দিত হওয়া মুমিনের আলামত। ঈমান না থাকলে আনন্দ আসবে না।

খ. কুরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়ার মানে কি, শুধু সুর করে তিলাওয়াত করতে পারার আনন্দ? জি না, কুরআনি বিধান নিয়ে আনন্দিত হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

গ. কিছু মানুষ আছেন, নামে মুসলিম, কিন্তু কুরআনি বিধানের কথা শুনলে তাদের গায়ে জ্বর এসে পড়ে।

২. কুরআন কারিম আমাদের জন্যে বয়ে এনেছে শুধু সম্মান আর সম্মান। আমি কুরআন নিয়ে থাকলে, কুরআন আমাকে সম্মানিত করবেই,

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(পরিশেষে) আমি তোমাদের প্রতি নাজিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (আম্বিয়া ১০)।

ক. এই আয়াতে 'যিকরুকুম' (ذِكْرُكُمْ) অর্থ আলোচনা হতে পারে। উপদেশ হতে পারে। বেশিরভাগ মুফাসসিরীনে কেরাম এই আয়াতে জিকিরের অর্থ: শারাফ বা ইজ্জত সম্মান মর্যাদা করেছেন।

খ. আয়াতের শেষে বলা হয়েছে (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) তবুও কি তোমরা বুঝবে না? এই প্রসঙ্গে আল্লামা তাহের ইবনে আশূর রহ. বলেছেন,

'যার কাছে হিদায়াতের উপাদান আসার পরও হিদায়াত লাভ করতে পারল না, তার বুদ্ধিমত্তা আর বিবেকবুদ্ধির স্তর নিন্দনীয়। যার কাছে সম্মানের বস্তু, সুখ্যাতির উপকরণ আসার পরও সেটাকে গুরুত্ব দিল না, নিজে সম্মানিত হতে পারল না, তার মধ্যে মূল্যবান বস্তুর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করার মানদণ্ড না থাকাটা নিন্দনীয়'।

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন কারিম দান করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। এই সম্মান পেয়ে আমরা তার কেমন মূল্যায়ন করেছি, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন,

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ

বস্তুত এই ওহি (কুরআন) আপনার ও আপনার কওমের জন্যে সুখ্যাতির উপায়। আর শীঘ্রই তোমাদের সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে (তোমরা এর কী হক আদায় করেছ? যুখরুফ ৪৪)।

৪. অন্যকে সম্মান দান করতে হলে, নিজেও সম্মানিত হতে হয়। কুরআন কারিম সম্মানিত। তাই কুরআনের সাথে যারা লেগে থাকবে, তারাও সম্মানিত হবে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ

যারা উপদেশবাণী (কুরআন)-কে অস্বীকার করেছে তাদের কাছে তা আসার পর (তারা নেহাত মন্দ কাজ করেছে), অথচ এটি অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব (ফুসসিলাত ৪১)।

৩. আজিজ শব্দের অর্থ আল্লামা যারকাশী রহ. লিখেছেন,

'যা পাঠক বা তিলাওয়াতকারী থেকে অসম্মান অমর্যাদা দূর করে। তবে শর্ত হলো, কুরআন অনুযায়ী আমল করতে হবে'।

৪. আমাদের যাবতীয় সম্মান ও অসম্মান কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন নিয়ে থাকলে সম্মান লাভ করব। কুরআন ছেড়ে দিলে অসম্মানিত হব।

৫. আবু শুরাইহ খুজাঈ রা. বলেছেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সা. আমাদের কাছে এসে বললেন,

أبشروا وأبشروا أليس تشهدونَ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ؟

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি একথার সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নেই, আর আমিই আল্লাহর রাসুল?

সবাই বলল জি।

فإنَّ هذا القرآنَ سَبَبٌ طرَفُه بيدِ اللهِ وطرَفُه بأيديكم فتمسَّكوا به فإنَّكم لنْ تضِلُّوا ولن تَهلِكوا بعدَه أبدًا

তাহলে জেনে রাখ, এই কুরআন হলো 'রজ্জু'। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। এই কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। এই কুরআন নাজিল হওয়ার পর, তোমরা এই কুরআনকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরলে, কখনো কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না (সহিহ ইবনে হিব্বান ১২২)।

৬. রশির একপাশ আল্লাহর হাতে, আরেক পাশ আমাদের হাতে। বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখলেই নিজের গুরুত্ব বোঝা যাবে। কল্পনা করতে পারছি? একটি রশির একপাশ আমার হাতে, আরেকপাশ রাব্বে কারীমের হাতে? আহ, গা কেমন শিউরে ওঠে না?

৭. কুরআন কারিম এমন এক রশি, যা আঁকড়ে ধরলে শুধু লাভ আর লাভ।

৮. কুরআন কারিম শুধু সম্মানিতই নয়, বরকতময়ও,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

(হে রাসুল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সাদ ২৯)।

ক. প্রথমে তাদাব্বুর করতে বলা হয়েছে। তাদাব্বুর মানে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে আমলের নিয়তে কুরআন কারিম অধ্যয়ন করা। তাদাব্বুরের পর 'তাযাক্কুর' করতে বলা হয়েছে।

খ. তাযাক্কুর মানে উপদেশ গ্রহণ করা। তাদাব্বুরের মাধ্যমে অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করাকে তাযাক্কুর বলা হয়।

গ. কুরআনের বরকত লাভ করতে হলে, তাদাব্বুর করতে হবে। তাদাব্বুরের পর তাযাক্কুরও করতে হবে। তাহলেই সম্মান লাভ হবে। আনন্দ লাভ হবে।

কুরআনের বুঝ

আমি কুরআন বুঝতে চাই? এখন আমার করণীয় কী? আরবি শিখতে হবে, নাহু-সারফ-বালাগাত শিখতে হবে। হ্যাঁ, এসব শিখতে তো হবেই। কুরআন কারিম ভালো করে বুঝতে চাইলে বাড়তি আরেকটি যোগ্যতা লাগবে। কুরআন কারিমই বলে দিচ্ছে,

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

(হে নবী!) আপনি যখন কুরআন পড়েন, তখন আমি আপনার এবং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দিই (ইসরা ৪৫)।

১. আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে কুরআন বোঝা যাবে না।

২. আমার মধ্যে যতবেশি আখিরাত থাকবে, আমি ততবেশি কুরআন বুঝব।

৩. কুরআন বোঝা মানে, কুরআনের হিদায়াত নসিব হওয়া। নইলে কুরআনের শব্দের অর্থ তো কাফিরও বোঝে।

কুরআনি আনন্দ

আমি কি কুরআন পেয়ে খুশি? কুরআনি নিয়ে খুশি? সবার উত্তরই হবে 'হ্যাঁ'। কিন্তু আসলেই কি তা-ই? আমি কুরআনে বর্ণিত সমস্ত বিধান নিয়ে খুশি?

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

(হে নবী!) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাজিল করা হয়েছে, তা শুনে আনন্দিত হয়। আবার তাদেরই কোনও কোনও দল এমন, যারা এর কিছু কথা মানতে অস্বীকার করে। বল, আমাকে তো এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং প্রভুত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। এ কথারই আমি দাওয়াত দিয়ে থাকি আর তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে (রা'দ ৩৬)।

১. আল্লাহর কিতাব পেয়ে, আনন্দিত হওয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। আহলে কিতাব মানে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন, যারা কুরআন নাজিল হওয়ার কারণে (يَفْرَحُونَ) খুশি হয়েছিলেন।

২. আবার তাদেরই কিছু লোক কুরআন কারিমের কিছু অংশ মানতে অস্বীকার করেছিল।

৩. আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি। ঈমানদার দাবি করি। আমি কি পরিপূর্ণ কুরআনি আইন মানতে প্রস্তুত? প্রস্তুত হলে, আমি এখন জীবনকে কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত করি? সুদ-ঘুষ পরিহার করি? তাগুতকে ঘৃণা করি? আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধানকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি?

৪. আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু আহলে কিতাব, কুরআন কারিমের কিছু অংশকে ঘৃণা করে। প্রত্যাখ্যান করে। আমিও সে দলে নেই তো? আমার কি মনে হয়, নবীজি সা. ও খেলাফতে রাশেদাযুগের শাসনব্যবস্থা এখন পুরোপুরি উপযুক্ত নয়। এখন যুগ বদলেছে। সময় পরিবর্তন হয়েছে। এখন এত কড়া ধাঁচের 'হুদুদ-কিসাস' বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাহলে আমিও কি কাফিরদের মতো হয়ে গেলাম না?

৫. কুরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়ার দাবি করি। কিন্তু ভোটকে 'কিতাল' বলে ঘোষণা দিই। আমি কি আয়াতে বর্ণিত (الْأَحْزَابِ) বা কাফির দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম না?

কুরআনি বংশধারা

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর দাদার নাম ছিল শাহ ওজীহুদ্দীন রহ.। তিনি বড় মুত্তাকি ছিলেন। কুরআন কারিমের প্রতি বড়ই মহব্বত রাখতেন। বাদশাহ আলমগীর রহ.-এর সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। সেনাব্যারাকে শৃঙ্খলাময় জীবনযাপন সত্ত্বেও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। লম্বা কেরাতে কিয়ামুল লাইলের আমল করতেন। তাহাজ্জুদের পর প্রতিদিন অত্যন্ত আবেগমথিত আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। একরাতে তাহাজ্জুদে মগ্নচিত্তে তিলাওয়াত করছিলেন। একদল ডাকু সেনাছাউনি আক্রমণ করে বসল। ওজীহুদ্দীন রহ. সে হামলায় শহীদ হয়ে গেলেন।

আল্লাহ তাআলা তার এই কুরআনি ভালোবাসাকে বৃথা যেতে দেননি। কুরআনের প্রতি তার এই অপূর্ব মহব্বতের কারণে, আল্লাহ তাআলা তার পরবর্তী বংশধরদের কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত, পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ তো বটেই, পুরো বিশ্বের জন্যেই কুরআনি খেদমতের অগ্রদূত করে দিলেন।

ওজীহুদ্দীন রহ-এর ছেলের নাম শাহ আবদুর রহিম রহ.। তাজভীদ, ইলমুল কিরাআত, ইলমুত তাফসির ও ইলমুল হাদিসে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। লেখাপড়া শেষ করে দিল্লিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটা মাদরাসায়ে রহিমীয়া নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। দূর-দূরান্ত থেকে তালিবে ইলমরা ইলম শিখতে আসত এ-মাদরাসায়।

বাবার ইন্তেকালের পর শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. (১৭০৩-১৭৬২) মাদরাসার হাল ধরলেন। জীবনটা কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফের খেদমতে ব্যয় করে দিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় কুরআন কারিম তরজমা করেন। এর আগে কেউ আরবি থেকে অন্য ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন কারিমের 'তরজমা' করেন নি। শাহ সাহেবের ইন্তেকাল করলেন। রেখে গেলেন চার সুযোগ্য পুত্রকে।

১. শাহ আবদুল আজিজ রহ.।

ফারসিতে তাফসির (আংশিক) রচনা করেছিলেন।

২. শাহ আবদুল কাদির রহ.।

অলংকারপূর্ণ উর্দু ভাষায় কুরআন তরজমা করেছিলেন।

৩. শাহ রফীউদ্দীন রহ.।

উর্দুভাষায় শাব্দিকভাবে কুরআন কারিমের তরজমা করেছিলেন।

৪. শাহ আবদুল গনী রহ.।

ইনি অল্প বয়েসে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু রেখে গিয়েছিলেন, একজন সুযোগ্য সন্তানকে। শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.। যিনি বালাকোটে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। কুরআনি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে।

পৃথিবীতে যত ভাষায় কুরআন তরজমা হবে, সবাই এই পরিবারের কাছে ঋণী থাকবে। এই পরিবার হিম্মত করে উর্দু ও ফারসি ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসিরে এগিয়ে আসার কারণে পরবর্তীদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। অন্যরা সাহস পেয়েছিল।

কুরআন কারিমের মহব্বত এমন এক 'রত্ন', আল্লাহ তাআলা এর বরকত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেন। শাহ ওজীহুদ্দীনের হুব্বে কুরআনের বরকত তার সন্তান হয়ে নাতিপুতি পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এবং এই বংশধারার ইলমি মেহনতের ধারাবাহিকতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ। যার রেশ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী।

নিজের বংশধরকে কুরআনপ্রজন্ম হিশেবে দেখতে চাইলে নিজেরও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করার কোনও বিকল্প নেই।

রূহ ও নুর

কুরআন কারিম হলো প্রাণ। কুরআনহীন জীবন নিষ্প্রাণ। কলবের জন্যে কুরআন রুখাসুখা মরুভূমিতে প্রবল বারির মতো।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহিরূপে নাজিল করেছি এক রূহ (শূরা ৫২)।

রূহ মানে কুরআন। কুরআন সত্যিকার অর্থেই 'রূহ'। প্রাণ। কুরআনের ছোঁয়ায় মৃত আত্মায় প্রাণের সঞ্চার ঘটে। আত্মিক শক্তি নবোদ্যমে চনমনে হয়ে ওঠে।

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্যে এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে (আনআম ১২২)।

যে কলবে কুরআনের ছোঁয়া লেগেছে, সে কলব মরতে পারে না। নিরাশ হতে পারে না। হতাশ হতে পারে না। ভীরু হতে পারে না। হিংসুটে হতে পারে না। অহংকারী হতে পারে না। রিয়াকারী হতে পারে না। যে কলবে কুরআন নেই, সে কলবে প্রাণও নেই।

সময়ের বরকত

সময়ের বরকত দরকার? কাজেকর্মে বরকত দরকার? তাহলে কুরআন নিয়ে বসতে হবে। কুরআন আগাগোড়াই বরকতময়,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

আপনার প্রতি এমন এক কিতাব নাজিল করেছি, যা বরকতময় (সোয়াদ ২৯)

তবে বরকত পেতে হলে নামকাওয়াস্তে কুরআন হাতে নিলেই হবে না,

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

(ইয়াহইয়া!) কিতাবকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো (মারইয়াম ১২)।

সালাফ কুরআন কারিমের গুরুত্ব বুঝতেন। তার বরকতময়তার কথাও জানতেন। তাই তারা অন্যসব জিকিরের চেয়ে কুরআন নিয়েই বেশি সময় কাটাতেন।

আপডেট

কিছু মানুষ ইসলামকে পছন্দ করে না। ঘৃণা করে। তার ইসলামের ভুল খুঁজে বেড়ায়। কুরআনের অসংগতি ধরার পেছনে লেগে থাকে। তাদের মেধা ও

পরিশ্রমের বড় অংশ ব্যয় হয় এ-কাজে। এই ধর্মবিদ্বেষীরা কুরআন কারিম ও ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত 'জানাশোনা' রাখে। তবে হ্যাঁ, ইসলাম সম্পর্কে জানা আর ইসলামের সঠিক রূপ জানা ভিন্ন বিষয়।

এই শ্রেণিটা কিন্তু নতুন নয়। সেই কুরআনি যুগেও এদের অস্তিত্ব ছিল। তারা কখন কোন আয়াত, কোন সূরা নাজিল হচ্ছে, তার খোঁজখবর রাখত। কোন আয়াতে বা সূরায় কী বলা হয়েছে, সেটাও তাদের নখদর্পণে থাকত। ঈমান না আনলেও তারা ইসলামকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে, মুমিনগণকে কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে, ইসলামি বিধি-বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে নতুন নাজিল হওয়া ওহি সম্পর্কে 'আপ-টু-ডেট' থাকতে সচেষ্ট হতো।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

যখনই কোনও সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে, এ সূরাটি তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে? যারা (সত্যিকারের) ঈমান এনেছে, এ সূরা বাস্তবিকই তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা (এতে) আনন্দিত হয় (তাওবা ১২৪)।

আয়াতে এক মুনাফিকের বিদ্রুপাত্মক কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সে বলেছে,

'এ সূরাটি তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?'

লোকটা একথা বলে, সূরা আনফালের দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত একটি কথার দিকে ইঙ্গিত করেছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি (বৃদ্ধি) সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে (আনফাল ২)।

তারা কাফির-মুনাফিক হয়ে কুরআন কারিমের গবেষণা করছে, বদমতলবে হলেও। আমি মুমিন হয়েও নেক নিয়তে কুরআন কারিমের একটা সূরা বা একটা আয়াত বোঝার পেছনে সময় দিতে রাজি নই।

ইসলামের একজন শত্রু কুরআন পড়ে অর্থ বোঝার জন্যে, আমি পড়ি না বুঝে বুঝে সওয়াব লাভের জন্যে। কোনটা বেশি জরুরি? কুরআন কারিমের 'বার্তা' বোঝা নাকি না বুঝে সওয়াব হাসিল করা?

কুরআন নাজিলের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

না বুঝে পড়ে সওয়াব হাসিল নাকি বুঝে পড়ে জীবনে ও সমাজে তার বাস্তবায়ন?

সময়কে ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় না?

কিছু সময় তিলাওয়াতের জন্যে।

কিছু সময় বোঝার জন্যে?

একজন কাফির, একজন মুনাফিক, কুরআনি ইলমে আমার চেয়ে এগিয়ে যাবে কেন?

একজন ইসলামবিদ্বেষী কুরআন গবেষণায় আমার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করবে কেন?

অপ্রিয় প্রিয়

মাঝেমধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সমাধানের জন্যে সব সময় কুরআন কারিমের দিকে রুজু করার কথা মনে থাকে না। একটি বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে কুরআন নিয়ে বসলাম। সূরা আনফালের আয়াতটা চোখে পড়ল,

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ

অথচ মুমিনদের একটি দলের কাছে এ-বিষয়টা অপছন্দ ছিল (আনফাল: ৫)।

বদর যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছিল। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে ঠেকানো উদ্দেশ্য ছিল। কিছু সাহাবি তাই আবু জাহলের সুসজ্জিত বাহিনীর মুখোমুখি চাচ্ছিলেন না। কিন্তু পরে প্রমাণ হলো, যুদ্ধটা মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ বয়ে এনেছে। কিছু বিষয় আমার ভালো লাগে না। পছন্দ হয় না, তাই বলে বিষয়টা আমার জন্যে খারাপ বা ক্ষতিকর, এমন নয়।

সালাত

রাব্বে কারিম তো আমাদেরকে সবসময়ই দেখেন। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু কিছু সময় আছে, তখন প্রিয় রব আমাদেরকে বিশেষভাবে দেখেন। তেমনই একটা সময় সম্পর্কে তিনি বলছেন:

الَّذِي يَرَاكَ (حِينَ) تَقُومُ

যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (ইবাদতের জন্যে) দাঁড়ান (শু'আরা ২১৮)।

সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিধান। আমি সালাতে দাঁড়ানোর মানে হলো, রাব্বে কারিম আমার দিকে ভিন্নতর গুরুত্বের সাথে তাকিয়ে আছেন। আর সালাতটা যদি গভীর রাতের আঁধারে হয়, তাহলে কথাই নেই।

সালাতে দাঁড়ানোর আগে আয়াতটা মাথায় কেন যে আসে না।

বায়োডাটা

আল্লাহ তাআলা মুসাকে দুবার নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নিজ থেকেই।

১. নিশ্চয় আমিই তোমার রব (إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ)। তোয়াহা ১২।

২. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ (إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ)। তোয়াহা ১৪।

ছোট্ট দুটি বাক্য। রাব্বে কারিম স্বয়ং নিজের পরিচয় তুলে ধরছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ বায়োডাটা আর দ্বিতীয়টি নেই। একজন সৃষ্টির কাছে স্রষ্টা খোদ আত্মপরিচয় তুলে ধরছেন। একজন বিশ্বাসীর কাছে এর চেয়ে সুন্দর আর প্রিয় বায়োডাটা আর হতে পারে না।

দাওয়াত

দায়ীগণের কাজ দাওয়াত দেওয়া। একেকজন দায়ীর দাওয়াতদান পদ্ধতি একেক রকম। কেউ গল্পকাহিনি, নানা রকম দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে দাওয়াত দেন। কেউ আখিরাতের, জাহান্নামের, কবরের, আজাবের ভয় দেখিয়ে দাওয়াত দেন। কেউ সুর দিয়ে ওয়াজ করে দাওয়াত দেন। তবে সবচেয়ে সেরা দাওয়াত দানপদ্ধতি হচ্ছে কুরআন কারিম ব্যবহার করে দাওয়াত দেওয়া। সুর এক সময় মুছে যাবে, কেসসা-কাহিনি এক সময় ভুলে যাবে, ভয়ভীতি এক সময় দূর হয়ে যাবে, একমাত্র কুরআন থেকে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তার নবীকে হুকুম দিয়েছেন,

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ

(হে নবী) আপনি বলে দিন, আমি কেবল ওহি (কুরআন) দ্বারাই সতর্ক করি (আম্বিয়া ৪৫)।

কী বললেন? কুরআনের কথা বললে মানুষ মজা পায় না? শোনার আগ্রহ থাকে না? না থাকুক! আমি বলে যাব। এটা আমার রবের হুকুম। একদম কিছু না পারলে স্রেফ একটা আয়াত শুনিয়ে দেব। অর্থও বলতে হবে না। আমার কাজ এটুকুই, বাকিটুকু রবের কাজ।

ইখলাস

সূরা ইখলাস আকারে ছোট হলেও প্রকারে বৃহৎ। আল্লাহ তাআলা এই সূরায় অনেক কথা বলেছেন। আমরা শুধু একটি দিক নিয়ে কথা বলবো। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ইয়াহুদিরা ভয়ংকর সব আকিদা পোষণ করে। সব ইয়াহুদির আকিদা এক নয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের আকিদা একেক রকম। অতীতে কোনও কোনও ইয়াহুদি বিশ্বাস করত,

ক. হুবহু মানুষের মতো তারও শরীর আছে।

খ. তিনি এক মহাসিংহাসন (আরশ)-এ সমাসীন আছেন। এই সিংহাসনই হলো স্বর্গের ছাদ।

গ. তার একটি পুত্র সন্তান আছে, তার নাম ওযায়ের। তার মধ্যে পিতাসুলভ আবেগ-অনুভূতিও আছে।

ঘ. মানুষের মতো হুবহু তারও হাত-পা আছে। চেহারা আছে।

কুরআন কারিমে এসব ভ্রান্ত অলীক ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে,

এক. (قل هو الله أحد) আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবদিক থেকে এক। আল্লাহ তাআলা একক অদ্বিতীয় সত্তা। মানুষের মতো নন তিনি। তিনি অবিভাজ্য। তাকে মানুষের শরীরের মতো অংশে অংশে ভাগ করা যায় না। তিনি তাঁরই মতো। তাঁর মতো কেউ নেই। কিছুই নেই। হতে পারে না।

দুই. (الله الصمد) আল্লাহ তাআলা এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোনও সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। মানুষের অবস্থানের জন্যে স্থান-কাল-পাত্রের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলার এসবকিছুরই প্রয়োজন নেই। বস্তুত তিনি বস্তু-ব্যক্তি-স্থান কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। এমনকি তিনি আরশেরও মুখাপেক্ষী নন। আরশ তাঁর সৃষ্টি। কোনও স্থান বা দিকের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই তিনি অস্তিত্ববান।

তিন. (لم يلد و لم يولد) তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তিনি কারও পিতাও নন। অন্য কেউ তাঁর সন্তানও নয়। তাঁর পূর্বপুরুষও নেই। তাঁর কোনও অধঃস্তন পুরুষও নেই।

চার. (و لم يكن له كفوا أحد) এবং তাঁর সমকক্ষ ও কেউ নয়। তাঁর মতো কেউ নেই। কোনও দিক দিয়েই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কেউ তাঁর মতো নেই। তিনিও কারও মতো নন। হুবহু মানুষের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর নেই। তাঁর মতো গুণাবলি কারও নেই।

কুরআন কারিমে প্রধানত তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে,

ক. তাওহিদ।

খ. রিসালত।

গ. আখিরাত।

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, সূরাতুল ইখলাস কুরআন কারিমের এক তৃতীয়াংশ।

এই সূরায় তিনটি আলোচ্য বিষয়ের প্রথম মানে তাওহিদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ-দিক থেকে সূরাটি এক তৃতীয়াংশ।

জিকির

যেখানেই থাকি, শত ব্যস্ততার মাঝেও অন্তত একবার হলেও আল্লাহর জিকির করে নেওয়া ভালো। এটা ভবিষ্যতে আমার জন্যে শক্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সে দিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে (যিলযাল ৪)।

এটা অনেকটা বীজ বপনের মতো। আমি যেসব জায়গায় জিকিরের বীজ বপন করে রাখব, কিয়ামতের দিন জায়গাগুলো আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে 'সাক্ষী'-এর চারা উৎপাদন করবে।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম।

আল্লাহর জিকিরের নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর জিকির করা যায়। তারপরও দিনের জিকিরের চেয়ে রাতের জিকিরে মনোযোগ বেশি থাকে। রাত মানে শেষ রাত।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা রাত-দিন তার তাসবিহতে মগ্ন থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না (আম্বিয়া ২০)।

এখানে রাতের কথা আগে বলা হয়েছে। ফিরিশতারা চব্বিশ ঘণ্টাই আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। ক্লান্তিহীন। রাতের আঁধার আল্লাহর জিকিরের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ফিরিশতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, সব সময় ক্লান্তিহীন জিকির করার কারণে। আর জিকির মানে সারাক্ষণ মুখে মুখে নির্দিষ্ট কোনও শব্দ উচ্চারণ করা নয়। মুখে তো বটেই, মনে মনে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও জিকির। কুরআন কারিমের একটা আয়াত নিয়ে চিন্তা করাও জিকির।

সুখময় দাম্পত্য

আল্লাহ তাআলা দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে দুটি সূত্র দিয়েছেন,

১. (التَّسَامُحُ) পরস্পর সহিষ্ণু হওয়া। পরস্পর ক্ষমাপরায়ণ হওয়া। সহনশীল হওয়া।

لَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

তোমরা পরস্পর ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেয়ো না (বাকারা ২৩৭)।

এখানে বিচ্ছেদের সময় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে উপদেশটা দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছেদের সময় যদি এমন আচরণ করতে হয়, তাহলে বিয়ে বহাল থাকাবস্থায় আরো বেশি উদার আচরণ করতে হবে। বরং বলা যায়, আয়াতে পরস্পরের অনুগ্রহ ও সদাচার করার কর্তব্য ভুলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে আগেও আদেশটা ছিল, এমন করা কর্তব্য ছিল। তুমি কর নি, তাই বিয়েটা ভাঙার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এখন শেষ মুহূর্তে অন্তত উদারতা দেখাতে ভুলো না।

২: (التَّغَاضِي) দেখেও না দেখার ভান করা। ভ্রুক্ষেপ না করা।

عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٍ

তিনি (নবী) তার কিছু অংশ জানালেন আর কিছু অংশ এড়িয়ে গেলেন (তাহরীম ৩)।

মাগাফির খাওয়া নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, আল্লাহর সেটা নিয়ে আম্মাজানদের সাথে রাগ দেখাননি। আলোচনাটা নসীহতের সীমায় রেখেছিলেন। বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাননি। বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন।

এ-দুটি গুণ দাম্পত্য জীবনকে মসৃণ রাখতে সাহায্য করে। পরস্পরের মন কষাকষি হতে রক্ষা করে। আর কথায় কথায় হিশেব নিলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব-তালাশে নেমে পড়লে, জীবন জটিল থেকে জটিলতরই হতে থাকে শুধু। সুখের দেখা পাওয়া যায় না।

বন্ধুত্বের মানদণ্ড

১. বিপদে কার কথা সবার আগে মনে পড়ে? কে আমার ডাকে সবার আগে সাড়া দেয়? আমি কার ডাকে সবার আগে সাড়া দিই? কার সাথে অবসর কাটাতে বেশি ভালো লাগে?

২. কেউ মনে করে, যাকে দিয়ে আমার বেশি উপকার হয়, সেই আমার সেরা বন্ধু। কেউ মনে করে, যার কথা শুনে আমি বেশি আনন্দ পাই, সেই আমার সেরা বন্ধু। কেউ মনে করে যার সাথে থাকলে টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হয় না, সেই আমার সেরা বন্ধু।

৩. বন্ধুত্ব কখনো রুচির মিল থেকে হয়। কখনো চিন্তার মিল থেকে হয়। একজন মাছ শিকার করতে ভালোবাসে, আমিও বাসি। ব্যস, বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একজন ফুটবল খেলতে পছন্দ করে, আমিও করি। বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একজন ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে, আমিও বাসি। বন্ধুত্ব হতে দেরি হয় না। একজন পাহাড়ে চড়তে ভালোবাসে, আমিও বাসি। কাছাকাছি আসতে সময় লাগে না।

৪. এসব তো আমার নিজস্ব মানদণ্ড। আমার চাওয়া-পাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াবি হিশেব-নিকেশের বেড়াজালে আবদ্ধ। একজন

মুমিন হিশেবে প্রথমেই চিন্তায় আনা দরকার ছিল, আমার রব এ-বিষয়ে কী বলেন? তিনি বন্ধুত্বের কোনও মানদণ্ড দিয়েছেন কি না?

৫. অবশ্যই তিনি মানদণ্ড দিয়ে রেখেছেন সেই কবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর চারপাশে অসংখ্য মানুষ ছিল। আপনজন ছিল। ভাই-বেরাদর ছিল। তাদের সবাইকে পাশ কাটিয়ে আল্লাহ তাআলা কাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় (কাহফ ২৮)।

৬. উপদেশ নয়, অনুরোধ নয় সরাসরি আদেশ। প্রথমেই আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞাপন জারি করলেন—(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) আপনি নিজেকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে এঁটে রাখুন। শুধু হুকুম করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞাও ঝুলিয়ে দিয়েছেন—(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। তারা কারা?

৭. যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে। রবের সন্তুষ্টি কামনা করে।

এটাই হলো মানদণ্ড। বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠি। শিকার নয়, মুভি দেখা নয়, গান শোনা নয়, মাউন্টট্রেকিং নয়, সাইকেল অভিযাত্রা নয়, গল্প-উপন্যাস পাঠ নয়, আড্ডাবাজি নয়, আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তি নয়, ফেসবুক ফ্রেন্ড নয়; শুধুই আল্লাহর জিকির। তাও নামকাওয়াস্তে লোকদেখানো জিকির নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা সচল সজাগ জিকির। এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব হতে পারে।

৮. আমি তাহলে আজ এখনই বসে যেতে পারি, হাতড়ে দেখতে পারি, কুরআনি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ আমার কোনও বন্ধু আছে কি না। একটু ভেবে দেখি। আমিই-বা কুরআনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য কারো বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখি কি না।

লা-খাইর

১. এক কুরআনপ্রেমিক আরব শায়খ, তার কুরআনি ভাবনাটুকু এভাবে তুলে ধরেছেন, 'সব সময় চেষ্টা করি, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে। তাহলে তাড়াতাড়ি ওঠা যাবে। দেরি করে ঘুমুতে গেলে ফজরের জামাত ধরা যায় না। ঘুম ঘুম চোখে নামাজ পড়তে আমার একদম ভালো লাগে না। নিজেকে মুনাফিক মুনাফিক মনে হয়। খালি একটা আয়াত চোখের সামনে ভাসে,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে (নিসা ১৪২)।

২. আজ ফজরের নামাজ পড়তে গেলাম। মনটা শান্ত ছিল। রাতের ঘুমটাও বেশ হয়েছে। চারদিকে শীতল একটা আমেজ ছড়িয়ে আছে। হালকা আরামদায়ক বাতাসে মসজিদের দিকে হেঁটে যেতে বেশ ভালোই লাগছিল। সুন্নাত আদায় করে জামাতে দাঁড়ালাম। কেরাত শুরু হলো। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি। ইমাম সাহেব আজিব এক আয়াত দিয়ে তিলাওয়াত শুরু করলেন,

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

মানুষের বহু গোপন কথায় কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে সেটা ভিন্ন কথা (নিসা ১১৪)।

৩. আয়াতের শুরুটাই আমাকে ভীষণ নাড়া দিল। (لَّا خَيْرَ) কোনও কল্যাণ নেই। অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, চিন্তা, চলাফেরা কিছুর মধ্যেই কল্যাণ নেই। হায় হায়! তাহলে আমার মধ্যে অসংখ্য অকল্যাণ বিরাজ করছে। আমি বিনা দরকারে, কত কথা বলি, কত চিন্তা করি, কত ওঠাবসা করি। 'লা খাইর'—এই একটা ছোট্ট বাক্য আমার সারাদিনের বহু আচরণকেই অসার করে দিয়েছে। অশুভ করে দিয়েছে। আরো গা-শিউরানো ব্যাপার হলো, আমার বেশিরভাগ দিনের সিংহভাগ কাজই 'কল্যাণহীন'। মাথার মধ্যে শব্দটা ঘুরপাক খাচ্ছে আর নানাবিধ অর্থহীন আচরণ-কথা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সারাদিনের অগণিত আচরণ একে একে সামনে আসছে আর 'লা খাইর'-এর সাথে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। ইয়া আল্লাহ, পাক কালামের একটা শব্দই যদি আমার বেশিরভাগ আচরণকে নাকচ করে দেয়, তাহলে বাকি কাজগুলোও কি অন্য কোনও কুরআনি বাক্যের সামনে মুখ থুবড়ে পড়বে না? আমার আমলনামায় যে কিছুই বাকি থাকবে না। ষোলোআনাই মিছে।

৪. লা খাইর—বাক্যটা আমাকে বলছে, তুমি অপ্রয়োজনীন আড্ডাবাজি বন্ধ করো। অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা বন্ধ করো। অপ্রয়োজনীয় পড়াশোনাও বন্ধ করো। আমি দুচোখ রগড়ে তাকালেই দেখতে পাবো, আমার মধ্যে অনেক 'লা খাইর' জমে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। নামাজ শেষ করে বসে বসে ভাবছিলাম আর অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিলাম। আমার কী হবে? আমি 'খাইর'-কল্যাণ কীভাবে আনব? ভালো কাজের আদেশ করতে হবে। মানুষকে দান-সাদাকার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১. অন্যদের কেমন চিন্তা আমি জানি না, আমার অজ্ঞতার কারণে মাঝেমধ্যে মনে হতো, হাদিস শরিফে বিভিন্ন আমলের কথা আছে। সকালে এই দুআ পড়তে হয়, বিকেলে ওই দুআ পড়লে ভালো হয় ইত্যাদি। কুরআন কারিমে তো এমন কোনও আমল নেই? তাহলে কুরআন মানবো কী করে? কুরআন অনুযায়ী আমল করবো কী করে? হ্যাঁ, কুরআন রাষ্ট্র-সমাজবিষয়ক বড় বড় মূলনীতি বলা আছে, কুফর শিরক সম্পর্কে কথা আছে। আছে আরও নানা দিক। কিন্তু হাদিস শরিফের মতো 'সকাল-সন্ধ্যা'-ধর্মী কোনও আমল নেই যে?

২. এটা আমার বোঝার ঘাটতি। আমার ইলমের অপরিপক্বতা। আসলে কুরআনের প্রতিটি আয়াতেই 'আমল' বলে দেওয়া আছে। একটু খুঁজলেই 'আমল'টি বের করা সম্ভব। সালাফের তাফসির মনোযোগ দিয়ে পড়লেই একেকটা আয়াত থেকে 'হাজারো' আমল আবিষ্কার করা সম্ভব। দরকার একটুখানি মনোযোগ।

৩. আমরা হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন আমল জানার চেষ্টা করি। মানারও চেষ্টা করি। বেশ ভালো প্রয়াস। পাশাপাশি কি আমরা একটুখানি কুরআন কারিমের দিকেও 'দৃকপাত' করতে পারি না। এই অতলান্ত সমুদ্রে কী কী লুকিয়ে আছে, সেটা আহরণে ব্রতী হতে পারি না।

৪. কুরআন সরাসরি 'সকাল-সন্ধ্যা'-এর আমলধর্মী কিছু বলে না। কুরআন কারিম প্রতিটি আয়াতে কিছু 'মানদণ্ড' দিয়ে দেয়। আমাদের কাজ হলো, সে মানদণ্ডগুলো চষে, দৈনন্দিন আমল বের করে আনা।

৫. সূরা ফাতিহার দিকে তাকাই,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি অতি দয়ালু ও চির দয়াময়। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক।

৬. চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে :

এক. রাব্বুল আলামিন।
দুই. আর-রাহমান।
তিন. আর-রাহিম।
চার. প্রতিদান দিবসের মালিক।

৭. সূরার শুরুতেই উক্ত চারটা গুণবাচক নাম কেন উল্লেখ করা হলো?

রাব্বে কারিম যেন আমাদেরকে বলছেন, 'আমার প্রিয় বান্দারা! তোমরা যদি পরিপূর্ণ সত্তা ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের জন্যে কারো প্রশংসা করতে চাও বা কাউকে সম্মান দেখাতে চাও, মহান মনে করতে চাও, বড় মনে করতে চাও,

তাহলে আমার প্রশংসা করো। আমিই তো আল্লাহ'।

৮. 'আমার প্রিয় বান্দারা! তোমরা যদি কারো অনুগ্রহ, লালন-পালন করার জন্যে কারো প্রশংসা করতে চাও, কাউকে বড় মনে করতে চাও,

তাহলে আমার প্রশংসা করো। আমিই তো রাব্বুল আলামীন।'

৯. 'আমার প্রিয় বান্দারা! যদি তোমরা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার জন্যে কারো প্রশংসা করতে চাও, কাউকে বড় মনে করতে চাও,

তাহলে আমার প্রশংসা করো, কারণ আমিই রহমান রহিম'!

১০. 'আমার প্রিয় বান্দারা! তোমরা যদি ভয়ডরের কারণে কারো প্রশংসা করতে চাও, কাউকে বড় মনে করতে চাও,

তাহলে আমার প্রশংসা করো। আমাকে বড় মনে করো,

কারণ, আমিই প্রতিদান দিবসের মালিক'!

১১. দুআ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হিশেবে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে হিদায়াত লাভের দুআ করা, একজন বান্দার শ্রেষ্ঠতম তামান্না। অন্যতম প্রাপ্তি। হিদায়াত লাভ তো পরের ধাপ, শুধু হিদায়াতের লাভের জন্যে দুআ করতে পারাও বিরাট বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে হিদায়াত লাভের দুআ করতে হবে,

ক. দুআর আগে আল্লাহর প্রশংসা করা। তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

খ. দুআর আগে আল্লাহর বন্দেগী করা। ইবাদত করা। আমি আল্লাহর দাস, একথা প্রমাণ করা। একমাত্র আল্লাহকেই উপাস্য হিশেবে গ্রহণ করা।

তাহলে বোঝা গেল, দুআ কবুল হওয়ার জন্যে,

ক. আল্লাহর আসমা ও সিফাতের উসিলা দিয়ে দুআ করতে হবে।

খ. আল্লাহর ইবাদতের উসিলা দিয়ে দুআ করতে হবে।

প্রতিটি দুআর আগে এই ধাপ অতিক্রম করলে, অবশ্যই দু'আ কবুল হবে, ইনশা আল্লাহ।

১২. 'ইস্তেআনত' বা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াটাও একটা ইবাদত। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আমরা আপনারই ইবাদত করি (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)। পরে বলা হয়েছে, (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) আমরা আপনার কাছেই সাহায্য চাই। ইস্তেআনতকে আলাদা করে উল্লেখ করার হেকমত কী?

১৩. বান্দা প্রতিটি কাজে ও ইবাদতে আল্লাহর কাছে ইস্তেআনতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সাহায্য না হলে বান্দা কোনও কাজই করতে পারবে না। ইবাদত করার

সৌভাগ্যও অর্জিত হবে না। ভালো কাজে আগে বাড়তে পারবে না। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবে না। তাই বাড়তি গুরুত্ব বোঝানোর জন্যেই 'ইস্তেআনতকে' আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে,

বান্দা রে! তুমি প্রতিটি কাজেই আমার কাছে সাহায্য চাও। আমার কাছে সাহায্য চাওয়া ব্যতীত তুমি কোনও কাজ শুরু করে দিয়ো না যেন।

১৪. ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট কেন?

ইবাদত হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনয় ও আত্মসমর্পণ। অন্য কারো ইবাদত করা শরিয়ত সমর্থন করে না। বুদ্ধি-চিন্তাও সমর্থন করে না। একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের উপযুক্ত। কারণ তিনিই জীবন দান করেছেন। নানাবিধ নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

১৫. ইবাদত ও ইস্তেআনত উভয় ক্ষেত্রেই 'বহুবচনের সীগাহ' ব্যবহার করা হলো কেন? 'আমরা আপনারই ইবাদত করি, আমরা আপনার কাছেই সাহায্য চাই'?

প্রধানতম ইবাদত হলো, সালাত। ফরজ সালাতগুলো জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যক। জামাত মানেই জমায়েত। অনেক মানুষ। হয়তো এ-কারণেই বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. সিরাতে মুস্তাকীম লাভের জন্যে দুআ করা হয়েছে। সাহায্য ও রিজিকের চেয়েও সিরাতে মুস্তাকীম কেন বেশি জরুরি?

দুনিয়াবি যিন্দেগীর জন্যে 'সিরাতে মুস্তাকীম'ই বেশি প্রয়োজন। একজন মানুষ সিরাতে মুস্তাকীম লাভ করার অর্থ, সে হিদায়াত লাভ করলো। একজন হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই মুত্তাকি বলা হয়। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলা রিজিকের পথ খুলে দেবেন। এমন এমন স্থান থেকে তার রিজিকের বন্দোবস্ত হবে, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।

১৭. সিরাতে মুস্তাকীম ও পুলসিরাতের মাঝে যোগসূত্রটা কী?

কুরআন বলছে,

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদেরকে আমল হিশেবেই প্রতিদান দেওয়া হবে (নামল ৯০)।

আমরা দুনিয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল থাকলে আখিরাতে পুলসিরাতেও অটল থাকতে পারবো। দুনিয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর যে পরিমাণ অটল থাকবো, সে পরিমাণ নিরাপত্তার সাথে পুলসিরাত পার হতে পারবো। সেদিন কেউ পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে। কেউ পার হবে চোখের পলকে। সবকিছু আল্লাহর তাওফিকেই সম্ভবপর হবে।

একটুখানি তাদাব্বুর-তাফাক্কুর

(এক) সূরা ফাতেহা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ আল্লাহর জন্যে, আরেক ভাগ বান্দার জন্যে।

ক. ইয়্যা-কা না'বুদু পর্যন্ত আল্লাহর জন্যে।

খ. ইয়্যাকা নাসতাঈন থেকে শেষ পর্যন্ত বান্দার জন্যে।

(দুই) আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, তাওফিক ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করা যাবে না। চতুর্থ আয়াতে এটাই ফুটে উঠেছে।

(তিন) মাগদূব কারা? ইয়াহুদিরা। গজবগ্রস্ত ইয়াহুদিদের অনুসৃত পথ পরিহার করা আবশ্যক। তাদের পথ কী? শরিয়তের উপর নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া।

দা-ল্লীন বলে খ্রিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। প্রকারান্তরে তাদের পথও পরিহার করতে বলা হয়েছে। তাদের পথ? বিদআত ও অজ্ঞতা।

একটুখানি আমল

সূরা ফাতিহার পুরোটাই দুআ। রাব্বে কারিম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, কীভাবে দুআ করতে হবে। কীভাবে দুআ করবো? প্রথমেই আমরা আল্লাহ প্রশংসা করবো। তার সানাখানি করবো। আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন। তারপর 'ইহদিনা' বলে দুআ শুরু করেছেন। হে আমার বান্দারা, এভাবেই আমার কাছে দুআ করবে কেমন?

একটুখানি পড়াশোনা

আমরা কোন সূরা বেশি পড়ি? অবশ্যই সূরা ফাতিহা। যে মানুষটা ইসলামের কিছুই জানে না, নামকাওয়াস্তে মুসলমান, সেও টেনেটুনে সূরা ফাতেহা মুখস্থ বলতে পারে। পড়া তো হলো, এবার একটু বোঝার চেষ্টাও কি করতে পারি কি না? বাঙলা তাফসির তো চাইলে সংগ্রহ করা যায়। এখন টাকাও লাগে না। কতক্ষণ লাগবে, বড়জোর বিশ মিনিট? একটু চেষ্টা করলেই আমরা সূরাটার তাফসির পড়ে নিতে পারি। ক্ষতি হবে না কিন্তু। কত কিছুই তো পড়ি। একদিন না হয় খেলার পেজটার একটা সংবাদ কম পড়ে, একটা সূরার তাফসিরই পড়লাম। সমস্যা হবে? আমাদের রব ভীষণ খুশি হবেন কিন্তু। আর নবীজি? আল্লাহু আকবার। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একটুখানি জনসংযোগ

আমাদের কাঙ্ক্ষিত পথ কোনটা? আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথ। আমরা তাদের পথই অনুসরণ করবো। আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা কারা? সালেহীন-সৎলোকেরা। নেক আমলধারীরা।

আমরা একটুখানি খুঁজলেই আশেপাশে 'সালেহ' পেয়ে যেতে পারি। নেককার পেয়ে যেতে পারি। এমন কাউকে পেলেই আমরা নিয়মিত তার সাথে কিছুটা সময় কাটাতে পারি। তার সোহবতে-সান্নিধ্যে থাকতে পারি। দ্বীনকে শিখতে পারি। দ্বীনকে আরও ভালোভাবে মানার প্রেরণা লাভ করতে পারি। এটাও কিন্তু একটা কুরআনি আমল। সূরা ফাতেহার আমল।

হরকত

১. আরবি ভাষায় তিনটা হরকত, যবর যের পেশ। আরবি ভাষা বিশ্লেষকগণ প্রতিটি হরকতের একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও বের করেছেন। তাদের মতে 'যের' বা কাসরার মাঝে 'বিনয়' বা অবনমনের ভাব লুকিয়ে আছে। কারণ যের থাকে হরফের নিচে। তাশদীদযুক্ত হলে তাশদীদের নিচে।

আল্লামা আলুসী রহ. বলেছেন,

'কুরআন কারিম শুরু হয়েছে 'কাসরা' দিয়ে। শেষও হয়েছে কাসরাহ দিয়ে। শুরুর 'বিসমিল্লাহ'-তে কাসরা। আবার সূরা নাসের শেষ শব্দ 'নাস'-এর সীনেও কাসরা।

২. কুরআন কারিম পড়তে হবে বিনয়ের সাথে। তিলাওয়াত শুরু করতে হবে সমর্পিত চিত্তে। নিবেদিত প্রাণ হয়ে। তাহলে কুরআনের নূর আসবে। হিদায়াত আসবে। আবার খতম শেষ করার পরও বিনয় অবলম্বন করতে হবে। কুরআনের বাণী প্রচারে এই বিনয় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অহংকারী কখনো দায়ী হতে পারে না।

৩. দুই কাসরার অর্থ

ক. শিক্ষার্থী কুরআন শিক্ষাকালে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থাকবে। কারণ, তার শিক্ষাসফর সবে শুরু হলো। বিনয়ী হতেই হবে।

খ. তুমি কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করলে। এখন তুমি শিক্ষক। তোমাকেও বিনয়ী হতে হবে। ছাত্রদের প্রতি কোমল-নম্র হতে হবে।

মাছির ন্যায়বোধ

এক কুরআন-নাবীস। নিজ হাতে লিখে কুরআনের কপি তৈরি করেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সারাটি জীবন কুরআন লিখেই কাটিয়ে দিয়েছি। সর্বমোট ষাট নুসখা কুরআন লিখেছি। একটা অদ্ভুত বিষয় ছিল, যতবারই কলমটা কালিতে ডুবিয়ে লিখতে গিয়েছি, কোত্থেকে একটা একটা মাছি এসে কলমের ডগায় বসতো। শুঁড় দিয়ে কালি চুষে খেতো। একটা ব্যাপার লক্ষ করে বেশ অবাক হতাম। আমি যতবার,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

'তোমরা এতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না'

লেখার জন্যে কালি নিতাম, মাছিটা কলমে বসতো না!

গানবাদ্যি

একজন লোক এসে ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করলো

আপনি গানের ব্যাপারে কী বলেন, হালাল নাকি হারাম?

আল্লাহর কালামে গানকে হারাম বলা হয় নি, আমি কীভাবে গানকে হারাম বলি?

তাহলে গান হালাল?

আল্লাহর কালামে তো গানকে হালাল বলা হয় নি। আমি কীভাবে হালাল বলি?

লোকটার চেহারায় দিশেহারা ভাব দেখে ইবনে আব্বাস রা. বললেন,

কিয়ামতের দিন যখন হক ও বাতিলকে আলাদা করে উপস্থিত করা হবে, তোমার কী মনে হয়, গান-বাদ্যিকে হকের সাথে রাখা হবে নাকি বাতিলের সাথে?

বাতিলের সাথে।

এই তো, তুমি নিজেই ফতোয়া দিয়ে দিয়েছ। এরপর আর কথা কী।

আর শোনো, কুরআন কারিমে (لَهْوَ الْحَدِيثِ) 'অনর্থক কথাবার্তা' বলে গানবাদ্যিকেও বোঝানো হয়েছে।

সাজুগুজু

এক মহিলা শুনল, যেসব নারী ভ্রু চিকন করে বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে এ-ধরনের অন্য কিছু করে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। মহিলাটি সাহাবির কাছে এসে জানতে চাইল,

আপনি কেন এমন করে অভিশাপ দিচ্ছেন?

নবীজি সা.-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তন করে সাজগোজকারিণীদেরকে লা'নত করেছেন, আমিও করেছি। কুরআনেও তা-ই আছে।

কুরআনে আছে? কই আমি পুরো কুরআনে এমন কোনও কথা পাই নি।

তুমি কি আয়াতটা পড়েছো?

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসুল তোমাদের যা দান করেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (হাশর: ৭)

জি, পড়েছি।

তাহলে আর কথা কীসের। নবীজির নিষেধ মানেই কুরআনের নিষেধ।

কুরআনের সন্ধানে

মাঝেমধ্যে দুয়েকজন মানুষের সাথে দেখা হয়ে যায়। কুরআন কারিমের প্রতি তাদের ভালোবাসা, অনুরাগ, সমীহবোধ দেখে নিজেকে ছোট মনে হয়। ভাবি, আমি তো কোনো যোগ্যতা ছাড়াই কুরআনের মহব্বতের দাবি করি। তাও আমলবিহীন ঠুনকো মহব্বত। এই মহব্বতের কোনও কার্যকারিতা কি আছে? আমলই যদি না করলাম, এমন ইলম তো খুব বেশি একটা সুফল বয়ে আনে না। অতীতের সাথে বর্তমানের পার্থক্যই তো এখানে। অতীতের সোনার মানুষগুলো যদ্দূর জানতেন তা-ই মানতেন। এখনকার মানুষগুলো খুব বেশি জানেও না, যতটুকু জানে তাও মানে না। আর যা মানে, তা কোনওরকম দায়সারাগোছের।

সেদিন একজন হুজুর এলেন। আমার চেয়ে অনেক বড়। বয়েসে ইলমে আমলে। কুরআন কারিম সম্পর্কে জানতে এসেছেন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমাদের মাদরাসায় একজন সুযোগ্য আলিম, কুরআন কারিম সম্পর্কে জানতে আসবেন, এটা আমাদের কাছে কল্পনাতীত বিষয় ছিল। কারণ, আমাদের মাদরাসায় মূলত কুরআন কারিমের প্রাথমিক স্তরের তরজমা আর তাহকীক নিয়ে কাজ হয়। তাফসির বা কুরআন কারিম নিয়ে উচ্চস্তরের কোনো মেহনত হয় না। আপাতত হওয়ার অবকাশও নেই। যোগ্যতাও নেই। ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ জানেন। আমাদের নিয়ত আছে।

হুজুরের আগমন থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো, আমাদের দেশে কুরআন কারিম নিয়ে মেহনত করার মতো মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। নইলে অযোগ্যদের কাছে কেন মানুষ ছুটে আসবে? একটা বিষয় বেশ ভাবিয়ে তুলল, আমাদের দেশে সুযোগ্য মুফতি সাহেব আছেন। সুযোগ্য মুহাদ্দিস আছেন। কিন্তু সব সময় কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন, এমন মুফাসসির বোধ হয় খুব বেশি নেই। তালিবে ইলমরা কুরআনি ইলমের আশায় ছুটে আসবে, এমন মানুষের বড় অভাব। ইলমুল হাদিস ও ইলমুল ফিকহের মতো ইলমুল কুরআনেও হক্কানি ওলামায়ে কেরামের মনোযোগ দেওয়া সময়ের দাবি। কুরআন বিষয়ে যোগ্য আলিমের অভাব নেই, অভাব শুধু কুরআন কারিম চর্চাকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো মানুষের। ইনশাআল্লাহ সময় বদলাচ্ছে। বদলাবে।

কুরআনই প্রথম

একদল কুরআন কারিমের প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখেও ফিকহকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। দ্বীনের কিছু জানার জন্যে প্রথমেই ফিকহের কোনও কিতাব নিয়ে বসে পড়ে।

আরেক দল কুরআন কারিমের প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখেও হাদিসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। দ্বীনের কিছু জানার জন্যে প্রথমেই হাদিসের কিতাব নিয়ে বসে পড়ে।

আরেক দল কুরআন কারিমের প্রতি মৌখিকভাবে পূর্ণ ঈমান রাখার কথা বলে হাদিস ও ফিকহ উভয়টাকে বাদ দিয়ে ফেলেছে। তারা দ্বীনের কিছু জানার জন্যে কুরআন নিয়ে বসে সত্য, কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যা করে নিজের মনগড়া। নিজেও গোমরাহ হয়, অনুসারীকেও গোমরাহির অতল গহ্বরে নিপতিত করে।

দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনও বিষয় সামনে এলে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি কি কুদুরি হিদায়ার দিকে যায় নাকি কুরআনের দিকে যায়?

দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনও বিষয় সামনে এলে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি কি 'বুখারি' শরিফের দিকে যায় নাকি কুরআনের দিকে যায়?

কুদুরি-হিদায়া কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফেরই ব্যাখ্যা।

বুখারি শরিফ কুরআন কারিমেরই ব্যাখ্যা।

হাদিস শরিফ ও ফিকহ কুরআন কারিমেরই ব্যাখ্যামূলক অংশ।

কিন্তু আমার দৃষ্টি সব সময় প্রথমে 'টেক্সটের' দিকে না গিয়ে 'নোটের' দিকে কেন যায়?

কী বললেন,

সাধারণ মানুষ কুরআন বুঝবে কীভাবে?

আরে ভাই, আগে থেকেই কুরআন বুঝবেন না, এটা ধরে নিলেন কেন? আর নিজে নিজে বুঝতে হবে কেউ বলেছে? যদি এমনই হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলাই দুইভাবে কুরআন কারিম নাজিল করতেন। একটা আলিমের জন্যে, আরেকটা 'আওয়ামের' জন্যে।

আলিমগণ কুরআন ও সুন্নাহ গবেষণা করে, যেসব কিতাব রচনা করেছেন, সেটা থেকেই 'আওয়াম' দ্বীন শিখবে। কুরআন বুঝবে।

তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আওয়াম আলিমগণের লিখিত কিতাবই পড়বে, কুরআন বোঝার চেষ্টা করবে না?

না না, তা কেন। আওয়ামও কুরআন পড়বে। তিলাওয়াত করবে।

-তার মানে, আওয়ামের জন্যে কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্যে নাজিল হয়েছে?

জি না, তা নয়। প্রয়োজনের সময় কুরআন ঘেঁটে সমাধান করতে করতে সময় লেগে গেলে, কাজটা করবে কখন? আওয়াম কুরআন বোঝার চেষ্টা করবে,

আলিমের কথা ও রচনা থেকে। নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করবে না। আবার না বুঝে শুধু আক্ষরিক তিলাওয়াত করেই সন্তুষ্ট থাকবে না। আপনি কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন। আমরা বুঝি একথা বলেছি, গুলি খেয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় কুরআন নিয়ে বসে যাবে সমাধান খুঁজতে? নাকি বলেছি, কুরআনকেই সবকিছুর মূল অক্ষ বানানোর কথা? মাসয়ালার জন্যে ফিকহের কিতাবের দ্বারস্থ হবে। নবীজিকে জানতে হাদিসের আশ্রয় নেবে। কিন্তু চিন্তা-চেতনায় কুরআনই প্রথমে থাকবে।

দুআ

কেউ কেউ এসে অভিযোগ করে বলে, কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে চাই, কুরআন কারিম নিয়ে মেহনত করতে চাই, কিন্তু দুয়েকদিন যেতে না যেতেই মন ভিন্ন দিকে ছোটে। ইস্তেকামত-অবিচলতা ধরে রাখতে পারি না।

-আপনি আগ্রহ ধরে রাখার জন্যে কী কী করেছেন?

-চেষ্টা করেছি। মনকে জোর করে কুরআন নিয়ে বসতে রাজি করিয়েছি! তাও হয় নি।

-দুআ করেছেন?

-জি, করেছি। তাতেও অবস্থার হেরফের ঘটে নি।

-দুআরও বিভিন্ন ধরন আছে। প্যারাসিটামল দুআ আর সাপোসিটর দুআ। দায়সারা গোছের হলে কোনওরকমে দুআ করেই খালাস। কিন্তু একরাতেই জ্বর নামাতে হলে সাপোসিটর লাগে। তুলনাটা শোভন হলো না, কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে। তাই একটু ...! রাব্বিগফিরলি।

আপনি কি সিজদায় গিয়ে দুআ করেছেন?

-জি না। করি নি। করার কথা মনেও আসেনি।

-ঠিক আছে, আজ থেকে আলাদা করে সালাতুল হাজত পড়ে, সিজদায় গিয়ে দুআ করবেন।

اللهمّ اجْعَلِ القرآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنا

আল্লাহুম্মা! কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন।

সিজদায় গিয়ে দুআ করা মানে একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে দুআ করা। একেবারে মুখের উপর গিয়ে কিছু চাওয়ার মতো।

কুরআনি জিহাদ

সাহাবায়ে কেরাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন কারিমকে সাথে রাখতেন। জিহাদের ময়দানে আরও বেশি করে সাথে রাখতেন।

(১). ইয়ারমুক: ইসলামি ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা. এই দিন বিভিন্ন স্কোয়াডে ঘুরে ঘুরে সূরা আনফাল ও জিহাদের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী তার তিলাওয়াত শুনে নব জোশে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। ধ্বসে পড়েছিল অপরাজেয় রোমান এম্পায়ার।

(২). কাদেসিয়া: প্রতিটি স্কোয়াডের জন্যেই পৃথক পৃথক 'কারী' নির্ধারণ করা ছিল। তারা নিয়মিত সূরা আনফাল ও জিহাদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে গেছেন। যুদ্ধের তীব্রতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করার সাথে সাথে তিলাওয়াতের মাত্রাও বেড়ে যেত।

(৩). যাতুস সাওয়ারি: কঠিন পরিস্থিতি ছিল। সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন সা'দের মনে কোনও ভয় নেই। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে নৌযানসমূহের পাশে সারিবদ্ধ করলেন। চমৎকার এক উদ্দীপনাময় খুতবা দিলেন। জিহাদের সময় কুরআন তিলাওয়াতের নসিহত করলেন। বিশেষ করে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করতে বললেন।

পলাতক মন

কুরআন তরজমার খতম শেষ হতে আর পনেরো পৃষ্ঠার মতো বাকি আছে। প্রতি বছর এ-সময়টাতে এসে রাজ্যের আলস্যি এসে ভর করে। থাক না, এত তাড়াহুড়োর কী আছে। আস্তেধীরে খতম করলেই হবে। কুরআন নিয়ে বসলেও মন একবার এদিকে যায়, আরেকবার ওদিকে যায়। রীতিমতো বর্ষার খলসে মাছের মতো। শুধু লাফাফাফি করে। আমিও মনের সাথে লোফালুফি করে সময় কাটাই। মনকে জোর করে কুরআনে এনে গাঁথি। মন আবার বরশি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া মাছের মতো ফস্কে যায়। আবার আধার ফেলে মনমাছটাকে ধরে আনি।

মনের এমন ঘাই দেওয়া অবস্থা দেখে প্রতি বছরই কিছু আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখি। কিন্তু শেষমেশ দেখা যায়, সব ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মন পগারপার হয়ে গেছে। এই যে এখন 'কুরআনি ভাবনা' লিখতে বসেছি, এটাও দুষ্ট মনের পালানোর একটা রূপ। না হলে এখন তরজমার দরসের প্রস্তুতি না নিয়ে, ভাবনা বিলাসের সুযোগ কোথায়?

কাঠবেড়ালির একটা দুষ্ট স্বভাব আছে। আমরা যখন বেড়ালিকে তাড়াই, সেটা পালালেও বেশি দূরে যায় না। কিয়ৎদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, পেছন ফিরে তাকায়, এখনো আছি না চলে গেছি। মাঝেমধ্যে মনে হয়, বেড়ালিটা আমার দিকে ফিরে ভেংচি কাটে। ভাবটা এমন, কী ধরতে পারলে? শুধু শুধু কেন আমার রসভঙ্গ করলে? কী আরাম করে কচি নধর ডাবটা চুকচুক করে 'পান' করছিলাম! আমার কুরআন ছেড়ে পালানো মনটাও আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে চোখ ঠারে আর বলে, আহ বেচারা!

বেড়ালের প্রিয় খাবার হলো ইঁদুর। বেড়ালের ইঁদুর শিকারের বিশেষ কায়দা আছে। বেড়াল ঢুলুঢুলু চোখে ওঁত পেতে বসে থাকে। বোকা ইঁদুর বেড়ালের চেষ্টাকল্পিত আলস্যের মাজেজা ধরতে পারে না। সে বেড়ালের নাকের ডগায় এসে ঘুরোঘুরি শুরু করে। বেড়াল আচানক স্প্রিংয়ের মতো তড়াক করে ঝমকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঁদুরটাকে কায়দামতো ধরার পরপরই কিন্তু বেড়লামামা ভোজনপর্ব শুরু করে না। শিকার নিয়ে একটু খেলাধুলা করে। বাঘমামারাও এমন করে থাকে। শিকার পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে এলে, তখন আহারপর্ব শুরু হয়। বছরশেষে মনের অবস্থাও এমন হয়ে যায়। আর কটা পৃষ্ঠা বাকি আছে। একনাগাড়ে পড়িয়ে শেষ করে দিলেই হিশেব চুকে যায়। না, মন তা করতে রাজি নয়। সে তার মনের কল্পিত চানাপোনাদের নিয়ে খেলতে শুরু করে। তবে আশার কথা হলো, শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছা হয়। সবই রাব্বে কারিমের অপার দয়া আর করুণা। তিনি তার কালামের সাথে লেগে থাকার তাওফিক দিয়েছেন।

আইসবার্গ

আমাদের সবক এখন সূরা আরাফে। এটাই শেষ সূরা। আগে ও পরের সব সূরার তরজমার দরস (ক্লাস) শেষ হয়েছে। আমরা প্রতি বছর একবার করে পুরো ত্রিশ পারা তরজমা পড়ি। সে ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে আছি বলা চলে। দরসের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তেইশতম আয়াত পড়তে গিয়ে হঠাৎ মাথায় বিরাট এক 'বরফখণ্ড' ঢুকে গেল। কী যন্ত্রণা চেষ্টা করেও বরফের প্রকাণ্ড চাঁইটা নামানো যাচ্ছে না। এই আয়াত থেকে মাথায় বরফখণ্ড চেপে বসার কোনও সূত্র বের করতে পারলাম না।

আরও বিপদ হলো, আইসবার্গ (বরফের চাঁই)-এর পিছু পিছু মাথায় এল টাইটানিক। বছরের শেষ। ভাবনা বিলাসের সুযোগ নেই। ঘরদোর, পড়াশোনা, দ্বীন-দুনিয়া সবকিছুকে সীমিত করে, সারাক্ষণ কুরআন কারিম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এখনো বেশ কয়েক পারা বাকি। খতম করতে হবে। শুধু পড়ে গেলে হবে না, প্রতিটি শব্দের বিস্তারিত অর্থ বলে, তবেই এগোতে হবে। এমন তুমুল ব্যস্ত সময়ে বরফ-পাহাড়ে চড়া কাজের কথা নয়। কিন্তু ভাবনাটা এসেছে, কুরআনের ছায়া ধরে। তাই একটু প্রশ্রয় দিতেই হয়।

গড়পড়তা একেকটা আইসবার্গের ওজন ১ থেকে ১০ হাজার টন। তবে সবচেয়ে বড় আইসবার্গের ওজন ১ কোটি ১০ লাখ টন পর্যন্ত হতে পারে। আইসবার্গ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার অবশ্য সংগত কারণ আছে। আইসবার্গকে বলা হয় সাগরের ভূত। রাতের অন্ধকারে বিশাল বরফের চলমান পাহাড়গুলো পানির তলায় নিমজ্জিত থেকে জাহাজের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি আইসবার্গের আঘাতেই 'টাইটানিক' ডুবে গিয়েছিল। ১৯১২ সালে আটলান্টিকে। আইসবার্গগুলোর উৎপত্তি উত্তর বা দক্ষিণ মেরু। দুই মেরু থেকে বিরাট আকৃতির

বরফের ঢাকা সাগরে নেমে পড়ে এবং ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে অজানার উদ্দেশ্যে।

আইসবার্গের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে মাথায় চিন্তাটা এসেছিল। যে-কোনও আইসবার্গের সাধারণত দশ ভাগের নয় ভাগ পানির নিচে থাকে। মাত্র এক ভাগ পানির ওপর ভেসে থাকে। এজন্য প্রথম দেখায় বুঝে ওঠা মুশকিল, সেটা আসলে কত বড়! দেখতে তো ছোটই মনে হয়।

আমাদের কুরআন কারিমও এমনই। মাত্র ছয় শ পৃষ্ঠার একটা বই। এই ক'টা পৃষ্ঠার মধ্যেই সুপ্ত আছে পূর্ব ও পরের সমস্ত 'ইলম'। আইসবার্গের সাথে কোনওভাবেই কুরআন কারিমের তুলনা চলে না। আইসবার্গের আয়তন নিরূপণ করা সম্ভব। কিন্তু কুরআন কারিম? অসম্ভব। কুরআন কারিমকে অনেকে মনে করে এটি আর আট-দশটা বইয়ের মতোই একটি বই। এমন ধারণা যারা করে, তাদের প্রতিক্রিয়া হয় দু-ধরনের,

১. তারা যখন কুরআন কারিম পড়তে শুরু করে, আস্তে আস্তে তাদের ধারণা বদলে যেতে শুরু করে।
২. আরেক দল কুরআনের কাছেও ঘেঁষে না। ফলে তাদের হিদায়াতও নসিব হয় না। ভুল ধারণা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়।

আমি কি কুরআন কারিমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারি?

আমি কি কখনো কুরআন কারিমের গভীরতার কথা ভেবেছি?

আমি কি কখনো কুরআন কারিমের অমিত শক্তির কথা ভেবেছি?

সম্মান ও আদর্শ

জীবন ও যৌবনের কী অবিশ্বাস্য অপচয়! ব্যক্তিকে দিয়ে কুরআন বোঝার কসরত করি। কুরআন দিয়ে ব্যক্তিকে মাপার মানসিকতা রাখি না। আহ, এমন কেন হয়? যাই ঘটুক, আমি তো প্রথমে কুরআনে আসবো, তাই না? তারপর সুন্নাহতে আসবো। কিন্তু প্রথমেই ব্যক্তিতে যাই! হ্যাঁ, আমি কুরআন ও সুন্নাহর বুঝ ব্যক্তি থেকেই নেব। কিন্তু আমি সঠিক ব্যক্তি থেকে কুরআন সুন্নাহ নিচ্ছি তো? আমার নির্ধারিত ব্যক্তির কুরআনি বুঝের সাথে খাইরুল কুরূনের ব্যক্তিগণের কুরআনি বুঝের মিল আছে তো?

আমার নির্ধারিত ব্যক্তির উপর কোনও রাষ্ট্রীয় চাপ নেই তো?

তাকে কথা বলা বলার আগে আগে পিছে অনেক ভাবতে হয় না তো?

তার চারপাশে কুফর-শিরক ঘিরে নেই তো?

তিনি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেই তো?

তাহলে তার কথা কি পুরোপুরি কুরআন ঘেঁষা হওয়া সম্ভব? তাকে তো বাধ্য হয়েও অনেক নমনীয় হয়ে যেতে হয়! এমন কেউ সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু আদর্শও কি হতে পারেন? সম্মান দেওয়া আর আদর্শের স্থানে রাখা, এ-দুইয়ের মাঝে তফাত করতে পারছি তো?

মূলধারা

এক মাদরাসায় পড়ে অন্য মাদরাসার কারো কাছে সাহিত্য বা জিহাদ বা রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শ চাইতে যাওয়া তালিবে ইলমগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

১. তাদের সাথে নিজের মাদরাসার কোনও হুজুরের খাস তা'আল্লুক নেই।

২. এরা সাধারণত দরসি লেখাপড়াতে দুর্বল।

৩. এরা দরসি লেখাপড়া না করে কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফ না বুঝেই সাহিত্যিক হতে চায়, মুজাহিদ হতে চায়।

৪. এদের অনেকের আমলি দিকটাও দুর্বল।

৫. মাদরাসার চেয়ে বাইরে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে।

৬. এরা অনলাইনেও বেশ সচল।

(এক) সেদিন এক তালিবে ইলম এল। সে কুরআন কারিম বুঝতে চায়। আমি বললাম,

-বছরের মাঝেই চলে আসবে?

-কেউ কিছু বলবে না।

-তুমি কুরআন কারিম বিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন করেই কুরআন বুঝতে চাও? তোমার এই চাওয়ায় বরকত থাকবে? আমার মনে হয় কি জানো, তুমি ওখানেও ঠিকমতো লেখাপড়া করছ না। তোমার সাথে ওখানকার কোনও উস্তাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক নেই! তুমি যে কোর্সে ভর্তি হয়েছ, সেটাও ঠিকমতো করছো না। তোমার মাথায় সাহিত্যিক হওয়ার ভূত চেপেছে। কি ঠিক বলি নি?

-জি।

(দুই) এক তালিবে ইলম কীভাবে যেন একেবারে গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির। সে বাঙলা ভাষায় বেশ পারদর্শী। আরও দক্ষতা অর্জন করতে চায়। কয়েকটা ছড়া-কবিতাও প্রমাণস্বরূপ নিয়ে এসেছে। বললাম,

-তুমি মাদরাসায় পড়ছ কয় বছর?

-'এত' বছর।

-আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে সূরা নাসের 'খান্নাস' শব্দটার অর্থ বোঝাও।

আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বললাম,

-আগে কুরআন কারিম বোঝ। তারপর বাংলা শেখো।

(তিন) বই পড়ে তার কীভাবে যেন ধারণা হয়েছে, আমি .....। সে দাওরার পর আল্লাহর রাস্তায় বিশেষ মেহনতে বের হতে চায়।

-কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি?

-তুমি সূরা তাওবা বোঝ?

-জি না।

-আনফাল?

-জি না!

-মায়েদা?

-জি না।

-মুহাম্মাদ?

-জি না।

-সিরাতের কোনও বই পড়েছ?

-জি না।

তুমি সূরা ফাতেহার তরজমা শুদ্ধ করে করতে পারবে?

-জি না।

শতভাগ বাস্তব চিত্র। সবাই এমন নয়। আমি মনে করি এরা দলছুট। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা কাম্য। এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। সবাই মনে করে, এরাই বুঝি মাদরাসার মূলধারা। বাস্তবে তা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, মূলধারায় কিছু কিছু অসাধারণ তালিবে ইলমের সাথে পাকেচক্রে দেখা হয়ে যায়। যারা অনেক কিছু জানে। অনেক কিছু বোঝে। অনেক কিছু অনুভব করে। অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখে। শুধুই দ্বীনের জন্যে।

ঘর্ষণ

শায়খ গাযালি রহ.। তিনি ইখওয়ানের বড় নেতা। তার একটা কিতাব পেয়েছিলাম অনেক আগে। নাম 'জাদ্দিদ হায়াতাকা'। তোমার জীবনকে নবায়ন করো। শায়খ বইটা লিখেছিলেন ডেল কার্নেগির অনুকরণে। সেকথা তিনি কিতাবেও স্পষ্ট করে বলেছেন। ছোটবেলায় মনে করতাম, আমাদের মতো বাংলাভাষীদেরই শুধু ডেল কার্নেগি বা ডা. লুৎফুর রহমানকে পড়ার প্রয়োজন হয়। আরবদের এসব প্রয়োজন হয় না। কারণ তারা কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফ সরাসরি বোঝে। প্রেরণা

লাভের জন্যে বাইরে কোথাও হাত পাততে হয় না। শায়খ গাযালির কিতাবটা দেখে ভুল ভেঙেছিল। বেশ অবাক হয়েছিলাম।

এসব বই পড়া ভালো না মন্দ সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। ইদানীং আরবে-আজমে অনুপ্রেরণামূলক দেদার বই বেরোচ্ছে। এসব বইয়ের ব্যাপক চাহিদাও আছে। নইলে এত বই বেরোচ্ছে কেন। অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে বইগুলো পড়ে। পাশাপাশি আরেকটা বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আজ কুরআন কারিমের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। সুন্নাহ-সিরাতের সাথে আমাদের সংযোগ নেই। তাই আলাদা করে অনুপ্রেরণামূলক বইয়ের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

এটা ঠিক, সালাফে সালেহীনের জীবনীতে আমাদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু সেটা হবে আমার জন্যে সাময়িক সিলেবাস। কুরআনই হবে মূল। সিরাতই হবে মূল। বাস্তবে হচ্ছে উল্টোটা। এতদিন ধার্মিক ছিল না, এখন ধর্মের পথে এসেও কুরআন কারিমে প্রবেশ করতে পারছে না। অনুপ্রেরণা খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্যদের কাছে। মানুষের জীবনীতে।

আবার কেউ কেউ কুরআনের কাছে এসেও ভুল পদ্ধতিতে প্রবেশ করছে। বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ-তাফসির পড়াকেই যথেষ্ট মনে করছে। তারা একটা ভুল বক্তব্যের শিকার হয়ে এমন করছে। তারা শুনেছে,

কুরআন শরিফ না বুঝে পড়লে কোনও ফায়েদা নেই।

ডাহা মিথ্যা কথা। চরম বিভ্রান্তিকর কথা। কুরআন বুঝে বুঝে পড়া যেমন আবশ্যক, তেমনি আমাদের মতো যারা আরবি বুঝি না, তাদের জন্যে দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে না বুঝে হলেও কুরআন তিলাওয়াত আবশ্যক। আমি মনে করি, আমাদের মতো যারা কুরআন বুঝি না, তারা যদি এক ঘণ্টা কুরআন বোঝার পেছনে ব্যয় করি, দুই ঘণ্টা ব্যয় করা উচিত দেখে দেখে তেলাওয়াত করার পেছনে। উভয় মেহনতই একসাথে চলতে থাকবে। দুই মেহনতের দুই ফায়েদা।

ক. বুঝে বুঝে পড়ার ফায়েদা হলো, এতে করে মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনার গিঁট-জট খুলবে।

খ. না বুঝে বেশি বেশি তেলাওয়াতের মাধ্যমে কলবের জং, দিলের ময়লা সাফ হয়।

তেলাওয়াত ও বোঝা এক ধরনের ঘর্ষণ বা পোঁচের মতো! ঘর্ষণে ঘর্ষণে মসৃণ হতে থাকে। পোঁচ দিতে দিতে রক্তক্ষরণ হয়। বিষাক্ত রক্ত বের হয়ে যায়। কলবে ও চিন্তায় শুদ্ধতা আসে।

শিল্পরুচি

মানুষ তার যৌবন ধরে রাখার জন্যে কত কী করে। বাঘের দুধ সংগ্রহ করে। তক্ষক সংগ্রহ করে। ব্যায়াম করে। সুষম খাবার খায়। ডায়েট করে। পানি খায়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও একসময় বার্ধক্য এসে হানা দিয়েই দেয়। আটকে রাখা যায় না। সাময়িকভাবে বার্ধক্যের প্রকাশটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। এর বেশি কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ তো গেল শরীরের যৌবনের কথা। মনের যৌবনের কথা বেশিরভাগ মানুষেরই মনে থাকে না। যারা সচেতন, তারা চেষ্টা করেন মনকে তারুণ্য উচ্ছ্বল রাখতে। কিন্তু কাজ হয় না।

ধর্মহীন সমাজ মনকে সতেজ রাখার জন্যে গান শোনে। ছায়াছবি দেখে। আর্ট একজিবিশনে যায়। 'ক্লাসিক' কোনও বই পড়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের রুচির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিছুদিন পরপরই আগের 'উপাদান' আর ভালো লাগে না। মনকে টানে না। একসময় তাদের মনে তৈরি হয় 'ডিপ্রেশন'। হতাশা। বিষণ্ণতা। ভয়। শূন্যতা।

ধর্মপ্রাণ সমাজের এসব সমস্যার বালাই নেই। তাদের মনকে সজীব রাখার জন্যে এতকিছু করতে হয় না। তারা জানে, আল্লাহর জিকিরই একমাত্র অব্যর্থ উপাদান, যা মনকে সজীব রাখে। প্রফুল্ল রাখে। আল্লাহর কালাম হলো শ্রেষ্ঠতম জিকির। এই জিকিরে অভ্যস্ত হলে রুচির পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। একদম ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত এক রুচিতেই জীবন পার। কুরআনি শিল্পরুচিতে কখনোই অরুচি ধরে না।

অনন্তযৌবনা

ওমর খৈয়ামের একটি লাইন এমন—

'মদ রুটি ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্তযৌবনা, যদি তেমন বই হয়।'

দুনিয়ার বই কি অনন্তযৌবনা হতে পারে? তাওহিদের মূলসূত্র অনুসরণ ছাড়া কোনও বইয়ের বক্তব্য চিরন্তন সত্যকে ধারণ করতে পারে না। ইলাহের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কোনও বই-ই অনন্তকাল ধরে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানব-মানবীর প্রেমমাখা বই হলে কালোত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সে বই কতটা মানবতার কল্যাণ সাধন করার যোগ্যতা রাখে, তা বলাই বাহুল্য।

কুরআন কারিমই একমাত্র অনন্তযৌবনা। কুরআন কারিমের সবকিছুই অনন্তকালকে ধারণ করে আছে। কুরআন কারিমের প্রতিটি শব্দই চিরন্তনতাকে ধারণ করে আছে। হাজার বছর অতিক্রম করেও কুরআন কারিম আজও প্রাসঙ্গিক। আরও

লক্ষ-কোটি বছর পার করেও কুরআন কারিম প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। অনন্ত অসীম কাল জুড়ে কুরআন কারিম সজীব থাকবে। জীবন্ত থাকবে।

সাহাবির ভয়

আহলে কুরআন, যারা কুরআন কারিম নিয়ে মেহনত করেন, কুরআন কারিম বোঝার চেষ্টা করেন, মানার চেষ্টা করেন, তাদের আত্মসমালোচনা কেমন? হযরত আবু দারদা রা.-এর একটা উক্তিতে চিত্রটা ফুটে উঠেছে। তিন বলেছেন,

-কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আলিম নাকি জাহেল? যদি বলি আমি আলিম, তাহলে কুরআন কারিমের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারেই আমাকে প্রশ্ন করা হবে। আদেশসূচক আয়াত হলে জানতে চাওয়া হবে, তুমি কি আয়াতের আদেশ যথাযথ পালন করেছিলে? নিষেধসূচক আয়াত হলে আমাকে জেরা করা হবে, তুমি কি নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থেকেছিলে?

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই, উপকারহীন ইলম থেকে, নম্রতাহীন কলব থেকে, তৃপ্তিহীন আত্মা থেকে, কবুলিয়্যতহীন দুআ থেকে (মুসলিম)।

কিতাবুল আখিরাত

১. কুরআনের নাম কী? কুরআন কারিমের অনেক নাম। কুরআনকে কিতাবুল আকায়েদ বলা যায়। কিতাবুত তাওহিদ বলা যায়। আরও বলা যায় কিতাবুল আখিরাত। কুরআন কারিমে ঘুরেফিরেই আখিরাতের আলোচনা। কুরআনের সব আলোচনাই শেষমেশ গিয়ে ঠেকে আখিরাতে।

২. বাইতুল্লাহ। কা'বার চারপাশে ঘুরে হাজারো আল্লাহপ্রেমিক তাওয়াফ করছে। নানা রঙের। নানা বর্ণের। ধনী। গরিব। একজন কালো মানুষও সবার সাথে তাওয়াফ করছে। আপনমনে জিকির করছে। শাদা ছড়ি ঠুকঠুক করে ভিড়ের বাইরে থেকে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করছে। গায়ে-গতরে অন্য আর দশজন আফ্রিকানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি শীর্ণ দেহকাঠামো। জীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। চোখে কালো ঠুলি। পায়ের পাতা আর গোড়ালি ফেটে ফালাফালা।

৩. অন্ধ মানুষ কত দূর থেকে হজ করতে এসেছে। আশপাশের লোকজন মায়াভরা দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। মানুষটাকে ঠেকে ঠেকে এগোতে দেখে, এক আরবের দিলে দরদ জেগে উঠল। কাছে গিয়ে মানুষটার কনুই ধরে সাহায্য করতে চাইল। অন্ধ মানুষটা সাহায্যকারীকে চমকে দিয়ে তিলাওয়াত করল,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

এবং মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে (হাজ্জ ২৭)।

৪. তিলাওয়াত শেষ করে আফ্রিকান একসেন্টে আরবিতে বলল,

-আরব ভাই! জাজাকাল্লাহু খাইরান। আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দাওয়াত সেই সুদূর 'বেনিন' থেকে এত দূর আসতে পেরেছি, বাকি কাজও আল্লাহর রহমতে করতে পারব।

৫. সাহায্যকারী আরব হাত গুটিয়ে নিলেন। কালো মানুষটার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করলেন। বোঝা গেল, এই লোকের আচরণ তাকে অবাক করেছে। মুগ্ধও করেছে হয়তো-বা। একটু পর আরবটি ভীষণ চমকে উঠল কালো মানুষটির একটি কথা শুনে। মানুষটা অনুচ্চস্বরে ভাঙা ভাঙা আরবিতে স্বগতোক্তি করলেন,

-আরব ভাই! আপনি আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। আপনাকে আমি দেখতে পারছি না। তবে দুআ করছি। ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে আমি আপনাকে দেখব।

৬. পাক্কা মুমিনের কথা। মুমিনের সবকিছুই হবে আখিরাতকে ঘিরে। দুনিয়ার অবস্থান সাময়িকের। ক্ষণিকের। কালো মানুষটা কী অনায়াসে আখিরাতকে হাজির করে ফেললেন! কুরআন কারিমের মূল শিক্ষা তো এটাই। আখিরাতই হবে মুমিনের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। আখিরাতকে ঘিরেই মুমিনের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হবে।

৭. কালো মানুষটা নিশ্চয় সব সময় আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকেন। নইলে এভাবে চট করে ছোট্ট প্রসঙ্গ থেকে এক দৌড়ে আখিরাতে চলে যাওয়া সহজ কথা নয়। প্রকৃত জীবন তো আখিরাতেই,

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত (আনকাবূত ৬৪)।

৮. আমার মনে কি ঘড়ির কাঁটার মতো সব সময় আখিরাত 'টিকটিক' করে ঘোরে? আমার মনের কম্পাসের কাঁটা কি হরওয়াক্ত আখিরাতের দিকনির্দেশ করে? ব্যতিক্রম হলে এখনো সচেতন হওয়ার সুযোগ আছে।

কুরআনের আলো

কুরআন কারিম নিয়মিত পড়া হয়, কুরআন কারিম বোঝার জন্যে মেহনতও করা হয়, কিন্তু কুরআন কারিমের আলো কলবে প্রবেশ করে না। দেখা যায়, বিরাট বড়

কুরআন গবেষক, কিন্তু নিজের মধ্যে নূন্যতম সুন্নাত নেই। কুফরের সাথে আপস। শয়তানের সাথে ওঠাবসা।

এর কারণ কী? উত্তরটা আল্লামা ইবনে কুদামা রহ.-এর একটা উক্তির নির্যাসে পাওয়া যেতে পারে,

'কুরআন কারিমের আলো না আসার কারণ হলো,

ক. কুরআন কারিম নিয়ে মেহনত করে পাশাপাশি নানাবিধ গুনাহেও লিপ্ত থাকে।

খ. কিবির-অহংকার নিয়ে কুরআন পড়তে বসে।

গ. কর্মকর্ম পালনের পাশাপাশি দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধও ইচ্ছামতো গ্রহণ করে।

এসবের কারণে কলবে

ক. জুলমত (অন্ধকার) ফয়দা হয়।

খ. জং ধরে যায়।

তিলাওয়াতে কুরআন

কুরআন কারিম বুঝে বুঝে পড়া ভালো। উপকার বেশি। সওয়াবও বেশি। কিন্তু না বুঝে পড়লে সওয়াব নেই যারা বলে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে। প্রতি হরফে দশ নেকি এটা না বুঝে তিলাওয়াতকারীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই বলা হয়েছে। না বুঝে পড়ার প্রতি যারা নিরুৎসাহিত করে, তারা আসলে সাধারণ মানুষকে কুরআনবিমুখ করার মিশনে নেমেছে।

কুরআন কারিম না বুঝে পড়লেও যে কত ফায়েদা, এটা তিলাওয়াতকারী ছাড়া কাউকে বোঝানো অসম্ভব। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করে দেখেছি, যারা এসব উল্টাপাল্টা কথা বলে, সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর প্রয়াস চালায়, তাদের জীবনে, কেন যেন খুব বেশি তিলাওয়াতে কুরআনের তাওফিক নসিব হয় না।

তবে হ্যাঁ, কুরআন কারিম বুঝে বুঝে পড়ার প্রতি যারা মানুষকে উৎসাহিত করে, পাশাপাশি না বুঝে পড়ার প্রতিও কটাক্ষ করে না, তারা সত্যিকার অর্থেই কুরআনপ্রেমিক।

জাদীদ আরবি

আরবি পড়তে পড়তে ঝুনো নারিকেল হয়ে গেছেন। কিন্তু কুরআনের সাথে সম্পর্ক নেই। কী হবে এই আরবিচর্চা দিয়ে। কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফকে একপাশে সরিয়ে রেখে দরকার নেই আমার আরবি সাহিত্যের ঢাউস ঢাউস কেতাব। পুঁথি। আদব। শে'র।

তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আরব বিশ্বে চাকুরির জন্যে আরবি শেখে, তার ব্যাপারটা আলাদা। হালাল রুজির জন্যে এটা করা যেতেই পারে। কিন্তু মাদরাসায় পড়ছে এবং তার রুজি-রুটির জন্যে আরবে যাওয়ার স্বপ্নও নেই, সে কেন কুরআন বোঝা বাদ দিয়ে অতিরিক্ত 'আধুনিক' আরবি নিয়ে মশগুল হবে?

জিজ্ঞেস করলে বলে,

কুরআন-হাদিস বোঝার জন্যেই আরবি শিখতে এসেছি।

কুরআন-হাদিস বোঝার সাথে কীভাবে আরবি বক্তব্য দেওয়া যায়, কীভাবে আরবিতে দরখাস্ত লেখা যায়, কীভাবে আধুনিক পত্র-পত্রিকা পড়া যায়, এসবের চর্চার কী সম্পর্ক?

এভাবে চর্চা করলে আরবিতে দক্ষতা জন্মায় তখন কুরআন বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়।

এসব না করে মোটামুটি আরবি বোঝার যোগ্যতা দিয়ে সরাসরি কুরআন বোঝার চেষ্টা করে দেখেছ? আধুনিক পত্রিকা বোঝার সাথে কুরআন বোঝার কী সম্পর্ক? হ্যাঁ, তুমি এটা বলতে পার, আমার বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ, তাই আরবি পত্র-পত্রিকা পড়া জরুরি। সেজন্য আরবি শিখছি। তাহলে ঠিক আছে। এমনকি আধুনিক তাফসির বোঝার জন্যেও 'জাদীদ আরবি' জানা থাকা ভালো। আধুনিক আরবি শিখতে হবে, সেটা নিয়ে আমাদের দ্বিমত আপত্তি কোনওটাই নেই। কথোপকথন-দরখাস্ত লেখাও শিখতে হবে। কিন্তু এগুলো যদি আমার আপাতত দরকার না পড়ে, তাহলে এসব ছেড়ে কুরআনের পেছনে ব্যয় করাই কি বেশি যুক্তিযুক্ত নয়?

কুরআনি পাঁচ

কুরআন কারিমের কিছু সূরাকে পাঁচটা ধাঁচে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগ: আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
সূরাতুল ফাতিহা। আনআম। কাহফ। সাবা। ফাতির। সবকটি মক্কী সূরা।

দ্বিতীয় ভাগ: আলিফ লাম রা দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
ইউনুস। হুদ। ইউসুফ। ইবরাহিম। হিজর। সবকটি মক্কী সূরা।

তৃতীয় ভাগ: নিদা বা সম্বোধন দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
নিসা। মায়িদা। হজ। হুজুরাত। মুমতাহিনা। সবকটি মাদানী সূরা।

চতুর্থ ভাগ: পাঁচটা সূরা শুরু হয়েছে 'তাসবিহ' দিয়ে।
হাদীদ। হাশর। সফ। জুমু'আ। তাগাবুন। সবকটিই মাদানী।

পঞ্চম ভাগ: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
আহযাব। তালাক। তাহরীম। মুয্যাম্মিল। মুদ্দাসসির।

ষষ্ঠ ভাগ: প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
দাহর। গাশিয়া। ইনশিরাহ। ফিল। মাউন।

সপ্তম ভাগ: আদেশসূচক শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচটি সূরা।
জিন। কাফিরুন। ইখলাস। ফালাক। নাস। সবকটি মক্কী।

খুলাসাতুল কুরআন

শায়খুত তাফসির মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, খুলাসাতুল কুরআন বা কুরআন কারিমের সারাংশ কী?

তিনটি বিষয়,

ক. ইবাদত।
খ. ইতা'আত। আনুগত্য।
গ. খিদমতে খালক। সৃষ্টির সেবা।

১. পরিপূর্ণ ইবাদত হবে আল্লাহ তাআলার।
২. পরিপূর্ণ আনুগত্য হবে হাবীব সা.-এর।
৩. রিয়ামুক্ত ইখলাসযুক্ত খেদমত হবে 'মাখলুক (সৃষ্টিজীব)-এর।

কুরআন রক্ষক

আমি কুরআন কারিম কতটুকু হিফজ করেছি তার চেয়ে বেশি জরুরি হলো, আমি কুরআন কারিম কতটুকু ধারণ করেছি সেটা। আমি কুরআনের হাফেজ কি না, সেটা মুখে বলার চেয়ে কাজে প্রকাশ করাটা বেশি জরুরি,

আমি ক্ষুধার্তকে আহার দান করি কি না?

আমি আমার প্রতি দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করি কি না?

আমি মা-বাবার প্রতি সদাচার করি কি না?

আমি পড়তে পড়তে বা হিফজ করতে করতে কুরআন কারিমের কোথায় পৌছলাম সেটার চেয়ে বেশি জরুরি হলো,

কুরআন কারিম আমার ভেতরে কতটুকু পৌছেছে সেটা।

কুরআন বোঝা

কুরআন কারিম বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কারো কারো একটা ভুল প্রায়ই হয়ে যায়—আমরা কুরআন কারিম বোঝার জন্যে বিভিন্ন তাফসির-তারজামা নিয়ে

বসি। লেকচার শুনি আর ভাবি—কুরআন বুঝে যাবো। উঁহু! চিন্তাটা একটু পরিবর্তন করে নেওয়া প্রয়োজন,

আমরা কুরআন বোঝার চেষ্টা হিশেবে তরজমা-তাফসির-লেকচারের আশ্রয় নেব সত্য, তবে এটা ভেবে বসবো না, এতে করে আমি কুরআন বুঝে যাবো। মনের মধ্যে রাখতে হবে, প্রকৃত বুঝ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক বুঝ আসার জন্যে সামান্য 'মাধ্যম' গ্রহণ করেছি মাত্র। আমার চেষ্টা আর মেহনত হিশেবেই আল্লাহ তাআলা আমাকে 'বুঝ' দান করবেন।

বাজারে গিয়ে একটা তাফসির কিনে বা পছন্দসই একজন শায়খের তাফসির শুনেই, কুরআন বুঝে যাবো, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কুরআন বোঝার জন্যে যত-যাই করি না কেন, পড়া ও শোনার পাশাপাশি 'দুআও' করতে হবে। শুধু কুরআন বোঝার দুআই নয়, কুরআনের সঠিক মর্ম বোঝার জন্যে, সঠিক মাধ্যম (তাফসির-লেকচার) গ্রহণ করার তাউফিকের জন্যেও দুআ করতে হবে।

ভাঙা-গড়া

কুরআন কারিম নিয়ে ভাবতে বসলে আমাদের বেশির ভাগেরই চিন্তায় ফুটে ওঠে একটা নিরীহ শান্তশিষ্ট আসমানি কিতাবের প্রতিচ্ছবি। মানুষকে ভালো হতে বলে। সুন্দর হতে বলে। সংশোধনকামী হতে বলে। এ-দিকগুলোই ওয়াজ-নসিহতে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। টিভি-মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

কিন্তু এটি হলো কুরআন কারিমের একটি দিক।

কুরআন কারিম একটি বিপ্লবী কিতাব, আন্দোলনের কিতাব, সংগ্রামের কিতাব, বিদ্রোহের কিতাব—এটি বলা হয় না সাধারণত। ইচ্ছে করেই এদিকটা এড়িয়ে যাওয়া হয়। আড়ালে রাখা হয়। কুরআন কারিম সমাজকে পরিবর্তনের কিতাব, হরকতের কিতাব, বাতিল বিধ্বংসী কিতাব, হকের প্রাসাদকে নির্মাণ করার কিতাব। কুরআন কারিম মুনকার-মন্দকে উপড়ে ফেলার কিতাব, কুফর-ভ্রান্ত উপাস্যকে তছনছ করে দেওয়ার কিতাব, জুলুম-অত্যাচারকে মিটিয়ে দেওয়ার কিতাব। যাবতীয় স্বৈরাচারকে উল্টে দেওয়ার কিতাব। কুরআন কারিম 'নূর' (আলো)-র কিতাব, কুরআন কারিম 'নার' (আগুন)-এর কিতাব।

কুরআন কারিমের শান্তশিষ্ট দিকটি দেখার ও শেখার পাশাপাশি বিপরীত দিকটাও দেখা-শেখা আবশ্যক। কুরআন কারিম শুধু সবলের নয়, দুর্বলেরও কিতাব।

কিতাবুল জিহাদ

না না, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর সুবিখ্যাত কিতাবটার কথা বলা হচ্ছে না। কুরআন কারিমের কথাই বলছি। কুরআন কারিমের প্রধান পরিচয় যদি

'হেদায়াতের কিতাব' হয়, তাহলে এ-কিতাবের অন্যতম প্রধান আলোচনা হলো জিহাদ। ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করলে কুরআন কারিম কিছুক্ষণ পরপরই জিহাদের কথা বলে। জিহাদ সম্পর্কে আমরা বুঝতে ভুল করি, ভাবতে ভুল করি। কিন্তু কুরআন কারিম 'সালাফের' মানহাজের আলোকে বুঝতে গেলে ঠিকই তার আসল রূপটা ফুটে ওঠে।

কুরআন কারিম আশ্চর্যরকমের মোহনীয় ও উদ্দীপক ভঙ্গিতে জিহাদের আলোচনা করেছে। যাবতীয় অন্যায় ও কুফরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছে। ঈমানি চেতনায় বলীয়ান হতে বলেছে।

সবর ও মুসাবারার কথা বলেছে। কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে বলেছে। প্রচণ্ড দুর্যোগের মুহূর্তে অটল-অবিচল থাকতে বলেছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বলেছে। শত্রুকে চিনতে বলেছে। শত্রুর শক্তি সম্পর্কে জানতে বলেছে। সীমান্তে যেতে বলেছে।

কুরআন তিলাওয়াতকারীর অবশ্য কর্তব্য হলো, কুরআন কারিমের এই 'প্রকৃতি' সম্পর্কে সচেতন হওয়া। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

এক্সপায়ার ডেট

বিভিন্ন বিদেশি বই কিনলে দেখা যায়, ছোট্ট করে লেখা থাকে,

'এই বই শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় বিক্রির জন্যে'

আগের নবীগণের কাছে ওহি আসতো। আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসতো। সেসব আসমানি কিতাবের আবার 'কান্ট্রিলক' থাকতো। মানে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে এই কিতাব অচল। প্রযোজ্য নয়।

বিভিন্ন পণ্যের 'এক্সপায়ার ডেট' থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের পর এই পণ্য ব্যবহার করা যাবে না। তদ্রূপ আগের কিতাবগুলোরও 'এক্সপায়ার ডেট' ছিল। কুরআন নাজিলের পর সেগুলোর কার্যকারিতা শেষ।

কিন্তু কুরআন কারিমের কোনও কান্ট্রিলক নেই। এক্সপায়ার ডেট নেই। কুরআন সব দেশের জন্যে। সব সময়ের জন্যে। কুরআন কারিম নাজিল হয়েছে সেই চৌদ্দশ বছর আগে। আজও এই কিতাব প্রাসঙ্গিক।

বাড়াবাড়ি

১. ইমাম সাহেব কোথাও গিয়েছেন। মুয়াজ্জিন সাহেবকে নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। মুয়াজ্জিন সাহেব অনভ্যস্ততার কারণে কেরাতে হোঁচট খেলেন।
২. জামাত শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব ফিরলেন। আজ নামাজ পাশের মসজিদে পড়েছেন। এলাকার কয়েকজন হর্তাকর্তা মুসলিম, ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। মুয়াজ্জিন সাহেব কেরাতে ভুল করেছেন।

৩. খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মুয়াজ্জিন সাহেব কেরাতে ভুল নয়, আটকেছেন। আবার দোহরিয়ে ঠিক করে পড়েছেন। ইমাম সাহেব পরে সুযোগমতো হর্তাকর্তাদের পাকড়াও করলেন,

'আপনারা অভিযোগ করেছিলেন মুয়াজ্জিন সাহেব কেরাতে ভুল করেছেন। কথাটা ঠিক নয়। তিনি এক জায়গায় আটকে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন, তিনি কোন সূরা পড়েছিলেন'?

গণমান্যরা চুপ। মুয়াজ্জিন সাহেব কোন কেরাত পড়েছেন সেটা মনে নেই? আচ্ছা, তিনি যে কেরাত পড়েছিলেন, সেটা কি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন? এবারও সবাই চুপ। ইমাম সাহেব এবার বললেন,

'মুয়াজ্জিন সাহেব কোন সূরা পড়েছেন সেটা মনে নেই। তার কেরাতে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন, সেটাও খেয়াল নেই। কিন্তু তাঁর নির্দোষ 'আটকে যাওয়া' এখনো মনে আছে? কোনটা বেশি জরুরি? কেরাতের ভুল ধরা, না আল্লাহ কী বলেছেন সেদিকে খেয়াল করা ও শিক্ষা লাভ করা'?

মাজারপন্থি

মনে বড় ব্যথা নিয়ে এসেছিল। বাবা মাজারপন্থি। দুনিয়ার সব খাজাবাবার অন্ধভক্ত। মিলাদ-কেয়াম-ওরশের নামে জানফিদা। এলাকার মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না। কারণ, ইমাম কওমি আলিম; খারেজি। বোঝালেও বোঝে না। উল্টো এমনসব কথাবার্তা বলে, ভয়ে চুপ মেরে যেতে হয়।

কুরআন পড়তে পারেন?

জি, তবে খুবই অশুদ্ধ। এলাকার নুরানি মক্তবেরও বিরোধিতা করেন। তার মতে, তারা আগে যেভাবে পড়েছেন সেটাই 'সহিহ'। তার পীরবাবারও একই মত। কোনও বই এনে দিলেও পড়েন না। বাংলাও খুব একটা পড়তে পারেন না।

এককাজ করতে পারবে, বাড়ি গেলে সুযোগমতো তাকে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করে শোনাবে।

শুনতে চান না। আমার পড়া নাকি শুদ্ধ নেই।

বলো কী, এ যে ভয়াবহ ব্যাপার। আচ্ছা, ভুল হলেও জোর করে সুযোগ বের করবে। যেভাবেই হোক তাকে কুরআন শোনাতে হবে। এ ছাড়া আর বিকল্প কোনও উপায় মাথায় আসছে না। তোমাকে হতে হবে ইবরাহিম আ.-এর মতো। তার বাবাও ছেলের হককথা শুনতে চাইতেন না। কিন্তু ছেলে ইবরাহিম হাল ছাড়েন নি। বাবা হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। ইবরাহিম দমে যান নি। দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তুমি মাদরাসায় কুরআন পড়ো। কুরআন তোমার সামনে ইবরাহিমের আদর্শ পেশ

করছে। তুমিও তোমার বাবাকে কুরআন শোনাও। কুরআন 'নূর'। কুরআন শিফা। কুরআন হিদায়াত। কুরআন আলো। ইনশাআল্লাহ। তোমার বাবার আশু আরোগ্য লাভ হবে। বাস্তবে হলোও তা-ই। প্রথম প্রথম কুরআন শুনতে চরম গাঁইগুঁই করলেও পরে ধীরে ধীরে নতিতে এসেছেন। কুরআনের ছোঁয়ায় বদলে না গিয়ে উপায় আছে?

কুরআনের পক্ষপুট

১. বর্ষায় নতুন বানের পানি এলে মাছেরা ডিম পাড়ে। ছানাপোনা ফোটায়। শোলমাছও একঝাঁক 'পুনপুনি' নিয়ে ঘোরে। এতগুলো সন্তনের গর্বিত মা হয়ে, মনের আনন্দে ভেসে বেড়ায়। ছানাপোনাগুলো নবজলে হুটোপুটি করে বেড়ায়। এত্তটুকুন বয়েসেও পোনাগুলো শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করে না। যেই মানুষ বা পাখি কাছাকাছি আসে, অমনি পোনাসোনাগুলো সুর-সুড়ৎ করে লুকিয়ে পড়ে।

২. প্রশ্ন হলো পোনাগুলো কোথায় লুকোয়? তাদের মায়ের মুখে গিয়ে লুকোয়। যখনই কোনও বিপদ আসে মা-শোল মুখব্যাদান করে দেয়। পোনাগুলো সব গিয়ে মায়ের মুখগহ্বরে আশ্রয় নেয়। শোল-মা পোনাদের নিয়ে পানির আরও গভীরে চলে যায়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হওয়া পর্যন্ত মা আর মুখ খোলে না।

৩. আমরা হলাম শোলপোনার মতো। কুরআন কারিম 'শোলমায়ের' মতো। কুরআন কারিম আমাদের দিকে সব সময় হাত বাড়িয়েই আছে। আমরা বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে যখনই কুরআনের দিকে ছুটে যাবো, কুরআন আমাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি কুরআনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে দেরি, যাবতীয় কুফর-শিরকের বিপদ থেকে মুক্তি পেতে দেরি হবে না। সামান্য শোলপোনা মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পরপরই তার 'আশ্রয়কেন্দ্র' চিনে যায়। আমি বুঝশক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়েও কেন আশ্রয়কেন্দ্র চিনতে ভুল করি?

কুরআনি মাদরাসা

কুরআন কারিম একটি 'মাদরাসা'।

একটি পাঠশালা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যায়তন।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় 'রেজা'-আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় 'সবর'।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় 'কানা'আত। আপ্তেতুষ্টি।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় ইয়াকিন।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় নিজের কাছে যা আছে, তা নিয়েই জীবন কাটাতে।

কুরআন তার শিক্ষার্থীকে শেখায় মাকারেমে আখলাক-অনুপম চরিত্র।।

মাদরাসাতুল কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার্থী সুসভ্য, মার্জিত, অল্পেতুষ্ট, ধৈর্যশীল, চরিত্রবান, মহৎ, দানশীল, সাহসী।

সাধারণ মাদরাসার সাথে মাদরাসাতুল কুরআনের পার্থক্য হলো, সাধারণ মাদরাসায় ছাত্ররা নির্দিষ্ট মেয়াদে পড়াশোনা করে। মাদরাসাতুল কুরআনে ছাত্রত্বের মেয়াদ আজীবন। গুরাবুড়া সবাই মাদরাসাতুল কুরআনের ছাত্র।

সালাফপাঠ

১. মুসলিম-অমুসলিম সবার মাঝেই কুরআন কারিমের প্রতি নতুন করে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়, কুরআন কারিমের হিদায়াত পুরোপুরি পেতে হলে শুধু কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন তরজমাপাঠ, তাফসিরপাঠ, কুরআন-বিষয়ক লেকচার-ওয়াজ-বয়ান শুনলেই হবে না। এতে কুরআনের 'জ্ঞান' হাসিল হবে, তবে পুরোপুরি কুরআনি হিদায়াত হাসিল না হওয়ার সম্ভাবনা।

২. কুরআন চর্চা করতে হবে সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পদ্ধতিতে। কুরআনপাঠের পাশাপাশি সিরাতপাঠ করতে হবে। সালাফের জীবনীও পড়তে হবে। প্রথম প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরাম কুরআনচর্চা করেছেন এভাবেই। তারা সরাসরি কুরআন পাঠের পাশাপাশি তরতাজা সুন্নাহ ও জীবন্ত সিরাহ পাঠও করেছেন। পাশাপাশি তারা একে অপর থেকে শিখেছেন। একে অপরকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আবু বকরকে দেখে উমার শিখেছেন, উমারকে দেখে আবু বকর শিখেছেন। এটাই ছিল তাদের 'সালাফপাঠ'। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের কুরআনপাঠ হয়েছে জীবন্ত। প্রাণবন্ত। কার্যকর। ফলপ্রসূ। যুগান্তকারী।

কুরআন ও আকল

১. আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করেছেন। পাশাপাশি আমাদেরকে 'আকল' দিয়েছেন। বোধবুদ্ধি দিয়েছেন। কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। কুরআনে এমন কোনও বিষয় থাকতে পারে না, যা চিন্তা বা বোধের অতীত।

২. কুরআনের মেয়াদ কিয়ামত পর্যন্ত। পৃথিবীতে কোনও সমস্যা হবে, কুরআনে সেটার কার্যকর সমাধান থাকবে না—এমনটা হওয়া অসম্ভব।

৩. কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সমস্ত মানুষের জন্যে হিদায়াত ধারণ করে আছে। কুরআনের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কুরআনে এমন কোনও বিধান নেই, যা কিয়ামত পর্যন্ত কোনও যুগের অনুপযোগী।

৪. কুরআন কারিমের কোনও বিধান বা বক্তব্যকে আমার কাছে যুগের অনুপযোগী মনে হলে, মধ্যযুগীয় মনে হলে, নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, আমিই যুগের অনুপযোগী। আমি নিজেই যুগের অনুপযোগী তো বটেই, আমি আইয়ামে জাহেলিয়াতযুগীয়। কুরআন নাজিলপূর্বযুগীয়। বর্বর।

৫. কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

আমার চিন্তা কুরআনের বিপরীত হলে, আমি 'মিথ্যুক'।
আমার চিন্তা কুরআনের বিপরীত হলে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
আমার চিন্তা কুরআনের বিপরীত হলে, আমি চরম পশ্চাৎপদ।
আমার চিন্তা কুরআনের বিপরীত হলে, আমি ভয়ংকর ক্ষতির মধ্যে আছি।
আমার চিন্তা কুরআনের বিপরীত হলে, আমি চরম অজ্ঞ। জাহেল। খবিস। পেত্নি।

ছাদের উপাদান

দালানবাড়ির ছাদে তিনটি উপাদান থাকে। কঙ্কর, সিমেন্ট আর লোহা। যে-কোনও ঘরে তিনটি বিষয় থাকে। দেওয়াল, ছাদ ও দরজা। কারও কারও মতে, প্রতিটি সূরায়ও মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে। ছোট সূরাগুলোতে তিনটির একটি বা দুটি থাকে।

১. আল্লাহ তাআলার সিফাত ও কুদরতের আলোচনা। সিফাত মানে আল্লাহর গুণাবলি বা সত্তাগত বৈশিষ্ট্য। কুদরত মানে ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

২. নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী প্রেরণ।

৩. মৃত্যুর পুনর্জীবন। কিয়ামত। হিসাব। প্রতিদান ও শাস্তি।

মুসলিমমাত্রই এই তিনটি বিষয়ে আকিদা-বিশ্বাস রাখতে হয়। কুরআন মানেই এই তিনটি বিষয়। প্রতিটি সূরাতেই এই বিষয়গুলো বারবার আলোচিত হয়েছে। যে-কোনও সূরা পড়ার সময় এই তিনটি মৌলিক ধারা মাথায় রাখা জরুরি। মনে রাখা জরুরি, একটি ঘরে যেমন ছাদ-দরজা-দেওয়াল ছাড়া আরও অসংখ্য বিষয় আছে, কুরআনেও শুধু এই তিনটি বিষয়ই আলোচিত হয় নি; আরও নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। উক্ত তিনটি বিষয় সামনে রেখে তিলাওয়াত করলে কুরআন কারিমের ভেতরে প্রবেশ করা কিছুটা সহজ হবে বৈ কি। রাব্বে কারিম তাওফিক দান করুন।

ক্যালিগ্রাফি

কোনও কোনও আলিম কুরআনি আয়াতকে ক্যালিগ্রাফির ধাঁচে লেখা অপছন্দ করেন। কুরআন কারিম সহজ। পড়া সহজ। বোঝা সহজ। প্যাঁচিয়ে-ঘুরিয়ে

লিখলে, শুরু-শেষ বোঝা দায়। কোনটা কোন হরফ তা বোঝাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এটা একপ্রকার কুরআন কারিমের সম্মানহানি। কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্যের সাথেও খাপ খায় না। দেওয়াল বা শিল্পের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে কুরআন নাজিল হয় নি। কুরআন নাজিল হয়েছে তিলাওয়াতের জন্যে, তাদাব্বুরের জন্যে, হিদায়াতের জন্যে।

ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চা করতে গিয়ে কুরআনি আয়াতকে ময়ূরের আকৃতিতে, ঘোড়ার আকৃতিতে, নানা পশুপাখির আকৃতিতে লেখা হয়ে থাকে। এটাও একপ্রকার কুরআন অবমাননার শামিল।

শিল্পচর্চাকে শরিয়ত নিরুৎসাহিত করে না। শরিয়ত সৌন্দর্যবিরোধী নয়। বর্তমানে ক্যালিগ্র্যাফি শিল্প জটিলতার যে পর্যায়ে পৌছেছে, শুরুতে এমন ছিল না। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল, কুরআন কারিমকে সুন্দর আর সহজ করে লেখার চর্চা করা। যাতে তিলাওয়াতকারী সহজে স্বচ্ছন্দে তিলাওয়াত করতে পারে। কালের বিবর্তনে এই শাস্ত্র আপন উদ্দেশ্যচ্যুত হয়ে জটিলতা আর দুর্বোধ্যতার দিকে মোড় নিয়েছে। এখন আধুনিক কবিতার মতো আধুনিক ক্যালিগ্রাফিও যত জটিল, তত উন্নত—এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ-ব্যাপারে ভিন্নমতের আলিমও আছেন। তবুও আমরা বলব, যে পন্থাতেই কুরআনচর্চা করা হোক, তার মূল উদ্দেশ্য যেন 'হিদায়াত' হয়। জটিল ক্যালিগ্রাফিচর্চায় যদি উম্মাহর হিদায়াতের ক্ষেত্রে কোনও উপকার হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে। এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিমগণের দ্বারস্থ হওয়াই বেশি নিরাপদ।

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ

১. আমরা সাধারণত মনের ৪০% ভাব প্রকাশ করি কথার মাধ্যমে। বাকি ৬০% প্রকাশ করি ইশারারা মাধ্যমে। এই ইশারা ভাষাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (Sign language)'। বধিররা তাদের মনের পুরো ভাবই প্রকাশ করে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে।
২. সারা বিশ্বে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন ভার্শন আছে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সরকারিভাবে স্বীকৃত। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজও রীতিমতো মেহনত করে শিখতে হয়।
৩. তবে কিছু সাইন আছে স্বতঃসিদ্ধ। সব দেশে, সব যুগে একরকম। হাসি। কান্না। উপর-নিচে, ডানে-বামে মাথা দোলানো। চোখ বড় বড় করা। ভ্রূ কুঁচকে ফেলা। গাল ফোলানো। জিভ বের করে ভেংচি কাটা। বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ইত্যাদি।
৪. গ্রামবাংলার অবোধ শিশু থেকে শুরু করে দুনিয়ার শেষ মাথার অতি বৃদ্ধও এসব সাইনের মর্মাথ অনায়াসে বুঝতে পারে। মজার বিষয় হলো, সব জায়গায়

ডানে-বামে মাথা দোলানো মানে 'না'। কিন্তু তামিলনাড়ুর লোকেরা ডানে-বামে মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝায়। আরও ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

৫. সর্বজনবিদিত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মতো আল্লাহর ওহিও সর্বজনবিদিত। আল্লাহর কালাম সর্বজনবিদিত। সবার বোঝার উপযোগী। গ্রামের নিরক্ষর চাষি থেকে শুরু করে মেরু অঞ্চলের এস্কিমো—সবার জন্যেই এক কুরআন। এক ওহি। এক নসিহত। এক জীবনাদর্শ।

৬. কুরআন কারিম আমার বুঝশক্তির সাধ্যের সীমাতেই আছে। আমি কি চেষ্টা করে দেখেছি কখনো?

মানস বন্দর

১. কুরআন আমাদের জন্যে মানস বন্দরস্বরূপ। পৃথিবীর যে প্রান্তেই জাহাজ যাক, তাকে ঘুরেফিরে আপন বন্দরেই ফিরে আসতে হয়। কুরআন কারিম মুমিনের মনোবন্দর। মুমিন যত দূরেই যাক, যেখানেই থাকুক, তাকে একসময় না একসময় তার মূল বন্দরে ফিরে আসতেই হয়। কুরআন কারিম ছাড়া মুমিনের আর কোন বন্দর থাকতে পারে?

২. ঝড়-তুফানে, বৃষ্টি-বাদলায়, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায়, উত্তাল ঊর্মিমালায় জাহাজ ফিরে আসে নিজ বন্দরে। আশ্রয় নেয় পোতাশ্রয়ে। মুমিনও দুঃখে-কষ্টে, ব্যথা-বেদনায়, আশা-নিরাশায় আশ্রয় নেবে কুরআনের ছায়াতলে। ফি যিলালিল কুরআন।

৩. অনেক মুমিন ভুল করে এদিক-সেদিক চলে যায়। ঘুরপাক খেতে থাকে দুনিয়ার নানা চোরা ঘূর্ণিতে। শেষে তাদের কুরআনে ফিরে আসতেই হয়।

৪. কুরআন আমাদের মানস বন্দর। কুরআন আমাদের একমাত্র পোতাশ্রয়। কুরআন আমাদের আলো ঝলমলে বন্দর। কুরআন আমাদের মুক্তির বন্দর।

চিন্তার নোঙর

নোঙরের কাজ কী? জাহাজকে আটকে রাখা। বন্দরে ভেড়ার পর নোঙর ফেলে নাবিক নিশ্চিন্ত মনে নেমে যায়। আর ভয় নেই। ঝড়-তুফান এলেও জাহাজ বন্দর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। অবশ্য ঝড়ের প্রকোপ তীব্র হলে কখনো কখনো নোঙরের কাছি ছিঁড়ে জাহাজ মাঝদরিয়ার চলে যায় বা ডুবে যায় বা হারিয়ে যায়।

আমাদের চিন্তারও নোঙর আছে। কুরআন ও সুন্নাহ হলো মুমিনের চিন্তার নোঙর। এক অদৃশ্য কাছির মাধ্যমে মুমিনের ঈমান-আকিদার নোঙর কুরআন কারিমের সাথে বাঁধা থাকা আবশ্যক। দ্বীনের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতে গেলেই যেন নোঙরে টান খেয়ে আবার শরিয়তের চৌহদ্দীতে ফিরে আসতে পারি। ঝড়ের প্রবল ঝাপটা

মাঝেমধ্যে যেমন নোঙ্গরের কাছি ছিঁড়ে ফেলে, আমিও যদি শরিয়তের বাইরে যাওয়ার জন্যে সব সময় ছটফট করতে থাকি, তাহলে দেখা যাবে একসময় আমার মনের নোঙ্গরের কাছি ছিঁড়ে গেছে। আমি চেষ্টা করব, সব সময় নোঙ্গরের কাছিকে নিরাপদ রাখতে। যাতে লাগামহীন হয়ে পাপের মাঝদরিয়ায় গিয়ে হাবুডুবু না খাই। চেষ্টা করব কুরআনের সাথে সব সময় লেগে থাকতে।

জাবর কাটা

তালিবে ইলমদের বলি, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে শুধু কুরআন নিয়ে ভাববে। কুরআন নিয়ে থাকবে। কুরআন নিয়ে ঘুমুবে। এমনকি ভাতের সাথেও কুরআন কারিম খাবে। যখন-যাই করো, সেই কাজ, সেই মুহূর্ত, সেই ভাবনা, সেই পাঠের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন আয়াত খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

শুধু কুরআন তিলাওয়াতের সময়ই নয়, কুরআন শরিফ থেকে দূরে অবস্থানের সময়ও কুরআনকে সাথে মাথায় রাখবে। অন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রেও আমরা তালিবে ইলমদেরকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলি। একটি সূরা পড়া হয়েছে, একটি অধ্যায় পড়া হয়েছে, সাথে সাথে কুরআন/কিতাব বন্ধ করে, মনে মনে জপবে, এতক্ষণ কী পড়লাম। কী শিখলাম। কী অর্জন করলাম।

গরু দেখেছ? কিছুক্ষণ বেঁধে রাখলে গরু কী করে, আগে খাওয়া ঘাসগুলো আবার বের করে এনে চিবুতে থাকে। এটাকে বলে জাবর কাটা। শিক্ষাক্ষেত্রেও জাবর কাটা পদ্ধতি বেশ কার্যকর। গরু একবারের খাবারকে কয়েকবারের খাবারে পরিণত করতে পারে। পাশাপাশি রশিতে বাঁধা থাকার বিরক্তিকর মুহূর্তকে জাবর কাটার মাধ্যমে উপভোগ্য আর সুখকর করে তোলে। তুমি আমিও পারি, কুরআনি আয়াতকে চিন্তার জাবর কাটার মাধ্যমে একান্ত আপন করে তুলতে।

বসে আছি, ভাবতে শুরু করি আমার প্রিয় আয়াত কী কী? কোন কোন আয়াত আমাকে জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমি আদৌ কোনও আয়াত মনে করতে পারছি কি না? না পারলে কিছু আয়াতকে আপন করে নেওয়ার প্রক্রিয়া কেন এখন থেকেই শুরু করে দিচ্ছি না?

কুরআনি ফুসফুস

১. ফুসফুস শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। ফুসফুসের প্রধান কাজ বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্তপ্রবাহে নেওয়া এবং রক্তপ্রবাহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে নিষ্কাশন করা।

২. ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। খকখক করে কাশি আসে। ধোঁয়াচ্ছন্ন স্থানে বেশিক্ষণ থাকলে মানুষ বা প্রাণী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

৩. দুনিয়ার জীবনের পাপ-পঙ্কিলতাও ধোঁয়ার মতো। বেশিক্ষণ এই বিষাক্ত ধোঁয়ায় অবস্থান করলে ঈমানি ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে।

৪. কুরআন কারিম ঈমানের ফুসফুস। দুনিয়ার বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে বাঁচতে হলে কুরআনি ফুসফুসের আশ্রয় নেওয়া জরুরি। পাপ কাছে ঘেঁষতে চাইলে দ্রুত কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেব। কুরআন আমার ঈমানকে সচল করে তুলবে। দুনিয়ার ধোঁয়া আমার ঈমানকে দুর্বল করে তুললে কুরআন সেটাকে সবল করে তুলবে।

৫. ফুসফুস বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে আমার রক্তপ্রবাহে সরবরাহ করে। কুরআন কারিমও আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়াতের আলো আমার ঈমান-আকিদায় সরবরাহ করে।

৬. ফুসফুস আমার রক্তপ্রবাহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আলাদা করে বাতাসে নিষ্কাশন করে। কুরআন কারিমও আমার ঈমান-আকিদায় মিশে থাকা গুনাহ-কুফরের 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' নিষ্কাশন করে, আমার ঈমান-আকিদাকে বিশুদ্ধ করে তোলে।

৭. কুরআন কারিম হোক আমার ঈমান আমলের ফুসফুস। কুরআন কারিম হোক আমার চিন্তা-চেতনার মূলরক্তপ্রবাহ।

কুরআনি 'বাছুর'

গতকাল আমাদের মাদরাসার ইফতিতাহী দরস (বছরের প্রথম ক্লাস) হয়েছে। তালিবে ইলমদের কুরআন কারিমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে একটা দৃশ্যকল্প মাথায় এল। দশ মিনিট ধরে যা বোঝাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম, দৃশ্যকল্পটার সাহায্যে সহজেই বোঝানো সম্ভব হয়েছে,

১. গাভীর দুধ দোহন করার দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনেই আছে। রাতের বেলা বাছুর বেঁধে রাখা হয়। যাতে দুধ গাভীর ওলানে জমা হয়ে থাকে। গাভীর ওলানে আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত রেখে দেওয়া আছে, ঠিক তেমনি কুরআন কারিমেও ইলমের সাগর জমা করা আছে।

২. সকালে দুধ দোহন করার সময় বাছুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাছুরটা ছুটে এসে মায়ের ওলানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাগলের মতো চুকচুক করে দুধ পান করতে শুরু করে। বেরসিক মালিক তখন বাছুরকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে আলাদা করে অদূরে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এবার ছ্যাঁ ছোঁ করে দুধ দোহন করতে শুরু করে।

৩. দুধ দোহন করার আগে বাছুরকে মায়ের ওলানে একটুখানি দুধ খেতে দেওয়ার কারণ হলো, বাছুরবৎসল গাভী অদ্ভুত উপায়ে ওলান থেকে দুধ উঠিয়ে রাখে।

মালিক দুধ দুইতে গিয়ে দুধ পায় না। বাছুর মুখ দিলে মাভী (মা+গাভী) দুধ ছাড়ে।

৪. ছেলেবেলায় দীর্ঘদিন গো-পালন ও গো-চারণের কাজে থাকতে হয়েছিল। আমাদের একটা গাভী ছিল বেশি চালাক। দুধ দোহনের আগে বাছুর মুখ দিলে দুধ ছাড়তো। বাছুর বেঁধে রাখলে সাথে সাথে দুধ উঠিয়ে নিত। বাঁট ধরে শত টানাটানি করেও একফোঁট দুধ বের হতো না। ভারি মুশকিল! কী করা যায়? আম্মু একটা বুদ্ধি বের করেছিলেন। বাছুর বাঁধার আগে করতেন কি, একটা ভেজা চুপচুপে কাঁথা গরুর পিঠে চাপিয়ে দিতেন। আর যাবে কোথায়। ঠান্ডা ও চাপের কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণে হোক, গরু দুধ উঠিয়ে নিতে পারত না।

৫. ওলানে দুধ নামাতে হলে বাছুর লাগে। কুরআন কারিমে সুপ্ত থাকা ইলম নামাতে হলেও আরবি ভাষা আগে। মেহনত লাগে। চর্চা লাগে।

৬. বাছুরকে মায়ের ওলান থেকে পৃথক করতে চাইলে বাছুর যেমন আরও মরিয়া হয়ে রশি ছিঁড়ে মায়ের ওলানের দিকে ছুটে যেতে চায়, আমাদেরও এমন হওয়া উচিত। যত বাধাই আসুক, আমরা সব বাধাবিঘ্ন দলে কুরআন কারিমের দিকে ছুটে আসব।

কুরআনি যোগ্যতা

আমাদের মাঝে কুরআন কারিম নিয়ে কাজ করেন এমন অনেক মুমিন-মুসলিম আছেন। তাদের যোগ্যতার স্তর কিন্তু এক নয়।

১. অত্যন্ত যোগ্য আলিম। কোনও তাফসির তরজমা দেখা ছাড়াই সরাসরি কুরআন থেকেই কুরআন বুঝতে পারেন। কুরআনের গভীরে পৌঁছতে পারেন।

২. আলিম। আরবি-তরজমা তাফসির দেখে কুরআন বুঝতে পারেন।

৩. আরবি পারেন না। বাংলা ও ইংরেজি বই-লেকচারের সাহায্যে কুরআন বোঝার চেষ্টা করেন।

আমার ব্যক্তিগত খেয়াল, প্রথম দলের কুরআনি মেহনতগুলোর উপর বেশি আস্থা রাখা উচিত। শায়খুল ইসলাম তকি উসমানি (দা.বা.) এমন একজন। তার তাওযীহুল কুরআনের উপর তাই আস্থা রাখা যেতে পারে। এই কিতাবের বাংলা অনুবাদ যিনি করেছেন, তিনিও প্রথম স্তরের যোগ্যতার অধিকারী অত্যন্ত যোগ্য আলিম। এর বাইরেও বাংলাভাষায় কুরআন কারিম নিয়ে কাজ করা, যোগ্য আলিম থাকতে পারেন, তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি না জানার কারণে, মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ।

অবশ্য কুরআন কারিম নিয়ে মেহনতকারীদের আরেকটি স্তরও হতে পারে,

৪. যারা সরাসরি সবকিছু বোঝে না, তাফসির দেখেও অনেক কিছু ভালো করে বোঝে না। বাংলা-উর্দু-ইংরেজি-আরবি মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। তারপরও অনেক জায়গা বোঝে না। তখন উস্তাদ বা যোগ্য বন্ধু আলিমদের কাছ থেকে বুঝে নেয়। আমার ব্যক্তিগত খেয়াল, আমি এই স্তরে আছি।

কুরআনি হিদায়াত

কুরআন কারিমকে বলা হয়, নবীজির স্থায়ী মু'জিযা বা অলৌকিক বস্তু। কিয়ামত পর্যন্ত এই মু'জিযা টিকে থাকবে। কীভাবে মু'জিযা? কুরআনের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটানো যায়? কুরআনের মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করা যায়? অসুস্থকে সুস্থ করা যায়?

সরাসরি হয়তো যায় না, তবে অন্যভাবে যায়। কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়াতের উৎস হিশেবে থাকবে। দুনিয়ার সমস্ত বই মিলে যা পারবে না, কুরআনের একটি আয়াত তা পারবে। কুরআনের মু'জিযা মানে শুধু তার ভাষা ও বিন্যাসগত অলৌকিকত্ব নয়, এর বাইরে আরও অনেক কিছু।

আমার কাছে মনে হয়, কুরআন কারিমের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যে-কেউ প্রকৃত হিদায়াতের পিয়াসী হয়ে কুরআনের আশ্রয় নিলে, সে কিছুতেই বঞ্চিত হবে না। হিদায়াত পেয়েই যাবে। ভ্রান্তি তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আফ্রিকার গহিন বনেও যদি কেউ কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, তার বেঁচে যাওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা।

কুরআন ব্যাখ্যা

কুরআন কারিমের সব কথা অকাট্য সত্য। বিজ্ঞানের সব কথা এখন পর্যন্ত অকাট্য নয়। বিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব সময়ের সাথে সাথে ভুল প্রমাণিত হয়। তাই বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য। কুরআন নাজিলের সময় ছিল না, চৌদ্দশত বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন কিছুকে কুরআন ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো ঝুঁকিপূর্ণ। শতভাগ নিশ্চিত না হলে, নতুন কিছুকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা নিরাপদ নয়। আমি বিজ্ঞানের একটি সূত্র দিয়ে কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করলাম, পরে দেখা গেল সূত্রটি ভুল, কাফির-অবিশ্বাসীরা এটা দেখে কুরআন সম্পর্কে কেমন ভাববে? তাদের সন্দেহের মাত্রা কি আমি আরও বাড়িয়ে দিলাম না?

কুরআন ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান একেবারে বর্জন করব—এমন চিন্তাও সঠিক নয়। তবে সতর্ক থাকা কাম্য।

আকিদার কিতাব

এখন একটা প্রশ্নের বেশ চল!

-আকিদা-বিষয়ক কিছু বইয়ের নাম সাজেস্ট করুন তো!

ব্যস, হুড়মুড় করে দেদার বইয়ের নাম আসতে থাকে। আকিদা ঠিক করার জন্যে একটা বইই যথেষ্ট! কুরআন কারিম। আল্লাহর পরিচয় জানার জন্যেও। আল্লাহ তাআলাকে ভালো করে চেনার জন্যে কী করা যেতে পারে?

আল্লাহ তাআলাকে চেনার সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর মাধ্যম হলো কুরআন কারিম। বিশেষ করে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনা সংবলিত আয়াতগুলো নিয়মিত বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আমলে দৃঢ়তা আসে।

সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো। সূরা রা'দ, সূরা ফুরকান, সূরা ফাতির, সূরা মুলক। এসব সূরায় আল্লাহর পরিচয়, বড়ত্বকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়ে হয়েছে। একটু খেয়াল করে, নিজের একটা রুটিন বানিয়ে নিতে পারি। আল্লাহর পরিচয়কে নিবিড়ভাবে জানার জন্যে সূরাগুলো মাঝেমধ্যে পড়তে পারি।

কুরআনের দাওয়াত

কুরআন কারিমের আলোচনা ভালো লাগে না! তবে আধুনিক পদ্ধতিতে হলে শোনা বা পড়া যেতে পারে। কেন? পুরোনো পদ্ধতিতে হলে কী সমস্যা? নতুন পদ্ধতিতে, আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে, কুরআনের প্রচার-প্রসার করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বলছি, শুধু কুরআন আমার ভালো লাগে না কেন? এই প্রশ্নটা নিজেকে করতে শেখা। গণমানুষের কাছে কুরআন কারিমকে পৌছাতে হলে আধুনিক গণমাধ্যমের আশ্রয় নিতে হবে—এটা এখন নতুন কোনও কথা নয়। নতুন হলো, গণমাধ্যমের কাছে আমরা কুরআন কারিমের খণ্ডিতাংশ পেয়ে থাকি। যারা গণমাধ্যমে কুরআনের প্রচার-প্রসার করেন, তারা যদি স্বনামে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন, তাহলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি কুরআনের খণ্ডিতাংশেরই দাওয়াত দিচ্ছেন। এবং এটাকে তিনি যথেষ্ট মনে না করলেও, তার শ্রোতারা একসময় এই খণ্ডিতাংশকেই 'পুরো' কুরআন বলে বিশ্বাস করছে। কুরআন কারিম থেকে ব্যতিক্রমী কোনও বক্তব্য সামনে এলে তারা মানতে চায় না। তারা বিশ্বাস করে, এমন কথা কুরআনে নেই। থাকলে, তাদের সেই 'দায়ী' অবশ্যই বলতেন।

খতমে কুরআন

এই রমজানে সারা বিশ্বে কুরআন কারিমের কতগুলো খতম হয়েছে? এক কোটি খতম? হতে পারে। কিন্তু কয়জনে বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করেছে? তাদের সামনে

কি প্রায় ২১৪টা জিহাদের আয়াত পড়ে নি? তাদের মনে কি কোনও ভাবনা জাগে নি? তাদের কি ক্ষীণতম প্রশ্নও জাগে নি,

-আজ কি কোথাও কুরআনি আইন বাস্তবায়িত আছে?

থাকলে আমি কি তাদের সাথে আছি? তাদের সহযোগিতায় আছি?

না থাকলে, আমি কি বাস্তবায়নের জন্যে কিছু করছি? করার ফিকির আছি? করার চেষ্টা করছি?

তারা কি কুরআনের কথাগুলো মন দিয়ে পড়ে নি? কুরআন তাদেরকে কিতাল করতে বলেছে। কাফিরদের প্রতি কঠোর হতে বলেছে। কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছে। যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাও তাদের দলভুক্ত। এসব কথা কি তাদের চোখে পড়েনি?

কুরআনি নেসাব

গত পরশু উখিয়া থানার কুতুপালং মুহাজির ক্যাম্পে হাফেজ তালিবে ইলমদের পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে। হাফেজদের সাথে পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে, এবার দাওরা থেকে ফারেগ হওয়া তালিবে ইলমকে। তারা এ-বছর ক্যাম্পের মাদরাসায় দাওরা পড়েছেন।

ঢাকা থেকে যাওয়া বড় বড় ওলামায়ে কেরাম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ওখানে গেলে চেষ্টা করি, বেশি বেশি মানুষের সাথে কথা বলতে। বিশেষ করে ছোটদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। মুরুব্বিগণ পাগড়ি প্রদানে ব্যস্ত আছেন। এই ফাঁকে পেছনে বসে ছোটদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। একটি বিষয় মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে,

মুহাজির ভাইদের জন্যে নেসাবটা একটু ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। শুরু থেকেই উর্দু-ফারসির চেয়ে কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফের উপর বেশি জোর দেওয়া জরুরি। আমার মনে হয়, তাদেরকে বেশি বেশি কুরআন কারিমের সাথে জুড়ে দেওয়া জরুরি। তারা আবারও সেই গতানুগতিক ধারার পড়াশোনায় ফিরে যাচ্ছে। কোনও জনগোষ্ঠী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে, সরাসরি কুরআন কারিমকে আঁকড়ে ধরা তখন সময়ের দাবি হয়ে যায়। সেটা মুহাজির ভাইদের বেলায় হচ্ছে না।

ফিকহ্

সেদিন ঘটনাক্রমে এমন মানুষের সাথে দেখা। তার কাছে শরিয়ত মানে শুধুই কুরআন। সাথে থাকবে কিছু সুন্নাহ, যেগুলোর সাথে কুরআনের বাহ্যত কোনও বিরোধ নেই। কুরআন কারীম ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন কিছু সহীহ হাদীসের বাইরে সবকিছুই কুফরি আর ভ্রষ্টতা। তার দৃষ্টিতে 'ফিকহশাস্ত্র' হলো

'পোকা'। জালিয়াতি আর গৌজামিলের নাম। তাসাউফকে ঢালাওভাবে একবার কুফরিও বলে ফেললেন।

একটা পর্যায় পর্যন্ত চিন্তাটা সুন্দর। সামান্য আগে বাড়লেই নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। তার কথা হলো, সবকিছু কুরআনেই পাওয়া যাবে। বাইরে যাওয়ার দরকার পড়ে না। আমি জানতে চাইলাম,

-তাহলে সাধারণ মানুষ কী করবে? তারা তো কুরআন বোঝে না?

-কেন তারা আলিমের কাছে যাবে?

-এই তো লাইনে এসেছেন,

-মানে?

-আলিমের কাছ থেকে কুরআনের যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে, সেটাই 'ফিকহ'। আপনি যেটাকে পোকা বলে নাক সিঁটকাচ্ছেন।

আলোচ্য বিষয়

গত তিন দিন টেকনাফে মুজাহির ভাইদের খেদমতে কাটানোর তাওফিক হয়েছিল। আসা-যাওয়ার পথে বিভিন্ন মাদরাসায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। অনেক তালিবে ইলমের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের কথাবার্তা ঘুরেফিরে পাঁচটা বিষয়েই ঘুরপাক খায়,

১. কুরআন কারিম।
২. সিরাত ও সুন্নাহ।
৩. মুসলিম বিশ্ব ও বিশ্বরাজনীতি।
৪. কুরআন কারিম।

সবার সাথে কথা বলার সময় একট বিষয় বেশ অবাক লেগেছে, আমরা কেউ কেউ, বড় বেশি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মানুষের কথা জানার জন্যে আমরা কত শ্রম ব্যয় করি। নিজ মতাদর্শের আলিম বা শায়খের কথার পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর জন্যে প্রাণপাত করি। কিন্তু আল্লাহর কালামের একটি আয়াত নিয়ে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করতে আমাদের মন সায় দেয় না। অথচ শত শত বান্দার শত শত কথার ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেয়ে, আল্লাহর কালামের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর মেহনতে সময় কাটানোর মাঝে আমার সুনিশ্চিত সাফল্য। তবুও কেন যেন আমরা বান্দার কথা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকি।

কেউ কেউ আমাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন,

-আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্যেই 'তিনাদের' কথা বোঝার পেছনে সময় ব্যয় করি।

-ঠিক আছে বুঝতে থাকুন।

কুরআনি ইলম

স্বাভাবিক নিয়ম হলো উস্তাদের কাছে শাগরিদ লেখাপড়া শেখে। কিন্তু কখনো ব্যতিক্রমও হয়ে যায়। খোদ উস্তাদই শাগরিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কুরআন কারিমের নিসবতে মাঝেমধ্যে কিছু এমন তালিবে ইলমের সাথে দেখা হয়ে যায়, যারা ইলমে ও আমলে উস্তাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। আমাদের মাদরাসায় আমরা মেহনত করি শুধু কুরআনি শব্দ ও শাব্দিক তরজমা নিয়ে। এর বেশি কিছু করার যোগ্যতা আমাদের নেই। শব্দ ও তরজমাতেও আমরা এখনো অত্যন্ত কাঁচা। এখনো শেখার পর্যায়ে আছি। কিন্তু কেউ কেউ সুধারণাবশত মনে করেন, আমাদের এখানে উচ্চতর কুরআনি মেহনত চলে। তাই সুযোগ পেলে পড়তে আসেন। এসে দেখেন, তাদের ধারণাটা সঠিক নয়। এখানে শুধুই প্রাথমিক স্তরের মেহনত চলে। আমাদের কাছে তার পাওয়ার মতো কোনও ইলম বা যোগ্যতা নেই। কেউ হতাশ হয়, কেউ নিরাশ হয়। চলে যায়।

এই ফাঁকে আমাদের একটা লাভ হয়ে যায়। এমন যোগ্য কেউ এলে, আমরা উল্টো তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব কুরআনি ইলম শিখে রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলার এক আজিব কর্মকৌশল। আমরা হন্যে হয়ে খুঁজেও যাকে পেতাম না, তার কাছ থেকে শিখতে পারতাম না, রাব্বে কারিম অন্য ছুতোয় তাকে আমাদের কাছে হাজির করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ!

কুরআনি ঘর

অনেকের মুখেই অভিযোগ শোনা যায়ঃ মনে শান্তি নেই। ঘরে-পরিবারে নানা অশান্তি আর কলহ লেগে আছে। এই বিবেচনায় ঘরগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়,

১ঃ সম্পূর্ণ কুরআন কারিম মুক্ত। কুরআন কারিম পড়া হয় না। কুরআন কারিমের কথা ভাবা হয় না। তবে গানবাদ্যি টিভি-সিনেমা পুরোদমে আছে। এই বাড়ি পুরোপুরি শয়তানের দখলে।

২ঃ কুরআন কারিমও আছে পাশাপাশি গানবাদ্যিও আছে। এই বাড়ির অর্ধেকটা শয়তানের দখলে।

৩ঃ শুধুই কুরআন কারিম আছে। গানবাদ্যির কোনও স্থান নেই।

আমার ঘরে সুখ-শান্তির পরিমাণ নির্ভর করবে, কুরআন কারিম থাকার পরিমাণের সাথে। যতটুকু কুরআন কারিম থাকবে, ঠিক ততটুকু সুখ থাকবে। পুরোপুরি ধর্ম মেনে চলে, এমন কিছু পরিবার থেকেও, কখনো কখনো মনোমালিন্যের অভিযোগ আসে, অশান্তির রেশ বের হয়ে আসে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে কুরআনের সাথে লেগে থাকার পরিমাণে ঘাটতি আছে। কুরআন তিলাওয়াতে

কুরআন তাদাব্বুরে ঘাটতি আছে। কুরআন বলছে, জিকির করলে শান্তি পাওয়া যাবেই। শান্তি আসবেই।

কুরআনের প্রতীক্ষা

এখনকার মানুষকে বিভিন্ন প্রজন্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। একেক বয়েসের মানুষ একেকটি বিষয় নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। কেউ মোবাইলের লেটেস্ট মডেল নিয়ে, কেউ লেটেস্ট মুভি নিয়ে, কেউ নির্বাচন নিয়ে, কেউ টকশো নিয়ে, কেউ ফ্যাশন নিয়ে, কেউ টিভি সিরিয়াল নিয়ে, কেউ দল নিয়ে, কেউ পদ নিয়ে, কেউ চাকুরি নিয়ে।

কিন্তু সোনালি যুগে, মক্কা ও মদীনার আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবাই বুঁদ হয়ে থাকতো একটি বিষয়ে। সর্বশেষ কোন আয়াত নাজিল হলো? ঘরের নারীর একটা চোখ সব সময় উৎসুক থাকত, বাইরের পুরুষের চোখ-কান-মন অধীর হয়ে থাকত নতুন কোনও আয়াতের প্রতীক্ষায়।

বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটলে, অধীর হয়ে প্রতীক্ষায় থাকি, আপডেট জানার জন্যে। বিশেষ কোনও উপলক্ষ্য সৃষ্টি হলে, তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো অনলাইন-অফলাইনে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকি, তারপর কী হলো, সেটা জানার জন্যে। মেগা সিরিয়াল উত্তেজনাময় কোনও পর্যায়ে শেষ হলে, পরের পর্বের জন্যে খাওয়া-নাওয়া ভুলে প্রতীক্ষার প্রহর গুনি।

কুরআনী প্রজন্মের মানুষগুলো, আমাদের এসবের প্রতীক্ষার চেয়েও লক্ষগুণ বেশি আগ্রহ নিয়ে দিনরাত গুজরান করতেন, নতুন একটি ওহির জন্যে। নতুন একটি আয়াতের জন্যে।

কুরআন বোঝা

কুরআন কারিম বোঝার দুটি স্তর আছে।

১. ফাহমে কুরআন। নিজে কুরআন কারিম বোঝা।

২. তাফহীমে কুরআন। অন্যকে বোঝানো।

ফাহমে কুরআন বা কুরআন কারিম বোঝার অধিকার সব বান্দার আছে।

কিন্তু তাফহীমে কুরআন বা অন্যকে কুরআন বোঝানোর অধিকার সব বান্দার নেই। দুটি স্তরের জন্যেই কিছু যোগ্যতা প্রয়োজন। আমরা এখন শুধু নিজে বোঝার দিকটাই দেখব। ফাহমে কুরআনের জন্যে তিনটি যোগ্যতা থাকা জরুরি।

১. আরবি ভাষা জানা। শুধু শাব্দিকভাবে জানলে চলবে না, তৎকালীন আরবদের পরিভাষা সম্পর্কেও জানা থাকা জরুরি। পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণ।

২. শানে নুযুল জানা। এটা শিখতে হবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভালো জানাশোনা না থাকলে শানে নুযুল জানা অসম্ভব।
৩. আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে আয়াতটা নাজিল করেছেন, সেটা জানা। এটা জানতে হলে নবীজি সা.-কে জানতে হবে। হাদিস শরিফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআনি লড়াই

বছরের শুরুতে যখন আমরা কুরআনি সফর শুরু করি, প্রথম প্রথম মনে হয়, খুব একটা কঠিন হবে না। সহজেই পুরো ত্রিশ পারার তরজমা শেষ করে ফেলা যাবে। এই চিন্তার সূত্র ধরে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে,

১. এত তাড়াহুড়োর কী আছে, অল্প অল্প করে পড়াও!

২. পড়ানোর সময় গল্পগুজবও করো। তাহলে তালিবে ইলমরা আনন্দ পাবে।

৩. শুধু তরজমা আর শব্দ বিশ্লেষণ করে কী হবে, তাফসিরও পড়িয়ে দাও।

প্রতিবারই শয়তানের এই পাতা ফাঁদে পড়ব না পড়ব না করেও পড়ে যাই। দেখা যায়, কোনও দিন এক পৃষ্ঠা কোনও দিন আধা পৃষ্ঠা পড়িয়েই ক্ষান্ত হই। অথচ নিয়ম হলো প্রতিদিন তিন পৃষ্ঠা করে সবক দিতে হবে। নইলে খতম শেষ করা যাবে না। কে শোনে কার কথা! অল্প অল্প করে পড়িয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুরফুরে ঘুরে বেড়াই। ভাবি, এখনো পুরোটা বছর হাতে আছে। কদিন পরই 'সিরিয়াস' হয়ে শুরু করে দেব।

তবে অলসতারও একটা উপকার আছে। শেষ মুহূর্তে জানপ্রাণ দিয়ে লড়তে হয়। এই লড়াইয়ের আনন্দ বলে বোঝানোর মতো নয়। চব্বিশ ঘণ্টা কুরআন নিয়ে থাকতে হয়। সারাক্ষণ কুরআন কারিমের সাথে লেগে থাকার মাঝে যে কী অপূর্ব ভালো লাগা জড়িয়ে থাকে, অভিজ্ঞগণই বলতে পারবেন।

কুরআনচর্চা

কুরআন কারিম নিয়ে নানা করমের গবেষণা হয়। মুসলিম অমুসলিম অনেকেই গবেষণা করে। অমুসলিমদের গবেষণার ধরন দুইটা;

ক. কুরআন কারিমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে গবেষণা। তাদের গবেষণার বিষয় সাধারণত শব্দকেন্দ্রিক হয়। ভাষাকেন্দ্রিক হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক হয়।
খ. কুরআন কারিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে গবেষণা। তাদের মূল লক্ষ্যই থাকে, কুরআন কারিমের খুঁত বের করা। মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা।

মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন, তাদেরকেও মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়,

ক. শব্দ ও ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণা। হিদায়াত গ্রহণও উদ্দেশ্য থাকে, তবে হিদায়াতের প্রভাব তাদের কারও কারও জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না।

খ. কুরআন কারিমের হিদায়াতের দিকটাই তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এজন্য মাঝেমধ্যে শব্দকেন্দ্রিক মেহনত চালালেও ঘুরেফিরে হিদায়াতকেন্দ্রিক মেহনতে ফিরে আসেন। তারা চান, কুরআন কারিমের মাধ্যমে নিজেও হিদায়াত পেতে, অন্যদের কাছেও হিদায়াত পৌঁছাতে। তাদের জীবনেও হিদায়াতের প্রভাব দেখা যায়।

খ্রিস্টান হাফেজা!

আমরা সেনেগালের ফালাঙ্গারা শহরে ছিলাম। রাজধানী ডাকার থেকে ৪০০ কিলোমিটার গহিনে। চরম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-অর্থনীতি সবদিকেই পিছিয়ে পড়া একটি এলাকা। অবশ্য পুরো দেশের অবস্থাই এক। খ্রিস্টান মিশনারিদের দৌরাত্ম্য মহামারি আকার ধারণ করেছে। রোগবালাই আর অশিক্ষা-কুশিক্ষার অভিশাপ মিশনারিদের জন্যে 'বর' হয়ে দেখা দিয়েছে। খ্রিস্টানদের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সামনে সামান্য খড়কুটোর মতো দেখালেও, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, ছোট্ট একটা চক্ষুশিবিরের আয়োজন করলাম। ব্যাপক সাড়া পড়ল। স্বেচ্ছাসেবীরা রোগী সামাল দিতে হিমশিম খেতে লাগল। শিবিরের আগে আমরা ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিলাম। বাগদাদ ইউনিভার্সিটি, ব্রিটেনের লিভারপুল ইউনিভার্সিটি, কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির পাশ করা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করা হবে—এমনটাই ফলাও করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সদ্যজাত শিশু থেকে শুরু করে শতবর্ষী বৃদ্ধ কে আসে নি চক্ষুশিবিরে!

এতদিন পর সেদিনের শত শত রোগীর কথা আলাদা করে মনে থাকার কথা নয়। তবে এক কিশোরীর কথা কিছুতেই ভোলার নয়। বয়েস দশের চেয়ে কিছু বেশি হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। পাঁচ বছর বয়েসে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। হালকা ছোট্ট এক অপারেশনেই কিশোরীর চোখের সমস্যা দূর হয়ে গেল। চোখের পট্টি খোলার পর মেয়েটি বিশ্বাস করতে পারছিল না, সে দেখতে পাচ্ছে। বাবা-মায়ের চোখে অশ্রু। মেয়েটির চোখে অশ্রু। বুড়ি নানিও নাতনিকে দেখতে এসেছে। বুড়ির চোখেও অশ্রু। চোখ মেলিয়া দেখার আনন্দে, তিনপ্রজন্ম গা-জড়াজড়ি করে কাঁদছে, দেখার মতো দৃশ্যই বটে। ডাক্তারদের চোখও ভিজে উঠল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা দয়ালু ডাক্তারদের ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। চোখে সুখের কান্না।

যাওয়ার আগে কিশোরী অপারেশনকারী ডাক্তারের সাথে দেখা করে যাবার বায়না ধরল। আমি তখন আরেক বৃদ্ধার ছানিকাটায় ব্যস্ত ছিলাম। হাতের কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলাম। কিশোরী দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বিব্রত আমি

আবেগতাড়িত কিশোরীকে নিয়ে অফিসে বসালাম। সাথে বাবা-মা, বুড়ি নানি আরও অনেকে। জানতে চাইলাম দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে তোমার প্রথম কাজ কী হবে? দৃষ্টিশক্তিকে তুমি কোন কাজে লাগাবে?

'আমি কুরআনে হাফেজ হবো।'

আমি ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি খ্রিস্টান হয়ে কুরআনে হাফেজ হতে চাও'? কিশোরীর সরল উত্তর, আমার এক মুসলিম বান্ধবী আছে। সে বলেছে হাফেজ সন্তানের বাবা-মাকে পরকালে নূরের টুপি পরানো হবে। আমার বাবা-মা আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন। আমি অন্ধ হওয়ার পর আমাকে কিছুই করতে দেন নি। রাজকুমারীর মতো আদরযত্ন দিয়ে লালন-পালন করেছেন। রাতবিরেতে প্রয়োজন দেখা দিলে বাবা-মা দুজনেই জেগে উঠেছেন। ধরাধরি করে বাহির থেকে ঘুরিয়ে এনেছেন। আমি 'অন্ধ', এটা আমাকে বুঝতেই দেন নি। পড়তে না পারলেও আব্বু প্রতিদিন কষ্ট করে সাইকেল চালিয়ে মিশনারি স্কুলে নিয়ে গেছেন। আবার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে স্কুল থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার মনে হয়েছে, তাদের এই কষ্টের প্রতিদান, একমাত্র কুরআনে হাফেজ হলেই দেওয়া সম্ভব হবে।

-ডা. আবদুর রহমান সুমাইত রহ.

কুয়েতি দাঈ।

সান্ত্বনা

এক অশ্রুত অদেখা 'মানবী' 'আই লাভ কুরআন' বইটা কিনে মাহরামের মাধ্যমে পাঠালেন। কিছু লিখে দিতে বললেন। তখন ব্যস্ত থাকায়, কী লিখব মাথায় কিছু আসছিল না। বইটা রেখে যেতে বললাম। পরদিন কিছু লিখে ফেরত দেব। ভোররাতে লিখতে বসে মাথায় এল, যে পাঠিয়েছে, জাগতিক কারণে, তাকে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ভাঙা মনের একজন মানুষ কুরআন বিষয়ে পড়তে চাচ্ছে, এটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু কী লেখা যায়? এমন কিছু লিখতে হবে, যা তার টুটাদিলে 'মরহাম'-এর কাজ করবে। পাশাপাশি বর্তমান জীবনকে আখিরাতের ছন্দে ফিরিয়ে আনবে,

জীবন বহতা নদীর মতো। জোয়ার-ভাটা, স্বচ্ছ বা ঘোলা পানি নিয়ে নদী সাগর পানে বয়ে চলে। জীবনও তা-ই। জোয়ার-ভাটা, স্বচ্ছ-ঘোলা যাই হোক, জীবন থেমে থাকে না। থেমে থাকতে দেওয়া যায় না। জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য? জান্নাত। আমি দেখব এখনকার জীবনটা জান্নাতের উপযোগী আছে কি না। এটা সম্ভব হতে পারে কুরআনকে আঁকড়ে ধরলে।

একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু কে? অবশ্যই আল্লাহ তাআলা।
একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গী কে? অবশ্যই কুরআন কারিম।

তাহলে জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত মোড় আমাকে নিঃসঙ্গ করতে পারে?
উঁহু, মোটেও না।
আমার আছে রাব্বে কারিম।
আমার আছে কুরআন কারিম।
যখন-তখন সালাতের মাধ্যমে রবের একান্ত সান্নিধ্যে চলে যেতে পারি।
যখন-তখন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রবের সাথে কথা বলতে পারি।
তাহলে আর কীসের কষ্ট? কীসের নিঃসঙ্গতা?

কুরআন পেয়ে ধন্য যারা!

আঁধারে আলো

আমি ক্যারেন ড্যানিয়েলসন। অসম্ভব ভালোবাসতাম কুমারী মাতা মেরিকে। ভালোবাসতাম সতীত্ব ও পবিত্র জীবনযাপনকে। আমি চার্চেই আলোর সন্ধান পেয়েছি। আমার পরিবার ছিল অত্যন্ত খোলামেলা। ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে আমেরিকার উদ্দাম জীবন ভালো লাগত না। আমার 'ফিতরাহ' তখনই আমাকে বলত এটা ভালো নয়। ব্যাপারটা অবাক করা হলেও সত্যি। আমি সে বয়েসে দুআ করতাম, 'গড আমাকে সঠিক পথ দেখান'। চার্চের কাজকর্ম আমার পছন্দ হতো না।

মা ছিলেন ক্যাথলিক। বাবা কোনও ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। একদিন স্কুলের একটি ঘটনায় আমার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। স্কুলের সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী মনে করে লাইন থেকে বেরিয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলাম। একটি ছেলে আমাকে বলল, তুমি কেন চার্চে যাচ্ছ না? তোমার চার্চে যাওয়া প্রয়োজন। আমি বললাম, আমি চার্চে গিয়েছি। সেখানে গড নেই। তাহলে তুমি ভুল চার্চে গিয়েছ।

ছেলেটির কথা শুনে আমার মধ্যে সেই বয়েসেই ভাবান্তর দেখা দিল। চিন্তা করতে লাগলাম। সত্যি সত্যিই কি আমি ভুল চার্চে গিয়েছি? তার কথাই বোধহয় ঠিক, আমি আমার উপযুক্ত স্থানে যেতে পারি নি। বিভিন্ন চার্চে যেতে শুরু করলাম। কোথাও মন বসে না। একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল চার্চের সন্ধান পেলাম। একদিন সেখানে হাজির হলাম। চার্চটি ছিল খুবই কনজারভেটিভ। কড়া রক্ষণশীল। এখানে মদ্যপান, ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি যুবক-যুবতিদের ডেট করতে পর্যন্ত নিষেধ করা হতো।

আমি নিজেকে যাজিকা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করলাম। মা প্রথমে নান হওয়াটা মেনে নিতে পারলেন না। তারপরও এ-ভেবে আশ্বস্ত হলেন, মেয়ে ভালো পথেই যাচ্ছে। তিনি রাজি হলেন। আমাকে খ্রিস্টান কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমি বাইবেল কলেজে গেলাম। নান হওয়ার জন্যে। বাইবেল কলেজে আমি একটা কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে কিছু সিরিয় যুবক ছিল। তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল। আমি ভেবেছিলাম তারা যেহেতু ভালো, তাই খ্রিস্টান না হয়ে যায় না। মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। মুসলমান হলেও ভালোত্বের কারণে শেষপর্যন্ত খ্রিস্টান হবেই হবে।

তাদের একজন আমাকে বলল, তুমি আমাদেরকে বাইবেল পড়ার উপদেশ দিচ্ছ, আমি যদি তোমাকে কুরআন পড়তে বলি তুমি কি পড়বে? আমার কুরআন পড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে বলল, তুমি যদি আমার কাছ থেকে কুরআন নাও তবেই আমি তোমার কাছ থেকে বাইবেল নেব। তার প্রস্তাব আমার কাছে ভালো লাগল। আমি খুশি। আমি কুরআন নিলেও একভাবে তার হাতে নিউ টেস্টামেন্ট যাচ্ছেই। আশা করা যায়, সে খ্রিস্টান হবে।

আনলামই যখন একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক। এই ভাবনা থেকে কুরআন নিয়ে বসলাম। এই প্রথম কুরআনের মুখোমুখি হলাম। কুরআনখানা হাতে নিয়ে ওল্টাতে প্রথমেই তৃতীয় পারা এল। সূরা আলে ইমরান। এমনি এমনি গা-ছাড়া ভাব নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। সুবহানাল্লাহ। সেখানে আমি ঈসা সম্পর্কে আলোচনা পেলাম। আমি ভীষণ ভীষণ অবাক। কুরআনে যেসাসের আলোচনা আছে? আমার কল্পনাতেও ছিল না, এখানে আমি যেসাসকে পাব। শুধু যেসাসই নয়, মারইয়াম, যাকারিয়া প্রায় সব আম্বিয়া, যাদের সম্পর্কে আমি পড়েছিলাম, সবাইকে এখানে পেলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ে গেলাম। কীভাবে আল্লাহ তাদের গল্পগুলো বলেছেন, এক গল্পকে আরেকটার সাথে কীভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন, সেটাও লক্ষ করলাম। পড়েই চললাম। আমি অভিভূত। হতবিহ্বল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পড়া থামিয়ে ভাবতে বসলাম। কী মনে হতে কুরআনখানা টেবিলে রেখে দিলাম। প্রায় ছুড়ে। কারণ এই সদ্য হাতে পাওয়া গ্রন্থ আমাকে সীমাহীন ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কারণ আর কিছু নয়, সামান্য পড়াতেই আমার সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল, আমার সামনে গ্রহণ করার মতো বিকল্প আরেকটি পথ এসে দাঁড়িয়েছে। ধরব না ধরব না করেও, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার কুরআন হাতে নিলাম। পড়তে পড়তে সূরাতুল মায়েদার ৮৩ নাম্বার আয়াতে পৌঁছলাম,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

'এবং রাসুলের প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন দেখবে তাদের চোখমুখসমূহকে তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, যেহেতু তারা সত্য চিনে ফেলেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন।'

এখানে আল্লাহ খ্রিস্টানদের কথা বলছেন। কীভাবে কি হলো জানি না, আয়াতটা পড়ে আমার দুচোখ আঁসুতে ভরে গেল। এখনো যখন এ-আয়াত পড়ি, আমার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। আমি বলি (فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন। আমি বুঝতে পারলাম, মুসলিম হওয়া ভিন্ন আমার আর কোনও গতি নেই। মুখে কালিমা না পড়েই আমি একপ্রকার মুসলিম হয়ে গেলাম।

এই আয়াত প্রচণ্ড শক্তিশালী। কুরআনে প্রতিটি আয়াতই অমিত শক্তির আধার। প্রতিটি খ্রিস্টানের কাছে আয়াতখানা পৌঁছানো মুসলিমদের কর্তব্য। এই আয়াত তাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ওদিকে বিকৃত বাইবেলের কাছে নয়, এদিকে কুরআনেই আছে তোমার পথ। এটিই একমাত্র পথ। বেছে নাও। আঁকড়ে ধর।

রাত এল। আমি খাটিয়ার পাশে মেঝেতে বসলাম। নিঝুম রাতে আরও নিবিড়ভাবে পড়তে থাকলাম। নেশা ধরে গেছে যেন। মনে মনে ভাবছি, আমি যদি আমার জীবন বদলে ফেলি, এর পরিণতি হয়তো সহজ হবে বা কঠিন। যদি কঠিন হয় এবং আমি সন্দেহের ধোঁকায় পড়ি বা এই বিশ্বাসে অটল থাকতে ব্যর্থ হই, তাহলে কী হবে? আমি আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, আমি যেন ব্যর্থ না হই। বসে বসে আরও আয়াত পড়তে থাকলাম। পড়তে পড়তে কী যে হলো, আজও বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ কুরআনখানা রেখে অজান্তেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আমি জানতাম না সিজদা কী। সিজদায় গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। পুরো শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এত বেশি কাঁদলাম, শরীরের তাপমাত্রার উচ্চতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম না, কীভাবে সিজদা দিতে হয়। এভাবে লুটিয়ে পড়াকে সিজদা বলে, সেটা পরে জেনেছি। একান্তই মনের তাগিদে সিজদার মতো লুটিয়ে পড়েছিলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, কুরআন আল্লাহর কালাম। মনে মনে এতটাই প্রতীতি জন্মেছিল, কোনও কিছুই আমাকে বদলাতে পারতো না। যদি না আল্লাহ বদলান। আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম হওয়া ছাড়াই নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে শুরু করলাম। আমি তখনো বাইবেল কলেজে। শেষে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হলাম। খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল।

এরপর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। আল্লাহ বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমার হবু স্বামী প্রথম দেখায় বললেন, অমি যাকে বিয়ে করতে চাই, সে হবে হিজাব পরিহিতা। আমি বললাম, হিজাব পরার জন্যেই বিয়ে করতে চাচ্ছি। আমি পরিপূর্ণ মুসলিম নারী হতে চাই। হিজাব পরে মনে হলো আমি আমার প্রকৃত আইডেন্টিটি ফিরে পেয়েছি।

কুরআন এক পরশ পাথর। আমাকে পাথর থেকে স্বর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলাই আমাকে সরাসরি পথ দেখিয়েছেন,

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ চান তোমাদের জন্যে (বিধানসমূহ) স্পষ্ট করে দিতে, তোমাদের পূর্ববর্তী (নেককার) লোকদের রীতি-নীতির উপর তোমাদেরকে পরিচালিত করতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময় (নিসা ২৬)।

আল্লাহ আমার কাছে কুরআন কারিমকে খুবই প্রিয় করে দিয়েছেন। কুরআনের প্রতিটি বিধানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। তাই হিজাব পরার জন্যে বলতে গেলে আমি মুখিয়ে ছিলাম। হতে গিয়েছিলাম 'নান'। আল্লাহ বানিয়ে দিলেন কুরআনের শিক্ষিকা। আমি বাইবেলের বদলে কুরআন শেখাই। এটাকে আমি কী বলব?

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। তিনি মহাঅনুগ্রহশীল (জুমু'আ ৪)।

কুরআন এক জীবন্ত মুজিযা। আমার আজও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আমি কুরআনের মতো এতবড় এক নিয়ামতের ছায়ায় নিয়মিত বাস করছি। আমরা কুরআনের যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি না বলেই আমাদের এত দুর্দশা। আমরা কুরআনকে ভালো করে আঁকড়ে ধরলে, আমাদের অবস্থা ফিরে যেতে দেরি হবে না। ইন শা আল্লাহ।

ফিল্মমেকার

আরনউড ভন ডোরন (Arnoud van Doorn)।

আমি এখন মুসলিম।

আমি খ্রিস্টান পরিবার থেকে এসেছি।

আমি হলান্ডের ফ্রিড্রম পার্টির অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলাম। এই দলের কাজ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা করা।

আমি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা রাখতাম।

শুরুতে আমি সর্বান্তঃকরণে রাজনীতিবিদ ছিলাম। ইসলাম নিয়ে আমার আলাদা কোনও ভাবনা ছিল না। ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানতামও না।

আমার বাবা-মা অত্যন্ত ভালো মানুষ। তারা আমাকে ছেলেবেলায় মূল্যবোধ আর নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। আমার ইসলাম গ্রহণের পেছনে তাদেরও পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

ফিতনা

আমি ফিতনা ফিল্মটি বানিয়েছি মূলত লোকজনকে ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে। ওটা আসলে আক্ষরিক অর্থে কোনও ফিল্ম নয়। দশ-পনেরো মিনিটের একটি তথ্যচিত্র বলা যেতে পারে। এই ছবি বানানোর পেছনে কিছু রাজনৈতিক কারণও ছিল। দেশের নাগরিকেরা আমাদের মানে রাজনীতিবিদদের মনে করে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষক। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আসা,

ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলাই ছিল মূলত ফিল্মমেকিংয়ের কারণ। ফিল্মটা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা। ফল হয়েছে উল্টোটা। এসব অভিযোগের কারণে অনেক লোক কৌতূহলী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পেরে মুসলিম হয়ে গেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করি নি, ফিল্মটার প্রতিক্রিয়া এতটা তীব্র হবে। এটা কোনও পেশাদারি কাজ ছিল না।

বিশ্বজুড়ে মানুষের প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। খেয়াল করে দেখলাম, বেশিরভাগ মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছে আহত হৃদয় নিয়ে, ভারাক্রান্ত দুঃখিত শোকাহত ক্রুদ্ধ হয়ে। এসব দেখে আমার বোধোদয় ঘটল, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। ভয়ংকর অনৈতিক কিছু করে ফেলেছি। এক-দেড় বিলিয়ন মুসলিম প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। একটি কাজের বিরুদ্ধে। এতগুলো মানুষ ভুল করতে পারে না। বারবার মনে হতে লাগল, আমি ভুল করে ফেলেছি।

ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ হলো। এক মসজিদে গিয়ে কুরআন তরজমা সংগ্রহ করলাম। সিরাতও। বাড়ি এনে কুরআন পড়তে শুরু করলাম। কুরআন আসলেই হিদায়াতের উৎস। পথপ্রদর্শনকারী। সমস্ত কল্যাণের মূলে। আমি এখন যা ভাবি, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুরআন সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পশ্চিমে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানি মূলত মিডিয়া ও রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে। তারা আমাদেরকে সঠিক তথ্য দেয় না। এটা আসলে আমার দোষস্খালনের জন্যে যথেষ্ট নয়। প্রতিটি মানুষেরই উচিত নিজে নিজে শেখার চেষ্টা করা। অন্যের শেখানো বুলিকে চূড়ান্ত মনে না করে নিজেও যাচাই করে দেখা। নিজেও সক্রিয় শিক্ষার্থী হওয়া।

কুরআন পড়তে পড়তে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা একশভাগ বদলে গেছে।

যতই কুরআন পড়তে থাকলাম, ততই ভেতরে কেমন এক উষ্ণতা অনুভব করতে লাগলাম। যতই পড়ি, পড়ার আগ্রহ আরও শতগুণ বেড়ে যায়। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কুরআনের কোন আয়াতখানা আপনাকে বেশি মুগ্ধ করেছে, আপনার চিন্তা ও জীবনে প্রভাব ফেলেছে?

'আমি বলি, কুরআন পুরোটাই সুন্দর। অসম্ভব সুন্দর। অপূর্ব সুন্দর। কুরআন রত্নেভর্তি একটি অতল সাগর। এই সাগরের সবটাই মুক্তো। সেখান থেকে একটি মুক্তা আলাদা করে বাছাই করে আনা মুশকিল বৈ কি। প্রতিটি আয়াতই অসংখ্য দিককে ধারণ করে। তারপরও বলতে পারি, সূরা নিসার ৩৬-৪০ আয়াতগুলো।

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি, পথচারী এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয় আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে। আমি (এরূপ) অকৃতজ্ঞদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا

এবং যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্যে, না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না আখিরাত দিবসের প্রতি। বস্তুত শয়তান কারও সঙ্গী হয়ে গেলে সঙ্গীরূপে সে বড়ই নিকৃষ্ট।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

তাদের কী ক্ষতি হতো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

আল্লাহ (কারও প্রতি) অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোনও সৎকর্ম হয়, তাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হতে মহাপুরস্কার দান করেন।

আয়াতগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।

আয়াতগুলো আমার মধ্যে শুদ্ধতা তৈরি করেছে।

আয়াতগুলো বলেছে, মানুষের মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ থাকা জরুরি।

আয়াতগুলো আমার মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে। আশেপাশের লোকজনের জন্যে ভালোবাসা। প্রতিবেশীর জন্যে ভালোবাসা। মাতা-পিতার জন্যে ভালোবাসা। অসহায় পথিকের জন্যে ভালোবাসা।

আয়াতগুলো আমাকে শিখিয়েছে, অসহায় মানুষকেও নিজের অর্জিত সম্পদে ভাগীদার করো। শরিক করো।

শিখিয়েছে, এসব সম্পদ আল্লাহরই দান করা। তিনি রিজিকরূপে দিয়েছেন। আমাকে কৃপণ হতে নিষেধ করেছে।

আমাকে রিয়া বা লোকদেখানোপনা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। এই ঘৃণিত আচরণ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করেছে।

এই আয়াতগুলো আমাকে শিখিয়েছে, একজন মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের সাথে কেমন আচরণ করব।

এই আয়াতগুলো মানুষের সবচেয়ে মৌলিক মানবিক গুণগুলো শিক্ষা দেয়। উৎসাহ দিয়ে বলে, যার মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান থাকবে, সে প্রকৃতপক্ষে প্রভূত কল্যাণ ধারণ করবে।

ইসলাম ও কুরআনের নির্যাস বলতে আমি বুঝেছি, নিজে 'কুদওয়া হাসানাহ' বা উত্তম আদর্শ হওয়া। কুরআন পড়তে গেলে আমার এমনই অনুভূতি হয়।

আয়াতগুলো বলে, ইবাদত মানে শুধু সালাত-সিয়াম নয়; বরং আয়াতে বর্ণিত আমালে সালিহাগুলোও ইবাদতের অংশ।

ইসলামের যে বিষয়টি আমাকে বেশি আশ্বস্ত করেছে, তা হলো আমার 'অনুভূতি', যা সব সময় আমার মধ্যে জাগ্রত ছিল। কারণ, আমি এক ধর্মপ্রবণ খ্রিস্টান পরিবারে বেড়ে উঠেছি। ইসলামের পূর্বেই আমি ইসলামের অনেক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। এসব আমাদের খ্রিস্টান সমাজেও ছিল। কিন্তু এসব নৈতিকতা ধারণ করা সত্ত্বেও আমার মধ্যে কেমন এক অস্থিরতা বা অস্বস্তি কাজ করত।

ইসলাম গ্রহণের পর বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে আগের সেই অস্থিরতা নেই। কারণ, আমি এখন এক আল্লাহর ইবাদত করি। আল্লাহর ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না। কোনও নবীর ইবাদত নয়, কোনও মানুষের ইবাদত নয়, শুধুই আল্লাহর ইবাদত। আমি এখন বুঝতে পারছি, ইসলামে তাওহিদের শিক্ষা দেয়, সেটাই আমার জন্যে উপযোগী। সমস্ত মানবতার জন্যে উপযোগী।

আরনউডের ইসলাম গ্রহণ অবশ্যই একটি 'আয়াত'। একটি নিদর্শন। একজন লোক এই কিছুদিন আগেও ইসলামের শত্রু ছিল, কুরআনের প্রভাবে মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে ইসলামের প্রচারকে পরিণত হয়েছে।

আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন? তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল?

'অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে ভর মজলিসে। লোকসমাগমে। জুমাবারে। আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করে আসছিলাম। ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানাশোনা ছিল। ভেবেছিলাম শাহাদাহ পাঠ করাটা একটা ফরমালিটি হবে মাত্র।

মনে মনে মুসলমান হয়েই ছিলাম। কিন্তু শাহাদাহ পাঠ করার সময় অবাক বিস্ময়ে অনুভব করেছি, আমি কালিমা পাঠ করতে গিয়ে কেমন এক ভালোলাগার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। বর্ণনাতীত এক সুখময় তরঙ্গ ভেতরটাকে তোলপাড় করে তুলছে। সবচেয়ে বেশি অবাক করা ব্যাপার হলো, আমি শাহাদাহ পাঠ করতে করতে কেঁদে দিয়েছি। মনে হচ্ছিল আমি এক উষ্ণ আরামদায়ক আবরণে আচ্ছাদিত হয়েছি। অদৃশ্য কোনও মোলায়েম আদরণীয় হাত আমার কাঁধ স্পর্শ করে চুপিচুপি বলছে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হলে।

সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটার কথা বলে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা ছিল এক অপার্থিব অনুভূতি। যেন এক পরম সুহৃদ আমার হাত ধরে, আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে। যেন এক স্নেহময় পিতা পরম আদরে সন্তানকে অভয় দিচ্ছে। প্রবোধ দিচ্ছে।

শাহাদাহ পাঠ করার সাথে সাথে আমি ভেতরে এক প্রবল আত্মশক্তি, অনির্বচনীয় এক সুখানুভূতি, অপার্থিব এক আরাম অনুভব করছিলাম। ভেতরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জেগে উঠছিল, আমি ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব। আমি এই ধর্মের একজন প্রকৃত আদর্শ অনুসারীতে পরিণত হব। মন খারাপ হলে, বিষণ্ন হলে, মুষড়ে পড়লে, শাহাদাহ পাঠ করার মুহূর্তটি কল্পনায় আনি। নতুন করে উজ্জিবীত হই। নতুন করে পুরোনো অনুভূতিতে আপ্লুত হই।'

আরনউডের মুসলমান হওয়া সহজ কথা ছিল না। তিনি ছিলেন ইসলামবিরোধী শক্তি। মসজিদবিরোধী সক্রিয় যোদ্ধা। আরনউড প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করে বলেছিলেন,

'আমি ছিলাম এই মসজিদের বিরোধীপক্ষ। এই মসজিদ ভেঙে দিতে চাওয়া লোক। কী অদ্ভুত ব্যাপার, আজ আমি সেই মসজিদে'। প্রথম দিন মসজিদে আমার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। হয়তোবা লজ্জা ও অনুতাপের কারণে এমনটা ঘটে থাকবে। অদ্ভুত ব্যাপার। সেই মসজিদের ইমাম সাহেবও একথা জানিয়েছেন।

আরনউড বলেন,

'সিরাহ পড়ে আমি অবাক। একজন মানুষের পক্ষে এতটা ভালো হওয়া সম্ভব? একজন মানুষের এতটা উঁচুতে ওঠা সম্ভব? এতটা উঁচু মনোবলের অধিকারী হওয়া সম্ভব? এতটা ডিটারমাইন্ড হওয়া সম্ভব? বিপদের পর বিপদ, লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা, বাধার পর বাধা, অপমানের পর অপমান, তবুও মানুষটা দমে যান নি। নিকটাত্মীয় থেকে চরম কষ্টকর আচরণ পেয়েছেন। টলেন নি। এতকিছুর পরও তিনি দয়ালু, উদার, সহনশীল, মহানুভব আচরণ করেছেন শত্রুদের প্রতি। ইনসাফ করেছেন। তাঁর চরিত্রে এতসব বহুমাত্রিক দিক দেখে আমি অভিভূত। আমি কার বিরুদ্ধে

ফিল্ম বানিয়েছি? আমি ভীষণ অনুতপ্ত। আমি তাঁকে আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ বানিয়ে নিয়েছি। তাঁর মধ্যে পেয়েছি সর্বোত্তম আদর্শ। মহোত্তম অনুপ্রেরণা। আমার পক্ষে তাঁর মতো হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর আদর্শ লালন ও পালন করাই আমার একমাত্র চ্যালেঞ্জ।

আমি প্রতিটি কথায় কাজে আচরণে তাঁর অনুসরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমিও কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর তুলনায় হাজারভাগের একভাগও নয়, কষ্টের সময়েও তিনিই আমার অনুপ্রেরণা।

আমি ডাচ ভাষায় সিরাহ-বিষয়ক সিরিজ লেকচার শুরু করেছি। লোকজন যাতে নবীজি সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর আদর্শ শিখতে পারে। যুবকেরা এমন সুন্দরতম ব্যক্তিকে ভালোবাসতে পারে। আমাদের যুবকেরা সিরাহমুখী হলে, কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। যুবকদের কাছে সিরাহ পৌঁছানো গেলে, সিরাতে মুস্তাকিম সহজেই তাদের নাগালে এসে যাবে। তারা একেকজন হয়ে উঠবে ইসলামের চলমান দূত। ব্র্যান্ড এম্বেসডর।

কুরআনই আমার প্রাণস্পন্দন। কুরআনই আমার প্রথপ্রদর্শক।

এই গ্রন্থ আমাকে আমার ইহজীবন সম্পর্কে সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা দেয়। কীভাবে নিজের সাথে আচরণ করব, কীভাবে অন্যের সাথে আচরণ করব, তা শিক্ষা দেয়। কীভাবে সমাজের সাথে আচরণ করব, তা শিক্ষা দেয়।

কুরআনই এখন আমার প্রজ্ঞা ভালোবাসা ও জ্ঞানের উৎস।'

বাইবেল থেকে কুরআনে

'আমি রুবা কা'ওয়ার। আমেরিকায় থাকি। জন্মসূত্রে জর্দানি। আমি বেড়ে উঠেছি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান পরিবারে। বাবা ছিলেন চার্চের ফাদার। জর্দানে। আমি কখনো ভাবি নি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করব। জীবন নিয়ে আমি সুখীই ছিলাম। আমেরিকায় আমার চাচাও গির্জার ফাদার ছিলেন। আমি গির্জার কাজে বাবাকে সাহায্য করতাম। আমার পুরো পরিবারই গির্জার কাজে জড়িত থাকত।

আমেরিকায় পড়তে এলাম। একদিন একদল মুসলিম ছাত্রের সাথে কুরআন ও ইনজিল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। এই বিতর্কই আমাকে ইসলামের দিকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বভাবই ছিল 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর'। আমি ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে ছিলাম। আমি এই প্রথম কুরআনকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করলাম। একজন গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে। উদ্দেশ্য, কুরআনের ভুল বের করা। মুসলিম সহপাঠীরা বলেছিল এই কুরআনে কোনও ভুল নেই। এই কুরআন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা। আমি তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে সূরা মায়িদায় পৌঁছলাম।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

তুমি অবশ্যই মুসলিমদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর পাবে ইয়াহুদিদেরকে এবং সেই সমস্ত লোককে, যারা (প্রকাশ্যে) শিরক করে এবং তুমি মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পাবে তাদেরকে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ রয়েছে। আরও এক কারণ হলো যে, তারা অহংকার করে না (মায়েদা ৮২)।

আয়াতখানা পড়ে আমি ভীষণ অবাক। আয়াতখানা আমাকে কাঁপিয়ে দিল। এখানে খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত ইতিবাচক ভঙ্গিতে। একটু থেমে আবার পড়া শুরু করলাম,

وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

এবং রাসুলের প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন দেখবে তাদের চোখসমূহকে তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, যেহেতু তারা সত্য চিনে ফেলেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন (মায়েদা ৮৩)।

এই আয়াতে পৌছে সত্যি সত্যি আমিই যেন আয়াতের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলাম। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, এটাই হক। এটা সত্য। অজান্তেই আমি বলে উঠলাম (رَبَّنَآ ءَامَنَّا) ইয়া রাব্ব, আমি ঈমান এনেছি। (فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ)। এই আয়াতখানাই আমাকে পুরো বদলে দিয়েছে। আমি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমি কাঁদছিলাম। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। মুসলিম বন্ধুদের কাছে ছুটে গেলাম। তাদের সামনে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম,

আশহাদু আল্লাহ....

তারা আনন্দে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠল। সুবহা-নাল্লাহ, রুবা, আল্লাহ সত্যি তোমাকে ভালোবাসেন? কীভাবে বুঝলে? আজ পহেলা রমাদান। আল্লাহু আকবার। সত্যি আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। আমি রমাদানের সিয়াম দিয়ে ইসলাম শুরু করতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত সেটাই ছিল আমার পালন করা শ্রেষ্ঠ রমাদান।

আমি আরও ভালো করে কুরআন শিখতে শুরু করলাম। ইসলামকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করতে লাগলাম। ইলমুত তাজভীদ শিখলাম। প্রথম দিকে বাসার কেউ জানতে পারে নি। আমি গোপনে ইসলাম পালন করে যাচ্ছিলাম। আমি

থাকতাম আমার বোনের সাথে একই কক্ষে। একরাতে সে ঘুমিয়ে পড়লে আমার পিপাসা জাগল। সালাতের পিপাসা। এ-বড় কঠিন পিপাসা। সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। রুকুতে গেলাম। ঘটনাটা তখনই ঘটল। বোন জেগে গেলেন। ধরা পড়ে গেলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জানতে চাইল,

'কী করছ, আপু'?

খ্রিস্টানদের নামাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে আমার বালিশের নিচে কুরআন খুঁজে পেল। এটা কী? আমি আবলীলায় বলে দিলাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। বোনের কাছে এটা ছিল বিরাট এক ধাক্কা। সবাইকে বলে দিল। পরিবারের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। সবাই মিলে আমাকে প্রচণ্ড প্রহার করল। শরীরের জায়গায় জায়গায় রক্তাক্ত জখম হয়ে গেল। ঘরে বেসবল খেলার কাঠের ব্যাট ছিল। সেটা দিয়ে বেধড়ক প্রহার করতে শুরু করল একজন। মারের চোটে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। আমি গড়াতে গড়াতে 'হাম্মামে' গিয়ে পড়লাম। বুদ্ধি করে, কষ্ট করে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আয়নায় দেখলাম চোখমুখ ফুলে গেছে। জামা ছিঁড়ে গেছে। পুরো শরীরে অসহ্য ব্যথা।

আল্লাহর কী কুদরত, আমার বোন ভুলে তার সেলফোন হাম্মামে রেখে গেছে। আমি ৯১১ নাম্বারে ফোন করলাম। পুলিশ এল। হাম্মামের দরজায় এসে অভয় দিয়ে বলল, আমি নিরাপদে বেরোতে পারি। পরিবারের একজনকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমি কোনও মামলা দায়ের করি নি। কাউকে গ্রেফতার করার প্রয়োজন নেই।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমি সুবিধাজনক আচরণ পাই নি। সহযোগিতাও না। উল্টো ভিন্ন আচরণ পেয়েছি। একজন আরব মুসলিম আমাকে প্রস্তাব দিল, আমেরিকা থেকে আরবে হিজরত করতে। সেখানে সে আমাকে বিয়ে করবে। সে ওয়াদা ভঙ্গ করল। আমাকে বিয়ে করল না। উল্টো আমার পরিচিত কিছু মুসলিম আমার বিরুদ্ধে ভ্রান্ত আর মিথ্যা সব অপবাদ দিতে শুরু করল। ইসলামের জন্যে চাকরি ছাড়লাম। নিজের গাড়ি বিক্রি করে দিলাম। আরও টুকিটাকি জিনিসও বিক্রি করে দিলাম। শখের দামি ক্যামেরা সেটাও বিক্রি করে দিলাম।

বিরোধীরা বলতে লাগল, আমি স্পাই। আন্ডার কাভার এজেন্ট। গির্জার কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়োগ দিয়েছে। এসব ছিল মিথ্যা। এসব আমার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলল। মনের উপর। ঈমানের উপর। এসব দেখে ইসলাম ও মুসলমানের উপর বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করল। মিসরে খ্রিস্টানদের পরিচালিত টিভি চ্যানেল আল-হায়াত আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। তারা আমাকে হিজাব পরেই তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলল। তাদের কথায় অবাক হলাম। তখন আমি ইসলাম ও

মুসলমানের উপর ভীষণ বিরক্ত। ইসলাম ত্যাগ করেছিলাম। তারপরও হিজাব কেন? আমি তাদের প্ররোচনায় হিজাব পরলাম। সঞ্চালক এক পর্যায়ে আমাকে প্ররোচনা দিল, আপনি তো আর মুসলিম নেই। কেন হিজাব পরে আছেন। খুলে ফেলুন। আমি ভরপুর অনুষ্ঠানে তাদের প্ররোচনায় সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়ে ক্যামেরার সামনেই একটানে হিজাব খুলে ফেললাম। আমি চরম ভুল করেছি। আমি লোকজন দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। আমেরিকার মার্সি মিশন একটা জরিফ প্রকাশ করেছে, ৭০% নবমুসলিম ৩ বছর পর ইসলাম ত্যাগ করে। জানি না পরিসংখ্যানটা কতটুকু সত্য।

মা আমাকে আবার খ্রিস্টবাদ পড়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বললেন। তার কথামতো পড়া শুরু করলাম। একদিন ক্লাস নিচ্ছিলেন এক ডক্টর। তিনি কথা বলছিলেন, ইনজিলের ভাষ্য কালের পরিক্রমায় কীভাবে বদলে গেছে, সে বিষয়ে। উপস্থিত এক যাজক প্রশ্ন করল, এত পরিবর্তন হলে, আমরা কীভাবে বুঝব এটা আল্লাহর কালাম? প্রফেসর প্রশ্নটা শুনে হেসে দিলেন। বললেন, যেভাবে ধর্মগ্রন্থ নাজিল হয়েছে, হুবহু সেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ধর্মগ্রন্থ যেভাবে নাজিল হয়েছে, সেভাবে যদি আমাদের কাছে পৌঁছত সেটা বর্তমানের উপযোগী হতো না। এই উত্তর শুনে উপস্থিত কেউ কোনও মন্তব্য করল না। সবাই চুপচাপ প্রফেসরের যুক্তিউত্তর মেনে নিল। আমি এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কিছু বলবে না। থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, আপনি কীভাবে এমন কথা বলতে পারলেন? এ কী করে সম্ভব? আল্লাহ কী করে তাঁর কালাম পরিবর্তন হওয়া অনুমোদন করবেন? আল্লাহর কোনও পরিবর্তন আছে? আল্লাহর যেমন কোনও পরিবর্তন নেই, তাঁর কালামেরও কোনও পরিবর্তন নেই।

আমি অনেক পাপ করেছি। আমি ইসলামের অনেক অসম্মান করেছি। আমি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ নই। আমি জানি তিনি গাফুর রহিম। তিনি চাইলে আমার ইরতিদাদের সময় আমাকে মৃত্যু দান করতে পারতেন। আমি চির জাহান্নামি হয়ে যেতাম। কিন্তু রহমান রহিম তাঁর বান্দাকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন? যে বান্দা তাঁর দিকে ছুটে এসেছিল। তাঁর জন্যে মার খেয়েছিল। তিনি আমার প্রতি অশেষ দয়া করেছেন। আমাকে ফিরে আসার তাওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যাজিকা থেকে দ্বীনের দাঈ হয়েছি। খ্রিস্টবাদ প্রচারকারিণী থেকে কুরআনের হাফেজ প্রস্তুতকারিণী হয়েছি। আমার কাছে কুরআন শিখে বাচ্চারা হাফেজ হচ্ছে। এটা রাব্বুল আলামিনের খাস রহমতেই সম্ভব হয়েছে। আমি ইনজিলে আল্লাহকে খুঁজেছি। পাই নি। কুরআনে আল্লাহকে খুঁজে পেয়েছি। (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ) আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।'

আবদুল্লাহ

১. আমি সৌদি আরবের অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্মেছি। আশেপাশের সবাই ধর্মপ্রাণ। ঘরে টিভি পর্যন্ত ছিল না। ঘরের পাশে মসজিদ ছিল। সেখানে তাহফীযে ভর্তি হলাম। কুরআন কারিম হিফজ করার খুব ইচ্ছা ছিল। মাদরাসার পরিবেশ ভালো লাগল না। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হতো। সেখানে এক ছাত্রভাইয়ের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, ধর্ম বিষয়ে খুবই কম জানি। আসরের পর এক শায়খের দরসে বসতে শুরু করলাম। তিনি আকিদা বিষয়ে দরস দিতেন। মাগরিবের পর আরেক শায়খের দরসে বসতে শুরু করলাম। তিনি হাদিস পড়াতেন। বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারলাম না।

দেখলাম বিভিন্ন শায়খের পারস্পরিক রেষারেষি। একজন আরেকজনের পেছনে সালাত আদায় করা হারাম ঘোষণা দিচ্ছেন, একজন আরেকজনকে ফাসেক ঘোষণা দিচ্ছে। শায়খদের দরস ছেড়ে দিলাম। আমি নিতান্ত সাধারণ মুসলিম। সালাত আদায় করি। সিয়াম পালন করি। আমার এসব বিরোধে জড়িয়ে কী লাভ।

ছাত্রজীবন শেষ হলো। বিভিন্ন শায়খদের প্রতি দ্বেষ দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেমন এক অবজ্ঞামাখা ঘৃণা তাদের প্রতি। এই দ্বীন যদি সহিহ হয়, তাহলে অনুসারীদের মধ্যে এত বিরোধ কেন? ধার্মিকদের আচরণ যদি এমন হয়, তাহলে অধার্মিক অবস্থা কেমন হবে?

প্রথম সন্দেহ এসেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এক ওয়েবসাইটে একটি প্রশ্ন চোখে পড়ল। আদম আ. সম্পর্কে। একজন মানুষ হয়ে কীভাবে সবকিছু নামধাম বলে দিতে পারলেন? আমি তখন উত্তরটা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে খুঁজিনি। এই প্রশ্নটা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহজনক প্রশ্ন সংগ্রহে আগ্রহী করে তুলল। শুরু হলো ইসলাম সম্পর্কে আরও কী কী সন্দেহ আছে, অভিযোগ আছে সেগুলো জানার অপপ্রয়াস।

নাস্তিকতার প্রথম ধাপে আমি সুন্নাহকে অস্বীকার করললাম। তারপর ইসলাম নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। তারপর এল আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ। একটার পর আরেকটা। ধারাবাহিকভাবে। একনাগাড়ে সমস্যা সামনে আসছিল। এই জোয়ারে বাঁধ দেওয়ার মতো জ্ঞানগত ভিত ছিলনা। আমার ঈমান ছিল নিছক পারিবারিকভাবে পাওয়া। কেউ যদি আমাকে বলত, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দাও। আমি জবাব দিতে পরতাম না। আমি যতদূর বুঝেছি, বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এদের কাছ থেকে দূরে থাকা। এদের এড়িয়ে চলা। এদের ছায়াও না মাড়ানো।

ছেলেবেলাতেই শিশুর মনে আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব গেঁথে দেওয়া ভীষণ জরুরি। ঈমান ও শিরকের পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যক। লুকমানের

নসিহতগুলো প্রতিটি শিশুকে ভালো করে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া দরকার। কুরআনে লুকমান নিজের পুত্রকে নসিহত করেছেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

এবং (সেই সময়কে স্মরণ করুন, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম (লুকমান ১৩)।

ছেলেবেলাতেই একটি শিশু এ-ধরনের আয়াত জেনে গেলে, তার পক্ষে আর নাস্তিক হওয়া সম্ভব নয়। সূরা লুকমানের ১২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়েছে আলোচনা। এখানে আছে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা, আসমান-জমিন সৃষ্টির কথা, এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি, মানবসৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিস্তারিত বর্ণনা। শিশুর জন্যে কুরআন এক পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ অব্যর্থ শিক্ষা। মৌলিক আকিদা-সংক্রান্ত আয়াতগুলো যদি অভিভাবকরা সন্তানদের সামনে তুলে ধরেন, বড় হওয়ার পর এই সন্তান বিপথে যাবে না। কুরআন শুধু যুক্তিসংগত কথাই বলে না, কুরআনের সব কথা হৃদয়সংগতও বটে। কুরআন শুধু মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে না, কুরআন একই সাথে কলব বা মনকে ছুঁয়ে যায়।

অনলাইনে কিছু পেইড করা লোক আছে। তাদের কাজ হলো ইসলাম সম্পর্কে নানাবিধ সন্দেহ ছড়িয়ে দেওয়া। নানা প্রশ্ন উত্থাপন করা। হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে এসব ছাঁইপাশ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। গোমরাহ থাকাবস্থায় আমি নাস্তিকতা ছড়ানোর যেসব কারণ আবিষ্কার করেছি, মোটাদাগে তিনটি বলা যায়,

১. বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাব। অনলাইনে ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত প্রতিরোধের অভাব।

২. নাস্তিকদের আক্রমণের মুখে কিছু ধার্মিক ব্যক্তির অযৌক্তিক অসংযত প্রতিক্রিয়া।

৩. ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কাছে সন্দেহ নিয়ে গেলে, উত্তর দেওয়ার বদলে ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দেওয়া।

পরিবার আমাকে স্বাধীনভাবে অনলাইন ব্যবহার করতে দিয়েছিল। তারা মনে করত আমি ভালো কাজ করছি। এমনকি তারা মনে করত, আমি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়ছি।

অন্যের পেছনে তাজাসসুস বা গোয়েন্দাবৃত্তি হারাম। কিন্তু সন্তান দরজা বন্ধ করে কী করছে সেদিকে খেয়াল রাখাও জরুরি। সন্তান ও মাতা-পিতার মাঝে কোনও দেওয়াল রাখা যাবে না। দেওয়াল গড়ে উঠলে সেটা ভেঙে দিতে হবে। সন্তানের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের রাস্তা খুলে রাখতে হবে। সন্তান যাতে ছোট

থেকে ছোট্ট বিষয়েও বলতে ভয় না পায়। সে যেন আমার সাথে লুকোচুরি না খেলে। এমন হলে আমাদের সন্তানরা আর কোন ও সমস্যায় পড়বে না। ইনশাআল্লাহ।

একজন নাস্তিক কী চায়?

নাস্তিকরা দুই প্রকার,

১. সে জানে, সে কী জানে আর কী জানে না। তাদের নাস্তিকতা হলো প্রতিক্রিয়া। সে চায় তার অস্তিত্বের জানান দিতে। সে আল্লাহর বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে। উম্মুল মুমিনিনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে লিখতে থাকে। সে চায় তার বিরোধিতা করা হোক। যত বিরোধিতা হয়, সে তত উৎসাহিত হয়। সে জানে তার অস্তিত্বের প্রকাশ হচ্ছে। সে এটা উপভোগ করে।

নাস্তিক যখন দেখে কেউ তার যুক্তিভিত্তিক উত্তর দিচ্ছে। সে প্রত্যুত্তর করতে উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু কেউ যখন গালিগালাজ শুরু করে, সে তখন প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে, তার উদ্দেশ্য সফল।

২. দ্বিতীয় প্রকার, সে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সব কাজ করে। ইউরোপে তাদের দিকনির্দেশক আছে। ইউরোপিয়ান গুরুরাই তাদের পরিচালিত করে। কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে দেয়। প্রশিক্ষণ দেয়। বলে দেয় ওমুক হ্যাশট্যাগ চালু করো, ওমুক হ্যাশট্যাগে অংশ নাও। ওমুক বিষয়ে কথা বলতে শুরু কর। আমি দেখেছি তারা বেশিরভাগ সময় ইসলাম নিয়েই কথা বলে। ইসলামই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে যুবকদের মাঝে নাস্তিকতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য যুবককে চিনি। এদের নাস্তিকতার অন্যতম প্রধান কারণ, ছোটবেলাতেই এদেরকে কুরআন কারিমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। শৈশবেই এদের কচিমনে কুরআনের বাণীগুলো ভালো করে গেঁথে দেওয়া হয় নি। কুরআনের সাথে পরিচয় থাকলে, ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলো এদের কাছে পরিষ্কার থাকত। সাময়িক গুনাহে লিপ্ত হলেও শেষে একসময় না একসময় ফিরে আসতই। কুরআনের নূর তাদেরকে ফিরিয়ে আনত। আমার মনে হয়, আল্লাহর অশেষ কুদরতে, আমার মধ্যে ছিটেফোঁটা যা কদ্দুর 'কুরআন' ছিল, তার বরকতেই হিদায়াতের উপর আবার ফিরে আসতে পেরেছি।

কুরআনকে আমি পেয়েছি, কুরআন এজমালিভাবে (মোটাদাগে) বেশিরভাগ সন্দেহের জবাব দিয়ে দিয়েছে। ঈমান আনার পর দেখেছি, কুরআন আমার বেশির সন্দেহের জবাব দিয়ে রেখেছে। কুরআন যখন একটা সন্দেহের জবাব দেয়, পাশাপাশি আরও অসংখ্য সন্দেহের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এরই সাথে আরও

অনেক হাকিকত-সত্য তুলে ধরে। বান্দার হাত ধরে অনেক দূর পথ এগিয়ে নিয়ে যায়। কুরআন মাঝেমধ্যে এমন অকাট্য কিছু তথ্য দিয়ে রাখে, যা বান্দাকে হতবাক করে দেয়। সূরা মুমিনুনের আয়াতগুলোও আমাকে অভিভূত করে দিয়েছে। মানবজন্মের প্রক্রিয়াগুলো এভাবে বলা কোনও মানুষের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ দ্বারা। তারপর তাকে স্খলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি। তারপর আমি সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দিই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান! (মুমিনূন ১২-১৪)।

আমি যখন ফেরার সফর শুরু করেছিলাম, তখন নাস্তিক বন্ধুদের জানিয়েছি। তারা আমাকে নিরস্ত করতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। হিদায়াতের আগে আমি ছিলাম অন্তঃসারশূন্য। কলবশূন্য। আধ্যাত্মিকতা শূন্য। প্রাণহীন। ভেতরে বিশাল শূন্যতা ছিল। হিদায়াতের পর সেই শূন্যতা ভরাট হয়ে গেছে। কুরআন আমার ভেতরটাকে কী এক আলোয় পূর্ণ করে দিয়েছে।

খালিদ

১. জন্মসূত্রে মুসলিম তারপর পাঠসূত্রে নাস্তিক। তারপর ভাবনাসূত্রে মুসলিম। কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। ফিলিস্তিনে। কুরআন হিফজ করেছি। বেড়ে উঠেছি ধার্মিক পরিবার। গতানুগতিক ধার্মিক। জন্ম থেকে যে ধর্মে বেড়ে উঠেছে, সেটাই পালন করে যাওয়া। বুঝেশুনে মুসলিম নয়।

আমি আরব হলেও ভালো করে জানতাম না, ইসলাম মানে কী? আল্লাহর সঠিক পরিচয় কী? দ্বীন কাকে বলে? কুরআন হিফজ করলেও কুরআন বোঝার প্রতি মনোযোগ ছিল না।

আশেপাশের অবস্থা দেখে নানা প্রশ্ন মনে উদয় হতো। আব্বু ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ভয়েই মনের প্রশ্ন মনে রেখে দিতাম। এসবের জন্যে আমি দায়ী করব পরিবার স্কুল আর সিলেবাসকে। আমরা না বুঝে শুধু মুখস্থ করতাম। আমাদের অবস্থা অনেকটা এমন,

كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে (জুমু'আ ৫)।

শুধুই পরীক্ষার পাস করার জন্যে। পরিবার স্কুল ও শিক্ষকের আসল কর্তব্য, ছোটবেলাতেই শিশুকে শিখিয়ে দেওয়া ইসলাম কী? কুরআন কী? দ্বীন কী? শরিয়াহ কী? আল্লাহ কে?

মাধ্যমিকে ওঠার পর থেকেই আমার ধর্মবিশ্বাসে টালমাটাল অবস্থা দেখা দিতে শুরু করে। আমি নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবেই জানতাম। ভদ্র শান্ত। কিন্তু আমার চারদিকে কেন এত হিংস্রতা। কেন এত দ্বন্দ্ব? কেন এত রক্তপাত? এসবের উত্তর পেতে আমি দর্শনের আশ্রয় নিলাম। দর্শনের সমস্যা হলো, এই শাস্ত্র শুধু প্রশ্নই করে, উত্তর দেয় না। দিলেও সেটা চূড়ান্ত সমাধানমূলক কিছু হয় না।

অন্তর্গত দ্বন্দ্বের প্রভাবে কিছুটা স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকলাম। লোকসঙ্গ ভালো লাগত না। একাকী থাকতে ভালো লাগত। শুধু মনে হতো সবার সাথে মিশলে লোকে আমার ভেতরের কথা জেনে ফেলবে। আমাকে তারা মারবে। জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে চাইবে।

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো, যখন তার চিন্তার সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া। যাতে তিনি মনের দ্বন্দ্ব দূর করে দেন। প্রশান্তি দান করেন। তাওফিক সাহায্য দান করেন।

আমি এহেন দুর্যোগকালে পরিবারকে পাশে আনতে পারি নি। ভয়েই মুখ খুলি নি। তখন আমার বয়েসও তেমন কিছু ছিল না। সেদিন প্রশ্নগুলো নিয়ে সাহস করে বাবার মুখোমুখি হতে পারি নি, আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ, আমি আল্লাহকেই দোষী করে তাঁর শানে অনৈতিক মন্তব্য করেছি। আল্লাহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি। নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছি।

চারদিকে এত অন্যায়-অবিচার পাশাপাশি পারিবারিক অশান্তি নাস্তিকতার অন্যতম প্রধান কারণ। বেশিরভাগ নাস্তিক বা নারীবাদীই অশান্তিময় ছেলেবেলা কাটিয়েছে। এখন যারা নতুন তারা হয়তো এই কারণে নয়, প্রচার-প্রচারণার জোয়ারের ধাক্কায় নাস্তিক হয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে অনেকে নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে—একজন পিতার পক্ষে কি সম্ভব, নিজের সন্তানকে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ চির জাহান্নামি করতে? এটা কি আদল ইনসাফ? এই আদলের প্রশ্নেও কেউ কেউ নাস্তিক হয়।

আমরা বলি, এই তুলনা সঠিক নয়। বাবার সাথে আল্লাহর তুলনা একদম ঠিক নয়। আল্লাহ আমাদের বাবা নন। কে বলল তিনি আমাদের পিতা? তিনি খালেক। আজিম। আলিম। জাব্বার। আজিজ। মুনতাকিম। মুতাকাব্বির।

নাস্তিকরা যখনই কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তারা ধরে নেয়, আল্লাহ আদেল নন। আরে তুমি গাইব জান না। তোমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আল্লাহ তোমাকে কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন, তোমার অন্য কল্যাণের জন্যে। কেন আল্লাহ অমুক কাফিরকে মিলিয়ন ডলার দিলেন আর আমি ফকির? বিষয়টা এমন নয়। জীবনটা নিছক পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্যে আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে।

নাস্তিক কখনো সুখী হতে পারে না। লক্ষ্য ছাড়া, অর্থ ছাড়া, মানে ছাড়া জীবনটা হয়ে পড়ে শূন্য। যারা বলে নাস্তিকরা সুখী, তারা ভুল বলে। এটা তো সত্য কথা, আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

আর যে আমার উপদেশ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব (তোয়াহা ১২৪)।

আমি একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকুরি করেছি। রিসার্চ ফেলো হিসেবে। তাদের একটা গবেষণা ছিল, কেন আরবরা বিশ্বনেতৃত্ব থেকে পিছিয়ে পড়ল, পশ্চিমারা এগিয়ে গেল। দুই বছরের একটানা সমীক্ষার পর রিপোর্ট জমা হলো,

'যে-কোনও জাতি বা গোষ্ঠীর উত্থানের পেছনে একটি সুপরিকল্পিত সুবিন্যস্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কাজ করে। যে পরিকল্পনা তৈরি হবে সেখানকার মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সংস্কৃতি-দর্শন, মনমানস, ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে।

আফসোসের বিষয় হলো, আরব বা মুসলিমদের একক কোনও পরিকল্পনা নেই। তারা নিজস্ব পরিমণ্ডলের বাইরে, অন্যদের থেকে কিছু কিছু নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সমাজ ও শাসনব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে। আমরা পুঁজিবাদ থেকে কিছু নিয়েছি, কমিউনিজম থেকে কিছু নিয়েছি-সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি মার্কা এক ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছি। পরিবারে চলে, কিছুটা ধর্ম, কিছুটা অধর্ম। অর্থনীতি চলে পুঁজিবাদের আদর্শে, রাজনীতি চলে গণতন্ত্র-কমিউনিজম-রাজতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্রের স্ববিরোধী পরস্পরবিরোধী এক মিশ্রণে। এভাবে সমৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।'

এরপর আমার মনে প্রশ্ন এল, তাহলে তারা কেন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? কেন তারা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জন্যে ফন্দি-ফিকির করে?

আমি তখন পাশ্চাত্যের অগ্রগতি, প্রাচ্যের অবনতি নিয়ে গবেষণা করছিলাম। কুরআন নিয়ে বসতে ভয় পেতাম। কুরআনের কথা মনে পড়লেই কেমন এক জড়সড় ভাব আসত। আমাদের গবেষণার প্রয়োজনেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে কুরআন হাতে নিতে হলো। কত্তবছর পর কুরআন হাতে নিলাম। আমি ছিলাম কুরআনে হাফেজ। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কুরআনের সাথে আমার ব্যস্ততার সময় কেটেছে। হাসিখুশির সময় কেটেছে। কত্ত

মহব্বত নিয়ে কুরআন পড়তাম। কত আগ্রহ নিয়ে উস্তাদজিকে সবক শোনাতাম। কত যত্ন করে কুরআন ধরতাম। কত আদর করে কুরআন তুলে রাখতাম। কত প্রতিযোগিতা করে পড়া শিখতাম। আর এখন? কুরআন হাতে নিয়েও কোনও বিকার হয় না। ভাব জাগে না মনে। কুরআনখানা হাতে নিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্যে কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মতো হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর যখন তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য (হাদীদ ১৬)।

এই আয়াতটা যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল আমার মাথায়। পাখি যেমন ডানা ঝাপটায় আয়াতটাও ডানা ঝাপটাতে লাগল। মন উথালপাতাল করতে লাগল। কী নেই, কী নেই মনে হতে লাগল। আয়াতটা বারবার মনে মনে আওড়াতে থাকলাম। কুরআন হাতে নিয়েছিলাম, সেটা বন্ধই রইল। কল্পনায় ভাসছিল পাখি। আমাদের গাজার সাগর তীরে। পাখিগুলো যেভাবে সন্ধ্যা হলে উড়ে নীড়ে ফিরে যায়, সে দৃশ্য ভাসছিল চোখের সামনে। একই সাথে চোখের সামনে ভাসছিল আমাদের গাজা উপকূলে নতুন সূর্যোদয়ের হৃদয়কাড়া ছবি। অনেকদিন এসব দৃশ্য মনে পড়ে নি। কানাডায় এসে ব্যস্ততার সাগরে ডুবে গিয়েছিলাম।

আয়াতটা যেন একান্তভাবে আমাকেই সম্বোধন করছিল। বারবার বলছিল, এখনো ফেরার সময় হয় নি? অথচ আমি মনেপ্রাণে একজন নাস্তিক। একটু আগেও কুরআনের কথা, ইসলামের কথা, আল্লাহর কথা মনে পড়ে নি। আচানক কেন মনে পড়ল? একথাও মনে পড়ল, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আমার মতো মানুষের জন্যে। আমার মতো 'দল্লীন'-এর জন্যে। নাস্তিক হওয়ার পর থেকে নিজেকে সুশীল শিক্ষিত মনে করতাম। হঠাৎ কেন নিজেকে দল্লীন (ٱلضَّآلِّينَ) মনে হলো, এতদিন সূরা ফাতিহার এই শব্দ কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল, বুঝতে পারি নি।

কুরআন খুললাম। ইচ্ছে করেই শুরু থেকে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করলাম। জানতাম আয়াতটা সূরা হাদীদে। তবুও এক লাফে সাতাশ পারায় চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। একপাশ থেকেই উল্টে যেতে থাকলাম। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে পরের পৃষ্ঠায় গেলাম। ঠোঁটে না আওড়ে শুধু চোখের দেখা দেখে যেতে লাগলাম। কিছু পৃষ্ঠা আগের মতো ইয়াদ আছে, কিছু পৃষ্ঠা ঝাপসা হয়ে গেছে। মনে হলো অনেক পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছি, এক এক করে ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করছি।

আয়াতটা হঠাৎ হঠাৎ ভেসে ওঠতে শুরু করল। আবার নতুন করে কুরআন পড়া শুরু করলাম। বিশেষ করে ইবতিলার আয়াতগুলো,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শুনিয়ে দিন তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনও মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, 'আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া হয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর (বাকারা ১৫৫-১৫৭)।

এই আয়াতগুলো আমাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমার জীবনে অনেক উত্থান-পতন গিয়েছে। আমি অনেক দুর্যোগময় সময় পার করেছি। আমি যদি ছেলেবেলাতেই এই আয়াতগুলো ভালো করে বুঝে রাখতাম বা ওই মহাসংকটময় সময়ে আয়াতগুলো আমার মনে পড়ত, আমি অবশ্যই আল্লাহর দিকে ধাবিত হতাম। আল্লাহ বলছেন, (وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ) সবরকারীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

নাস্তিক থাকাকালে আমার মধ্যে সবজান্তাসুলভ অজ্ঞতা বা ধর্মকে অবজ্ঞা করার মানসিকতা আর একগুঁয়ে অহংকার আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমাকে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছেন।

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ সেই সকল লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর দিকে বেশি বেশি রুজু (তাওবা) করে (বাকারা ২২২)।

সামান্য সন্দেহ, তুচ্ছ অবিশ্বাসের ভেলায় ভেসে, কুরআনের নূর ছেড়ে কুফরের অন্ধকারে যাওয়া যৌক্তিক আচরণ নয়। আমার কেন মনে হল, আল্লাহর কিতাব ছাড়াই, ঈমান আর হিদায়াত লাভ করতে পারব? যাবতীয় সন্দেহের নিরসন, কুরআনের বাইরে গিয়ে পাব? আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন,

تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ

এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর এমন কোনও জিনিস আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে (জাসিয়া ৬)?

জীবনের এই পর্যায়ে এসে মনে হয় , বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানের প্রতি নিবিড় দৃষ্টি রাখা। তাদেরকে পর্যক্ষেণে রাখা। তারা কী পড়ছে, কাদের সাথে ওঠাবসা করছে, অনলাইনে কী করছে। বিষয়গুলো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। সামান্য স্বাধীনতা পেয়েই একটি শিশু ও কিশোর বহুদূরে চলে যেতে পারে। পা বাড়াতে পারে বিদ্রোহের দিকে। নাস্তিকতার দিকে।

প্রথমে পরিবারকে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদেরও ধারণা থাকতে হবে। শিশুমনে উঁকি দেয়া নানা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পরিবারকে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধিকাংশের ঈমান ভাসাভাসা। শিশুদের বেয়াড়া প্রশ্নে বাবা-মায়েরা হয় তাদেরকে দমিয়ে দেয়, নয় পাশ কাটিয়ে যায়, নইলে একটা কিছু বলে বুঝ দেয়।

এন্টনি ফ্লো, সে ছিল নাস্তিকদের নেতা। অক্সফোর্ডে। সে ব্যক্তি মৃত্যুর আগে বই লিখে গেছে 'হুনাকা ইলাহ'-আল্লাহ আছেন। কেউ স্বাধীন হতে পারে না। নাস্তিক মনে করে সে সবকিছু থেকে মুক্ত। সমাজে বাস করতে গিয়েই তো কত আইন শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য হয়। কতজনের অধীনে সে থাকে। কত নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে কেন ভাবছে, এই বিশ্বজগতের কোনও স্রষ্টা নেই। নাস্তিক মোটেও স্বাধীন নয়। সে আল্লাহকে অস্বীকার করে প্রকৃত স্বাধীনতাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা।

আমরা কেন এখানে, আমরা কোথায় যাবো, কী হবে আমাদের পরিণতি, কেন এই জীবন—এ-ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন অনেকের ঘুম নষ্ট করে দেয়। যুগে যুগে এমনটা হয়ে আসছে। এর একমাত্র সমাধান—আল্লাহর কিতাবের আশ্রয় নেওয়া। আন্তরিকতার সাথে। অনেকে অনেক জবাব দেবে। কিন্তু মন প্রশান্তকর জবাব একমাত্র কুরআনই দিতে পারে। এটা ভুল বিশ্বাস, ইলহাদ একমাত্র সমাধান। ইলহাদ হলো আমার একথার স্বীকারোক্তি, আমি সঠিক সমাধানের কাছে আসতে ব্যর্থ হয়েছি।

পরিবর্তিত জীবনে এসে বারবার গা শিউরে ওঠে, মরে গেলে আল্লাহর সামনে কীভাবে দাঁড়াতাম? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, একজন শিশু যখন বাবা-মায়ের প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হয়, সে বাবা-মা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। বাবা-মায়ের উচিত নয়, সন্তানকে শাসন দিয়ে বিরক্ত করে তোলা। অতীতে বাবা-মায়ের সাথে রাগ সন্তান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। এখন সন্তানরা ঘর ছেড়ে বের হয় না, তবে মন থেকে বের হয়ে যায়। আশ্রয় নেয় 'অনলাইনে'। হারামে। বাবা-মাকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি।

রেবেকা: মূক-বধির

আমি রেবেকা হুসাইন। জন্মেছি বাংলাদেশে। তিন বছর বয়েসে আমেরিকায় চলে আসি। জন্ম থেকেই আমি 'মূক-বধির'। কিছুই শুনতে পাই না, বলতে পারি না। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কাজ হয় নি। ডাক্তাররা কোনও আশা দেখাতে পারে নি। বাবা-মা শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। খুঁজে ভালো এক প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমি এখানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলাম। আমার মতো আরও শিশু পেয়ে মনটা ভরে উঠল। নতুন করে বাঁচতে শিখলাম। আমিও অন্যদের মতো লেখাপড়া শিখতে পারব, আমার আনন্দ দেখে কে?

এ ছাড়া আমি ঠোঁটের ভাষা শিখেছি। সামনাসামনি থাকলে ঠোঁট দিয়েও কথা বলতে পারি। কিছু কিছু ভাব প্রকাশ করতে পারি।

রেবেকার স্বামী বললেন, আমার বয়েস যখন ২৫-এর আশেপাশে, তখন রেবেকার কথা জানতে পারি। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। আমার বিবেক আমাকে বলেছে, আমি এমন একটি মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারব। রেবেকার মাতা-পিতা প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন, মেয়ে সম্পূর্ণ মূক-বধির, আমি পুরোপুরি সুস্থ। কীভাবে মানিয়ে নেব। প্রথম আবেগ কেটে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমি আশ্বস্ত করলাম। এই তো ২৮ বছর কেটে গেল দাম্পত্যজীবনের। কোনও সমস্যা হয় নি। বিয়ের সময় আমি শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজ থেকেই ওয়াদা দিয়েছিলাম, আমি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে নেব। আমি এখনো রেবেকার মতো দ্রুতগতিতে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারি না, তবে কাজ চালানো গোছের চেয়েও বেশি শিখে গেছি।

রেবেকা বললেন, আমি সাধারণ মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তানের মতোই। নামে মুসলিম ছিলাম। ধর্মকর্মের খুব একটা ধার ধারতাম না। আমার পরিচিত কয়েকজন মুসলিম খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টা আমাকে গভীরভাবে ভাবাল। আমি ধর্মকর্মে মনোযোগী হলাম। নিজেকে দ্বীনের দাঈ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমার সাত মুসলিম বন্ধুও খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। তারা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে অতটা পাকা ছিল না, তাদের পরিবারও তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি এতটা যত্নবান ছিল না। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল।

চার্চের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানানো হতো। তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নিত। চার্চের নিজস্ব লোক ছিল। তারা সাইন ল্যাঙ্গয়েজেই খ্রিস্টবাদ প্রচার করত। আমার বন্ধু মানসিক প্রশান্তির জন্যেই গির্জায় যেতে শুরু করেছিল। তাদের সাথে একটু ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবে, এর বিনিময়ে তারা ভুলধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। গির্জায় তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের কথা আন্তরিক ভঙ্গিতে শোনা হয়।

আমি তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতাম। তাদেরকে আগের ধর্মে টেনে আনতে চাইতাম। আমি অল্পস্বল্প যা জানি, তা দিয়েই তাদেরকে ফের ইসলামের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিতাম। তারা খ্রিস্টান থেকে যাবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তারা তো মুসলিমই ছিল। তাদের পরিণতির কথা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বিশ্বে প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে। শুধু আমেরিকাতেই আছে ৩ মিলিয়ন। মসজিদগুলোতে আমাদের জন্যে আলাদা কোনও ব্যবস্থা নেই। আমরা মসজিদে গিয়ে এমনি এমনি বসে থাকি। অন্যরা বয়ান শোনে। অথচ আমাদেরও শেখার অধিকার আছে। আমরাও মসজিদে যাই কিছু শিখতে। কিছু অর্জন করতে। আমাদের মহল্লার মসজিদ কর্তৃপক্ষকে দুই বছর ধরে বলে আসছি, তারাও যেন আমাদের জন্যে কিছু করেন।

আমি শিখতে চাই। নিজের জন্যে, দাওয়াত দেওয়ার জন্যে। আমরা একটি সংগঠন শুরু করেছি। মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে। আমরা চেষ্টা করছি, আরবির আদলে একটি বিকল্প সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দাঁড় করাতে। অধিকাংশ মুসলিম মূক-বধির মোটেও শিক্ষিত নয়। তাদের কাছে দ্বীন নেই। কারণ তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার অনেক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাদের জন্যে। কিন্তু দ্বীনটা অবহেলিত। তারা সত্যিই খুব দুঃখী।

আল্লাহর ইচ্ছায়, আমাদের প্রচেষ্টায়, এ-পর্যন্ত ৯ জন ভাইবোন মুসলিম হয়েছে। আরও দুজনের ব্যাপারে আশাবাদী। সবাই প্রশ্ন করে, আমি কীভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করি? আমাদের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই শক্তিশালী। আমরা কথা বলার সময় হাত-চোখ-ঠোঁক-নাক সবকিছু একসাথে ব্যবহার করি। শ্রোতা অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসতই পায় না। এতগুলো অঙ্গ একসাথে সক্রিয়ভাবে চোখের সামনে নড়তে দেখলে চোখ সরানো কঠিন। তারা যখন আমার চেহারার দিকে তাকায়, তারা খুবই উষ্ণ ভালোবাসা আর দরদ অনুভব করে। বড় আপন মনে করে। তাদের গা শিউরে ওঠে। তাদের অন্তর ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সূরা আবাসা আমার খুবই ভালো লাগে। আবাসায় রাসুলুল্লাহ একজন অন্ধ ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন। ইলম শেখার প্রতি তাঁর বেজায় আগ্রহ ছিল। দ্বীন শেখার জন্যে প্রবল আগ্রহ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নবীজির দরবারে। রাসুলুল্লাহ তখন কুরাইশ নেতাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অন্ধ সাহাবি বারবার নবীজির সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। কথায় ব্যাঘাত ঘটায় নবীজি ভ্রুকুটি করলেন। আল্লাহ তখন সূরা আবাসা নাযিল করলেন। অন্ধ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে বললেন। কারণ, সে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে দ্বীন শিখতে এসেছে। কাফির সর্দাররা তেমন নয়। আমরাও সেই অন্ধ সাহাবির মতো। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা কল্পনাও করতে পারবে না,

এই প্রতিবন্ধী মানুষগুলো দ্বীন শেখার প্রতি কতটা ব্যগ্র। আমি এই অসহায় মানুষগুলোর সাথে থাকতে চাই। তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না।

সূরা ফাতিহাকে আমার খুবই ভালো লাগে। এই সূরাটা আমার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মূক-বধিরদের সূরাটি শিক্ষা দেওয়ার সময় আমি দেখেছি, তারা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তাদের গা শিউরে ওঠে। তাদের অন্তর বিগলিত হয়। তাদের কলব গলে যায়। তারা খুব বেশি সূরা পড়ার সুযোগ পায় না। আল্লাহর কালামের সামান্য অংশই তারা পায়। এই সূরার সাথেই তাদের বেশি পরিচয়। কালামুল্লাহর প্রভাবে একেকজন রীতিমতো লুটিয়ে পড়ে।

আমি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সূরা ফাতিহা পড়ে শোনাই। সবাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। গোগ্রাসে আল্লাহর কালাম গিলতে থাকে। চোখের পলকও পড়ে না। আমি যখনই ইশারাভাষায় পুরো সূরা তিলাওয়াত শেষ করি, তাদের রোম খাড়া হয়ে যায়। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভেতরে অন্যরকম এক প্রশান্তি অনুভব করে। সবার উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক বেড়ে যায়। মানুষগুলো বুঝতে পারে, অদৃশ্য এক শক্তি তাদের ভেতরকে চাঙ্গা করে তুলেছে। তাদের অন্তরকে আলোকিত করে দিয়েছে। এই সূরা শোনার আগে, গতজীবনে তারা এমন সুখকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় নি।

ভাইবোনেরা সোৎসাহে আবেদন করে, আমি যেন তাদের আরও বেশি করে সময় দিই। আরও বেশি করে দ্বীন শেখাই। আরও বেশি আল্লাহর কালামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। কী অপূর্ব আর নিখাঁদ অনুভূতি, মানুষগুলো কুরআনের প্রভাবে বদলে যাচ্ছে। কুরআনের প্রভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের ভয় বেড়ে যাচ্ছে। কুরআনের প্রভাবে তাকওয়ার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হয়, তাদের তাকওয়া অনেক বিশুদ্ধ আর খাঁটি। আল্লাহর কালামের প্রতি তাদের যে আত্মসমর্পণ দেখি, যদি আরবি মূল কুরআন শুনতে পেত তাহলে কেমন হতো? তাদের এই পরিবর্তন তাকওয়ার পরিচায়ক, ঈমানের পরিচায়ক। আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচায়ক।

অন্যরা কত বড় বড় নিয়ামতের মধ্যে বাস করছে। অথচ এই মহিলার কাছে সেসব নিয়ামতের অনেকগুলোই নেই। তারপরও কী অদম্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কোনও রকমে ঠোঁট নেড়ে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়তে পারেন। সূরা ইখলাস পড়তে পারেন। অনেকটা বিড়বিড়ানির মতো। কিছুই বোঝা যায় না। অত্যন্ত অস্পষ্ট আওয়াজে। মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারিত হয় না। চাইলেও ভালো করে পড়তে পারছে না। আমার সাথে কুরআন। পকেটে কুরআন। আমি কী করছি?

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না (বাকারা ১৮)।

আল্লাহ তাআলা আমার মুখ চালু রেখেছেন। আমার কান সুস্থ রেখেছেন। আমাকে চোখের দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর কালামের জন্যে ব্যয় করছি তো?

কুরআনের জন্য

কিংবদন্তি দাঈ সমাজসেবক আবদুর রহমান সুমাইত রহ.। কুয়েতের অধিবাসী। তার পুরো জীবন কেটেছে আফ্রিকায়। মানুষের সেবায় নিজের জীবন-যৌবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তার স্মৃতিচারণ,

'পুরো আফ্রিকা জুড়ে, খ্রিস্টান মিশনারিদের রেডিও-টিভি স্টেশন জালের মতো ছড়িয়ে আছে। অনবরত খ্রিস্টবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। মিশনারিদের প্রচারের দৌরাত্ম্যে কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এসব স্টেশন থেকে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভয়ংকর ভয়ংকর সব কথা প্রচার করে যাচ্ছিল। বলা হচ্ছিল মুসলমানরা হাতের কাছে খ্রিস্টান পেলেই নির্দয়ভাবে জবাই করে হত্যা করে ফেলে। এক মহিলা তাদের অনুষ্ঠান দেখে এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, আমাদের কথা শুনে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে লুকিয়ে পড়ল। আমরা জানতে চাইলাম কেন আমাদেরকে এত ভয়?

'তোমরা মুসলমান। খ্রিস্টান পেলেই তোমরা জবেহ করে হত্যা করে ফেল।'

আমাদের একভাই বললেন, হাজার হাজার বছর ধরে মুসলমানরা তোমাদের সাথে বাস করে আসছে, কোথাও শুনেছ এমন ঘটনা? আর তোমার আশেপাশেই তো মুসলমান ছিল। তারা এতদিন তোমাকে হত্যা করে নি কেন?

মিশনারিরা তাদের উন্নত প্রযুক্তির প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। মুসলমানদের সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব মনগড়া নৃশংস কাহিনি, খ্রিস্টানদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমাদের সামনে ইসলামি রেডিও স্টেশন খোলা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। আল্লাহ গায়েবি ইন্তেজাম করে দিলেন। সিয়েরালিওন সরকারের কাছ থেকে অত্যন্ত কমদামে পুরো একটি রেডিও স্টেশন কিনে নিতে সক্ষম হয়েছি। স্টেশনটি জার্মানির পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ এসেছিল সিয়েরালিওন সরকারের কাছে। সরকার এই স্টেশনের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে, স্টেশনটা বন্ধ করে রেখেছিল। আমরা আমাদের মতো করে স্টেশনটা চালু করেছি। শুরুতে অনভিজ্ঞতার কারণে হোঁচট খেলেও আস্তে আস্তে সেসব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কুরআন তিলাওয়াত প্রচার দিয়ে শুরু করেছি।

তখন সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল জোসেফ সিদু মোমাহ। এই নামের মূলরূপ হচ্ছে 'ইউসুফ সাঈদ মুহাম্মাদ'। জেনারেল খ্রিস্টান ছিলেন। তার

অফিসে স্বর্ণের বিরাট এক ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষ থেকে এই ক্রুশ তাকে উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। রেডিও স্টেশনের সরঞ্জামাদি কেনার জন্যে আমরা সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথেই কথা বলেছি। ব্যবসায়িক কথাবার্তা শেষে তিনি আমাদেরকে বললেন,

'চেষ্টা করবেন মিশনারিদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী রেডিও স্টেশন বসাতে। মুসলমানরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। আপনারা প্রচারকাজকে আরও জোরদার করুন। চেষ্টা করুন বাকি জনসংখ্যাকেও মুসলমান বানিয়ে ফেলতে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই। আপনার নিজের মতো কাজ করে যাবেন।'

মুসলিম দেশের খ্রিস্টান প্রেসিডেন্টের এমন বক্তব্যে আমরা বিস্মিত হলাম। আমরা বিপুল উদ্যমে কাজে নেমে পড়লাম। জনগণের সাথে মিশে আমরা বুঝতে পারলাম, এখানকার খ্রিস্টানদের পূর্বপুরুষ প্রায় সবাই মুসলিমই ছিল। এখন মিশনারিদের ফাঁদ প্রলোভনে অনেকে খ্রিস্টান হলেও তারা মনেপ্রাণে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারে নি। বেশিরভাগই খ্রিস্টান মিশনারিকে পশ্চিমাদের দালাল মনে করত। উপবেশিক শক্তির প্রতিভূ মনে করত।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ 'টোগো'। এ-দেশের একটি শহর 'কারা'। জনসংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। এই ছোট্ট অঞ্চলের জন্যেই খ্রিস্টানদের সাতটি রেডিও স্টেশন ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত এই শহরে একটিও মুসলিম রেডিও স্টেশন ছিল না। আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত প্রচার শুরু করলাম, চারদিকে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এখানকার মানুষগুলো কুরআন তিলাওয়াত এত পছন্দ করবে, আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। রীতিমতো নাওয়া-খাওয়া ভুলে তারা কুরআন তিলাওয়াত শোনায় বুঁদ হয়েছিল। মানুষগুলো অত্যন্ত সরল। যে যা বোঝাতে পারে, তা নিয়েই মেতে থাকে। কুরআনের ব্যাপারে আমাদের আলাদা করে কিছু বোঝাতে হয় নি। আমরা জানতাম কুরআন নিজেই নিজের পথ বের করে নেয়। কুরআন নিজেই রহমত, শিফা,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ

বলুন, যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে এটা হিদায়াত ও উপশমের ব্যবস্থা (ফুসসিলাত ৪৪)।

কুরআন তিলাওয়াতের সুর শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদের অন্তরে প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। আমরা পায়ে হেঁটে কদ্দূরই বা যেতে পারতাম। একটা রেডিও স্টেশন আমাদের শত শত মাইল পায়ে হাঁটার কষ্ট কমিয়ে দিয়েছে। কুরআনিক রেডিও স্টেশন যেখানে স্থাপন করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমাদের বাসস্থান প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরে। প্রতিদিন স্টেশন-বাসার মধ্যবর্তী এতটা পথ

দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছিল। আবার এই পথটুকু অতিক্রম করাও মসৃণ ছিল না। একটু পরপর সেনা চৌকিতে থামতে হতো। জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হতো।

তল্লাশি চৌকির সেনারা জানত আমরা রেডিও স্টেশন নিয়ে কাজ করছি। সেখান থেকে কুরআন প্রচার করা হবে। প্রতিদিনই তারা অধীর আগ্রহ জানতে চাইত, স্টেশনের কার্যক্রম শুরু হতে আর কতদিন লাগবে? আমাদের উত্তর শুনে তারা হতাশ হতো। সব কাজ শেষ হওয়ার পর যেদিন প্রচার শুরু হলো, তার পরদিন আমরা স্টেশনে যাচ্ছিলাম। চৌকিতে গাড়ি থামাল। প্রতিদিনের মতোই প্রশ্ন করল, স্টেশন চালু হয়েছে? জি, হয়েছে। উত্তর শুনতে না শুনতেই প্রহরারত সেনাদের মুখাবয়ব বদলে গেল। একজন দৌড়ে গিয়ে রাস্তার ব্যারিডেক নামিয়ে আমাদের সামনে চলার পথ বন্ধ করে দিল। আমরা তাদের এহেন অদ্ভুত আচরণে সীমাহীন অবাক! হলো কী তাদের? প্রতিদিন এত আগ্রহ করে স্টেশনের খোঁজ নেয়। আজ চালু হওয়ার খবর দিতে না দিতেই ভিন্ন আচরণ। আমরা গাড়িতে বসে আছি। অনিশ্চিত আশঙ্কায়। রাস্তা বন্ধ করেই সেনারা আমাদের ফেলে হৈ রৈ করে ব্যারাকের দিকে দৌড় লাগাল। একটু পর দেখি, সবাই আমাদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। সবার হাতে একটা করে রেডিও। দৌড় প্রতিযোগিতা করছে যেন তারা। কে কার আগে আমাদের কাছে ছুটে আসবে, তারই কসরত চলছে। লম্বামতো এক সেনা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাদের দিকে রেডিও বাগিয়ে ধরল। চ্যানেল ধরে দিতে অনুরোধ জানাল। আমরা এতক্ষণে ধাতস্থ হলাম। হাঁপ ছেড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চ্যানেল ধরে দিলাম। প্রত্যেককে আলাদা করে চ্যানেল ধরে দিয়ে তবেই ছাড়া পেলাম।

চ্যানেল খুলতেই কুরআন তিলাওয়াত ভেসে এল।

জীবনে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, অনেক মজার ঘটনা শুনেছি, অনেক রোমহর্ষক কাহিনি পড়েছি। কিন্তু রেডিও থেকে কুরআন তিলাওয়াতের সুর ভেসে আসতেই ক্ষ্যাপাটে মানুষগুলো যেভাবে হঠাৎ করে শান্ত-সুস্থির হয়ে গেল, এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আর চোখে পড়ে নি।

মানুষগুলোকে কেমন এক তন্ময়তা পেয়ে বসল। মাথায় যেন পাখি বসেছে, নড়াচড়া করলেই পাখি উড়ে যাবে। শান্ত-সুস্থির হয়ে ভেসে আসা কুরআনি সুরে ডুবে গেল। আল্লাহ তাআলা কারী আবদুল বাসেত রহ.-কে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন। তার কুরআনি সুর মানব-দানব উভয়কে মোহিত করেছে।

আরেক সেনাচৌকিতে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। তারা যখন জানতে পারল, আমরা রেডিও স্টেশন চালু করকে সমর্থ হয়েছি। আগের চৌকির মতো সবাই হুড়োহুড়ি করে রেডিও নিয়ে এল। স্টেশন চালু করতেই কারী আবদুল বাসেত রহ.-এর সমধুর তিলাওয়াত ভেসে এল। রেডিও বেজে উঠতে না উঠতেই এক অবাক করা

দৃশ্যের অবতারণা হলো। সেনারা হৈ হৈ করে উঠল। দুপদাপ মাটিতে পা ফেলে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করল। তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কুরআন শুনে এমন করা অনুচিত। কে শোনে কার কথা। তারা আছে তাদের তালে। তাদেরকে কুরআনের আয়াত শুনিয়ে নিরস্ত করব, সে সুযোগই দিচ্ছিল না,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُۥ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয় (আ'রাফ ২০৪)।

তাদের আবেগ থিতিয়ে এলে জানতে চাইলাম, কেন তারা এমন বেসামাল আচরণ করল? তারা বলল, দেশের মুসলমানের হার ৮৫% হলেও আমাদের অফিসার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবাই খ্রিস্টান। খ্রিস্টান অফিসাররা আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। আমরা সংখ্যায় বেশি হয়েও খ্রিস্টানদের অধীন হয়ে আছি, এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করত। তাদের বাইবেল কত শক্তিশালী, তারা বাইবেলের বাণী প্রচারে কী কী করেছে তার ফিরিস্তি দিত। আমাদের কুরআন নিয়ে এমন কোনও উদ্যোগ নেই, এ-নিয়ে অপমানজনক কথাবার্তা শোনাত। জোর করে তাদের বাইবেলীয় স্টেশন শুনতে বাধ্য করত। বলত, তোমাদের যেহেতু কুরআনি স্টেশন নেই, বাইবেল শোন। আমরা কোনও জবাব দিতে পারতাম না। বাধ্য হয়ে বাইবেল শুনতে হতো। আজ কুরআন তিলাওয়াত শুনে আনন্দের আতিশয্যে ধেই ধেই করে নেচে উঠেছি।

সেনারা একটি রেডিও স্টেশন স্থাপনকে বিরাট অর্জন ভেবেছে। এরপর থেকে আমাদের গাড়ি দাঁড় না করিয়েই ছেড়ে দিত। উল্টো আমরা চৌকি অতিক্রম করার সময় তারা সামরিক কায়দায় স্যালুট দিত। কুরআন প্রেমে আপ্লুত সেনারা, তাদের ক্যাম্পের দুই প্রান্তে দুটি বড় বাঁশের খুঁটির ডগায় দুটি রেডিও লটকে দিয়েছিল। সারাদিন উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত বাজতে থাকত।

রেডিও স্টেশন চালুর পর, আমরা চাক্ষুষ কুরআনের মুজিযা দেখার সৌভাগ্য লাভ করলাম। মানুষগুলো আরবি বুঝত না, শুধু তিলাওয়াত শুনেই তারা এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়ত, না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। আমরা অদক্ষ অপ্রতুল জনবল দিয়ে মিশনারিদের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম। সবই সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর অসীম কুদরতে।

আমরা একদিন রেডিও স্টেশনে বসে আছি। একজন খ্রিস্টান দেখা করতে এল। শিক্ষিত মার্জিত। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইল, আমরা এই স্টেশন থেকে যে 'সংগীত' প্রচার করি, সেটা কীসের সংগীত, কোনও প্রার্থনা সংগীত কি না? তিনি প্রথম দিন থেকেই 'সংগীত' শুনে আসছেন। তার কাছে খুবই ভালো

লেগেছে। যতক্ষণ এই 'সংগীত' শোনেন তার অন্তরে অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব হয়। সম্প্রচার বন্ধ হলেই তার মধ্যে কেমন অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। তিনি আরও জানালেন, সংগীতের ভাষাগুলো তিনি বুঝতে পারেন না। সংগীতে কী বলা হয়, সেটার অর্থ জানার খুব ইচ্ছে। সংগীতের সুরটা তার হৃদয়তন্ত্রীর গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়। আমরা তাকে জানালাম, এটা মুসলমানদের 'কিতাবুল মুকাদ্দাস'- কুরআন শরিফ। ভাষা আরবি। আপনি এর অর্থ জানতে চাইলে, ফরাসি অনুবাদ দিতে পারি। তিনি সাগ্রহে ফরাসি অনুবাদ নিয়ে গেলেন। দুদিন যেতে না যেতেই তিনি আবার হাজির। কিছুটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন,

'আপনারা কেমন মানুষ, আপনাদের কাছে ইখলাসের মতো সূরা থাকতে কীভাবে এখনো আফ্রিকায় একজন খ্রিস্টানও বাকি থাকে?'

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

বলে দিন, কথা হলো- আল্লাহ সবদিক থেকে এক। আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। এবং তাঁর সমকক্ষ নয় কেউ (ইখলাস)।

মানুষটা ইসলাম গ্রহণ করে চলে গেল। সাথে আরও কিছু ইসলামি বইপত্র নিয়ে গেল। কয়েকদিন পর তার পুরো পরিবার নিয়ে হাজির হলো। সবাই একসাথে ইসলাম গ্রহণ করল।

কুরআন তিলাওয়াত প্রচারের জন্যে আরও কিছু এফএম রেডিও স্টেশন চালু করলাম। খ্রিস্টানদের বিপুল প্রচার জোয়ারে আমরা খড়কুটো প্রাণপণে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কুরআন প্রচারের সামান্য আয়োজনেও চারদিকে যে উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছি, তাতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এল আমাদের মন। শুধু একটুখানি কুরআন শোনার জন্যে কালোমাণিকগুলো এককেজন যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সভ্য দুনিয়ার মানুষের কাছে এসব ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হবে। দারিদ্র্য সীমারও বহু নিচে বাস করা মানুষগুলোর মুখে খাবার ছিল না। পরনে কাপড় ছিল না। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। তারপরও কুরআন শোনার জন্যে একটি রেডিও কেনার জন্যে, তাদের এককেজন কী অসাধারণ ত্যাগই না স্বীকার করেছিল।

এক যুবকের মোটর সাইকেল ছিল। সেটা ছিল তার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার একমাত্র বাহন। এই কুরআনপ্রেমী যুবকের মনে হলো, একটা রেডিওই যদি না থাকল, কী হবে মোটর সাইকেল রেখে? মোটর সাইকেল কি কুরআন শোনার চেয়ে বেশি দামি? পুরো এলাকায় একটাও রেডিও নেই। আগ্রহের আতিশয্যে লোকজন কতদূর হেঁটে পাশের গ্রামে গিয়ে কুরআন শুনে আসে। একটা রেডিও না হলেই নয়। গ্রামের কারও কাছে রেডিও কেনার টাকা নেই। কারও কাছে এমন কোনও

'সামানাও' নেই, যা বিক্রি করে রেডিওর টাকা সংগ্রহ করা যায়। অমিত সাহসী যুবকটি সবার হৃদয়ের একান্ত বাসনা পূরণ করতে, নিজের অতীব প্রয়োজনীয় 'মোটর সাইকেল' বিক্রি করে দিল। বাজার থেকে একটি রেডিও আর একটি ঘড়ি কিনে নিয়ে এল।

যুবকের কথা শুনে অভিভূত আমি জানতে চাইলাম, ঘড়ি কেন কিনলে?

'কুরআন প্রচারের সঠিক সময় জানতে হবে না? কুরআনের একটা শব্দও যেন বাদ না পড়ে। তিলাওয়াত সম্প্রচার শুরু হওয়ার আগে থেকেই যেন রেডিওর সামনে বসে যেতে পারি'।

আরেক গ্রামে এক মহিলার ঘটনা আমাদেরকে রীতিমতো বাকরুদ্ধ করে দিল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করা মহিলাটি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। গ্রামের সবার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াতেন। কিছু দিয়ে না হোক, অন্তত তার মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে সবাইকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। আমাদের রেডিও স্টেশন চালু হলো। কুরআন প্রচারের সংবাদ এই প্রত্যন্ত গাঁয়ের নিরিবিলিতেও এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু উপায় কী? রেডিও নেই। টাকাও নেই। গ্রামের সবাই পালা করে অনেক দূর গাঁয়ে গিয়ে কুরআন শুনে আসে। মহৎপ্রাণ মহিলাটির জীবিকার একমাত্র উৎস একটি গরু। গরুর দুধই মহিলার প্রধান খাদ্য। শুষ্ক ভূমিতে অন্য খাবার জোটানো সহজ কথা নয়। মহিলা সিদ্ধান্ত নিলেন গরুটি বিক্রি করে দেবেন। তার কুরআন শোনা দরকার। কুরআনহীন জীবনে গরু দিয়ে কী করবেন? রিজিকের বন্দোবস্ত আল্লাহ করবেন। কুরআনের জন্যে জীবিকার প্রধানতম উৎস বিক্রি করলে, আল্লাহ যদি না খাইয়ে মারেন, কোনও আফসোস থাকবে না। গরুবিক্রির সংবাদে গ্রামবাসী আশার আলো দেখতে পেল যেন। দূরের এক গাঁয়ে গরু বিক্রি করা হলো। এবার রেডিও কেনার পালা। শহর অনেক দূরে। পিঠের ঝোলায় কয়েকদিনের শুকনো খাবার নিয়ে কয়েক যুবক রওনা দিল। উৎসাহী গ্রামবাসী তাদেরকে গ্রামের শেষসীমা পর্যন্ত এসে বিদায় জানাল। ছেলে-ছোকরারা প্রতিদিন বহুদূর পর্যন্ত এসে যুবকদলের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকত। কখন তারা রেডিও নিয়ে ফিরবে! একদিন প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। পুরো গ্রামবাসী ছুটে গেল। যুবকদলকে অভ্যর্থনা জানাতে। রেডিও তো নয়, যেন তাদের প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। যুবকদল যেন রেডিও নয়, বহুমূল্য কোনও 'রত্ন' নিয়ে এসেছে। রেডিওটাই যেন 'কুরআন'. সবাই আপ্লুত হয়ে রেডিওকেই পরম ভক্তিভরে গদগদচিত্তে চুমু খেতে লাগল।

এমন একটি দুটি নয়, অসংখ্য ঘটনা। কালো চামড়ার এই সাদা মনের মানুষগুলো কুরআনের জন্যে জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও পিছপা হয় নি। আখিরাতের জন্যে দুনিয়ার শেষ সম্বলটুকু ত্যাগ করে রিক্তহস্ত হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। একটা হাদিস মনে পড়ছে,

سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ. قالوا: يا رسولَ اللهِ كيفَ سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ؟ قال: رجلٌ له درهمٌ واحدٌ فتصدَّقَ بِهِ، ورجلٌ لَهُ مائةَ ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بها

একটি দিরহাম, লক্ষ দিরহামকে হারিয়ে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, কীভাবে একটি দিরহাম লক্ষ দিরহামকে হারিয়ে দিয়েছে? রাসুলুল্লাহ বললেন, এক ব্যক্তির কাছে আছেই মাত্র এক দিরহাম, সেই একমাত্র দিরহামই মানুষটা সাদাকা করে দিয়েছে। আরেকজনের কাছে লক্ষ দিরহাম আছে, সেখান থেকে মাত্র একটি দিরহাম দান করেছে (সুনানে নাসাঈ)।

আমরা দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে শতভাগ নির্বিরোধী থাকার চেষ্টা করেছি। কোনও ধরনের বিতর্কিত বক্তব্য দিতে যাই নি। আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক বিরোধ এড়িয়ে আমরা শুধু ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেছি। কুরআনের বাণী শুনিয়ে গেছি। ইসলামের বিশুদ্ধতম উৎসের সন্ধান দিয়ে গেছি,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

আপনি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবেন হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত (নাহল ১২৫)।

ঘটনাগুলো পড়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। কুরআনের জন্যে আমি কী করছি? আমার হাতের কাছে কুরআন শেখার উপকরণের কোনও অভাব আছে? তবুও আমি কেন কুরআন থেকে দূরে?

রহমানী রাইহান

আমার মধ্যে যতটুকু ধার্মিকতা আছে, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা আছে, তার সবটাই পেয়েছি আমার মহীয়সী মায়ের কাছ থেকে। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক নারী ছিলেন। আমাদেরও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করতেন। এ-ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতেন না।

চার শতাব্দী জুড়ে উসমানী খিলাফাহর অধীনে থাকা, আমাদের প্রিয় বেলগ্রেড শহর আবার খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেল। খিলাফাহ বাহিনী আসার আগে বেলগ্রেড ছিল ছোট্ট একটি দুর্গশহর। উসমানীরা এই অপাংক্তেয় দুর্গকে পরিণত করেছিল বিশাল এক শহরে। উসমানি খিলাফাহ বেলগ্রেডকে গড়ে তুলেছিল দামেস্কের আদলে। দামেস্কের মতোই এই শহরের অলিগলিতে ছিল মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, খানকার ছড়াছড়ি। খিলাফাহ দুর্বল হয়ে পড়ার পর, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে

বেলগ্রেড থেকে আত্মরক্ষার্থে একপ্রকার শূন্যহাতেই পালিয়ে আসতে হয়। আমাদের পরিবারও বাধ্য হয়ে বসনিয়ার সামাতশ শহরে এসে আশ্রয় নেয়।

নতুন জায়গায় থিতু হতে পরিবারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শত কষ্ট আর অনিশ্চিত জীবনেও মা আমার ধর্মপালন ত্যাগ করেননি। তিনি নামাজের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। আমাদের ভাইবোনদেরও নামাজের ব্যাপারে শিথিল হতে দেননি। মাত্র ছয় বছর বয়েসেই আমি পুরো কুরআন পড়া শিখে নিয়েছিলাম। এটা সম্ভব হয়েছিল আমার মায়ের মেহনতে। আম্মু কি শীত কি গ্রীষ্ম, সব ঋতুতেই আমাকে পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথে পড়ার জন্য মসজিদে পাঠাতেন। যেতে না চাইলে জোর করে পাঠাতেন। প্রচণ্ড শীতের সময়ও আমাকে ফজরের সময় জোর করে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। আমি ধুঁকতে ধুঁকতে মসজিদে যেতাম। প্রায়ই এমন হতো, আমি চোখ বন্ধ করাবস্থাতেই হাঁটতে হাঁটতে মসজিদে যেতাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পুরো নামাজ পড়তাম। সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরতাম। মজার বিষয় হলো, নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময়, এক অদ্ভুত আরামদায়ক তৃপ্তিকর অনুভূতিতে মন আপ্লুত হয়ে থাকত। এত আরামের ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নামায পড়ার পুরস্কার আমি হাতেনাতে পেয়ে যেতাম। বিশেষ করে বসন্তকালে যখন আবহাওয়া মনোরম থাকত।

আমি আজো ছেলেবেলার সেই সুখময় অনুভূতি খুঁজে বেড়াই। ফজরের জামাআত আমাকে অনেক শক্তি যুগিয়েছে। আম্মু যদি আমার ধর্মীয় জীবনের মস্তিষ্ক হন, তো ঘুমজড়ানো ফজরের জামাআত ছিল আমার 'আত্মা'। মসজিদে গেলে আম্মু ভীষণ খুশি হতেন। ফজরের পর সুখময় জান্নাতী অনুভূতি উপভোগ ছাপিয়ে, আরেকটি বিষয় আমাকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হলেও ফজরের জামাআতে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করত। তা হলো, আমাদের মসজিদের বৃদ্ধ ইমাম সাহেবের অপূর্ব সুন্দর তিলাওয়াত। বৃদ্ধ মানুষটি প্রায়ই ফজরের দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা রহমান তিলাওয়াত করতেন। এটাই ছিল আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের মসজিদটি ছিল অনেক পুরনো। সেই উসমানী খিলাফাহ যুগের। মসজিদের চারপাশটা অপূর্ব সব ফুলগাছে ভর্তি ছিল। বাগানে সারা বছর একটা না একটা ফুল ফুটেই চলত। খিলাফাহর মুজাহিদগণ মসজিদ ও বাগানটি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন, সারা বছর পাঁচওয়াক্ত নামাজের সময় কোনো-না-কোনো ফুলের সুবাস ভেসে আসত। আমাদের মসজিদে বাড়তি আতরের প্রয়োজন হতো না। অনেক পরিকল্পনা করেই মসজিদ আর সংলগ্ন বাগানটি তৈরি করা হয়েছিল। উসমানী খিলাফাহর জানেসারীনরা আসলেই এক অসাধারণ বাহিনী ছিল। ফজরের সময় ফুলের সুবাস এতটাই অপূর্ব হয়ে উঠত, কুরআনের সুর আর ফুলের সুবাস মিলে মনে হতো আমি সত্যি সত্যি জান্নাতে আছি।

সূরা রহমানে জান্নাতের বর্ণনা আছে। তখন অর্থ না বুঝলেও, বৃদ্ধ ইমাম এতটা দরদমাখা গলায় তিলাওয়াত করতেন, মনে হতো আমি আর দুনিয়াতে নেই; অন্য কোথাও আছি। তাঁর তিলাওয়াত শোনার লোভেই হাজারো চোখ কচলানো ঘুমভাঙা কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিতাম। তখনো মনে হতো, এখনো মনে হয়, মানুষকে মসজিদমুখী করার অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হলো—

ক. ইমাম সাহেবের সুন্দর দরদমাখা তিলাওয়াত।

খ. মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

গ. ইমাম সাহেবের বয়ান ও মানুষের সাথে মেশার যোগ্যতা।

মার্শাল টিটো (১৮৯২-১৯৮০)-র স্বৈরশাসনে পুরো যুগোশ্লাভ ফেডারেশনেই কড়া বামচিন্তা ব্যাপকভাবে ছেয়ে গিয়েছিল। বাম-নাস্তিকতার হাওয়া আমার গায়েও লেগেছিল। আমার অসংখ্য বন্ধু এই বামবক্রতা থেকে সময়মতো ফিরে আসতে পারেনি। বামভ্রষ্টতার পাঁকেই জীবন পার করে দিয়েছে। আমাদের প্রজন্মের কাছে বামচিন্তা ছিল আফিমের চেয়েও কঠিন এক নেশার মতো। কয়েক প্রজন্মের তরুণ এই বাম-আফিমে চুর হয়ে ছিল। আমি ভাবি, আমি কেন বামঘেঁষার কিছুদিন পর, ডানে ফিরে আসতে পেরেছিলাম? অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছায়। ধর্ম নয়, কম্যুনিজমই আসলে আফিমের মতো। আমার চিন্তাজগতে মাত্র দুই বছর স্থায়ী হয়েছিল ভ্রান্তবাম প্রভাব। দুই বছরেই মার্কসিজমের প্রায় সব বই পড়া হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রহমতে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল—রব্বহীন জীবন অর্থহীন। একমাত্র আল্লাহওয়ালা মানুষই অর্থবহ জীবন গড়তে পারে। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন কোনো সত্তাকে আর যাই হোক, মানুষ বলা যায় না। মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে, তার সৃষ্টিকর্তাকে চেনার জন্য। যে মানুষ তার মূল দায়িত্বই পাশ কাটিয়ে যায়, তাকে কী করে মানুষ বলা যায়?

নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—বাম-নাস্তিকতার ঝড়তুফানেও, আল্লাহর প্রতি আস্থা ধরে রাখার পেছনে কোন বিষয়টা অণুঘটক হিসেবে কাজ করেছে? উত্তর খুঁজতে আমাকে বেশি দূর যেতে হয়নি। আল্লাহই সব করেন। কোনো মাধ্যম ছাড়াই করেন। বাহ্যিকভাবে তিনটি বিষয় বের হয়ে এসেছে—

১. মায়ের ধর্মপ্রবণ আদর-শাসন।

২. মসজিদমুখিতা। বিশেষ করে ফজরের জামাআতমুখিতা। ফজরের জামাআতে প্রচণ্ড এক শক্তি আছে। ছেলেবেলায় শিশুকে জোর করে হলেও, কিছুদিন ফজরের জামাতে শরীক করতে পারলে, এই শিশু পৃথিবী উল্টে গেলেও ধর্মবিদ্বেষী হবে না। আল্লাহ কাউকে তাঁর 'গযব'-এর জন্য নির্ধারণ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। তখন মাদরাসা পড়ার পরও আল্লাহবিদ্বেষী হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। নাউযুবিল্লাহ।

৩. কুরআন। মাত্র ছয় বছর বয়েসেই কুরআনের নাজেরা শেষ করে কিছুটা হিফযও করে ফেলেছিলাম। আমাদের বলকান অঞ্চলে পাঁড় কমিউনিস্ট যুগে, এত ছোটো বয়েসে কুরআন পড়তে পারা ও হিফয শুরু করে দেওয়া প্রায় অলৌকিক ব্যাপার ছিল। এটাও সম্ভব হয়েছিল, আল্লাহর অসীম কুদরতে, মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে। কুরআনেরই বাড়তি প্রভাব তৈরি হয়েছিল 'ফজরের জামাআতে'। প্রাণপ্রিয় বৃদ্ধ ইমামের ভাঙা ভাঙা গলার গমগমে দরদী তিলাওয়াত। কী এক অচেনা অজানা টানই না থাকত তার কুরআন তিলাওয়াত। বিশেষ করে সূরা রহমানে। তিনি কেনই বা প্রায় প্রতিদিনই ফজরের দ্বিতীয় রাকাতে সূরা রহমান পড়তেন, আল্লাহমালুম। তুলনাটা ভুল হলে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করুন। সূরা রহমানকে আমার কুরআনী নাশীদের মতো মনে হয়। একটি লাইনকে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। এ-সূরার প্রায় প্রতিটি আয়াত 'নূন' দিয়ে শেষ হয়েছে। এই সূরার প্রতিটি আয়াতে, শেষ হরফের আগে এক আলিফ মদ্দে তবাঈ কেমন এক অপূর্ব ছন্দ তৈরি করে।

আচ্ছা, আমাদের ইমাম সাহেব কি জানতেন, তার 'ফজরী' একটি শিশুর মানসগঠনে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে? তিনি কি জানতেন, তার 'ফজরী' একটি শিশুকে বামভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবে? তিনি কি জানতেন, তার মধুর ফজরী তিলাওয়াত, একটি শিশুকে কুরআনমুখী আর কুরআনপ্রেমী করবে? তিনি কেন প্রতিদিন কলগুঞ্জনময় ছন্দমুখর সূরা রহমান পড়তেন? একটি শিশুকে হারাম সংগীতের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে? আল্লাহ তা'আলাই কি তার কলবে এসব ইলহাম করে দিতেন? আমি মনে করি, বৃদ্ধ ইমামের 'ফজরী' সুর আমাকে জীবনে নানা বিপদজনক বাঁকে, আমি একজন মুসলিম, একথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হৃদয়ের গভীরে অঙ্কিত হয়ে থাকা বৃদ্ধ ইমামের 'রহমানী' সুর আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে—

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

'তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে'?

পদে পদে আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি। এটা ঠিক, আমি ভালো মুসলিম হতে পারিনি। তবে কুরআনের প্রেম ছিল আজন্ম। কুরআনী সুর আমি আজীবন হৃদয়ে বয়ে বেড়িয়েছি। বৃদ্ধ ইমামের 'ফজরী'-র সুবাস আজন্ম আমার অনুভূতিকে 'রাইহানময়' করে রেখেছে। সূরা রহমানের 'রাইহান' আমাকে আমৃত্যু সুরভিত করে গেছে। কচি শৈশবের ভালোবাসার 'সূরা রহমান', পক্ব-পৌঢ়ত্বে জাগতিক নানা প্রলোভন থেকে রক্ষা করেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের আগে-পরে কত আকর্ষণীয় টোপ-প্রলোভন এসেছে, এসব পাশ কাটিয়ে সামনে

যেতে পারার পেছনেও সেই অবুঝ শৈশবের 'রহমানী সুর' ক্রিয়াশীল ছিল। মানুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে গান গায়, সুর ভাঁজে। আমি বিশেষ সময়গুলোতে সূরা রহমান পড়ি। এমনো হয়েছে—রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে আছি, মন আনমনা হয়ে গেছে, আমি গুনগুন করে সূরা রহমান তিলাওয়াত করেছি। অন্য দেশের আমন্ত্রণে সফরে গেছি, ক্লান্তিকর প্রটোকলের ফাঁকে সূরা রহমানে আশ্রয় নিয়েছি।

শৈশবেই শিশুর হাতে কুরআন তুলে দিতে হবে। শিশুর কানে কুরআন তুলে দিতে হবে। শিশুর চোখে কুরআন এনে দিতে হবে। শিশুর হৃদয়ে কুরআন এঁকে দিতে হবে। কুরআন শিশুকে নিয়ে যাবে আল্লাহ তাআলার কাছাকাছি। কুরআন শিশুকে চিনিয়ে দেবে জান্নাতের পথ।

আলি ইজ্জত বেগোভিচ (১৯২৫-২০০৩)।

বসনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা।

মাদরাসাতুল আম্বিয়া!

নবীর বেড়ে ওঠা

১. বড় কোনও ঘটনা ঘটার আগে, তার প্রেক্ষাপট তৈরি হতে থাকে। একজন নবী আসার আগেও প্রেক্ষাপট তৈরি হতে থাকে। নবী আসার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নবীকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিপালন করেছেন। নবীকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে নবীর যথাযথ প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর প্রতিপালনের জন্যে ভিন্নরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মুসার প্রতিপালন বনী ইসরাঈলের মধ্যে হোক, এটা বোধ হয় রাব্বে কারিমের মানশা (ইচ্ছা) ছিল না। দাসত্বের জীবন কাটাতে কাটাতে বনী ইসরাঈলের অবস্থা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল, ফিরআউনের পেটোয়া বাহিনী এসে, বাবা-মায়ের কোল থেকে, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কেড়ে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করার শক্তি বাবা-মা, আশেপাশের লোকজনের ছিল না। এহেন পরিবেশে একজন নবী বেড়ে উঠতে পারেন না। এই পরিবেশে বেড়ে ওঠে কেউ জালিমের প্রতিরোধে কঠোর ভূমিকা নিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মুসাকে কৌশলে ফিরআউনের প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাসাদে বেড়ে ওঠার কারণে মোটাদাগে দুটি লাভ হলো,

ক. রাজা ও রানির পালকপুত্র হিশেবে গৃহীত হলেন। রাজপুত্রের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে লালিত-পালিত হলেন। নিজবংশের লোকদের মতো লাঞ্ছনা-গঞ্জনাময় জীবনযাপন করতে হলো না। দাসত্ব আর পরাধীনতার হীন অভিজ্ঞতা হলো না। আত্মসম্মানবোধ আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলেন।

খ. ফিরআউনকে একেবারে কাছ থেকে দেখার কারণে তার সম্পর্কে ভয়-ভীতি বাসা বাঁধতে পারে নি। প্রাসাদের বাইরের মানুষের কাছে ফিরআউন ছিল 'ইলাহ', অপার্থিব ব্যক্তিত্ব, অতিমানবীয় কিছু, পূজনীয়। কিন্তু মুসার কাছে ফিরআউন ছিল একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকে আর দশজন সাধারণের মতোই ফেরাউন রক্তগোশতের কাঠামো হিশেবেই দেখে এসেছেন। সে হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়, ব্যথিত হয়, অসুস্থ হয়, বিপদে ভয় পায়, শত্রুর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়, স্নায়বিক উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে। এসব দেখে দেখে মুসার মন থেকে ফিরআউনের মুখোশ খসে পড়েছিল। সাধারণ বনী ইসরাইল ফিরআউনকে যেভাবে অপরাজেয় কিছু

ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মুসার এই সমস্যা ছিল না। প্রাসাদে বেড়ে ওঠার কারণে ফিরআউন সম্পর্কে মুসার আকিদা-বিশ্বাস বনী ইসরাঈলের আকিদা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

৩. শুধু ছেলেবেলাতেই নয়, বড়বেলায়ও আল্লাহ তাআলা মুসাকে সযত্নে লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। মুসা যুবক হলেন। বনী ইসরাঈল ও ফিরআউনের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। সংঘাত আগে থেকেই ছিল। এবার আরও চড়া হলো। ফিরআউনের জুলুম নির্যাতন দেখতে দেখতে মুসার মধ্যে প্রতিবাদ জন্ম নিতে শুরু করল। এর মধ্যে ঘটল এক কিবতি হত্যার ঘটনা ঘটনা। মুসাকে গ্রেফতার করার সমূহ আশঙ্কা তৈরি হলো। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে মুসাকে বাঁচিয়ে দিলেন। মুসা মাদয়ানে চলে গেলেন। বন্দিত্বের জ্বালাময় জীবনে আটকা পড়তে হলো না। জল্লাদের চাবুকের আঘাত খেতে হলো না। অপমানজনকভাবে খুনের দায়ে বিচারের মুখোমুখি হতে হলো না। বন্দিত্ব অনেক সময় ব্যক্তিত্বকে নরম করে দেয়। আল্লাহর নবী বেঁচে গেলেন।

৪. বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে, এভাবে দেশছাড়া হলেন, কত কষ্ট! কতবড় বিপদ! বাস্তবে এটা ছিল অনেক বড় পুরস্কার। রাজপ্রাসাদে রাজার হালে বেড়ে উঠেছেন। স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছেন। এবার যখন স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল, আল্লাহ তাআলা আবার তাঁর নবীকে সংকটপূর্ণ ভূমি থেকে বাঁচিয়ে স্বাধীন ভূমিতে নিয়ে গেলেন। প্রথম অবস্থায় বিদেশ বিভুঁইয়ে দরিদ্র ছিলেন, আশ্রয়হীন ছিলেন, কিন্তু পরাধীন ছিলেন না।

৫. জালিমের অধীনে জীবন কাটানো অনেক বড় এক দুর্ভাগ্য। স্বৈরাচার ও তাগুতের অধীনে জীবন কাটালে চিন্তায় হীনতা নিচুতা জন্ম নেয়। আত্মসম্মানবোধ চলে যায়। আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। ঈমানি গাইরত দুর্বল হয়ে পড়ে। মন আপসকামী আর ভঙ্গুর হয়ে যায়। তাই দেশছাড়া হওয়াটা ছিল মুসা আ.-এর জন্যে নিয়ামত, কিয়ামত নয়।

৬. একটি জাতির মন-মানসিকতার পরিবর্তন এক-দু দিনে হয় না। স্বাধীনচেতা জাতি থেকে দাসত্বের মানসিকতায় অধঃপতিত স্তরে নেমে আসতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়। দাসত্বের মানসিকতা থেকে স্বাধীনচেতার স্তরে উত্তরিত হতেও কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়। মুসাকে দিয়ে সেই উত্তরণের কাজই শুরু হয়েছিল। তাই মুসার জীবনে দাসত্বের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও যেন না লাগে, এটা রাব্বে কারিম সুনিশ্চিত করেছিলেন।

৭. বনী ইসরাঈল দাসত্বের কতটা নীচ স্তরে পতিত হয়েছিল সেটা ধরা পড়ে আল্লাহ তাআলার সুনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়ার পরও, তাদের গড়িমসি দেখে। তাদেরকে মুসা বললেন,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেয়ো না; তা হলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে (মায়িদা ২১)।

৮. বনী ইসরাঈল কী উত্তর দিল,

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

তারা বলল, হে মুসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা (সেখানে) প্রবেশ করব (২২)।

৯. আজ কেউ শান্তিবাদের কোলকে সমস্যা সমাধানের মোক্ষম উপায় ভাবছে, কেউ পাঁড় গণতন্ত্রী হওয়াকে সমাধান ভাবছে, কেউ খানকার নেকাবের আড়ালে থাকাকে সমাধান ভাবছে, কেউ ভোটকে কিতাল মনে করাকে উত্তরণ ভাবছে। কিন্তু এসব হলো প্রজন্ম জুড়ে কুফর ও তাগুতের অধীনে বাস করার কারণে দাসত্বমূলক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

১০. এই দাসত্বের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে, আপস নয়, প্রতিরোধ জরুরি। এক প্রজন্মের প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে আশাহীন হয়ে বসে গেলে হবে না। একরাতের ধাক্কায় মাদরাসার চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিলে হবে না। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ধুঁকে ধুঁকে হলেও চালিয়ে যেতে হবে। হাত-পা গুটিয়ে বসে গেলেই শেষ।

১১. যত সময়ই লাগুক, থেমে যাওয়া চলবে না। মুসা আ. এত চেষ্টা করেও বনী ইসরাঈলের মানসিকতা পরিবর্তন করে যেতে পারেন নি। তবে তিনি শুরু করে দিয়ে গেছেন। এরপর আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ পরিবর্তনের আন্দোলন অব্যাহতভাবে সামনে টেনে নিয়ে গেছেন। শেষমেশ বনী ইসরাঈল দীর্ঘ দাসজীবনের পর, বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পেরেছিল। বিজয়ীর বেশে।

১২. প্রতিরোধ আন্দোলন কখনো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে পারে। বনী ইসরাঈলে এমনটাই ঘটেছিল। বাতিল তাগুতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা করা কঠিন কিছু নয়, এটা যে-কেউ করতে পারে। কিন্তু সূচনার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

১২. প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখতে গিয়ে চরম থেকে চরম মূল্য দিতে হতে পারে, কিন্তু দমে যাওয়া যাবে না। আপস-আত্মসমর্পণ না করে প্রতিরোধ চালিয়ে

গেলে নিজেদের শক্তিহানি হয়, কিন্তু বাতিলেরও অপরিমেয় ক্ষতিসাধন হয়। একসময় বাতিলের পরাজয় ঘটে। একটু খুঁজলে বর্তমানেও এমন নজির পাওয়া অসম্ভব নয়।

১৩. হাল পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে কখনোই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। কষ্ট করে হলেও কাজ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

১৪. মুসা আ.-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাঈল ৪০ বছর শুধু তীহের ময়দানেই উদভ্রান্তের মতো ঘুরপাক খেয়েছে। তারপর তাদের পরিশোধন হয়েছে কিছুটা। নবীগণ তাদের পরিশোধনের কাজ অনবরত চালিয়ে গেছেন।

১৫. সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখা উচিত, আমার সন্তানের মানসিক বিকাশ, ঈমানি বিকাশ, আমলি বিকাশ যথাযথ হচ্ছে তো? বিশেষ করে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে কোথাও সন্তান বেড়ে উঠলে, বেশি সতর্ক থাকা। নানার বাড়িতে, খালার বাড়িতে, চাচার বাড়িতে বেড়ে উঠলে, সেখানে সন্তান কি মাথা উঁচু করে থাকতে পারে নাকি মাথা নিচু করে থাকতে হয়, সজাগ দৃষ্টি রাখা। অন্যের বাড়িতে মানুষ হলে, অনেক সময় মেরুদণ্ড সোজা করে থাকা যায় না। এর প্রভাব বাকি জীবনেও কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা এখন ক্রান্তিকালে আছি। পুরো মুসলিম উম্মাহর এখন ক্রান্তিকাল চলছে। একসময় কেটে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আত্মিক শক্তি: ক্ষমতার উৎস

বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস। চীনের মাওসেতুংয়ের বিখ্যাত উক্তি। উক্তিটা শতভাগ সঠিক না হলেও মোটামুটি সঠিক। না না, আমরা মাওবাদ নিয়ে আলোচনায় বসি নি! আমরা মুসা ও হারুন আ.-এর বিশেষ একটি দিক নিয়ে কথা বলব। ইনশাআল্লাহ!

১. মুসা আ. শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। প্রচণ্ড দাপট ছিল তাঁর। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী নবী ছিলেন। রাশভারী ব্যক্তিত্বের কারণে আশেপাশের সবাই তাকে সমীহ করে চলত। রেসালতের দায়িত্ব এল আল্লাহর পক্ষ থেকে। এত শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে সহকারীর আবেদন জানালেন। এই গুরুদায়িত্ব একা একা পালন করা কঠিন। (وَأَخِي هَارُونُ) আমার ভাই হারুন।

هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

সে আমার চেয়েও স্পষ্টভাষী।

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي

তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরূপে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সমর্থন করে।

إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

আমার আশঙ্কা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে (কাসাস ৩৪)।

২. মুসা আ.-এর তুলনায় হারুন আ. ছিলেন কিছুটা নরম প্রকৃতির। শক্তপোক্ত ব্যক্তিরও নরমসরম সহযোগী দরকার হয়। প্রবল কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারীর আশেপাশে কিছু নরম মানুষ থাকা দরকার। তারা গরম কথাগুলোকে নরম ভাষায় বুঝিয়ে দেবে। হারুন আ.-এর ভূমিকাও অনেকটা তা-ই। তিনি মুসার চিন্তাকে বিশুদ্ধ ভাষায়, উত্তম পদ্ধতিতে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে, গুছিয়ে সবার কাছে পৌঁছে দেবেন।

৩. মুসা আশঙ্কা করেছিলেন, তিনি হয়তো রেসালতের বাণী যথাযথভাবে ফেরআউনের কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না। তাই ভাইকে সাহায্যকারী হিশেবে চেয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছিলন, ফেরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসা সাহায্য চেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আবেদন মঞ্জুর করে বলেছেন,

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ

আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি (৩৫)।

৪. দুই ভাই গেলেন রাজদরবারে। কথোপকথন শুরু হলো। কুরআন কারিমে কথোপকথনটা আছে। সূরা ত্বহা ও শু'আরাতে কথোপকথনটা দেখে নিতে পারি। পুরো আলোচনার কোথাও হারুনের উপস্থিতি বোঝা গেল না। ফেরআউনের সাথে কথা যা বলার মুসাই বললেন। অথচ তিনি (হারুন) সাথেই ছিলেন। এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, তাকে আনাও হয়েছিল মুসার পক্ষ থেকে কথোপকথন চালানোর জন্যে। মুসা আ. যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা চালিয়ে গেছেন, তাতেই ফেরআউন ভড়কে গেছে। মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড রেগেও গিয়েছে। কখনো কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কখনো উত্তর খুঁজে পায় নি। রীতিমতো লেজেগোবরে অবস্থা হয়েছে ফেরআউনের।

৫. প্রশ্ন হলো, হারুন আ.-এর ভূমিকা কী ছিল? হারুন ছিলেন (دعم معنوي) আত্মিক সমর্থন জোগানো। মেন্টাল সাপোর্টও বলতে পারি। একজন ভাই ও ভাষাবিদ সাথে থাকার কারণে মুসার মনোবল নিশ্চয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জালিমের সামনে বুকচিতিয়ে দাঁড়ানোর হিম্মত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৬. আত্মিক শক্তিটা হেলাফেলার বিষয় নয়। এই একটা ব্যাপার, যতবড় শক্তিশালীই হোক, তারও মেন্টাল সাপোর্ট লাগে। সেটা হতে পারে ভাই বা বিবি বা মা-বাবা বা অন্য কেউ, অন্য কিছু। এই শক্তিটা হয় কোমল, নরম, কমনীয়, নমনীয়। এটা থেকে শক্তিমান পক্ষ লড়াইয়ের শক্তি (এনার্জি) অর্জন করে। প্রেরণা লাভ করে। মনোবল হাসিল করে। মানসিক স্বস্তি অনুভব করে। মুসা আ.ও ভাইয়ের সঙ্গ থেকে মনোবল অর্জন করেছিলেন।

৭. পৃথিবীর সমস্ত সেনাবাহিনীতেই (Department of Morale Affairs) বিভাগ থাকে। সৈন্যদের নীতি-নৈতিকতা ও মনোবল চাঙ্গা রাখা এই বিভাগের মূল দায়িত্ব। আরবিতে একে আমরা বলতে পারি (هيئة الشؤون المعنوية)। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি সেনাবাহিনীতে এই বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্ব ও তৎপরতার সাথে কাজ করে এসেছে।

ক. বদর যুদ্ধের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাব, আবু জাহল অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তব্য দিয়ে কুরাইশ যোদ্ধাদেরকে উস্কে দিয়েছে। পেছন থেকে নারী নর্তকীরা তো অনবরত গান গেয়ে, ঢোল-তবলা পিটিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে গেছে। ওহুদে কী হলো? এই বিভাগের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিল স্বয়ং প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা. এই মহিলা যে জোশ আর অভিব্যক্তি দিয়ে অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছিল, তা পড়ে যে কারও রক্ত গরম হয়ে যাবে। কুরাইশরাও ইসলামবিরোধী সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে Department of Morale Affairs-এর কার্যক্রম চালু রাখতো। খন্দকেও একই ঘটনা। আর হুনাইনে কাফির দলের সেনাপতি মালিক যা খেল দেখিয়েছিল, সে আলাপের সুযোগ এখানে নেই।

খ. আর মুসলমানদের মধ্যে কি এই 'ডিপার্টমেন্ট' ছিল? ছিল না মানে, আলবত ছিল। স্বয়ং নবীজি সা. এই বিভাগের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তার একেকটি কথা, একেকটি ইশারাই সাহাবায়ে কেরামকে তাতিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। বলতে কেমন শোনায় বলতে পারছি না। ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলি, বদরে-ওহুদে, নবীজীবনের সমস্ত যুদ্ধে, Department of Morale Affairs-এর দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ তাআলার কুদরতি হাতেই ছিল। বদরের দিকে একটু লক্ষ করি। যুদ্ধের প্রতিটি স্তরে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলের মারফতে আয়াত নাজিল করেছেন। একটি আয়াত আসে, হুজুর সা. তিলাওয়াত করেন, আর সাহাবায়ে কেরামের মনোবল পাহাড়চুম্বী হয়ে ওঠে। কাদেসিয়া, ইয়ারমুক, মুতার ঘটনা সবার সামনেই আছে। এসব ময়দানে, সেনাপতি ও খতীবগণের জ্বালাময়ী খোতবা মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

গ. কেউ কেউ বলে সিরাত পড়ে মজা পায় না। যুদ্ধগুলোর বিবরণ পড়ে কোনও রসকষ পায় না। অবাক লাগে, গল্পের বইয়ের মতো গড়গড় করে পড়লে মজা লাগবে কোত্থেকে? ঈমান ও কুফর উভয় পক্ষের প্রতিটি নড়াচড়াকে বিশ্লেষণ করে করে পড়লে, অন্য কিছু পড়তেই তো ইচ্ছা না হওয়ার কথা।

ঘ. অতীতে ও বর্তমানে, ময়দানে দুটি পক্ষ থাকে। ঈমানের দল ও কুফরের দল। দুই দলের বিভাগীয় কর্মপদ্ধতিতে অনেক তফাত থাকে। কুফরপক্ষের কার্যক্রমে মিথ্যা আশা, ধোঁকা আর পাপ জড়িয়ে থাকে। হালের ঘটনাবহুল মুসলিম অঞ্চলগুলোর দিকেই দেখি না। কুফর পক্ষ কী করে? কোনও একটা শহর সামান্য দখল করতে পারলেই, মিডিয়ার ফলাও করে প্রচার শুরু করে দেয়, পুরো শহরই দখল হয়ে গেছে। এতে তাদের লাভ হয়। তাদের সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ঙ. অপরদিকে ঈমানের পক্ষও নাশিদ, বিভিন্ন চিত্র প্রচার করে নিজ সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা রাখার প্রয়াস পায়। কুরআন হাদিসপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করে।

৮. ফেরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া, মুসা ও হারুন আ.-এর জন্যে ছিল যুদ্ধ। স্নায়ুযুদ্ধ। এই যুদ্ধে 'তনোবলের' চেয়ে মনোবলের ভূমিকা বেশি ছিল। হারুন আ.-এর উপস্থিতিই Department of Morale Affairs-এর কাজ করেছিল।

৯. তবে, 'ডিপার্টম্যান্ট মোরাল অ্যাফেয়ারস' কার্যকর আর সক্রিয় ভূমিকা পালন করার পূর্বশর্ত হলো, মূল 'ডিপার্টম্যান্ট' শক্তিশালী হওয়া। মূলনেতৃত্ব শক্তিশালী হওয়া। মুসা আ. শক্তিশালী না হলে, শত 'হারুন' দিয়েও কোনও কাজ হবে না।

১০. খেলাধুলাতেও দেখি, গ্যালারিতে দর্শক বা প্রিয়জনের উপস্থিতি খেলোয়াড়কে চাঙ্গা করে। খেলোয়াড়ের যদি যোগ্যতাই না থাকে, তার স্কুলজীবন থেকে শুরু করে ভার্সিটি জীবন পর্যন্ত যত মেয়ের দিকে পাপপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, তাদের সবাইকে বধূবেশে হাজির করলেও কিছু হবে না। নৈতিক সমর্থন বড়জোর সাময়িক 'তোড়' সৃষ্টি করতে পারে। মূল শক্তি নিজের কাছেই থাকতে হয়। মুসা আ.-এর মধ্যে, আমাদের নবীজি সা.-এর মধ্যে এই শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

১১. বাহ্যিক সমর্থন, অতিরিক্ত প্রাপ্তির আশ্বাস যোদ্ধাকে জাগিয়ে দেয়। আরও কিছুটা সময় তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়। তাকে চূড়ান্ত বিজয়ী করে তোলে না। সেনাপতির মৃত্যুর ব্যাপারটার দিকে তাকালে বিষয়টা বোঝা যায়। অথচ সেনাপতিও সৈন্যদের মতোই একজন সেনা। তার মৃত্যুতে একজন লোকের পরিমাণ কমে শুধু। কিন্তু তারপরও সেনাপতির মৃত্যুর খবর চাউর হওয়ার সাথে সাথে, পুরো সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কাদেসিয়ার জিহাদে আমরা যেটা দেখতে

পেয়েছি। রুস্তম 'কাত' হওয়ার সাথে সাথে অপরাজেয় 'পারস্য' বাহিনী সাফা। সেই পরাজয়ের কষ্ট পারস্যবাসী আজ পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। এটা কেন হয়? কারণ হলো, সেনাপতি শুধু মূলশক্তিই নয়, একটা দলের সেনাপতি তার দলের সদস্যদের কাছে 'মোরাল' আইকনও বটে। একজন সেনাপতি পুরো দলের শক্তির প্রতীক। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ভরকেন্দ্র। এজন্যই দেখা যায়, কিছুদিন পরপরই পাশ্চাত্য মিডিয়াতে খবর বেরোয়, অমুক সন্ত্রাসী নেতা মারা গেছে। অবশ্য তাদের এই প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধ খুব একটা কাজে আসে না।

১২. আমরা 'মোরাল' ডিপার্টম্যান্টের দিকেই শুধু লক্ষ রাখব না। মূল বিভাগের দিকেও লক্ষ রাখব। মনে রাখতে হবে, হারুন নয়, মুসা আ.-ই মূলশক্তি। মুসা ছাড়া হারুন অচল। বাস্তবেও তা-ই দেখা গেছে। মুসা আ. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে তুর পাহাড়ে গেলেন। হারুনকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন কওমের। মুসা বেরিয়ে যেতে না যেতেই বেশিরভাগ বনী ইসরাঈল 'গোবৎস-পূজা' শুরু করে দিল। হারুন আ. শত চেষ্টা করেও এই শিরকি কর্মকাণ্ড রোধ করতে পারলেন না।

১৩. বনী ইসরাঈল কিছুদিন আগেই বিরাট বড় বড় মুজিযা দেখেছে। সাগর দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ফেরআউনের মৃত্যু, বারোটি প্রস্রবণ আরও আরও মুজিযা। কিন্তু দুষ্টলোকগুলো মুসা আড়াল হওয়ার সাথে সাথে সব ভুলে গেল। হারুন আ. বাধা দিতে গেলে তাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল আরকি। মুসা আ. ফিরে এলে হারুন আ. প্রকৃত চিত্রটা তুলে ধরেছিলেন,

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

বিশ্বাস কর, লোকজন আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল (আ'রাফ ১৫০)।

১৪. দুষ্ট বনি ইসরাঈল নবী হারুনকে মানল না। একগুঁয়েমি করে বলল,

لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসা ফিরে না আসেন, আমরা এর (গো-বৎসের) পূজায় রত থাকব (তোয়াহা ৯১)।

মুসা ফিরে এলেন তুর পাহাড় থেকে। এরপরের ঘটনা একেবারে সংক্ষিপ্ত। মুসা সবকিছু দেখলেন। বিভিন্ন পক্ষের কথা শুনলেন। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলেন। গো-বৎসটাকে পুড়িয়ে ছাইভস্ম উড়িয়ে ফেলার কড়া নির্দেশ জারি করলেন। গো-বৎসের মূলহোতাকে ধরে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন। গো-পূজারি হাজার হাজার বনী ইসরাঈলের একজনের মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটিও বের হলো না। অথচ এর আগে হারুন আ.-কে তারা মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল।

১৫. হারুন বিশুদ্ধভাষার অধিকারী। মুসার দাওয়াতি কাজের প্রধান সহযোগী। কিন্তু এসব কোনও কাজে এল না। শক্তিমান না হলে, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে, বিশুদ্ধ ভাষা, আরও অন্যান্য গুণ প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ মোকাবিলায় কোনও কাজে আসে না। এই গুণাবলি কাজে আসার প্রধান শর্ত হলো, কোনও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা। হারুন আ.-এর বিশুদ্ধভাষার শক্তি কার্যকর ছিল মুসার আশ্রয় ও ছত্রছায়ায় থেকে। বৃহৎ কোনও শক্তির আশ্রয় না থাকলে, ভাষা দিয়ে বেশি কিছু করা যায় না। হারুন আ.-এর বিশুদ্ধ ভাষা, গোছালো উপস্থাপনের প্রতি নবী ইসরাঈল ভ্রুক্ষেপই করেনি। বনী ইসরাঈলকে সোজা করেছে মুসা আ.-এর 'লাঠির বাড়ি'। কবি মুতানাব্বির একটা লাইন মনে পড়ল। এই কবি ব্যাপারটা বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন। মুতানাব্বি জীবনটা শী'আ প্রশাসক 'সাইফুদ্দৌলার' তল্পিবাহক হয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কবি তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরছেন,

حتى رجعتُ وأقلامي قوائل لِي .. المجد للسيف ليس المجد للقلم

আমি নিজেকে ও কলমকে অনেক যাচাই করে দেখেছি, শেষে এটাই মনে হয়েছে, যাবতীয় সম্মান 'সাইফ' (তরবারির)। কলমের কোনও স্বতন্ত্র সম্মান নেই।

এই কবিপ্রবর এই কবিতায়ও তার নুন-খুদদাতার প্রশংসা করতে ছাড়েন নি। 'সাইফ' বলে তরবারি যেমন বুঝিয়েছেন, পাশাপাশি মনিব সাইফুদ্দৌলাকেও বুঝিয়েছেন। এই না হলে আর কবি।

১৬. দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফেরআউনের মুখোমুখি হওয়ার সময় মোরাল সাপোর্টের জন্যে, ভাই হারুনের বিশুদ্ধ 'ভাষাজ্ঞান' সহযোগী শক্তি হিশেবে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিছক ভাষাজ্ঞান দিয়ে দুর্বলের বিরুদ্ধেও জয়লাভ করা যায় না। যে-কোনও বিজয়ের জন্যে প্রয়োজন 'শক্তি'। কঠোর ব্যক্তিত্ব।

১৭. মুসা আ.-এর ঘটনায়, মূল কার্যনির্বাহীশক্তি ও সহযোগী শক্তির নানাবিধ নমুনা দেখতে পাই। বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের মতো আরেকটি শক্তি হলো 'সম্পদ'। রাজনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান কায়েমের জন্যে অর্থসম্পদ প্রয়োজন। সম্পদ ক্ষমতা ও রাজনীতিকে পাকাপোক্ত করে। ক্ষমতা না থাকলে, নিছক সম্পদের কোনও মূল্য নেই।

১৮. শুধু বনী ইসরাঈল কেন, ফেরআউনের বংশধারা কিবতিদের মধ্যেও কারুনের মতো সম্পদশালী আর কেউ ছিল না। তার সম্পদের বহর কেমন ছিল? আল্লাহ তাআলাই বলে দিচ্ছেন,

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল (কাসাস ৭৬)।

এমন প্রভূত অগাধ ধনভান্ডার থাকা সত্ত্বেও, কারুন নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটাতে পারে নি। বরং কারুন সুযোগ বুঝে, নিজের সম্পদ বাঁচাতে, স্বপক্ষ ত্যাগ করে, সরকারি দলে যোগ দিয়েছিল। কারুনের সম্পদ ফেরআউনের স্বার্থেই ব্যয়িত হয়েছে। তার কওমের কোনও কাজে আসে নি।

১৯. সম্পদ বা ভাষাজ্ঞানও ও অন্যান্য সম্পূরক 'উপাদানের' নিজস্ব শক্তি আছে। তবে তার দৌড় খুব বেশি নয়। আরেকটু কাছের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলেও বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক. লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছে। সারাদিন মুখের ভাষা দিয়ে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে দিয়েছে। রাতের আঁধারে 'রাষ্ট্রশক্তি' তার স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ভাষাজ্ঞান' সাফা। কোথাও কেউ নেই। এই বিপর্যয়ের পর, 'ভাষাজ্ঞানের' যথার্থ উপলব্ধি হলো। এবার ভাষাজ্ঞান 'রাষ্ট্রশক্তিকে' তোয়াজ-তাজিম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল অবলম্বন করল।

খ. বিশাল ব্যাংক। সকাল-সন্ধ্যা গ্রাহকে গিজগিজ করছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার লেনদেন হচ্ছে। কিন্তু কী হলো? রাষ্ট্রশক্তি এক ফুৎকারে 'কারুনের' ধন ধসিয়ে দিল।

২০. রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে, অদৃশ্য শক্তি, জাদুকরি বিদ্যা, পোষা জিনও কোনও কাজে আসে না। দেশের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত চষে বাছা বাছা জাদুকর হাজির করা হলো। জাদুকররা নবীর 'মুজিযা' দেখে ঈমান আনল। তারপর? রাষ্ট্রশক্তি তাদেরকে টুকরা টুকরা করল, শূলে চড়িয়ে চরম নির্যাতন চালাল। এতদিনের জাদু কোনও কাজে এল না।

ক. রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে 'তসবিহ' ও জায়নামাজ কোনও কাজে আসে না। ব্রাশফায়ার, সাউন্ড গ্রেনেডের তোড়ে, তসবিহ-জায়নামাজ মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়।

খ. মাদরাসার পাশেই ছিল জলীল খোনার। জিন ছালা দিত। জিন হাজিরা মেলাত। প্রতি মঙ্গলবারে। এক মঙ্গলবারে 'খোনারালয়' বন্ধ। কারণ কী? আজ জিন-হাজিরা মেলানো হবে না। আমেরিকা আক্রমণ করেছে ইরাককে। সারা বিশ্বের জিনেরা সব বাগদাদে জড়ো হয়েছে। আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মাজার হেফাজত করার জন্যে। বাগদাদ রক্ষার জন্যে। কোথায় কি, জিনেরা মার্কিন বোমারু বিমানের বিকট আওয়াজে 'ওজু' ভেঙে পালিয়ে এসেছিল।

২১. মোটকথা, ভাষাজ্ঞান বা 'সুকুমারবৃত্তি' খুবই প্রয়োজন কিন্তু মূল (রাজনৈতিক/রাষ্ট্রীয়)-ক্ষমতা ছাড়া এসব (لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ) কোনও কাজে আসবে না। আয়াতের ভাষায় বলতে গেলে, পুষ্টি জোগাবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না।

২২. তবে কাফিরের রাষ্ট্রশক্তি আর মুমিনের রাষ্ট্রশক্তিতে পার্থক্য আছে। মুমিনের রাষ্ট্রশক্তি হবে আল্লাহনির্ভর। শুধু রাষ্ট্রশক্তি কেন, মুমিনের প্রতিটি মুহূর্তই কাটবে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হয়ে। দুই ভাই রাজদরবারে যাওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলেছেন,

رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে কিনা আমাদের উপর অত্যাচার করে অথবা সীমালঙ্ঘন করতে উদ্যত হয় (তোয়াহা ৪৫)।

মুমিন এমনই হবে। সুখে-দুঃখে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। আল্লাহ দুই ভাইয়ের মিনতির প্রেক্ষিতে আশ্বাস দিয়ে বললেন,

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

তোমাদের উভয়কে এমন প্রভাব দান করছি যে, আমার নিদর্শনাবলির বরকতে তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হয়ে থাকবে (কাসাস ৩৫)।

২৩. শেষকথা হলো, হকের পক্ষশক্তির সহযোগী হয়ে, তাকে 'মেন্টাল সাপোর্ট' দিয়ে যাওয়া সুন্নতও বটে।

ইলাহি সুন্নত।
নববি সুন্নত।
সাহাবিয়ানা সুন্নত।
ক্ষেত্রবিশেষে ফরজও।

একাল-সেকাল

দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফেরআউনের শাসন চলছে। গোয়েন্দা (গণক)-সূত্রে ফেরআউন খবর পেল, দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এক শিশুর জন্ম হবে।

তাই নাকি! ঠিক আছে,

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব (আ'রাফ ১২৭)।

দৃশ্যপট: এক

ফরমান জারি হলো, প্রতিটি ছেলেশিশুকে হত্যা করতে হবে। শুরু হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান। স্বেচ্ছাসেবক, রেজাকার, ভলান্টিয়ার, অতি উৎসাহী, খণ্ডকালীন নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবার কাজ?

১. সন্তানসম্ভবা ও আসন্নপ্রসবাদের 'আদমশুমারি'।

২. সদ্যভূমিষ্ঠদের হত্যা।

পুরো এলাকায় সরকারি বাহিনী গিজগিজ করছে। গোটা এলাকা কর্ডন করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চলছে। বিভিন্ন ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে। মায়েদের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। শিশুদের কলজে ছেঁড়া কান্নায় পাষণহৃদয়েরও স্থির থাকা মুশকিল। একপাল সেনা প্রসূতির ঘরে জোরজবরদস্তি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সৈন্যদের হর্ষধ্বনি শোনা গেল, আরেকটি ছেলে পাওয়া গেছে। ঘ্যাচাং করে খঞ্জর বের করে, এক পোঁচে কল্লা আলগা করে ফেলল। মা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। বাবাকে কয়েকজন ধরে রেখেছে। তবুও বাবা ধস্তাধস্তি করে ছুটে গিয়ে সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। কয়েকজন পাড়াতো হিতাকাঙ্ক্ষী হা হা রবে তেড়ে গেল। বাবাকে জাপটে ধরে ভর্ৎসনা করে বলল,

'কী সব্বোনেশে কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছিলে বলো দিকিনি। কেন অবুঝের মতো আচরণ করছ? শান্ত হও। নিজেকে সংবরণ কর। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছ? শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে জড়াচ্ছ কেন নিজেকে? সরকার আমাদের স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেকুবের মতো, চরমপন্থিদের মতো কাজ করতে উদ্যত হয়েছ? জানো না,

আমাদের শান্তিবাদী অবস্থান তরবারির চেয়ে শক্তিশালী'?

সন্তানহারা বাবা সংবিৎ ফিরে পেল। শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল। শয়তানের প্ররোচনায়, শান্তিবাদী কর্মপদ্ধতি থেকে সাময়িক বিচ্যুতির কাফফারাস্বরূপ 'আস্তাগফিরুল্লাহ' 'আউযুবিল্লাহ' পড়তে থাকল।

দৃশ্যপট: দুই

ফেরআউনের অত্যাচারের জ্বালা আর সইতে না পেরে, একজন বলে উঠল, আর কত? কীভাবে এত নির্যাতন সইবো? তোমরা জেগে ওঠো! আর গাফলতের ঘুমে অচেতন থেকো না। কিছু একটা করো। জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। যে হারে ছেলেশিশু হত্যা চলছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হবে শুধুই নারী। আমাদের মান-সম্মান সবই জালিমশাহির কব্জায় চলে যাবে। আমাদের নারীদের কোনও আশ্রয় থাকবে না। খাদ্যসংস্থান থাকবে না। ফেরআউনের কাছে ইজ্জত বিক্রি করা ছাড়া তাদের খাবার জুটবে না।

শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌমদর্শন পাগড়ি পরা এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষ দাঁড়িয়ে গেলেন। লাঠি ঠুকঠুক করে বক্তৃতারত যুবকের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে বললেন,

'রে নাদান বেকুব মাথামোটা যুবক, যা বলছ, তার পরিণতি কী হবে, সেটা ভেবে দেখেছ? তুমি আমাদের সবাইকে ডোবাবে দেখছি। তোমার একজনের হঠকারী

আচরণের মাশুল আমাদের সবাইকে দিতে হবে। তোমার মতো মাথাবিগড়ানো যুবকরাই সব নষ্টের মূল।'

'শায়খ, কী বলছেন এসব। এতকিছুর পরও আমরা চুপে চুপে মুখ বুজে জুলুম সয়ে যাবো? আমাদের শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। এর প্রতিরোধে লড়াই করে আমাদের মরে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?'

'আরে বোকা, তোমার সন্তান হত্যা করেছে সরকার নিজের নিরাপত্তার কারণে। তুমি কেন উস্কানি নিয়ে আমাদের সবার হত্যার আয়োজন করছ? তোমার ব্যক্তিগত লাভের জন্যে আমাদেরকে কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? আর তোমার এক সন্তান হত্যা করা হয়েছে। তাতে কী হয়েছে? তোমার বিবি আছে না? কিছুদিন পর আবার তোমার সন্তান হবে। ব্যস, মিটেই গেল। আর শোন, আমি ও আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন তোমাকে আবার সন্তান দান করেন। বুঝেছ? একটু ধৈর্য ধরো, আর কটা দিন। তারপরেই আমার কথার সত্যতা পরখ হয়ে যাবে।'

দৃশ্যপট: তিন

চারদিক থেকে শুধু হত্যা আর হত্যার সংবাদই আসছে। বাবা সীমাহীন উদ্বিগ্ন। এতদিন পর একটা সন্তান হলো। এসব ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই ফেরআউনের পেটোয়াবাহিনী হাজির। অনুমতির তোয়াক্কা না করেই দুমড়ে মুচড়ে ঘরে ঢুকল। বাচ্চাটাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে এককোপে দ্বিখণ্ডিত করে মু হা হা করতে করতে বেরিয়ে গেল।

সন্তানহারা পিতা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তানহত্যাকারীর উপর। তার হাত থেকে তরবারি নিয়ে কোপাতে শুরু করল। চারপাশে উৎসুক (বনি ইসরাঈল) দর্শক হায় হায় করে উঠল। সব গেল। সব গেল রবে হা রে রে করে তেড়েফুঁড়ে এসে, হামলাদ্যোত পিতাকে আক্রমণ করল। বেদম আড়ং ধোলাই দিয়ে বেচারা দুঃখী পিতাকে মেরেই ফেলল। এখানেই থামল না। ঘরে ঢুকে সদ্যবিধবা দুঃখিনী মাকেও মেরে ফেলল।

অত্র এলাকার মুয়-মুরুব্বি পঞ্চায়েতরা দ্রুত আইন ও শালিশ কেন্দ্রে জড়ো হলো। সবাই মিলে একটা নিন্দাপ্রস্তাবের খসড়া তৈরি করল।

'এক অপ্রকৃতিস্থ যুবকের হামলায় 'আহত' হওয়া মহান সেনাটির আত্মত্যাগে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আর বেকুব বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী, খারেজি যুবকটির এহেন দুষ্কর্মের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। পাশাপাশি সরকার বাহাদুরের সমীপে সবিনয় নিবেদন করছি, আমাদের এই গ্রামের বাসিন্দারা অত্যন্ত শান্তিপ্রবণ।

সরকারবিরোধী কোনও কার্যক্রম আমাদের এলাকায় ঘটতে পারে না। আমরা সেই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি'।

দৃশ্যপট: চার

বেয়াড়া যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আর কাহাঁতক সহ্য করা যায়? বনী ইসরাঈলের দুঁদে 'শায়খরা' একান্ত বৈঠকে মিলিত হলো। ইবরাহিম আ.-এর সহিফাসমূহ, ইসহাক আ.-এর ওসিয়তমালা, ইয়াকুব আ.-এর শিক্ষা মন্থন করে, তারা ফতোয়া বের করল।

'মহান ফেরআউন শিশুহত্যার যে রাজকীয় ফরমান জারি করেছেন, সেটা নবীগণের রেখে যাওয়া শিক্ষামতে সম্পূর্ণ সঠিক। এই সিদ্ধান্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থেই নেওয়া হয়েছে। এসব শিশু সমাজের স্থিতাবস্থার জন্যে, সরকারের অস্তিত্বের জন্যে মারাত্মক হুমকি ছিল'। জনগণ, রাষ্ট্র ও সরকারের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। আমরা এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।'

ফতোয়া লেখা হতেই, এর সমর্থনমূলক 'বন্ডে' স্বাক্ষর করার জন্যে বিশাল লাইন পড়ে গেল। শেষে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ফিরআউন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হলো। লাখ লাখ 'জ্ঞানী' ফতোয়ায় স্বাক্ষর করল। সামেরিরা পরামর্শ দিল, কিবতিরা গরুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাই কিছু গণ্যমান্য গরুর স্বাক্ষরও নেওয়া হোক। তাহলে এই ফতোয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা চড়চড় করে বেড়ে যাবে। তা-ই করা হলো।

ফতোয়ার নিচে পর্যবেক্ষণমূলক মন্তব্যে লেখা হলো,

বনী ইসরাঈলের যুবক সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা পরিহার করতে আদেশ করা হচ্ছে। তারা যেন সন্ত্রাসী-তাকফীরি চিন্তা বাদ দিয়ে, মহান ফেরআউনি শরিয়তের প্রতি আস্থা স্থাপন করে।

একদল প্রতিনিধি ফেরআউনের সকাশে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলো। ফেরআউন তাদের জন্যে বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করল। ঘুরে ঘুরে নিজ হাতে গোশত পাতে তুলে দিল। ভোজসভায় অংশ নেওয়া একজন ফিসফিস করে বলল, গোশতগুলো খেতে কেমন যেন। এত নরম গোশত জীবনেও খাই নি। স্বাদটাও সম্পূর্ণ অপরিচিত। মৃতশিশুর গোশত নয়তো? ফেরআউন বলল,

কী বললেন?

না বলছিলাম, এত স্বাদু গোশত জীবনেও খাই নি।

তাই? নিন আরেক টুকরা। না না নিতেই হবে।

ফতোয়া পেয়ে ফেরআউন বেজায় খুশি। ফতোয়ার আরও অনেক কপি তৈরি করল। প্রতিনিধি দলকে আশেপাশের বিভিন্ন রাজাদের দরবারে পাঠিয়ে দিল। তারাও দেখুক এই আসমানি ফতোয়া। তারাও জানুক, আমি কোনও ভুল কিছু করছি না।

উপরের দৃশ্যগুলো কল্পচিত্র হলেও, খুব একটা অবাস্তব নয়। বর্তমানের প্রেক্ষিতে এমন কিছু অসম্ভবও মনে হয় না। বরং আশেপাশের অবস্থা দেখে, দৃশ্যগুলোকে শতভাগ সত্য বলে মনে হয়।

আর যুবকদের প্রতি নির্বুদ্ধিতার অপবাদ শুধু একালেই নয়, সেকালেও ছিল। তবে সাহসিকতাপূর্ণ কাজে একালে যেমন যুবকরা বেশি এগিয়ে যায়, সেকালেও তা-ই ছিল। একটা আয়াত দেখি,

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنۡ قَوۡمِهٖ

অতঃপর এই ঘটল যে, মুসার প্রতি অন্য কেউই তো নয়, তার সম্প্রদায়েরই কতিপয় 'যুবক' ঈমান আনল।

আবার পড়ি, কতিপয় 'যুবক' ঈমান আনল। পরিস্থিতি কেমন ছিল?

عَلٰى خَوۡفٍ مِّنۡ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهِمۡ اَنۡ يَّفۡتِنَهُمۡ ؕ

ফিরআউন ও তার নেতৃবর্গ নির্যাতন করতে পারে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও (ঈমান আনল)।

শাসক কেমন ছিল? আমাদের যুগের চেয়েও শতগুণ বেশি পরাক্রমের অধিকারী ছিল,

وَاِنَّ فِرۡعَوۡنَ لَعَالٍ فِى الۡاَرۡضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ

নিশ্চয় দেশে ফিরআউন অতি পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত (ইউনুস ৮৩)।

কুরআন বলে, ইতিহাস বলে, কোনও জাতি চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হলে, যুবকরাই সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে সবার আগে এগিয়ে আসে। বয়স্করাও থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বয়স্করা 'ফতোয়া', গভীর 'বুঝ', সূক্ষ্ম 'চিন্তা' নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। উভয়টার সমন্বয় খুব দরকার।

উসওয়া

আকাবিরের জীবনী পড়তে চায়। পরামর্শের জন্যে এল। তার নিজের পছন্দের তালিকা পেশ করতে বললাম। গড়গড় করে একগাদা নাম বলে গেল। অবাক লাগল। তার তালিকায় একজন সাহাবিরও নাম নেই। সিরাত তো দূর কি বাত।

'তুমি আকবিরের জীবনী কেন পড়তে চাচ্ছ'?

'দ্বীনের সহিহ 'রুখ' ও 'রুহ' বোঝার জন্যে।

'দ্বীনের রুখ-রুহ বুঝতে চাচ্ছ, সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে'?

'বাদ দিইনি তো, আপাতত কাছের ও পরিচিতজনদের দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি।

'তুমি দ্বীন বুঝতে চাইলে প্রথমে কার কাছে যাবে? 'ইমামের' কাছে নাকি মুক্তাদির কাছে? অবশ্যই ইমামের কাছে যাবে। তাহলে দ্বীন বোঝার জন্যে কেন মুক্তাদির কাছে ছুটছ প্রথমে'?

'তেনারা' দ্বীনকে আমাদের জন্যে সহজ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের কাছ থেকে সহজে দ্বীন শেখা যাবে'।

'তাহলে তোমার বক্তব্য হলো, দ্বীন শেখার জন্যে প্রথম ধাপে সাহাবায়ে কেরামের কাছে যাওয়া যাবে না। আগে যেতে হবে, নিজের 'গণ্ডির' আকাবিরের কাছে'?

'জি না, তা নয়, তবে...'

'তুমি একজন মাওলানা, ভালো যোগ্যতা রাখো বলেই মনে করি, আচ্ছা, বলো তো, তুমি যেহেতু আরবি জানো, আবু বকর রা.-এর জীবনী পড়ে কোন বিষয়টা বোঝ নি? সিরাত পড়ে কোন বিষয়টা তুমি বোঝ নি? শুধু একটা বিষয় বলো'।

'এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে কিছু মনে পড়ছে না'

'সময় দিলে বের করে বলতে পারবে'?

'মনে হয়'।

'আমার মনে হয় পারবে না। তুমি আসলে মুখস্থ বলে দিয়েছ। তুমি কখনোই দ্বীন বোঝার মানসে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী নিয়ে বসো নি। সিরাত নিয়ে বসো নি।

আমি বলি কি, প্রথমেই এতসব আকাবিরের তালিকার পেছনে না পড়ে, শুরুতেই আল্লাহর পরামর্শটা মেনে নাও,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে (বাকারা ১৩৭)।

এই আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মতো করে ঈমান আনতে বলা হচ্ছে। তাদের জীবনী জানার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তুমি দ্বীন বুঝতে চাইলে, আল্লাহর মানশা কি, সেটা তুমি ভালো করেই জানো,

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

তোমরাও সেই রকম ঈমান আন, যেমন অন্য লোকেরা ঈমান এনেছে (বাকারা ১৩)।

তারা (সাহাবায়ে কেরাম) যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও ঠিক সেভাবে ঈমান আন। তাহলেই হিদায়াত পাবে। বেশি লাগবে না, তুমি শুধু চার খলিফার জীবনীটা পড়ো। পাশাপাশি সিরাত। এরপরও যদি তোমার দ্বীন বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এটাও হতে পারে, যেখানে তুমি বুঝবে না, সেখানে তোমার তালিকায় থাকা 'আকাবিরের' শরণাপন্ন হবে?

একটা কথা মনে রাখবে, তুমি যত 'আকাবিরের' জীবনীই পড়ো, সবারই কোনও না কোনও ঘাটতি থেকেই যায়। একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম, তারাই পুরো দ্বীন একসাথে মেনে গেছেন। এমনকি যাদের নাম প্রতি পদে পদে আসে, চার ইমাম, তাদের জীবনেও দ্বীনের পরিপূর্ণ রূপ পাবে না। ইমামগণ তাদের ইলম দিয়ে দ্বীনের পরিপূর্ণ রূপরেখা দিয়ে গেছেন, কিন্তু জীবন দিয়ে দ্বীনের পরিপূর্ণ রূপরেখা দিয়ে গেছেন শুধু সাহাবায়ে কেরাম।

শোনো, পুরো খেলাফতে রাশেদা মানে চার খলিফার জীবনী পড়ার পর যদি তোমার হাতে সময় থাকে, তাহলে তোমার যত ইচ্ছা 'আকাবিরের' জীবনী পড়ো, কোনও আপত্তি নেই।

'তাদের জীবনীতে কয়েক প্রকারের 'আমল' পেলে? আমি কোনটার উপর আমল করব'?

'এই তো থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। তুমি ফিকহ বোঝার জন্যে জীবনী পড়তে বসেছ? সেটা আগে বলতে। এত কথা বলতে হতো না। আমলের ক্ষেত্রে তোমার কাছে যে ইমামের ব্যাখ্যা ভালো লাগে, সেটা মানবে। ফিকহের ক্ষেত্রে যে ইমামের 'তাফাক্কুহ' তোমার কাছে বেশি নির্ভরশীল মনে হয়, তারটা মেনে নেবে। সবাই হক।

'তোমাকে আবারও বলছি, চার খলিফার জীবনী পড়ে, কেউ 'আমল' নিয়ে দ্বিধায় পড়েছে, তোমার কাছেই প্রথম শুনলাম। তুমি কুরআন মানো?'

'কেন মানব না?'

তাহলে, একটু আগে দুটি আয়াত বললাম, সেগুলোর উপর একটু আমল করেই দেখ না। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী নিয়ে একটু বসেই দেখো না। পাশাপাশি সিরাত? এই দুটি বস্তুই তোমাকে পরিপূর্ণ দ্বীনের রূপ দেখাবে। কুরআন কারিমের যথার্থ 'তরজমা ও তাফসির' শেখাবে। ফিকহের বিশুদ্ধতম 'ইলম' সরবরাহ

করবে। আমল-আখলাকের পরিপূর্ণতম মানদণ্ড পেশ করবে। নবীজি সা. ও সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া, বাকি সবার জীবন তোমাকে দ্বীনের 'খণ্ডিত' রূপে অভ্যস্ত করে তুলবে।

কারো জীবনী তোমাকে 'ইলম' অর্জন করতে করতে করতে করতে খাওয়া-নাওয়া ভুলে যেতে উৎসাহ দেবে।

কারো জীবনী তোমাকে মানতিক-ফালসাফার 'চিকন' থেকে 'চিকনকথা'র পেছনে পড়ার মোহ দেখাবে।

কারো জীবনী তোমাকে 'তাযকিয়ায়ে নাফস' করতে করতে অন্যসব ভুলে যেতে মায়াময় ডাক দেবে।

এসব বলে শেষ করা যাবে না। আচ্ছা আসো, আপস করি। তুমি তোমার পছন্দের একজন আকাবিরের জীবনী পড়বে, তারপর সাহাবির জীবনী পড়বে। ভালো হয় সবার আগে আবু বকর রা.-এর জীবনী হলে। তারপর আরেকজন আকাবির। তারপর উমার রা.।

তারচেয়ে ভালো হয়, সবকিছু ভুলে সবার আগে সিরাত পড়ে নেওয়া। তারপর সময় থাকলে চার খলিফা। এসো না আয়াতটা আবার পড়ি?

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

তোমরাও সেই রকম ঈমান আন, যেমন অন্য লোকেরা ঈমান এনেছে (বাকারা, ১৩)।

সবুরের মেওয়া

১. একটা প্রশ্ন প্রায়ই তাড়া করে ফিরত। ইয়াকুব আ. কেন চুপ করে ছিলেন। ছেলেদের কথা শুনে তিনি যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা নিলেন না কেন? তিনি দেখলেন ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগানো আছে,

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

আর তারা ইউসুফের জামায় মেকি রক্ত মাখিয়ে এনেছিল!

তার জামাটাও অক্ষত। ছেলেদের কারসাজি ধরে ফেললেন। তার কথাতেও বোঝা যায়, ফাঁকিবাজির জারিজুরি তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। ইয়াকুব বলেই ফেলেছেন,

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا

(এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে।

২. এটা যখন বুঝতে পারলেন, তাহলে ইয়াকুব কেন সশরীরে অকুস্থলে চলে গেলেন না? সরেজমিনে বিষয়টা তদন্ত করে দেখার জন্যে। আসলে ঘটেছিল কী? ইউসুফকে ওরা কোথায় রেখে এসেছে? কী হালতে রেখে এসেছে? একজন পিতা হিশেবে এমন কিছু করাটাই তো স্বাভাবিক আচরণ ছিল। অথবা ইয়াকুব ছেলেদেরকে কেন চেপে ধরলেন না, তাদের কৃত অপরাধ স্বীকার করার জন্যে? জেরার মুখে ছেলেরা অবশ্যই মুখ খুলতে বাধ্য হতো। সমস্যা সমাধানের এই সহজ পথে না হেঁটে ইয়াকুব কঠিন পথে পা বাড়ালেন,

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

সুতরাং আমার জন্যে ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি (ইউসুফ ১৮)।

৩. সবরের পথ কঠিন। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। তা না করে তিনি কেন দুর্গম পথে পা বাড়ালেন? শুধু এবারই নয়, আরো একবার তিনি কঠিন পথে পা বাড়িয়েছেন। প্রথমবার সবরের পথে হেঁটেছেন ইউসুফকে হারিয়ে। দ্বিতীয়বারও সবর করেছেন সন্তান হারিয়ে। তাও এবার এক সন্তান নয়, একসাথে দুই সন্তান। ভাইয়েরা ছোট ভাই বিন ইয়ামিনকে নিয়ে মিসরে এল। খাবার সংগ্রহ করতে। ইউসুফ ছোট ভাইকে নিজের কাছে আটকে রেখে দিলেন। বাবার কাছে কী জবাব দেবেন, এই লজ্জায় বড় ভাইও মিসরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হুবহু একই কথা বললেন,

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ

(ভাইয়েরা মিসর থেকে ফিরে, ইয়াকুব আ.-এর কাছে গেল। এবং বড় ভাই যা শিখিয়ে দিয়েছিল সে কথাই তাকে বলল)। ইয়াকুব (তা শুনে) বললেন, না, বরং তোমাদের মন নিজের তরফ থেকে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার পক্ষে সবরই শ্রেয় (৮৩)।

৪. এসব দেখে মনে হয়, ইয়াকুব নিশ্চিত ছিলেন, তার সবরের ফল কী হবে। তিনি সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলেছিলেন,

عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ

কিছু অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন (৮৩)।

নিজে ইয়াকিনের উপর থাকলেও সন্তানদের কাছে সেটা প্রকাশ করলেন না। মনের ভাবটা প্রকাশ করলেন সবকিছু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার ভঙ্গিতে। সেই শুরু থেকেই তিনি আল্লাহর রহমতের উপর শতভাগ বিশ্বাস স্থাপন করে আসছেন। তবে প্রকাশটা হয়েছে সবরের মোড়কে তাওয়াক্কুল করার মাধ্যমে। এবার দুই সন্তান একসাথে হারিয়েও তিনি বলেছেন,

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৮৩)।

৫. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলেছেন,

ক. তিনি আলিম। আমার ছেলেরা কোথায় আছে, তিনি তা জানেন। আমার জানার প্রয়োজন নেই। তিনি জানলেই চলবে।

খ. তিনি হাকিম। তাঁর কাজে অবশ্যই হিকমত আছে। আমি বুঝলেও আছে, না বুঝলেও আছে। আমার কাজ হলো তাঁর প্রতি ভরসা রাখা।

৬. আরেকটা অবাক করা বিষয় হলো, তিনি একের পর এক দুঃখ পাওয়ার পরও কষ্টের কথা প্রকাশ করতে চান নি। সযত্নে নিজের কষ্ট লুকিয়ে রেখেছেন,

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ

সে (ইয়াকুব) মুখ ফিরিয়ে নিল (৮৪)।

ছেলেদেরকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না, তিন সন্তান হারানোর বেদনার কথা। ছেলেদেরকে জেরা না করে, তাদের কাছে কৈফিয়ত না চেয়ে, একদিকে ফিরে আড়ালে বললেন,

يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ

আহা ইউসুফ!

সন্তান হারানোর বেদনা ইয়াকুবকে কত গভীরভাবে পেয়েছিল? পরের বাক্যটা পড়লে সহজেরই অনুমেয় হবে,

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ

আর তার চোখ দুটি দুঃখে (কাঁদতে কাঁদতে) শাদা হয়ে গিয়েছিল!

বুড়ো মানুষটা এত কষ্ট সত্ত্বেও ভেঙে পড়েন নি। আশেপাশের মানুষকে, বুঝতে দেন নি,

فَهُوَ كَظِيمٌ

আর তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল!

৭. ছেলেরাও কম অবাক হয় নি। সেই কখন ইউসুফ হারিয়ে গেছে, আজ এতকাল পরও বাবা তার স্মরণ করে চলেছেন। শুধু কি তা-ই, তাকে ফিরে পাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করছেন? বিস্ময়টা তারা চেপে রাখতে না পেরে, সরাসরি প্রশ্ন করে বসেছে,

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন (৮৫)।

৮. ছেলেদের উষ্মায় ইয়াকুব মুখ খুলতে রাজি হলেন না। ধৈর্যচ্যুত হয়ে তাদেকে বকাবকি শুরু করলেন না। শুধু বললেন,

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহর কাছেই করছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা জান না (৮৬)।

শেষের বাক্যটা বিশেষ লক্ষণীয়। ইয়াকুবকে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়েছিল। সন্তানদের কাছে তা তিনি প্রকাশ করতে চান নি। চুপ থাকার জন্যে আল্লাহ তাআলাই হয়তো তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাই দীর্ঘকাল দুঃখ-কষ্ট শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছিলেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও কারো কাছে কিছু খোলেন নি।

৯. পাশাপাশি বোধ করি এটা অনুমান করাও ভুল হবে না, ইউসুফকে ওহির মাধ্যমে কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সেই কূপে পড়ার সময় থেকেই। ওহির মাধ্যমেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, ভাইদের এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আল্লাহর হেকমত আছে। নবুওয়াতের আগে ওহি আসে না, আসে ইলহাম। এটাকেও কুরআনে ওহি বলে প্রকাশ করেছেন। কূপে ফেলার পরের ঘটনা আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন,

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহি পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, কে তুমি?) ইউসুফ ১৫।

১০. আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আশ্বাস পাওয়ার কারণে, ছোট্ট ইউসুফও বাবার মতো সবর করতে পেরেছিলেন। বন্দিত্বকে মেনে নিয়েছেন। দেশ ও দশ থেকে দূরে থাকার কষ্ট সহ্য করেছেন। কয়েক বছরের কারাবরণও করেছেন। জানতেন একসময় এর অবসান ঘটবেই। ইয়াকুব যেমন সন্তানের তালাশে বের হন নি, ইউসুফও বড় হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার পর বাবার সন্ধানে বের হন নি। অন্তত কুরআনে এ-ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। উভয়েই সবর করেছেন। কষ্টের কথা নিজের মধ্যে গোপন রেখেছেন। উভয়েই আল্লাহ তাআলার আদেশই বোধ হয় বাস্তবায়ন করে গেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিসালতের দায়িত্ব পালন

নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। মানুষকে হিদায়াতের পথে তুলে আনার ফিকির করেছেন। যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় হয়েছে, ঠিক ঠিক ঘটনা ঘটেছে,

ক. ইয়াকুব আ. দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

খ. ইউসুফ আ. তাঁর হারানো পরিবার-পরিজন ফিরে পেয়েছেন।

গ. ভাইয়েরাও কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

ইউসুফ আ. সেই শৈশবের স্বপ্নের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন,

يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

আব্বাজি! এই হলো আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন (১০০)।

এতদিন সবরের পুরস্কার কী পেলেন, তাও বলতে ভুললেন না,

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ

তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেহাত থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

১১. ভাইদের অপকর্মের জন্যে কোনও রাগ দেখালেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ হলেন না। প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা। ভাইয়েরা অনুতপ্ত হলো। ইউসুফের সম্মানার্থে,

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

১২. ইউসুফ আ. মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে ভাইদের অতীত অপকর্মের দায়ভার শয়তানের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন,

مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي

ইতঃপূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল।

আল্লাহ তাআলার প্রতিও কোনও অভিযোগ প্রকাশ করলেন না। কেন তাকেই এত ভোগান্তি পোহাতে হলো, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র টু-শব্দ করলেন না। উল্টো কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে বললেন,

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করেন।

১৩. বাবার অনুগত সুযোগ্য সন্তানের মতো, হুবহু বাবার ভাষাতেই বললেন,

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

বাবার মতোই আল্লাহর উপর নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করলেন। বাবার কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ থেকে চুলমাত্র এদিক-ওদিক করলেন না। কাজে যেমন বাবার আদর্শ ধরে রেখেছেন, কথায়ও হুবহু বাবার ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

১৪. কত বিপদ গুজরেছে, আজ পুনর্মিলনীতে সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। মন শুধু কৃতজ্ঞই হতে চাইছে। মন শুধু অনুগতই হতে চাইছে। মন শুধু রবের অনুগ্রহের কথাই স্মরণ করতে চাইছে, ইউসুফ যেন রবের অপার কৃপা বলে আঁশ মেটাতে পারছেন না। আবারও শুরু করলেন,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্বেও অংশ দিয়েছেন এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করেছেন (১০১)।

১৫. এমন দিনে কি কাউকে ভর্ৎসনা করা শোভা পায়? অভিযোগ করা উচিত? আর কোনও অনুগত বান্দা মুনিবের প্রতি অভিযোগ করতে পারে? মনিবের নিঃশর্ত স্বীকৃতি প্রদান করাই দাসের কর্তব্য, সে কর্তব্যকর্ম পালন করতেই ইউসুফ ঘোষণা দিলেন,

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা!

১৬. শুকনো ভাষায় স্বীকৃতি নয়, অত্যন্ত বিনয় আর নম্রতার সাথে, নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করে বলছেন,

أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক!

মাবুদ গো! শুধু এটুকু চাওয়া,

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

ক. আপনি আমাকে দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় তুলে নেবেন, যখন আমি থাকি আপনার অনুগত।

খ. আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১৭. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেন। সবচেয়ে বেশি আর কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন নবীগণকে। সর্বযুগেই কাফির-মুশরিকরা মুমিনগণকে কষ্টে

ফেলেছে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। নবীগণের উপর তার চেয়েও বেশি কষ্ট এসেছে। তারা পরিবার-পরিজন হারিয়েছেন। সন্তান হারিয়েছেন। শত চেষ্টাতেও জাতি ঈমান আনে নি। আল্লাহ তাআলা একবার নবীজিকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয়। তাতে আপনার অন্তর যতই কামনা করুক না কেন (১০৩)।

১৮. সবর একটি শক্তিশালী মাদরাসা। প্রতিটি নবীকে আল্লাহ তাআলা এই মাদরাসায় ভর্তি করিয়েছেন। প্রতিটি নবীই এই পরীক্ষায় পাস করে বের হয়েছেন। সবরের পরীক্ষায় পাস করার পরই আল্লাহর সাহায্য এসেছে। সবরের একেবারে চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করার আগে, আল্লাহর নুসরত আসে নি,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ

(পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল যে, তাদের সম্প্রদায়ের উপর আজাব আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল) পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফিররা মনে করতে লাগল, তাদেরকে মিথ্যা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল (অর্থাৎ কাফিরদের উপর আজাব এল) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম তাকে রক্ষা করলাম (১১০)।

১৯. শুধু মুমিনদের জন্যেই নুসরত এল, তা নয়, কাফিরদেরও ছাড়া হয় নি। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর,

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি টলানো যায় না।

২০. এসব ঘটনা কি শুধু গল্প বলার জন্যে? জি না, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, সবার জন্যেই এতে শিক্ষার উপকরণ রয়েছে। যখন কেউ বিপদে পড়বে, সবর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসবে, তারা এই ঘটনা থেকে পাথেয় গ্রহণ করতে পারে। কারণ,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে (ইউসুফ ১১১)।

২১. এসব ঘটনা এমনি এমনি বলা হয়নি,

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছেমিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক।

২২. ঘটনা একটা, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্যে এই একটা ঘটনাই চূড়ান্ত পাথেয় হিশেবে কাজ করে যাবে। কুরআন কারিমের পর আর কোনও কিতাব নেই। কুরআন কারিমই চূড়ান্ত সমাধান,

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

সুতরাং এরপর আর এমন কী কথা আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে? (মুরসালাত ৫০)।

২৩. কুরআন কারিমেই আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান,

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

এবং যারা ঈমান আনে, তাদের জন্যে হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।

আমি কুরআন কারিমকে নিছক একটি বই হিশেবে নিলে চরম ভুল করব। আমার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন। এটা কি আমি বিশ্বাস করি? বিশ্বাস করলেও কার্যক্ষেত্রে কি তার প্রতিফলন ঘটাই?

কুরআন ছেড়ে অন্যদিকে ঘুরপাক খাওয়া, কুরআনের প্রতি আমার আস্থাহীনতাই প্রমাণ করে।

পরীক্ষার ফল

ভাইদের শত্রুতার শুরুতেই যদি ইউসুফকে আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর করায়ত্তে মিসরের ধনভান্ডার (خزائن الأرض) আসত না। কখনো কখনো বালা-মুসিবত দীর্ঘায়িত হয়ে, আমার প্রাপ্তি ও পুরস্কারকে বৃদ্ধি করে। আমার কাজ হলো সুখে-দুঃখে রাব্বে কারিমের প্রতি আস্থা রাখা। পরীক্ষায় অস্থির হয়ে আল্লাহর প্রতি তাড়া প্রকাশ না করা।

নবীগণের পেশা।

আদম আ. ছিলেন কৃষিজীবী। জমিতে চাষ করতেন। ফসল বুনতেন।

ইদরীস আ. ছিলেন খাইয়াত। প্রচলিত ভাষায় খলিফা। পোশাক সেলাই করতেন।

নূহ আ. ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। জাহাজ বানিয়েছেন।
ইবরাহিম আ. ছিলেন রাজমিস্ত্রি। কাবাঘর বানিয়েছেন।
ইলয়াস আ. ছিলেন তাঁতি। সুতো-কাপড় বুনতেন।
দাউদ আ. ছিলেন কামার। লৌহবর্ম বানাতেন।
মুসা আ. ছিলেন রাখাল। শ্বশুরবাড়ির মেষ চরাতেন।

ঈসা আ. ছিলেন ডাক্তার। দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতেন।
মুহাম্মাদ সা. ছিলেন রাখাল। মক্কায় মেষ চরাতেন।
কোনও পেশাই ফেলনা নয়।
শরিয়তের সীমায় সব হালাল পেশাই সম্মানের।
আয়-উপার্জনের জন্যে কায়িকশ্রমের কোনও পেশাকে ছোট করে দেখা গুনাহ।
মানুষকে পেশা দিয়ে মাপাও গুনাহ।

প্রশ্ন

এই উম্মতই তাদের নবীকে সবচেয়ে কম প্রশ্ন করেছে। পুরো কুরআনে, উম্মতের পক্ষ থেকে নবীজিকে কতবার সুয়াল বা প্রশ্ন করা হয়েছে?

১৫টির মতো হবে

বিকৃতি

১. তাওরাতঃ মুসা আ.-এর উপর নাজিল হয়েছে। মুসা আ.-এর ইন্তেকালের পর একাধিকবার তাওরাত হারিয়ে গিয়েছিল।

২. ইনজিলঃ বিকৃত হতে হতে ৭০টারও বেশি ভার্শন তৈরি হয়েছিল। সেগুলোকে যাচাই-বাছাই করে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা চারটা ইনজিল মনোনীত করেছে। এই চারটাতেও পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে ভরপুর।

৩. বেদঃ রচিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি কবি ও দার্শনিক এই রচনায় অংশ নিয়েছে।

৪. কুরআন কারিমঃ একমাত্র কিতাব, যার একটি হরকত বা 'মাত্রাও' পরিবর্তন হয় নি। এটা শুধু মুসলমানের কথাই নয়, অমুসলিম গবেষকরাও বলেন।

৫. কুরআন কারিম শুধু যে পরিবর্তিত বা বিকৃত হয় নি তা নয়, কুরআন পুরো মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে কুরআনের মতো একটি আয়াত এনে দেখাক দেখি!

অতি সতর্কতা

১. ইয়াহুদিদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের পছন্দসই কিছু অংশের প্রতি ঈমান রাখা আর নিজের মনঃপূত না হওয়া অংশের সাথে কুফরি করা।

২. একজন বলল, তাদের 'প্রতিষ্ঠানে' ধারাবাহিক কুরআন তরজমার দরসে সুরা তাওবা বাদ দিয়ে কুরআন তরজমা পড়ানো হয়েছে। অবিশ্বাস্য ঠেকল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘটনা সত্যি।

৩. এই যে সতর্কতা বা ভয় বা আশঙ্কা, এসব কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। দিনে দিনে দেনা বেড়েছে। এখনো সময় আছে সতর্ক হওয়ার।

রাজ্য পরিচালনা

সুলাইমান আ. এতবড় সাম্রাজ্য কীভাবে শাসন করতেন। কিছু বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র আপস করতেন না,

১. তাওহিদ। সাবার রানির সূর্যপূজা বরদাশত করেন নি।

২. হেকমত। হেকমতের সাথে চিঠি লিখেছেন। হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে।

৩. আদল-ইনসাফ। আগে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন। খবর পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েন নি।

৪. দৃঢ়তা, শক্তিমত্তা। চিঠিতে দাওয়াতের পাশাপাশি নিজের শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিতেও কসুর করেন নি। ছোট্টপাখি হুদহুদের অনুপস্থিতিও তার চোখে পড়ে গেছে। এতটা চৌকান্না সতর্ক ছিলেন বলেই এত বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষ হাতে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

খুকি ও দুধবেড়ালী

মাদরাসার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ছোট্ট এক খুকি বোতলে করে দুধ নিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি কাড়ল খুকির খরগোশ লাফ। যেভাবে ছোট্ট পনিটেইল উড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, ঝাঁকিতে বোতলের ছিপি উপছে দুধ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। খুকির এতকিছু খেয়াল করার সময় কোথায়! আপন খেলায় মগ্ন। হঠাৎ খুকির দৌড় বন্ধ হয়ে গেল। সামনে একটা অলস বেড়াল বসে বসে লেজ চাটছিল। বেড়ালের চোখ পড়ল খুকির উপর। বেড়াল সাধারণত এমন করে না। দুষ্ট বেড়াল খুকির দিকে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। খুকি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পেছাতে শুরু করল।

লোকজন দেখে বেড়াল থমকে গেল। খুকিও নিরাপদ দূরত্বে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভয়ে ভয়ে একবার বেড়ালের দিকে তাকায়, আরেকবার পেছন দিকে তাকায়। ভেবে কূলকিনারা করে উঠতে পারছে না, বেড়ালকে ডিঙ্গিয়ে এই অথৈ দূরত্ব কী করে পাড়ি দেবে?

খুকির অসহায় অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বড় ভাই দৌড়ে এল। বীরপুরুষ ভাইটা হুলোটাকে তাড়িয়ে গলিছাড়া করল। বোনকে বাঘের মাসির কবল থেকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে গেল। বেড়ালটি দূর হতেই খুকি আবার আগের মতো নাচতে নাচতে বাসামুখো হলো।

গাড়িতে উঠে অভ্যেসবশত ভাবতে বসলাম, কুরআন কারিমে এমন কোনও চিত্র কি আছে? কয়েকটা ঘটনা মাথায় ক্লিক করল। ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের ঘটনা। সূরা কালামে বাগানওলা ভাইদের কথাবার্তা। হাবিল কাবিলের ঘটনা। ইসহাক ও ইসমাইলের ঘটনা। মারইয়াম ও ইয়াহইয়ার ঘটনা। আর আপন ভাইবোনের ঘটনা সরাসরি একবারই আছে। মুসা ও তার বোনের ঘটনা।

সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল মা পাঠালেন মেয়েকে। বলে দিলেন (قُصِّيهِ) মুসাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু যাও। দুধের শিশুর সুরক্ষায় বোনকে পাঠিয়েছেন। দুধখুকির জন্যেও মা তার পিছু পিছু ভাইকে পাঠিয়েছেন। যুগে যুগেই মায়েরা এমন বাৎসল্য দেখিয়ে এসেছেন। ছোট সন্তানকে একা একা কোথাও পাঠাতে নেই। সাথে কাউকে দিতে হয়। মুসার মা দিয়েছেন। আমাদের খুকির মাও দিয়েছেন। আচ্ছা, বস্তিতে বাস করা এই মা কি জানেন, তিনি একটি কুরআনি আমল করেছেন?

সুস্থ চিন্তা

১. অবুঝ অবলা প্রাণীকে মাত্র একবার বলেছেন, তারা সাথে সাথে নবীর কথা মেনে কিশতিতে উঠে পড়েছে। ৯৫০ বছর ধরে একটানা দাওয়াত দিয়ে গেছেন, প্লাবন আসার পরও বারবার বলেছেন নৌকায় উঠে পড়তে, কিন্তু দুষ্টমতি কওম উঠতে রাজি হয় নি। নিজের সন্তানকেও বারবার নৌকায় উঠতে বলেছেন। বাবার কথা বিশ্বাস হয় নি ছেলের। কওমের অন্য অবিশ্বাসীদের মতোই নবীপুত্রের মনে হয়েছিল, প্লাবন অত বেশি ভয়ংকর হবে না। পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিলেই প্রাণ বাঁচবে।

২. অন্যতম বড় দাঈর ঘরে জন্ম নিয়েও নুহপুত্রের হিদায়াত নসিবে জোটে নি। সবচেয়ে বড় জালিম খোদাদ্রোহীর ঘরনি হয়েও ফিরআউনের স্ত্রীর ঈমান নসিব হয়ে গেছে।

৩. ঈমান ও হিদায়াতের জন্যে পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার সম্ভাবনা কম। হিদায়াত লাভের জন্যে জরুরি হলো সুস্থচিন্তা। ঈমানবিরোধী অসুস্থ চিন্তার মানুষের চেয়ে দ্বীনের কাজের উপযোগী পশুপাখি হাজার গুণে উত্তম।

৪. নবীর ঘরে জন্ম নিলেই হিদায়াত ও জান্নাত সুনিশ্চিত হয়ে যায় না। মাদরাসায় পড়াশোনা করলেই পাক্কা মুমিন হয়ে যাওয়ার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।

৫. একজন মুমিনকে সব সময় সতর্ক থাকা ভীষণ জরুরি। তার ঈমান-আকিদার জায়গাটাতে কোনওভাবে কাফির-মুশরিকের সাথে সাদৃশ্য হয়ে না তো? নুহপুত্রের বড় সমস্যা কী ছিল? সে তার কাফির সাঙ্গপাঙ্গদের পাল্লায় পড়েছিল। তাদের ভুলচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বর্তমানেও এমন ঘটে চলছে।

৬. কোনও চিন্তা বা কর্মপদ্ধতি যদি কাফির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, সেই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে উঠলে, তখন দেখতে হবে, কাফিরদের সেই চিন্তাটা ইসলামের কোনও চিন্তার বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না। এমন হলে সে চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।

৭. গণতন্ত্র এমন এক চিন্তা। কাফিরদের প্রভাবে অনেকে এটাকে সাময়িক মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করার অজুহাত দেখায়। কাফিরের কাছ থেকে দুনিয়াবি কাজের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ঈমানবিরোধী চিন্তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা যেতে পারে না।

উত্তম পরিণতি

আজ কোথায় আদ, সামূদ জাতি? কোথায় ফেরআউন? কোথায় হামান কারুন? কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। পৃথিবীতে আকওয়া (أقوى) শক্তিমান হয়ে লাভ নেই। এখানে দরকার তাকওয়ার (تقوى)। মুত্তাকিদের শেষ পরিণামই উত্তম হয়ে থাকে (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)। দল-পদ-মদের শক্তি নয়, তাকওয়ার শক্তিই আখিরাতে কাজে লাগবে।

আনুগত্য

আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে হুকুম করেছিলেন, আদমকে সিজদা করতে। ইবলিস সিজদা করতে অস্বীকার করল। দম্ভভরে বলল (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ) আমি তার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আ.-কে হুকুম করলেন, (পাথুরে) কাবার দিকে ফিরে সিজদা করতে। নির্দ্বিধায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অথচ ইবরাহিম পাথরের চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। মূলবিষয় হলো কলবে আল্লাহর আজমত (সম্মান) থাকা। নিজের মধ্যে আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের বোধ তৈরি থাকলে যে-কোনও হুকুম পালন করতে, কিছুমাত্র গড়িমসি হয় না।

তাকদির ও সতর্কতা

বান্দা যত কিছুই করুক, আল্লাহ তাআলা যা চান, সেটাই হয়। আল্লাহর সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হয় না।

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

এবং (সেই সঙ্গে একথাও) বলল যে, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হতে রক্ষা করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম কার্যকর হয় না, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। আর যারা নির্ভর করতে চায়, তাদের উচিত তাঁরই উপর নির্ভর করা (ইউসুফ ৬৭)।

ইয়াকুব আ. জানতেন, আল্লাহর যা ফয়সালা, সেটার কোনও পরিবর্তন নেই। তবে বান্দার দায়িত্ব হলো তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহর উপর ভরসা করা। বিপদ সুনিশ্চিত জেনেও বান্দার কর্তব্য বাঁচার চেষ্টা করে যাওয়া। আল্লাহর নবীও জানতেন

বিষয়টা। তারপরও সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে। যাতে বদনজর না লাগে।

বিপদ এলে সবার উপর যাতে একসাথে না আসে।

মেহনত ও ফলাফল

কুরআন কারিমের দরস চলছে। আমরা এখন আছি 'সূরা কামারে'। নুহ আ.-এর কথামাখা আয়াতগুলো পড়তে পড়তে মনে হলো,

'সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় কাজ করেও বাহ্যিক ফলাফল না আসতে পারে। নিজের কাজে দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে লেগে থাকার পরও কাঙ্ক্ষিত ফল না আসতে পারে। আগের যুগের নবীগণ দীর্ঘদিন মেহনত করেছেন, নুহ আ. সাড়ে ৯০০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। অল্প কজনই শুধু ঈমান এনেছিল। বহু নবী বিগত হয়েছেন, যাদের দাওয়াতে খুব বেশি মানুষ সাড়া দেয় নি'।

তার মানে কি নবীগণ ব্যর্থ ছিলেন? নাউযুবিল্লাহ। এমনটা চিন্তাও করা যায় না। তাহলে? তারা তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে থেকে ওহির মাধ্যমে দিকনির্দেশনা পেয়েই রিসালতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন? আসলে যেটাকে আমরা চর্মচক্ষে সাফল্য বা ফলাফল হিশেবে বিবেচনা করি, আল্লাহ তাআলা সেটাকে সাফল্য নাও ভাবতে পারেন।

আমি পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে, যুগোপযোগী পন্থায় মেহনত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নাও পৌছতে পারি। বিজয় নাও অর্জন করতে পারি। কিন্তু নিয়ত খালেস থাকলে বান্দার মেহনতকে আল্লাহ তাআলা বাতিল করেন না। তিনি তার মতো করেই বান্দার মেহনতের প্রতিদান দিয়ে দেন। আমি না বুঝে মনে করি আমার মেহনত ব্যর্থ হয়েছে। আমার এতদিনের শ্রম বৃথা গেছে।

দরকষাকষি

প্রতিটি ঘটনার স্বপক্ষে কুরআন কারিমের আয়াত বের করতে পারা জীবনের বড় স্বপ্নগুলোর একটি। ওআইসির ঘোষণার পর থেকেই ভাবছিলাম, কুরআন আমাকে কী বলে? বেশিরভাগ মানুষই ঘোষণার স্বপক্ষে যেভাবে খুশি আর আনন্দ প্রকাশ করছে, দ্বিধাতেই পড়ে গেলাম, ভুলের মধ্যে আছি কি না।

ঘটনা যেহেতু ইয়াহুদিদের নিয়ে, প্রথমেই ইয়াহুদিদের ঘটনা সংবলিত আয়াতগুলোতে খোঁজার চেষ্টা করলাম। বেশি দূর যেতে হলো না। প্রথম পারার মাঝামাঝিতেই কাঙ্ক্ষিত আয়াতের হদিস মিলল।

ইয়াহুদিদেরকে বলা হলো, গাভী জবেহ করো। ইয়াহুদিরা নানা টালবাহানা শুরু করল। আল্লাহ তাআলার সাথে (تفاوض) আলোচনায় লিপ্ত হলো। তারা আলোচনা-

তর্ক করে গরু জবেহ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। সহজ কোনও পন্থা বের করতে চেয়েছিল। উল্টো তাদের কাজ আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকা পূর্ব-পশ্চিম পুরো 'আল-কুদস'কেই ইসরাঈলের রাজধানী ঘোষণা করেছে। ওআইসি তার পাল্টা পদক্ষেপ হিশেবে, পূর্ব 'কুদস'কে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে (تفاوض)-এর দরজা খোলা রাখা হলো। দরকষাকষি শেষে যা টিকে, সেটাই ফিলিস্তিনের থাকবে। বাকিটুকু ইসরাঈল পাবে। কিন্তু ওআইসির কি এটা জানা নেই, আজ অর্ধেক কুদস ছাড়লে, আগামীতে বাকি কুদস ছাড়তে হবে? আমরা যারা উক্ত ঘোষণায় খুশি হয়েছি, তারাও নিশ্চয় অর্ধেক 'কুদস'কে ছেড়ে দিয়েই খুশি?

শাসকের ভয়

১. জালিম শাসক সবচেয়ে ভয় কাকে করে?

ক. জনগণের জাগরণকে।

খ. জনগণকে জাগিয়ে তোলা ব্যক্তি বা ঘটনাকে।

২. মুসা আ. ও ফেরআউনের ঘটনায় দেখা গেছে, মুসার প্রতি জনমত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ফেরআউন নানা ধরনের আগাম ব্যবস্থা নিয়েছে। মুসা ও হারুন আ.-এর নামে নানা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে। বনী ইসরাঈলকে ভয় দেখানোসহ বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।

৩. জালিম শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা নেতাদের কণ্ঠরোধ করার জন্যে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফিরআউনও মুসা ও হারুন আ.-এর দাওয়াত বন্ধ করার জন্যে এমন কোনও পন্থা নেই, যা সে গ্রহণ করেনি।

জালিমের বৈশিষ্ট্য

১. অত্যাচারী, একগুঁয়ে, স্বৈরাচারী, ক্ষমতালোভী শাসক জনগণকে কোনওভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে চায় না। যতভাবে সম্ভব তারা জনগণের টুঁটি চেপে ধরে রাখে। একান্ত বাধ্য হলেই শুধু নরম কথা বলে।

২. ফিরআউন যখন দেখল জনমত মুসার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন সে তার চিরাচরিত দাম্ভিক কথাবার্তা ছেড়ে নরম পন্থা অবলম্বন করেছে। বলেছে (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) তোমাদের পরামর্শ কী? (আ'রাফ ১১০)।

৩. পায়ের নিচে মাটি নড়বড়ে হতে দেখলে, জালিম শাসকরা জনগণকে তোয়াজ-তাজিমের পথ গ্রহণ করে। বিপদ কেটে গেলে, আবার তার স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়।

৪. এজন্য প্রজাদের উচিত, জালিম একবার নরম হলে তাকে আর সুযোগ না দেওয়া। তার মিষ্টিকথায় তুষ্ট না হয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা।

বনী ইসরাঈল ও ফিরআউন

পুরো কুরআন কারিমে মুসা আ.-এর কথা সবচেয়ে বেশি বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি বনী ইসরাঈল আর ফিরআউনের কথাও। কারণ হিশেবে কোনও কোনও অভিজ্ঞ আলিম বলেন,

১. কুরআনি বর্ণনায় সমস্ত জালিম শাসক, নেতার প্রতিনিধি ফেরআউনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও তার প্রতিকার প্রদান করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত জালিম শাসক, দাম্ভিক জাতীয়তাবাদী নেতা, কুফর-শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ আসবে, সবাইকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. বনী ইসরাঈলের যাবতীয় শয়তানির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত শয়তানি আসবে প্রায় সবই মোটাদাগে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের সমালোচনা ও সংশোধনপদ্ধতি বর্ণনা করার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার আগাম সংশোধনী জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. মুসা আ.-এর পরে বনী ইসরাঈলে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবারই মূল কিতাব ছিল তাওরাত। সবার মূল আদর্শ ছিল—মুসা আ.। মুসা আ.-এর বর্ণনার মাধ্যমে মূলত বনী ইসরাঈলের অগণিত নাম না জানা নবীর কথাই বলা হয়েছে। এক বা দুই লাখ ৪০ হাজার নবীর মধ্যে বেশির ভাগ নবীই বনী ইসরাঈল। মুসা আ.-কে জানার মাধ্যমে অন্য নবীদের বর্ণনা, দাওয়াতি কার্যক্রমও জানা হয়ে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত কাফির-মুশরিকদের থেকে ধেয়ে আসা বেশির ভাগ সমস্যারও সমাধানও মুসা আ.-এর কার্যক্রমে পাওয়া যাবে।

৪. এজন্য মুসা আ. বনী ইসরাঈল, ফিরআউন—এই তিনের কোনও বর্ণনা সামনে এলেই বুঝতে হবে, কুরআন আমাকে বর্তমানে বিরাজমান এক বা একাধিক সমস্যার সমাধান দিচ্ছে। আমার কাজ হলো, আশেপাশে তাকিয়ে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং কুরআনি সমাধান নির্ণয় করে বাস্তবায়ন করা।

৫. তাহলে এখন থেকে শুরু হোক না। উপরোক্ত তিনটির কোনও একটি বর্ণনা সংবলিত একটি আয়াত খুঁজে নিয়ে সেটাতে কী বলা হয়েছে, বর্তমান থেকে তার সদৃশ খুঁজে বের করার মেহনতে নেমে পড়ি?

জিকিরের শক্তি

১. বান্দার মূলশক্তি কী? আল্লাহকে সব সময় সাথে পাওয়া। বান্দা যেমনই হোক, আল্লাহ সব সময় তার সাথেই থাকেন। তাকে রক্ষা করেন। বান্দার কর্তব্য হলো,

আল্লাহ যে তার সাথে আছেন, থাকেন, ছিলেন, থাকবেন—এই অনুভূতি সর্বাবস্থায় সচল রাখা। আল্লাহ সাথে থাকলে দুনিয়ার কোনও পরাশক্তি আমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে?

২. লোহা কত শক্ত পদার্থ। আল্লাহ সাথে থাকলে লোহাও মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য। দাউদ আ. সতত আল্লাহর জিকির-আযকার, তাসবিহ-তাহলিলে মশগুল থাকতেন। শুধু কি তাই? দাউদ আ.-এর জিকিরের প্রভাবে, পশুপাখি, পাহাড়পর্বত পর্যন্ত তার সাথে জিকিরে শামিল হতো।

৩. রাব্বে কারিমও দাউদ আ.-এর সাথে ছিলেন। দয়ালু রব কী করলেন? (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিলাম (সাবা ১০)। আল্লাহ তাআলা সাথে থাকলে আর ভয় কীসের?

তাসবিহ

১. সারা জীবনের সঞ্চয় শেষজীবনে কাজে লাগে। সঞ্চয় মানেই নিরাপত্তা। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। সঞ্চয়ের সাথে অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফিক থাকতে হবে। দুনিয়াতে নেকআমলের সঞ্চয় থাকলে আখিরাতে রাব্বে কারিম মাফ করলেও করতে পারেন। দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

২. ইউনুস আ.-কে মাছে গিলে নিল। তিনি তাসবিহ পাঠ শুরু করলেন। কুরআন কারিমের বর্ণনাভঙ্গি বোঝা যায়, তিনি আগেও বেশি বেশি তাসবিহ পাঠ করতেন। মাছের পেটের আঁধারেও তিনি আগের আমল অব্যাহত রেখেছেন। আগের 'তাসবিহের' সঞ্চয় তো ছিলই, এখন নতুন করে সঞ্চয় করতে শুরু করলেন। আল্লাহ তাআলা সঞ্চয়ের মূল্যায়ন করে বললেন,

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ইউনুস যদি মুসাব্বিহ (তাসবিহপাঠকারী)-দের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তাহলে সে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেত (সাফফাত ১৪৩-৪৪)।

৩. অন্যদিকে ফিরআউনের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না। বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকতে চাইলেও কোনও লাভ হয় নি। আল্লাহ তার ডাক প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন,

ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এখন ঈমান আনছ? অথচ আগে তো তুমি নাফরমানি করেছিলে এবং তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম (ইউনুস ৯১)।

৪. সঞ্চয় খুবই জরুরি। মনগড়া সঞ্চয় হলে চলবে না, আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় হতে হবে। আগে সঞ্চয় না করে, বিপদের সময় সঞ্চয়ে ব্রতী হলেও কাজ হবে না। সময়ের আগে থেকেই সঞ্চয় শুরু করতে হবে।

৫. বেশি বেশি তাসবিহের সঞ্চয় করতে হবে। বেশি বেশি 'তাহলিলের' সঞ্চয় করতে হবে। তাহলে বিপদের মুহূর্তে ফেরআউনের মতো অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে হবে না। ইউনুস আ.-এর মতো উত্তরণের উপায় মিলবে। রাব্বে কারিমই একমাত্র তাওফিকদাতা।

মহাসাফল্য

১. বিরাট সাফল্য। রাব্বে কারিম কোনটাকে বিরাট সাফল্য (اَلْفَوْزُ الْكَبِيرُ) বলেছেন? তাওহিদের কালিমাকে সমুন্নত রাখতে, আপসহীন সংগ্রামে একে একে সবাই শহীদ হয়ে যাওয়াকে রাব্বে কারিম 'ফাওজে কাবির' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা বুরূজে আসহাবে উখদূদকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাওহিদের জন্যে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তারা তাওহিদের প্রশ্নে কাফির রাজার সাথে বিন্দুমাত্র আপসে সম্মত হন নি। তাদের এই জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়াই আল্লাহর কাছ 'ফাওজে কাবির'। বিরাট সাফল্য।

২. হুবহু একই ঘটনা আমরা মাত্র কিছুদিন আগেও দেখেছি। ওই ভাইবোনদের অপরাধ কী ছিল? তারা শুধু বলেছিল (رَبُّنَا اللّٰهُ) আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ। গণতন্ত্র নয়, জাতীয়তাবাদ নয়, সমাজতন্ত্র নয়। সেই ভাইবোনেরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। তাই পুরো বিশ্ব তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কুরআনি আসহাবে উখদূদের মতো তাদেরকেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হয়েছিল।

৩. আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে করতে সবাই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পরাজয় নয়, বিরাট সাফল্য। এটা কুরআনি আকিদা। এটা কুরআনি 'সুন্নাহ। এটা আল্লাহর নির্ধারণ করা 'ফিতরাহ'। জগৎনীতি।

ইয়াহুদি তাকবির

১. বাংলায় একটা প্রবাদবাক্য আছে 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। এই বাক্যটি প্রথম পড়েছিলাম বোধহয় পাক্ষিক *শৈলী* পত্রিকায়। গুণে মানে অত্যন্ত উঁচুদরের সাহিত্য পত্রিকা ছিল সেটি। অনেক স্মৃতি আছে পত্রিকাটি নিয়ে। বাক্যটির মানে হলো, আমাকে যে 'বধ' করবে, সে আমার গোয়ালেই আমার অগোচরে বেড়ে উঠছে।

২. প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভাত খাই। পানি পান করি। নিশ্বাস গ্রহণ করি, ছাড়ি। দেখি। শুনি। হাঁটাচলা করি। কাজ করি। এগুলো আমরা অভ্যস্ত রীতিতে

নিয়মিত করি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এসব কাজের পাশাপাশি আমরা নিয়মিত কিছু চিন্তাও অভ্যস্ত রীতিতে করে থাকি। সংসারের চিন্তা করি। বিবি-বাচ্চার চিন্তা করি। রুজি-রোজগারের চিন্তা করি।

৩. কুদস-ফিলিস্তিন, মুসলিম বিশ্ব নিয়ে ভাবনাও একজন মুসলিমের প্রাত্যহিক জীবন ও চিন্তার অংশ হওয়া উচিত। গত কয়েকদিন ধরে ইসরাঈলে তুমুল বিক্ষোভ চলছে।

৪. ইয়াহুদিদের বারো গোত্রের একটির বাস ছিল ইথিওপিয়ায়। ইসরাঈল গঠিত হওয়ার পর থেকেই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বারোটি গোত্রকে ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু হয়। তার ধারাবাহিকতায় নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ইথিওপিয়া থেকেও 'ফালাশা' ইয়াহুদিদের ইসরাঈলে নিয়ে আসা হয়।

৫. 'ফালাশা' ইয়াহুদিদের গায়ের রঙ কালো। এজন্য ইউরোপ ও অন্য জায়গা থেকে আসা শাদা চামড়ার ইয়াহুদিরা 'ফালাশাদেরকে' অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। রাষ্ট্রীয়ভাবেও ফালাশারা অবহেলার শিকার। এজন্য তাদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলতেই থাকে। কয়েকদিন আগে পুলিশের গুলিতে এক ফালাশা ইয়াহুদি নিহত হয়েছে। তার জের ধরে ফালাশারা তুমুল হট্টগোল মাচিয়ে তুলেছে। ভাংচুর-বিশৃঙ্খলার রাজত্ব কায়েম করেছে তারা। দেখার বিষয় হলো, এতকিছুর পরও পুলিশ এখন আর কারো গায়ে হাত তুলছে না।

৬. মজার বিষয় হলো, ফালাশা ইয়াহুদিরা শাদা চামড়ার প্রভুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে মুজাহিদীনের মতো 'তাকবিরধ্বনি' করছে। একজন বলছে,

তাকবিইইইর! বাকিরা সবাই গলা ফাটিয়ে বলছে, আল্লাহু আকবার। দৃশ্যটা হঠাৎ করে কেউ দেখলে ভাবলে কোনও মুসলিম দেশের যুবকরা বুঝি রাস্তায় এসেছে। তবে খুব বেশি দেরিও নেই। সত্যিকারের মুসলিমরাই সেখানে তাকবির দেবে। ইনশা আল্লাহ।

৭. যে-কোনও ভাবনা বা কাজকে কুরআন কারিমে নিয়ে আসার প্রবণতা থেকেই মাথায় এল সূরা হাশরের আয়াতখানা,

ক. আপনি তাদেরকে একতাবদ্ধ মনে করেন (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا)।

খ. অথচ তাদের হৃদয়গুলো বিক্ষিপ্ত (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ)।

৮. আল্লাহ তাআলার আজিব এক সুন্নাহ বা রীতি হলো, তিনি শক্তিমানের শক্তির জায়গা থেকেই তার পতনের সূচনা করেন। দাম্ভিকের দম্ভই হয় পতনের মূল। আমেরিকার অস্ত্র বা অর্থনীতিই হয়ে উঠবে তার পতনের মূল। এমনকি মুজাহিদের ক্ষমতা বা সামর্থ্যও কখনো কখনো তার পরাজয়ের কারণ হয়ে যায়। হুনায়নের যুদ্ধ তার একটি উদাহরণ হতে পারে। সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল ক্ষণিকের আত্মমুগ্ধতা।

৯. সূরা হাশরে ইয়াহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা শেষকথা বলে দিয়েছেন। তারা যতই একত্র হোক, তাদের মধ্যে হাজারো ফাটল থাকবেই। এবং তাদের 'একত্র' হওয়াটাই তাদের পতনের সূচনা করবে।

আসমানি মাইর

কওমে লুত সমকামিতার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। অল্পকিছু হয়তো ব্যতিক্রম ছিল। বর্তমানের আলোকে বিবেচনা করলে,

১. গণতান্ত্রিক: তাদেরকে বাধা দেওয়ার অধিকার লুতের নেই। কারণ, নোংরা স্বভাবের লোকেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতেই সমাজ-দেশ চলবে। একজনের কথায় নয়। গুটিকয়েকের মতামতের ভিত্তিতে দেশ ও দশ চলতে পারে না।

২. লিব্যারাল: মানুষ যে যার কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন। আরেকজন তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে? প্রত্যেকেরই নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার অধিকার রয়েছে। অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে, যা-খুশি করতে পারবে। দুজনে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সমকামে লিপ্ত হলে অন্যের সেখানে নাক গলানোর অধিকার আসে কীভাবে?

৩. আধুনিকমনা/এনলাইটেড: এদের জিনগত সমস্যা আছে। তারা যেহেতু নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, তাই স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে জোর খাটানোর কী দরকার? তাদেরকে তাদের মতো করে চলতে দিলেই হয়। আর বর্তমান অতি আধুনিকরা বলে, সমকামিতা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার।

৪. অন্ধ দরবারি: উলিল আমর, দেশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বাদশা যদি এতে 'মাসলাহাত' (কল্যাণ) আছে বলে মনে করেন, তাহলে আমরা তাদের সাথে আছি। বাদশাই শেষ কথা। তিনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই হবে। ভালো বললে আমরা শুধু শুধু কোন দুঃখে খারাপ বলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে যাবো?

৫. আধুনিক ইসলামিস্ট: সমকাম খারাপ। নাহি আনিল মুনকার (মন্দ কাজে বাধা দান)-এর দায়িত্ব হিশেবে আমরা এই কাজের নিন্দা জানাচ্ছি। লুত আ.-এর কর্মকৌশলই এমন ছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসুল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (শু'আরা ১৬১-১৬৩)।

৬. রব্বানি (প্রকৃত আল্লাহওয়ালা): এরা সমাজের বিষাক্ত অংশ। এরা বিকৃতরুচির লোক। আল্লাহর সৃষ্টিপ্রকৃতির উল্টো আচরণ করছে এরা। এরা যেহেতু 'হকপথ' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সুতরাং এদের ব্যাপারে কর্মকৌশল সেই আগেরটাই,

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর থাকে থাকে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম। যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল (হুদ ৮২-৮৩)।

৭. এই খবিসদের উপর আকাশ থেকে আজাব নেমে এসেছিল। বর্তমানেও নেমে আসতে পারে। আল্লাহ তাআলা ছিলেন আছেন থাকবেন।

সন্তানের সালাত

১. পিতা হিশেবে ইবরাহিম আ. অসাধারণ ছিলেন। নবীগণ সবদিক দিয়েই অসাধারণ হয়ে থাকেন। তিনি দুআ করলেন (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ) ইয়া রাব্ব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন। তারপর আগে বেড়ে বললেন (وَمِن ذُرِّيَّتِي) আমার বংশধরদের থেকেও সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন।

২. সন্তানের সালাতের প্রতি চৌকান্না থাকা, পিতার উপর কুরআনি দায়িত্ব। একজন পিতা তার শিশু সন্তানদের মন-মগজে সালাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বসিয়ে দেওয়ার জন্যে চমৎকার এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

৩. সন্তানরা বাবার কাছে কতকিছুর বায়না ধরে। পছন্দমতো খেলনা পোশাকের আবদার জুড়ে দেয়। উক্ত পিতা বাসায় নিয়ম করে দিয়েছিলেন, তার কাছে সন্তানদের কিছু চাওয়ার থাকলে তারা যেন যে-কোনও সালাতের পর চায়।

৪. এ-বিষয়ে বাবার বক্তব্য হলো,

'আমি সন্তানদের বলে দিয়েছি, নামাজের পর রাব্বে কারিমের ইবাদত ও কুরআন কারিমের ছোঁয়ায় আমার মনে সুখী সুখী ফুরফুরে আমেজ থাকে। দিলটাও থাকে বেজায় খোশ। তোমরা বৈধ ও যৌক্তিক কিছু চাইলে আমি পূরণ করার চেষ্টা করব'।

৫. বাবা বললেন,

'মাঝেমধ্যে এমনও হয়, অন্য সময় চাওয়ার কারণে যৌক্তিক কোনও চাহিদা পূরণ করি নি। নামাজের পর তাকে কাছে ডেকে বলি, তুমি তখন 'ওটা' চেয়েছিলে। এখনও কি সেটা পাওয়ার ইচ্ছা আছে? তুমি চাইলে কিনে দেব। এখন নামাজ পড়েছি তো, নামাজের প্রভাবে মনটাও খুশি আছে।'

৬. বাবার উপর সালাতের সরাসরি প্রভাব দেখতে পায়। তাদের মনে গাঁথা হয়ে যায় সালাত শুধু আল্লাহর হুকুম পালনই নয়, সালাতের কারণে দৈনন্দিন জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সালাতের ছোঁয়ায় আব্বু অনেক বেশি 'আব্বু' হয়ে ওঠেন। আম্মু আরও বেশি 'আম্মু' হয়ে ওঠেন।

৭. এমন বাবা-মায়ের সন্তান কখনো সালাতবিমুখ হতে পারে না। এমন বাবা-মায়ের সন্তান বড় হয়েও 'হিজাব-নিকাবের' বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না।

৮. এমন বাবা-মা হতে বড় আলিম বা শায়খ হওয়াও জরুরি নয়। অতি সাধারণ একজন বাবা-মাও এমন হতে পারেন। সন্তানকে করে তুলতে পারেন আজীবনের সালাতপ্রেমী।

৯. আর হ্যাঁ, সন্তানকে সালাত কায়েমকারী বানাতে সূরা ইবরাহিমের ৪০ নম্বর আয়াতের দুআটা নিয়মিত পড়ার কোনও বিকল্প নেই। সাথে ৪১ আয়াতের দুআটাও পড়ে নিতে পারি।

সন্তান

১. সুলাইমান আ. দরবারে বসে ছোট্ট একটি পাখির খোঁজও রেখেছেন। (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) সুলাইমান পাখি অনুসন্ধান করলেন। এতবড় রাজ্যের রাজা হওয়ার পরও ছোট্ট একটি পাখি তার দৃষ্টির অগোচরে অনুপস্থিত থাকতে পারে নি।

২. একঘরে বাস করেও অনেক বাবা-মা নিজের সন্তানের খোঁজখবর রাখে না। কোথায় যায়, কার সাথে থাকে, কিছুরই খবর নেই।

৩. আমরা আমাদের ঘরের 'পাখিগুলোর' নিয়মিত খোঁজখবর রাখব। ইনশা আল্লাহ।

রিফ্লেক্স অ্যাকশন

ইয়ামান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে চোখের পলকে সাবার রানি (বিলকিস)-এর সিংহাসন হাজির। বিস্মিত সুলাইমানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ (নামল ৪০)।

চরম বিস্ময়ের সময়ও রবের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মুমিনের বড়গুণ। এত দূর থেকে একটা সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে হাজির করা চাট্টিখানি কথা নয়। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা চাক্ষুষ দেখার পর ধাতস্থ হতে সময় লাগে। আল্লাহর নবী এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতেও আল্লাহর দিকে 'রুজু' করেছেন। একজন নবীর আকিদার 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন' এমনই হওয়ার কথা। আমাদের আকিদার রিফ্লেক্স অ্যাকশন কেমন? প্রথমে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধাতস্থ হব। তারপর ভাবতে বসব,

এটা কীভাবে হলো? কারণ, খুঁজে না পেয়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই বলব: এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।

আকিদা এতটা ধীরগতিসম্পন্ন হলে চলবে না। আমাকে নবীওলা আকিদা অর্জন করতে হবে। সর্বাবস্থায় কলব আল্লাহর দিকে রুজু থাকবে। আমি শুধুই আল্লাহর। আর কারো নই। বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় ডুবে ছিলাম। এমন সময় একজন তালিবে ইলম এল। বিধ্বস্ত অবস্থা,

কী ব্যাপার?

পরীক্ষা আবার স্থগিত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর পরীক্ষা দেব না।

আচ্ছা। কেন দেবে না? যুক্তিগুলো এক এক করে বলো।

না মানে, এত চাপ সহ্য করতে পারছি না।

কীসের চাপ?

মানসিক চাপ।

কীভাবে মানসিক চাপ অনুভব করলে?

আর কথা বলল না। ছেলেপেলেরা আবেগের বশবর্তী হয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিছু দুষ্ট লোকের কারণে পরীক্ষা বাদ দিতে যাবে কেন? তাহলে দুষ্ট লোকেরাই জয়ী হয়ে গেল না?

তালিবে ইলম আসার আগে ভেবেছিলাম শুধু (هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي) অংশটুকু নিয়েই ভাবব। তালিবে ইলমের ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে বললাম, এরপর আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন? সাথে সাথে পড়ল,

لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা করি?

এসো এই অংশটা নিয়ে ভাবি। তুমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে রুজু থাকতে পার কি না, তোমার পরীক্ষা স্থগিতের ঘটনায় তুমি আল্লাহর দিকে রুজু না করে, নিজের নফসের দিকে রুজু হয়েছ। কৃতজ্ঞ বান্দা হও। অকৃতজ্ঞ হয়ো না। অল্পতেই হাল ছেড়ে দেওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার হও। পরীক্ষায় পাস করো। দাওরা পরীক্ষায় পাসের নিয়ত করেছ। অথচ আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার পরীক্ষায় ফেল করতে বসেছ? কর্তৃপক্ষ কি সাধে পরীক্ষা স্থগিত করেছেন? অস্থির না হয়ে তাদের জন্যে দুআ করো।

মাথায় সব সময় কুরআন কারিম নিয়ে চিন্তা ঘুরপাক খায়। প্রতিটি ঘটনাকে কুরআনে নিয়ে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর সময় কাটে। একটু আগে মধু নিয়ে

ভাবছিলাম। সূরা মুহাম্মাদের ১৫ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত মধু নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় একজন তালিবে ইলম সামনে দিয়ে গেল। তার নামও মুহাম্মাদ।

কুরআন হোক নিত্যসঙ্গী।

ঈমান হোক নবীওলা ঈমান।

সবকিছুতে কলব আল্লাহর দিকে রুজু হোক।

কমিসে ইউসুফি

গুনাহের কারণে কতকিছুর বরকত থেকে মাহরুম হয়ে আছি। ছেলে মিসর থেকে জামা পাঠিয়েছেন। বাবা সেটার ছোঁয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। মাঝেমধ্যে মনে হয়, ইশ, আমারও যদি এমন একটা 'কামিসে ইউসুফি' থাকত। যার ছোঁয়ায় আমার হারানো শুদ্ধতা ফিরে পেতাম। কলবের সালামত (চিত্তের শুদ্ধতা) ফিরে পেতাম।

আক্ষেপটা ভেতরে ভেতরে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। গভীর রাতে, ঘুমের ঘোরে মনে হলো, আমার কাছেও তো একটা 'কামিসে ইউসুফি' আছে। আমার 'কামিস' ইউসুফের কামিসের চেয়েও অসংখ্যগুণ বেশি শক্তিশালী। আমার কাছে আছে 'কামিসে মুহাম্মদি'-আলকুরআন। কামিসে ইউসুফি যদি ইউসুফ আ.-এর মুজিযা হয়, আমার কুরআন তো মুহাম্মাদ সা.-এর মুজিযা।

এত শক্তিশালী 'কামিস' থাকতে কি না আমি আক্ষেপ করে মরছি। আমার কুরআনই আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরকারী 'কামিস'। এর ছোঁয়ায় আমিও হয়ে উঠতে ইসহাকপুত্রের মতো (فَارْتَدَّ بَصِيرًا) দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

আলহামদুলিল্লাহ

সূরা কাহফের মূল বার্তা কী?

সূরার শুরুর শব্দটাই হতে পারে মূল বার্তা।

কুরআন বলছে, প্রথম শব্দটাকেই জীবনের মূল বার্তা বানিয়ে নাও,

১. দ্বীন নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার কষ্টে দেশ-দশ ছেড়ে সংকীর্ণ গুহায় আশ্রয় নিতে হলেও 'আলহামদুলিল্লাহ'।

২. যুলকারনাইনের মতো পূর্ব-পশ্চিমের বাদশাহ বনে গেলেও 'আলহামদুলিল্লাহ'।

৩. বাগান মালিকের মতো অহংকারী বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে থেকে অপমানজনক কথাবার্তা সইতে হলেও 'আলহামদুলিল্লাহ'।

৪. খিজিরের মতো মহান বিনয়ী নেককারের সঙ্গ পেলেও 'আলহামদুলিল্লাহ'।

সর্বাবস্থায় 'আলহামদুলিল্লাহ'।

দ্বীন বিক্রি

বনী ইসরাঈলের আলিমগণ অল্পমূল্যে দ্বীন বিক্রি করে দিয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কিছু মানুষ কোনও মূল্য ছাড়াই দ্বীন বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রতি যুগেই কিছু লোক থাকে, যারা অল্পমূল্যে, নামমাত্র মূল্যে বা কোনও মূল্য ছাড়াই দ্বীন বিক্রি করে দেয়। এই বিক্রেতাদের জানা নেই, আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। এসব ব্যবসায়ীরা আসলে তাদের নিজস্ব দ্বীন বিক্রি করে। আল্লাহর দ্বীন নয়। এদের দ্বীনব্যবসায় আল্লাহর দ্বীনের কোনও ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হতে পারে না।

মিলন

ইয়াকুব আ. যখন দূর থেকে হারানো সন্তানের ঘ্রাণ পেলেন, কেমন আনন্দ অনুভব করেছিলেন? ইউসুফ যখন ছোটভাই বিন ইয়ামিনকে পেলেন, তার কেমন আনন্দ হয়েছিল? পরে বাবা-মা উভয়কে মিসরে পেয়ে, ইউসুফ আ.-এর কেমন আনন্দ হয়েছিল? হঠাৎ এই নবী-পরিবারের তিন আনন্দদৃশ্যের কথা মাথায় এল। কুরআন কারিমে আর কোথাও এমন পারিবারিক মিলনের কথা নেই। একই পরিবারে তিন তিনবার মিলনদৃশ্য। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন অবশ্যই আনন্দের।

মারইয়াম

সূরার নাম 'মারইয়াম'। কিন্তু আলোচনা শুরু হয়েছে যাকারিয়া ও ইয়াহয়া আ.-এর কথা দিয়ে। তালিবে ইলমের মনে খটকা।

হুজুর, এমন কেন হলো? শুরু থেকেই 'মারইয়ামের' আলোচনা কেন করা হলো না?

যাকারিয়া আ. ছিলেন মারইয়ামের খালু। ইয়াহয়া খালাতো ভাই। বাইরের কারো আলোচনা করা হয় নি। আর যাকারিয়া ছিলেন অতি বৃদ্ধ, স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। এমতাবস্থায় সন্তানের আশা ছিল না। সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সন্তান দিয়েছেন আল্লাহ। এটা ছিল ভূমিকা। বৃদ্ধ-বন্ধ্যার সংসারে সন্তান দিয়ে স্বামীহীন কুমারী মাতার গর্ভে সন্তান দেওয়ার বিষয়টা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

চারপাশ

আল্লাহ তাআলা আমাকে কখনো মাছি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কখনো পিঁপড়া দিয়ে। কখনো মৌমাছি দিয়ে। কখনো উট নিয়ে। কখনো গরু দিয়ে। কখনো মাছ দিয়ে। আরও বহু কিছু দিয়ে আমাকে বুঝিয়েছেন। আমি কি এসব কুরআনি প্রাণী নিয়ে ভাবি? সামনে কোনও প্রাণী পড়লে তাকে নিয়ে আমার মনে কোনও ভাবনা জাগে? প্রাণীটাকে আমি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি হিশেবে গ্রহণ করে

আল্লাহর কুদরতি শক্তি বোঝার চেষ্টা করি? সামনে দিয়ে একটা পিঁপড়া হেঁটে গেলে কুরআনের কথা মনে পড়ে? সামনে কুকুর পড়লে আসহাবে কাহাফের কুকুরের কথা মনে পড়ে? সামনে গরু দেখলে, বনী ইসরাঈলের ঘটনার কথা মনে পড়ে?

আস্তে আস্তে মনকে কুরআনমুখী করার সহজ পদ্ধতি হলো, সামনে কোনও প্রাণী এলে, সেটা নিয়ে ভাবনায় ডুবে যাওয়া। নিজেকে প্রশ্ন করা, কুরআন কারিমে এই প্রাণীর কথা আছে? না থাকলে এর মতো কোন প্রাণীর কথা আছে? আল্লাহ তাআলা সে প্রাণী দিয়ে আমাকে কী শেখাতে চেয়েছেন?

আকিদার গুনাহ

ক. আল্লাহ তাআলা আদমকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। বাবা আদম আ. শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেছিলেন।

খ. আল্লাহ তাআলা শয়তানকে সিজদা করতে বলেছিলেন। শয়তান জেনেশুনে আদমের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে অস্বীকার করেছিল।

গ. আদমের ভুলের কারণ ছিল, চিন্তার সাময়িক 'বিস্মৃতি'। ভুলটা সচেতন প্রয়াস থেকে সংঘটিত হয় নি। পক্ষান্তরে শয়তানের ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল। শয়তান আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল সচেতন অহংকার আর হিংসাবশত।

ঘ. আদম আ. আল্লাহর দেওয়া 'পরিণতি' ভোগ করার পর, তাওবার মাধ্যমে পুনরায় জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু শয়তানের তাওবা নসিব হবে না। আদমের ভুল সংঘটিত হয়েছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। শয়তানের ভুল সংঘটিত হয়েছিল 'কলব' বা হৃদয়ের মাধ্যমে।

ঙ. আদমের ভুলটা সাময়িক ভ্রমের কারণে হয়েছে। শয়তানের ভুলটা সাময়িক ছিল না। সে ভুল করেছিল আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহের চেয়ে আকিদার গুনাহ বেশি মারাত্মক। তাওবা নসিব না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কুরআনি শিশু

মায়ের অভ্যেস হলো, অবসরে, রাতে ঘুমুনোর আগে, সন্তানদের কুরআনি গল্প বলা। একদিন মা রান্নাঘরে কিছু একটা করছিলেন। পড়ার ঘরে দুই ভাই-বোনও বসে বসে লিখছে। ভাই-বোনে ঝগড়া লেগে গেল। ভাই বড় হওয়াতে গায়ের জোরেই জিততে চায়। আজ বোধ হয় ভাই জিততে পারে নি। মা শুনলেন, ছোট্ট মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে,

ভাইয়া তুমি আমাকে মেরেছ, আমি আম্মুর কাছে বিচার দেব না। ইউসুফ আ. যেমন তার ভাইদের মাফ করে দিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম। আদরের মেয়ের কথা শুনে মায়ের মনটা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল। দুদিন আগেই দুই ভাই-বোনকে ইউসুফ আ.-এর ঘটনা বলেছেন।

ইবতিলা

নবীগণ ও দ্বীনের খাদিমগণকে আল্লাহ তাআলাই ইবতিলা (পরীক্ষা)-এর সম্মুখীন করেন। আবার আল্লাহই ইবতিলা থেকে উদ্ধার করেন। ইউসুফ আ.-কে জেলে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষায় ফেললেন। আবার কীভাবে উদ্ধার করলেন? আকাশ থেকে ফিরিশতা পাঠিয়ে? জি না। বজ্রপাত দিয়ে কয়েদখানার তালা ভেঙে? জি না। স্বীয় কুদরতে জেলের দেওয়াল ভেঙে? জি না। এসব কিছুরই প্রয়োজন হয় নি। আল্লাহ কী করলেন? আঁধার রাতে বাদশাকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়ে অস্থির করে দিলেন। স্বপ্নই হয়ে গেল ইউসুফ আ.-এর 'পোরোলে মুক্তির' অব্যর্থ আজ্ঞা।

আমি দ্বীনের পথে কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনের মুখে পড়লে, জেল-জুলুম সইতে হলে, সমালোচনার বিষাক্ত তিরে বিক্ষত হতে হলে, পিছপা হব না। আমি বিশ্বাস করি, এসব একসময় থাকবে না। রাব্বে কারিমই এসব দূর করে দেবেন। সুতরাং শুধু শুধু কেন বিচলিত হব? কেন ভেঙে পড়ব? কেন কাজ থামিয়ে সমালোচকদের জবাব দিতে যাব? আমার কাছে আমার কাজ বড় না সমালোচকদের জবাব দেওয়া বড়? দ্বীনি কাজের চেয়ে দুর্জনের মুখ বন্ধ করা বড় হয়ে যাবে কেন আমার কাছে? একদম নয়।

পরীক্ষা

নবীজি সা.-কে তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। নবীজির গায়ে হাত তোলা হয়েছে। নবীজিকে গালি দেওয়া হয়েছে। ইউসুফ আ.-কে কূপে ফেলা হয়েছে। দাস হিশেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত করা হয়েছে। কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এসব কি নবীগণের পরাজয়? জি না। এটা 'ইবতিলা'। আল্লাহর যাচাইমূলক পরীক্ষা। ঠিক যেমন বড় কোনও দায়িত্বে পদায়ন করার আগে বিভিন্ন এসাইনমেন্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, নবীগণের 'ইবতিলাও' এমন। প্রতিটি ঘরেরই দরজা থাকে। প্রতিটি দরজার দোরগড়া থাকে। ইবতিলা হলো 'নুসরত' বা চূড়ান্ত বিজয়ের দোরগোড়া।

অনুসারী

অনুসারীর সংখ্যা দিয়ে হক ও বাতিল নির্ণয় করা ভুল। নুহ আ. ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। গুটিকিছু মানুষ ঈমান এনেছিল। মুহাম্মাদ সা. মাত্র ২৩ বছর

দাওয়াত দিয়েছেন, আরবের বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর অনুসারীতে পরিণত হয়েছিল।

নাপাক শিরক

সমস্ত নবী মুশরিককে পরিষ্কার ভাষায় মুশরিক বলে গেছেন। সমস্ত নবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফিরকে কাফির ঘোষণা দিয়ে গেছেন। কুরআন কারিমে মুশরিককে নাজিস বা অপবিত্র বলা হয়েছে। এজন্য মসজিদে হারামের কাছে আসাও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কাফিরের সাথে প্রয়োজনে সামাজিক সহাবস্থান হতে পারে। তবে তার কুফরকে সমর্থন করা মুমিনের ঈমান-আকিদার জন্যে বিপজ্জনক।

মুনাফিক

নবীজি সা. যখন বহিঃশত্রু দমনে ব্যস্ত থাকতেন, তখন মদীনার ভেতরে অবস্থানকারী মুনাফিকরা দুটি কাজে মশগুল থাকত,

ক. ছোটখাটো বিভিন্ন বিষয়ে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করত। যাতে বহিঃশত্রু মোকাবিলায় মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে।

খ. মদীনার মুসলিম নারীদের প্রতি 'লোভাতুর' দৃষ্টিতে তাকানোর পাঁয়তারা করত।

নবীজির তিলাওয়াত

কিছু কিছু কারী সাহেবের কেরাত শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগে। বারবার শোনা হয় তাদের কেরাত। যারা নিয়মিত কুরআন কারিম তিলাওয়াত করেন, তিলাওয়াত শোনেন, তাদের সবারই প্রিয় কারী থাকেন। ঠিক যেমন সুর রসিকের থাকে 'প্রিয় গায়ক'।

উঠতে বসতে অন্য অনেকের কেরাত শোনা হলেও ঘুরে ফিরে প্রিয় কারীর কেরাতই বেশি শোনা হয়। কৃত্রিমতামুক্ত, বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ, গভীর অভিনিবেশ, নিমগ্ন অনুধাবন (তাদাব্বুর), পরম আন্তরিকতা দিয়ে, বিনয়-বিগলিত চিত্তে, ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে কেউ তিলাওয়াত করলে, সবারই ভালো লাগতে বাধ্য। আয়াতের অর্থের পরিবর্তন যদি গলার স্বরে ও সুরে ফুটে ওঠে, তাহলে সে তিলাওয়াত হয়ে ওঠে জান্নাতি।

হঠাৎ চিন্তায় এল, আমাদের যুগের পছন্দের কারী সাহেবগণের কেরাত শুনতে আমাদের এত ভালো লাগে। তাদের কেরাত আমরা এত আগ্রহ, মহব্বত আর মনোযোগ দিয়ে শুনি। তাদের কেরাত শুনে আমরা এতটা প্রভাবিত হই। তাদের কেরাত আমাদের এত অপ্লুত করে তোলে,

তাহলে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা কেমন ছিল? তারা সরাসরি, কোনও আড়াল ছাড়াই সদ্য নাজিল হওয়া তরতাজা টাটকা আনকোড়া কুরআন নবীজি সা.-এর

পবিত্র মুখে শুনতেন। কুরআন কারিম সব সময়ই 'তরতাজা'। তারপরও একটু আগে নাজিল হওয়া কুরআন শোনার নিশ্চয় অন্যরকম মাহাত্ম্য থাকবে।

সাহাবায়ে কেরামের মনের অবস্থা কেমন হতো? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মুখে, সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সবচেয়ে সেরা কিতাবের তিলাওয়াত শুনতে শুনতে তারা কোন লোকে হারাতেন?

যিনি সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝেছেন, সবচেয়ে বেশি সুন্দর তিলাওয়াত করেছেন, সবচেয়ে বেশি কুরআনের বিধি-বিধান মেনেছেন, তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পারার সৌভাগ্য সাহাবায়ে কেরামকে কেমন আবেগপ্রবণ করে তুলত?

নবীজির কেরাত শুনে শুধু কি সাহাবিগণ আপ্লুত হতেন? কাফিররাও নবীজির কেরাত শুনে বেসামাল হয়ে পড়ত। জুবাইর বিন মুতইম কাফির থাকাবস্থায় মদীনায় আসার পর নবীজি সা.-এর কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে, তা কী অবস্থা হয়েছিল, সেটা তো সবারই জানা।

রাব্বাহ! দয়া করে জান্নাতে নবীজির মধুসঙ্গ দান করুন। নবীজির মধুক্ষরা কণ্ঠে তিলাওয়াত শোনার তাওফিক দান করুন।

সুযোগসন্ধানী

মুনাফিকরা সব সময় ওত পেতে বসে থাকত। কখন মুসলমানদের একটা ভুল পাওয়া যাবে। একটু সুযোগ পেলেই তারা মদীনার বাজার সরগরম করে তুলত। সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিত। তাদের সমালোচনা মুসলমানদের সংশোধনের জন্যে হতো না; হতো ঘৃণা থেকে। মুনাফিকরা সমালোচনা করত মুমিনকে অপদস্থ করার জন্যে।

'ইফকের' ঘটনায় মুনাফিকরা মহাসুযোগ পেয়ে গেল। আম্মাজান আয়েশা রা.-এর চরিত্রে কালিমা লেপনে যা যা করা দরকার, সবই করেছিল। ব্যভিচারের জঘন্য অপবাদ দিয়েছিল। ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা বা বেগানা নারীপুরুষের নির্জনে একাকী মিলিত হওয়ার প্রতি ঘৃণা থেকে তারা এই সমালোচনায় মাতে নি। নবীজি সা.-কে ছোট করার জন্যেই তারা সোৎসাহে কুৎসা রটনায় উঠেপড়ে লেগেছিল। ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশের কারণেই তারা আম্মাজানের পবিত্র চরিত্রহননে আদাপানি খেয়ে নেমেছিল।

চূড়ান্ত বিজয়

মদীনায় ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে বেশ সময় লেগে গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল মুনাফিকরা। তারা সংখ্যায় কম হলেও ইয়াহুদিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বর্তমানে ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়

আসতে বেশি সময় লাগছে। কারণ, এখন ইয়াহুদিদের তুলনায় মুনাফিক-স্বভাব মানুষের সংখ্যা বেশি।

তাওহিদ

মক্কায় নবীজি সা. তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা তাওহিদের বাণীকে পশ্চাৎপদতা বলেছিল। বাতিল প্রাচীন আচল মতবাদ বলেছিল। 'পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকাহিনি' (أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ)। মুশরিকরা বলেছিল, মুহাম্মাদের মৃত্যুর সাথে সাথে তার 'তাওহিদের দাওয়াতেরও' মৃত্যু ঘটবে। কারণ, মুহাম্মাদ নিঃসন্তান (ٱلْأَبْتَرُ)। এখনো কেউ কেউ ধর্মীয় আইনকে মধ্যযুগীয়, পশ্চাৎপদতা বলে নাক সিঁটকায়। মক্কার মুশরিকদের ধর্ম আজ কোথায়? কোথায় মক্কার সেই মুশরিকরা? কিন্তু তাওহিদ আজও আছে। মুহাম্মাদের স্মরণও দিনদিন বেড়ে চলেছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কুরআনের বক্তব্য

কুরআন কারিম আল্লাহর কালাম। এই কিতাবের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তবে কুরআন কারিম বুঝে পড়ার সময় একটি বিষয় লক্ষ রাখা জরুরি। কুরআন কারিমে উল্লিখিত প্রতিটি কথাই স্বয়ং আল্লাহর নয়; কুরআন কারিমে নবীগণের কথা আছে। কাফিরদের কথা আছে। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের কথাও আছে। আল্লাহ তাআলা এসব কথাকে 'উদ্ধৃতি' হিশেবে কুরআন কারিমে বর্ণনা করেছেন, যেমন সুদ সম্পর্কে মুশরিকদের বিখ্যাত উক্তি,

إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا

'ব্যবসা তো সুদেরই মতো' (বাকারা ২৭৫)।

এর জবাবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

সূরা ইউসুফে নারী সম্পর্কিত বিখ্যাত একটি বাক্য হলো,

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

বস্তুত তোমাদের ছলনা বড়ই কঠিন (২৮)।

এটা আল্লাহর নিজের উক্তি নয়, আজিজে মিসরের উক্তি। তিনি নারীদের জেরা করার সময় এই উক্তি করেছেন। বক্তব্য যারই হোক, আল্লাহ তাআলার হোক বা অন্য কারো হোক, সবই কুরআনের অংশ।

তাহাজ্জুদ

নবীজি সা.-কে বলা হয়েছিল, তাহাজ্জুদ আপনার জন্যে (نَافِلَةً لَّكَ) নফলস্বরূপ। ওলামায়ে কেরাম বলেন, নফল সালাত ও আমল হলো ফরজ সালাত ও আমলের 'সীমানাপ্রাচীর'। আমার সীমানা প্রাচীর দুর্বল হলে শয়তান চৌহদ্দীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। তাই আমার কর্তব্য বেশি বেশি নফল সালাত-আমল করে, নিজের সীমানাপ্রাচীর মজবুত রাখা।

আলো-আঁধারী

ক. দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে, দাঁড়ানোর পর দেখা যায়, পায়ে ঝিমঝিম ধরে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হয়। ধাতস্থ হতে সময় লাগে। রক্ত চলাচল বন্ধ থাকার কারণে এমনটা হয়। পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল শক্ত করে চিপে ধরলে রক্ত চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে।

খ. দীর্ঘসময় অন্ধকারে থাকলে, হঠাৎ করে আলোতে এলে, চোখ মিটমিট করে। সয়ে নিতে সময় লাগে। প্রথম প্রথম চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হয়। কিছুক্ষণ পিটপিট করার পর দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

গ. দীর্ঘদিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জীবনযাপন করলে ইজ্জত-সম্মানের জীবনে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। বনী ইসরাঈল শত শত বছর দাসত্বের জীবন কাটানোর পর ইজ্জতের জীবন গ্রহণ করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ইজ্জতের জীবন লাভের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করা দরকার, ভয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ঘ. আমি দীর্ঘদিন গুনাহে লিপ্ত থাকলে, বা কুফরে লিপ্ত থাকলে, কুরআনের আলো গ্রহণ করতে কষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। তারপরও জোর প্রচেষ্টায় কুরআনি নূরের কাছে চলে আসা আবশ্যক।

প্রজন্ম

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলা অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর নাফরমানি করেছে। তাদের বক্রতার শাস্তি হিশেবে তারা ৪০ বছর সিনাই মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। ৪০ বছর পর, তাদের সেই দুষ্ট প্রজন্ম মারা যাওয়ার পর, সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রজন্ম জন্ম নিয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছিলেন। বর্তমানেও বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোতে এমন কিছু হচ্ছে কি না, আল্লাহই ভালো জানেন।

বক্রতা

বনী ইসরাঈলকে হুকুম করা হয়েছিল গাবি জবেহ করতে। তারা তাদের স্বভাবজাত বক্রতার কারণে প্রশ্ন করা শুরু করল, কেমন সেই গাভী, কী তার রঙ ইত্যাদি। ফলে অতি সহজ কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল তাদের জন্যে। বনী ইসরাঈলের স্বভাবের লোক আমাদের মুসলিম সমাজেও বিরল নয়।

ঈমানি অবস্থান

কোনও হকদল যখন কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক পর্যায়ে বিজয় দান করেন। তারপর আবার পরীক্ষায় ফেলেন। এই পরীক্ষার মেয়াদ কখনো দীর্ঘ হয়, কখনো হ্রস্ব হয়। পরীক্ষার সময় সবর করতে হয়। পরীক্ষাটা মূলত হয় সবরের। তালূতের বাহিনীকে নদীর পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু অল্পকিছু ছাড়া, বেশিরভাগই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পানি পান করেছিল। শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে তালূতের বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে হকপন্থি অধিকাংশ দলের অবস্থাও এমন। তাদের জন্যে হারাম ছিল কুফর-শয়তানের সাথে জোটবদ্ধ না হওয়া। তাদের কর্তব্য ছিল আপসের পানি পান না করা। কিন্তু তারা এই নিষেধাজ্ঞা মানে নি। ফলে কী হলো, এখন বেশিরভাগই হয় ঈমানবিরোধী দলে যোগ দিয়েছে, নয় অন্য কোনও কুফরবান্ধব দলের অধীনে আছে।

কুরআন ও কুদস

সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে, মসজিদে আকসার আলোচনা দিয়ে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস জয় সম্পর্কে আলোচনা আছে। কুরআন (القرآن) শব্দটি পুরো কুরআনে সর্বমোট ৬৮ বার এসেছে। তার মধ্যে এগারোবার এসেছে সূরা বনী ইসরাঈলে।

এ থেকে কেউ কেউ বলেন, কুদস জয় করতে হলে এই উম্মাহকে আগে কুরআন কারিমকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। নিজেদের হতে হবে কুরআনি প্রজন্ম। তবেই কুদস জয় করা সম্ভব হবে।

জাহিলিয়্যাহ

১. জাহিলিয়্যাত মানে? ওহির বিপরীত অবস্থান। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত অবস্থান। নবীজি সা.-এর আগের যুগকে কুরআন কারিম 'জাহিলিয়্যাহ' বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরাইশ তাদের জাহিলিয়্যাতের কারণে নবীজির বিরোধিতা করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল তাদের বাপ-দাদা। তারা বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় নি।

২. বর্তমানের জাহিলিয়্যাত সে যুগের জাহিলিয়্যাত থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ? আগের জাহিলিয়্যাহ বাপ-দাদাকে অনুসরণ করত। এখনকার জাহিলিয়্যাহ জন্মশত্রু কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ করে।

পরীক্ষা

আমি যে দুনিয়ার পেছনে ছুটছি, সে দুনিয়ায় পিতা আদম আ.-কে শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় পাস করে আবার জান্নাতে গিয়েছিলেন। আমিও পরীক্ষার্থী। তা কেমন চলছে পরীক্ষা?

গণভোট

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে 'অধিকাংশে'র মতামত দ্বারা যদি সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করাটা যথার্থ পদ্ধতি হতো, তাহলে অধিকাংশ নবীই 'মিথ্যা' প্রমাণিত হতেন। কওমের ভোটে লূত আ. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। ফেরআউন ও তার কওমের ভোটে মুসা আ. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। আবু জাহল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ভোটে মুহাম্মাদ সা. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। ইবরাহিম, শু'আইব, হুদ, সালেহ, হারুনসহ প্রায় সব নবীরই একই অবস্থা হতো।

অধিকাংশের মতামত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সেটা যদি 'ওহির' বিরুদ্ধে যায়, সে মতামতের সাথে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ভোট থাকলেও সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুধু নবীগণ কেন, প্রথম খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটার দিকে তাকালেও বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক যুক্তি ও পর্যালোচনা যেদিকে যাচ্ছিল, তার লাগাম ছেড়ে দিলে আবু বকর রা. খলিফা হতে পারতেন কি না সন্দেহ। কারণ, মদীনায় আনসারের সংখ্যাই বেশি ছিল। কিন্তু আবু বকর রা. অধিকাংশের মতামতের বিপরীতে ওহি নিয়ে এসেছিলেন। নবীজির হাদিস পেশ করে বলেছিলেন, 'খলিফা' নির্বাচিত হতে হবে কুরাইশ থেকে'। ব্যস, আনসারগণ আর কোনও কথা বাড়ালেন না। ওহির সামনে মাথা পেতে দিলেন। বর্তমানেও তা-ই। অধিকাংশের মতামত হকের বিরুদ্ধে গেলে গ্রহণযোগ্য হবে না। খলিফা হলেও কুরাইশ থেকেই হওয়া উচিত। সাধারণ শাসক, অন্য বংশ থেকে হতে পারে।

হিতাকাঙ্ক্ষী

রক্তসম্পর্কের আত্মীয় হলেই হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায় না। পোশাকাশাকে মিল হলেই সমমনা হয়ে যায় না। সুরত-সিরাত এক হলেই আপনা হয়ে যায় ন। রক্তের সম্পর্কের ভাইয়েরাও বলেছিল, ইউসুফকে হত্যা করে ফেল (اقْتُلُوا يُوسُفَ)। বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে বলেছে, তাকে অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস (اطْرَحُوهُ أَرْضًا)। অথচ কোথাকার কোন মন্ত্রী, যার সাথে জীবনে দেখা হয়নি, কথা হয় নি; সে

তিনিই বড় আপনের মতো দরদি হয়ে নিজের স্ত্রীকে বললেন, ইউসুফকে সম্মানজনকভাবে রাখবে (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ)। মানুষের সামনে যখন স্বার্থ চলে আসে, আপন ভাই হলেও ছাড় দেয় না। মাথায় বাড়ি দিয়ে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপে না।

ধ্বংসের হাতছানি

সমুদ্রের বুকচেরা রাস্তা দেখে ফেরআউন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, এই অযাচিত পথ বেয়ে অসহায় মজলুম বনী ইসরাঈলকে পাকড়াও করতে পারবে। ওই ব্যাটা বুঝতে পারে নি, তাকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর তাআলার একটা চিরন্তন নীতি হলো, তিনি জালিমের সামনে ধ্বংসের পথকে মুক্তির পথের মতো করে দেখান। জালিমও নিশ্চিন্ত মনে আগে পা বাড়ায়। এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে।

বিয়ের বাসনা

মারইয়ামের মতো পূতপবিত্র কুমারি বিয়ে করার ইচ্ছে?

তাহলে ইউসুফের মতো সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে যে।

আদর্শ

আয়েশার মতো হতে চাই?

জি।

তাহলে দুষ্টলোকের মিথ্যা অপবাদের গঞ্জনা সইতে অভ্যস্ত হতে হবে।

সংযম

ইউসুফের মতো সৌন্দর্য চাই?

জি।

তাহলে নারীর লোভনীয় আহ্বানকে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হতে হবে।

সচেতনতা

সুলাইমানের মতো রাজত্ব চাই?

জি।

তাহলে আপনাকে রাজ্যে বাস করা পিঁপড়ার অনুভূতিও বুঝতে শিখতে হবে।

হিদায়াত

সবচেয়ে বড় কাফিরের ঘরনি হওয়ার পরও ঈমানের উপর অটল ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। সবচেয়ে বেশি সময় (৯৫০) ধরে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া

ব্যক্তির ঘরনি হয়েও কাফির থেকে গেছে নুহ আ.-এর স্ত্রী। হিদায়াত আল্লাহর বিশেষ দান। সব সময় আল্লাহর কাছে হিদায়াত তলব করে যাওয়া আবশ্যক। মুখস্থ বাকবাকুম না করে অন্তত একটু হলেও বুঝেশুনে সূরা ফাতিহার পঞ্চম আয়াতটা পড়তে পারি। সালাতে ও বাইরে।

জালিমের পরিণতি

কুরআন কারিম পড়তে বসলেই মুসা আ. ও ফিরআউনের ঘটনা সামনে আসে। প্রায়ই একটা বিষয় কিছুতেই মাথায় আসত না। ফেরআউন রাষ্ট্রপরিচালনায় এত বুদ্ধিমান ছিল, তার অত্যন্ত যোগ্য একদল মন্ত্রিপরিষদ ছিল, কিন্তু তারপরও তারা মুসার দেখাদেখি কীভাবে লোহিত সাগরে নেমে গেল? তাদের কারও মাথাতেই কেন এল না, সদ্য সাগরচিরে তৈরি হওয়া পথটা স্বাভাবিক পথ নয়? যে-কোনও মুহূর্তে পথটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে? সাগর আগের মতো দুপাশ থেকে মিলে যেতে পারে?

সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা দেখে, অপরিণামদর্শী শাসকদের হঠকারী কর্মকাণ্ড দেখে খটকা দূর হয়েছে। মজলুমের দুআ আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না। জালিমের জুলুম যখন সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে তখন আল্লাহ তাআলা জালিমের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়ে দেন। ফলে তারা উল্টাপাল্টা কাজ করতে শুরু করে। যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। জালিমের উল্টাপাল্টা আচরণ বোধ হয়, মজলুমের বদদুআরই ফল।

জীবনের স্বরূপ

পার্থিব জীবনের স্বরূপ কী?

ইউসুফের সৌন্দর্যের সাথে তার পিতার শোক আর ভাইদের গাদ্দারির সমন্বয়েই পার্থিব জীবন।

পাপের সহযোগী

লুত আ.-এর কওমকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিয়েছিলেন। তারা যে পাপের কারণে শাস্তি পেয়েছিল, হুবহু একই পাপ আজ সমাজে বিদ্যমান। তুরস্ক-তিউনিসিয়াতে রাষ্ট্রীয়ভাবেই বিদ্যমান। তিউনিসিয়াতে ইসলামি দল নাহদার মৌন সম্মতিতেই কুরআনবিরোধী অনেক আইন পাস হচ্ছে। তিউনিসিয়ার নারীবাদী ‘বুশরা বেলহাজ হামীদা’ যে প্রস্তাব তিউনিসিয়ান সংসদে পেশ করতে যাচ্ছে, সেটা পাস হলে দুনিয়াতে ‘নীতি-নৈতিকতা’ বলতে যে কিছু আছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। আগের কওমসমূহের মতো যদি আল্লাহ তাআলা বর্তমান মুসলিম উম্মাহকে ধরতেন, তাহলে কত আগে আসমানি গজব এসে আমাদেরকে ধ্বংস করে

ফেলত। আমাদের অবস্থা আগের কওমের চেয়েও খারাপ বিভিন্ন কারণে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে,

পূর্বেকার কওমের আলিমরা সব সময় নবীগণের সাথেই থাকতেন। নবীগণ না থাকলে তারা নবীগণের দায়িত্ব পালন করতেন। জাতির পাপকে অনুমোদন করতেন না। জাতির পাপের সামনে চুপ থাকতেন না।

কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ উল্টো। কিছুসংখ্যক হলেও 'জানাশোনা' মানুষ, হয় পাপকে দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা পাপী শাসকের সাথে 'হিকমতবশত' বাহ্যিক সদ্ভাব বজায় রাখছেন। তাদের যুক্তি হলো,

বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে এমনটা করছি। শাসকের পাপকে মেনে নিচ্ছি না, আপাতত চুপ থাকছি।

শাসকের প্রশংসা করেন যে?

শাসক ভালো কাজ করলে, সেটার প্রশংসা করে, তাদেরকে ভালো কাজের প্রেরণা জোগাচ্ছি। এভাবে প্রশংসা করার মাধ্যমে আস্তে আস্তে শাসকের ভালো কাজের পরিমাণ বাড়বে। মন্দ কাজের পরিমাণ কমে আসবে।

যে শাসকের প্রশংসা করছেন, তার শাসনামলে তো এমন পাপকাজের বৈধতাও দেওয়া হয়েছে, যে পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা পূর্বে গোটা একটা জাতিকে ধসিয়ে দিয়েছেন? আপনি প্রকারান্তরে শাসকের শরিয়াহবিরোধী 'কর্মকাণ্ডের' সাথেও থাকছেন না?

শাসক এসব আইন বড় বড় শক্তির চাপে অনুমোদন দিতে বাধ্য হন। তিনি ভেতরে ভেতরে এসব চান না। আমরাও চাই না।

ভেতরে ভেতরে না চাইলেও, আল্লাহর আজাব আনয়নকারী এমন পাপ অনুমোদনকারীর সাথে আছেন; সরাসরি না হলেও অন্তত প্রশংসা করে। এটাও কম বিপজ্জনক নয়।

আমরা কী করতে পারি? হককথা বলতে না পারেন তাহলে অন্তত বাতিলের প্রশংসা করা থেকে চুপ থাকুন।

তথ্যবিকৃতি

ফেরআউনের কুফরি, ঔদ্ধত্য আর ভ্রষ্টতার কথা যদি কুরআন কারিমে সুস্পষ্টভাবে না থাকত আজ একদল লোক তাকেও 'শহীদ' বানিয়ে ছেড়ে দিত। ফলাও করে প্রচার করতো,

সন্ত্রাসীদেরকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনি ডুবে মরে শহীদ হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ।

ঈমান ও কুফর

পুরো কুরআন কারিমে ঈমান ও কুফরের মাঝে চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথা অসংখ্যবার এসেছে। কিন্তু কোথাও 'মধ্যপন্থা' বা দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়াধর্মী কোনও সমাধানের কথা বলা হয় নি। ঈমান ও কুফরের যুদ্ধের শুধু দুটি রূপই দেখতে পাই,

ক. বদরের দিনের মতো। সম্মুখ সমরে কুফরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়া।

খ. আসহাবুল উখদুদের মতো হকের উপর টিকে থেকে আগুনে পুড়ে মরাকে প্রাধান্য দেওয়া।

স্থায়ী কুরআন

মক্কার মুশরিকরা জাদুকর ও গণককে বেশ গুরুত্ব দিত। নবীজি সা. কুরআন নিয়ে এলেন। কুরআনের বক্তব্য মুশরিকদের মনোপূত হলো না। তারা অভ্যেসবশত নবীজিকে জাদুকর হওয়ার অপবাদ দিল। গণক বলে আখ্যায়িত করল। বর্তমানেও প্রায় একই ঘটনা। মানুষ আজ ফিল্ম আর সিরিয়াল নাটকে অভ্যস্ত। আহলে হকের কোনও ঘটনার চিত্র দেখলে, আহলে হকের কোনও মেহনতের কথা শুনলে, তারা চট করে বলে বসে, এসব বানানো 'নাটক'। তারা তাদের সুখময় নিরপদ্রব জীবনের কোল ঘেঁষে থেকে কল্পনাও করতে পারে না, তাদের মতোই একদল 'আবাবীল', জাঁদরেল জাঁদরেল হস্তিকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারবে। কুরআন কারিম কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথম যুগে যেমন কুরআনবিরোধী মানুষ ছিল, এখনো আছে। এমনকি উভয় দলের ধরনও প্রায় এক।

মিলাদুন্নবী

মিলাদুন্নবী পালন করা কুরআনি মানহাজ। কুরআনি সুন্নাহ। কুরআন কারিমে কয়েকজন নবীর জন্মকে বেশ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. কুরআন কারিমে মুসা আ.-এর জন্মের বর্ণনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খ. ঈসা আ.-এর জন্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মায়ের প্রসব যন্ত্রণার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। মারইয়াম দূরে চলে গেছেন। সন্তান প্রসব করার জন্যে। খেজুর গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। দুঃখ না পেতে বললেন। আরও নানা কথা আছে কুরআনে। যাকারিয়া আ.ও ঈসার জন্ম উপলক্ষ্যে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন।

গ. ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মের কথা আলেচিত হয়েছে।

ঘ. তার আগে ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ নিয়ে খোদ ফিরিশতারা নেমে এসেছে। ইবরাহিম আ.ও তাদের আনন্দে যোগ দিয়েছেন।

ঙ. বিভিন্ন আয়াতে নবীগণের জন্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবের কিছু বেদাতি পেজে গত কয়েকদিন ধরে এমন লেখাগুলো পড়তে পড়তে অতিষ্ঠ হওয়ার জোগাড়। থাকতে না পেরে একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম,

আচ্ছা, তাহলে আপনি বলছেন, মিলাদুন্নবী পালন করা কুরআনি সুন্নাত।

জি।

আপনার কথানুযায়ী আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফিরিশতা ও নবীগণও অন্য নবীদের জন্মোৎসব পালন করে গেছেন।

জি। মানে আমাদের পালন না করলেও নবীগণের জন্মকে তারা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন।

কুরআনি সুন্নাহগুলো পালন করা কী?

কোনওটা ফরজ। কোনওটা নফল।

এটা পালন করার দায়িত্ব কাদের?

কেন মুসলমানের?

এই মুসলমানের মধ্যে আমাদের পেয়ারা নবীজিও পড়েন?

জি।

তাহলে একটা হাদিস দেখান, সহিহ না পেলে 'যয়ীফ' হলেও দেখান, নবীজি সা. অন্য কোনও নবীর জন্মদিবস পালন করেছেন।

অসংখ্য হাদিস আছে, নবীজি অন্য নবীগণের কথা, গল্প আমাদের বলে গেছেন।

তেমন গল্প আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। নবীগণের জন্ম নিয়ে বিশেষ কিছু করা হয়েছে, এমন হাদিস দেখান। অথবা সাহাবায়ে কেরামের 'আসার' দেখান।

আমাদের মতো করে তারা পালন করেন নি।

তাহলে কেন নিজের কাজের স্বপক্ষে নবীগণকে জড়ালেন? কুরআনকে জড়ালেন? এমনকি আল্লাহ তাআলা ও ফিরিশতাগনকে জড়ালেন? উঠতে উঠতে একেবারে আরশে উঠে গেলেন। আপনারা মিলাদ মাহফিলে চেয়ার খালি রাখেন নবীজি সা.-এর জন্যে। কদিন পর দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলার জন্যেও মঞ্চে খালি চেয়ার রাখা শুরু করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

নেকআমল

মুসা আ. ও কারুন। দুজন দুই বলয়ের প্রতিনিধি।

কারুন : বিপুল সম্পদের অধিকারী। ক্ষমতার অধিকারী।

মুসা : বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী। মূল্যবোধের অধিকারী।

কারুন চলে গেছে। তার সাথে গেছে তার ধন-সম্পদ। তার ক্ষমতা।

মুসা চলে গেছেন। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর আকিদা। তাঁর মূল্যবোধ।

দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হওয়ার কারণ নেই। কারো পদ দেখে বিস্মিত হওয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা নেই। এসব পদ-মদ চলে যাবে। থেকে যাবে (الصالحات)। নেকআমল।

আপডেট ভার্সন

মৌলিক হিদায়াত সব সময় একরকম। মৌলিক আকিদাও সব নবীর মাযহাবে (ধর্মে) এক। কিন্তু যুগের পালবদলে হিদায়াতের প্রকাশভঙ্গি ও প্রায়োগিক পদ্ধতিতে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য সবকিছুর যেমন আপডেট ভার্শন থাকে বিভিন্ন নবীর হিদায়াতের প্রকাশভঙ্গিরও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি থাকে। এক নবীর শরিয়তে একদিক প্রাধান্য পায়। একেক নবীর মুজিযাও একেক রকম।

কুরআন কারিম হলো হিদায়াতের সর্বশেষ আপডেট ভার্শন। আমরা টেকনোলজির সর্বশেষ আপডেট ভার্শনের সাথে পরিচিত না থাকলে পিছিয়ে পড়ি। যুদ্ধে পরাজিত হই। হিদায়াতের আপডেট ভার্শনের সাথেও পরিচিত না থাকলে আমরা ঈমানের ময়দানে পিছিয়ে পড়ব। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা হিদায়াতের আপডেট ভার্শনের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে নি, তারা আখিরাতের দৌড় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। ঈমান-কুফরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

সবকিছুরই একটা আপডেট ভার্শন থাকে। আপডেট ভার্শন মানে খোলনলচে বদলে ফেলা নয়। ভেতরের মূল কনফিগারেশন ঠিক থাকে, শুধু সুযোগ-সুবিধা বাড়ে। কুরআন কারিমও তেমনি। সালাফ যা বলে গেছেন, যা করে গেছেন, সেটাই এখনো বলবৎ। শুধু প্রকাশভঙ্গিতে একটু তারতম্য হয়েছে। প্রায়োগিক দিকটাতে ভিন্নতা এসেছে। আগে তরবারি ছিল এখন রাইফেল। কিন্তু অনেকেই এই তারতম্যের সাথে, রূপান্তরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আগের ভার্শনের সাথেই গোঁ ধরে বসে থাকে। ফলে পিছিয়ে পড়ে। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার মেহনতে অনেকেই শরিক থাকে। কিন্তু সময়ের পালবদলের সাথে সাথে বেশিরভাগ দলই কৌশল আপডেট করে নিতে পারে না। যারা আপডেট করে নিতে পারে, তাদেরকেও পুরোনো অনেকের সহ্য হয় না। কেউ কেউ আপডেট আর লেটেস্টের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। দুটোকে গুলিয়ে ফেলে। ইসলামের মৌলিক আকিদা ও শিক্ষার কোনও লেটেস্ট বা আপডেট ভার্শন নেই। প্রকাশভঙ্গির আপডেট ভার্শন থাকে।

কুরআনি বুঝ

মিসরের উদারপন্থি এক শায়খ খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, তাদের সাথে আমাদের অনেক বিষয়েই মিল। তাদের সাথে আমাদের সুন্দর সহাবস্থান করা আবশ্যক। 'ইরহাবিদের' কথায় কান দেওয়া যাবে না। তারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। ইরহাবিদের চেয়ে কপটিক খ্রিস্টানরা আমাদের বেশি কাছের। কপটিকরাও কুরআন মানে। তারা ইরহাবিদের চেয়ে বেশি কুরআন বোঝে।

এক বেয়াড়া ছাত্র প্রশ্ন করল,

শায়খ, কপটিকরা কুরআন থেকে যিশুর 'ঐশীত্ব' প্রমাণ করার চেষ্টা করে। পাদরিরা বলে, কুরআনেই 'যিশুর' ইলাহ হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে আছে। আমার প্রশ্ন হলো, কপটিকদের এই কুরআনি বুঝটা কি ঠিক আছে?

বেড়ে ওঠা

জীবন ও মানস বেড়ে ওঠাতে পার্থক্য আছে। জীবনের বেড়ে ওঠা দিন-সপ্তাহ-মাস বছর দিয়ে নির্ণয় হয়। মানসের বেড়ে ওঠা নির্ণয় হয় পড়াশোনা, সাহচর্য, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সাত দিন পার হলে আমার বয়েসের খাতায় এক সপ্তাহ বাড়ে। ভালো কোনও কিতাব, বড় কোনও ব্যক্তির সাহচর্য, গভীর কোনও অভিজ্ঞতা, এক দিনেই আমার মানস বয়েসকে এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারে।

কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর মানস বয়েসকে বাড়িয়ে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। দুনিয়াতে কুরআনের মতো শক্তিশালী আর কিছু নেই। আল্লাহর রাসুলের সঙ্গ-সাহচর্য, কুরআনের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। কারণ রাসুল ছিলেন দুই কুরআনের সমন্বয়,

ক. মূল কুরআন।
খ. কুরআনের ব্যবহারিক রূপ।

এখন রাসুল সা. নেই। একমাত্র কুরআনই আমাদেরকে রাসুলের অভাব মেটাতে পারে। রাসুল ছিলেন জীবন্ত কুরআন। তিনি তার বিকল্প হিশেবে দুটি বিষয় রেখে গেছেন,

ক. আল্লাহর কিতাব।
খ. রাসুলের সুন্নাহ।

আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ উভয়টাই ওহি। একটা সরাসরি ওহি, আরেকটা ঘুরিয়ে। আমি যতবেশি কুরআন তিলাওয়াত-তাদাব্বুর করব, আমার অগোচরেই আমার ঈমান ততবেশি বৃদ্ধি পাবে, আমার কলব ততবেশি আশ্বস্ত হবে, আমার

জীবন ততবেশি সুখের হবে, আমার রিজিকে ততবেশি বরকত আসবে, আমার চিন্তাভাবনা ততবেশি বিশুদ্ধ আর সত্যঘেঁষা হবে, আমার কথাবার্তা ততবেশি ভুলমুক্ত হবে, আমার উচ্চারণ ততবেশি অশ্লীল-অশোভন শব্দমুক্ত হবে, আমার কাজকর্মও ততবেশি অনর্থকতামুক্ত হবে। কারণ আমার কলব কুরআনের আলোয় আলোকিত। কুরআনের নূরে নূরান্বিত। কুরআনি নূর সব আঁধারকে দূর করে দেয়।

উৎকৃষ্ট প্রতিপালন

মুয়াজ্জিন সাহেবের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই অল্প। মাদরাসায় কয়েক জামাত পড়েছেন। জীবন ও জীবিকার তাগিদে আল্লাহর ঘরের খেদমতে লেগে গেছেন। সুন্দর করে আজান দিতে পারেন। শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারেন। ফাঁকে-ফুঁকে ভোরে সুমধুর সুরে মসজিদের মাইকে গজল গাইতে পারেন। মসজিদকে সব সময় ঝকঝকে তকতকে রাখতে পারেন।

ব্র্যাকস্কুল, কিন্ডারগার্টেনের তোড়ে সবাহী (প্রভাতী) নুরানি মক্তবগুলোর নাভিশ্বাস অবস্থা। মসজিদভিত্তিক নুরানি মক্তবগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বললেই চলে। এই মুয়াজ্জিন সাহেব সকালে না পারলেও নিজ উদ্যোগে বিকেলে মক্তব চালু করেছেন। তার শিক্ষাদান পদ্ধতিও বেশ চমৎকার। তার ছাত্ররা নিয়মিত মসজিদে এসে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করে।

একটি শিশু মক্তবে নিয়মিত আসে। মসজিদেও আসে। তবে খুবই দুষ্টুমি করে। জামাতের সময় ছোটাছুটি করে। বড়দের ভয়ে নিয়ত বেঁধে দাঁড়ালেও সারাক্ষণ ইতিউতি তাকায়। দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দাঁড়ায় না। মুয়াজ্জিন সাহেব শিশুটিকে কাছে ডাকলেন। প্রথমে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। কোমল গলায় বললেন,

'জানো খোকা, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে? তুমি কি জানো কেন তোমাকে আমার ভালো লাগে? কারণ আল্লাহ তাআলারও যে তোমাকে খুব ভালো লাগে।

'আচ্ছা তাই? আমাকে আল্লাহরও ভালো লাগে'?

'তুমি দেখছ না, তোমার বন্ধুরা সবাই মাঠে খেলছে, আজান শুনে মসজিদে আসে নি। খেলা বন্ধ করে নি। তাদের সাথে থেকেও আজান শুনে চলে এসেছ। আমি জোহরের পরে মক্তবে তোমাদেরকে কত করে বলে দিয়েছি, আসরের আজান হলেই মসজিদে চলে আসবে। কই, তারা আসে নি। এখন বল, তুমি আল্লাহর জন্যে প্রিয় খেলা ছেড়ে চলে এসেছ, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন না তো কাকে ভালোবাসবেন'?

শিশুটির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুয়াজ্জিন সাহেব এবার বললেন,

'তুমি কি চাও, আল্লাহ তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসেন'?

'জি, উস্তাদজি চাই।'

'কাল তোমাকে মসজিদগলির কাঠের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে?'

'জি, আছে উস্তাদজি।'

'আমরা যখন গিয়েছি ছুতার (কাঠমিস্ত্রি) তখন হাতুড়ি দিয়ে একটা চেয়ারের পায়ায় পেরেক ঠুকছিল। তুমি খেয়াল করেছ, মিস্ত্রি কী মনোযোগ দিয়েই না হাতুড়ি দিয়ে পেরেকে আঘাত করছিল। মিস্ত্রি গভীর শান্তদৃষ্টিতে একধ্যানে পেরেকের দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্য কোনও দিকে মনোযোগ ছিল না। তুমি বলো তো খোকা, মিস্ত্রি যদি হাতুড়ি মারার সময় অস্থির হয়ে অনদিকে চোখ ফেরাত তাহলে কী হতো?'

'মিস্ত্রির আরেক হাতের উপর হাতুড়ির আঘাত লাগত।'

'ঠিক ধরেছ। তুমি যে নামাজে এদিক-সেদিক তাকাও, অস্থির দৌড়াদৌড়ি করো, এতে কিন্তু তোমার নামাজ আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছুতার যেমন একদৃষ্টিতে শান্ত হয়ে পেরেকের দিকে তাকিয়ে থাকে, তুমিও যখন নামাজে দাঁড়াবে, একদৃষ্টিতে সিজদার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এদিক-সেদিক তাকাবে না। অস্থিরতা প্রকাশ করবে না। তাহলে আল্লাহর রহমত তোমার উপর এসে পড়বে।'

মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘটনা থেকে মনটা কুরআনে ডুব দিল,

১. আল্লাহ তাআলা মারইয়ামকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিপালন করলেন (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) আলে ইমরান ৩৭।

২. শিশুকে লালন-পালন করতে হবে উৎকৃষ্টতম পন্থায়। শিশুকে সালাত শিক্ষা দিতে হবে উৎকৃষ্টতম পন্থায়। হযরত লুকমানও সন্তানকে সালাতের আদেশ করেছেন।

৩. সন্তানকে দীক্ষাদানের ব্যাপারে কুরআন কারিম সব সময় আলোচনার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। পাশাপাশি পিতা-মাতা দুআ করে গেছেন। ইবরাহিম আ. ইসমাইলের সাথে কুরবানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনাসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪. ইবরাহিম আ. সালাতের ব্যাপারে সন্তান ও বংশধরদের জন্যে দুআ করেছেন। লুকমানও সন্তানের সাথে আলোচনার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। মুয়াজ্জিন সাহেবও তার শিষ্যকে সংশোধনের জন্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। 'ফেলো তক্তা মারো পেরেক' ভঙ্গি গ্রহণ করেন নি।

৫. সন্তানের ভুল সংশোধনে কুরআন বলে আলোচনা করতে। প্রথমেই মুগুর হাতে তেড়ে যেতে বলে নি। নুহ আ.ও জীবন-মৃত্যুর চরম সঙ্গীন মুহূর্তেও আলোচনার মাধ্যমে সন্তানকে নৌযানে উঠে আসতে বলেছিলেন।

৬. মুয়াজ্জিন সাহেব নবীওলা পদ্ধতিতেই শিষ্যকে সংশোধনে ব্রতী হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ইসমাইল আ.-এর আলোচনা খুব বেশি করেন নি। ইসমাইল আ.-এর গুরুত্বপূর্ণ দুটি গুণ তুলে ধরেছেন (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ)। তিনি নিজ পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত (মারইয়াম ৫৫)।

৭. আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের ব্যাপারে বলেছেন (وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) সে ছিল নিজ প্রতিপালকের কাছে সন্তোষভাজন।

৮. মুয়াজ্জিন সাহেব কি জানেন, তার চমৎকার ভঙ্গিটি নবীগণের কাজের সাথে মিলে গেছে? তিনিও আল্লাহর সন্তোষভাজনদের তালিকায় উঠে আসার প্রক্রিয়ায় আছেন?

৯. মুয়াজ্জিন সাহেব কি জানেন, তিনি শিশুটিকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে না দিয়ে, তার সাথে আলোচনার ভঙ্গি গ্রহণ করে, অপূর্ব কুরআনি চাদরে নিজেকে জড়িয়েছেন?

শিশুর খেলনা

১. কারুনের কাছে তার অঢেল সম্পদ, ঈমানের মতো মহামূল্যবান বস্তুর চেয়েও বেশি দামি ছিল। এর একটাই কারণ, ঈমান সম্পর্কে তার অজ্ঞতা বা জাহালত।

২. একটি শিশুর কাছে পাঁচ টাকা দামের একটা খেলনাও কারুনের ধনের চেয়েও বেশি দামি। এটাও তার শিশুসুলভ অজ্ঞতার কারণে হয়।

৩. দুনিয়া আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নগণ্য আর তুচ্ছ বস্তু। শিশু বা কারুনের মতো আমি অজ্ঞতাবশত দুনিয়াকে ঈমানের চেয়েও বেশি দামি মনে করে ফেলছি না তো?

উম্মাহর জাগরণ

সূরা কাহফ আমাদের বলে আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফকে তিনশ বছরের বেশি সময় ঘুম পাড়িয়ে বা মৃত রাখার পর পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ছিলেন। আছেন। থাকবেন। তিনি তিনশ বছর পর একদল যুবককে জীবিত করে তুলতে পারলে, এই উম্মাহর দীর্ঘঘুম ভাঙিয়ে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। তিনি এই ঘুমন্ত উম্মাহকে অবশ্যই আবার জাগিয়ে তুলবেন। আলহামদুলিল্লাহ, দিকে দিকে সেই জাগরণের আলামতও দেখা দিয়েছে।

অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ

অনেকেই আবেগ অনুভূতি প্রকাশে লজ্জাবোধ করে। উত্তম কথার অপরিসীম প্রভাব। ছোট্ট একটি বাক্য, অন্যের মনে গভীর রেখাপাত করে। অন্যের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি প্রশংসাবাক্য, দুজনের মধ্যে গড়ে তোলে মধুর সম্পর্ক। রাসুলুল্লাহ সা. এই চমৎকার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। তিনি মু'আজ বিন জাবালকে বলেছেন, (يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ) আল্লাহর কসম মু'আজ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। কুরআন বলে, রাসুলের মাঝেই আমাদের জন্যে রয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ'। উত্তম আদর্শ।

শুকরিয়ার ইবাদত

সুলাইমান আ.-এর দুআটা পড়ার সময় প্রতিবারই ভাবনার ফুরসত লাভের জন্যে একটু দম নিই; (أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফিক দান করুন, যেন শোকর আদায় করতে পারি (নামল ১৯)। আপনার শুকরিয়া আদায়ে করার জন্যে আমার প্রতি ইলহাম করুন। আমাকে তাওফিক দান করুন।

দুআটা পড়ে বোঝা যায়, শুকরিয়ার ইবাদত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম ও তাউফিকেই সম্ভবপর হয়। আল্লাহর সরাসরি সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষে শুকরিয়া আদায়ের মহতি ইবাদত করা সম্ভব হয় না। আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারছি, ধরে নিতে পারি, আমার সাথে আছে আল্লাহর ই'আনত-ইলহাম ও তাওফিক। ইয়া রাব্বাহ, আপনার জিকির-ফিকির ও শোকরের তাওফিক দান করুন।

যুহদ

ইউসুফ আ. রাজদণ্ড পেয়েও রাজকীয়তায় ডুবে যান নি। দুনিয়া আর রাজত্বের প্রতি তাঁর বিস্ময়কর নিরাসক্তি ছিল। যুহদ ছিল। দুনিয়ার সবকিছু তার নাগালে থাকা সত্ত্বেও তিনি সব সময় ছিলেন আল্লাহর প্রতি সমর্পিত,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্বেও অংশ দিয়েছেন এবং দান করেছেন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নেবেন, যখন আমি থাকি আপনার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ ১০১)।

প্রতিটি মুমিনেরই এই তামান্না হওয়া উচিত। (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নেবেন, যখন আমি থাকি আপনার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ ১০১)।

সহযোগিতা

সব সময় একা একা সব কাজ করা যায় না। নিকটজনের সাহায্য নিতে হয়। একজন নবীও আল্লাহর কাছে ভাইয়ের সাহায্য তলব করেছেন। আল্লাহ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি (কাসাস ৩৫)।

মাদয়ানের নেককার ব্যক্তির কন্যাদ্বয়ের বক্তব্য আচরণ চিন্তা যুক্তি মানসিকতা সবই উম্মাহর অনাগত কন্যাদের জন্যে এক অপূর্ব শিক্ষা। পুরো আয়াতখানা আগে পড়ে নিই,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

যখন মুসা মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছে। আরও দেখল তাদের পেছনে দুজন নারী, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মুসা তাদেরকে বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ (কাসাস ২৩)।

১. পশুগুলো ভীষণ পিপাসার্ত। সেগুলোকে জোর করে আগলে রাখতে হচ্ছে। পুরুষদের ভিড়ে কুয়ার কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

২. বাবা অতি বৃদ্ধ এজন্যই ঘর থেকে বের হতে হয়েছে। নইলে বের হওয়ার প্রশ্নই আসত না। সে যুগেও অতি প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। বাবার অতি বার্ধক্যের কথা নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে বলা থেকেই এটা প্রমাণ হয়।

৩. জীবন ও জীবিকার তাকিদে বের হতে হয়েছে। কিন্তু পুরুষদের সাথে কাজে যোগ দেননি। তীব্র প্রয়োজনেও পুরুষদের সাথে সহাবস্থান সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

৪. অতীব প্রয়োজনেও নিজের লাজুকতা খুইয়ে বসেন নি। নিজেদের হায়া-শরম বাঁচিয়ে একপাশে অপেক্ষা করেছেন।

৫. আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্যার্থে মুসা আ.-কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, আরও দশ বছর মুসাকে তাদের খেদমতে নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

৬. প্রচণ্ড প্রয়োজনে বের হলেও কোনও অবস্থাতেই পুরুষের সাথে সহাবস্থান নয়। হায়া-শরমও বিসর্জন নয়, এটাই সেই দুই মহীয়সী নারী থেকে পাওয়া মূল শিক্ষা।

৭. দুই মহীয়সীর আল্লাহ আজও পূর্ণতম কুদরত নিয়ে স্বমহিমায় বিদ্যমান। আজকালের কোনও মহীয়সী উক্ত অপূর্ব দুটি গুণ ধারণ করলে এ-যুগেও কোনও মুসাকে পাঠিয়ে দেবেনই।

৮. এ-যুগের কোনও মুসাকে পাওয়ার আশায় কোনও বোন নিজের জীবনকে উক্ত দুটি গুণে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চাইলে, তাওয়াক্কুল-বিষয়ক লেখাপত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

৯. নারীর ইফ্ফত (চারিত্রিক পবিত্রতা), ইস্তিহইয়া (স্বভাবজাত লাজুকতা) পৃথিবীর সুন্দর আর পবিত্রতম বস্তুগুলোর একটি।

সদিচ্ছা

ফেরাউনের স্ত্রী সবচেয়ে বড় কাফিরের ঘরে বাস করেও ঈমানের সন্ধান পেয়ে গেছেন। ঈমানের উপর অটল থেকেছেন। বড় দাঈর ঘরে বাস করেও নুহ আ.-এর স্ত্রী ঈমানের দৌলত অর্জন করতে পারে নি। পরিবেশ কোনও ব্যাপার নয়। আল্লাহর তাওফিকই আসল। সদিচ্ছা থাকলে চরম বৈরী পরিবেশেও ঈমানের সন্ধান লাভ করা যায়।

মেয়ের শুদ্ধতা

এক বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। উপস্থিত মুফতি সাহেব বললেন, তিনি ফতোয়ায়ে শামী ঘেঁটে মোট বিশটিরও বেশি গুণাবলি বের করেছেন, যা একটি মেয়ের মধ্যে থাকা জরুরি। পাত্রী দেখতে গেলে, গুণগুলো যাচাই করে দেখা যেতে পারে। তিনি বিস্তারিত না বলেই চলে গেছেন। এক বৃদ্ধলোক ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উত্তেজিত। তাকে জানতেই হবে, গুণগুলো কী? সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম, আপনি এই বয়েসে পাত্রীর গুণাবলির তালিকা জেনে কী করবেন? বৃদ্ধ লাজুক হেসে বললেন, জেনে রাখতে দোষ কী, কখন দরকার পড়ে, আগাম বলা যায়? গুণগুলোর তালিকার প্রতি আমারও কৌতূহল ছিল। মুফতি সাহেবকে না পেয়ে, বৃদ্ধ আমাকে কষে ধরলেন। তাকে গুণগুলোর কথা বলতেই হবে। যতই বলি, আমার জানা নেই, তিনি ততই নাছোড়বান্দা। শেষে বাধ্য হয়ে, কুরআন কারিমে বর্ণিত বিভিন্ন নারী চরিত্র ও জান্নাতি নারীদের গুণাবলি মন্থন করে একটা তালিকা বৃদ্ধকে গছিয়ে দিয়ে, প্রাণে বাঁচা গেছে। আমাদের আলাপ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, বৃদ্ধের কাছেও স্বরচিত একটি তালিকা আছে। এবারে সত্যি সত্যি বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করলাম। এতক্ষণ মনে হয়েছিল, বৃদ্ধ নিতান্তই ছাপোষা লোক। এখন দেখা যাচ্ছে, ছুপা রুস্তম। বৃদ্ধ এ-নিয়ে

নিয়মিত ভাবনাচিন্তা করেন বলেই মনে হলো। বৃদ্ধ তালিকা শেষ করে, একটা গুণের উপর বেশি গুরুত্ব দিলেন, মেয়ে দেখার আগে তার মাকে দেখা জরুরি। সব ক্ষেত্রে এটা শতভাগ কাজ না দিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাকে দেখেই মেয়ের মেজাজ-মর্জি, রুচি-সংস্কৃতি বুঝে নেওয়া যায়। একটি মেয়ে ওহির শুদ্ধতা নিয়ে কখন বেড়ে উঠবে? কুরআনে এর প্রচ্ছন্ন উত্তর আছে,

يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا

ওহে হারুনের বোন! তোমার পিতাও কোনও খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অসতী নারী (মারইয়াম ২৮)।

আয়াতে ভাই, মা ও বাবার কথা বলা হয়েছে। এই তিনজনের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করছে, একটি মেয়ের শুদ্ধতা।

এক নেককার ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিমত—নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন পোশাক একটা কথাই প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা ওই নারীর প্রতি নারাজ। তিনি ওই নারীর প্রতি গজব নাজিল করেছেন। তিনি এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যখন আদম ও হাওয়ার প্রতি নারাজ হলেন, তিনি দুজনের পরিধেয় পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিলেন। তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآ

হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদেরকে পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে পোশাক অপসারণ করিয়েছিল (আ'রাফ ২৭)।

বিপদে সাহায্য

আল্লাহ তাআলা নানাভাবে বান্দার প্রতি তার রহমত নাজিল করেন। কখনো মানুষের আকৃতিতেও রহমত পাঠান। তিনি বান্দার কষ্টের দিনে একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দেন। মুসা আ.-এর ঘটনায় দেখি বিপদের সময় একজন লোক তার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে,

فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

সুতরাং যখন মুসা সে নারীদ্বয়ের পিতার কাছে এসে পৌছল এবং তাকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল, তখন সে বলল, কোনও ভয় করো না। তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছ (কাসাস ২৫)।

এত নবী-রাসুল থাকতে ইবরাহিম আ.-এর নামে কেন আমরা সালাতে দুরুদ শরিফ পাঠ করি? তিনি ছিলেন পাঁচ উলুল আজম বা দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসুলের অন্যতম।

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ

এবং পরবর্তীকালীন লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন রসনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে (শু'আরা ৮৪)।

ইবরাহিমের এই দুআ আল্লাহ তাআলা অক্ষরে অক্ষরে কবুল করে নিয়েছেন,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

এবং পরবর্তীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করলাম যে, (তারা বলবে,) সালাম হোক ইবরাহিমের প্রতি, আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি (সফফাত ১০৮-১১০)।

এটা মূলত ইবরাহিম আ.-এর দুআর ফসল। আল্লাহ তাআলা তার দুআকে এভাবেই কবুল করেছেন। প্রতিটি নামাজে দুরুদে ইবরাহিমী পাঠ করতে হয়।

ইবরাহিম আ.-এর আরেকটি দুআও আল্লাহ তাআলা অক্ষরে অক্ষরে কবুল করেছিলেন। দুআ কবুল হওয়াটা প্রকাশ পেয়েছে প্রায় ২৫০০ বছর পর।

সেটা কোন দুআ?

হকের আত্মপ্রকাশ

দ্বীনের উপর থাকতে গেলে নানা বাধা আসে। প্রতিপক্ষের দিক থেকে অসংখ্য অপবাদ আসে। গালিগালাজ ধেয়ে আসে। চরিত্রের উপরও আঘাত আসে। হকপন্থিদের তখন সবর করতে হয়।

ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ

এবার সত্য কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম (ইউসুফ ৫১)।

মিথ্যা অপবাদে আল্লাহর নবী ইউসুফ আ.-কে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি সবর করেছেন। তিনি জানতেন, একদিন না একদিন হাকিকত প্রকাশ পাবেই। মিথ্যা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। হক স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেই।

মিথ্যার সাময়িক তোড়জোড়ে হক কিছু সময়ের জন্যে আড়ালে চলে যায়, কিন্তু সত্যের মৃত্যু নেই। জেলে গেলেও, শাস্তি পেলেও, সমাজের কাছে ক্ষণিকের জন্যে

ধিকৃত হলেও, একসময় সত্যের আলো প্রস্ফুটিত হয়। মুমিনকে একটু সবর করতে হয়। খোদ মিথ্যাই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়,

وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এটাই চিরকালের বিধান। আজিজের স্ত্রী তো নমুনামাত্র। ইউসুফ আ.-এর অনুসারীগণ কিয়ামত পর্যন্তই পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, অবশেষে সম্মানিত হবেন।

বিদামিন কাজিব

১. বৃদ্ধ বাবাকে মিথ্যা বলে, ছোট ভাইকে বনে নিয়ে গেল। বড় দশ ভাইয়ের মনে দুরভিসন্ধি। যে করেই হোক, ইউসুফকে বাবার কাছ থেকে আলগ করতে হবে। আমরা বড়রা থাকতে বাবা তাকেই কেন বেশি ভালোবাসে? আমরা কম কীসে? ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ বেশ সফল। তারা বাবাকে বোঝাতে পেরেছে। বাবা ইউসুফের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও শেষমেশ ভাইদের পীড়াপীড়িতে 'নাড়ীছেঁড়া ধনকে' কাছছাড়া করতে সম্মত হয়েছেন।

২. ভাইয়েরা বনে গিয়ে পরিকল্পনামাফিক ইউসুফকে কূপে ফেলে দিল। মেষজাতীয় কোনও প্রাণী হত্যা করে ইউসুফের জামাকে রক্তরঞ্জিত করলো। সেটা নিয়ে বাবাকে দেখালো।

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ

তারা ইউসুফের কামিসে মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এল (ইউসুফ ১৮)।

৩. রক্ত তো মিথ্যা নয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা 'মিথ্যা রক্ত' কেন বললেন?

ভাইয়েরা তাদের ষড়যন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্যে রক্ত লাগিয়েছে। তারা ভেবেছিল, শুধু মুখের কথাতেই বাবা সন্তুষ্ট হবেন না। আরও প্রমাণ চাই। সেটা কী? রক্ত। রক্তই আমাদের হয়ে সাক্ষ্য দেবে ইউসুফকে মেরেছে কে? রক্ত যেহেতু মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রতিভূ হচ্ছে, তাই রক্তকে সরাসরি 'মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪. কুরআনের ভাষ্যমতে বোঝা গেল, রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, জালিম ও শয়তানদের প্রাচীন কৌশল। মিথ্যা রক্তকে সত্য বলে প্রচার করা। আবার সত্য রক্তকে মিথ্যা বলে প্রচার করা শয়তানের দোসরদের চিরাচরিত রীতি।

৫. রক্তকে ব্যবহার করে মানুষের আবেগ অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া এবং স্বার্থসিদ্ধি করা জালিমদের বংশানুক্রমিক রীতি। রক্ত মানে আবেগ। রক্ত মানে বিদ্রোহ। রক্ত মানে সহানুভূতি। রক্ত মানে প্রতিবাদ।

৬. আবার রক্ত মানে দমন, রক্ত মানে পীড়ন, রক্ত মানে জুলুম, রক্ত মানে নির্যাতন। রক্ত মানে হকের টুটি চেপে ধরা।

৭. রক্তকে আসলে যে যার সুবিধামতোই ব্যবহার করে। রক্ত দেওয়া ও নেওয়া বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হক ও বাতিলের মাঝে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া নিয়েই বচসা চলছে।

৮. হক তার তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, বাতিল বলছে এটা 'দামুন কাজিব'-মিথ্যা রক্ত। তাদের এই রক্তদান বৃথা। মিডিয়ার মারদাঙ্গা প্রচারের কারণে, কুফরিশক্তির ভ্রান্ত দাবিটাই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

৯. কাফিররা তো বটেই মুসলিম এমনকি অনেক ধর্মীয় জ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ঝরা রক্তকে 'মিথ্যা রক্ত' বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বেশিরভাগের ফতোয়াই একসময় ভিন্ন ছিল। একসময় তারা আল্লাহর পথে ঝরা রক্তকে সত্যই মনে করত। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগের সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। একই মুখ থেকে দুই যুগে দুই ফতোয়া।

১০. পাশ্চাত্য মিডিয়া এই পরিবর্তিত ফতোয়াকে ফলাও করে প্রচার করছে। ব্যাপক প্রচারণার বদৌলতে ফতোয়াটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অবিশ্বাসীরা একটা বিষয় বারবার ভুলে যায়, ইসলামের শত্রুরা যখনই কোনও ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, কিছুদিন পর সেই ষড়যন্ত্রই তাদের বিরুদ্ধে বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে।

১১. পাশ্চাত্য মিডিয়াও রক্তকে পুঁজি করে। তারা যখন নিরীহ মুসলিম হত্যা করে, তখন কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় যখন রক্তপাত হতে শুরু করে, তখন পাশ্চাত্য মিডিয়া 'রক্ত' দেখিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতিতে নাড়া দেওয়ার সর্বোচ্চ কোশেশ চালায়। তাদের এই রক্ত 'মিথ্যা রক্ত'। হানাদার কাফিরের রক্ত কীভাবে 'সত্য রক্ত' হতে পারে? মিথ্যা রক্ত দেখিয়ে তারা তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। যেমনটা ইউসুফের দশ ভাই করেছিল! কৌশল সেই একই।

জামালে ইউসুফি

১. সবাইকে সব কথা বলতে নেই। অতি আপনজন হলেও না। আপন মায়ের পেটের ভাইও একসময় শত্রু হয়ে যায়। ইয়াকুব জ্ঞানবৃদ্ধ। তিনি আপন সন্তানদের স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। তিনি ছোট ছেলের মাঝেও বিশেষ গুণ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গেলেন। ছেলেকে বলে দিলেন:

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

নিজের এ-স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করে (৫)।

(ক). হিংসুকদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে নিজের গুণাবলি গোপন রাখা জরুরি। হিংসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

(খ). কিছু মানুষের চিন্তা ও মানসিকতা এতই নীচ, তারা অপরের সুন্দর স্বপ্নটাও সহ্য করতে পারে না। সে কেন সুন্দর স্বপ্ন দেখে না, এটা তাকে পোড়ায়।

(গ) হিংসা বেশির ভাগ সময় কাছের মানুষদেরই বেশি পোড়ায়। দূরের লোকেরা আমার সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে! তাই সতর্কতা কাছের লোকদের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা বেশি কাম্য।

(ঘ) নিজের সুন্দর স্বপ্নের কথা, জীবনের হাসি-আনন্দের কথা অন্যকে বলার অভ্যেস মানুষের মধ্যে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান।

(ঙ) ছোটদের সাথে কথা বলার সময় বিস্তারিত ভেঙে বলা উচিত। সংক্ষেপ করলে ছোটরা অনেক সময় বুঝতে পারে না। আয়াতে বলা হয়েছে (لَا تَقْصُصْ) তুমি বর্ণনা করো না। 'তাকসুস' শব্দটাকেও ভেঙে উচ্চারণ করা হয়েছে। ইদগাম বা যুক্ত করা ছাড়া। স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা ছিল 'তাকুসসা'। যুক্ত শব্দটাকে মুক্ত করে ব্যবহার করে আলাপটাকে মুক্ত করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(চ) সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা গোপন রাখতে হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নানান কারণে ব্যাখ্যাটা হজম নাও করতে পারে। ইয়াকুব ছেলেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন নি। শুধু কী করতে হবে সেটা বলে দিয়েছেন। এমনটাই কখনো ক্ষেত্রবিশেষে করা উচিত।

(ছ) একজন বাবাকে হতে হয় বিচক্ষণ। সন্তান প্রতিপালনে দূরদর্শী। তিনি হক-বাতিলের পার্থক্য বোঝাবেন। সন্তানদেরকে সেভাবে গড়ে তুলবেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। সন্তানের কল্যাণে বাবার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত যখন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলে যায়, সেখানে প্রকৃত কল্যাণ দেখা দেয়।

২. মানুষ অনেক সময় মন্দ কাজ করে ভালো কিছুর প্রত্যাশায়। ঘুষ খায় কেন? ছেলেসন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করবে বলে। ডাকাতি করে কেন? গরিব-দুঃখীর মাঝে সম্পদ বিলিয়ে দেবে বলে। গুপ্তহত্যা করে কেন? দুষ্টলোক থেকে সমাজকে মুক্ত করবে বলে। ইউসুফের ভাইয়েরাও বলেছিল তাকে হত্যা করো (اقْتُلُوا) অথবা অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস (اطْرَحُوهُ)। তাহলে তোমাদের বাবার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসবে। তাদের চিন্তা ছিল, কাজটা আপাতত মন্দ হলেও,

تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে (৯)।

তারা বিবেকের দংশন থেকে বাঁচার জন্যে অদ্ভুত যুক্তি বের করে নিয়েছে। এখন স্বার্থ উদ্ধার করে নাও, পরে ভালো হয়ে যাব! সারা জীবন দেদার অবৈধ কাজ করে, শেষ জীবনে হজ করে ভালো মানুষ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রাখে, সমাজে এমন মানুষ ভুরি ভুরি! মন্দ কাজ সব সময়ই মন্দ। পরিণতি ভালো হলেই মন্দটা ভালো হয়ে যায় না। কয়লা সব সময়ই কালো।

কুরআনের ছায়াতলে

১. আজিজের স্ত্রী কৌশল খাটিয়ে, ইউসুফকে আটকানোর জন্যে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে ইউসুফের জন্যে ইসমত (নিষ্পাপ)-এর দরজা খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সম্মান দান করার পর দুনিয়ার কোনও চক্রান্ত সম্মানকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার পর শত্রু দুনিয়ার দরজা বন্ধ করলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

২. আমি যা কিছুই করি, তার পরিণতি আমাকে ভোগ করতেই হবে। ভালো বা মন্দ। আমি অন্যায় করে ছাড় পেয়ে গেলেও আখিরাতে ছাড় পাব না। ওখানে ধরা পড়তেই হবে:

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ

(কেউ যদি জিজ্ঞেস করে) এসব মুলতবি রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্যে, (তার জবাব হলো) বিচার দিবসের জন্যে! (মুরসালাত ১২-১৩)।

আমার অনেক আচরণের চূড়ান্ত নিকাশ ঝুলন্ত হয়ে আছে। বিচারাধীন আছে। রায় প্রকাশ পাবে শেষ দিন। সেটা যত ছোট আচরণই হোক! যত তুচ্ছ অন্যায়ই হোক!

৩. একজন দায়ীর কাজ হলো সুযোগ পেলেই দাওয়াত দেওয়া। দায়ীর কোনও ছুটির দিন নেই। সুনির্দিষ্ট অফিস নেই। সামনে মানুষ থাকলেই হয়। কাজ শুরু হয়ে যাবে:

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী? (ইউসুফ ৩৯)।

খাতা নেই। কলম নেই। মাইক নেই। মাইক্রোফোন নেই। রেকর্ডার নেই। লাইট-ক্যামেরা নেই। ছিল শুধু ইখলাস। তাতেই তাঁর বাক্যটা চিরন্তন হয়ে আছে। বলেছেন সেই শত শত বছর আগে, আজও তাঁর কথাটা কোটি মুসলমানের মুখে মুখে।

৪. কুরআন কারিম এক জীবন্ত মুজিযা। আল্লাহ তাআলার সাথে যোগাযোগের সরাসরি মাধ্যম। আমরা নিয়মিত কুরআন কারিম তিলাওয়াত করি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআনের স্বাদ পেয়েছেন, আমরা সেভাবে পাই না। কেন?

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

(হে রাসুল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি।

কেন নাজিল করেছেন?

لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগত উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ ২৯)।

রাব্বে কারিম কুরআন নাজিল করেছেন এক উদ্দেশ্যে, আমরা সেটা ভুলে কুরআনকে কাজে লাগাচ্ছি অন্য উদ্দেশ্যে। এজন্যই কুরআন কারিমের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের অধরা থেকে যাচ্ছে।

কুদওয়াহ/ আদর্শ

১. বাবা আর ছেলে দুজনেই আমাদের জন্যে আদর্শ। দুজনেই অসাধারণ সব শিক্ষা রেখে গেছেন।

২. বড় অবহেলা সইতে হয়েছে। ভাইদের কাছে। সমাজের কাছে।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

এবং (তারপর) তারা ইউসুফকে অতি অল্প দামে বিক্রি করে দিল, যা ছিল মাত্র কয়েক দিরহাম। বস্তুত ইউসুফের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না (ইউসুফ ২০)।

৩. দাস ব্যবসায়ীরা ইউসুফের প্রতি খুব একটা আগ্রহী ছিল না। বড় অবহেলার সাথে বিক্রি করে দিয়েছে। ইউসুফ আ. তাদের উপেক্ষা সয়ে সবর করেছেন। সবরের ফল পেয়েছেন। মিসরের অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

৪. এত ভালো এক সন্তানকে হারিয়ে ভেঙে পড়েন নি। মানুষের কাছে মাথা নোয়ান নি,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না (ইউসুফ ৮৬)।

৫. একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছেন। বাপ-বেটা দুজনেই সবর করেছেন। মানুষের দুর্ব্যবহারে নিরাশ হয়ে পড়েন নি।

৬. শত কষ্টেও সবর করব। পরিস্থিতি যাই হোক, আল্লাহকেই শেষ আশ্রয় মনে করব। আল্লাহর দরবারকেই একমাত্র চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্র বানাব।

আজাব

আজাব বলতে কী বুঝি? দাউদাউ আগুনে ঝলসে যাওয়া। প্রকাণ্ড মুগুরের আঘাতে মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কুরআন কারিমে ভিন্নধর্মী এক লাঞ্ছনাকর আজাবের কথা আছে,

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

আর বনী ইসরাঈকে উদ্ধার করলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি হতে। অর্থাৎ ফিরআউনের থেকে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক উদ্ধত ব্যক্তি (দুখান ৩০-৩১)।

১. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে 'লাঞ্ছনাকর শাস্তি' থেকে উদ্ধার করেছেন। কী সেই লাঞ্ছনাকর শাস্তি? ফিরআউন। একজন 'ব্যক্তি'-কে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছনাকর শাস্তি হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২. প্রতিটি জালিম শাসক, প্রতিটি তাগুত স্বয়ং 'আজাব'। তারা মূর্তিমান 'শাস্তি' হয়ে দেশ ও জনগণের উপর চেপে থাকেন।

৩. জালিম ও তাগুত শাসনের অধীনে থাকা মানে আজাবের অধীনে থাকা। জালিম-তাগুতের শাসনে সন্তুষ্ট থাকা মানে আল্লাহর আজাবে সন্তুষ্ট থাকা।

৪. সবার পক্ষে এই আজাবের তিক্ততার স্বাদ অনুভব করা সম্ভব নয়। ঈমান বিশুদ্ধ থাকলে, তাওহিদের আকিদা স্বচ্ছ থাকলে, এই আজাব অনুভব করা সম্ভব।

৫. ঈমান-আকিদায় দুর্বলতা থাকলে লাঞ্ছনাকর আজাবে ভুগলেও কিছুই মনে হবে না। উল্টো আজাবের তিক্ততাকে 'মিষ্ট' মনে হবে।

৬. আমি আত্মসমীক্ষা করে দেখতে পারি। আমি কি জুলুমের অধীনে আছি? আমি কি জুলুমের অধীনে থেকেও চাপমুক্ত থাকি?

৭. অপারগতার কারণে চুপচাপ থাকা এক কথা, জুলুমকে 'ন্যায়' মনে করা আরেক কথা। অন্তত মনে মনে হলেও ঘৃণা করা জরুরি। না হলে যে 'ঈমান' নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

হাসির সাদাকা

নবীজি সা. মক্কার বড় বড় নেতাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। দাওয়াতি কথাবার্তায় মশগুল এমন সময় অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. এলেন।

নবীজি কারও সাথে কথা বলছেন, সেটা না দেখার কারণে কথার মাঝেই নবীজির কাছে কিছু শেখার আবেদন করলেন। ব্যাপারটা নবীজির পছন্দ হলো না। চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। আবদুল্লাহর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কাফিরদের সাথে যথারীতি কথা চালিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আল্লাহর পছন্দ হলো না। মুশরিক নেতারা চলে যাওয়ার পরপরই নাজিল করলেন,

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰى

(রাসুল) মুখ বিকৃত করলেন ও চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল (আবাসা ১-২)।

১. একজন অন্ধ মানুষের সামনে মুখ বিকৃত করার কারণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিলেন।

২. আমরা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের সামনেও কত মুখ বিকৃত করি। চেহারা তখ বদলে ফেলি!

৩. মুখের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দা'ঈর উচিত ভালো-মন্দ সবার সাথে স্বাভাবিক মুখভঙ্গিতে কথা বলা। যতই বিরক্তিকর আচরণ করুক, নিজের মুখের অভিব্যক্তি বদল না করা।

৪. হাসিমুখে কথা বলা সুন্নাত। মুসলিম ভাইয়ের হাসিমুখে কথা বলা সাদাকা।

তিন কাজ

নবীজি সা.-এর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল কুরআন কারিম। সূরা কাফের শেষ আয়াতে নবীজিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাব্বে কারিম বলেছেন,

১. (হাকিকত): তারা (কাফিররা) যা-কিছু বলছে, আমি তা ভালোভাবেই জানি,

نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَقُوۡلُوۡنَ

ক. আপনি দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে, তাওহিদের কথা বলতে গিয়ে, কাফিরদের কটূকটব্যের সম্মুখীন হন। আমি সেসব ভালো করেই জানি। এ-বাক্যে চরম বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। ভালো কাজ করতে গেলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবেই। এ-নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান।

খ. আমাদের জন্যেও শিক্ষা আছে। আমরাও দৃঢ় বিশ্বাস রাখব, আল্লাহ তাআলা আমার কাজ দেখছেন। আমার বিরোধীদের আচরণও দেখছেন। আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব। বিরোধীদের সামলানোর জন্যে আল্লাহ আছেন। এভাবে চিন্তা করতে পারলে কাজের গতি ব্যাহত হবে না। উৎসাহে ভাটা পড়বে না।

২. দিক-নির্দেশনা: (হে রাসুল!) আপনি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নন,

وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ

ক. নবীজির কাজ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো নবীজির দায়িত্ব ছিল না। নিজের কাজের সীমারেখা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নবীজিকে।

খ. দায়িত্বের পরিধি জানা থাকলে অহেতুক পেরেশানি থেকে বাঁচা যায়। অনেক সময় কাফিরকে দাওয়াত দিতে গিয়ে ইসলামের বিকৃত বা খণ্ডিত রূপ তুলে ধরেন কোনও কোনও দা'ঈ। এটা মোটেও ঠিক নয়। প্রথম দাওয়াতে তাওহিদ ও শিরক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া জরুরি। ঈমান আনা না আনা তার অভিরুচি।

৩. দায়িত্ব: আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে, এমন প্রত্যেককে আপনি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিতে থাকুন,

فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

ক. এটাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নবীজির দাওয়াতের প্রধান ক্ষেত্র, যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা। যারা আল্লাহকে ভয় করে না, বোঝানোর পরও নিজের অবস্থানে অনড় থাকে, তাদের ব্যাপারে নবীজির কোনও দায়-দায়িত্ব নেই।

খ. আমাদের দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাবে, আল্লাহকে ভয় করে চলেন, এমন শ্রেণি। তার মানে অমুসলিমদের দাওয়াত বন্ধ করে দিতে হবে? জি না। তাদের কাছে দ্বীনের হাকিকত পৌঁছাতে হবে। না মানলে, জোর করা যাবে না।

ছুতো

১. বনী ইসরাঈলের কাছে ছুতোর অভাব ছিল না। মুসা আ. তাদেরকে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন,

وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

এবং আল্লাহর পথে কিতাল কর।

২. বনী ইসরাঈল জিহাদ করতে সাফ অস্বীকার করে বসল। শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সিনাইতে আটকে দেওয়া হয়। মুসা আ. ইন্তেকাল করেন। তারপর দায়িত্ব লাভ করেন ইউশা আ.. বনী ইসরাঈলের দুর্ভোগ কাটেনি। এভাবে কেটে গেল বহুদিন। আশেপাশের জালিম সম্প্রদায়সমূহের জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে, বনী ইসরাঈল তাদের সে সময়ের নবী শামাবীল আ.-এর কাছে আবেদন জানাল,

ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন, যাতে (তার পতাকাতলে) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।

৩. নবীর সন্দেহ হলো। তারা সত্যি সত্যি জিহাদ করবে? নাকি নতুন কোনও বাহানা বের করেছে?

هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا

তোমাদের দ্বারা এমন ঘটা কি অসম্ভব, যখন তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হবে, তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না?

৪. বনী ইসরাঈলের কখনো জবাবের অভাব ছিল না। তারা যে-কোনও অভিযোগেরই হাজিরজবাব দিতে পারত,

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

আমাদের এমন কী কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে?

৫. নবীর আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, বনী ইসরাঈলের পরবর্তী আচরণে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

অতঃপর (এটাই ঘটল যে,) যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তাদের মধ্যকার অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে পেছনে ফিরে গেল।

৬. আল্লাহ তাআলা এদেরকে জালিম আখ্যায়িত করেছেন,

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত (বাকারা ২৪৬)।

৭. বনী ইসরাঈলের কথামতো তালূত রহ.-কে রাজা বানিয়ে দিলেন। এবার নতুন ছুতো বের করল,

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

তার কী করে আমাদের উপর বাদশাহি লাভ হতে পারে, যখন তার বিপরীতে আমরাই বাদশাহির বেশি হকদার? তা ছাড়া তার তো আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয় নি (বাকারা ২৪৭)।

৮. আল্লাহর নবী তাদের অবান্তর আপত্তির জবাবে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ

আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

৯. ঘটনা সামনে গড়াল। নানা গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈল যুদ্ধে বের হলো। পথে বিভিন্ন পরীক্ষায় বেশিরভাগ লোক অকৃতকার্য হলো। অবশেষে যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত এল, তারা বলে বসল,

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোনও শক্তি আমাদের নেই (বাকারা ২৪৯)।

১০. একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, বনী ইসরাঈল রাজা চেয়েছে জিহাদ করার জন্যে। মানে একজন শাসক ছাড়া তারা জিহাদ করতে রাজি ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের দাবি মতো শাসক দিলেন।

১১. কুরআন কারিমের ঘটনার প্রেক্ষিতে বোঝা যায়, বনী ইসরাইল চরম নির্যাতিত ছিল। এজন্য তাদের নবী জিহাদের ডাক দিয়েছিল। কোনও শাসকের ছত্রছায়া ছাড়াই। তার মানে তাদের ধর্মে জুলুম প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নিজের অধিকার ফিরে পেতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে শাসকের প্রয়োজন ছিল না।

১২. সবধর্মের বিধান এক নয়। ইয়াহুদি ধর্ম আর ইসলাম ধর্মও এক নয়। কিন্তু কুরআন কারিমে কোনও কিছু বর্ণিত হলে, তা সর্বজনীন আকার লাভ করে। আমরা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি।

১৩. একদল মজলুমের পক্ষ নিয়ে বলছে, আমরা জিহাদ করব। কারণ জুলুম প্রতিরোধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরজ। এজন্য শাসকের প্রয়োজন নেই।

১৪. আরেকদল বলছে, শাসক ছাড়া জিহাদ ফিতনা। কুরআন ও সুন্নাহ মতেই তারা ফতোয়া জারি করছেন।

১৫. ফাঁক দিয়ে মজলুম মুসলিম ভাইদের অবস্থা দিনদিন শোচনীয় হয়ে চলেছে। যারা শাসকের আশায় বসে আছেন, তারা মজলুমের জন্যে কি পরামর্শ দেবেন? মার খেতে খেতে মরে যেতে বলবেন?

১৬. আমরা কি বর্তমানে কিছুটা হলেও বনী ইসরাঈলের সেই সময় ও চরিত্রকে ধারণ করছি না?

তিন দান, তিন তলব

আল্লাহ তাআলা সূরা দুহায় নবীজি সা.-কে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামতের কথা বলেছেন। পাশাপাশি তিনটি বিষয়ে আদেশ করেছেন। নবীজির যখন যা প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তাআলা সঠিক সময়ে সর্বোত্তম সহযোগিতা দান করেছেন। সূরার বর্ণনাতেও দানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

প্রথম দানঃ আশ্রয় প্রদান। ইয়াতিম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। সত্যিকারের সুরক্ষা দান করেছেন।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

তিনি কি আপনাকে ইয়াতিম পান নি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন?

দ্বিতীয় দানঃ পথের সন্ধান প্রদান। কুরাইশ মূর্তিপূজা করত। নবজাতকের পক্ষে ব্যতিক্রম কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নবীজিকে আল্লাহ তাআলা শিরকের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করেছেন।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

এবং আপনাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত; অতঃপর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।

তৃতীয় দানঃ ঐশ্বর্য দান। তাঁর প্রতিপালনের জন্যে, তাকে শত্রু থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে শৈশবের বিভিন্ন পর্যায়ে লোক প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

এবং আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন, অতঃপর (আপনাকে) ঐশ্বর্যশালী বানিয়ে দিয়েছেন।

দানগুলো এসেছে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। তদ্রূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম বা তলবগুলোও এসেছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। তবে ব্যাপারটা এমন নয়, যে-কোনও দানের বিনিময়েই 'তলব' থাকে। মানে আমি দিয়েছি বলেই তোমার কাছে বিনিময়ে কিছু একটা তলব করছি।

প্রথম তলব: আপনি নিজে ইয়াতিম ছিলেন। পিতা হারানোর বেদনা যে কি, সেটা আপনি বোঝেন। সে হিশেবে আপনিও ইয়াতিমের প্রতি সদাচার করুন। ইয়াতিমের প্রয়োজন প্রতিপালন আর স্নেহ-মমতা। তার ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। কারণ অনেক সম্পদশালী ইয়াতিমও আছে,

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

সুতরাং যে ইয়াতিম, আপনি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না।

দ্বিতীয় তলব: অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন। সুতরাং দুঃখী মানুষকে কষ্ট দেবেন না। তাদের সাথে সদাচার করুন।

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

এবং যে সওয়াল করে, তাকে দাবড়ি দেবেন না।

তৃতীয় তলব: আপনাকে আল্লাহ তাআলা অনেক নিয়ামত দান করেছেন। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। এজন্য শুকরিয়া আদায় করুন।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

এবং আপনার প্রতিপালকের যে নিয়ামত (পেয়েছেন), তার চর্চা করতে থাকুন।

ফেরার সুযোগ

দুনিয়ার দরবারগুলো নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর দরবার কখনোই বন্ধ হয় না। সব সময় ফেরার সুযোগ থাকে।

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

আর (এভাবে আদম নিজ প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ও বিভ্রান্ত হলো। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তাওবা কবুল করলেন ও তাঁকে পথ দেখালেন (তোয়াহা ১২১-২২)।

১. আদম আ. ইজতিহাদি ভুল করেছিলেন। সেটাকে কুরআন কারিম 'বিভ্রান্ত' শব্দে ব্যক্ত করেছে। ইজতিহাদি ভুলে গুনাহ নেই। নবীগণ যেহেতু সাধারণ মানুষের মতো নন। তাই তাঁরা ইজতিহাদি ভুলের জন্যেও আল্লাহর দরবারে তাওবা করেন।

২. ভুল করে ফেললে আল্লাহ তাআলা তাওবা করে ফিরে আসার সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছেন। এই দরজা সদা-সর্বদা খোলা।

৩. ভুল করলে চাকরি চলে যায়। গুনাহ করে ফেললে, আল্লাহ তাআলা বান্দার মূল কাজ 'ইবাদতের' চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেন না।

৪. বান্দা যত বড় গুনাহই করুক, নতুন করে দাসত্বের জীবন শুরু করার সুযোগ রেখেই দেন।

৫. দুনিয়ার মনিবদের সময়-অসময় আছে। আল্লাহর দরবারে কোনও সময়-অসময় নেই। যে-কোনও সময় ফেরার পথ উন্মুক্ত। সুপারিশ লাগে না। লোক ধরতে হয় না। বারবার ধরনা দিতে হয় না। আমি তাওবা করলেই তিনি তাওবা কবুল করে নেন।

নবীজির ভালোবাসা

কিছু ভালোবাসা শুধু নিয়েই যায়, কিছু দেয় না। কিছু ভালোবাসা শুধু দিয়েই যায়, খুব বেশি কিছু নেয় না। চায় না। দাবি করে না। বিনিময় পাওয়ার আশা করে না। নবীজি সা.-এর ভালোবাসাও তেমনই।

আবার কিছু ঘৃণা আছে খুবই বিপজ্জনক। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই বরবাদ। নবীজি সা.-এর প্রতি ঘৃণাও তেমনই।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিশ্চয় আপনার যে শত্রু, তারই শেকড় কাটা (কাওসার ৩)।

১. নবীজি সা.-এর পুত্রসন্তান বাঁচেন নি। আস বিন ওয়াইলসহ মক্কার আরও মুশরিকরা বলে বেড়াতে লাগল,

'মুহাম্মাদ 'আবতার'। নির্বংশ'।

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের এই প্রচারণার জবাবে সূরাটি নাজিল করেছেন।

২. নবীজির প্রতি ঘৃণাপোষণকারী, সর্বদা অকল্যাণের মধ্যে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত এই আসমানি লানত অব্যাহত থাকবে।

৩. নবীজির আনীত দ্বীনকে যারা ঘৃণা করবে, তারাও সর্বদা অভিশাপের মধ্যে থাকবে।

৪. নবীজির আনীত দ্বীনকে বাদ দিয়ে যারা মানবরচিত আইনকে প্রাধান্য দেবে, তারাও অভিশাপের মধ্যে থাকবে।

৫. নবীজির পছন্দের খলিফাগণের আদর্শকে বাদ দিয়ে যারা ভিন্ন আদর্শে দেশ চালাবে, তারা অভিশাপের মধ্যে থাকবে।

৬. নবীজির আনীত শরিয়তকে যারা অপছন্দ করবে, কথা বা কাজে, তারা স্থায়ী অকল্যাণের মধ্যে থাকবে।

৭. যারা নবীজি সা.-কে ভালোবাসবে, তার দ্বীনকে ভালোবাসবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

কূটিল কূটচাল

নিজের চিন্তা ও মত প্রতিষ্ঠার জন্যে দুষ্টলোকেরা নানা কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। প্রতিপক্ষের অবস্থানকে নড়বড়ে করার জন্যে তার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ ছড়িয়ে দেয়। বিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিমান 'যুক্তিকে' অসার ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যে হেন 'কূটচাল' নেই, যা তারা চালে না। এটা নতুন কিছু নয়। বলা ভালো, এটা কুফফারদের চিরাচরিত কৌশল,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

(হে নবী!) আমার জানা আছে যে, তারা (আপনার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়।

মক্কায় এক অনারব কামার বাস করত। নবীজি সা.-এর কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনত। নবীজি সময়-সুযোগ করে তার কাছে দ্বীনের কথা শোনাতেন। সে কামারও হয়তো কথাপ্রসঙ্গে দু-চারটি ইনজিলের কথা শুনিয়ে থাকবে। এটা দেখেই

কাফিররা বলাবলি শুরু করে দিল, মুহাম্মাদকে একজন মানুষ এসব শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাদের এই অসার মিথ্যা প্রচারণার জবাব দিচ্ছেন,

لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

(অথচ) তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা আরবি নয়। আর এটা (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবি ভাষা (নাহল ১০৩)।

কামার হলো অনারব। সে কীভাবে কুরআনের মতো এমন বিশুদ্ধ আরবি রচনা করবে? আসলে বাতিল শক্তি হকের বিরুদ্ধে নেমে, সামান্য খুড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও হয়েছে তা-ই।

কাফির হলেও তারা মূর্খ ছিল না। তারা বুঝত কীভাবে মানুষকে হক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। তারা জানত কীভাবে একটা আন্দোলনকে বানচাল করা যায়। এজন্য তারা 'তেঁতুল তত্ত্ব' আবিষ্কার করল। কুরআন আসমানি কিতাব নয়, এটা এক কামারের বানানো পঙ্‌ক্তিমালা।

জনগণকে যদি এটা গেলানো যায়, তাহলে মুহাম্মাদের পুরো আন্দোলনই হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। বেচারা মুশরিকরা বুঝতে পারেনি, তারা মুহাম্মাদ নয়, খোদ আল্লাহর বিরুদ্ধে লাগতে এসেছে।

যে যাই বলুক, দ্বীনের পথ থেকে হটে যাওয়া যাবে না। তবে কিছুদিন বাতিলের প্রপাগাণ্ডার ধাক্কা সহ্য করে যেতে হবে। উপেক্ষা করে যেতে হবে। দ্বীনের পথে কাজ করলেও কুফরিশক্তি সর্বস্ব ব্যয় করে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে, আমি যে কাজে আছি, সেটা প্রকৃত দ্বীন নয়। সেটা বিকৃত দ্বীন। এই কুফফারের সাথে কিছু নামধারী মুসলিমও যোগ দেবে। তাদের এতসব আয়োজন বেশিদিন ধোপে টিকবে না। শেষতক হকেরই জয় হয়। সুতরাং ভয় কীসের?

হকের জ্বালা

বিছুটি লাগলে শরীর চুলকাতে শুরু করে। ক্ষতস্থান লাল হয়ে যায়। ফুলে যায়। কালশিটে দাগ পড়ে যায়। চাক চাক গোশত জমে যায়। এখন হককথা বললেও বাতিলের মাথায় এমন বিছুটি লেগে যায়।

কুরআন কারিম নাজিলের সময়ও বাতিল ছিল। সেই বাতিল আর বর্তমান বাতিলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। মক্কার মুশরিকরা বিশেষ করে মদীনার ইয়াহুদিরা ভালোভাবেই জানত, নবীজি সা. একজন সত্য নবী। কুরআন কারিমই তাদের ভেতরকার অবস্থা ফাঁস করে দিয়েছে,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (এতটা ভালোভাবে) চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। নিশ্চয় তাদের মধ্যে কিছু লোক জেনে-শুনে সত্য গোপন করে (বাকারা ১৪৬)।

মোটামুটি প্রায় ইয়াহুদি-খ্রিস্টানই জানত, নবীজি হক, তবুও অহমিকা বা একগুঁয়েমির কারণে সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত। তাদের নেতারা নবীজি সম্পর্কে আরও বেশি জানত। কিন্তু জেনেও তথ্য গোপন করত। সূরা আনআমেও হুবহু একই কথা বলেছেন! তবে আয়াতের শেষটা বদলে গেছে,

ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(তথাপি) যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা ঈমান আনবে না (২০)।

তারা সত্যকে গোপন করে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে ঈমান আনতে পারে নি। হকের পরিচয় পেয়েও হকের বঞ্চিত থাকে। তাদের সম্পর্কে রাব্বে কারিম বলেছেন,

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ চেনে, তবুও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ (নাহল ৮৩)।

১. বর্তমানেও এমন লোকের অভাব নেই। কিছু লোক আছে হকের পরিচয় জানে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক না আসার কারণে হক গ্রহণ করতে পারে না।

২. আরেক দল আছে, হককে চেনে, হক জানে, কিন্তু অন্যদেরকে, অনুসারীদেরকে জানতে দেয় না। পাছে তাদের গদি উল্টে যায়।

৩. আরেকদল হককেই চিনতে পারে না। অথচ হক তাদের নাকের ডগাতেই বিচরণ করে। দেখেও তারা হক চিনতে পারে না। আল্লাহ তাআলার এক আজিব ফয়সালা।

৪. আরেকদল হকের কথা শুনলেই তাদের জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। এরা হককেই 'বাতিল' ঘোষণা দিয়ে হকের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে।

সব সময় রাব্বে কারিমের কাছে বিনয়ের সাথে দুআ করে যাওয়াই আমার কর্তব্য। তিনি যেন হক থেকে মাহরুম-বঞ্চিত না করেন। অহমিকা-একগুঁয়েমীর মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করে না দেন।

ইমানে যত্ন

১. বাড়ি হারিয়েছেন। সন্তান-সন্ততি হারিয়েছেন। ধন-জন হারিয়েছেন। প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়েছেন। আইয়ুব আ. এত দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে সবর করে থাকতে পেরেছিলেন?

২. স্বামী নেই, তবুও সন্তান হলো। অবাক করা ব্যাপার। ভীতিকরও বটে। লোকে কী বলবে? তা সত্ত্বেও সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে লোকসমক্ষে বের এলেন মারইয়াম। কীভাবে পারলেন এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে?

৩. লেলিহান শিখাময় আগুন। শুধু আগুন নয়, বিশাল অগ্নিকুণ্ড। দেখলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়ার কথা। তাকে এই দাউদাউ আগুনে ফেলে দেওয়া হলো। একটুও ভয় পেলেন না ইবরাহিম আ.। কেন?

৪. কত বছর কেটে গেছে। কত দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। কত লোক মারা গেছে। কিন্তু আজও সেই হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ভুলতে পারেন নি। আশায় আশায় বুক বেঁধে আছেন। একদিন ফিরে আসবে কলজের টুকরা ইউসুফ। কীভাবে এমন অসম্ভব আশাকে জিইয়ে রেখেছিলেন ইয়াকুব আ.?

৫. ঘুটঘুটে অন্ধকার। পানির নিচে, মাছের পেটে। সাগরের তলদেশে। বাঁচার কোনও আশা আছে? আশা থাকার কথা? তবুও ইউনুস আ. কীভাবে বাঁচার আশা করলেন? বাঁচার দুআ করলেন?

৬. চারদিকে শত্রু। আস্তে আস্তে ঘেরাও ছোট হয়ে আসছে। দুজন মানুষ গুটিসুটি মেরে গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। একজন উদ্বিগ্ন আরেক পরম নিশ্চিন্ত। কীভাবে সম্ভব হলো নবীজি সা.-এর পক্ষে এমন নিরুদ্বেগ থাকা?

এর উত্তর একটাই,

'তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রতি (হুসনে যন্ন) সুধারণা পোষণ করতেন। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস করতেন, যত কিছুই হোক, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথেই আছেন। যত আঁধারই হোক, আলো আসবেই। আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেনই।

আমিও কি পারি না, রাব্বে কারিমের প্রতি এমন অচল অটল আস্থা পোষণ করতে?

বড় কে?

রাজত্ব বড় না আল্লাহর ক্ষমা বড়? সুলাইমান আ.-এর দুআতে এর উত্তর মেলে। তিনি দুআ করেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রাজত্ব দান করুন (সোয়াদ ৩৫)।

সত্যিই, আল্লাহর ক্ষমার চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। রাজত্ব দিয়ে কী হবে? যদি তার ক্ষমাই না পেলাম!

ওয়া উম্মাতাহ

ঈদের দিন মাকে খুশি করতে ভোজনটা কিঞ্চিত গুরুই হয়ে গেছে। তার ভার বইতে না পেরে লঘু একটা ঘুমের আয়োজন শুরু করেছি, মাথায় একটা শব্দ ঢুকে গেল; মাখায (مخاض)। প্রসববেদনা। সবকিছুরই একটা ভূমিকা আছে। সূচনা আছে। ঘুমের যেমন আছে, প্রসবেরও আছে। মাখায শব্দমূলটা কুরআন কারিমে একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। মারইয়াম আ.-এর ঘটনাপ্রসঙ্গে। মাখায শব্দটার সূত্র ধরে একজনের কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে গুরুভোজনজনিত লঘু ঘুমের আয়োজন স্থগিত হয়ে গেল। আবার উঠে বসলাম। মানুষটা বলেছিলেন,

'উম্মাহর অবস্থা আজ মৃত্যুপথযাত্রীর মতো। পুরো উম্মাহ আজ যেন ধুঁকছে'।

তাকে বলেছিলাম,

'উম্মাহর অবস্থা দেখে অনেকে হতাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চিন্তায় নিমগ্ন। আপনার অবস্থাও তাদের মতো। আমি মনে করি, উম্মাহর এই যে আপাত নড়বড়ে অবস্থা, সেটা মৃত্যুযন্ত্রণা নয়, প্রসববেদনা। শিগগিরই উম্মাহ নতুন কিছুর জন্ম দেবে। হয়তো জন্ম দিয়েও ফেলেছে। আমাদের কাছে এখনো তার সংবাদ এসে পৌছায় নি। অথবা পৌছলেও বুঝে উঠতে সময় লাগছে। (فاستبشروا خيرا) সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, (المحن تولد المنح) সংকট সময় সব সময় সম্পদ দান করে। আরো একটা কথা মনের মণিকোঠায় আচ্ছা করে গেঁথে নিন, (أمة محمد تمرض ولا تموت) উম্মতে মুহাম্মাদ সাময়িকভাবে রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু মরে যায় না। এই উম্মত মরতেই পারে না। কিয়ামত পর্যন্ত হকের ঝাণ্ডা, কুরআনের পতাকা বয়ে নিয়ে যেতে হবে যে।

যীনত

বিশেষ উপলক্ষ্যে উৎসব আয়োজনে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলারও অনুমোদন আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

মুসা বললেন, যে দিন আনন্দ উদ্‌যাপন করা হয় (সজ্জার দিন/ উৎসবের দিন), তোমাদের সাথে সে দিনই স্থিরীকৃত রইল এবং এটা স্থির থাকল যে, দিন চড়ে ওঠা মাত্রই মানুষকে সমবেত করা হবে (ত্বহা ৫৯)।

১. উৎসবের দিন সাজ-সজ্জা চলতে পারে। হারাম কিছু না হলেই হলো। একজন নবীও উৎসবের দিনকে হিদায়াতের দাওয়াতের ক্ষেত্র হিশেবে গ্রহণ করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা কুরআনে এর বিপরীতে কিছু বলেন নি। হাদিসেও নিরুৎসাহিত করা হয় নি। বরং পোশাকের ব্যাপারে বাড়তি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৩. শুধু তা-ই নয়, আরেক আয়াতেও বিশেষ সময়ে সাজ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে, তখন শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে (আ'রাফ ৩১)।

৪. যীনত (زِينَة) শোভা বা সৌন্দর্য শব্দটা কুরআন কারিমে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ১৯ বার এসেছে। আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলাও যীনত পছন্দ করেন। এবং এই যীনত তিনি বান্দাকে নিয়ামত হিশেবেই দান করেছেন।

৫. কুরআন কারিমে যীনত অবশ্য শুধু পোশাকি সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আকাশ-জমিন, গবাদিপশু-ধনসম্পদের সৌন্দর্কেও আল্লাহ তাআলা যীনত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬. বাহ্যিক শোভা গ্রহণ করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। খারাপ কিছু না হলে কুরআন কারিম মানুষের মৌলিক চাহিদা ও স্বভাবজাত বিষয়কে অনুমোদন দিয়েছে।

জ্ঞানসরোবর

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যারা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ধারণ করতেন, তাদের জন্যে আমীরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রা. অবশ্যই শীর্ষে থাকবেন। বর্তমানে ঈমান ও কুফর, দ্বীনি বুঝের মানদণ্ড, তাফাক্কুহ ফিদ্দীনের মানদণ্ড হিশেবে গ্রহণ করার জন্যে উমার রা.-এর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আর হতে পারে না। উমার রা. ইলম ও প্রজ্ঞার তিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।

ক. কুরআন কারিম।

খ. নবীজি সা.

গ. আবু বকর রা.।

উমার রা. বলেছিলেন,

احذروا الفرس فأنهم غدرة مكرة

তোমরা পারস্যবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তারা (সাধারণত) গাদ্দার ও ধোঁকাবাজ হয়।

তিনি শহীদ হয়েছেনও এক পারসিকের হাতে। শী'য়ারা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে উমারকে। আজ তার উক্তির সত্যতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যে আজ যে সমস্যা, তার অন্যতম কারণও সেই 'পারস্য'।

আদব ও কৃতজ্ঞতা

(এক)

হুদহুদ সংবাদ নিয়ে এল। ইয়ামানে এক নারী শাসক আছে। সুলাইমান আ. রানির কাছে দ্বীনের দাওয়াত পাঠালেন। গ্রহণ না করলে যুদ্ধের হুমকি দিলেন। রানি ছিলেন ভীষণ বুদ্ধিমান আর বিবেচক। শাসক হিশেবেও যোগ্য ছিলেন বোঝা যায়। তিনি সুলাইমান আ.-এর ডাকে সাড়া দিলেন। এদিকে সুলাইমান ঘোষণা দিলেন,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

ওহে দরবারিগণ! কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে তারা বশ্যতা স্বীকার করে আসার আগেই আমার কাছে তার সিংহাসন নিয়ে আসবে? (নামল৩৮)।

এই উদাত্ত আহ্বানে প্রথমে এক জিন সাড়া দিয়ে বলল,

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি সেটি আপনার কাছে নিয়ে আসব। নিশ্চয় আমি এ কাজে সক্ষম, (এবং আমি) বিশ্বস্তও বটে।

জিনের কথা শেষ হওয়ার পর, কিতাবের ইলমধারী আলিম বললেন,

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ

আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনার সামনে এনে দেব (নামল ৪০)।

একথা বলতে না বলতেই সিংহাসন হাজির। ইয়ামান থেকে কুদসের দূরত্ব কম নয়। রাজধানী সানা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দূরত্ব প্রায় ২০৪১ কিলোমিটার। ১২২৪ মাইল। এত দূর থেকে কীভাবে এতবড় এক সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এমন অবিশ্বাস্য কীর্তি দেখে, সুলাইমান আ. বলে উঠলেন,

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ!

(দুই)

যুলকারনাইন বিশ্বপরিক্রমায় চলতে চলতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন। সেখানকার অধিবাসীরা আবেদন করল,

يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেব, যার বিনিময়ে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন? (কাহফ ৯৪)।

যুলকারনাইন কোনও বিনিময় গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তাদের কথার জবাবে বললেন,

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, সেটাই (আমার জন্যে) শ্রেয়। সুতরাং তোমরা (তোমাদের হাত-পায়ের) শক্তি দ্বারা আমাকে সহযোগিতা কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব (৯৫)।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। যে লক্ষ্যে বানিয়েছিলেন, সেটাও সফল হলো,

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

(এভাবে প্রাচীরটি নির্মিত হয়ে গেল) ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ না তাতে চড়তে সক্ষম হচ্ছিল আর না তাতে ফোকর বানাতে পারছিল (৯৭)।

এতবড় একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর একটুও আত্মতৃপ্তিতে ভুগলেন না। তিনি সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে বললেন,

هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي

এটা আমার রবের রহমত (যে, তিনি এ রকম একটা প্রাচীর বানানোর তাওফিক দিয়েছেন)।

একজন আল্লাহর নবী।

আরেকজন আল্লাহওয়ালা শাসক।

দুজনেই কৃতিত্বের পর আল্লাহর দিকে রুজু করেছেন।

নিজেকে আড়াল করে আল্লাহ তাআলাকে সামনে রেখেছেন।

রাব্বে কারিমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছেন।

একজন বলেছেন,

এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ!

আরেকজন বলেছেন,

এটা আমার রবের রহমত!

আমি কি রাব্বে কারিমের প্রতি মুহূর্তে শোকরগুজার থাকি?

বাধা ও সান্ত্বনা

দ্বীনের কাজ করতে গেলে বাধা আসবে। সমালোচনা আসবে। গালি-গালাজ আসবে। প্রতিবন্ধকতা আসবে।

وَيَضِيقُ صَدْرِي

আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে (শু'আরা ১৩)।

এটা মুসা আ.-এর কথা। নিজের জিহ্বার জড়তা, ফিরআনের ভয়, লোকজনের টিটকারি ইত্যাদির কথা মনে করে, তার অন্তর সংকুচিত হয়ে আসছিল।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

নিশ্চয় আমি জানি তারা যে সব কথা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয় (হিজর ৯৭)।

কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে, হাসি-মস্করায়, বিরোধিতায় নবীজি সা.-এর অন্তরও সংকুচিত হয়ে আসতো। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

বিরোধিতার মুখে অন্তর সংকুচিত হয়ে আসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। নবীগণও এ থেকে মুক্ত নন। তাদের অন্তরও যদি সংকুচিত হতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের মানসিক অবস্থা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকব। বিরোধিতার মুখে, অন্তর দমে যাওয়া, অন্তর কুঁকড়ে যাওয়া, খারাপ কিছু নয়। মানুষ মাত্রই এমন হতে পারে। হয়েও থাকে। খারাপ হলো, মনের সংকুচিত অবস্থাকে আমলে নিয়ে অবশ্যকর্তব্য ভুলে যাওয়া। নিজের কাজকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ছুতো ধরা।

শত্রু আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চাইবে, আমাকে হতোদ্যম করতে চাইবে। আমি দমবার পাত্র হব কেন? নবীগণ বিশেষ করে আমাদের নবীও কাফিরদের কথা ও আচরণে মানসিকভাবে অস্বস্তি বোধ করেছেন। কিন্তু কাজের গতিতে বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নি। আমিও আমার কাছে ছেদ পড়তে দেব না, ইনশাআল্লাহ। কাজ করছি স্রেফ আল্লাহর জন্যে, তাহলে কেন থমকে যাব।

হকের তালাশ

কয়েকজন একসাথ হলেই ঘুরেফিরে আলোচনা নির্দিষ্ট একটি বা দুটি বিষয়ে চলে আসে। অথবা আমাদের কেউই আলোচনাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিয়ে যায়। সেদিন একভাই বললেন,

'এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, হক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। আর ময়দানের মেহনতে সঠিক দল ও মতে পৌছতে পারা তো রীতিমতো দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

এবং আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম হয়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে কতক (এখনও) জালিম। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হিদায়াতের পথ খুঁজে নিয়েছে (জিন ১৪)।

হক এক দুর্লভ বস্তু। সহজে ধরা দেয় না। সারা জীবনব্যাপী সাধনার বিষয়। এজন্য প্রতিনিয়ত হকের তালাশে থাকা জরুরি। হকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। আল্লাহ তাআলা শব্দটাও তেমন ব্যবহার করেছেন।

তাহাররি

তাহাররি (التحري) কোনও কিছুর অনুসন্ধানে দৃঢ় সংকল্প করে, তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। হিদায়াত অনুসন্ধানের বস্তু, এমনি এমনি আসে না। শুধু নামকাওয়াস্তে মুসলমান হলেই বাঁচার নিশ্চয়তা নেই। হকের রূপ সব সময় একরকম থাকে না। হকের অবস্থানও সব সময় এক দলে থাকে না। পালাবদল ঘটে। আমি নিজেকে একটা দলের সাথে বেঁধে রাখলাম, আর ভাবলাম আমি হক দলের সাথেই আছি, এটা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপদ সিদ্ধান্ত নয়। পছন্দের দলে বা গোষ্ঠীতে আছি, তারা যেদিকে যায় আমিও সেদিকে যাই। তারা যা করে, আমিও তা-ই করি। এমন সিদ্ধান্ত প্রথম যুগের জন্যে নিরাপদ হলেও, শেষ যুগের জন্যে যথাযথ নয়। আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিষয় নিয়ে ভাবতে পারি।

১. সবকিছুকে খাইরুল কুরুনের মাপকাঠিতে ফেলে মাপা। আমি দ্বীন মানার সুবিধার্থে নতুন যে পন্থা উদ্ভাবন করেছি, সেটাকে বিদাত বলা না গেলেও, এখনো সেটার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

২. সাহাবায়ে কেরামের তাযকিয়ায়ে নাফস হতো তিনটি মাধ্যমে,

ক. কুরআন তিলাওয়াত তাদাব্বুর ও তদনুযায়ী আমলের মাধ্যমে।

খ. নবীজি সা.-এর সাহচর্য ও তাঁর সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে।

গ. ময়দানের আমলে।

আমি কি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছি? আমি এই তিন তরিকার সব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি নাকি একজন পীর বা বুজুর্গের কাছে বাইয়াত হওয়াকেই তাযকিয়ায়ে নাফসের জন্যে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকছি? এমনকি হাতের কাছে কুরআন কারিম থাকা সত্ত্বেও শুধু পীরসাহেব প্রদত্ত 'তাসবিহ-তাহলীল-ওযীফা' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছি? কুরআন শরিফ উল্টেও দেখছি না?

৩. আমি কি কুরআন কারিমকে পাশে রেখে দ্বীনি কিতাবাদি নিয়েই বেশি সময় কাটাচ্ছি? প্রশ্ন উঠতে পারে, দ্বীনি কিতাবাদি তো কুরআন কারিমেরই ব্যাখ্যা। জি, তা ঠিক। সেসব কিতাবাদি পড়তে কেউ নিষেধ করছে না। সরাসরি কুরআনের জন্যে আমি কতটা সময় ব্যয় করছি? বুঝে হোক না বুঝে হোক? অথবা দ্বীনি কিতাবাদির পাশাপাশি কতটা সময় সরাসরি কুরআন নিয়ে বসছি?

৪. আমি যে দল বা ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত, তারা যে বিশেষ পরিস্থিতিতে গঠিত হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি এখনো বিরাজমান আছে? আমার অনুসৃত দল, বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে আত্মরক্ষামূলক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিল, এখনো কি সেই বিশেষ পরিস্থিতি আছে? এখনো কি আগের কর্মপন্থায় থাকা জায়েয হবে?

৫. হক দল বদল করে। দল বদল করা মানে, হকের চর্চা ও প্রচার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসা। যেমন,

ক. আমি আগে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে (শামেলির) ময়দান থেকে সাময়িকের জন্যে পিছু হটে মাদরাসার চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভবিষ্যতের প্রস্তুতির সুবিধার্থে। শত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের প্রস্তুতি শেষ হয়নি?

খ. ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে দাওয়াতের যে নিরাপদ পন্থা বের করেছিলাম, মুসলিমবান্ধব পরিবেশেও সেটাকেই যথেষ্ট মনে করছি কেন? আরও বাড়তি কিছু করার কি দরকার নেই?

গ. বিশেষ কারণে রাজপথে মিছিল মিটিং জনসভা প্রতিবাদ সভা করে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এটা সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত পন্থা? প্রায় শত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমরা কেন রাজপথ থেকে উতরে গিয়ে 'সরাসরি জান্নাতের পথে' অগ্রসর হতে পারলাম না?

ঘ. আগে যেভাবে ময়দানের মেহনত চলতো, নতুন কেউ এসে আরো আপডেট পন্থায় মেহনত শুরু করলে, আমি কি পুরোনোকে ছেড়ে নতুনকে আঁকড়ে ধরতে পারি? নাকি দলীয় গোঁ ধরে বসে থাকি?

৬. শেষ কথাটা হলো, আমি যে দল বা ফিরকার সাথেই থাকি, একটা বিষয় কষ্ট করে হলেও মেনে নিতে পারলে ভালো,

'আমি যে দলের সাথে আছি, তারা হক। ঠিক আছে। কিন্তু দ্বীনের প্রতিটি শাখায় তারা খাইরুল কুরুনের পন্থায় মেহনত করছে, এমন নাও হতে পারে। আমি তালিম ও তাযকিয়ার ক্ষেত্রে আমার দলের সাথে থাকলাম, কিন্তু দাওয়াত ও কিতালের ক্ষেত্রে অন্য কোনও দল আমার দলের চেয়ে এগিয়ে থাকলে তাদের সাথে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মেহনতে শামিল হতে আপত্তি থাকবে কেন?

৭. সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি কেন দল ও ফিরকা ও হিজবিয়্যার উর্ধ্বে উঠে একজন 'মুসলিম' হতে পারছি না? সব গলি কানাগলি বাদ। আমার পরিচয় আমি মুসলিম। খাইরুল কুরুনের মতো? পারবো? সম্ভব?

পাতা ফাঁদ

সবাই নিজেকে কত চালাক মনে করে। কঠোর হস্তে হকপন্থিদেরকে দমন করে। হককে গায়ের জোরে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায়।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ

এবং তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং (এই টানা-হ্যাঁচড়ার ভেতর) স্ত্রীলোকটি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল (ইউসুফ ২৫)।

১. ইউসুফ আ. ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজিজের স্ত্রী মরিয়া হয়ে তাকে ঠেকাতে উদ্যত হলেন। পেছন থেকে ঝাপটে ধরার জন্যে জামা ধরে টান দিলেন।

২. শক্তিমত্তায় মহিলাটিও কম ছিলেন না। ইউসুফ আ. দৌড় দিলেন। মহিলাও পিছু পিছু দৌড় দিলেন। নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই ধরে ফেললেন। আরেকটু আগে বেড়ে বলতে গেলে, ইউসুফের চেয়ে মহিলাটির দৌড়ের গতি বেশি ছিল। নইলে ধরে ফেললেন কীভাবে? ইউসুফ আ. শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। মরিয়া হয়ে সর্বোচ্চ শক্তিতে দৌড়াতে থাকা একজন সুস্থ-সবল যুবককে দৌড়ে ধরে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়।

৩. রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছেন ইউসুফ। জামা-কাপড়ও নিশ্চয় ভালো ভালোই পরবেন। মহিলার হ্যাঁচকা টানটাতে কতটা শক্তি থাকলে একজনের জামা ছিঁড়ে যায়?

৪. বাতিল যত শক্ত কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন, কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করেই ফেলে। মহিলার দৌড়ের যে গতি ছিল, তাতে ইউসুফকে পুরোপুরি জাপটে ধরে ফেলা সম্ভব ছিল। কিন্তু মহিলা শেষ মুহূর্তে বোধ হয় কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। মানুষটাকে পুরোপুরি বাগে পাওয়ার আগেই জামা ধরে থামাতে চেয়েছিলেন।

৫. হককে দমন করতে গিয়ে বাতিল যে পন্থা অবলম্বন করে, ঠিক সেই পন্থাটাই বাতিলের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছেঁড়া জামাটাই মহিলার বিরুদ্ধে মূল প্রমাণ হিশেবে দাঁড়িয়ে গেল। নিরীহ মানুষগুলোর দিকে ছোড়া লক্ষ লক্ষ বুলেটগুলোই একদিন জালিমের দিকে বুমেরাং হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

৬. বাতিল এক সময় না এক সময় দুর্বল হয়েই যায়। তার কৌশল আর গৃহীত পন্থাই তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহর পরামর্শ

গতকাল আমরা সূরা হুদ পড়েছি। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা নবীজি (ﷺ)-এর পাশাপাশি মুমিনগণকেও পরামর্শের আদলে কিছু হুকুম দিয়েছেন।

(এক) ইস্তেকামত বা অবিচল থাকার ওসিয়ত করেছেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

সুতরাং (হে নবী!) আপনাকে যেভাবে হুকুম করা হয়েছে, সে অনুযায়ী আপনি সরল পথে স্থির থাকুন (১১২)।

(দুই) সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تَطْغَوْا

আর আপনারা সীমালঙ্ঘন করবেন না (১১২)।

(তিন) জুলুমের দিকে ঝুঁকতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

তোমরা জালিমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না (১১৩)।

(চার) সালাত কায়েমের হুকুম!

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

এবং (হে নবী!) সালাত কায়েম করুন (১১৪)।

(পাঁচ) সবরের উপদেশ!

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

এবং সবর অবলম্বন করুন। কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না (১১৫)।

আগে চারটা উপদেশ দিয়ে, সবার শেষে দিয়েছেন সবরের উপদেশ। পাশাপাশি উপরের কাজগুলোকে সৎকর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সৎকর্মশীলদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রতিদানের আশ্বাস দিয়েছেন।

সুখপাখি

খাইর বা কল্যাণ পাখির মতো। পাখি আকাশে ওড়ে। উন্মুক্ত আকাশে। ডানা মেলে। তারপর নেমে আসে। পছন্দসই গাছ পেলে, জুতমতো বসে। দুদণ্ড জিরিয়ে

নেয়। আরেকটু ভালো লাগলে সে গাছে বাসা বোনে। খাইর বা কল্যাণও এমনই। কাউকে উপযোগী মনে হলে তার কোলে এসে ধরা দেয়।

إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে, তোমাদের থেকে যে সম্পদ (ফিদইয়াস্বরূপে) নেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন (আনফাল ৭০)।

আলোচনা চলছিল বদর যুদ্ধে বন্দিদের সম্পর্কে। বন্দিদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তাআলার এই আয়াত। মুক্তিপণের বিনিময়ে তারা ছাড়া পেয়েছিল।

কেউ কেউ আত্মরক্ষার্থেও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে থাকতে পারে। তাই বাস্তবেই যদি খাসদিলে কেউ ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে বিনিময়ে অনেক বেশি দান করবেন।

বন্দিদের মধ্যে নবীজি সা.-এর চাচা আব্বাস রা.-ও ছিলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। কুরাইশের চাপে যুদ্ধে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আব্বাস রা. বলেছেন,

'আমি মনে মনে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। আমাকে জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে'।

নবীজি বললেন,

'আপনি বন্দি হয়েছেন, আপনাকে মুক্তিপণ দিতে হবে। সাথে সাথে আপনার ভাতিজা আকিল ও নাওফালের মুক্তিপণও আপনাকে দিতে হবে'।

আমি এত টাকা কোথায় পাবো?

'আপনি চাচিজান (উম্মুল ফজল)-এর কাছে গোপনে যে অর্থ রেখে এসেছেন, সেটা দিয়ে দেবেন'।

আব্বাস রা. যারপরনাই অবাক হলেন। এ টাকাগুলোর কথা তিনি আর স্ত্রী ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। তার আর কোনও সন্দেহ রইল না, ভাতিজা সত্যি সত্যি আল্লাহর নবী! পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উচ্চারণ করলেন,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল।

পরবর্তী সময়ে আব্বাস রা. বলতেন,

'আমি মুক্তিপণ (ফিদইয়া) হিশেবে যা দিয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি দিয়েছেন।'

আমার কলব যদি বিশুদ্ধ হয়, আল্লাহর কল্যাণ লাভ করার উপযুক্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর কল্যাণের ভান্ডার থেকে উপচে দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার কাছে খাইর (কল্যাণ) তলবের আগে আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখা জরুরি, আমি সে কল্যাণ লাভের উপযুক্ত কি না! মেহমান আসার আগে ঘরদোর গোছাতে হবে না?

সাবাত। অবিচলতা

(এক) আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা ফিতনা এসে হানা দেয়। প্রলোভন এসে ফুসলাতে থাকে। হকের উপর টিকে থাকা কঠিন। আমি এখন হিদায়াতের উপর আছি, নেক আমল করতে পারছি, এ-নিয়ে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। যে-কোনও মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে:

فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا

পরিণামে (কারও) পা স্থিত হওয়ার পর পিছলে যাবে (নাহল : ৯৪)।

আল্লাহ তাআলা বলেন নি 'টালমাটাল' হয়ে যাওয়ার পরে পা পিছলে যাবে। তাহলে ব্যাপারটাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বলা হয়েছে পা স্থিত হওয়ার পরও পিছলে যেতে পারে। গা শিউরানো কথা। সর্বান্তঃকরণে সব সময় আল্লাহর কাছে সাবাত (الثبات) বা স্থিতাবস্থার জন্যে দুআ আবশ্যক। নইলে কখন কীভাবে পা হড়কে যাবে, টেও পাব না।

সাবাত বা হিদায়াতের উপর স্থির থাকার উপায় কী? বেশি বেশি ওয়াজ-নসিহত শোনা? নেককারদের সোহবত উঠানো? সমাধান কুরআনেই আছে,

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتًا

তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হতো এবং তা (তাদের অন্তরে) অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হতো (নিসা ৬৬)।

তার মানে, ওয়াজ শুনলেই হবে না, ওয়াজ অনুযায়ী আমলও করতে হবে। তবেই 'সাবাত' আসবে। কাজ লাগবে। শুধু কথা শুনে ফল পাওয়া যাবে না। একজন আলিমকে প্রশ্ন করা হলো,

'অমুকের আমল নষ্ট হয়ে গেছে। নামাজ-কালাম ছেড়ে দিয়েছে'।

'সে আমল করার সময় হয়তো দুটি কাজ করে নি'।

'সেই দুটি কাজ কী কী'?

‘প্রথমত, সে হয়তো আল্লাহর কাছে ‘সাবাত’ কামনা করে নিয়মিত দুআ করে নি’। দ্বিতীয়ত, হয়তো সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে নি’।

‘কীসের শুকরিয়া’?

‘সে যে আমল করতে পারছে, হিদায়াতের উপর মুস্তাকিম (অবিচল) আছে, তার শুকরিয়া’।

আমি আমল করতে পারছি, আমি হিদায়াতের উপর আছি, তার মানে এই নয়, আমি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, আমি হিদায়াতের যোগ্য। বরং হিদায়াতের উপর থাকা, আল্লাহর খাস রহমতেই সম্ভব হয়। যে-কোনও মুহূর্তে আমি এই রহমতের বাগডোর থেকে ছিটকে পড়তে পারি।

আমি আমার আমল দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে যাব না। ইবাদত করতে পারছি দেখে, অহমিকায় ভুগবো না। যারা পথহারা হয়ে আছে, তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাব না। মনে রাখব, আল্লাহর খাস রহমত না হলে, আমার অবস্থাও আজ তার মতো হতো,

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতে (বনী ইসরাঈল : ৭৪)।

আশ্চর্য, আমাদের পেয়ারা নবী পর্যন্ত নিরাপদ নন। তাকেও আল্লাহ তাআলা ধরে ধরে ঠিক পথে রাখেন। তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

আমার যদি ধারণা হয়, ভালো কাজ করা, হজ-যাকাত পালন করা, আমার কৃতিত্ব, তাহলে আমার সামনে বড় বিপদ ওত পেতে আছে। যেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ইস্তেকামত বা অবিচলতার জন্যে আল্লাহর সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী, আমার অবস্থান কোথায়?

ফিতনার সময় সাবাত বা অবিচলতা অর্জনের উপায় কী? অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, পাঁচটি উপায় বের করেছেন,

(এক) কুরআন কারিম।

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ

আমি এরূপ করেছি এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে আপনার অন্তর মজবুত রাখার জন্যে (ফুরকান ৩২)।

কাফিররা সমালোচনা করে বলত, কুরআন কারিম পুরোটা একবারেই নাজিল করা হয় না কেন? এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা কথাটা বলেছেন। কুরআন কারিম ধীরে

ধীরে নাজিল করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নবীজির মনকে স্থির রাখা। সাবিত রাখা। অবিচল রাখা। এখনো কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে, হকের উপর অবিচল থাকা সহজ হবে।

(দুই) সিরাত পাঠ ও নবীগণের ঘটনা (কাসাস) পাঠ করা। তাহলে হকের উপর সাবিত থাকা যাবে।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

(হে নবী) আমি আপনাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরে শক্তি জোগাই (হুদ ১২০)।

বিগত নবীগণের জীবনী পাঠ শুধু আমাদের মতো সাধারণের জন্যেই নয়, নবীজির জন্যেও উপকারী ছিল। নবীজির সাবাতের জন্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

(তিন) ইলম অনুযায়ী আমল করা।

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হতো এবং তা (তাদের অন্তরে) অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হতো (নিসা ৬৬)।

(চার) দুআ করা।

يا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ على طاعَتِكَ

হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার আনুগত্যে অবিচল রাখুন।

(পাঁচ) সাহচর্য বা সৎসঙ্গে থাকা।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় (কাহফ ২৮)।

নবীজিকেও হুকুম করা হচ্ছে, ভালো মানুষদের সাথে লেগে থাকতে। সাহাবিদের সাথে সময় কাটাতে। তাহলে ভালো হবে। নবীজি স.-এর যদি সৎসঙ্গ আবশ্যক হয়, আমার জন্যে ফরজ।

নবীগণ মাসুম। নিষ্পাপ। গুনাহমুক্ত। তবুও তারা সব সময় আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। অজান্তে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে যায় কি না, আশঙ্কায় থাকতেন,

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ

সালিহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে তাঁর নিজের কাছ থেকে আমাকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করে থাকেন, আর তারপরও আমি তার নাফরমানি করি, তবে এমন কে আছে, যে আমাকে তাঁর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? সুতরাং তোমরা (আমার কর্তব্য কাজে বাধা দিয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আমাকে আর কী দিচ্ছ? (হুদ ৬৩)।

১. সালেহ আ. নবী হয়েও বলছেন, (إِنْ عَصَيْتُهُ) আমি যদি তার নাফরমানি করি। ভয়ে ভয়ে থাকতেন। আমাদের নবীজি সা. কী বললেন?

قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

বলে দিন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে (আনআম ১৫)।

২. হুবহু একই কথা পুরো কুরআন কারিমে তিনবার আছে। আনআম ১৫। ইউনুস ১৫। যুমার ১৩। তার মানে নবীজি সব সময়ই এই ভয় করতেন।

৩. নবীগণ (معصية) অবাধ্যতা ও নাফরমানি নিয়ে এত শঙ্কিত থাকতেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কেমন শঙ্কিত আর সতর্ক থাকা উচিত?

চাওয়া-পাওয়া

১. এ কেমন কথা! স্বামী নেই, তবুও গর্ভে সন্তান এসে গেল! এখন কী হবে? সমাজে মুখ দেখাব কী করে? মারইয়ামের ভাবনা ছিল হয়তো এমনই। এমনই তো হওয়ার কথা।

২. পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন ছিল, তিনি না বলে থাকতে পারলেন না,

يَٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

হায়, আমি যদি এর আগে মারা যেতাম? আমি যদি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যেতাম (মারইয়াম ২৩)।

৩. যে শিশুর কারণে মৃত্যু কামনা করেছিলেন, সে শিশুই মারইয়ামের যাবতীয় সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪. যে কঠিন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে হয়েছিল, সেই কঠিন সময়টাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মারইয়ামের জন্যে প্রকৃত জীবনের সূচনা।

৫. আমি কেন কঠিন সময়ে এতটা বিচলিত হয়ে যাই? রাব্বে কারিম হয়তো আমাকে পরীক্ষা করছেন। রাব্বে কারিম হয়তো আমার কোনও দোষের শাস্তি দিচ্ছেন। দুটোই তো আমার জন্যে নতুন এক সূচনার দুয়ার খুলে দেবে।

বর্ণচোরা

১. কিছু গিরগিটি ইচ্ছেমতো রঙ বদল করতে পারে। গাত্রবর্ণ পাল্টে গাছের বাকল, সবুজপাতার আড়ালে, শিকারের আশায় ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে।

২. মনুষ্যসমাজেও গিরগিটি আছে। তারা খোলস পাল্টে সবার সাথে বাস করে। বনী ইসরাঈলে এমন একজন গিরগিটি ছিল। তার নাম 'সামেরী।

৩. এই গিরগিটিগুলো সবার সাথে মিলেমিশে থাকে। মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় থাকে। ঝোপ বুঝে কোপ মারে,

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ

আল্লাহ বললেন, তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলেছি আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে (তোয়াহা ৮৫)।

৪. এতদিন সামেরীর কোনও আলোচনাই ছিল না। মুসা আ. যেই তুর পাহাড়ে গেলেন, সে মাথাচাড়া উঠে ভেসে উঠল। স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

৫. কুরআন কারিমে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে মুসা আ.-এর কথা। দীর্ঘ আলোচনায় সামেরী নেই। যখনই গোমরাহির প্রসঙ্গ এল, সামেরী আলোচনার শীর্ষে চলে এল।

৬. মদীনায় বহু মুনাফিক ছিল। সামেরী ছিল বনী ইসরাঈলের মুনাফিক। মুসা আ.-এর প্রবল প্রতিপত্তি দেখে মুখে মুখে ঈমান এনেছিল।

৭. বর্তমানেও সমাজে এমন বহু সামেরী আছে। তারা নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। টুপি-দাড়িও রাখে। হজে যায়। নামাজে প্রথম কাতারে থাকে। পহেলা বৈশাখে, পূজা-পার্বণে নিজেদের আসল রূপ জানান দেয়।

৮. নতুন সামেরীদের কেউ যৌবনে বাম আন্দোলনে যুক্ত ছিল। কেউ অমুসলিম দেশ থেকে 'উচ্চডিগ্রি' অর্জন করে এসেছে। সাথে করে এনেছে 'কুফর', সাথে

এনেছে নিফাক, সাথে এনেছে ইসলাম সম্পর্কে নানা সন্দেহ-সংশয়। ঝামেলা এড়াতে এসব ভ্রান্তি নিয়েই মুসলিম পরিচয়ে সমাজে থাকে।

৯. সামেরীরা কখন মাথাচাড়া দেয়? যখন নবীগণ থাকেন না। নবীগণের ওয়ারিস থাকেন না তখন।

১০. নবীর ওয়ারিসগণের উচিত কখনোই সমাজ থেকে অনুপস্থিত না থাকা। সমাজের নিজেদের সরব সক্রিয় উপস্থিতি বজায় রাখা। কোনও সমাজে পাপের সয়লাব হওয়ার মানে হলো, সে সমাজে আলিমগণ যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ফিতনা

অনেক সময় এমন হয়, আমার আশেপাশে গুনাহের নানা উপকরণের ছড়াছড়ি হয়ে যায়। হাত না বাড়াতেই একশো একটা গুনাহের মাধ্যম মুহূর্তেই এসে হাজির হয়ে যায়। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এক অশনিসংকেত।

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

আমি তাদের পরীক্ষার্থে তাদের কাছে একটি উট পাঠাচ্ছি (কামার ২৭)।

১. কওমে সালেহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে উটনি পাঠিয়েছিলেন। তারা আল্লাহর এই নিদর্শন (উটনি)-কে সম্মান করে নাকি অসম্মান করে।

২. কওমে সালেহ উটনিকে মেরে ফেলেছিল। তারপর তাদের উপর গজব নাজিল হয়েছিল।

৩. আমি চারপাশে গুনাহের সহজলভ্য উপকরণ দেখে লাফিয়ে উঠব না। সতর্ক হয়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা গুনাহের উপকরণকে অনেক সময় (فِتْنَة) ফিতনা বা পরীক্ষাস্বরূপ পাঠিয়ে থাকেন। আমি কোন পথে চলি সেটা যাচাই করার জন্যে।

৪. দুষ্টবন্ধু বা বেদ্বীন স্বামী বা স্ত্রীও কিন্তু ফিতনা। বন্ধু বা জীবনসঙ্গী যেমনই হোক, আমাকে আল্লাহর পথেই চলতে হবে। তাদের প্ররোচনায় পড়া চলবে না। আমাকে ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেল করা চলবে না।

৫. মোবাইল-টিভি-ল্যাপটপ কেনার টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে? এগুলো সালেহ আ.-এর উটনির মতো ফিতনা হয়ে যাবে না তো?

তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টা

তাওয়াক্কুল মানে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার অর্থ এই নয় হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ

আর সে (মুসার আম্মু) মুসার বোনকে বলল, শিশুটির একটু খোঁজ নাও (কাসাস ১১)।

১. আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জোরদার মেহনতও চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল আমাকে লক্ষ্য অর্জনের পথে মেহনতে শক্তি জোগাবে। অলস হয়ে ঘরে বসে থাকলে ভাত জুটবে না।

২. বারবার মায়ের উৎকণ্ঠামাখা ফোনে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা মায়েদের এভাবেই তৈরি করেছেন।

৩. মুসা আ.-এর মাকে আল্লাহ তাআলা সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন, তার ছেলেকে ফের তার কোলে ফিরিয়ে দেবেন। তারপরও মুসা আ.-এর মা মেয়েকে পাঠিয়েছেন, ছেলের খোঁজ করার জন্যে।

৪. তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি চেষ্টা—এটাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

শেষ চাওয়া

১. আবু জাহলের শেষ চাওয়া কী ছিল? তার গর্দান কাটার সময় যেন একটু লম্বা রেখে কাটা হয়। যাতে কাটামুণ্ডটা অন্যদের তুলনায় উঁচু হয়ে থাকে। নেতা নেতা ভাব ফুটে ওঠে। মরার পরও তার ঠাঁটবাঁট বজায় রাখতে চেয়েছিল। কুফর তার মধ্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল!

২. আর একজন নবীর শেষ চাওয়া কী ছিল? মাত্র দুটি চাওয়া,

ক. ইয়া রাব্বা! আমাকে মুসলিম হিশেবে মৃত্যু দান করুন (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا)।

খ. আমাকে মৃত্যুর সালেহীনের সাথে যুক্ত করে দিন (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)। সূরা ইউসুফ ১০১।

৩. আমার শেষ চাওয়া কী? ভেবে দেখেছি কখনো? আবু জাহলের মতো নয় নিশ্চয়? তাহলে এখনকার কাজগুলো নবীর মতো হচ্ছে? সারা জীবন আবু জাহলের মতো কাজ করে শেষটা নবীর মতো হওয়ার দু'আ কীভাবে করি?

৪. যাই হোক, আল্লাহ চাইলে সবকিছু করতে পারি। আমি যেমনই হই, আমি চাইব আমার শেষটা যেন নবীওলা হয়। আমার মৃত্যুটা যেন ঈমানের মৃত্যু হয়।

৫. আমি যতই দুনিয়া কামাই। যত টাকা-পয়সাই রুজি করি, যত আশাই পূরণ করি, ইউসুফ আ.-এর মতো সুন্দর শেষ চাওয়ার চেয়ে সুন্দর কিছু কি হতে পারে?

বাবা মারা গেছেন? মা মারা গেছেন? ভাইবোনও? আদরের সন্তান নিখোঁজ? মনে রাখতে হবে, এমনটি শুধু আমার নয়, পৃথিবীর শুরু থেকে এ-পর্যন্ত অনেকের বেলাতেই এমন ঘটনা ঘটেছে। আমিই প্রথম নই, আমিই শেষ নই। ইয়াকুব আ. সবচেয়ে প্রিয় সন্তান হারিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। নিরাশ হয়ে পড়েন নি। আশায় আশায় ছিলেন। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে গেছেন।

একদিন এল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন, যার প্রতীক্ষায় ইয়াকুব জীবনের বৃহৎ একটি অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন। দূর থেকেই চিরচেনা সেই ঘ্রাণ পেয়ে গেলেন। কত্ত আগে ঘ্রাণটুকুর ছোঁয়া নাকে পেয়েছিলেন। আজ এতকাল পর আবার। স্বগতোক্তি করলেন,

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ

তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি (ইউসুফ ৯৪)।

পরিস্থিতি কেমন দাঁড়িয়েছিল? ইউসুফকে পাওয়ার আশা করাটাই হয়ে পড়েছিল দুরাশা। আশেপাশের লোকজন শতভাগ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ইউসুফকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ইউসুফের আলোচনা করাটাও ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার। এমন পরিস্থিতিতে তার ঘ্রাণ পাওয়ার কথা বলা কেমন, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহর নবী নিরাশ হয়ে পড়েন নি

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ

তারপর যখন সুসংবাদবাহী এসে সে (ইউসুফের) জামা তার (ইয়াকুবের) চেহারার উপর ফেলে দিল, অমনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল (৯৬)।

আল্লাহর রহমতের উপর আস্থার পরিমাণ কেমন হতে হবে? এককথায় অবিশ্বাস্য রকমের আস্থা থাকতে হবে। আশেপাশের সকলের কাছে যা অসম্ভব আল্লাহর কাছে তা অতি নগণ্য এক ব্যাপার।

কুরআনি ভাবনা

১. কুরআনের মর্যাদা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. রমাদান মাসেই কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আব্বাসী খলিফার চাবুকের ক্রমাগত আঘাত সইতে না পেরে একেকদিন বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এমন অবিশ্বাস্য নির্যাতনের মুখেও কুরআনের সম্মান রক্ষার দাবি থেকে একবিন্দু পিছু হটেন নি। রোজাও ভাঙেন নি। আমি কী করছি? টেনেটুনে একপারা তিলাওয়াত করছি? অথচ তাঁরা দিনে রাতে দুই খতম দিতেন।

২. অনিদ্রা রোগ

এক আরব খ্রিস্টানের সরল স্বীকারোক্তি,
আপনি সব সময় এত হাসিখুশি কীভাবে থাকেন?
আমি প্রতিদিন শোয়ার আগে একটা কাজ করি।

কী কাজ?

ভালো করে গোসল করে কুরআন খুলে কয়েকটা 'ভার্স' বাইবেলের মতো সুর করে করে পড়ি। আগে আমার অনিদ্রা রোগ ছিল, একজন 'দরবেশ' আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন রাতে আমার গভীর ঘুম হয়। আগে আমি বিষণ্ন রোগে ভুগতাম। এখন দিনের পর দিন আমার একবারও খারাপ হয় না।

অথচ মাসের পর মাস চলে যায়, আমি একবারও কুরআন কারিম খুলে বসি না।

৩. আল্লাহকে চেনা

সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ সর্বোৎকৃষ্ট সর্বোপকারী ইলম হলো, আল্লাহকে চেনার ইলম। আল্লাহকে চেনার ইলম অর্জনের অব্যর্থ কার্যকরী পদ্ধতি হলো:

ক. কুরআন কারিমের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করা।
খ. সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুব দেওয়া।

৪. বুঝে পড়া

কুরআন কারিম পড়ার সময় বোঝার চেষ্টা করা। আরবি না জানলেও অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো হলেও অর্থটা অনুভব করার চেষ্টা করা। কুরআন পড়া মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। তখন মনকে সব চিন্তা থেকে অবমুক্ত করে নিলে

অফুরন্ত লাভ। আমি আল্লাহর কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আল্লাহ তো আমার কথা বুঝতে পারছেন। আমি যে তাঁরই কথা উচ্চারণ করছি। আমার এই না-বোঝা আবৃত্তি শুনে তিনি কি খুশি না হয়ে পারেন? আমাকে তাঁর নৈকট্য দান না করে পারেন?

৫. অফুরন্ত শক্তি

কুরআন কারিমের প্রতিটি আয়াতই অফুরন্ত শক্তির আধার। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করলে, বারবার একই আয়াত পড়তে থাকলে, মনের দুঃখ দূর হয়। যাবতীয় দুশ্চিন্তা উবে যায়। জীবন ও কর্মে প্রভূত বরকত আসে। আমরা চর্মচক্ষে এসব বরকত দেখতে পাই না। আল্লাহ তাআলা আমাদের অগোচরেই নানাবিধ বরকতে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে দেন। নবীজি সা. একটা আয়াত পড়ে পড়েই সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

৬. মূল্যায়ন

কুরআন কারিম নিয়ে মুসলিম-অমুসলিম-নির্বিশেষে মনীষীগণ নানারকম মন্তব্য করেছেন। যে যার বুঝ মতো মতামত প্রকাশ করেছেন। ভালোলাগার অনুভূতি জানিয়েছেন। এসব মন্তব্য ও অভিব্যক্তিগুলো খুঁজে খুঁজে পড়লে কুরআন কারিমের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নতুন করে বাড়তি ভালোবাসা জন্মায়।

৭. আল্লাহর প্রতি দরদ

বাবা-মা, বিবি-বাচ্চার প্রতি আমার কেমন দরদ, সেটা মাপা যায়। তার গভীরতা অনুমান করা যায়। আচরণ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, যাপিত জীবন দিয়ে। আল্লাহর প্রতি আমার ভালোবাসা কতটা গভীর, সেটাও মাপা যায়। কুরআন কারিমের প্রতি আমার ভালোবাসা কতটা গভীর, সেটা দিয়ে।

৮. ধনভান্ডার

কুরআন কারিম হলো ধনভান্ডারের মতো। কাউকে বিশাল এক ধনভান্ডারের চাবি দিয়ে যদি বলা হয়, তোমার যত ইচ্ছা দুহাত ভরে হীরা-জহরত-মণিমুক্তা নিয়ে নাও। মানুষটা দু'হাত ভরে নিবেই, কসরত করে গিলেও কিছু মুক্তা নিয়ে আসতে চাইবে। আঁশ না মেটা পর্যন্ত ধনভান্ডার ছেড়ে একচুলও নড়তে চাইবে না।

কুরআন কারিম ইলমের মণি-মুক্তায় ভরপুর। তবুও কুরআন নিয়ে বসতে মন চায় না। বসলেও কখন উঠব তার জন্যে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চোখ যায়। বারবার হাই ওঠে। নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা মনে পড়ে যায়। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টোটা।

৯. হিদায়াত

রাব্বে কারিম অনেক সময় অনীহ বান্দাকেও হিদায়াত দিয়ে দেন। এমন অনেক ঘটনা আছে, কুরআন কারিমের ভুল বের করার নিয়তে কুরআন নিয়ে বসেছে। দুয়েক আয়াত পড়েই হিদায়াতি বুঝ পেয়ে গেছে। জাহান্নাম নিতে এসে জান্নাত নিয়ে ফিরে গেছে।

১০. নিয়ামত

সব সময় কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন। কুরআন কারিম নিয়ে গবেষণা করেন। কুরআন কারিম-বিষয়ক বিশাল বিশাল গ্রন্থ লিখেন। সারা জীবন কুরআন কারিম নিয়ে কাটিয়েছেন। এমন মানুষও কিন্তু হিদায়াত থেকে দূরে থাকতে পারেন। মৃত্যুর সময় কালিমাহীন থাকতে পারেন। হিদায়াত এক আজিব নিয়ামত।

১১. প্রলোভন

শয়তানের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় হলো, আমার কুরআন কারিম নিয়ে বসা। শয়তান তার সর্বশক্তি ব্যয় করে আমাকে কুরআন কারিম থেকে দূরে সরাতে। নানা সুন্দর সুন্দর বিকল্প সামনে রাখতে থাকে। আমার মতো দুর্বল বান্দারা সেইসব প্রলোভন এড়াতে পারে না। ফাঁদে পড়ে যায়।

১২. কুরআনের প্রভাব

কুরআন কারিম তিলাওয়াত করলে স্বভাবে কোমলতা আসে।
কুরআন কারিম হিফজ করলে মর্যাদা বুলন্দ হয়।
বিষণ্ন মন নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করলে অল্পক্ষণেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।
কুরআন কারিমের সাথে লেগে থাকলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।
কুরআন কারিমকে কলবে স্থান দিলে?
সে কলব থেকে দুনিয়া বের হয়ে যায়।
সে কলবে সুখ-সৌভাগ্য এসে বাসা বাঁধে।
সে কলবওলার জীবনে বরকতের বান ডাকে।
ধন্য হোক, কুরআন দ্বারা পূর্ণ হৃদয়, কুরআন দ্বারা সজ্জিত হৃদয়।
ইয়া রাব্ব, আমাদেরকে এমন মানুষের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১৩. ঈমানখেকো

আমাদের কথা হচ্ছিল দোকলাম আর চিকেন নেক নিয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম, দৈনিক পত্রিকার, অনলাইন পোর্টালের প্রায় সব খবরই তার নখদর্পণে থাকে। দোকলাম অঞ্চল নিয়ে চীন-ভারতের দ্বৈরথ, দার্জিলিংয়ের চিকেন নেক নিয়ে ভারতের থরহরি কম্পমান অবস্থা, মার্কিনি গুয়াম ঘাঁটিতে হামলার জন্যে উত্তর

কোরীয় 'রাজার' হুমকি, সবই তার নখদর্পণে। কিন্তু বিশটা মিনিট কুরআন কারিমের জন্যে ব্যয় করার ফুরসত মেলে না। কখনো সালাতও পিছিয়ে যায়। মিডিয়া এক প্রচণ্ড ঈমানখেকো দানবে পরিণত হয়েছে।

১৪. কিয়ামুল লাইল

কিছু মানুষ থাকে, তাদের সাথে কথা বলতে দাঁড়ালে কোন ফাঁকে সময় পেরিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। গত পরশু বিশ্বরোডের পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুরু হলো। ঈশার পর থেকে। কোন ফাঁকে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, আল্লাহই ভালো জানেন। একই জায়গায় সাড়ে বারোটা বাজার রেকর্ডও আছে। এই বিশেষ 'কিয়ামুল লাইলে'(!) খুব বেশি মানুষ থাকে না।

যত বিষয় নিয়েই আমাদের কথা হোক, শেষ মুহূর্তে এসে কুরআন কারিমে ঠেকবেই। সেদিনও তা-ই হলো। কালও একই অবস্থা। প্রতিবারই তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন,

তিলাওয়াত কেমন চলছে?

এবার আমিই প্রশ্ন করলাম,

'তিলাওয়াতের তাওফিক কেমন হচ্ছে'?

আসলে কুরআন কারিম নিয়ে যতই সময় কাটানো হোক, গবেষণা করে কাগজের বিশাল স্তূপ দিয়ে ফেললেও তিলাওয়াতের বিকল্প কিছুই নেই। বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেই হবে। এটার মতো শক্তিশালী আমল আর কিছু নেই। তিলাওয়াত মানে হলো, ডিরেক্ট কল। ডাইভার্ট কল নয়। প্রতিবার আমাদের এই বিশেষ 'কিয়ামুল লাইলের' পর তিলাওয়াতের মান ও পরিমাণ বেড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

১৫. নারীর শক্তি

একজন নারীর কতটা শক্তি? দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে? না না, টিভি মিডিয়া বা ফেসবুকের কথা বলছি না। ঘরে থেকেই একজন নারী কতটা দ্বীনের কাজ করতে পারে? প্রশ্নটা যখনই জাগে, সাথে সাথে একটা শে'রও পাশাপাশি মুখে চলে আসে।

তু মী দা-নী কেহ সূজে কেরাআতে তূ

দিগরগোঁ করদ তাক্দীরে উমার রা।

শে'রটা প্রায়ই মাথায় ঘোরে। আল্লামা ইকবাল মরহুমের চিন্তাগুলো বড়ই অদ্ভুত। যেদিকে কারো দৃষ্টি যায় না, তার দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে ঠিক সেখানে হাজির হয়।

বোনের কুরআন পড়া, কুরআন শিক্ষার প্রতি দরদ, কুরআনের শিক্ষার প্রতি অবিচল আস্থা দেখে উমার ঈমান এনেছিলেন। এ-ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেই আল্লামার স্বগতোক্তি,

তুমি তো জানই তোমার তিলাওয়াতে কতটা শক্তি।
উমারের মতো মানুষের তাকদিরই বদলে দিয়েছে।

১৬. মুফাসসির

দ্বীন সম্পর্কে জানার একটা পর্যায়ে গিয়ে কারো কারো মধ্যে কিছু বিচ্যুতি দেখা দেয়। তাদের মধ্যে মুফাসসির বা মুহাদ্দিস হওয়ার শখ জাগে। মুফাসসির হতে গিয়ে নিজের বুঝ মতোই কুরআন ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দেয়। ভেবে দেখে না, আমি যা বলছি, সেটা সালাফের মানহাজ অনুযায়ী হচ্ছে তো? নাকি কুরআন থেকে গায়ের জোরে যুগোপযোগী সমাধান বের করতে গিয়ে খোদ নিজেই উৎকট এক জীবন্ত সমস্যায় পর্যবসিত হচ্ছি?

১৭. মুজিযা

কুরআন কারিম খোদ একটি 'মুজিযা'। শুধু তা-ই নয়, পাশাপাশি মুজিযার জন্মদানকারীও বটে। কুরআনের সংস্পর্শে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য মুজিযা। কুরআন কারিমের উপর আমল করে অনেক মানুষ আল্লাহর ওলি হয়েছেন। সেই ওলিগণের হাত দিয়ে অনেক 'কারামত' মানে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। এটা কুরআনেরই বরকত।

পার্থক্য হলো, নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া অলৌকিক ঘটনাকে 'মুজিযা' বলে। ওলি-বুজুর্গের হাত দিয়ে প্রকাশ পাওয়া অলৌকিক ঘটনাকে 'কারামত' বলে। কুরআন কারিম এতই প্রভাবশালী কিতাব, শুধু ঈমানদার নয়, একজন কাফিরও উপকৃত হতে পারে।

(হাকীমুল উম্মতের মালফুযাত অবলম্বনে)

১৮. পকেটে কুরআন

পকেটের মধ্যে কুরআন কারিম নিয়ে ঘোরাফেরা করলেই সবকিছু হয়ে যাবে—এমনটা নয়। নিজের আখলাকের মধ্যে একটা আয়াত নিয়ে ঘোরাটা অনেক বড় কিছু।

১৯. কুরআনের ধুলো

একটা বাক্য পড়লাম, ভেতরে বড়সড় একটা ধাক্কা লাগল। বাক্যটি হলো,

'তুমি তোমার মোবাইলে ধুলো পাবে না। কিন্তু কুরআনের ওপর ঠিকই ধুলো জমে থাকতে দেখবে'।

আসলেই যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে তুমি ধরে নাও, তুমি বান্দার সাথে সম্পর্কস্থাপনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ। অবহেলা করছ আল্লাহর সাথে সম্পর্কস্থাপনকে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাক্যটা পড়ার সাথে সাথেই মোবাইল এবং কুরআন উভয়টার প্রতি চট করে নজর দিলাম। হায় হায়, কুরআনের ওপর ধুলোর হালকা স্তর জমে আছে,

ইয়া আল্লাহ!

২০. তিলাওয়াতের তাওফিক

সবারই মনে ইচ্ছা থাকে, প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করার। যদি সে পরিমাণ তিলাওয়াত প্রতিদিন না হয়, বা করা হলেও মনের ওপর জোর খাটিয়ে করতে হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে,

কোনও গুনাহ আমার কলবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মলিন করে ফেলেছে। পাপের এ মলিনতা-কলুষতাই আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বাধা দিয়ে রাখছে।

২১. সৌভাগ্যের উৎস

আমরা কত কত জায়গায় সৌভাগ্যের সন্ধান করি, অথচ যাবতীয় সৌভাগ্যের উৎস অযত্নে, অবহেলায়, ধুলোমলিন অবস্থায় বইয়ের তাকে, পড়ার টেবিলের এক কোণে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে।

আমরা নিশ্চয় বুঝে গেছি সেটা কী?

'আল-কুরআন'।

২২. কুরআনি চিকিৎসা

মানসিক রোগের জন্যে যত বড় ডাক্তারের কাছেই যাই, কুরআন কারিমের একটি আয়াত আমার মনকে যতটা শান্তি দিতে পারবে, সুখ দিতে পারবে, দুনিয়ার তাবত ডাক্তার মিলেও তা পারবে না।

২৩. আল্লাহর রজ্জু

কুরআন কারিম একটা রশির মতো। এর একটি দিক আল্লাহর হাতে, আরেক দিক আমার হাতে। আমি যত বেশি রশিটা ধরে থাকবো, ততবেশি আল্লাহর সাথে জুড়ে

থাকতে পারবো। আমি যত বেশি রশিটা ঢিল দেবো, তত বেশি আমি গোমরাহির অতল গহ্বরে পতিত হতে থাকব।

শুধু ধরে থাকলেই হবে না, শক্ত করে ধরতে হবে। কারণ এই রশির অদৃশ্য একটি টান আছে। আমাকে আস্তে আস্তে টেনে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে। যেমন তেমন করে ধরে থাকলে, আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবো। কোনও উন্নতি হবে না।

২৪. প্রয়োজন পূরণ

কুরআন কারিম সবার জন্যে। সবার প্রয়োজন মেটায়।
ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে তিলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
ভয় দূরীভূত করার জন্যে তিলাওয়াত করলে ভয় দূর হয়।
দুঃখ-শোক দূরীভূত করার জন্যে তিলাওয়াত করলে দুঃখ-শোক দূর হয়।
আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির জন্যে তিলাওয়াত করলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

২৫. কুরআনের ভালোবাসা

যে জন্মগতভাবে বোবা, সেও চায় সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে। মায়ের পেট থেকেই বধির হয়ে এসেছে, সেও গভীর আশায় প্রহর গোনে, আল্লাহর কালাম শুনবে। জন্মান্ধ ব্যক্তিও মনে মনে সুপ্ত বাসনা পোষণ করে, কুরআন কারিমকে একটু নিজ চোখে দেখবে। আমার চোখ আছে, আমার বাকশক্তি ঠিক আছে, আমার দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে। আমি কী করছি? আমাকে কি আমার মোবাইল গ্রাস করে নিয়েছে?

২৬. সংবিধান

কুরআন কারিম আল্লাহর দেওয়া সংবিধান। মানবজাতির সংশোধনের জন্যে তিনি নাজিল করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের জন্যে। আমি কোন দলে থাকবো?

কুরআন কারিম অনুসারীদের দলে?
কুরআন কারিম অমান্যকারীদের দলে?

আমি যদি প্রথম দলে থাকি, তাহলে শান্তিতে দুনিয়ার জীবন কাটাতে পারবো, আখিরাতে সফলদের কাতারে শামিল হবো।

২৭. শোকহরা

বিষণ্ণচিত্তে যখন কুরআন কারিম তিলাওয়াত করতে বসি, একটু পর মনে হতে থাকে, কুরআনের আয়াতগুলো আমার কলবের চারপাশে ঘুরছে। কলব জড়িয়ে ধরছে। আহত হৃদয়ের উপর উপশমের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আয়াতগুলো মুখ

লাগিয়ে হৃদয় থেকে সমস্ত দুঃখ-শোকের বিষ চুষে নিচ্ছে। কাজ শেষে বলছে, কোনও সমস্যা নেই, সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

কী চমৎকার এক কিতাব আমাদের এই কুরআন।

২৮. এ<u>কের ভেতর অনেক</u>

একটি সূরা একই সাথে কত কিছু:

কুরআনি ইলমের আধার।

তিলাওয়াত।

জিকির।

দুআ।

রুকইয়া। ঝাড়ফুক। জাদুটোনানিরোধক।

হিসন। সুরক্ষা।

যখনই সম্ভব হয়, একবার পড়ে নিতে পারি সূরা ফাতিহা। সূরাটা সবারই মুখস্থ আছে। ছোটও আছে। সময়ও বেশি লাগে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়া যায়। মন খারাপ থাকলে পড়া যায়। বিপদ এলে পড়া যায়। কোনও কারণ ছাড়াই পড়া যায়। এমনিতেই পড়া যায়।

২৯. আত্মীয়তা

কুরআন কারিমের আয়াতগুলো নিয়ে ভাবলে মনে হয় আমি আর সাধারণ কেউ নই, সরাসরি আল্লাহর সাথে আমাকে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এই অনুভূতি সবারই হয়। আমরা ভিন্ন হলেও আল্লাহ তো একজন। কুরআনও সেই একটাই। এটাই শেষরক্ষা।

৩০. <u>কুরআনের বাগান</u>

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর একজন ছাত্রের নাম রবি বিন সুলাইমান। উস্তাদের কাছে প্রশ্ন করলেন,

সততা ও আত্মশুদ্ধি কীভাবে অর্জন করতে পারি?

তুমি বা তোমার ভাই-বেরাদর যারই সততা-চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা করবে, তাকে কুরআনের বাগানে ছেড়ে দেবে। তাতে বিচরণ করতে দেবে। কুরআনের সাথে কিছুদিন থাকলে, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, আল্লাহ তাকে সংশোধন করে দেবেনই।

৩১. <u>হৃদয়ে কুরআন</u>

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন দিকটা বেশি খেয়াল রাখবো?

তুমি প্রতিদিন কতটুকু তিলাওয়াত করো?
এক পারা করে।

তাহলে একটা বিষয় লক্ষ রাখবে: তুমি তিলাওয়াত করতে করতে সূরা বা পারার কোন জায়গায় পৌঁছতে পারলে, সেটার হিশেব না রেখে, বরং কুরআন কারিম তোমার হৃদয়ের কোথায় গিয়ে পৌঁছলো, তার হিশেব রাখা শুরু করো! কাজ দেবে।

৩২. জিহাদ ও জিহায

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. যখনই কুরআন কারিম হাতে নিতেন, অশ্রুসিক্ত চোখে কুরআন কারিমকে সম্বোধন করে বলতেন,

জিহাদই আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আহ, কুরআন থেকে দূরে থাকার কত সুন্দর আর চমৎকার অজুহাত। দূরে থাকাই বা বলি কী করে? জিহাদ করাও তো কুরআনের সাথেই থাকা। কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করা। কিন্তু আজ আমরা 'জিহায'-এর কারণে কুরআন থেকে যোজন-যোজন দূরে। পার্থক্য শুধু একটা হরফের: 'দ' ও 'য'।

জিহায অর্থ সরঞ্জাম। সামগ্রী। অর্থাৎ মোবাইল-কম্পিউটার-ল্যাপটপ-টিভি।

৩৩. কুরআনের ছোঁয়া

কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও কুরআন কারীম চর্চা মানুষকে উদার আর মুক্তহস্ত করে দেয়। কুরআনের ছোঁয়ায় একজন মানুষ হয়ে পড়ে অন্তহীন আকাশের ন্যায় উদার। মুক্ত বাতাসের ন্যায় অবাধ। নবীজি সা.-ও কুরআনের ছোঁয়ায় মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেশি উদার আর মুক্তহস্ত হয়ে উঠতেন (বুখারী)।

কৃপণকে বেশি বেশি কুরআনের ছোঁয়ায় নিয়ে আসতে হবে। যে কোনও মানসিক রোগীকে কুরআনের ছায়ায় নিয়ে আসতে হবে। মন খারাপ থাকলে কুরআনের আলোয় আসতে হবে।

৩৪. আয়াতের মিল

কুরআন কারিমের প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি মিলপূর্ণ আয়াত বা আয়াতাংশ থাকে। শব্দের সংখ্যায় মিল থাকে। বাক্য গঠনে মিল থাকে। অনেক সময় অন্ত্যমিলের দিক থেকেও অদ্ভুত রকমের মিল থাকে। একটু নমুনা দেখা যাক:

প্রথম পৃষ্ঠা:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

وأولئك هم المفلحون

তৃতীয় পৃষ্ঠা:

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়, প্রতি পৃষ্ঠার সাদৃশপূর্ণ দুটি আয়াতে অর্থগত মিলও আছে। দুটিকে সামনে রেখে তাদাব্বুর-তাফাক্কুরেরও ব্যাপক অবকাশ আছে। সব পৃষ্ঠায় এই নিয়ম খাটবে কি না বলতে পারছি না, নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। মিলে গেলে আলহামদুলিল্লাহ, না মিললে, নাউযুবিল্লাহর কিছু নেই।

৩৫. মনের ওষুধ

কী ব্যাপার, মন খারাপ করে বসে আছ যে?
সংসার-সমাজের চাপ?
একটু ভেবে কারণটা বলো তো?
নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই, মাঝেমধ্যে মন কেন যেন বিষণ্ন হয়ে থাকে।

সঠিক উত্তর দাও নি। সাচমুচ বাতাও, আমি আজ ইস্তেগফার করি নি। কুরআন তিলাওয়াত করি নি।

৩৬. অবিশ্বাসী মুসলিম

তিউনিসিয়ার সদ্যপ্রয়াত প্রেসিডেন্ট আলবাজী সাবসি। তার মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেল একলোক বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে। অথচ সাবসী ক্ষমতায় থাকাকালে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, 'তিউনিসিয়ার সাথে ইসলাম ও কুরআনের কোনও সম্পর্ক নেই'।

নারী ও পুরুষ সমান মিরাস পাবে, এই বিষয়ে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর আর সুস্পষ্ট। মুসলিম নারীকে কাফির পুরুষ বিয়ে করতে পারবে, কুরআনবিরোধী এই আইনেও সাবসীর ধর্মবিরোধী অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। যে জীবিত অবস্থায় কুরআন মানে নি, যদি তাওবা না করে মারা যায়, কুরআন পাঠে তার কী উপকার হবে?

৩৭. আক্ষেপ

১. হায়, আমি যদি জীবনটা শুধু কুরআনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতাম।

-সুফিয়ান সাওরি রহ.

২. আমার, আমাদের মধ্যেও একসময় এই আক্ষেপটা প্রবল হয়ে উঠবে। ইশ, দুনিয়ার সব বাদ দিয়ে শুধু কুরআন ও হামিলে কুরআনকে নিয়ে কেন ব্যস্ত থাকলাম না।

৩৮. সংশোধন

১. আহলে কুরআন যদি সংশোধিত হয়ে যেত, সব লোক আপনা-আপনিই সংশোধিত হয়ে যেত।

-মায়মূন বিন মুহরান রহ.

২. কুরআন হলো উম্মুল কিতাব। সমস্ত কিতাবের মূল। কুরআন মেনে চলা মানে, সমস্ত জ্ঞানের মৌলিক অংশকে মেনে চলা।

৩. আহলে কুরআন বা কুরআন শিক্ষাদানকারীগণও নবীজি সা.-এর প্রকৃত ওয়ারিস। তারা ভালো হলে, বাকিরা তাদের ছোঁয়া পেয়ে এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে।

৪. আহলে কুরআন এখন ব্যবহৃত হয়, যারা হাদিস মানে না, তাদের ক্ষেত্রে। হাদিস শরিফে আহলে কুরআন বলে বোঝানো হয়েছে, যারা কুরআনে হাফেজ। যারা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করে, তাদের।

৩৯. ওসিয়ত

১. একলোক উবাই বিন কা'ব রা.-কে বললেন,

'আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন'।

আল্লাহর কিতাবকে ইমাম হিশেবে গ্রহণ করো, আল্লাহর কিতাবকে কাজি ও হাকিম হিশেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাও। কুরআন ও সুন্নাহকেই তোমাদের রাসুল তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেছেন। কুরআন তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী। কুরআন তোমাদের জন্যে নিরঙ্কুশ মাননীয়। কুরআন সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী। কুরআনে আছে তোমাদের আলোচনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আলোচনা। কুরআনে আছে তোমাদের বর্তমান জীবনের বিধি-বিধান। কুরআনে আছে তোমাদের সংবাদ-বৃত্তান্ত। তোমাদের পরবর্তীদের বৃত্তান্তও আছে।

২. কুরআন কারিম হলো পুরো মানবজাতির দর্পণ। কুরআনেই আছে সব সমস্যার সমাধান। কুরআনের ছোঁয়া পেয়েই মৃত কলব জীবিত হয়। কুরআনের প্রভাবে মানবজাতির গতি-প্রকৃতি সংশোধিত হয়।

৪০. হুদান-লিন্নাস

কুরআন কারিম নাজিল শুরু হওয়ার পর, প্রায় পনেরোশ বছর পার হয়ে গেছে। আজও কুরআন প্রথম দিনের মতোই 'হুদান লিন্নাস' আছে। কিয়ামত পর্যন্ত একই রকম (هُدًى لِّلنَّاسِ) মানবজাতির জন্যে হিদায়াতস্বরূপ থেকে যাবে।

৪১. মুকাল্লিদ

মানুষ প্রথমে কুরআন ছেড়ে হাদিসের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপর হাদিস ছেড়ে ইমামগণের বক্তব্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপর ইমামগণের বক্তব্য ছেড়ে 'মুকাল্লিদদের' রীতিনীতির দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপর কিছু মুকাল্লিদের মতো অন্ধ তাকলিদ ছেড়ে জাহেল ও তাদের ভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয়েছে। এভাবেই একটি উম্মত তাদের শক্তি হারিয়ে বসেছে।

-শায়খ গাযযালী রহ.।

৪২. কুদসিয়া

১. কুদসের সবচেয়ে যে বিষয়টা বেশি টানে, তা হলো 'কুদসিয়া' বোনদের কুরআনি হালকা। যায়নবাদী দখলদার ইয়াহুদিদের শত নির্যাতন কাঁদানে গ্যাস, লাঠির আঘাত, গুলি, কিছুই 'কুদসিয়া' বোনদের দমিয়ে রাখতে পারে না। তারা আল্লাহর কালাম নিয়ে অহর্নিশি মশগুল 'মুনহামিক' (বুঁদ) হয়ে থাকেন।

২. এদের দেখলে, বুকের ভেতরে কেমন এক চিনচিনে গিবতা (ঈর্ষা?) অনুভব করি। কী এক আলোময় জীবন তাঁদের।

৪৩. আরিফ বিল্লাহ

কুরআন কারিম 'বুস্তানুল আরিফীন'। আল্লাহকে যারা চিনতে চান, যারা আল্লাহকে চেনার পথে বের হন, তাদেরকে 'আরিফ' বলা হয়। কুরআন কারিম আল্লাহকে চেনার শ্রেষ্ঠতম বুস্তান। বাগান। এই বাগানে আল্লাহকে চেনা যায়। এই বুস্তানের প্রতিটি ফুলে আল্লাহকে চেনার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এই বাগানের প্রতিটি লাইনে আল্লাহকে জানার 'রঙ' পাওয়া যায়। এই বাগানে আল্লাহকে পাওয়ার তরিকা পাওয়া যায়।

৪৪. কুরআন সম্প্রচার

সেদিন কুয়েতের আমির মারা গেলেন। কুয়েতের জাতীয় টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান স্থগিত করে, কুরআন তিলাওয়াত সম্প্রচার করা হয়েছে। কুরআন কারিমকে আজ আমরা মৃত্যুর সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলেছি। অথচ দরকার ছিল উল্টোটা। কুরআন কারিম জীবনের জন্যে। আমি সারা জীবন কুরআনবিরোধী

আচরণ করে, শেষযাত্রায় কুরআন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করলে, কুরআন আমার জন্যে কতটা উপকারী হবে, বলা কঠিন। তারপরও কুরআনে ফিরে আসাও কম কথা নয়। কুরআন কারিম হোক জীবনে ও মরণে।

৪৫. কুরআন-যাপন

গতরাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময়ও কুরআন নিয়ে মশগুল ছিল। স্বপ্নও দেখেছে কুরআন নিয়ে। ঘুম থেকে উঠেও কুরআন নিয়ে বসে পড়েছে। এমন জীবন কতই না বরকতময়।

৪৬. ওসিয়ত

বিয়ের পর আমার ফুপি আমাকে 'ওসিয়ত' করেছিলেন,

'বাবা, যখন তুমি তোমার সন্তানের জন্যে দুআ করবে, সাথে সমস্ত মুসলমানের সন্তানের জন্যেও দুআও করবে। অন্যের সন্তানের জন্যে দুআ করলে, তোমার সন্তানের কল্যাণও আল্লাহ নিশ্চিত করবেন। মুসলমানের সন্তানের ভালো তো একপ্রকার তোমার সন্তানের ভালোর মতোই। কারণ, অন্য মুসলমানের সন্তান ভালো হলে, তোমার সন্তানও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।

ফুপির এই ওসিয়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, হাতেনাতে ফল পেয়েছি।

-ড. ফাহদ সুলতান রুমী

৪৭. হিলিং টাচ

হিলিং টাচ বলে একটা কথা আছে। এটি একটি চিকিৎসাপদ্ধতির নাম। বিশেষ পদ্ধতিতে, শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি স্পর্শের মাধ্যমে নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও নাকি এই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার মাধ্যমে নিরাময় করা যায়। কুরআন কারিমেরও নিজস্ব শক্তিশালী হিলিং টাচ আছে। নিরাময়ী স্পর্শ। এ স্পর্শ শুশ্রূষার। এ স্পর্শ জীবনের। এই স্পর্শ আখিরাতের। এই স্পর্শ জান্নাতের। এই স্পর্শ চূড়ান্ত সাফল্যের।

৪৮. ছায়ানিবিড় বাগান

কুরআন কারিম শীতল ছায়ানিবিড় আরামদায়ক এক বাগান। এই বাগানে চাষাবাদ খুবই সহজ। এই বাগানের ফুল-ফল সবই অতি সুস্বাদু। এই বাগানের প্রতিটি গাছ-ফল-ফুল নিরাময় আর আরোগ্যদানকারী। এই বাগানের ছায়ায় বাস করতে পারা বিরাট সৌভাগ্যের। এই বাগানের ফলমূল কুড়াতে পারা রাব্বে কারিমের অপরিমেয় নিয়ামত। এমন একটি বাগানের মালিক—আমি বলতে গেলে কোনও

বিনিময় ছাড়াই—বনে বসে আছি। আমি বাগানটার ঠিকমতো দেখভাল করছি? বাগানের ফুলের সুবাসে, ফলের রসে নিজেকে রঙিন করতে পারছি তো?

৪৯. <u>আসমানি কিতাব</u>

১. পৃথিবীতে একমাত্র একটি গ্রন্থই আছে, যা বিশ্বের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর পাঠানো সমস্ত আসমানি কিতাবের ইলম ধারণ করে আছে। কুরআন কারিম হলো সেই কিতাব।

২. তাওহিদ ও ঈমানের মূলনীতি আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত এক। সমস্ত নবী ও রাসুল একই তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। পার্থক্য হয়েছে শুধু শরিয়তে। সালাত কয় ওয়াক্ত হবে, সিয়াম কয়দিন রাখবে—এসবের পার্থক্য।

৩. কুরআন কারিম অনুসরণ করা মানে, সমস্ত আসমানি কিতাবের অনুসরণ। পেয়ারা নবীজি সা.-এর অনুসরণ মানে, সমস্ত নবীর অনুসরণ।

৫০. <u>মনমরা ভাব</u>

সারাক্ষণ এমন মনমরা ভাব নিয়ে থাক কেন?

কী করবো, কিছুই ভালো লাগে না। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কথা বলতে মন চায় না। ঘর থেকে বের হতে মন সায় দেয় না।

তুমি সূরাতুল ইনশিরাহ (আলাম নাশরাহ) নিয়মিত পড়তে থাক।

কখন কয়বার পড়ব?

কোনও ক্ষণটন ছাড়াই যখন তখন পড়তে থাক। হিশেব ছাড়া। গোনা ছাড়া।

কিছুদিন পর। হুজুর, আমার অসুখ কেটে গেছে।

কুরআন কারিম হলো 'শিফা' আরোগ্য। উপশম নিকেতন।

৫১. <u>আয়াতুল কুরসি</u>

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়া সুন্নাত। অনেকে পড়িও। আয়াতুল কুরসিখানা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার দ্বারা, অন্তরটা আল্লাহর প্রতি সম্মান সমীহ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি। পুরো আয়াত জুড়ে শুধু আল্লাহর কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহর মৌলিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা আছে। এগুলো নিয়ে চিন্তা-তাদাব্বুর করে ধীরে ধীরে পড়লে, আমার চিন্তা-ফিকিরে পরিবর্তন আসবেই। আমার ঈমান-আকিদাতেও পরিমার্জন আসবে। ফলে আমার কর্মকৌশলেও উন্নতি হবে। ইনশাআল্লাহ।

৫২. গায়েবি সমাধান

এক বুজুর্গ বললেন, যখনই আমার সামনে কোনও সমস্যা আসে, আমি সাথে সাথে কুরআন নিয়ে বসে যাই। সাধ্যানুযায়ী তিলাওয়াত করি। দুআ করি। আল্লাহ তাআলা গায়েবিভাবে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।

৫৩. ধারাবাহিক বরকত

১. একটি আয়াত তিলাওয়াত আমাকে ধীরে ধীরে একটি সূরা তিলাওয়াতের দিকে নিয়ে যাবে। একটি সূরা তিলাওয়াত আমাকে ধীরে ধীরে একটি পারা তিলাওয়াতের দিকে নিয়ে যাবে।

২. একটি লাইন হিফজ (মুখস্থ) করা আমাকে একটি পৃষ্ঠা হিফজের দিকে নিয়ে যাবে। একটি পৃষ্ঠা হিফজ আমাকে একটি পারা হিফজের দিকে নিয়ে যাবে।

৩. আমাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। হিম্মত করে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে শুরু করে দিতে হবে। ব্যস, আর কিছু না।

৫৪. সাবান

১. একেকটি খতম শেষ করে, একেকটি আয়াত শেষ করে, একেকটি সূরা শেষ করে, আমার কি মনে হয়, আমি নতুন জন্ম লাভ করেছি? না হলে, হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করে করে নিজেকে এই স্তরে উন্নীত করা উচিত।

২. একের পর এক আয়াত পড়ার দ্বারা আমার কী উপকার হয়? প্রতিটি আয়াত যেন একেকটি সাবান। প্রতিটি আয়াত আমার কলব ও চিন্তার উপর ঘষা দেয়। যত বেশি তিলাওয়াত, ততবেশি ঘর্ষণ। কুরআনি সাবানের ঘষা খেয়ে খেয়ে একসময় আমার কলবের যাবতীয় ময়লা-দাগ সাফ হয়ে যায়।

৩. কুরআন কারিমের একেকটি আয়াত, অসংখ্য আলোর সমন্বয়। লাল আলো, নীল আলো, সবুজ আলো। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে আমার অন্ধকার কলব নানারঙা আলোয় ঝলমলে হয়ে ওঠে।

৪. আমি জীবন্ত অনুভূতি নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে কুরআনও আমার প্রতি জীবন্ত আচরণ করবে।

৫৫. আসমানি সৌভাগ্য

আমি মনপ্রাণ ঢেলে কুরআন কারিম নিয়ে বুঁদ হলে, কুরআন আমার মনের যাবতীয় যখম সারিয়ে তুলবে। প্রতিটি আয়াত আমার মনের 'ক্ষতে' আরামের পরশ বোলাবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দ আমার ঈমানি দুর্বলতাকে সবল করে তুলবে। আমার মনের আকাশ থেকে গাফলতের মেঘ সরিয়ে নির্মল করে তুলবে। আমি যত

বেশি কুরআনের কাছাকাছি হব, ততবেশি আসমানি সৌভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত হতে থাকবে।

৫৬. কুরআনের জন্যে

১. কুরআন বুঝতে চাইলে, আমাকে আগে আল্লাহর প্রতি যথাসাধ্য প্রণত হওয়া আবশ্যক।

২. হিফজে ও কেরাতে 'ইতকান' বা নৈপুণ্য অর্জন করতে চাইলে, দীর্ঘ সবর ও মেহনত-মুজাহাদা আবশ্যক।

৩. কুরআনের বরকত লাভ করতে চাইলে, সমস্ত সন্দেহ-দ্বিধা ছুড়ে ফেলে বিশ্বাস করতে হবে, কুরআন কারিম সমস্ত ভুলের উর্ধ্বে এক বরকতময় কিতাব।

৪. কুরআনের সাথে মহব্বত কায়েম করতে চাইলে, প্রথমে মানুষের অপ্রয়োজনীয় মহব্বত ত্যাগ করা আবশ্যক।

৫. কুরআনের মজা পেতে চাইলে, তিলাওয়াতের সময় সুর করে করে পড়া আবশ্যক।

৫৭. কুরআনের ছোঁয়া

সালাত, সিয়াম, তাসবিহ, তাহলিল অনেকেই নিয়মিত আদায় করেন। এটা সহজ। কিন্তু আকিদাগত ভ্রান্তিগুলো থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। এদিকটা সহজে নজরে আসে না। এর সহজ সমাধান হলো, কুরআনের সাথে লেগে থাকা। নিয়মিত হিদায়াত লাভের নিয়তে তিলাওয়াত করা। একটু একটু করে বোঝার চেষ্টা করা। উস্তাদের তত্ত্বাবধানে। কুরআনের প্রভাবে আস্তে আস্তে আকিদাগত ভ্রান্তি কেটে যাবে। আল্লাহ তাআলাই একটা রাস্তা বের করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ।

৫৮. কুরআনের ব্যাখ্যা

কুরআনের প্রতিটি আয়াতই আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে। আলোকিত করে। তাই যখনই কোনও আয়াত পড়ার সুযোগ পাই, সৌভাগ্য মনে করে সাগ্রহে পড়ে নিই। অর্থ না বুঝলে, বোঝার চেষ্টা করি। তবে নিজে নিজে ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা না করে, সালাফ ও হক্কানি ওলামায়ে কেরাম কী বলেছেন, আগে সেটা জানার চেষ্টা করি।

৫৯. দিল ও ইলম

আমি কুরআনকে হৃদয়ে স্থান দিলে, কুরআন আমাকে তার হিদায়াতে ধন্য করবে। আমি কুরআনকে আমার আবেগ-অনুভূতি দিলে, কুরআন আমাকে তার ফয়েজ-বরকতে ধনী করবে। আমি কুরআনকে 'দিল' দিলে, কুরআন আমাকে দ্বীন দেবে,

'ইলম' দেবে। আমি কুরআনের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে, কুরআন আমাকে আল্লাহ মিলিয়ে দেবে।

৬০. ভালোবাসা বিনিময়

কুরআন কারিমকে সত্যি সত্যি ভালোবাসলে, কুরআন অবশ্যই জীবনের পরিবর্তন করে, আখিরাতমুখী করে দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেই। আমি কুরআনের ভালোবাসায় পড়লে, কুরআনও আমার ভালোবাসায় পড়বে। আমি কুরআনকে ভালোবাসা দিলে, কুরআনও আমাকে ভালোবাসা দেবে। আমি কুরআনের যত্ন নিলে, কুরআনও আমার যত্ন নেবে।

৬১. হাঁটাচলায় তিলাওয়াত

প্রত্যন্ত গাঁয়ের এক মাদরাসার উস্তাদ প্রতিদিন দরস (ক্লাস) শেষ হওয়ার পর বাড়ি বা জায়গিরমুখী শাগরেদদের বলে দিতেন, তোমরা একজন একজন করে মাদরাসা থেকে বের হও। একসাথে বের হবে না। দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটবে। একসাথে হাঁটলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করবে। পুরো পথ আল্লাহর কালামকে সাথি বানিয়ে নেবে। আগামীকাল আমি হাজিরা নেব, আসা-যাওয়ার পথে কে কত পারা তিলাওয়াত করেছ। এমন উস্তাদের কাছে যারা পড়তে পেরেছে, তাদের জীবন সত্যি সত্যি ধন্য।

৬২. ডিগ্রি

কুরআন কারিম হিফজের সনদ শত শত ডক্টরেট ডিগ্রির চেয়ে বেশি দামি। কুরআন কারিমের একটি আয়াত বুঝেশুনে তিলাওয়াত, দুনিয়ার সমস্ত বই পড়ার চেয়ে দামি।

৬৩. আলোকিত কলব

রমাদান এলে মসজিদে লাইটিং হয়। মসজিদে বাড়তি ঝাড়াপোছা হয়। বাহ্যিক আড়ম্বর-আয়োজনে বেশ সাজসাজ রব দেখা যায়। এসব বাদ দিয়ে কলবের আলোকায়নে মনোযোগী হওয়া জরুরি। মসজিদ নয়, মুসল্লিদের কলবকে ঝাড়াপোছা করা বেশি জরুরি। কলবকে আলোকিত করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো কুরআন কারিম। বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। যতবেশি তিলাওয়াত করব, কলব তত বেশি আলোকিত হবে।

৬৪. স্পর্শ

মিসরের কারারুদ্ধ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি। বন্দি হওয়ার পর পরিবারের লোকদের কাছে বলেছেন,

-'আমি একটি 'মুসহাফ' চেয়েছিলাম। 'তারা' কারাগারে মুসহাফ আনতে দেয় নি। তারা বোধ হয় ভুলে গেছে, আমি কুরআনের হাফেজ। ত্রিশ বছর ধরে মুখস্থই কুরআন তিলাওয়াত করি। আমি 'মুসহাফ' চেয়েছিলাম শুধু কুরআন কারিমকে ছুঁয়ে দেখতে। আল্লাহর কালামের ছোঁয়া পেতে। অনেকদিন আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে দেখতে পারি নি।'

৬৫. কাসাসুল কুরআন

কুরআন কারিমে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা 'কাসাস' (ঘটনা) বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি ঘটনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার হলেও প্রশ্নটা মনে জাগ্রত করা, রাব্বে কারিম কেন এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন? আমি এই ঘটনা থেকে কী শিখতে পারি? উত্তরটা আলিমের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। মনগড়া ব্যাখ্যা বের করা বিপজ্জনক। কুরআন কারিম পড়ার সময় মনে রাখা জরুরি, আমাকে কী বলতে চায় এই কুরআন? এই ঘটনা? এই আয়াত?

৬৬. পরশপাথর

তাওহিদ এমন এক পরশ পাথর, এমন এক সঞ্জীবনী সুধা, যার অণু পরিমাণও যদি গুনাহের পাহাড়ের উপর রাখা হয়, মুহূর্তের মধ্যে গুনাহের পাহাড়কে 'হাসানাত' বা নেককাজে পরিণত করে দেয়।

৬৭. ইস্তেগফার

আকাশে মেঘ জমে। কালো কালো মেঘে গোটা আকাশ ছেয়ে যায়। মেঘমালা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। ইস্তেগফারও আকাশজুড়ে জমে থাকার মেঘের মতো। আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ইস্তেগফার থেকে বান্দার উপর রিজিক বর্ষণ হয়, বরকত বর্ষণ হয়, ক্ষমা বর্ষণ হয়, আনন্দ বর্ষণ হয়, সুখশান্তি বর্ষণ হয়, সন্তান-সন্ততি বর্ষণ হয়, ধন-সম্পদ বর্ষণ হয়, জান্নাত বর্ষণ হয়।

৬৮. খোকার সাধ

বাচ্চাটাকে যেখান থেকেই প্রশ্ন করা হোক, চট করে উত্তর দিয়ে ফেলে। সবাই অবাক,

এই বয়েসেই হিফজুল কুরআনে এমন নৈপুণ্য কীভাবে অর্জন করলে?

বাচ্চাটা হাতা গুটিয়ে রাগ দেখিয়ে বলল,

আমার হুজুর বলেছেন, এই যে শিরা দেখা যাচ্ছে, এটার মধ্য রক্ত চলাচল করছে। জীবনের স্পন্দন জারি রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কুরআন কারিমকেও তনুমনের এমন অপরিহার্য অংশে পরিণত করতে হবে। শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলের মতো, হৃদয়ে-মস্তিষ্কে সারাক্ষণ কুরআন জপতে হবে।

৬৯. চিনি

চিনির মতো আত্মত্যাগ আর কে করে? চিনির মতো অং'রের তরে নিজেকে আর কে বিলিয়ে দেয়? চা-পাতাওলা টগবগে গরম পানিতে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিজে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভালো কাজগুলো এমনই হওয়া উচিত। কুরআনের খেদমতে, দ্বীনের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি আমার সবটুকু দিয়ে কুরআনের খেদমতে লেগে থাকব। আমার কী প্রাপ্য জুটল, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমাদের সালাফগণ এভাবেই দ্বীনের খেদমত করে গেছেন।

৭০. কলব

কুরআন তিলাওয়াত করলে দিলটা নরম হয়?
কুরআনের কোনও আয়াত শুনলে, দিলে শান্তি শান্তি ভাব আসে?
কুরআন দেখলে মনে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়?
কুরআনের মানুষের প্রতি বাড়তি শ্রদ্ধা জাগে?
কুরআনের শাসনের প্রতি নত হতে মন চায়?

তাহলে নিশ্চিত থাকা যেতে পারে, কলব (অন্তর) এখনো কুরআনি হিদায়াত লাভের উপযুক্ত আছে। সময় থাকতেই এই কলবে কুরআন বসানোর কাজ শুরু করে দেওয়া আবশ্যক। নইলে এমন সময় আসবে, কলব পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাবে, কুরআন বসাতে চাইলে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

৭১. চোরাস্রোত

বর্ষা এলে নদ-নদীতে, খাল-বিলে বানের পানি আসে। বর্ষা শেষ হলে বানের পানি নেমে যায়। বানের পানি নেমে যাওয়ার সময় আশেপাশে যা কিছু থাকে, টেনে নিয়ে যায়। সমুদ্রে ও প্রমত্তা নদীর গভীরে চোরাস্রোত থাকে। এই স্রোতের উপস্থিতি বাহির থেকে বোঝা যায় না। এই স্রোতের কবলে পড়লে বড় বড় শক্তিশালী সাবমেরিনও আটকা পড়ে যায়।

কুরআন কারিমেরও এমনই এক টান আছে। এই টান সবাইকে টানে না। জাগ্রত আর সলিম (বিশুদ্ধ) কলবেই শুধু এই টান পড়ে। দেখা যায়, সবাই তুমুল আনন্দে বিভোর, এত হৈ চৈয়ের মধ্যেই কেউ একজন ঘরে, মাদরাসা, মসজিদের এককোণে নিভৃতে বসে বসে কুরআনে ডুবে আছেন। এই মানুষটার কলবে কুরআনের চোরাস্রোতের টান লেগেছে। কুরআন প্রেমের বানের টানে এই লোক ভেসে গেছে। কুরআন কারিমের চোরাস্রোত কি আমাকে কখনো এভাবে টেনেছে? আমি কি কখনো এই স্রোতে ভেসে যেতে পেরেছি?

৭২. চুম্বকের আকর্ষণ

চুম্বকের একধরনের আকর্ষণী শক্তি আছে। আরেকটি চুম্বক আশেপাশে থাকলে নিজের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কুরআন কারিম চুম্বকের মতো। কুরআন কারিমে অবিশ্বাস্য রকমের সম্মোহনী শক্তি রয়েছে। বিশুদ্ধ হৃদয় (কলবে সলিম)-এর অধিকারীরাই শুধু কুরআনের চৌম্বকীয় টান অনুভব করতে পারে। কুরআন কারিম তিলাওয়াত করতে না পারলে, তাদের স্বস্তি লাগে না। কুরআন কারিমের অদৃশ্য আকর্ষণে তারা বারবার কুরআন কারিমের কাছেই ফিরে ফিরে আসে।

৭৩. সারকথা

পুরো কুরআন কারিমের সারকথা;

গাইরুল্লাহর সাথে যাবতীয় সম্পর্ক তুড়ে (ছিন্ন করে), আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে। তাআল্লুক মাআল্লাহ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেওয়াই কুরআন কুরআন কারীমের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

৭৪. হিদায়াত সংগ্রহ

যখনই তিলাওয়াত করতে বসি, তিলাওয়াতের সওয়াবের পাশাপাশি, কিছুটা হিদায়াতও সংগ্রহ করা দরকার। না বুঝে তিলাওয়াত করলে অবশ্যই সওয়াব মিলবে। কিন্তু কুরআন কারিম শুধু সওয়াব অর্জন করার জন্যে নাজিল হয় নি। কুরআন কারিমকে নিছক 'ওজিফার' কিতাব বানানোর জন্যেও নাজিল করা হয় নি। না বুঝলে, অন্তত একটি আয়াত তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসিরসহ পড়তে পারি। বিশ মিনিট না বুঝে তিলাওয়াত করলে, অন্তত পাঁচ মিনিট একটি আয়াতের তরজমা ও তাফসিরের জন্যে ব্যয় করতে পারি।

৭৫. শিক্ষার খনি

কুরআন কারিমে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা, উপমাই বান্দার শিক্ষার জন্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হলো শিক্ষার 'আকর' (খনি)। কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি যুগে নিত্য-নতুন শিক্ষা আবিষ্কৃত হতে থাকবে। কুরআন মূলত আকিদার কিতাব। বিশুদ্ধ আকিদায়ে তাওহিদ শিক্ষা দেয় কুরআন। কুরআন কারিমে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর শেষকথা 'তাওহিদ'। কুরআন কারিমের সব ঘটনা-উপমার শেষ কথা, আল্লাহর দিকে বান্দার প্রত্যাবর্তন। কুরআন তিলাওয়াতকালে সামনে কোনও ঘটনা এসে গেলে, একটু থেমে ভেবে নেওয়া মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা এখানে আমাকে কী বলতে চেয়েছেন?

৭৬. কুরআন শিক্ষাদান

শিশুকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মানে কি শুধু কুরআন পড়তে শেখানো? মনে হয় না। কুরআন পড়া শেখানোর পাশাপাশি কুরআনি গল্পগুলো, কুরআনি শিক্ষাগুলো, কুরআনি আকিদাগুলো শিক্ষা দেওয়াও এর আওতায় পড়বে। কিন্তু কারো কারো মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে বসে গেছে, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মানে শুধু কুরআন পড়তে শেখানো। এটা খণ্ডিত চিন্তা। নবীজির বিখ্যাত হাদিসটাও বোধ হয় আমরা কেউ কেউ খণ্ডিতভাবেই বুঝি।

৭৭. কুরআনি গল্প

শিশুদের কুরআনি গল্প বলতে অনেক সময় দ্বিধা হয়, আমি গুছিয়ে বলতে পারব না, তাই কুরআনি গল্প থাক। অন্য গল্প বলি। ভুল চিন্তা। আমি যতটুকু পারি, ততটুকু কুরআন পৌঁছে দেওয়াই আমার কর্তব্য। যেভাবে আমার সাধ্যে কুলোয়, সেভাবে কুরআন কারিম পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য। গোছানো হোক, অগোছালো হোক, আমি শিশু ও সন্তানদের কাছে কুরআন কারিম পৌঁছে দেব।

৭৮. কুরআনের শক্তি

পৃথিবীর যাবতীয় বই কাউকে পড়তে দিতে একটু না একটু দ্বিধা হয়। বুঝবে তো? ধরতে পারবে তো? একমাত্র কুরআন কারিম ব্যতিক্রম। মুসলিম ও অমুসলিম কাউকে দিতেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। বুঝকে কি বুঝবে না, এ-ব্যাপারেও কোনও দ্বিধা থাকে না। কারণ বুঝবে কি বুঝবে না, সেটা নিয়ে ভাবার দায়িত্ব আমার নয়। আর কুরআন কারিম একমাত্র কিতাব, না বুঝে পড়লেও তার সীমাহীন উপকারিতা। কুরআন কারিমের অদৃশ্য এক অবিশ্বাস্য শক্তি আছে। কুরআন কারিমের ছোঁয়াতেই অনেক কিছু বদলে যায়। আর বুঝে বুঝে পড়লে তো কথাই নেই। প্রতিটি মুমিনেরই কুরআন কারিম বুঝে পড়ার মেহনতে লেগে থাকা কর্তব্য।

৭৯. কুরআনি শৈশব

ছেলেবেলায় মাদরাসায় নুরানিখানায় নিজে নিজে কুরআন কারিম তিলাওয়াতের সময়, একেকজন মরহুম আবদুল বাসেতের চেয়েও বড় কারি হয়ে উঠতাম। সেকি তেজোদীপ্ত তিলাওয়াত। কিন্তু হুজুরের কাছে সবক শোনাতে গেলে, একেকজনের অবস্থা দাঁড়াত, জবেহ করা মুরগির মতো, কোনও রকমে শেষনিশ্বাস নিচ্ছে। মুমূর্ষ। নিস্তেজ।

৮০. আঁকড়ে ধরা

যখন কুরআন কারিমের উপর আমার হাতের কবজা শিথিল হয়ে পড়বে, দুনিয়া ও জীবনের কবজা আমার উপর কঠোর হয়ে চেপে বসবে। যে-কোনও মূল্যে, শত

ব্যস্ততাতেও আমার কবজা যেন কুরআন কারিমের উপর থেকে আলগা না হয়ে পড়ে।

৮১. শুকরিয়া

আমাকে রাব্বে কারিম হিদায়াত দান করেছেন। এই হিদায়াত আমি নিজের যোগ্যতায় অর্জন করি নি। আমার বংশগৌরবের কারণেও অর্জন করি নি। আমার বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্যের কারণেও অর্জন করি নি। আমার কোনও ইবাদত-বন্দেগি বা আল্লাহর প্রতি অনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ লাভ করি নি। এই হিদায়াত খালেস আল্লাহর রহমতে লাভ করেছি। তিনি নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই আমাকে ইসলামের গণ্ডিতে ধরে রেখেছেন। যে-কোনও মুহূর্তে আমার কাছ থেকে হিদায়াতের মহাসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে। এজন্যে কিছুতেই নিজের ইবাদত-বন্দেগি, কর্মকীর্তি নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। সারাক্ষণ হিদায়াতচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় থরহরি কম্প থাকা কর্তব্য।

৮২. ওহির অনুসরণ

আল্লাহ তাআলা ওহি নাজিল করেছেন। ওহির সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা বান্দার জন্যে ফরজ। চোখ বুজে ওহির কথা মেনে নেওয়া, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে ছুড়ে ফেলা নয়, বরং বুদ্ধি-বিবেচনা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। স্রষ্টাই তার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো জানেন। জীবনের শুরুতে বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে গ্রহণ করা কত সিদ্ধান্ত, শেষ জীবনে এসে 'ভুল' মনে হয়, তার হিশেব থাকে না। কিন্তু আল্লাহর পাঠানো ওহির অনুসরণ করে নেওয়া সিদ্ধান্ত কখনোই ভুল মনে হয় না।

৮৩. কুরআনপাঠ

'কুআন কারিম বুঝে বুঝেই পড়তে হবে'

এমন দাবি নিয়ে যারা বেশি উচ্চকিত, তাদের অনেকেই সমাজের নিম্নস্তরে বাস করা মানুষগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা সাধারণত আরামের জীবন কাটিয়ে সুখে-শান্তিতে ইসলামের বাণী প্রচারে অভ্যস্ত। যেখানে বেশিরভাগ মানুষ কুরআন কারিম দেখে দেখেই পড়তে পারে না, সেখানে বুঝে বুঝেই পড়তে হবে—এমন দাবি তোলা যুক্তিসংগত নয়। কুরআন কারিম বুঝে বুঝে পড়া জরুরি, কিন্তু না বুঝে পড়লে কোনও লাভ নেই—এমন কথা বলা একপ্রকার ধৃষ্টতা।

৮৪. নেতিবাচকতা

একটি গাছ থেকে হাজার-হাজার ম্যাচের কাঠি তৈরি হয়। একটি 'কাঠি' দিয়েই হাজার হাজার গাছ জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। একটি নেতিবাচক চিন্তাও এমনই

হাজারো 'আশাকে' জ্বালিয়ে দিতে পারে। কুরআন কারিম যাবতীয় নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। মনে কোনও নেতিবাচক চিন্তা উঁকি দিতে চাইলেই কুরআন কারিম নিয়ে বসে যাওয়া।

৮৫. হিজব/বিরদ

ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেছেন,

-আমি কুরজ আলহারেসি (كرز الحارثي)-র দরবারে গেলাম। দেখলাম তিনি কাঁদছেন। জানতে চাইলাম, কেন কাঁদছেন?

-আমি গতরাতে আমার নির্ধারিত 'হিজব' তিলাওয়াত করতে পারি নি। আমি নিশ্চিত, আমার কোনও গুনাহের কারণেই এমনটা ঘটেছে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া ৫/৭৯)।

৮৬. কুরআনি জগৎ

'বিশ্বজগৎ' আল্লাহ তাআলার নীরব 'কুরআন'।
'কুরআন' আল্লাহ তাআলার সরব 'বিশ্বজগৎ'।

কুরআন কারিম নাজিল করা হয়েছে, আল্লাহকে চেনার জন্যে। বিশ্বজগতে আল্লাহকে চেনার হাজারো নীরব উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কুরআনের আয়াতে, শব্দেও আল্লাহকে চেনার অসংখ্য উপাদান ছড়িয়ে আছে।

৮৭. সুখ

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুখ কি? দুনিয়ার বুকে বান্দার শ্রেষ্ঠ অর্জন কী? আল্লাহর জিকির আর আল্লাহর কালামে মজা পাওয়া। কোনও বান্দা যদি আল্লাহর কালামে মজা পায়, তাহলে বুঝতে হবে, দুনিয়ার সেরা সুখ ও সৌভাগ্য আল্লাহ তাকে দান করেছেন।

৮৮. জিকরুল্লাহ

আল্লাহর তাওফিকই আসল কথা। দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ কী? আল্লাহর জিকির। আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত। কিন্তু সবার ভাগ্যে কি জিকির-তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য জোটে? না, জোটে না। কেন জোটে না? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক আসে না, তাই জিকিরের সৌভাগ্য নসিব হয় না। আমি কি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছি? আমি আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত কি না?

৮৯. কুরআন শোনা

ইসলাম গ্রহণ করার পর, আমি যে-কোনও মূল্যে চেষ্টা করতাম জামাতে হাজির হতে। জামাতে শরিক হলে কুরআন তেলাওয়াত শোনা যায় তাই। আমাকে প্রশ্ন করা হতো,

-আপনি তো আরবি বোঝেন না, তিলাওয়াত শুনে কী লাভ হয়?

-আচ্ছা বলুন তো, শিশু মায়ের কথা শুনে শান্ত হয়ে যায় কেন? সে কেন মায়ের গলার স্বর পেয়ে কান্না থামিয়ে দেয়? সে কি মায়ের কথা বোঝে? আমার অবস্থাও তা-ই। আমি আজীবন এই আসমানি 'স্বরের' ছায়াতলে থাকতে চাই।

-জনৈক নওমুসলিম।

৯০. উপভোগ

আমি দুনিয়ার প্রায় সমস্ত বিলাস উপভোগ করেছি। দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ চেখে দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কালাম নিয়ে একাকী সময় কাটানোর মতো উপভোগ্য কাজ আর কিছু পাই নি।

-শায়খ আলি তানতাবী রহ.।

৯১. গোপনকথা

আমি কাউকে ভালোবাসলে, পছন্দ করলে, তার কাছে নিজের একান্ত গোপন কথা বলি। আমি কুরআন কারিমকে ভালেবাসলে, কুরআন কারিম আমাকে তার 'গূঢ়' মারেফত দান করে। এতে কুরআনের প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। কুরআন কারিম আমাকে যত 'ইলম' দান করে, কুরআনের প্রতি আমার ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে এমন হয়, কুরআন কারিমের সাথে সময় কাটানোর মতো মজা আর কোনও কিছুতে অনুভূত হয় না। অবস্থা দাঁড়ায় এমন, দুনিয়ার সমস্ত মজা-আনন্দ একদিকে, কুরআনের মহব্বত আরেকদিকে।

৯২. আরোগ্য

একজন প্রশ্ন করল, অনেক হাদিসের কিতাবে 'কিতাবুত তিব্ব' নামে একটা অধ্যায় থাকে। কুরআন কারিমে এমন কোনও সূরা নেই কেন?

-কুরআন কারিম পুরোটাই উম্মতের জন্যে শিফা। আরোগ্য। হাদিসের কিতাবে চিকিৎসা-বিষয়ক অধ্যায়গুলোতে সাধারণত শারীরিক আরোগ্য নিয়ে আলোচনা থাকে। কুরআন কারিমের প্রতিটি আয়াত,

ক. আত্মিক রোগ,
খ. চিন্তার রোগ,
গ. সমাজের রোগ,
ঘ. ক্ষেত্রবিশেষে শরীরের রোগও সারিয়ে তোলে।

৯৩. আপডেট

কতকিছুর আপডেট রাখি নিজের কাছে। খেলার আপডেট, শেয়ার বাজারের আপডেট, লেটেস্ট মডেলের আপডেট, লেটেস্ট ভার্শনের আপডেট, হলি-বলি-টলি-ঢলির আপডেট। আপডেটের শেষ নেই। এতকিছু আপডেট রাখি, শুধু নিজের আমলের অপডেট রাখি না। কুরআন কারিম আমাকে এতকিছুর আপডেট রাখতে বলে না। কুরআন কারিম শুধু আমার নিজের আমলের আপডেট রাখতে বলে। বাকিসব প্রয়োজনীয় আপডেট আল্লাহ তাআলাই করে দেবেন।

৯৪. কুরআনি আকর্ষণ

কুরআন কারিম 'নিকৃষ্টতম' কাফিরকেও চম্বুকের মতো সম্মোহনী আকর্ষণ দিয়ে কাছে টেনে এনেছিল! রাতের পর রাত, একঠায় দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত শুনতে বাধ্য করেছিল!

কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবি করার পরও, সেই একই কুরআন আপনাকে কেন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না?

আজ কি আলাদা করে তিলাওয়াত তাদাব্বুর হয়েছিল?

৯৫. অক্ষত কিতাব

দুনিয়ার সমস্ত বই, কিছুদিন পর হয় বিলুপ্ত হয়ে যায়, নয়তো বিকৃত হয়ে যায়, একমাত্র ব্যতিক্রম কুরআন কারিম। সেই শুরুতে যেমন ছিল, আজও তেমনি। দুনিয়ার বইগুলো কিছু সময় পর, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, কুরআন সব সময়ের জন্যে প্রাসঙ্গিক।

৯৬. পিপাসা

পানির অভাবে পিপাসার্ত ব্যক্তি মারা যায়। কিন্তু কুরআনপিয়াসী ব্যক্তির মৃত্যু নেই। অনেক সময় দেখা যায়, পানি খুঁজতে খুঁজতে মরুচারী মুত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু কুরআনের পিপাসায় ছটফট করতে থাকা মানুষকে আল্লাহ তাআলা ঠিকই কুরআনের কাছে নিয়ে আসেন! অথবা কুরআনকে তার কাছে নিয়ে আসেন!

৯৭. অনিবারণীয় তৃষ্ণা

পানির পিপাসা একসময় মিটে যায়। কিন্তু যার মনে একবার কুরআনের পিপাসা ঠাঁই করে নিয়েছে, আর এই পিপাসা মেটে না। দিন দিন কুরআনের পিপাসা বাড়তেই থাকে! বাড়তেই থাকে!

৯৮. তিয়াস

'পিপাসা' বড় শক্তিশালী বস্তু। দুনিয়াতে অনেক রকমের পিপাসা আছে। কারও জ্ঞানের পিপাসা! কারও ধনের পিপাসা! কারও জনের পিপাসা! কারও মনের পিপাসা! আবার কারও কারও 'কা'বার পিপাসাও' আছে। তাদের মন সব সময় কা'বার প্রতি 'পিপাসার্ত' হয়ে থাকে! কা'বার তৃষ্ণায় তারা হরদম ছটফট করতে থাকেন। এমন পিপাসার্ত ব্যক্তি অতি দীন-দরিদ্র হলেও, আল্লাহ তাআলা তাকে 'কা'বার' পানে ডেকে নিয়ে যান!

কারও কারও মনে আবার কুরআনের পিপাসাও থাকে। অজপাড়ার নিতান্ত সাধারণ মানুষ হয়েও কুরআনের পিপাসা তাকে অসাধারণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। না বুঝে কুরআন পড়েও, মানুষটা হাজারো বইপড়ুয়া মানুষের চেয়ে বেশি দামি হয়ে যান। আর কুরআন বুঝে পড়লে তো কথাই নেই।

নিতান্ত আটপৌরে লোক, প্রচলিত অর্থে 'মূর্খ'। শুধু দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারেন, নিয়মিত পড়েনও, এমন লোক, অসংখ্য কুরআনহীন 'জ্ঞানী' মানুষের চেয়ে উত্তম।

৯৯. উপকারী কিতাব

দুনিয়ার যে-কোনও বই না বুঝে পড়লে কোনও উপকার হয় না। একমাত্র কুরআন কারিম তার ব্যতিক্রম। না বুঝে পড়লেও, বিস্ময়করভাবে (তাযকিয়ায়ে নাফস) আত্মার পরিশুদ্ধি হয়ে যায়। তবে, কুরআন কারিম বোঝার চেষ্টা করা প্রতিটি মুমিনের উপর আবশ্যক। কারণ, কুরআন কারিম নাজিল হয়েছে, বোঝার জন্যে। মানার জন্যে।

১০০. জান্নাত

কুরআন কারিম জান্নাতের অংশ। কুরআনের সাহচর্যে কাটানো সময়টুকুতে আমি মূলত জান্নাতি আবহেই থাকলাম। দুনিয়ার বুকে জান্নাতের আমেজ কত সহজেই আমাদের হাতের নাগালে। হাত বাড়ালেই জান্নাত!

১০১. কুরআন পাঠ

আমিরুল মুমিনিন (চতুর্থ খলিফা) আলি রা. একলোককে বলেছিলেন,

-তুমি বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে, কুরআন কারিমকে তিন প্রকারে তিলাওয়াত করা হবে।

১. একদল কুরআন পাঠ করবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যে।
২. একদল কুরআন পাঠ করবে দুনিয়া হাসিলের জন্যে।

৩. একদল কুরআন পাঠ করবে তর্কে জেতার জন্যে।

যে যেই জন্যেই পাঠ করবে, মনোবাঞ্ছা লাভ করবে।

১০২. অনন্য কুরআন

মুসলিম উম্মাহর পনেরো শ বছরের ইতিহাস জুড়ে গ্রিক দর্শনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, পাশাপাশি কুরআন বোঝার ক্ষেত্রেও উম্মাহর প্রথম সারিতে অবস্থান রাখেন, এমন মানুষ হাতেগোনা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. ছিলেন এই ঘরানারই একজন। তিনি তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা কথা বলেছিলেন,

'আমি পুরো কালামশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছি। আমি দর্শনশাস্ত্রের নানা মতপথ নিয়েও সুবিস্তৃত পড়াশোনা করেছি। কিন্তু কুরআন কারিমের মতো উপকারী আর কিছু পাই নি'।

১০৩. মুদ্রিত কুরআন

মোবাইলে কুরআন কারিম তেলাওয়াতের বেশ প্রচলন হয়েছে আজকাল। ভালো। কিন্তু কাগজে ছাপা কুরআন কারিমও সময় সময় হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করা জরুরি। মোবাইলে তিলাওয়াত করতে বসলে ক্ষণে ক্ষণে মনোযোগ টুটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ছাপার অক্ষরের কুরআন নিয়ে বসলে, সে সম্ভাবনা থাকে না। আসল কথা হলো, ছাপার অক্ষরে কুরআন কারিম নিয়ে বসার সুযোগ থাকলে, মোবাইলে না পড়াই উত্তম বলে মনে করেন অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম। একান্ত বাধ্য হলে, তখন মোবাইলে তিলাওয়াত করতে কোনও বাধা নেই। প্রতি হরফে দশ নেকি। এটা মোবাইল-মুসহাফ উভয়টাতেই সমান।

১০৪. দ্বীন শেখা

দ্বীন শেখার জন্যে কত বই কেনা হয়। দ্বীন শেখার জন্যে কত সময় অনলাইন-অফলাইনে ব্যয় করা হয়। প্রতিদিন এ সময়ের চার ভাগের একভাগও যদি কুরআন কারিম ও তাদাব্বুরের পেছনে ব্যয় করা যেত, তাহলে শতগুণ বেশি দ্বীন শেখা যেত। হিদায়াত নসিব হয়ে যেত। এমনকি প্রতি মাসে কয়েক খতম কুরআনও তেলাওয়াত হয়ে যেত।

১০৫. কুরআনপ্রেমী

আহলে কুরআন (কুরআনপ্রেমী/কুরআনসেবী) হতে চাইলে, সবচেয়ে কার্যকর উপায় একটাই, আহলে কুরআনের সাথে ওঠাবসা করা। তাদের সঙ্গ গ্রহণ করা। কারণ ওঠাবসা (المجالسة) থেকেই সাদৃশ্য (المجانسة) তৈরি হয়।

১০৬. উলুল আযম

আহলুল হিমাম বা উলুল আযম (দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী) কারা?

যারা ঈদের দিন, তার পরদিনও নিয়মিত হিজব আদায় করতে ভোলেন না। শত আনন্দে, হাজারো ব্যস্ততাতেও প্রতিদিনের পারা ঠিকই তিলাওয়াত করে ফেলেন।

১০৭. কুরআনের আলো

কুরআন কারিমের সাথে লেগে থাকলে, কুরআন কারিম তার চিন্তা ও মানস লালন-পালনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সে ব্যক্তি টেরটিও পায় না, তার পথচলাটা কীভাবে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কুরআনের প্রভাবে তার আচরণ ঠিক হয়ে যায়। ভাষা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে অসংযত ভাষা ও শব্দ দূর হয়ে যায়। অনর্থক গল্পগুজব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। জীবন থেকে অতীতের যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয়াশয় দূর হয়ে যায়। জীবনটা ভরে ওঠে এক অপার্থিব আলোয়।

১০৮. নুর

মুসহাফ হাতে নিয়ে তিলাওয়াতে দুই নূর!

১. তিলাওয়াতের নুর।

২. কুরআনের লিখিত রূপের নুর।

১০৯. কেন?

একটা পর্যায়ে গিয়ে, পেশাগত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে পেশাগত পড়াশোনা আর প্রয়োজন হয় না। তখন যারা পড়ুয়া, তারা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পছন্দ করেন। ভালো। কিন্তু যারা ধর্মকর্ম পালন করেন বা করবেন বলে ঠিক করেছেন, তারা কেন কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাতেন? এই জীবন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। এখন বুঝ আসার পরও কেন, আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছু আমাকে টানে? এখনো কেন কুফরি গণতন্ত্র, কাফিরের জীবনী, দুনিয়াবি খবরাখবর আমাকে আকর্ষণ করে?

১১০. জিকির

'জিকির' মানে কী? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি আমার চিন্তা ও কল্পনায় প্রথমেই 'কুরআন কারিম' না এসে অন্য কিছু আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমার দীনি বুঝে কিছুটা হলেও ভেজাল আছে। জিকির বলতে যদি আমার প্রথমেই মনে হয়, তাসবিহ বা হাতের কড়ে নির্দিষ্ট কিছু 'শব্দ' বা 'বাক্যকে' বারবার আওড়ানো, তাহলে বুঝে নিতে হবে, আমার দীনি ইলম অর্জনের পদ্ধতিতে কিছুটা হলেও কুরআন কারিম কোণঠাসা হয়ে আছে।

১১১. কুরআনই একমাত্র

আমার অনেক জ্ঞান, আমার অনেক মান, আমার অনেক মেধা, আমার অনেক যোগ্যতা, আমার অনেক বুঝ, আমার চিন্তার অনেক গভীরতা কিন্তু এসবের সাথে কুরআন কারিম নেই, তাহলে আমার কিছুই নেই।

১১২. শহীদ

গতকাল এক শহীদ (ইনশাআল্লাহ) ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি শহীদ হয়েছিলেন পাঁচই মের পরদিন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, একটা বিষয় মনে হল: 'কোনও পরিবারে যখন কেউ শহীদ হন, তখন পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়'।

১. কেউ সরাসরি কুরআনের কথা বিশ্বাস করে, সবর করেন। কুরআন কারিম বলে, শহীদগণ মরেও অমর থাকেন। তারা অন্যদের মতো একেবারে মরে যান না। তারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় জীবিত থাকেন। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়।

২. কেউ কেউ সরাসরি কুরআনের বিপরীত অবস্থান নিয়ে, অসংখ্য অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে ফেলে। ফলে পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো তাদের ঈমান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

১১৩. বিচ্যুতি

কেউ সারাক্ষণ কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন, সব সময় কুরআন নিয়ে কথা বলেন। সুযোগ পেলেই কুরআন কারিম নিয়েই লিখেন। এমন মানুষের মধ্যেও ভ্রান্তি থাকতে পারে। বিরাট তাফসির লিখে ফেললেও তার মধ্যে ভ্রান্তি থাকতে পারে। বিরাট কুরআনি আন্দোলনের নেতা হলেও গোমরাহি থাকতে পারে।

সেদিন এক তাফসিরকারকে দেখলাম, অন্য এক তাফসিরের আকিদার ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই জালিয়াতির আশ্রয় নিলেন। আগে অবাক লাগতো, এসব দেখে এখন আর অবাক লাগে না। বরং ভয় লাগে। রাব্বে কারিম না বাঁচালে যে-কেউ গোমরাহির গর্তে পড়ে যেতে পারে। ইয়া রাব্ব! রহম ফরমা!

১১৪. মুহাজির মাওলানা

এবার মুহাজির ভাইদের খেদমতে যাওয়ার পথে এক মাদরাসায় রাত যাপনের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্যে চমৎকার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারাও মাওলানা হওয়ার সুযোগ নিতে পারেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যবস্থাপনা জানার চেষ্টা করেছি। ভালো লেগেছে। কিন্তু একটা পুরোনো চিন্তা মাথায় এসে ভিড় জমিয়েছে,

'সবাই মাওলানা হতে চায়। মহিলা মাদরাসা, পুরুষ মাদরাসা সব জায়গাতে একই অবস্থা। কেন সবাইকে প্রথাগত মাওলানা হতে হবে? হ্যাঁ, সবার চেষ্টা থাকতে হবে কুরআন কারিম ভালো করে জানার। সিরাত ভালো করে জানার। মাওলানা হবে বাছাই করা কিছু ছেলে ও মেয়ে। যারা আসলেই ইলমপিপাসু'। বাকিরা দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে, কুরআন কারিমের সাথে লেগে থাকবে।

১১৫. প্রেরণা

যে সমস্ত বোনেরা সব সময় ঘরে থাকেন, বাইরের কোনও ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে হয় না। স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়েই থাকেন, তাদের জন্যে কুরআনে সমর্পিত হওয়া কত সহজ। আমি ঘরেও কথাটা প্রায়ই বলি,

'তুমি চাইলে এ-যুগের সেরা কুরআনমানবী হতে পারো। আমরা পুরুষরা বাইরে যাই, এটাসেটা দেখি, ওটাসেটা পড়ি, নানাজনের সাথে মিশি। এসবের কারণে চিন্তা-চেতনায় গুনাহের ছাপ পড়ে। তোমার সে ঝামেলা নেই। গুনাহের সুযোগ নেই। শুধুই সওয়াব আর সওয়াব।'

ঘরে থেকে ঘর-সংসার করা বোনদের জন্যে কুরআন কারিম হতে পারে সেরা বন্ধু। সেরা আশ্রয়। সেরা আনন্দের উপকরণ। অবসর যাপনের সেরা মাধ্যম। এমন কিছু বোনকে দূর থেকে চেনার জানার তাওফিক রাব্বে কারিম দিয়েছেন। এমন বোনদের জীবন সত্যি প্রেরণা জোগায়। তারা হতে পারলে, অন্যরা হতে পারা কঠিন কিছু নয়।

১১৬. অবস্থান

কুরআন কারিম দোধারি তলোয়ারের মতো। হিদায়াত দেয়। আবার উল্টাপাল্টা করলে, গোমরাহ করে দেয়। আমি যদি শুধু হিদায়াত তলবের জন্যে তিলাওয়াত করি, তাদাব্বুর করি, তাহলে আমি হিদায়াত পাবোই। কোনও সন্দেহ নেই। আর যদি বিতর্কের সূত্র লাভের জন্যে, নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কুরআন নিয়ে বসি, তাহলে ফলাফল কী হবে সেটা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। রাব্বে কারিমের রহমতই ফলাফল নির্ধারণ করে। আমার কুরআন পাঠ, আমার কুরআন তাদাব্বুর হবে হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে। ইনশাআল্লাহ। আমরা কে কেন কুরআন নিয়ে থাকি, সেটা সব সময় পরিষ্কার থাকা দরকার।

১১৭. রোগের নিদান

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন,

'এমন কোনও 'দা' (ব্যাধি) নেই, যার নিদান কুরআনে নেই'।

প্রতিটি রোগ উপশমের নিদান ও বিধান কুরআন কারিমে আছে। রোগের কারণও কুরআনে আছে। রোগমুক্তির উপায়ও আছে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগের।

১১৮. উপশম

কুরআন কারিম তিলাওয়াত অন্তরের ব্যাধির উপশমে কেমন ভূমিকা পালন করে? ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন,

'মধু যেমন দুর্বল শরীরকে সবল করে তোলে, কুরআন তিলাওয়াতও কলবকে ঠিক সেভাবে চনমনে করে তোলে। ব্যাধিমুক্ত করে তোলে'।

১১৯. খতমে কুরআন

আবুল আব্বাস ইবনুল আতা রহ.। হিজরি চতুর্থ শতকের আলিম। বুযুর্গ। খুব বেশি তিলাওয়াত করতেন। খুব দ্রুত কুরআন কারিম খতম হয়ে যেত। একবার ঠিক করলেন, কুরআন কারিম একবার বুঝে বুঝে পড়ে খতম করতেন। দশ বছরেও এক খতম দিতে পারেন নি। খতম শেষ হওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া)।

কুরআন কারিমকে গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে পড়া উচিত। পাশাপাশি মোটামুটি বুঝে বা না বুঝলেও বেশি বেশি পড়া উচিত। দুভাবেই মেহনত চালিয়ে যাওয়া উচিত। দুই তরিকাতেই উপকার আছে। বুঝে পড়লে বেশি লাভ এবং এটাই মূল পদ্ধতি। না বুঝে পড়লেও লাভ আছে তবে শুধু না বুঝে পড়ার জন্যে কুরআন কারিম নাজিল করা হয় নি।

১২০. রবের স্মরণ

আবু মুসা আশ'আরি রা. অত্যন্ত চমৎকার লাহানে তিলাওয়াত করতে পারতেন। নবীজি সা.-ও তাঁর তিলাওয়াত মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সাহাবায়ে কেরাম কোথাও কোনও উপলক্ষ্যে জমায়েত হলে, আবু মুসা রা.-কে অনুরোধ করতেন,

-আবু মুসা! আমাদের রবকে একটু স্মরণ করিয়ে দিন!

মানে আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান।

কুরআন কারিম শুনলেই রবের কথা মনে পড়ত তাদের।

আমার তো কুরআন কারিমের কথাই মনে থাকে না, রবের কথা মনে থাকবে কী করে?

১২১. কুরআনি বন্ধু

উমার রা.-এর একজন কুরআনি বন্ধু ছিল। তিনি আনসারি ছিলেন। দুজনে পালাক্রমে কুরআন শিখতেন। একজন নবীজি সা.-এর কাছে থাকতেন, নতুন কোনও ওহি নাজিল হলে শিখে রাখতেন। আরেকজন জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে

থাকতেন। এভাবে একজন আরেকজনের কাছ থেকে কুরআন শিখতেন। একটা আয়াতও যাতে ছুটে না যায়। আমার বেলায় দিনকে দিন চলে যায়, কুরআন নিয়ে বসার কথাই মনে থাকে না।

১২২. মাদরাসাতুল কুরআন

মক্কা ও মদীনার প্রতিটি ঘরই ছিল 'মাদরাসাতুল কুরআন'। স্বামী ঘরে ফিরলেই ঘরের মানুষগুলো ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করতেন,

'আজ নবীজির উপর নতুন কোনও ওহি নাজিল হয়েছে? তাড়াতাড়ি আমাকে শোনান। কুরআন কারিমের নতুন কী শিখে এসেছেন, আমাকে জলদি শিখিয়ে দিন'!

১২৩. কুরআনের মোড়ক

যে-কোনও দামি জিনিসই মোড়কে মুড়িয়ে রাখতে হয়। আল্লাহ তাআলাও তার বাণীকে ভাষার মোড়কে মুড়িয়ে পাঠিয়েছেন। অর্থকে ধারণ করার জন্যে মোড়ক হিশেবে, আরবির সাথে কোনও ভাষারই তুলনা হয় না। কুরআন কারিমের মোড়ক উন্মোচন করতে না পারলে, আল্লাহ তাআলার মূল বাণীর কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আমরা গাছ থেকে নারকেল পাড়ি। শুধু পানি খেতে চাইলে ফুটো করলেই চলে। কিন্তু খোল বা মালা না ভাঙলে ভেতরের নারকেল পর্যন্ত পৌঁছা যায় না। কুরআন কারিম না বুঝে তিলাওয়াত করলেও অনেক ফায়েদা। তবে না বুঝে তিলাওয়াত কুরআন কারিমে নাজিলের মূল উদ্দেশ্য নয়। এটা হলো খোল ফুটো করে পানি খাওয়ার মতো। মূল শাঁস বা নারিকেল খেতে হলে খোল ভাঙতে হবে। রবের মূলবাণী বুঝতে হলেও আরবি ভাষা শিখতে হবে। অথবা কারো কাছ থেকে মূলবাণীটা বুঝে নিতে হবে।

১২৪. সাফাইয়ে কলব

ঘরদোর, জামাকাপড়, হাম্মাম পরিষ্কার করার জন্যে বাজারে কত কি উপকরণ পাওয়া যায়। আমরা সেসব কিনে আনি। এজন্যে অনেক টাকা খরচ করি। সময় ব্যয় করি। সাবান কিনে আনি, ক্লিনিংয়ের নানাবিধ দ্রব্য কিনে আনি।

কলব সাফ করার জন্যে কি আমি এতটা সময় ব্যয় করি? টাকা খরচ করার চিন্তা করি? কলব সাফ করার জন্যে আমাকে বাজারে যেতে হবে না। টাকাও খরচ করতে হবে না। খুব বেশি সময়ও ব্যয় করতে হবে না। উপকরণ আমার ঘরেই মজুত আছে। সেটা হলো কুরআন কারিম। একটুখানি কুরআন কারিম নিয়ে বসলেই আমার কলব সাফ হয়ে যাবে।

১২৫. কুরআনি গোসল

শরীরের 'ময়লা' সাফ করার জন্যে গোসল করি। মনের ময়লা দূর করার জন্যেও গোসল করা প্রয়োজন। মনের গোসলের অনেক পদ্ধতি আছে। জিকির হলো প্রধানতম মাধ্যম। কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে সেরা জিকির। আমরা মাদরাসায় প্রতি বছর একবার করে কুরআন তরজমার খতম করি। প্রতিবারই খতম শেষ করার পর, মনে হয়, একটা গোসল দিয়ে এলাম। গোসলের দ্বারা শরীরের ময়লা দূর হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেও কলবের অনেক ময়লা দূর হয়ে যায়। অনেক চিন্তার পরিবর্তন ঘটে যায়। খতম শেষে মনে হয়, আমি নতুন আরেক মানুষের পরিণত হয়েছি। অবশ্য দুনিয়ার নানাবিধ কলুষতার কারণে, মনটা আবার কলুষিত হয়ে যায়। আবার কুরআন দিয়ে কলব সাফাইয়ে লেগে যেতে হয়।

১২৬. কোমলহৃদয়

ভালো কোনও সাহিত্য পাঠে হৃদয় কোমল হয়। ইতিহাস পাঠ করলে ইবরত বা শিক্ষা অর্জন হয়। কুরআন কারিম পাঠ করলে হৃদয় কোমল হয়। ইবরত হাসিল হয়। সওয়াব অর্জন হয়।

১২৭. পরাধীন তাফসির

কুরআন কারিম বুঝতে চাইলে, উপনিবেশিক আমলের আগের মুফাসসিরীনের কেরামের তাফসির থেকে বোঝা ভালো। নিরাপদ। সবচেয়ে ভালো হয়, প্রথম তিন শতাব্দীর এদিকে না আসা। বিশেষ করে ঈমান কুফর ওয়ালা ওয়াল বারা, নিফাক বোঝার জন্যে। এসব বোঝা হয়ে গেলে, তারপর বর্তমানের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে।

১২৮. স্ববিরোধিতা

আমরা কুরআনের চারপাশে জড়ো হই, কিন্তু কুরআন কারিমের ভেতরে প্রবেশ করি না। কুরআনের জন্যে জড়ো হই কিন্তু কুরআনি বিধানকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়নের জন্যে জড়ো হই না। কুরআন সাথে নিয়ে জড়ো হই কিন্তু কুরআনের দিক-নির্দেশনা মেনে জড়ো হই না। কুরআন কারিমের জন্যে সংগ্রাম করি। সংগ্রাম শেষ হলে কুরআনবিরোধী শাসনব্যবস্থার সাথে আপস করে ফেলি। মসজিদে-ওয়াজে-সমাজে কুরআনি শাসন চাই। সমাজে এসে কুরআনবিরোধী শাসনে তুষ্ট হয়ে পড়ি। বেশিরভাগ সময়, কুরআনি আইনের প্রতিই রুষ্ট হয়ে পড়ি।

১২৯. ক্ষোরকানিয়া মক্তব

সবাহী (প্রভাতি) মক্তবগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে বলা যায়। এর বিপরীতে কিন্ডার গার্টেনগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা বেশ সমাদৃত হচ্ছে। অথচ

দুই ধারার শিক্ষার মান ও পরিমাণে আকাশ পাতাল তফাত। আগে মক্তবে একটা শিশু কুরআন পড়তে শিখত। তার মানে সে প্রায় ৭৭৪৩০টা শব্দ পড়তে ও লিখতে শিখত। আর এখন কেজি স্কুলে একটি শিশু বড়জোর পঞ্চাশ থেকে শুরু এক হাজার শব্দের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

১৩০. কুরআনের সম্মান

মিসরের শায়খ কিশক রহ. এক বয়ানে বলেছিলেন,

উসমানি খিলাফাহর আমলে এক তুর্কি মুসলিম ছিল। তিনি কুরআন কারিমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পরম যত্নে আলাদা কামরায় কুরআন কারিম রাখতেন। তিলাওয়াত করার সময় হলে, কুরআনি কামরায় গিয়ে তিলাওয়াত করতেন। কুরআনি কামরা থেকে বের হওয়ার সময়, কুরআন কারিমের দিকে পিঠ দিয়ে বের হতেন না। কুরআন কারিমের দিকে মুখ করে বের হতেন।

কুরআন কারিম সম্মানের। কুরআন কারিমকে যথাযথ সম্মান দেওয়া আবশ্যক। তবে সম্মান দানের অতিশয্যে কুরআন কারিমকে জীবন থেকেই আলাদা করে ফেলব, এটা কুরআনের দাবি নয়। কুরআন কারিমের দাবি হলো, তার বিধি-বিধানকে মানা।

১৩১. কুরআনশিক্ষা

ইমাম সুমআনি রহ. বলেছেন:

-আবু মানসুর খাইয়াত রহ. মারা গেলেন। পরিচিতজনেরা তাকে স্বপ্নে দেখলেন। জানতে চাইলেন:

-আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?
-আমাকে মাফ করে দিয়েছেন!
-কোন আমলের কারণে?
-আমি যে বাচ্চাদেরকে সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিতাম, সেজন্য!

১৩২. হাজরুল কুরআন

-আপনি একবার বলেছিলেন, কুরআন পরিত্যাগকারীর পরিণতি হবে ভয়ংকর। মাঝেমধ্যে এমন হয়, কয়েক দিন পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করা হয়ে ওঠে না। এটাকে কি 'হাজরুল কুরআন' (কুরআন পরিত্যাগ) বলা হবে?

-এক্ষেত্রে তোমাকে পরিত্যাগকারী বলা যাবে না, তবে তুমি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছ এটা সত্যি। কারণ, তিলাওয়াত করতে না পারাটাই প্রমাণ করে তুমি আল্লাহর সাথে কথাবলা ব্যক্তিদের তালিকায় নেই।

-আমার করণীয় কী?

-আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে তাউফিকের দুআ করা।

১৩৩. বোঝার মেহনত

যে গুরুত্ব দিয়ে তিন বা চার বছর একটি শিশু বা কিশোরকে হিফজখানায় রেখে কুরআন কারিম হিফজ করানো হয়, ঠিক এমন গুরুত্ব দিয়ে যদি তাকে কুরআন বোঝা ও মানার মেহনতে শামিল করা যায়, তাহলে ফলাফল আরও ভালো হওয়ার আশা করা যায়। হিফজখানায় কাটানো দীর্ঘ সময়টাতে অনেক সময় অযথা ব্যয় হয়ে যায়। একজন ছাত্র পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের পুরোটা সমান মনোযোগে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করে না। বিশেষ করে দুপুরে আমুখতা শোনানোর পর, সকালে সাতসবক শোনানোর পর কিছুটা ঢিলেমি আসে। অনেক সময় সবক শেখা হয়ে গেলে ঈশার পরও ঢিলেমি আসে। সময়টা নষ্ট হয়। এমন অলস শিথিল সময়গুলোতে তাকে অন্য কিছুও দেওয়া যেতে পারে। অন্তত কুরআনি শব্দগুলোর অর্থ শেখানো যেতে পারে।

১৩৪. কুরআনের দাওয়াত

দা'ঈ আলিমগণের জন্যে বড় একটি নিয়ামত হলো, তাদের দাওয়াতি কাজ করতে হয়, কুরআন কারিম বিশ্বাস করে এমন এক সমাজে। মানুষ কুরআন কারিম বুঝতে প্রস্তুত। কুরআন কারিমকে ভালোবাসতে প্রস্তুত। শুধু তাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষাটা পৌঁছে দেওয়া। অথচ কুরআন কারিমের খণ্ডিত শিক্ষাকেই শুধু প্রকাশ করি। বেশির ভাগ দা'ঈ নিজের জন্যে কুরআন কারিমের নির্দিষ্ট একটা অংশকে নির্ধারণ করে নেন। এর বাইরে তিনি কথা বলতে চান না। কথা বলাকে অনধিকারচর্চা মনে করেন। তারপরের প্রজন্ম নিজের দাওয়াতের পরিধিকে আরও খণ্ডিত করে ফেলে। এভাবে কুরআনির পয়গাম খণ্ডিত হতে হতে কালিমা আর সালাতে এসে ঠেকেছে।

১৩৫. সতর্কতা

যারা সব সময় কুরআন কারিম নিয়ে থাকেন,
যারা সব সময় কুরআন নিয়ে লিখেন,
যারা সব সময় কুরআন নিয়ে বলেন,
যারা কুরআনপ্রেমী হিশেবে পরিচিত,
যারা কুরআনের আধুনিক ব্যাখ্যার প্রতি বেশি জোর দেন,
যারা কুরআনের যুগোপযোগী তাফসির করার দাবি তোলেন,
যারা সবাইকে কুরআন কারিম বোঝানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগেন,

তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা কাম্য। এমন কেউ আলিম হলেও, অন্য আরেকজন অভিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে সত্যায়ন করানো ছাড়া, তার কথা-লেখা-বক্তব্য-তাফসির গ্রহণ করা নিরাপদ নয়।

কারণ, কুরআন কারিম হিদায়াত দান করে। পাশাপাশি ভুল পদ্ধতি অবলম্বন বা নিজে নিজে কুরআন বুঝতে গিয়ে, অনেক অভিজ্ঞ আলিমও হোঁচট খেয়ে যান।

আলিম হলেও নিজের কুরআনি চিন্তা ও ব্যাখ্যাকে সালাফের সাথে মিলিয়ে ঝালিয়ে নেওয়া আবশ্যক। নিজের কুরআনি মেহনতকে অভিজ্ঞ আলিমের সামনে পেশ করে যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি

১৩৬. নেশা

-হুজুর, কুরআন কারিম নিয়ে সালাফের মাশগালাহ (নিমগ্নতা) কেমন ছিল একটু যদি বলতেন!

-সত্যি সত্যি জানতে চাও?

-জি।

-সহজ করে বলব নাকি কঠিন করে বলব?

-সহজ করে!

-এনড্রয়েড মোবাইল নিয়ে তুমি যেমন অনুক্ষণ-হরদম, সকাল-সন্ধ্যা, রাতদিন বুঁদ হয়ে থাক, সালাফও ঠিক এমনই প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন কারিমে ডুবে থাকতেন।

১৩৭. আল-কুদস

পড়া (قرأ) শব্দমূলটি কুরআন কারিমে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বমোট ৮৮ বার। তার মধ্যে কুরআন (القرآن) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮ বার। অবাক করা ব্যাপার হলো, 'কুরআন' শব্দটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলে। সর্বমোট ১১ বার।

এই সূরার শুরুতেই 'আল-মাসজিদুল আকসা'-এর কথা আলোচিত হয়েছে। ইয়াহুদিদের উত্থান ও পতনের কথা আলোচিত হয়েছে। তাদের চূড়ান্ত পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

তার মানে এই ধরে নিতে পারি, আল-আকসাকে উদ্ধার করতে হলে, ইয়াহুদিদেরকে খেদাতে হবে, আমাদেরকে 'আল-কুরআনের' কাছে ফিরে আসতে হবে? কুরআনি শাসনব্যবস্থার পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে? কুরআনি হুদুদ-কিসাস-আহকামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহর পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে?

১৩৮. চলমান সুন্নাহ্

বুখারি শরিফে একটা অধ্যায় আছে: (باب القراءة على الدابة) 'বাহনের উপর তিলাওয়াত অধ্যায়'। তাতে আছে,

-নবীজি বাহনে আরোহণ করা অবস্থাতে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করতেন।

বুখারি শরিফের বিখ্যাত ভাষ্যকার 'ইবনে বাত্তাল' রহ. বলেছেন, বাহনে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

সাইকেলে, বাইকে, বাসে, ট্রেনে, বিমানে, নৌকায় তিলাওয়াত করাও সুন্নাত। এতদিন সুন্নত হওয়ার বিষয়টা মাথায় থাকত না। এবার থেকে বাড়তি গুরুত্ব যোগ হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩৯. বিরক্তি ও তৃপ্তি

দুর্বল ঈমানের লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বিরক্ত হয়। আরেকটু কম দুর্বল ঈমানের লোকেরা কিছুক্ষণ শোনার পর বিরক্ত হতে শুরু করে। যার যার ঈমানের স্তর অনুযায়ী বিরক্ত হতে থাকে। পূর্ণ ঈমানদার কখনোই কুরআন শুনে বিরক্ত হয় না। যতই শোনে তার তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়। পরিতৃপ্তি আসে না।

১৪০. তরকে কুরআন

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন:

-একটানা তিন দিন কুরআন কারিম তিলাওয়াত না করলে, কুরআন 'বর্জনকারীর' তালিকায় নাম উঠে যায়। নবীজি সা. কুরআন তরককারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন।

১৪১. ধর্না

কুরআন কারিম তিলাওয়াত করতে বসলে আগ্রহ ধরে রাখতে পারি না। তিলাওয়াত করলেও মজা পাই না। তার মানে, আল্লাহ তাআলা আমার পাপের কারণে, আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি এখন কী করব?

-বিপদে পড়লে কী করে?

-ত্রাণকর্তার দুয়ারে বারবার ধর্না দিই। দুয়ার না খোলা পর্যন্ত খটখট করে যাই। করেই যাই। আমিও জোর করে করে তিলাওয়াত করে যাব। দয়াল রবের দুয়ার খুলনেই খুলবে। ইন শা আল্লাহ।

১৪২. চিকিৎসা

সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে, কিছুই ভালো লাগে না, বিষণ্ণ রোগে ভোগে। হাতের কাছে কুরআন কারিম রেখে, জনে জনে মনোচিকিৎসক দেখিয়েছে। কোনও কাজ হয় নি। তার অবস্থা হলো, সাথে পানি রেখে, মরুভূমিতে তীব্র পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে ধুঁকতে থাকা ব্যক্তির মতো।

১৪৩. মৃত কলব

গাড়ি ভাড়া করতে এসে দেখ, চালক নিবিষ্ট মনে কুরআন তিলাওয়াত করছে। দরদাম করে গাড়িতে উঠেই যাত্রী প্রশ্ন করল,

-কেউ মারা গেছে বুঝি?
-কেন একথা বলছেন?

-তন্ময় হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখলাম!
-জি, মারা গেছে। আমার কলব মারা গেছে।

১৪৪. সমর্পণ

একটি শিশু ক্ষুধা লাগলে মায়ের স্তন খোঁজে। রাতের অন্ধকারে, ঘুমের ঘোরেও মায়ের স্তন খুঁজে বের করে ফেলে। চোখ বন্ধ করেও ঠিক ঠিক মুখ লাগিয়ে চুকচুক করে দুধ পান করতে শুরু করে।

আমার অবস্থাও তো এমন হওয়া উচিত। শিশুর যেমন দুধ প্রয়োজন, আমারও কিছু একটা প্রয়োজন। সেটা হলো কুরআন কারিম। সুখে-অসুখে কুরআন কারিম হবে আমার মাতৃদুগ্ধ। ঘুমের ঘোরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কুরআন কারিম হবে আমার প্রথম ও একমাত্র অবলম্বন। শিশু ব্যথা পেলে প্রথমে মায়ের কাছে আসে। আমিও বিপদে-আপদে প্রথমেই আল্লাহর কালামের কাছে আসব।

১৪৫. ইলমের সত্যায়ন

কুরআন শিখেই শেখাতে বসে যাওয়া উচিত নয়। অন্যকে শেখাতে যাওয়ার আগে প্রয়োজন, আমি যা শেখাতে যাচ্ছি, সেটা সঠিকভাবে শিখেছি, উস্তাদের কাছ থেকে এটা সত্যায়িত করে নেওয়া জরুরি। আমি ভুল শেখাচ্ছি না, এটা নিশ্চিত করা আবশ্যক। একজন অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত আমানতদার উস্তাদের কাছ থেকে 'ইজাযাহ' বা অনুমতি লাভ করা দরকার। এটাই সালাফের সুন্নাহ।

১৪৬. ইতকান

বড়বেলায় কুরআন শিখতে শুরু করলে, কিছুদিন পড়েই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কুরআনি ইলমে ইতকান বা দক্ষতা আসতে সময় লাগে। দীর্ঘদিনের চর্চা

লাগে। বয়েস বেড়ে গেলে কুরআনি হরফগুলোর উচ্চারণ যথাযথভাবে হতে চায় না। ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হয়।

কেউ কেউ কিছুদিন চেষ্টার পর কুরআন কারিম শুদ্ধ করার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। স্বপক্ষে কল্পিত ফতোয়া হাজির করে—কুরআন শুদ্ধ করে পড়া আবশ্যক নয়। মোটামুটি পড়তে পারলেই হবে। এসব ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহর কাছে নিয়মিত দুআ করা দরকার। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে কুরআন শুদ্ধ করার মেহনতে মশগুল হওয়া জরুরি।

১৪৭. মিডিয়ার ধাঁধা

মিডিয়ার বদৌলতে জানতে পারছি, অনেক ছোট ছোট শিশুও হাফেজ হয়ে যাচ্ছে। তাদের নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি দেখে মাঝেমধ্যে মনে ভয় জেগে ওঠে, এই মাসুম শিশুগুলোকে নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি না করলেই কি নয়? তাদেরকে এত ছোট বয়েসেই পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসলে কচি শিশুমন খ্যাতি প্রশংসা, ক্যামেরা, ফ্ল্যাশলাইটের চাকচিক্যময় মোহে পড়ে যাবে না তো? এটা ঠিক এমন শিশুদের চাঞ্চল্যকর প্রতিভা দেখে, সারা পৃথিবীর আরও হাজারো শিশু উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু হাজার শিশুর জন্যে এই একটি শিশুর জীবন কুরবানি হয়ে যাচ্ছে কি না, সেটা খেয়াল রাখা উচিত। প্রশংসা খ্যাতির পথ বেয়েই শয়তান হানা দেয়। রাসুলুল্লাহও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন।

১৪৮. মুয়াল্লিমুল কুরআন

কুরআন শেখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুরুতে একজন উস্তাদের কাছে কুরআন পড়তে শেখে। প্রাথমিক যোগ্যতা হয়ে গেলে আরও যোগ্যতর কোনও উস্তাদের কাছে চলে যায়। আগের উস্তাদের কথা মনেও থাকে না। এটা কুরআনের ছাত্রের কাছে কাম্য নয়। মুয়াল্লিমুল কুরআন যত ছোটই হোক, তাকে আজীবন সম্মান-সমাদর করে যাওয়া জরুরি। কুরআন আজীবনের, মুয়াল্লিমুল কুরআনও আজীবনের।

১৪৯. কুরআনচর্চা

আখিরাতে কুরআন আমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। আমার বিরুদ্ধে কখন হবে? আমি কুরআনকে দুনিয়ার জন্যে ব্যবহার করলে। দুনিয়ার পদ-মদের জন্যে কুরআনচর্চা করলে। নিজের খ্যাতিসম্মান বৃদ্ধির জন্যে কুরআন নিয়ে থাকলে।

১৫০. অহংকার

অহংকার বড় মারাত্মক গুনাহ। মনে যাররা পরিমাণ অহংকার থাকলেও আল্লাহ দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। অহংকারী হৃদয়ে কুরআন থাকে না। অহংকারী কুরআনি হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

১৫১. ডিভাইস

কিছু আধুনিক মসজিদ থেকে কাগজের কুরআন উঠিয়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসনির্ভর কুরআন প্রচলন করার প্রস্তাব উঠেছে। কেন যেন মনে হলো, এটাই কি শেষ জমানায় কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার প্রথম ধাপ? কাগজের কুরআন তো আগেই গেছে, একদিন ডিভাইস খুলে দেখবে সেখানে কুরআন নেই। ডিভাইসটাই হ্যাং হয়ে আছে? আল্লাহই ভালো জানেন।

১৫২. জান্নাত

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান-জমিনের সমান। কিন্তু অনেক মানুষ এই জান্নাতে একটা কদম রাখার স্থানও পাবে না। আমার এখনই সতর্ক হওয়া অবশ্যক। কুরআন ও সুন্নাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা ভীষণ জরুরি।

পাথুরে জমি দেখেছি কখনো?
সেখানে কিছু জন্মায়?
কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে কর্কশ নির্দয় পাথুরে হৃদয়েও
ঈমানের ফুল ফোটাতে পারে।
কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্মদ ব্যক্তির অন্তরেও আল্লাহর
মহব্বতের ঝরনাধারা বইয়ে দিতে পারে।
কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেপরোয়া নাস্তিকের কলবেও
আল্লাহর ভয়-খাশইয়াহ জাগিয়ে তুলতে পারে।
কুরআন চরম আল্লাহবিরোধীর কাছেও আল্লাহকে সবচেয়ে
প্রিয় করে তুলতে পারে।
তাহলে আর দেরি কেন!
অসুখ চেনা, দাওয়াইও চেনা—আল-কুরআন।
কুরআনকে সত্যি সত্যি আঁকড়ে ধরে, আস্তে আস্তে
গুহামুখের চাঁই অল্প অল্প করে সরাতে শুরু করে দিই।
বাইরে অপেক্ষা করছে সূর্যালোক।
মুক্ত বাতাস।
হৃদয়সঞ্জীবনী পানি।
আল্লাহই একমাত্র সহায়।...